উপেন্দ্রকিশোর সমগ্র রচনাবলী

২

সম্পাদনায়
লীলা মজুমদার

সম্পাদনায় সহকারী
সমীর মৈত্র



এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি
কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-সাত

প্রথম প্রকাশঃ
আশ্বিন ১৫, ১৩৬৬
অক্টোবর ২, ১৯৫৯

প্রকাশিকাঃ
গীতা দত্ত
এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি
এ/১৩২, ১৩৩ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-৭

মুদ্রাকরঃ
ভোলানাথ হাজরা
৩১, বিপ্লবী পুলিনবিহারী দাস স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ লিপিঃ
সুব্রত ত্রিপাঠী

বাঁধাইঃ
সুবর্ণ বুক বাইন্ডিং ওয়ার্কস
১১০ বৈঠকখানা রোড
কলিকাতা-৯

বই প্রসঙ্গে

দেরিতে হলেও উপেন্দ্রকিশোর সমগ্র রচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ড পাঠক বন্ধুদের হাতে তুলে দিতে পেরে আজ আমরা আনন্দিত। গত একটা বছর অনেক বাধা অনেক সঙ্কট পেরিয়ে এসেছি আমরা। যে কথা অতীতে আপনাদের বলার সুযোগ মেলেনি আমাদের।

রচনাবলী পরিকল্পনার দ্বিতীয় গ্রন্থ সুকুমার সমগ্র রচনাবলীর প্রথম খণ্ড ছাপা হচ্ছিল এই শহরেরই কোন এক প্রখ্যাত ছাপাখানায়। আমাদের কাজ অসম্পূর্ণ রেখেই ছাপাখানার কর্তৃপক্ষ নাকি বিদ্যুৎ সঙ্কট জনিত কারণে ছাপাখানার উপর লে-অফ প্রয়োগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন সেদিন। পুরোপুরি শিকার হয়ে পড়ল আপনাদের শুভেচ্ছাপুষ্ট এই ছোট্ট এশিয়া। আংশিক সরবরাহ পেলাম এক-তরফাভাবে মুদ্রক সংস্থার চুক্তি-লঙ্ঘিত বর্ধিত হারে। পর্বত প্রমাণ আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে আমাদের। সে কারণেই এই অহেতুক দেরি।

উপেন্দ্রকিশোর রচনাবলীর ক্ষেত্রে আমরা মূলতঃ বছর পনেরো আগে প্রকাশিত দুই খণ্ডে উপেন্দ্রকিশোর রচনাবলীর উপর নির্ভর করে প্রকাশনার খসড়া বাজেট গ্রহণ করি। পরবর্তীকালে দেখা গেল লেখকের প্রায় ততোধিক লেখা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে রয়েছে যা এর পূর্বে কোন গ্রন্থেই স্থান পায় নি। অবশ্য এর কিছু লেখা আজকের যুগের পাঠকদের কাছে নিরর্থক মনে হতে পারে। কারণ গত একশো বছরে বিভিন্ন রকম পরিবর্তন হয়েছে আমাদের এই পৃথিবীর। সে কারণে, আজকের পাঠকের কাছে তার আবেদন অনেকটা যেন ফিকে হয়ে গিয়েছে। তবুও সেদিনের সূর্যের কিরণ আর চাঁদের আলো আমরা পৃথকরূপে নামমাত্র মূল্যে পাঠকদের কাছে হাজির করছি।

এতকাল আমরা বেশ কিছু লেখা উপেন্দ্রকিশোরের বিভিন্ন গ্রন্থে পড়ে এসেছি—সম্প্রতি প্রকাশিত বিশেষ এক রচনাবলীতে উপেন্দ্রকিশোরের সেই সব লেখা-গুলির অন্তর্ভুক্তি আমাদের বিস্মিত করেছে। সে কারণে, বিতর্কের শরিক না হয়ে আমরাও সেই লেখাগুলি বর্তমান রচনাবলী থেকে সরিয়ে আমাদেরই প্রকাশিত সুকুমার সমগ্র রচনাবলী-তে প্রকাশ করলাম।

যাঁদের সহযোগিতায় এ-বই-এর সুষ্ঠু প্রকাশ সম্ভব হয়েছে তাঁদের প্রত্যেকের জন্য রইল আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। শত ব্যস্ততার মাঝেও সম্পাদনার কাজে ও মূল পাঠ উদ্ধারে অকুণ্ঠ সহযোগিতা পেয়েছি শ্রীসমীর মৈত্র ও শ্রীমতী কৃষ্ণা মৈত্রের কাছ থেকে। পুরনো কালের হারিয়ে যাওয়া অমূল্য পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থ-রাজি দিয়ে সহযোগিতা করেছেন শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত, শ্রীদেবদত্ত দে ও শ্রীঊষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয়। এঁদের প্রত্যেকের জন্য রইল আমার আন্তরিক অভিনন্দন।

সবশেষে এ-বই-এর ভাল-মন্দ বিচারের ভার ছেড়ে দিলাম আমার ক্ষুদে বন্ধুদের উপর—তাদের ভাল লাগলেই সার্থক মনে করব এই উদ্যোগ।

গীতা দত্ত

সূচীপত্র

চিত্র সূচী



জন্ম : ১০ মে ১৮৬৩ ॥ মৃত্যু : ২০ ডিসেম্বর ১৯১৫

শিশুসাহিত্য

যত বড় প্রতিভাসম্পন্ন ও শক্তিমান লেখক হন-না কেন এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে সবাই ছোটদের জন্য লিখতে পারেন না। অন্তত এত ভালো লিখতে পারেন না যা পড়ে ছোটরা আর সহানুভূতিশীল বড়রা, উভয়ই খুশি হবেন। শুধু ছোটরা খুশি হলেই হল না, কারণ তাদের বিচারবোধ নেই; অনেক সময় বাইরের চটক দেখেই তারা ভুলে যায়। কিন্তু সহানুভূতিশীল বড়দের ফাঁকি দেওয়া বড় শক্ত। তবে আবার শুধু বড়দের নয়, ছোটদেরও আনন্দ দিতে পারা চাই। নইলে বই রচনা করার আসল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হল। আনন্দ না পেলে ছোটরা পড়তে চাইবে না। জোর করে পড়াতে হলে, সে বই থেকে তারা কিছু পাবে না। প্রসাদগুণটি না থাকলে অনেক পাঠ্যপুস্তকের যা হয়, এরও তাই হবে। এই তো গেল প্রথম কথা।

দ্বিতীয় কথা হল, যাঁরা নিজেদের ছোটবেলার কথা ভুলে গেছেন, তাঁদের দিয়ে এ-কাজ হয় না। শুধু ঘটনাগুলি মনে রাখলেও চলবে না, ঘটনাকালে নিজের মনের মধ্যে কি হয়েছিল তাও মনে রাখা চাই।

শেষ কথা হল যে, যাদের গাছপালা কীট-পতঙ্গ জীব-জন্তু মানুষ নদী-ডাঙ্গা সাগর-পর্বত সুদ্ধ এই বিচিত্র বিশ্বটাকে ভালো লাগে না, যারা তা দেখে অবাক হয় না, কৃষ্ণপক্ষের রাতে যে আকাশটাকে বেগুনি দেখায় তাও লক্ষ্য করে না, যারা পাখির ছানার, বেড়াল বাচ্চার গায়ে হাত দিতে ভয় পায়, তাদের দিয়েও এ কাজ চলা মুস্কিল। অর্থাৎ এমন একটি কোমল সহানুভূতি-শীল মন চাই, এমন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি চাই, এমন সজাগ কান চাই যে, গাছ থেকে পাতাটি যখন শুকনো হলদে হয়ে, খস্ করে একদিন খসে পড়ে, তার জন্যেও দুঃখ হয়। বিশ্বটাকে ভালো লাগার পিছনে আরেকটি জিনিসও থাকে। সে হল বিশ্বের সৃষ্টিকর্তার মঙ্গল বিধানের উপর আস্থা। তাও চাই।

এত সব একসঙ্গে হলে, তবে একেকজন শিশুসাহিত্যিক তৈরি হয়। তখন আপনা থেকেই রসের উৎসের মুখ খুলে যায়, আর নয়টি রসের মধ্যে ছোটদের উপভোগ্য সাতটির তরঙ্গ ছোটে। শুনতে কঠিন হলেও, দেশে-বিদেশে শত শত মানুষ এ-কাজ করেছেন এবং চিরকাল করবেন। সমস্ত প্রাচীন কাহিনী, লোককথা, উপকথা, পুরাণ এই নিয়মে চলে এসেছে। কে লিখল, কবে লিখল, কোথায় লিখল আর কোনো হিসাব নেই, শুধু লেখাগুলি আজও পৃথিবীর সব ছেলেমেয়েরা আদর করে পড়ে, হেসে কেঁদে আকুল হয়। বাংলার লোকে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ও তাঁর পুত্র সুকুমার রায়কে

বলে বাংলা শিশুসাহিত্যের দুই দিক্‌পাল। হয়তো বেশি কৃতিত্ব উপেন্দ্রকিশোরের, কারণ জমি যাঁরা তৈরি করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে তিনি ছিলেন অগ্রণী। যেটুকু কাজ বাকি ছিল, তাঁরই হাতে তৈরি সুকুমারের অনাবিল রসের স্রোতে সে জায়গাটুকু ফুলে ফলে অপরূপ হয়ে উঠেছিল। দুজনকে দেখে রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের কথাও মনে হয়। অবনীন্দ্রনাথও কবির প্রভাবে মানুষ, অথচ দুজনার লেখার মধ্যে ভাবে, অথবা ভাষায় কোনো সাদৃশ্য নেই। উপেন্দ্রকিশোর আর সুকুমারের বেলাও ঠিক তাই। উভয় ক্ষেত্রেই জ্যেষ্ঠের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব এইখানে যে, ভক্তের স্বকীয়তা তাঁরা এতটুকু ক্ষুণ্ণ করেন নি। বিশ্লেষণ করে বোঝা যায় যে, জ্ঞান যুক্তির কঠিন পাদপীঠে সুকুমারকে যদি তাঁর পিতা দাঁড় করিয়ে না দিতেন, তা হলে হয়তো আবোল তাবোল এমন সর্বাঙ্গসুন্দর রূপ নিয়ে লেখা হত না।

উপেন্দ্রকিশোর মনে প্রাণে শিল্পী ছিলেন। তিনি জানতেন যে, শিল্প-সৃষ্টির প্রথম প্রয়োজন অবাধ স্বাধীনতার। কি গভীরতায় কি প্রসারে, কোথাও কোনো বাধা থাকলে চলবে না। সমস্ত চিন্তারাজ্য থেকে উপযুক্ত বিষয়বস্তু বেছে নেওয়া হবে। তারপর তাকে মনের মতো রূপ দিতে হবে। এইখানেই আসে শিল্পী বা সাহিত্যিকের নিজের মন থেকে রসের জোগান দেওয়া। শিশু-সাহিত্যিক কেউ বানাতে পারে না, অবনীন্দ্রনাথ বলতেন, জন্মের সময় সঙ্গের সাথী করে আনতে হয় একটুখানি পিপাসা।

তবে কায়দাকানুন শেখানো যায়। ছবি আঁকতেও যেমন, তেমনি ছোটদের জন্য বই লিখতেও কতকগুলি অলিখিত কায়দা আছে। তাকে নিয়ম বলা চলে না, কারণ কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, লেখক একেবারে স্বাধীন। তবে ঐ-সব কায়দায় দক্ষ না হলে ছোটদের জন্য লেখা বইগুলিও উৎরোয় না। মনের মধ্যে তাগাদা থাকলে ঐ কায়দাগুলি আপনা থেকেই রপ্ত হতে সময় লাগে না। কুড়ি বছর বয়সে উপেন্দ্রকিশোর যখন "সখা"র পাতায় ছোটদের জন্য লিখতে লাগলেন, কেই-বা তাঁকে আদব-কায়দা শিখিয়েছিল? শেখাবার মতো এ দেশে ছিলই-বা তেমন কে? কিন্তু বিদেশে ছিল। তাঁদের রচনা পড়ে উপেন্দ্রকিশোর বুঝেছিলেন যে, ছোটদের জন্য লেখার ভাষা হবে অতি সহজ সরল, কিন্তু তাতে ভাঙা-ভাঙা-আধো-আধো বুলি থাকবে না। কোনোরকম ন্যাকামি থাকবে না। বাড়তি একটি কথা থাকবে না। যুক্তিশূন্য কোনো বাক্য থাকবে না। রস থাকবে যথেষ্ট। কারণ ভালো না লাগলে, পড়ার বই যদি-বা ছোটরা বাধ্য হয়ে পড়ে, বাইরের বই কখনোই পড়বে না। পায়ের নীচে জ্ঞান-যুক্তির এই পাকা বনেদটি পেয়েছিলেন বলেই সুকুমার অমন রসের খেলা দেখাতে পেরেছিলেন।

উপেন্দ্রকিশোরের নিজের সাহিত্যসৃষ্টি ছিল অন্যপ্রকারের। তাও ছিল সরস সজীব, কিন্তু আজগুবি বা অতিশয় কাল্পনিকের ধার দিয়েও যেত না। মনে রাখা দরকার যে সেটা ছিল আধুনিক বাংলা শিশুসাহিত্যের প্রথম যুগ এবং তখনো তা একটা বলিষ্ঠ স্বকীয়তায় ফুটে ওঠার সময় পায় নি। ছোটদের পত্রিকাতে যা প্রকাশিত হত সে ছিল ইংরিজি গল্প কবিতা প্রবন্ধের অনুকরণ

বা হুবহু অনুবাদ। উপেন্দ্রকিশোর বাংলার শিশুসাহিত্যকে বলিষ্ঠতা ও বৈশিষ্ট্য দিয়েছিলেন।

তবে আরো চার-পাঁচশো বছর আগে যে বাঙালি ছেলেমেয়েরা গান, গল্প, ছড়া শুনত না, বা পড়ত না, এটা মনে করা ভুল। তখনো দিদিমা ঠাকুমারা বাঘের, ভূতের, সুন্দরী রাজকন্যাদের, দুষ্ট ডাকাতদের, রামায়ণের, মহাভারতের অপূর্ব সব গল্প বলে তাদের ঘুম পাড়াতেন। কিম্বা রাতের রান্না শেষ হতে দেরি হলে, ঐভাবে জাগিয়েও রাখতেন। তা ছাড়া যাত্রা হত, কবির লড়াই হত, গাইয়েরা পাঁচালী গাইত, চন্দ্রাবতী মহুয়ার দুঃখের কাহিনী গেয়ে গাঁয়ে গাঁয়ে ফিরত। বলা বাহুল্য, বড়দের সঙ্গে ছোটরাও রাত জেগে সে-সব শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ত। যা শুনত তার কতক তারা বুঝত, কতক প্রথম প্রথম বুঝত না, কিন্তু সবটাই উপভোগ করত। বার বার শুনে শুনে মুখস্থ হয়ে যেত। সন্ধ্যাবেলায় পাড়ার ভট্টাচার্যিমশাই সুর করে রামায়ণ মহাভারত পড়ে শোনাতেন। এমনি করে কৃত্তিবাস, কাশীরামদাসের মহাকাব্যগুলোর অনেক জায়গা ক্রমে তাদের মুখস্ত হয়ে যেত। সে কালে বিশেষ করে পূর্ববঙ্গের নিজস্ব এই যে একটা বলিষ্ঠ সংস্কৃতি ছিল, ছোটরাও তার ভাগ পেত।

তা ছাড়া অনেক রূপকথা, উপকথা, লোককথা প্রচলিত ছিল। মুখে মুখে সেগুলি বলা হত ; ছেলেবুড়ো দল বেঁধে শুনত। কিন্ত ছেলেদের জন্য আলাদা করে কিছু রচিত বা লিখিত হত না। বড়দের জন্যও অনেকদিন পরে সখের তাগাদায় কেউ হয়তো গল্পগুলি সংগ্রহ করে পুস্তকাকারে বের করলেন। তাও সব সময় হয়ে উঠত না। সে-সব বই ছোট বড় সবাই পড়ত। বিষয়বস্তুকে সব সময় ছোটদের উপযুক্ত বলা চলে না। শোনা যায় জলের সঙ্গে দুধ মিশিয়ে দিলে, হাঁসরা নাকি জল বাদ দিয়ে দুধটুকু খেয়ে নেয়। ছোটদের এই ধরণের একটা ক্ষমতা থাকে। ঐ-সব প্রাচীন কাহিনী থেকে তাদের বোধগম্য ও উপভোগ্য অংশটুকু তারা বেছে নিত।

শুধু আমাদের দেশে কেন, পৃথিবীর প্রায় সব দেশের প্রাচীন কাহিনীর, লোককথার, রূপকথার বিষয়বস্তু বড়দের জীবনের নানান্ সমস্যা নিয়ে। ছোটদের জীবন নিয়ে কেউ তখন মাথা ঘামায় নি। আর কি সব বিষয়বস্তু! লোভ, রাগ, হিংসা, ঈর্ষা, প্রতিশোধ, বিশ্বাসঘাতকতা, নরনারীর প্রেমঘটিত ব্যাপার—এর কোনোটিকে ছোটদের উপযুক্ত বলা চলে না। তবু এই-সব কাহিনী শুনেই ছোটবেলায় আমরাও হেসে কেঁদে আকুল হয়েছি। এগুলির মধ্যে থেকেই শিখেছি যে, দয়া আর ক্ষমার মতো গুণ নেই, নিষ্ঠুরতা বিশ্বাস-ঘাতকতার মতো পাপ নেই। আসলে দেশের জল-মাটি-হাওয়ায় এগুলির জন্ম হয়। এগুলি সাধারণ মানবের সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা, আরাম-বেদনা দিয়ে উষ্ণ-কোমল। এগুলির মধ্যে পঙ্কিল কিছু থাকে না। জলের মতো নির্মল পুরাকালের প্রাথমিক ভাবগুলি হিংস্র নিষ্ঠুর হত বটে, কিন্তু সেইসঙ্গে হত সরল, স্বাভাবিক, অবিকৃত। শুনতে অদ্ভুত লাগতে পারে, সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে চিন্তার নির্মলতা দূর হয়েছে। আধুনিক উপন্যাস পড়ে

অনভিজ্ঞ দুর্বল শিশুমনের অনিষ্ট হতে পারে, কিন্তু প্রাচীন কাহিনী পড়ে কিছু হয় না। যে ছেলেরই খানিকটা ভাষাজ্ঞান হয়েছে, সে-ই রুদ্ধশ্বাসে রামায়ণ মহাভারতের চেনা অংশগুলি যতটা সম্ভব গিলে-ফেলতে চেষ্টা করে। এবং তার থেকে কারো কোনো অনিষ্ট হয়েছে বলে শুনি নি।

অসুবিধাটা অন্যরকম। সেকেলে ভাষা বোঝা শক্ত। বই বড় ভারী। আদ্যোপান্ত মূল গল্পটি উদ্ধার করা মুস্কিল। এদিকে উপেন্দ্রকিশোর বিশ্বাস করতেন যে ভারতীয় চিন্তার ও ভারতীয় সংস্কৃতির মূলে আছে রামায়ণ ও মহাভারত। ও দুটিকে ভালো করে না জানলে, শিক্ষার ভিত্তিই শক্ত হয় না। সেইজন্যই তাঁর প্রথম প্রকাশিত দুটি গ্রন্থ হল ছেলেদের রামায়ণ আর ছেলেদের মহাভারত।

কৃত্তিবাস ও কাশীরামদাস বর্ণিত বাংলা রামায়ণ ও মহাভারত থেকে মূল কাহিনী উদ্ধার করে, স-রস ঝরঝরে ভাষায় লেখা। লেখা হয়েছিল প্রায় আশি বছর আগে, কিন্তু আজ পর্যন্ত খুব কম ছেলেমেয়ে দেখা গেছে, যারা মুগ্ধ হয়ে ঐ দুটি বই পড়ে শেষ না করে। উপেন্দ্রকিশোর নিজে বলেছেন যে, মূল গল্পের তিনি কোনো অদল-বদল করেন নি, সংক্ষিপ্ত করেছেন মাত্র। রামায়ণ মহাভারতের মহিমা তাতে এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয় নি এবং বই দুটি হয়েছে অতিশয় সুখপাঠ্য।

রামায়ণ মহাভারত শুধু গল্পের বই তো নয়, প্রাচীন ভারতের পুরাতত্ত্বের ও চিন্তার একেকটি জীবন্ত ইতিহাস। মূল গল্পের সঙ্গে কত যে অবান্তর কিন্তু অপূর্ব কাহিনী জড়িয়ে আছে তার গোনা-গুন্তি নেই। সেইরকম কয়েকটিকে নিয়ে লেখা হয়েছিল "মহাভারতের গল্প"। তারপর আমাদের দেশের পুরাণগুলিকে বাদ দিলেও চলবে না। এগুলি যেন রামায়ণ মহাভারতের পরের অধ্যায়। উপেন্দ্রকিশোরের "পৌরাণিক কাহিনীতে" তার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। এইভাবে ছেলেমেয়েদের নিজেদের দেশের মহিমা তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন।

যে বই-ই প্রকাশ করতেন তাতেই ছবি থাকত। অপূর্ব সব জল-রঙের ছবি, হাফ-টোন ব্লকে ছাপা, মজার মজার সব কালি দিয়ে আঁকা ছবি। তিনি মনে করতেন ছোটদের বই হবে সব চেয়ে ভালো কাগজে ছাপা, সব চেয়ে সুন্দর ছবি দিয়ে সাজানো, সব চেয়ে ভালো লেখা দিয়ে পুষ্ট।

এর খরচ ছিল প্রচুর ; সাধারণ ব্যবসায়ীরা পারবেন কেন? যোগীন্দ্রনাথ সরকার তাঁর সিটি বুক সোসাইটিতে ১৮৯৩ থেকে, লাভের আশা ছেড়ে দিয়ে, এ-কাজ শুরু করেছিলেন। তবে তাঁর যন্ত্রপাতি খুব ভালো ছিল না, তার উপর তখন সাধারণত কাঠের বা স্টিলের ব্লক ব্যবহার হত। ফলে লেখা যদিবা ভালো হল, ছবি মনের মতো হত না। উপেন্দ্রকিশোরের ছেলেদের রামায়ণ, মহাভারত এখান থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮৯৫ থেকে উপেন্দ্রকিশোর নিজের প্রকাশনী ইউ. রায় এণ্ড সন্স থেকে, নিজের মনের মতো করে ছোটদের বই ছাপতে শুরু করেছিলেন। ১৯১৫ খৃস্টাব্দে উপেন্দ্রকিশোর পরলোকগমন

করেছিলেন। তারপর এই উনষাট বছরে বাংলা ভাষায় কতটুকু পরিবর্তন হয়েছে ভাবলে হতাশ হতে হয়। প্রবন্ধগুলি বাদ দিলে, কবিতা ও গল্পগুলি আজকাল লেখা হতে পারত। একমাত্র তফাৎ অনেক রচনার ক্রিয়াপদে। প্রতীচ্যের স্বনামধন্য লেখক সমরসেট মম বলেছিলেন, গদ্যের আদর চল্লিশ বছর, কাব্যের চিরদিন। তার মানে গদ্য সাধারণত সমাজের পটভূমিকায় ব্যক্তিগত কাহিনীরূপে লেখা হয়। সমাজের ক্রমাগত পরিবর্তন ঘটছে ; চল্লিশ বছরে এক পুরুষ কেটে যায়, গল্পগুলিকে মনে হয় সেকেলে। যেমন হয়েছে বঙ্কিমের রাজসিংহ, রবীন্দ্রনাথের গোরা, শরৎচন্দ্রের অনেক উপন্যাসের বেলায়। কিন্তু কাব্যের কারবার হল চিরন্তনকে নিয়ে, সে স্থান-কালের অতীত। কাব্য পাঠকের মর্মের মূলে গিয়ে নাড়া দেয়, মানুষের মানবতায় আবেদন জানায়। সে কখনো সেকেলে হয় না।

তবে অনেক গদ্য-রচনাও কাব্যধর্মী হয়, যেমন অনেক জীবনী, ভ্রমণ-কাহিনী ও দুঃসাহসের গল্প, বহুদিনের পুরনো সব দিনপঞ্জিকা, ধর্মগ্রন্থ, অলৌকিক কাহিনী এবং সবার চেয়ে বেশি শিশুসাহিত্য তিনহাজার বছরের পুরনো বহু গল্পের আদর এতটুকু কমে নি। বিদেশের গল্প ছোটরা পেলে উল্লসিত হয়। এগুলি তাদের মর্মমূলে নাড়া দেয়। যেখানে পৃথিবীর সব শিশু সমান, সেইখানে নিয়ে যায়। প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় জে· এম· ব্যারির 'পিটার প্যান', কিংস্লির 'ওয়াটার বেবিজ', লুইস্ ক্যারলের 'অ্যালিস ইন্ ওয়ান্ডারল্যান্ড' আর যত রাজ্যের পরীদের ও ভূতপ্রেতের গল্প। তবে সব গল্পেরই চিরন্তন হতে হলে, এই প্রবন্ধের আরম্ভে উল্লিখিত নিয়মগুলি নিজেদের জ্ঞানে বা অজ্ঞানে, পালিত হওয়া চাই। সহজ, সংক্ষিপ্ত ও সরস না হলে কোনো বই বেশি দিন আদর পায় না।

উপেন্দ্রকিশোরের একটি গল্পকেও যে সেকেলে মনে হয় না, তারও ঐ একই কারণ। তবে প্রবন্ধগুলির কথা আলাদা। শিল্পী হলেও উপেন্দ্র-কিশোরের ছিল বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি, সাধারণ জ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর ছিল অসীম আগ্রহ। তখন সবেমাত্র মধ্যযুগীয় কুসংস্কারের কুয়াশা কাটিয়ে, দেশটা বৈজ্ঞানিক চিন্তার আলো দেখেছে। সত্তর বছর আগে মানুষের জীবনযাত্রায় কতটুকুই-বা বিজ্ঞানের প্রভাব দেখা যেত? বিজলীবাতি পর্যন্ত ছিল না। ট্র্যাম টানত ঘোড়ায়। মোটর দেখে নি বিশেষ কেউ। এরোপ্লেনের সম্ভাবনা নিয়ে নানান্ গবেষণা চলছিল, তারপর আস্তে আস্তে মানুষ উড়তেও শিখল। উপেন্দ্রকিশোর অসীম আগ্রহে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা নিয়ে মাসের পর মাস, আগে 'সখা', 'সখা ও সাথী' আর 'মুকুলে' এবং পরে 'সন্দেশে' সংক্ষিপ্ত সহজ ঝরঝরে সব প্রবন্ধ লিখতেন। তাঁর পাঠকদের অজানা খুব কম জিনিস-ই ছিল। দুঃখের বিষয় এগুলিকে এখন সেকেলে মনে হয়, জীব-বিদ্যায় তাঁর ভারি উৎসাহ ছিল। পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ, গাছপালা নিয়ে অজস্র রচনা। প্রাক্-ঐতিহাসিক যুগ সম্বন্ধে লেখাগুলি পরে "সেকালের কথা" নামে প্রকাশিত হয়েছিল। এ-সব কখনো পুরনো হয় না।

বাস্তবিক এখন যাকে লোকে বলে সাধারণ জ্ঞান, তিনি তার ভাণ্ডার-দ্বার খুলে দিয়েছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল ছেলেমেয়েরা বলিষ্ঠ হবে, সাহসী হবে, সব শুনুক দেখুক জানুক তবেই তারা স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে শিখবে। সঙ্গে সঙ্গে এ-ও শিখুক যে, জীবনটা একটা অতিশয় আনন্দের ব্যাপার। দুঃখগুলিকে মেনে নিতে হয়, আর সুখগুলিকে কৃতজ্ঞচিত্তে দুই হাত ভরে গ্রহণ করতে হয়। এমনি করে তাদের মনে রসের সঞ্চার হোক। তা হলে পৃথিবীতে কেউ তাদের বিফল করতে পারবে না।

সেকালের অধিকাংশ মাস্টারমশাইরা মনে করতেন ছোটদের বই মাত্রেই নীতিশিক্ষা দেবে। উপেন্দ্রকিশোর মনে করতেন রস গ্রহণ করতে জানার চেয়ে বড় নীতিশিক্ষা আর হয় না। সেকালের অধিকাংশ বইয়ের শেষে মন্দ লোকরা উপযুক্ত সাজা পেত, ভালো লোকেরা পুরস্কৃত হত, সবাই খুশি হত। উপেন্দ্রকিশোরের রচনা পড়ে মনে হয় তিনি বিশ্বাস করতেন ভালো সর্বদাই ভালো, মন্দ হল মন্দ, তা পার্থিব পুরস্কার যে-ই পাক না কেন। ভালো কথা শুনলে বা পড়লে, সুন্দর জিনিস দেখলে, তার ফলও ভালো হবেই। তাই তাঁর ইচ্ছা করত ছোটদের সামনে জ্ঞান-বিজ্ঞান শিল্প-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ জিনিসগুলি উপস্থিত করা হোক। তারা দেখুক, পড়ুক, জানুক।

শুধু মামুলী ভালো জিনিস এনেই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না। আরেক শ্রেণীর জিনিস আছে যাকে মজার জিনিস বলে, তার কাছে ভালো-মন্দর মাপকাঠি চলে না। রসের পরীক্ষাই তার একমাত্র পরীক্ষা। পৃথিবীর সব ঘটনা থেকে হাসির খোরাক জড়ো করতে হয়। তবেই না দুঃখের সঙ্গে বোঝাপড়া করা যায়। তাঁর 'ঝানু চোর চানু' কিছু অনুকরণ করার মতো নয়, কিন্তু তার ব্যাপারগুলো বড়ই মজাদার।

শিশুসাহিত্যের আরেক কাজ ছোট ছেলেমেয়েদের পৃথিবীর সঙ্গে চেনা-পরিচয় করিয়ে দেওয়া, তা সে গল্পের মধ্যে দিয়েই হোক, বা প্রবন্ধর মধ্যে দিয়েই হোক। এখানে একটি সমস্যা ওঠে। গল্প হতে পারে বানানো, ঘটনা হতে পারে কাল্পনিক, কিন্তু সত্যিকার ইতিহাস, ভূগোল, জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোনো তথ্যে ভুল হলে চলবে না। ছোটরা বইয়ে যা পড়ে, তার প্রায় সবই বিশ্বাস করে। কাজেই ভুল তথ্য উপস্থিত করলে তাদের ক্ষতি করা হয়। অবিশ্যি আজগুবি গল্পের বেলা আলাদা। সেখানে সবই আজগুবি, ছোটরাও প্রকৃত তথ্য আশা করে না, বরং যা কখনো হয় না, তার আনন্দে মন ভরপুর হয়ে ওঠে। উপেন্দ্রকিশোর অনেক কাল্পনিক ঘটনার কথা লিখেছিলেন, কিন্তু তার মধ্যে কোনোটাকেই ঠিক আজগুবি বলা চলে না। পুরনো পরীদের বা ভূতদের যে-সব গল্প বলেছেন, সেগুলিতেও একরকম নিয়মানুবর্তিতা আছে, যা সব দেশের সব পরীদের গল্পেই প্রযোজ্য। আজগুবি গল্প অন্য জিনিস। সে বিষয়ে পরে সুকুমার হাত পাকিয়েছিলেন। সেগুলি হল খামখেয়ালের জিনিস, উপেন্দ্রকিশোরের কল্পনাশক্তিও ভারি পরিপাটি ছিল। তাকে খামখেয়ালি বলা চলে না।

৮

আজকাল যে-সব ছোটদের গল্প পড়ে, কিম্বা চিত্রে গল্পের ছবি দেখে, অভিভাবকরা অনেক সময় চিন্তিত হন, তার একটা বিপদ আছে। দুষ্কৃতকারীদের অনেক সময় অতি বড় বাহাদুর বলে চিত্রিত করা হয়। দুষ্কর্মগুলিকে দেখানো হয় যেন ভারি প্রশংসনীয়। ছোটদের যতই না উদার শিক্ষা দেওয়া যাক, তাদের ন্যায়-অন্যায় বোধ বিভ্রান্ত করা উচিত নয়।

শিশুসাহিত্যের ক্ষেত্রে আরেকটি বিষয়ও সংযত হলে ভালো হয়। সেটি হল অতিশয় হিংসা, অত্যাচার, নিষ্ঠুরতা। ছোট ছেলেমেয়েরা রোজ যা দেখবে, পড়বে, তার একটা মিলিত প্রভাব থাকে। নিত্য অত্যাচার নিষ্ঠুরতার বিশদ্ বিবরণী পড়ার ফলে, ওগুলিকে আর তত বীভৎস বলে মনে হয় না। মনের একটা কোমল সূক্ষ্ম দিক নষ্ট হয়ে যায়। গোড়াতেই বলা হয়েছে যে আমাদের শাস্ত্রে নয়টি রসের উল্লেখ আছে, তার মধ্যে থেকে সাতটি ছোটরা অল্পবিস্তর পরিমাণে উপভোগ করতে পারে। যে দুটিকে বাদ দিতে হয়, সে-দুটি হল আদি রস ও বীভৎস রস। এ বিষয়ে আর বৃথা বাক্যব্যয়ের প্রয়োজন নেই। জ্ঞানত বা অজ্ঞানত উত্তম শিশুসাহিত্যিকরা এই নিয়ম মেনে থাকেন। এর জন্য তাঁদের নিজেদের বিচারবুদ্ধি এবং রুচিই যথেষ্ট, শাস্ত্র পড়ার দরকার হয় না। উপেন্দ্রকিশোর এই দলে।

কৌতূহলী সমালোচকরা একটা বিষয় লক্ষ্য করে থাকবেন যে, কুড়ি বছর বয়সে যখন উপেন্দ্রকিশোর প্রথম শিশুসাহিত্যের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন, ১৮৮৩ খৃস্টাব্দের 'সখা' পত্রিকার পাতায় তাঁর বেশ কয়েকটি রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু তার একটিও গল্প নয়, সবগুলিই প্রকৃতি-বিজ্ঞান বা সাধারণ জ্ঞান বিষয়ক ঝরঝরে সহজ ভাষায় লেখা প্রবন্ধ। ভারি সরস করে লেখা। মন-গড়া গল্প সরস করে লেখা অনেক সহজ। তথ্যমূলক প্রবন্ধ ছোটদের উপভোগ্য করে লেখা বড় কঠিন কাজ। তাঁর সাহিত্য জীবনের শুরু থেকেই উপেন্দ্রকিশোরের মধ্যে এই গুণটি দেখা গিয়েছিল।

এখন যা হল শিশুসাহিত্যের সব চাইতে জনপ্রিয় লেখা, যার জন্য ছেলে-মেয়েরা আর সব সাহিত্যগুণে জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত, সেটি হল দুঃসাহসিক অভিযানের কাহিনী। যত বেশি বাজে গল্প হোক-না কেন, তার রোমাঞ্চ উপভোগ করার জন্য অসীম আগ্রহ। তার জন্যই যাকে ভুলক্রমে কমিক্স্ বলা হয়, তার এত আদর। এ জিনিস সেকালে বিলেতেও ছিল না, আমাদের দেশে তো নয়ই। কিন্তু উপেন্দ্রকিশোর বুঝেছিলেন দুঃসাহসিক অভিজ্ঞতায় কত রোমাঞ্চ। ১৯১৩ সাল থেকে তিনি 'সন্দেশ' প্রকাশ করেন। তার মধ্যে পাওয়া যায় বহু সত্যিকার দুঃসাহসিক অভিযানের কাহিনী : স্বেন হেদিনের কথা, মেরু যাত্রার কথা। এ ধরণের লেখা যে কাল্পনিক হলেও, রোমাঞ্চময় তার প্রমাণ ছিল রবিন্সন ক্রুসো, ট্রেজার আইল্যান্ড ইত্যাদি। উপেন্দ্রকিশোর নিজে সত্য কাহিনী নিয়েই কারবার করতেন।

লীলা মজুমদার

ছেলেদের মহাভারত

প্রথমে রামায়ণ। তারপর—এই বই হল উপেন্দ্রকিশোরের দ্বিতীয় প্রকাশিত পুস্তক। সিটি বুক সোসাইটি হয়তো ১৮৯৪ খৃস্টাব্দে এটিকে প্রথম প্রকাশ করেন।

মহাভারতের মূল্যায়ন হয় না। পণ্ডিতদের মতে রামায়ণ আগে লেখা হয়েছিল, মহাভারত পরে। রামায়ণের ঘটনাবলী বড় বেশি ব্যক্তিগত আদর্শবাদকে কেন্দ্র করে অগ্রসর হয়েছে। পড়তে পড়তে রামসীতার সুখ-দুঃখে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে হয়। ভক্তরা রামায়ণকে বেদের মতো শ্রদ্ধা করেন, দেবতা বলে রামের বন্দনা করেন। কাহিনীর মধ্যে আগাগোড়া একটা সংসারাতীত এবং প্রবল ধর্মভাব দেখা যায়।

মহাভারতের সুরটি অন্যরকম। এই গ্রন্থে সমাজ ও রাজনীতি একটা সচেতনতা লাভ করেছে। পাণ্ডবরা নানান দেবতার পুত্র বলে পরিচিত, তাঁদের নানান্ দুঃখে কষ্টে সকলেরই সহানুভূতি হয়, কিন্তু দেবতা বলে তাঁদের কেউ পূজা করে বলে শোনা যায় না। মহাভারতের কাহিনী অনেকটা সাধারণ মানুষের গল্প।

মনে হয় এ গ্রন্থ কোনো একজন মানুষের রচনাও নয়, আগাগোড়া এক সময়ও লেখা নয়। তিন চার হাজার বছর আগে ভারতের ইতিহাসের যেন কয়েকটি অধ্যায়। এমনি বিশাল এর পটভূমিকা যে সব স্তরের মানুষই কাহিনীতে স্থান পেয়েছে। অজস্র ছোট-ছোট ঘটনা আছে, সেগুলিকে সহজেই মূল ঘটনা থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায়। বহু প্রক্ষিপ্ত অংশ আছে মনে হয়। বহু মনস্তত্ত্ব, মতবাদ, স্থান পেয়েছে। ন্যায় অন্যায় কিভাবে একসঙ্গে জড়িয়ে থাকে তার বহু দৃষ্টান্ত আছে। ভারতের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার চমৎকার চিত্র দেখা যায়। কি বৈচিত্র্য ভারতের জীবনে, কত ভিন্ন জাতির সংঘাত, কত পরস্পরবিরোধী মনোভাব। কত দোষে-গুণে ভালোয়-মন্দে মেশানো মহাভারতের চরিত্রগুলি।

কথায় বলে 'যা নাই ভারতে তা নাই ভারতে'। অর্থাৎ ভারতের সম্ভাব্য সকল পরিবেশ, পরিস্থিতি ও চরিত্রের স্থান আছে মহাভারতে।

গ্রন্থকারের নিবেদন

মহাভারতের আখ্যানকে বালক-বালিকাদিগের উপযোগী করিতে গিয়া উহার স্থানে স্থানে আবরণের প্রয়োজন হইয়াছে। মূল গল্প অক্ষুণ্ণ রাখিয়া এই কার্য করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি, কতদূর কৃতকার্য হইয়াছি বলিতে পারি না। এ বিষয়ে যদি কেহ কোনো ত্রুটি দেখিতে পান, দয়া করিয়া আমাকে জানাইলে বিশেষ উপকৃত হইব।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট এই গ্রন্থ-প্রণয়ন বিষয়ে আমি বিশেষভাবে ঋণী। লিখিবার সময় তাঁহার নিকট উৎসাহ পাইয়াছি, এবং পাণ্ডুলিপির আদ্যোপান্ত তিনি সংশোধন করিয়া দেওয়াতে পুস্তকখানি প্রকাশ করিতে সাহসী হইয়াছি। ইতি

২২নং সুকিয়া স্ট্রীট, কলিকাতা
২৩এ ভাদ্র, ১৩১৫

শ্রীউপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী



খন আমরা যাহাকে দিল্লী বলি, সেই দিল্লীর কাছে, অনেকদিন আগে, হস্তিনা বলিয়া একটা নগর ছিল।

এই হস্তিনার রাজা বিচিত্রবীর্যের ধৃতরাষ্ট্র আর পাণ্ডু নামে দুই পুত্র ছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র বয়সে বড় ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি অন্ধ ছিলেন। অন্ধ যে, সে রাজ্য পায় না। কাজেই, বয়সে বড় হইয়াও ধৃতরাষ্ট্র রাজা হইতে পারিলেন না ; রাজা হইলেন ছোট ভাই পাণ্ডু।

রাজ্য না পাওয়ায় ধৃতরাষ্ট্র দুঃখিত হইয়াছিলেন বৈকি! তবুও যদি পাণ্ডুর ছেলে হওয়ার আগে তাঁহার ছেলে হইত, তবে সে দুঃখ তিনি সহিয়া থাকিতে পারিতেন ; কারণ তাঁহাদের ছেলেদের মধ্যে যে বড়, তাহারই রাজ্য পাইবার কথা ছিল। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের কপালে তাহাও হইল না ; পাণ্ডুরই আগে ছেলে হইল। ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেরা যখন বুঝিল, তাহারা রাজ্য পাইবে না, তখন হইতেই তাহারা প্রাণ ভরিয়া পাণ্ডব (অর্থাৎ পাণ্ডুর ছেলে)-দিগকে হিংসা করিতে লাগিল।

ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেদের মধ্যে দুর্যোধন সকলের বড়, তারপর দুঃশাসন, তারপর আরো আটানব্বুই জন। সবসুদ্ধ তাহারা একশত ভাই। ইহা ছাড়া দুঃশলা নামে তাহাদের একটি বোনও ছিল।

পাণ্ডুর পাঁচ পুত্র। সকলের বড় যুধিষ্ঠির, তারপর ভীম, তারপর অর্জুন, তারপর নকুল ও সহদেব নামে দুটি যমজ ভাই। ইঁহারা এক মায়ের ছেলে নহেন। পাণ্ডুর দুই রানী ছিলেন। বড়র নাম কুন্তী, ছোটর নাম মাদ্রী। যুধিষ্ঠির, ভীম আর অর্জুন, ইঁহারা কুন্তীর ছেলে। নকুল সহদেব মাদ্রীর ছেলে। দুই মা হইলে কি হয়? ইঁহাদের মধ্যে যে ভালোবাসা ছিল, তেমন ভালোবাসা এক মায়ের ছেলেদের ভিতরেও কম দেখা যায়।

এক-একজন দেবতা পাণ্ডুকে এই-সকল পুত্রের এক-একটি দিয়াছিলেন। ধর্ম যুধিষ্ঠিরকে দিয়াছিলেন, পবন ভীমকে দিয়াছিলেন, ইন্দ্র অর্জুনকে আর অশ্বিনীকুমার নামক দুই দেবতা নকুল ও সহদেবকে। এইজন্য লোকে বলে

যে যুধিষ্ঠির ধর্মের পুত্র, ভীম পবনের পুত্র, অর্জুন ইন্দ্রের পুত্র, নকুল সহদেব অশ্বিনীকুমারদিগের পুত্র। এই-সকল দেবতা ইঁহাদিগকে অতিশয় স্নেহ করিতেন।

কিন্তু হায়! এই পৃথিবীতে অল্পদিনই ইঁহারা সুখে কাটাইতে পারিয়াছিলেন। পাণ্ডু ইঁহাদিগকে খুব ছোট রাখিয়াই হঠাৎ মারা গেলেন, মৃত্যুর সময় মাতা মাদ্রী তাঁহার কাছে ছিলেন ; তিনি মনের দুঃখ সহিতে না পারিয়া, পাণ্ডুর চিতার আগুনে ঝাঁপ দিয়া সেই দুঃখ দূর করিলেন। ইহার পর আর এমন কেহই রহিল না, যে আপনার বলিয়া মা কুন্তী আর পাঁচটি ভাইয়ের দিকে চায়।

যাহা হউক, পাণ্ডবেরা পাঁচ ভাই ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেদের সঙ্গেই রহিলেন। একশো পাঁচটি ছেলের একসঙ্গে থাকা, একসঙ্গে পড়া, একসঙ্গে খেলা, সবই একসঙ্গে হইতে লাগিল।

খেলার সময় ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা ভীমের হাতে বড়ই নাকাল হয়। ভীমের জ্বালায় উহারা ভালো করিয়া খেলিতেই পায় না। খেলা আরম্ভ করিলেই ভীম কোথা হইতে আসিয়া তাহাদের মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি করিয়া দেন। উহারা একশো ভাই, ভীম একেলা। তবুও উহারা কিছুতেই তাঁহাকে আঁটিতে পারে না। তিনি তাহাদিগকে আছড়াইয়া ফেলিয়া চুল ধরিয়া এমনি টান দেন যে, বেচারারা তাহাতে চ্যাঁচাইয়া অস্থির হয়। জলে নামিয়া খেলা করিতে গেলে, তিনি তাহাদের দশজনকে একসঙ্গে জড়াইয়া ধরিয়া ডুব দেন, আর তাহারা আধমরা না হইলে ছাড়েন না। বেচারারা হয়তো ফল পাড়িবার জন্য গাছে উঠিয়াছে, এমন সময় ভীম আসিয়া সেই গাছে লাথি মারিতে থাকেন। লাথির চোটে গাছ এমনি নড়িয়া উঠে যে, ফলের সঙ্গে সঙ্গে উহারাও মাটিতে পড়িয়া যায়। কাজেই উহারা ভীমকে বড়ই হিংসা করে, আর তাঁহার কাছে বড়-একটা ঘেঁষে না।

ভীমকে যতই দেখে, দুর্যোধনের মনে ততই ভয় হয়, আর ততই তাহার দুষ্টবুদ্ধি বাড়িয়া উঠে। সে কেবলই ভাবে, 'এই ভীমটাকে বড় হইতে দিলেই তো আমাদের সর্বনাশ! সুতরাং, এইবেলা এটাকে মারিয়া ফেলিতে না পারিলে চলিতেছে না। ভীম মরিলে আর চারিটা ভাইকে বাঁধিয়া রাখিলেই চলিবে।'

দুষ্ট বসিয়া বসিয়া খালি এইরূপ ভাবে। তারপর একদিন সে সকলকে বলিল, "চল আজ গঙ্গাস্নানে যাই!" এই সহজ কথাটার ভিতর কি ভয়ানক ফন্দি রহিয়াছে, তাহা তো পাণ্ডবেরা জানেন না, তাঁহারা কেবল জানেন যে গঙ্গায় ঝুটোপাটি করিয়া স্নান করিতে যারপরনাই আরাম। সুতরাং, গঙ্গা-স্নানের কথা শুনিয়াই সকলে 'যাইব!' 'যাইব!' বলিয়া প্রস্তুত হইলেন।

প্রমাণকোটিতে গঙ্গাস্নানের আয়োজন হইল। প্রমাণকোটি অতি চমৎকার স্থান। গঙ্গার ধারে বাগান আর সুন্দর বাড়ি ; জলযোগের আয়োজনটিও সেখানে ভালো মতেই হইয়াছে। কাজেই ছেলেদের আনন্দের আর সীমা নাই।

বেশি খুশি অবশ্য মিঠাই দেখিয়া। মিঠাই যে তাঁহারা কি আনন্দ করিয়া খাইলেন, সে কি বলিব! আবার শুধু নিজে খাইয়া তৃপ্তি হয় না ; যেটা ভালো লাগে, সেটা ভাইয়ের মুখে তুলিয়া দেওয়া চাই।

তাহা দেখিয়া দুর্যোধন ভাবিল, 'এইবার আমার সুবিধা।' তারপর মিষ্ট-মিষ্ট কথা বলিয়া, আর যারপরনাই আদর দেখাইয়া, হাসিতে হাসিতে দুরাত্মা বিষ মাখানো সন্দেশ ভীমের মুখে তুলিয়া দিল। ভীম কি জানেন? তিনি সন্দেশের সঙ্গে বিষ খাইয়া ফেলিলেন, কোনো সন্দেহ করিলেন না।

তারপর অনেকক্ষণ ধরিয়া স্নান চলিল। শেষে ঝুটোপাটিতে ক্লান্ত হইয়া আর সকলেই কাপড় ছাড়িবার জন্য ঘরে গেলেন, গেলেন না শুধু ভীম। বিষের তেজে, আর তাহার উপর পরিশ্রমে, তিনি এতই দুর্বল হইয়া পড়িলেন যে, গঙ্গার ধারেই একটু না শুইয়া থাকিতে পারিলেন না।

সেইখানে ভীম কখন অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছেন, দুর্যোধন ছাড়া তাহা আর কেহই জানিতে পারে নাই; ভীম অজ্ঞান হইতেই সেই দুষ্ট, লতা দিয়া তাঁহার হাত-পা বাঁধিয়া তাঁহাকে জলে ফেলিয়া দিল।

ভীম জলে ডুবিয়া গেলেন। কিন্তু ভগবান যাঁহাকে রাখেন, হাজার দুষ্ট-লোক মিলিয়াও তাঁহাকে মারিতে পারে না। ভীম ডুবিলেন বটে, আর অন্য স্থানে পড়িলে তিনি মরিয়াও যাইতেন, তাহাতে ভুল নাই ; কিন্তু তাঁহাকে যেখানে ফেলিয়াছিল, ঠিক সেইখান দিয়া ছিল পাতালে যাইবার পথ—যেখানে সাপেরা আর তাহাদের রাজা বাসুকি থাকেন। ভীম সেই পাতালের পথ দিয়া ডুবিতে ডুবিতে একেবারে সেই সাপের দেশে গিয়া পড়িয়াছেন। আর পড়িবি তো পড়--একেবারে কতকগুলি সাপের ঘাড়ে! সে বেচারারা তাঁহার চাপে তখনই চেপ্টা হইয়া গেল।

তখন যে ভারি একটা গোলমাল হইল, তাহা বুঝিতেই পার। সাপের দল মহারাগে আসিয়া ভীমকে যে কি ভয়ানক কামড়াইতে লাগিল, তাহা আর বলিবার নয়।

ইহাতে কিন্তু ভীমের ভালোই হইল, কেননা, ভীমকে যে বিষ খাওয়ানো হইয়াছিল, সাপের বিষই হইতেছে তাহার ঔষধ। কাজেই সাপের কামড়ে ভীমের গায়ের বিষ কাটিয়া গেল। ভীম চক্ষু মেলিয়া উঠিয়া দেখেন, একি আশ্চর্য ব্যাপার! তখন তিনি দুই মিনিটের মধ্যে বাঁধন ছিঁড়িয়া কিল চড়ের ঘায় সাপের বাছাদের কি দুর্দশাই করিলেন! সে কিল যাহারা খাইল, তাহারা তো মরিয়াই গেল। যাহারা পলাইতে পারিল তাহারা ঊর্ধ্বশ্বাসে তাহাদের রাজা বাসুকিকে গিয়া বলিল, "রাজা মহাশয়! সর্বনাশ! একটা মানুষের ছেলে আসিয়া সব মাটি করিল! আপনি শীঘ্র আসুন!"

এ কথা শুনিয়াই বাসুকি ছুটিয়া দেখিতে আসিলেন, ব্যাপারখানা কি। আসিয়া দেখেন—কি আশ্চর্য! এ যে ভীম! "আরে তাইতো! ও ভীম! তুমি যে আমার নাতির নাতি! এসো ভাই কোলাকুলি করি!" বলিয়া বাসুকি ভীমকে জড়াইয়া ধরিয়া কতই আদর করিলেন! আর ধনরত্নই-বা তাঁহাকে কত

দিলেন!

শুধু তাহাই নহে, ইহার উপর আবার অমৃত। বাসুকির বাড়িতে অমৃতের ভাণ্ডার ছিল। চৌবাচ্ছার পর চৌবাচ্ছা সারি সারি সাজানো, তাহা ভরিয়া খালি অমৃত রাখিয়াছে। সাপেরা ভীমকে সেই অমৃতের কাছে নিয়া বলিল, "যত ইচ্ছা খাও!"

ভীম এক নিশ্বাসে এক চৌবাচ্ছা খালি করিয়া দিলেন! তারপর আর-এক নিশ্বাসে আর-এক চৌবাচ্ছা! আর-এক নিশ্বাসে আর-এক চৌবাচ্ছা! এমনি করিয়া আট চৌবাচ্ছা অমৃত খাইয়া দেখিলেন, আর পেটে ধরে না।

যেমন খাওয়া তেমনি বিশ্রামটি তো চাই! ভীম আট চৌবাচ্ছা অমৃত খাইয়া, আটদিন যাবৎ কেবলই ঘুমাইলেন।

যুধিষ্ঠির স্নান করিয়া বাড়ি ফিরিবার সময় ভীমকে দেখিতে পাইলেন না বটে, কিন্তু সেজন্য তখন তাঁহার মনে বেশি চিন্তা হইল না। তিনি ভাবিলেন, হয়তো ভীম আগেই চলিয়া আসিয়াছেন। বাড়ি ফিরিয়া মাকে প্রণাম করিয়াই যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, ভীম যে আমাদের আগে চলিয়া আসিয়াছে, তাহাকে তো দেখিতেছি না। তুমি কি তাহাকে কোথাও পাঠাইয়াছ?"

এ কথা শুনিয়াই কুন্তী নিতান্ত ব্যস্তভাবে বলিলেন, "সেকি কথা বাবা, আমি তো ভীমকে দেখিতে পাই নাই। হায় হায়, কি হইবে? শীঘ্র তার খোঁজ কর।"

তখনই বিদুরকে ডাকানো হইল। বিদুর যুধিষ্ঠিরের কাকা হন। এমন সরল সাধুলোক পৃথিবীতে খুব কমই জন্মিয়াছেন। বিদুর আসিলে কুন্তী সকল কথা তাঁহাকে জানাইয়া, শেষে বলিলেন, "বুঝি-বা দুর্যোধনই আমার ভীমকে মারিয়া ফেলিল। ও দুষ্ট ভীমকে বড়ই হিংসা করে!"

বিদুর বলিলেন, "বৌদিদি, চুপ, চুপ! আপনার এ কথা দুর্যোধন শুনিতে পাইলে বড়ই বিপদ ঘটাইবে। ভীমের জন্য আপনি কোনো চিন্তা করিবেন না। আমি ব্যাসদেবের মুখে শুনিয়াছি যে, আপনার ছেলেরা অনেকদিন বাঁচিয়া থাকিবেন। ব্যাসের কথা কি মিথ্যা হইতে পারে? আপনার কোনো ভয় নাই; নিশ্চয় ভীম ফিরিয়া আসিবেন!" এই বলিয়া বিদুর চলিয়া গেলেন, কিন্তু তাঁহার কথায় কুন্তী আর তাঁহার পুত্রগণের মনের দুঃখ ঘুচিল না।

এদিকে ভীমও আটদিনের লম্বা ঘুমের শেষে জাগিয়া উঠিয়াছেন। অমৃত খাইয়া তাঁহার শরীরে দশহাজার হাতির বল হইয়াছে। সাপেরা তাঁহাকে স্নান করাইয়া সাদা কাপড় আর সাদা মালা পরাইয়া, পায়স রাঁধিয়া খাওয়াইয়া, পরম আদরের সহিত সেই প্রমাণকোটির স্নানের জায়গায় রাখিয়া গেল। সেখানে আর কিছুমাত্র বিলম্ব না করিয়া তিনি তাড়াতাড়ি বাড়ি চলিয়া আসিলেন।

মরা ছেলে বাঁচিয়া উঠিলে মা-বাপ যেমন খুশি হয়, ভীমকে পাইয়া সকলে তেমনি সুখী হইলেন। তারপর তাঁহার মুখে সকল কথা শুনিয়া যুধিষ্ঠির বলিলেন, "ভাই, সাবধান! এ-সব কথা যেন আর কেহ না জানে।"

তখন হইতে পাঁচ ভাই যারপরনাই সাবধান হইয়া চলিতে লাগিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র, দুর্যোধন আর দুর্যোধনের মামা শকুনি কতরকমে তাঁহাদিগকে হিংসা করেন, তাঁহারা সে-সব জানিতে পারিয়াও চুপ করিয়া থাকেন। এইরূপ করিয়া দিন যাইতে লাগিল।

শিশুকাল হইতেই লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষত্রিয়ের ছেলেরা ধনুর্বিদ্যা (অর্থাৎ ধনুক দিয়া তীর ছোঁড়া) শিখিতে আরম্ভ করে। যুধিষ্ঠির, দুর্যোধন প্রভৃতি সকলেই একসঙ্গে কৃপাচার্য নামক একজন খুব ভালো শিক্ষকের নিকট ধনুর্বিদ্যা শিখিতে লাগিলেন।

এই সময়ে একদিন ছেলেরা শহরের বাহিরে একটা লোহার গোলা লইয়া খেলা করিতেছিল। খেলিতে খেলিতে গোলাটা একটা শুকনো কুয়ার ভিতরে পড়িয়া গেল ; ছেলেরা অনেক চেষ্টা করিয়াও কিছুতেই তাহা তুলিতে পারিল না। গোলা তুলিতে না পারায় অপ্রস্তুত হইয়া তাহারা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতেছে, এমন সময়, সেইখান দিয়া একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ যাইতেছিলেন। ছিপ্‌ছিপে, কালো-হেন লোকটি, পাকাচুল, হাতে তীর-ধনুক। ছেলেদের দুর্দশা দেখিয়া তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "দুয়ো! দুয়ো! তোমরা ক্ষত্রিয় হইয়া এই গোলাটা তুলিতে পারিলে না! দুয়ো! দুয়ো! আমাকে কি খাইতে দিবে বল, আমি গোলা তুলিয়া দিতেছি! গোলাও তুলিব, আর আমার এই আংটি কুয়ায় ফেলিতেছি, তাহাও তুলিব।" এই কথা বলিয়া তিনি তাঁহার আংটিটিও কুয়ায় ফেলিয়া দিলেন।

তখন যুধিষ্ঠির বলিলেন, "মহাশয়, আপনি যদি গোলাটা তুলিতে পারেন তবে চিরকাল খাইতে পাইবেন।"

ব্রাহ্মণ হাসিতে হাসিতে একমুঠা শর লইলেন। তারপর তাহার একটি শর গোলায় বিঁধাইয়া, সেই শরের পিছনে আর-একটি শর বিঁধাইয়া তাহার পিছনে আবার আর-একটি- এমনি করিয়া কুয়ার মুখ অবধি লম্বা একটা কাঠি প্রস্তত করিয়া ফেলিলেন। সেই কাঠি ধরিয়া গোলা টানিয়া তুলিতে আর কতক্ষণ লাগে ?

ছেলেরা আশ্চর্য হইয়া বলিল, "আচ্ছা, আংটিটি তুলুন তো!" ব্রাহ্মণ তীর-ধনুক লইয়া দেখিতে দেখিতে আংটিও তুলিয়া আনিলেন। ছেলেরা তো অবাক! তখন তাহারা হাত জোড় করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল ; তারপর বলিল, "আপনি নিশ্চয় কোনো মহাপুরুষ হইবেন। বলুন আপনি কে ? আর আমরা আপনার কোন্ কাজ করিব ?"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "তোমাদের আর কিছুই করিতে হইবে না। তোমরা তোমাদের ঠাকুরদাদা মহাশয়ের নিকট গিয়া বল যে, এইরকম এক বুড়া আসিয়াছে।"

অমনি সকলে ছুটিয়া গিয়া তাহাদের ঠাকুরদাদা ভীষ্মের নিকট সংবাদ দিল। ভীষ্ম সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, "বুঝিয়াছি! দ্রোণাচার্য আসিয়াছেন। এ আর কাহারো কর্ম নহে।" ভীষ্মের অনেকদিন হইতেই ইচ্ছা, ছেলেদিগকে দ্রোণাচার্যের হাতে দেন, সেই দ্রোণাচার্য আপনা হইতেই আসিয়া উপস্থিত।

ইহাতে বড়ই আনন্দিত হইয়া, ভীষ্ম তাঁহাকে পরম আদরের সহিত বাড়িতে লইয়া আসিলেন।

ভীষ্ম, দ্রোণ, ইঁহারা অতি মহৎ লোক ছিলেন। ইঁহাদের খালি নাম আর পরিচয় শুনিলেই হইবে না ; ইঁহাদের কথা আরো বেশি করিয়া জানা চাই।

দেবতাদের মধ্যে আটজনকে আট বসু বলে। এই বসুরা একবার তাঁহাদের স্ত্রীদিগকে লইয়া সুমেরু পর্বতের কাছে একটি সুন্দর বনে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। সেই বনে বশিষ্ঠ মুনির আশ্রম ছিল। বশিষ্ঠের একটি গাই ছিল, তাহার নাম নন্দিনী। এমন সুন্দর গোরু আর কখনো হয় নাই, হইবেও না। যত দুধ চাই নন্দিনী তত দুধই দিত, আর সে আশ্চর্য দুধ একবার খাইলে দশহাজার বৎসর সুস্থ শরীরে বাঁচিয়া থাকা যাইত।

বসুদের মধ্যে একজনের নাম দ্যু। তাঁহার স্ত্রীর বড়ই ইচ্ছা হইল, গাইটি লইয়া যাইবেন। উশীনর রাজার কন্যা জিতবতী তাঁহার সখী। সখীকে একবার এই গোরুর দুধ খাওয়াইতে পারিলে তিনি দশহাজার বৎসর বাঁচিয়া থাকিবেন! আহা, তাহা হইলে কি সুখের কথাই হইবে!

দ্যুর স্ত্রী যতই এ কথা ভাবেন, ততই তাঁহার গাইটির জন্য মন পাগল হয়; আর ততই তিনি তাঁহার স্বামীকে পীড়াপীড়ি করেন, "ওগো! লইয়া চল! লইয়া চল, গাইটি আর বাছুরটি!"

ইঁহার কথায় শেষে বসুরা আট ভাই মিলিয়া বাছুরসুদ্ধ গাইটিকে চুরি করিলেন।

বশিষ্ঠ ফলমূল আনিবার জন্য বাহির হইয়াছিলেন, সুতরাং তিনি নন্দিনীকে লইয়া যাইবার সময় দেখিতে পাইলেন না। কিন্তু মুনিরা ধ্যানে সকল কথাই জানিতে পারেন। কাজেই, তাঁহার চোর ধরিতে বেশি বিলম্ব হইল না। তিনি বসুদিগকে এই বলিয়া শাপ দিলেন, "তোরা দেবতা হইয়া এমন কর্ম করিলি, এজন্য তোরা মানুষ হইয়া পৃথিবীতে জন্মাইবি।"

বসুদের আটজনের মধ্যে দ্যুরই অধিক দোষ ছিল, অন্যদের দোষ তত নহে। তাই শেষে বশিষ্ঠ দয়া করিয়া বলিলেন যে, অপর সাতজন একবৎসর মানুষ থাকিয়াই আবার দেবতা হইতে পারিবে, কিন্তু দ্যুকে, যত বৎসর মানুষ বাঁচে, তত বৎসরই পৃথিবীতে থাকিতে হইবে।

এখন বসুরা তো নিতান্তই সংকটে পড়িলেন। মুনির কথা মিথ্যা হইবার নহে, কাজেই মানুষ হইয়া জন্মিতেই হইবে। সুতরাং আর উপায় না দেখিয়া তাঁহারা গঙ্গাদেবীকে বলিলেন, "মা! পৃথিবীতে যদি জন্মিতেই হয়, তবে যে-সে বাপ-মায়ের ছেলে হইয়া যেন আমরা না জন্মাই, এমনি করিয়া দাও। হস্তিনার রাজা প্রতীপের শান্তনু নামক অতিশয় ধার্মিক পুত্র হইবেন, আমরা তাঁহারই পুত্র হইব। আর আমাদের মা হইবে তুমি নিজে। আমাদের জন্য মা তোমাকে মানুষ হইয়া পৃথিবীতে যাইতেই হইতেছে। তোমার সঙ্গে আমাদের এই কথা রহিল যে, আমাদের জন্মের পরেই তুমি আমাদিগকে জলে ফেলিয়া দিবে।"

বসুগণের মিনতি দেখিয়া গঙ্গা তাঁহাদের কথায় রাজি হইলেন।

পরম ধার্মিক রাজা প্রতীপ গঙ্গার ধারে বসিয়া চক্ষু বুজিয়া ভগবানের চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় গঙ্গাদেবী একটি সুন্দরী কন্যা হইয়া তাঁহার কোলে গিয়া বসিলেন। প্রতীপ চক্ষু মেলিয়া দেখিয়া নিতান্ত আশ্চর্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে মা, বৌমার মতন আসিয়া আমার কোলে বসিলে? আমার পুত্র হইলে তোমাকে তাহার সঙ্গে বিবাহ দিব।"

গঙ্গা বলিলেন, "আচ্ছা দিবেন। কিন্তু আমার একটি কথা রাখিতে হইবে: আমি যখন যাহা করিব, হাজার মন্দ বোধ হইলেও আপনার পুত্র তাহাতে বাধা দিতে পারিবেন না, তাহার জন্য আমাকে তিরস্কার করিতে পারিবেন না।" রাজা এ কথায় সম্মত হইবামাত্র, গঙ্গা আকাশে মিলাইয়া গেলেন।

প্রতীপের পুত্র হইলে, তাঁহার নাম শান্তনু রাখা হইল। শান্তনু দেখিতে যেমন সুন্দর ছিলেন, ধর্মে, বিদ্যায়, স্বভাবে এবং অন্য সকল গুণেও তেমনি তাহা দেখিয়া প্রতীপ মনের সুখে তাঁহার হাতে রাজ্যের ভার দিয়া, তপস্যা করিবার জন্য বনে চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় তাঁহাকে বলিলেন, "বাবা একটি দেবতার মেয়ে আমার বৌমা হইতে রাজি হইয়াছিলেন। তাঁহার দেখা পাইলে তুমি তাহাকে বিবাহ করিবে, আর তাঁহার মন বুঝিয়া সর্বদা চলিতে চেষ্টা করিবে। তাঁহার কোনো কাজে কখনো বাধা দিও না, বা অসন্তুষ্ট হইও না।"

যুদ্ধের কাজটা রাজাদের খুব ভালো করিয়াই শিখিতে হয়, আর সর্বদা তাহার অভ্যাস রাখিতে হয়। এইজন্য শিকার তাঁহাদের একটা খুব দরকারি কাজের মধ্যে। শান্তনু শিকার করিতে বড়ই ভালোবাসিতেন। একদিন শিকার করিতে করিতে তিনি গঙ্গার ধারে আসিয়া একটি পরমাসুন্দরী কন্যাকে দেখিতে পাইলেন। এমন সুন্দর মানুষ তিনি আর কখনো দেখেন নাই। তাঁহাকে তাঁহার এতই ভালো লাগিল যে, তিনি তাঁহার সঙ্গে কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলেন না।

শান্তনু বলিলেন, "আপনি কি দেবতা, না দানব, না অপ্সরা, না যক্ষ, না মানুষ? আপনাকে আমার রানী করিতে পারিলে বড়ই সুখী হইব।"

সেই মেয়েটি আর কেহ নহেন, গঙ্গা। গঙ্গা বলিলেন, "মহারাজ, আমি আপনার রানী হইব; কিন্তু আমার একটা নিয়ম আছে। আমার কোনো কাজে আপনি বাধা দিতে পারিবেন না, বা অসন্তোষ দেখাইতে পারিবেন না। যদি কখনো বাধা দেন, বা অসন্তুষ্ট হন, তবে তখনই আমি চলিয়া যাইব।"

শান্তনু এই নিয়মে রাজি হইয়া পরমাসুন্দরী রানী লইয়া ঘরে ফিরিলেন। তারপর তাঁহাদের দিন খুবই সুখে যায়।

কিন্তু ইহার মধ্যে একটা ভারি দুঃখের বিষয় হইয়া উঠিল। রাজার দেবকুমারের মতো সুন্দর এক-একটি ছেলে হয়, আর অমনি রানী তাহাকে গঙ্গায় ফেলিয়া দেন। দুঃখে রাজার বুক ফাটিয়া যায়, তবুও কিছু বলিতে সাহস পান না, পাছে রানী বলেন, "আমি চলিলাম!"

একটি নয়, দুটি নয়, রানী ক্রমে সাতটি ছেলে এইভাবে জন্মের পরেই গঙ্গায় ফেলিয়া দিলেন; সাতবার রাজা চুপ করিয়া দুঃখ সহ্য করিলেন। তারপর যখন আর-একটি ছেলে হইল, তখন রানী হাসিতে লাগিলেন। কিন্তু রাজার প্রাণে আর কত সহ্য হইবে? এই একটি ছেলেকে রাখিতে পারিলেও বুঝি তাঁহার প্রাণ একটু শীতল হয়! এই ভাবিয়া তিনি সকল কথা ভুলিয়া গিয়া এবারে রানীকে বাধা দিলেন। বলিলেন, "হায় হায়, এটিকে মারিও না; কেন তুমি এমন নিষ্ঠুর হইলে? এমন পাপ কি করিতে আছে?"

রানী বলিলেন, "মহারাজ, এই লও তোমার ছেলে। কিন্তু নিয়মের কথা মনে আছে তো? আমি চলিলাম, তোমার মঙ্গল হউক!"

তখন গঙ্গা তাঁহার নিজের কথা আর আটজন বসুর কথা রাজাকে বুঝাইয়া বলিয়া, আর ছেলেটি তাঁহাকে দিয়া, আকাশে মিলাইয়া গেলেন।

সেই ছেলেটির নাম দেবব্রত আর গাঙ্গেয়, এই দুই নাম রাখা হইল। দেবব্রত খুব ছোট থাকিতেই শান্তনু তপস্যা করিতে বনে চলিয়া গেলেন।

গঙ্গার ধারেই সেই বন। সেখানে অনেক বৎসর ধরিয়া শান্তনু তপস্যা করিলেন, ততদিনে দেবব্রতও বেশ বড় হইয়া উঠিলেন। রূপে, গুণে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে এই পৃথিবীতে দেবব্রতের সমান কেহ রহিল না।

এমন সময়, একদিন দেবব্রত হরিণ শিকারে বাহির হইয়াছেন। আর একটা হরিণ তাঁহার তীর খাইয়া পলায়ন করাতে, তাহাকে ধরিবার জন্য তিনি ভয়ংকর তীর ছুঁড়িয়া গঙ্গার জল প্রায় শুষিয়া ফেলিয়াছেন।

সেইখানে শান্তনু থাকেন। হঠাৎ গঙ্গার জল কেন শুকাইয়া গেল, তাহা জানিতে গিয়া, দেবব্রতের সঙ্গে তাঁহার দেখা হইল। কিন্তু দেবব্রত তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াই অন্য দিকে চলিয়া গেলেন। যাহাই হউক, শান্তনুর বুঝিতে বাকি রহিল না যে, এটি তাঁহারই পুত্র। তাই তিনি গঙ্গাকে স্মরণ করিয়া বলিলেন, "আমার পুত্রকে আবার দেখাও।"

তখন গঙ্গা দেবব্রতকে শান্তনুর নিকট উপস্থিত করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, এই তোমার সেই পুত্র। আমি ইহাকে বড় করিয়াছি। এই কুমার দেবতার অতিশয় প্রিয়পাত্র। বশিষ্ঠের নিকট সকল বেদ আর বৃহস্পতি ও শুক্রের নিকট সকল শাস্ত্র পড়িয়াছে। পরশুরাম ধনুর্বিদ্যা যত জানেন, সব ইহাকে শিখাইয়াছেন। ইহাকে লইয়া তুমি ঘরে ফিরিয়া যাও।"

এমন সুন্দর পুত্র পাইয়া রাজা মনের সুখে আবার রাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন, আর কিছুদিন পরেই তাঁহাকে যুবরাজ করিয়া দিলেন।

ইহার মধ্যে একদিন শান্তনু বনের ভিতরে বেড়াইতে গিয়া, দেবতার মতো সুন্দরী একটি কন্যা দেখিতে পাইলেন। সেই কন্যার দেহের এমনি অপরূপ সৌরভ যে, সমস্ত বন তাহাতে ভরিয়া গিয়াছে। রাজা আশ্চর্য হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?"

কন্যা বলিল, "আমি জেলের মেয়ে।"

মেয়েটির নাম সত্যবতী। আসলে সে জেলের মেয়ে নহে; জেলে তাহাকে

একটা মাছের পেটের ভিতরে পাইয়া মানুষ করিয়াছিল। লোকে জানে যে, সে সেই জেলেরই মেয়ে।

যাহা হউক, রাজা অবিলম্বে সেই জেলের কাছে গিয়া বলিলেন, "আমি তোমার মেয়েকে বিবাহ করিতে চাহি।"

জেলে বলিল, "ইহার যে ছেলে হইবে, তাহাকে যদি আপনার সমস্ত রাজ্য দেন, তবে বিবাহ দিব, নহিলে দিব না।"

যদিও সেই মেয়েটিকে বিবাহ করিতে রাজার বড় ইচ্ছা হইয়াছিল, তথাপি দেবব্রতকে ছাড়িয়া অন্য কাহাকেও রাজ্য দিতে তিনি কিছুতেই প্রস্তুত ছিলেন না। সুতরাং সত্যবতীকে না লইয়া নিতান্ত দুঃখের সহিত তাঁহাকে ঘরে ফিরিতে হইল। সে দুঃখ এতই যে, তিনি তাহাতে দিন-দিন রোগা হইয়া যাইতে লাগিলেন।

দেবব্রত ভাবিলেন, 'তাইতো, বাবাকে কেন এমন দেখিতেছি?' একদিন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা কি হইয়াছে?"

রাজা বলিলেন, "আর কি হইবে বাবা! তোমার জন্যই ভাবি, তোমার পাছে কোনো অসুখ হয়, তাই আমার চিন্তা।"

দেবব্রত বুড়া মন্ত্রীকে বলিলেন, "মন্ত্রীমহাশয়, বাবার তো বড়ই অসুখ!"

মন্ত্রী সকল কথাই জানেন ; তিনি সেই জেলের মেয়ের কথা দেবব্রতকে বলিলেন।

এ কথা শুনিবামাত্র, অমনি দেবব্রত সবান্ধবে জেলের নিকট গিয়া বলিলেন, "আমার পিতার সহিত আপনার মেয়ের বিবাহ দিন।"

জেলে দেবব্রতকে অতিশয় আদর করিয়া বলিল, "রাজপুত্র, আপনি যাহা বলিলেন, আমার পক্ষে তাহার চেয়ে সৌভাগ্যের কথা আর কি হইতে পারে? কিন্তু আমার মনে হইতেছে যে, এই বিবাহ হইলে শেষে একটা বিষম ঝগড়া-ঝাঁটির কারণ হইবে। আপনার মতো বীরের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া কি আর কেহ বাঁচিয়া থাকিতে পারে?"

দেবব্রত বুঝিলেন যে, পাছে রাজ্য লইয়া সত্যবতীর ছেলেদের সঙ্গে তাঁহার ঝগড়া হয়, জেলে সেই ভয় করিতেছে। তিনি তখনই বলিলেন, "আমার সঙ্গে আপনার নাতিদের ঝগড়া হইবার কোনো ভয় থাকিবে না। কারণ, আমি এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমি রাজ্য লইব না, আপনার নাতিই আমাদের রাজা হইবে।"

জেলে বলিল, "রাজপুত্র, আপনি অতি মহাশয় লোক—আপনি যে আপনার কথামত কাজ করিবেন, তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি। কিন্তু আপনার ছেলেরা তো এ কথায় রাজি না হইতে পারেন!"

দেবব্রত বলিলেন, "আমার যদি ছেলে না হয়, তবে তো আর সে রাজ্য চাহিতে আসিবে না! আমি আবার এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমি বিবাহ করিব না।"

এ কথায় জেলে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া বলিল, "তবে আপনার পিতাকেই

মেয়ে দিব।"

এদিকে আকাশ হইতে দেবতারা দেবব্রতের মাথায় পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। আর তিনি যে ভয়ানক প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহার জন্য তাঁহার নাম দিলেন 'ভীষ্ম' অর্থাৎ ভয়ানক লোক। তখন হইতে সকলে তাঁহার 'দেবব্রত' নাম ছাড়িয়া দিয়া তাঁহাকে 'ভীষ্ম' বলিয়াই ডাকিত।

জেলের অনুমতি লইয়া ভীষ্ম সত্যবতীকে বলিলেন, "মা, রথে উঠুন, ঘরে যাই!"

এইরূপে ভীষ্ম সত্যবতীকে আনিয়া পিতার সহিত বিবাহ দিলেন। শান্তনু তাঁহার এই কাজে কত সুখী হইলেন, বুঝিতেই পার। তিনি তাঁহাকে এই বলিয়া বর দিলেন, "তোমার মরিতে ইচ্ছা না হইলে কিছুতেই তোমার মৃত্যু হইবে না।"

সত্যবতীর চিত্রাঙ্গদ আর বিচিত্রবীর্য নামে দুইটি পুত্র জন্মিবার পরে শান্তনুর মৃত্যু হয়। তখন চিত্রাঙ্গদ বড় হইয়াছেন, বিচিত্রবীর্য শিশু। ভীষ্ম চিত্রাঙ্গদকে রাজা করিলেন। কিন্তু ইহার কিছুকাল পরেই এক গন্ধর্বের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া চিত্রাঙ্গদেরও মৃত্যু হইল। বিচিত্রবীর্যের তখনো রাজা হওয়ার বয়স হয় নাই; ভীষ্ম তাঁহার হইয়া রাজ্যের কাজ দেখিতে লাগিলেন।

ক্রমে বিচিত্রবীর্যের বিবাহের বয়স হইল। এই সময়ে ভীষ্ম শুনিতে পাইলেন যে, কাশীরাজের তিন কন্যা অম্বা, অম্বিকা আর অম্বালিকার স্বয়ম্বর হইবে। স্বয়ম্বর, কিনা নিজে দেখিয়া বিবাহ করা। দেশ-বিদেশের রাজাদিগকে ডাকিয়া মস্ত সভা হয়; কন্যা মালা হাতে সেই সভাতে আসিয়া যাঁহার গলায় সেই মালা পরাইয়া দেন, তাঁহার সঙ্গেই তাঁহার বিবাহ হয়। ইহারই নাম 'স্বয়ম্বর'। স্বয়ম্বরের কথা শুনিয়াই ভীষ্ম ভাবিলেন যে, তিনটি মেয়েকে আনিয়া তাঁহার ভাইয়ের সহিত বিবাহ দিবেন।

কাশীরাজের বাড়িতে স্বয়ম্বরের সভা আরম্ভ হইয়াছে, আর তাঁহার কন্যাদের রূপগুণের কথা শুনিয়া ভারতবর্ষের প্রায় সকল রাজাই তাঁহাদিগকে বিবাহ করিবার আশায় সেখানে আসিয়াছেন। এমন সময় ভীষ্ম তথায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "আমি আমার ভাইয়ের জন্য এই মেয়ে তিনটিকে চাহিতেছি। ক্ষত্রিয়ের মেয়েদের যে কেবল স্বয়ম্বর করিয়াই বিবাহ হয়, তাহা তো নহে, বিবাহ অনেকরকমেই হইতে পারে। তাহার মধ্যে জোর করিয়া মেয়ে লইয়া গিয়া বিবাহ দিতে পারিলেই লোকে খুব ভালো বলিয়া থাকে। সুতরাং এই দেখ, আমি জোর করিয়া মেয়ে লইয়া যাইতেছি। তোমরা পার তো আমাকে আটকাও।"

এই বলিয়া তিনি মেয়ে তিনটিকে রথে তুলিয়া লইয়া চলিলেন। রাজারা সকলে ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াও তাঁহাদিগকে রাখিতে পারিলেন না। সকলের শেষে রাজা শাল্ব প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু ভীষ্মের হাতে তাঁহারও খুবই দুর্দশা হইল।

তারপর ভীষ্ম সেই তিনটি মেয়েকে যারপরনাই আদরের সহিত বাড়িতে আনিয়া বিচিত্রবীর্যের সহিত তাঁহাদের বিবাহ দিবার আয়োজন করিতেছিলেন, এমন সময় অম্বা বলিলেন, "আমি শাল্বকে ভালোবাসি, আর মনে মনে তাঁহাকেই বিবাহ করিয়াছি।"

এ কথায় অম্বাকে ছাড়িয়া দিয়া, অম্বিকা আর অম্বালিকার সঙ্গে বিচিত্র-বীর্যের বিবাহ হইল। সেই অম্বিকার ছেলে ধৃতরাষ্ট্র ; আর অম্বালিকার ছেলে পাণ্ডু।

ভীষ্ম এমনি মহাপুরুষ ছিলেন।

আর দ্রোণও নিতান্ত কম লোক ছিলেন না। দ্রোণ, অর্থাৎ কলসীর ভিতর জন্মিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম দ্রোণ ; তিনি ভরদ্বাজ মুনির পুত্র। দ্রোণ অনেক তপস্যা করিয়াছিলেন, সকলরকম বিদ্যা, বিশেষত, ধনুর্বিদ্যা, খুব ভালোরূপেই শিখিয়াছিলেন। তারপর পরশুরামের নিকট তাঁহার সমস্ত অস্ত্র পাইয়া তিনি এমন হইয়াছিলেন যে, তাঁহার সামনে কেহ দাঁড়াইতেই পারিত না।

পাঞ্চাল দেশের রাজা পৃষতের পুত্র দ্রুপদের সহিত দ্রোণের ছেলেবেলায় বন্ধুতা হইয়াছিল। তখন দ্রুপদ দ্রোণকে বলিয়াছিলেন, "বন্ধু! আমি রাজা হইলে, সত্য করিয়া বলিতেছি, আমার যাহা কিছু সব তোমারই হইবে।" সেই ছেলেবেলার কথা দ্রোণের মনে ছিল।

বড় হইয়া দ্রোণ কৃপাচার্যের ভগিনীকে বিবাহ করেন, এবং অশ্বত্থামা নামে তাঁহার একটি পুত্র হয়। দ্রোণ অতিশয় দরিদ্র ছিলেন ; ছেলেকে দুধ কিনিয়া খাওয়াইবার শক্তি তাঁহার ছিল না। অন্য ছেলেদিগকে দুধ খাইতে দেখিয়া একদিন অশ্বত্থামা কাঁদিতে লাগিলেন। সেই ছেলেরা 'পিঠালি' গোলা জল আনিয়া তাঁহাকে বলিল, "এই দুধ, খাও।" অশ্বত্থামা সেই পিঠালির জল খাইয়াই "দুধ খাইয়াছি" বলিয়া নাচিয়া অস্থির। তখন ছেলেরা হাততালি দিয়া বলিল, "ছি ছি! তোর বাপের পয়সা নাই, তোকে দুধ কিনিয়া দিতে পারে না!"

ইহাতে দ্রোণের মনে খুব কষ্ট হওয়ায়, তিনি দ্রুপদের সেই ছেলেবেলার কথাগুলি মনে করিয়া ভাবিলেন, 'একবার বন্ধুর কাছে যাই, এ দুঃখ দূর হইবে।'

দ্রোণ অনেক আশা করিয়া দ্রুপদের কাছে গেলেন। কিন্তু দ্রুপদ আর সে দ্রুপদ নাই ; বড় হইয়া আর রাজ্য পাইয়া, তিনি আর-এক রকম হইয়া গিয়াছেন।

দ্রোণ বলিলেন, "বন্ধু! সেই যে তুমি বলিয়াছিলে, রাজা হইলে আমাকে কত সুখে রাখিবে : তাই আমি আসিয়াছি।"

দ্রুপদ বলিলেন, "বল কি, ঠাকুর? আমি রাজা, আর তুমি ভিখারি, তুমি নাকি আবার আমার বন্ধু! ছেলেবেলায় তোমাকে কি বলিয়াছি তাহা কে মনে রাখিয়াছে? চাহ তো নাহয় তোমাকে একবেলা চারিটি খাইতে দিতে পারি।"

এইরূপ অপমান পাইয়া দ্রোণ সেখান হইতে হস্তিনায় চলিয়া আসিয়াছেন,

আর মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, 'ইহার শোধ লইতে হইবে।'

হস্তিনায় আসিয়া দ্রোণ যুধিষ্ঠির, দুর্যোধন প্রভৃতির গুরু হইলেন। তাঁহাদিগকে তিনি বলিলেন, "বাছাসকল! আমি খুব ভালো করিয়া তোমাদিগকে ধনুর্বিদ্যা শিখাইব ; কিন্তু শেষে তোমাদিগকে আমার একটা কাজ করিয়া দিতে হইবে।"

এ কথায় সকলেই চুপ করিয়া রহিল, কেবল অর্জুন বলিলেন, "হাঁ, গুরুদেব! আপনার কাজ অবশ্যই করিয়া দিব।"

আহা, এই কথাগুলি না জানি বুড়ার কাছে কতই মিষ্ট লাগিয়াছিল! তিনি অর্জুনকে জড়াইয়া ধরিয়া চোখের জলে তাঁহাকে ভিজাইয়া দিলেন।

রাজপুত্রদের শিক্ষা আরম্ভ হইল। দ্রোণের কাছে শিক্ষা পাইবার লোভে বাহিরেরও দু-একটি রাজপুত্র আসিলেন। আর-একটি ছেলে আসিলেন, তাঁহার নাম কর্ণ। লোকে বলে, কর্ণ অধিরথ নামক এক সারথির ছেলে।

কর্ণের সঙ্গে প্রথম হইতেই অর্জুনের শত্রুতা হইয়া গেল। কর্ণ অর্জুনের সঙ্গে বড়ই রেষারেষি করেন, আর দুর্যোধনের সঙ্গে জুটিয়া যুধিষ্ঠির আর তাঁহার ভাইদিগকে অপমান করেন।

যাহা হউক, অর্জুনের সমান কেহই শিখিতে পারিল না। শিখিবার জন্য তাঁহার যত্ন দেখিয়া দ্রোণ বলিলেন, "তোমাকে এমনি ভালো করিয়া শিখাইব যে, তোমার সমান আর পৃথিবীতে কেহ থাকিবে না।"

ছেলেদের শিক্ষা বেশ ভালো করিয়াই হইল। দুর্যোধন আর ভীম গদা খেলায় খুব মজবুত হইলেন, নকুল সহদেব খড়্গে, রথ চালাইতে যুধিষ্ঠির ; আর ধনুকে যে অর্জুন, তাহা বুঝিতেই পার। ভীম আর অর্জুনের ক্ষমতা দেখিয়া ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা আর হিংসায় বাঁচে না।

ইঁহাদের পরীক্ষা লইবার জন্য দ্রোণ চুপিচুপি এক কারিগরকে দিয়া একটা নীল পক্ষী প্রস্তুত করাইলেন। তারপর সেটাকে এক গাছের আগায় রাখিয়া, রাজপুত্রদিগকে ডাকাইয়া বলিলেন, "তোমরা তীর-ধনুক লইয়া প্রস্তুত হও। এক-একবার এক-একজনকে আমি তীর ছুঁড়িতে বলিব। আমার কথা শেষ হইতে না হইতে তাহাকে ঐ পাখিটার মাথা কাটিয়া ফেলিতে হইবে।"

সকলের আগে যুধিষ্ঠিরের ডাক পড়িল। যুধিষ্ঠির ধনুক উঠাইয়া পাখির দিকে তাকাইয়া প্রস্তুত। দ্রোণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি দেখিতেছ?"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "গাছ দেখিতেছি, আপনাদের সকলকে দেখিতেছি, আর পাখিটাকে দেখিতেছি।"

ইহাতে এই বুঝা গেল যে, যুধিষ্ঠিরের নজর ঠিক হয় নাই, তিনি এদিক-ওদিক তাকাইতেছেন। কাজেই এ কথা শুনিয়া দ্রোণ মুখ সিঁটকাইয়া বলিলেন, "তবে তুমি পারিবে না। তুমি সরিয়া দাঁড়াও।"

এইরূপে এক-একজন করিয়া সকলেই আসিলেন, সকলেই লজ্জা পাইয়া ফিরিয়া গেলেন।

শেষে আসিলেন অর্জুন। তাঁহাকেও দ্রোণ ধনুক উঠাইয়া পাখির দিকে

তাকাইতে বলিয়া, তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি দেখিতেছ?"

অর্জুন বলিলেন, "আমি কেবল পাখিই দেখিতে পাইতেছি, আর তো কিছু দেখিতেছি না।"

দ্রোণ বলিলেন, "সমস্তটা পাখিই দেখিতে পাইতেছ?"

অর্জুন বলিলেন, "না, পাখির কেবল মাথাটুকু দেখিতেছি, আর কিছু না।"

এইবার দ্রোণ সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "তবে তীর ছাড়।"

কথাটা ভালো করিয়া শেষ হইতে না হইতেই অর্জুন তীর ছাড়িয়া দিলেন, আর কাটা মাথাসুদ্ধ পাখিও মাটিতে পড়িয়া গেল।

এমন আশ্চর্য শিক্ষা কি সকলের হয়? দ্রোণের আনন্দ আর ধরে না। তিনি অর্জুনকে বুকে চাপিয়া মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, 'আমার পরিশ্রম সার্থক হইল। আমার কাজ করিয়া দিতে পারিবে।'

আর-একদিন স্নানের সময় দ্রোণকে কুমিরে ধরিল। সে ভয়ংকর কুমির দেখিয়া রাজপুত্রদের বুদ্ধিসুদ্ধি কোথায় যে চলিয়া গেল, তাঁহারা খালি ফ্যাল্‌-ফ্যাল্‌ করিয়া তাকাইয়া আছেন, নড়িবার-চড়িবার ক্ষমতা নাই। অর্জুন ইহার মধ্যে ঝক্‌ঝকে পাঁচটি বাণ মারিয়া কুমিরকে খণ্ড-খণ্ড করিয়াছেন।

দ্রোণ ইচ্ছা করিলেই কুমির মারিয়া চলিয়া আসিতে পারিতেন। কিন্তু রাজপুত্রদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি তাহা না করিয়া, কেবল ডাকিতে-ছিলেন, 'রাজপুত্রগণ! আমাকে বাঁচাও।" অর্জুনের বুদ্ধি আর সাহস দেখিয়া তিনি তাঁহাকে 'ব্রহ্মশিরা' নামক একটি আশ্চর্য অস্ত্র পুরস্কার দিলেন।

এটি বড় ভয়ংকর অস্ত্র। তাই দ্রোণ, অর্জুনকে সেই অস্ত্র ছাড়িবার আর থামাইবার সংকেত শিখাইয়া, তারপর সাবধান করিয়া দিলেন, "দেখিও, যেন মানুষের উপরে এ অস্ত্র কদাচ ছাড়িও না, তাহা হইলে সব ভস্ম হইয়া যাইবে। কোনো দেবতার সঙ্গে যুদ্ধ হইলেই এ অস্ত্র ছাড়িতে পার।"

অর্জুন গুরুকে প্রণাম করিয়া, জোড়হাতে অস্ত্রখানি লইলেন।

এমনি করিয়া রাজপুত্রদের অস্ত্রশিক্ষা শেষ হইল। সকলেই বড়-বড় বীর হইয়াছেন; এখন সকলকে ডাকিয়া ইঁহাদের বিদ্যার পরীক্ষা দেখাইবার সময় উপস্থিত। পরীক্ষার আয়োজন খুব ধুমধামের সহিত হইতে লাগিল। এক দিকে প্রকাণ্ড মাঠে শত-শত রাজমিস্ত্রী খাটিতেছে, আর-এক দিকে পরীক্ষার সংবাদ লইয়া দূতেরা দেশ-বিদেশে ঢোল পিটাইয়া ফিরিতেছে। লোকের উৎসাহের আর সীমা নাই। বুড়া ধৃতরাষ্ট্র পর্যন্ত বলিলেন, "এতদিনে অন্ধ বলিয়া আমার মনে দুঃখ হইতেছে; এমন খেলা আমি দেখিতে পাইলাম না!"

পরীক্ষার দিন উপস্থিত। লোকজন যে কত আসিয়াছে তাহার সীমা-সংখ্যা নাই। নিশানে, ঝালরে, মণি-মুক্তায় সভাটি ঝল্‌মল করিতেছে। খেলার জায়গা, অস্ত্র রাখিবার জায়গা, বাজনদারদের জায়গা, স্ত্রীলোকদের বসিবার জায়গা, রাজারাজড়াদের বসিবার জায়গা, সাধারণ লোকদের বসিবার জায়গা, সব এমন সুন্দর করিয়া সাজানো আর গুছানো যে দেখিলে আশ্চর্য বোধ হয়। লোকের

কোলাহল আর বাজনার শব্দ মিশিয়া সমুদ্রের গর্জনকে হারাইয়া দিতেছে। সভার মধ্যে ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র, কৃপাচার্য এবং আর-আর সকলে বসিয়াছেন। মেয়েদের জায়গায়, কুন্তী, গান্ধারী (দুর্যোধনের মা) প্রভৃতি সকলে দাসী চাকরানী লইয়া উপস্থিত। এমন সময়ে দ্রোণাচার্য তাঁহার পুত্র অশ্বত্থামাকে সঙ্গে লইয়া রঙ্গভূমি অর্থাৎ খেলার জায়গায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার চুল সাদা, দাড়ি সাদা, ধুতি সাদা, চাদর সাদা। বুকের উপরে সাদা পৈতা, গলায় সাদা ফুলের মালা, গায় শ্বেত চন্দন।

তারপর সকলের আগে দেবতার পূজা হইলে, চাকরেরা অস্ত্র-শস্ত্র আনিয়া রঙ্গভূমিতে উপস্থিত করিল।

এদিকে রাজপুত্রেরা সাজগোছ করিয়া প্রস্তুত! প্রত্যেকের পরনে সুন্দর দামী পোশাক, কোমরে কোমরবন্ধ, আঙ্গুলে আঙ্গুলপোষ (অর্থাৎ আঙ্গুল বাঁচাইবার জন্য চামড়ার ঢাকনা), হাতে ধনুক, পিঠে তূণ। যুধিষ্ঠির সকলের বড় বলিয়া সকলের আগে, তারপর যিনি যত ছোট, তিনি তত পিছনে, এমনি করিয়া তাঁহারা রঙ্গভূমির দিকে আসিতে লাগিলেন। রাজপুত্রদের সুন্দর পোশাক আর উজ্জ্বল চেহারা দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য হইল। তারপর তাঁহারা নানারকম অস্ত্র ছুঁড়িতে আরম্ভ করিলে, অনেকে খুব ভয়ও পাইল।

সেদিন দুর্যোধন আর ভীমের গদার খেলা বড়ই অদ্ভুত হইয়াছিল। এমন খেলা আর কেহ দেখে নাই। তাঁহারা বাহবাও পাইয়াছিলেন যতদূর হইতে হয়। এদিকে তাঁহাদের হাতির মতো গর্জন শুনিয়া দ্রোণ একটু ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। ইহার পরই হয়তো ইঁহারা চটিয়া গিয়া মুস্কিল বাধাইবেন। কাজেই তাড়াতাড়ি ইঁহাদিগকে থামাইয়া দিতে হইল।

তারপর অর্জুনকে আসিতে দেখিয়া লোকের আনন্দ আর ধরে না। কেহ বলে, "আরে ঐ অর্জুন!" কেহ বলে, "ইনি ভারি যোদ্ধা!" কেহ বলে, "ইনি বড়ই ধার্মিক!"

অর্জুন কি আশ্চর্য খেলাই দেখাইলেন! একবার অগ্নিবাণে ভীষণ আগুন জ্বালিয়া তিনি সকলের ত্রাস লাগাইয়া দিলেন ; তার পরেই আবার বরুণবাণে জলের বন্যা বহাইয়া আগুন নিভাইয়া ফেলিলেন, এখন সকলে তল না হইলে বাঁচে! তখনই আবার বায়ুবাণ ছুটিল : অমনি জল উড়িয়া গিয়া সব পরিষ্কার ঝর্‌ঝরে! পর্জন্যাস্ত্রে তারপরের মুহূর্তেই মেঘ আসিয়া আকাশ অন্ধকার করিয়া ফেলিল!

ভৌমাস্ত্র মারিয়া তিনি মাটির ভিতর ঢুকিয়া গেলেন। পর্বতাস্ত্র মারিয়া কোথা হইতে বিশাল এক পর্বত আনিয়া ফেলিলেন। তারপর যখন অন্তর্ধান অস্ত্র মারিলেন, তখন আর কেহই তাঁহাকে দেখিতে পাইল না!

আর কত বলিব? অর্জুন সকলকে অবাক করিয়া তবে ছাড়িলেন।

এইরূপে খেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, বাজনা থামিয়াছে, সকলে বাড়ি যাইবে ; এমন সময় ফটকের কাছে ও কিসের গর্জন? সকলে বলে, "একি, বাজ পড়িল? না পর্বত ফাটিল?"

বাজও পড়ে নাই, পর্বতও ফাটে নাই। উহা কর্ণের হুঙ্কার, আর কিছুই নহে। কর্ণকে যেমন-তেমন লোক মনে করিও না। কেহ বলে তিনি সূর্যের পুত্র, কেহ বলে তিনি অধিরথ নামক সারথির পুত্র। কিন্তু আসলে তিনিও কুন্তীরই পুত্র, অধিরথের কেহ নহেন। কুন্তী কর্ণের মা হইয়াও তাঁহার প্রতি মায়ের কাজ করেন নাই, জন্মিবার পরেই তিনি তাঁহাকে ফেলিয়া দেন।

সেই শিশুটিকে অধিরথ কুড়াইয়া পাইয়া তাহার স্ত্রী রাধার নিকট আনিয়া দিল, আর দুজনে মিলিয়া পরম যত্নে তাঁহাকে মানুষ করিতে লাগিল। নিজেদের ছেলেপিলে নাই, তাই এমন সুন্দর শিশুটিকে পাইয়া তাহারা ভাবিল যেন দেবতা দয়া করিয়া তাহাদিগকে একটি পুত্র দিলেন ; তখন হইতেই লোকে ভাবে যে কর্ণ অধিরথ আর রাধার ছেলে। কর্ণও ইহাদিগকে পিতা-মাতার মতন মান্য করেন আর ভালোবাসেন। তিনি জানেন না যে তিনি যুধিষ্ঠিরদের ভাই।

জন্মাবধিই কর্ণের কানে কুণ্ডল আর পরনে কবচ (অর্থাৎ বর্ম বা যুদ্ধের পোশাক) ছিল। দেখিতে তিনি খুব উঁচু, খুব সুন্দর আর খুব ফরসা ; গায় সিংহের মতন জোর। তাঁহাকে দেখিয়াই সকলে "ইনি কে?" "ইনি কে?" বলিয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

কর্ণ বড়ই অহংকারী। আর জানই তো, অর্জুনের সঙ্গে তাঁহার কেমন শত্রুতা। তাই তিনি অর্জুনের প্রশংসা সহিতে না পারিয়া রাগের ভরে নিজের ক্ষমতা দেখাইতে আসিয়াছেন। আর যথার্থই তাঁহার ক্ষমতা কম ছিল না ; কারণ, অর্জুন যাহা কিছু করিয়াছিলেন, তাহার সমস্তই তিনিও করিয়া দেখাইলেন। তারপর তিনি বলিলেন, "আমি অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করিব।" ইহাতে সভার মধ্যে ভারি একটা হুলস্থুল কাণ্ড উপস্থিত হইল। একদিকে দুর্যোধন কর্ণকে প্রশংসা করিতেছেন, আর পাণ্ডবদিগকে অপমানের কথা বলিতেছেন, অপর দিকে অর্জুন তাহা সহিতে না পারিয়া রাগে কাঁপিতেছেন : একটা খুনাখুনি বুঝি না হইয়া যায় না। নিজের দুই পুত্রের এমন ভাব দেখিয়া ভয়ে আর দুঃখে কুন্তী ইহার মধ্যেই অজ্ঞান হইয়া গিয়াছেন।

এমন সময় কৃপাচার্য কর্ণকে বলিলেন, "বাপু, যুদ্ধ যে করিবে, তাহা তো বুঝিলাম, কিন্তু রাজার ছেলে তো আর যাহার তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারে না ; আগে বল দেখি, তুমি কোন্ রাজার বংশে জন্মিয়াছ, আর তোমার বাপ-মায়েরই-বা কি নাম?"

কৃপের কথা শুনিয়া লজ্জায় কর্ণের মাথা হেঁট হইল। তাহা দেখিয়া দুর্যোধন বলিল, "রাজা হইলেই তো যুদ্ধ হইতে পারে ; আচ্ছা আমি এখনই কর্ণকে অঙ্গদেশের রাজা করিয়া দিতেছি!" তখনই জল আসিল, ব্রাহ্মণ আসিল : আর তখনই কর্ণকে স্নান করাইয়া, ছাতা ধরিয়া, খই ছড়াইয়া, চামর দোলাইয়া, সোনা আর ফুল দিয়া, জয়-জয় শব্দে রাজা করিয়া দেওয়া হইল। কর্ণ ইহাতে চিরদিনের তরে দুর্যোধনের বন্ধু হইয়া গেলেন।

এদিকে সেই সারথি অধিরথ সংবাদ পাইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে পাগলের মতন

সেখানে ছুটিয়া আসিয়াছে। তাহাকে দেখিয়াই কর্ণ তাঁহার সেই রাজার সাজসুদ্ধ উঠিয়া তাড়াতাড়ি প্রণাম করিতে গেলেন ; কিন্তু অধিরথ ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া নিজের চাদর দিয়া পা ঢাকিয়া রাখিলেন। তারপর 'বাপ! বাপ!' বলিয়া কর্ণকে আদর করিতে করিতে বুড়া চক্ষের জলে তাহার গা ভিজাইয়া দিল।

তাহা দেখিয়া ভীম বলিলেন, "সারথির ছেলে, তুই অর্জুনের হাতে প্রাণটা কেন দিতেছিস? ততক্ষণ রাশ ধরগে যা!"

তখন রাগে কর্ণের ঠোঁট কাঁপিতে লাগিল। দুর্যোধন পাগলা হাতির মতো ক্ষেপিয়া উঠিয়া বলিলেন, "কর্ণ রাজা হওয়াতে যদি কাহারো আপত্তি থাকে, আসিয়া যুদ্ধ কর!"

ভাগ্যিস তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল, নহিলে সেদিন কি হইত, কে জানে? সন্ধ্যা হওয়ায় কাজেই সকলকে ঘরে ফিরিতে হইল, বিপদও কাটিয়া গেল।

শিক্ষা শেষ হইলে গুরুকে দক্ষিণা দিতে হয়। রাজপুত্রদেরও শিক্ষা শেষ হইয়াছে, এখন দক্ষিণা দিবার সময়। দ্রোণ রাজপুত্রদিগকে বলিলেন, "তোমরা পাঞ্চাল দেশের রাজা দ্রুপদকে ধরিয়া আনিয়া দাও। ইহাই আমার দক্ষিণা।"

সে কথায় রাজপুত্রেরা তখনই দ্রোণকে লইয়া দ্রুপদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে চলিলেন। দুর্যোধন, কর্ণ, দুঃশাসন, ইঁহাদিগকে পাণ্ডবদের আগে যুদ্ধ করিবার জন্য বড়ই ব্যস্ত দেখা গেল। ইচ্ছা যে বাহাদুরিটা তাঁহাদেরই হয়। পাণ্ডবদের তাহাতে কোনো আপত্তি ছিল না, কাজেই তাঁহারা দ্রোণের সঙ্গে একটু পিছনে থাকিলেন। কিন্তু দুর্যোধনেরা অনেক যুঝিয়াও বেশি কিছুই করিতে পারিলেন না, এবং পাঞ্চালেরাই যেন 'মার্ মার্' করিয়া আরো তেজের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। তাহাদের গর্জন এমনই ভয়ংকর হইয়া উঠিল যে, তাহা শুনিয়া অর্জুন আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না।

দ্রোণকে লইয়া পাণ্ডবেরা যুদ্ধে নামিলেন : কিন্তু দ্রুপদের লোকেরা তবুও ভয় পাইল না। ভীমের গদায় কত হাতি ঘোড়ার মাথা ফাটিল, রথ চুরমার হইল, সৈন্য পিষিয়া গেল। অর্জুনের বাণেও কত হাতি ঘোড়া সিপাহী সৈন্য কাটিল, তাহার লেখাজোখা নাই। কিন্তু দ্রুপদ কাবু হওয়া দূরে থাকুক, বরং ভীম অর্জুনকে প্রশংসা করিয়া আরো ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সেনাপতিরাও কম যুদ্ধ করিলেন না।

যাহা হউক, অর্জুনের হাতে ক্রমে সকলেরই জব্দ হইতে হইল শেষে রহিলেন কেবল দ্রুপদ : তাহারও ধনুক নিশান সারথি, সব গিয়াছে। তখন অর্জুন ধনুক-বাণ ফেলিয়া, তলোয়ার হাতে সিংহনাদ পূর্বক, এক লাফে তাঁহার রথে উঠিয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। দ্রুপদ মন্ত্রীসহ ধরা পড়িলেন, তাঁহার লোকজন পলাইয়া গেল, কাজেই যুদ্ধও মিটিল। ভীমের কিন্তু এমন একটুখানি যুদ্ধ একেবারেই ভালো লাগিল না ; তাঁহার ইচ্ছা ছিল আরো অনেকক্ষণ যুদ্ধ করেন।

দ্রুপদকে দ্রোণের নিকট উপস্থিত করা হইলে, দ্রোণ তাঁহাকে বলিলেন,

"দ্রুপদ! তোমার রাজ্যও গিয়াছে, নগরও গিয়াছে, তোমার প্রাণ অবধি আমাদের হাতে। এখন আমাদের বন্ধুতার খাতিরে তুমি কি চাহ বল?"

তারপর তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ভয় নাই, আমি ব্রাহ্মণ, ক্ষমা করাই আমাদের স্বভাব। তাহা ছাড়া শিশুকাল হইতে তোমাকে ভালোবাসি; এখনো তোমার সঙ্গে আমি বন্ধুতাই করিতে চাহি। তোমার রাজ্য এখন আমার হাতে, আমি তাহার অর্ধেক তোমাকে দিয়া অর্ধেক রাখিব। কেননা, আমার একটু রাজ্য না থাকিলে আবার তুমি বলিবে যে, 'তুই গরিব, তোর সঙ্গে বন্ধুতা করিব না!' এখন হইতে গঙ্গার দক্ষিণধারে তোমার, উত্তরধারে আমার জায়গা হইল। কি বল?"

দ্রুপদ আর কি বলিবেন? এইটুকু যে পাইয়াছেন, ইহাই তো ঢের বলিতে হইবে। কাজেই তিনি সবিনয়ে দ্রোণকে ধন্যবাদ দিয়া, দুঃখের সহিত ঘরে ফিরিলেন। সেই অবধি তাঁহার এই চিন্তা হইল যে, 'কি করিয়া দ্রোণকে মারিতে পারা যায়?'

ইহার পর এক বৎসর চলিয়া গেলে ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে যুবরাজ করিলেন। যুধিষ্ঠির এমনি ধার্মিক, সরল, দয়ালু আর শান্ত ছিলেন যে, তাঁহার গুণে রাজ্যের সকল লোক মোহিত হইয়া গেল। এদিকে ভীম, অর্জুন, নকুল আর সহদেব মিলিয়া বাহিরের শত্রুদিগকে এমনি শাসনে রাখিলেন যে, তাহারা আর মাথা তুলিতে সাহস পায় না। আর তাহা দেখিয়া ধৃতরাষ্ট্রের মনে এমনি হিংসা হইল যে, রাত্রিতে তাঁহার আর ঘুম হয় না।

শেষে আর না থাকিতে পারিয়া তিনি তাঁহার মন্ত্রী কণিককে ডাকাইয়া বলিলেন, "মন্ত্রি! এই পাণ্ডবদের বাড়াবাড়ি তো আর আমি সহিতে পারিতেছি না। বল দেখি ইহার কি উপায়?"

কণিক বলিলেন, "মহারাজ, ইহারা আর বেশি বড় না হইতেই এইবেলা ইহাদিগকে মারিয়া ফেলুন।"

একদিকে কণিকের এইরূপ পরামর্শ, আর-একদিকে দুর্যোধনের পীড়াপীড়ি।

রাজ্যের লোকেরা খালি যুধিষ্ঠির যুধিষ্ঠিরই বলে। ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ, ভীষ্ম রাজ্য ছাড়িয়া দিয়াছেন, কাজেই সকলে এমন গুণবান যুধিষ্ঠিরকে পাইয়া তাঁহাকেই রাজা করিতে চাহিতেছে। এ-সকল কথা যেন কাঁটার মতো দুর্যোধনের বুকে গিয়া বিঁধিতে লাগিল। তিনি কর্ণ, শকুনি (দুর্যোধনের মামা) দুঃশাসন প্রভৃতিকে লইয়া পরামর্শ করিলেন যে, পাণ্ডবদিগকে পোড়াইয়া মারিতে হইবে।

এইরূপ যুক্তি আঁটিয়া দুর্যোধন ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন, "বাবা! আর তো সহ্য হয় না। আপনি আর ভীষ্ম থাকিতে ইহারা নাকি যুধিষ্ঠিরকে রাজা করিতে চাহে। পাণ্ডবদের কাছে হাত জোড় করিয়াই কি শেষটা আমাদের থাকিতে হইবে? তাহা হইলে আর নরকে যাওয়ার বাকি কি রহিল? বাবা! এ অপমান হইতে কি রক্ষা পাওয়া যায় না?"

দুর্যোধনের কথায় ধৃতরাষ্ট্রের মন আরো খারাপ হইয়া গেল। তখন দুর্যোধন, কর্ণ, শকুনি, দুঃশাসন, ইঁহারা বলিলেন, "মহারাজ! একটিবার যদি বুদ্ধি করিয়া ইহাদিগকে বারণাবত নগরে পাঠাইতে পারেন, তবেই আমাদের আপদ দূর হয়!"

ধৃতরাষ্ট্রের ইহাতে খুবই মত ; ভয় শুধু এই যে, পাছে ইহাতে রাজ্যের লোক চটিয়া গিয়া তাঁহাদিগকে মারিতে আসে। তাহাতে দুর্যোধন বলিলেন, "ভয় কি? টাকাকড়ি তো সব আমাদেরই হাতে! আমরা টাকা দিয়া সকলকে বশ করিব। একটিবার কুন্তী আর তাহার পাঁচটা ছেলেকে বারণাবতে পাঠাইয়া দিন। তারপর আমরা সব হাত করিয়া লইতে পারিলে যেন উহারা ফিরিয়া আসে।"

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, "আমারও তো তাহাই মনে হয়। কিন্তু কাজটা কিনা ভালো নয়, তাই ভয় করি, পাছে ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর, কৃপ ইঁহারা চটিয়া মুস্কিল বাধান।"

দুর্যোধন বলিলেন, "ভীষ্মের কাছে তো আমরা যেমন, পাণ্ডবেরাও তেমনি। অশ্বত্থামা আমারই পক্ষের লোক, কাজেই তাঁহার বাবা দ্রোণ আর মামা কৃপাচার্যও আমাদের পক্ষেই থাকিবেন। তারপর একা বিদুর আর আমাদের কি করিবেন?"

এইরকম তাঁহাদের পরামর্শ হয় ; আর এদিকে টাকা দিয়া লোকজনকে বশ করিবার চেষ্টাও চলে। তারপর একদিন ধৃতরাষ্ট্রের পরামর্শে তাঁহাদের লোকেরা সভায় বসিয়া বলিতে লাগিল, "বারণাবত যে কি চমৎকার জায়গা, কি বলিব! আর সেখানকার শিবের মন্দিরে এই সময়ে বড়ই ধুমধাম ; দেশ-বিদেশের লোক পুজো করিতে আসিয়াছে।"

এ-সকল কথা শুনিয়া পাণ্ডবদের বারণাবত যাইতে খুব ইচ্ছা হইল। তাহা দেখিয়া ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, "বাছাসকল! শুনিতেছি এটা নাকি বড়ই সুন্দর স্থান, পৃথিবীতে এমন স্থান আর নাই। তা তোমাদের ইচ্ছা থাকিলে, তোমরা সপরিবারে একবার সেখানে গিয়া পরম সুখে কিছুদিন বাস কর। তারপর আবার ফিরিয়া আসিও।"

ধৃতরাষ্ট্রের দুষ্টবুদ্ধি যুধিষ্ঠিরের বুঝিতে বাকি রহিল না। কিন্তু কি করেন, চারি দিকেই ধৃতরাষ্ট্রের লোক, পাণ্ডবদের হইয়া দু কথা বলিবার কেহ নাই। কাজেই তিনি রাজি হইলেন। তারপর তিনি ভীষ্ম, বিদুর, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, গান্ধারী আর ব্রাহ্মণ পুরোহিত প্রভৃতি সকলের নিকট গিয়া বিনয়ের সহিত বলিলেন, "জেঠামহাশয়ের কথায় আমরা বারণাবত চলিলাম, আপনারা আমাদিগকে আশীর্বাদ করুন।"

তাঁহারা সকলেই বলিলেন, "ভালোয় ভালোয় ফিরিয়া আসিও। তোমাদের যেন কোনো অনিষ্ট না হয়।"

পাণ্ডবদের বারণাবত যাওয়া স্থির হইয়াছে দেখিয়া দুর্যোধনের আর আনন্দের সীমা রহিল না! তিনি গোপনে পুরোচন নামক তাঁহাদের একজন

মন্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, "পুরোচন, তোমার মতো আর আমাদের বন্ধু কে আছে? এই যে রাজ্য দেখিতেছ, ইহা যে কেবল আমারই, তাহা নহে—তোমারও। বাবা আজ পাণ্ডবদিগকে বারণাবত পাঠাইতেছেন। তুমি খুব গাড়ি হাঁকাইয়া উহাদের ঢের আগেই সেখানে চলিয়া যাও। সেখানে গিয়া শহরের একপাশে, নির্জন স্থানে, গাছপালার আড়ালে একটি সুন্দর বাড়ি করিবে। গালা, ধুনা, চর্বি, তেল, শণ, কাঠ এমনি সব জিনিস দিয়া বাড়িটি প্রস্তুত হওয়া চাই, যাহাতে আগুন ছোঁয়াইবামাত্রই তাহা দপ্-দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। সাবধান! যেন বাড়ি দেখিয়া কেহ টের না পায় যে তাহাতে এমন কোনো জিনিস আছে। তারপর কুন্তীকে তাহার পাঁচ ছেলে সুদ্ধ নিয়া সেই বাড়িতে রাখিবে। দিন কতক খুব আদর দেখাইয়া উহাদের বিশ্বাস জন্মাইয়া নিবে; শেষে একদিন রাত্রিকালে পাণ্ডবেরা নিশ্চিন্তে ঘুমাইবার সময় দরজায় আগুন দিয়া তাহাদিগকে পোড়াইয়া মারিবে। তাহা হইলে লোকে ভাবিবে, হঠাৎ আগুন লাগিয়াছে, আমাদের কেহ সন্দেহ করিবে না।"

দুষ্ট পুরোচন এ কথায় "যে আজ্ঞা" বলিয়া চলিয়া গেল।

এদিকে পাণ্ডবদের যাত্রার সময় উপস্থিত, রথ প্রস্তুত। পাণ্ডবেরা গুরুজনকে প্রণাম, সমান বয়সীদের সঙ্গে কোলাকুলি, ছোটদিগকে আশীর্বাদ আর প্রজাদিগকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া রথ ছাড়িয়া দিলেন। বিদুর প্রভৃতি কয়েকজন লোক অতিশয় দুঃখের সহিত কিছুদূর তাঁহাদের পিছু পিছু চলিলেন। এদিকে ব্রাহ্মণেরা ধৃতরাষ্ট্রের নিন্দা করিয়া বলিতে লাগিলেন, "ধৃতরাষ্ট্র দুষ্টলোক তাই এমন কাজ করিল। পাণ্ডবেরা তো কোনোদিন তাহাদের কোনো ক্ষতি করে নাই। আর ভীষ্মকেই-বা কি বলি? তাঁহার চোখের সামনে এমন অধর্ম হইল, আর তিনি চুপ করিয়া রহিলেন! আইস আমরাও যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে চলিয়া যাই।"

যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগকে বলিলেন, "দেখুন, জ্যেঠামহাশয় আমাদের গুরুলোক, তাঁহার কথা শুনিয়া চলাই আমাদের উচিত! আপনারা আমাদের পরম বন্ধু, আমাদিগকে আশীর্বাদ করিয়া এখন ঘরে ফিরুন। ইহাতে শেষে আমাদের উপকার হইবে।"

এ কথায় তাঁহারা পাণ্ডবদিগকে আশীর্বাদ করিয়া ঘরে ফিরিলেন। বিদুর এতক্ষণ চুপিচুপি আসিতেছিলেন! তাঁহাদিগকে ফিরিতে দেখিয়া, সময় বুঝিয়া তিনি যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, "বাবা যুধিষ্ঠির! বিপদ আসিলে বুদ্ধিমান লোকে তাহা এড়াইবার চেষ্টা করেন। গর্তের ভিতরে থাকিলে আগুনে পোড়াইতে পারে না। লোহার অস্ত্র নয়, কিন্তু তাহাতে শরীর কাটে ; তাহার কথা যে জানে, শত্রুরা তাহাকে মারিতে পারে না। অন্ধ হইলে পথ দেখিতে পায় না ; ব্যস্ত হইলে বুদ্ধি ঠিক থাকে না। এইটুকু বলিলাম, বুঝিয়া লও। চলাফেরা করিলেই পথ জানা যায়, নক্ষত্র দিয়া দিক ঠিক করা যায়, আর নিজের মন বশে থাকিলে ভয়ে কাবু হইতে হয় না।"

এই কথাগুলি বিদুর যে কিরকম একটা ভাষায় বলিলেন, কেহ তাহার অর্থ

বুঝিতে পারিল না! কেবল যুধিষ্ঠির বলিলেন, 'বুঝিয়াছি।' সকলে চলিয়া গেলে কুন্তী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা! বিদুর যে কি বলিলেন, আর তুমিও বলিলে 'বুঝিয়াছি', আমি তো তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না!"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "মা! দুর্যোধন নাকি আমাদিগকে পোড়াইয়া মারিতে চাহে। তাই কাকা আমাকে সাবধান করিয়া দিলেন, আর সবদা পথ-ঘাটের খবর লইতে, আর ভালো হইয়া চলিতে বলিলেন।"

তারপর কিছুদিন পথ চলিয়া তাঁহারা বারণাবতে পোঁছিলেন। তাঁহাদিগকে পাইয়া সেখানকার লোকদিগের খুবই আনন্দ হইল। পাণ্ডবেরা নিতান্ত গরিবদেরও বাড়ি বাড়ি গিয়া দেখা করিলেন। পুরোচন তো প্রথমেই আসিয়া তাঁহাদের সঙ্গে জুটিয়াছে। তাঁহাদিগকে পাইয়া যেন কত খুশি! দুষ্টের মুখে হাসি আর ধরে না, কুমিরের মতন তাহার দাঁত খালি বাহির হইয়াই আছে। পাণ্ডবদিগকে সে আগে অন্য একটা সুন্দর বাড়িতে খুব আদরের সহিত দশদিন রাখিয়া তারপর তাঁহাদিগকে সেই গালার বাড়িতে নিয়া উপস্থিত করিল। সে বাড়িতে গিয়াই যুধিষ্ঠির চুপিচুপি ভীমকে বলিলেন, "ভাই! আমি চর্বি আর গালার গন্ধ পাইতেছি। এ বাড়িটা নিশ্চয়ই গালা, চর্বি, শুকনো বাঁশ প্রভৃতি জিনিসের তৈরি। দুষ্ট আমাদিগকে পোড়াইয়া মারিবার জন্য এইখানে আনিয়াছে! বিদুর কাকা ইহার কথা জানিতে পারিয়াই আমাকে ওরূপ বলিয়াছিলেন।"

এ কথা শুনিয়া ভীম বলিলেন, "তবে আসুন আমরা এখান হইতে চলিয়া যাই।"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "না আমাদের এখানে থাকাই ভালো। এখন চলিয়া গেলে উহারা আর কোনো ফন্দি করিয়া আমাদিগকে মারিবে। তাহার চেয়ে এই ঘর পোড়াইবার সময় উহাদিগকে ফাঁকি দিয়া আমরা পলাইয়া গেলে লোকে ভাবিবে, আমাদিগকে পোড়াইয়া মারিয়াছে। আর এ কথা শুনিলে ভীষ্ম, দ্রোণ ইঁহারাও ইহাদের উপর খুব বিরক্ত হইবেন। এখন হইতে খুব শিকার করিয়া বেড়াইলে আমরা পথ-ঘাট সবই জানিতে পারিব, আর পলাইবার সময় কোনো মুস্কিলও হইবে না। আজই এই ঘরের ভিতরে একটা গর্ত খুঁড়িয়া, আমরা তাহার মধ্যে থাকিব ; তাহা হইলে আর আগুনের ভয় থাকিবে না।"

ইহার মধ্যে একদিন একটি লোক চুপিচুপি যুধিষ্ঠিরের নিকট আসিয়া বলিল, "বিদুর মহাশয় আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন। আমি প্রাণ দিয়া আপনাদের কাজ করিব। আপনারা আসিবার সময় তিনি ম্লেচ্ছ ভাষায় আপনাকে কিছু বলেন, তাহার উত্তরে আপনি বলেন যে, 'বুঝিলাম' এই কথা বলিলেই বুঝিতে পারিবেন যে আমি যথার্থই বিদুরের লোক। কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীতে পুরোচন এই ঘরসুদ্ধ আপনাদিগকে পোড়াইয়া মারিবার যুক্তি করিয়াছে। এখন কি করিতে হইবে বলুন : আমি খুব গর্ত খুঁড়িতে পারি।"

লোকটিকে দেখিয়াই যুধিষ্ঠির বুঝিতে পারিলেন যে, এ ব্যক্তি খুব সরল ও ধার্মিক। তিনি তাহাকে বলিলেন, "আমি বেশ বুঝিয়াছি, তুমি ভালো

লোক, আর কাকা তোমাকে পাঠাইয়াছেন। এখন যাহাতে আমরা এ বিপদে রক্ষা পাই তাহাই কর।"

সেই লোকটি ঘরের মধ্যে নর্দমা কাটিবার ছল করিয়া এক প্রকাণ্ড গর্ত খুঁড়িয়া ফেলিল। পাণ্ডবেরা দিনের বেলায় শিকার করিয়া বেড়াইতেন ; রাত্রিতে সেই গর্তের ভিতরে সাবধানে লুকাইয়া থাকিতেন। গর্তের মুখ এমনভাবে লুকানো ছিল যে, না জানিলে তাহা টের পাওয়া অসম্ভব। উহার কথা খালি পাণ্ডবেরা জানিতেন, আর যে গর্ত খুঁড়িয়াছিল সে জানিত, আর কেহই জানিত না। ক্রমে সেই কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী আসিল, যেদিন পুরোচনের সেই গালার ঘরে আগুন দেওয়ার কথা। সেদিন কুন্তী অনেক ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য লোককে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইলেন। একটি নিষাদী, অর্থাৎ ব্যাধজাতীয় স্ত্রীলোকও তাহার পাঁচটি পুত্র লইয়া সেখানে খাইতে আসিল। গরিব লোক, ভালো খাবার পাইয়া এতই খাইল যে আর তাহাদের চলিয়া যাইবার শক্তি নাই। কাজেই তাহারা ছয়জন সেইখানে রহিল।

এদিকে ক্রমে ঢের রাত হইয়াছে, আর খুব বাতাসও বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। সকলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, পুরোচনও নিদ্রায় অচেতন। সেই সুন্দর সুযোগ পাইয়া ভীম তখনই তাড়াতাড়ি তাহার ঘরের দরজায় আগুন লাগাইয়া দিলেন। তারপর বাড়ির চারিদিকে বেশ ভালোরূপে আগুন ধরাইয়া, পাঁচ ভাই মায়ের সঙ্গে সেই গর্তের ভিতর দিয়া বাহিরে চলিয়া আসিলেন। পুরোচন আর পাঁচপুত্র সমেত সেই নিষাদী পুড়িয়া মারা গেল।

আগুনের শব্দে শহরের লোকের জাগিতে অনেকক্ষণ লাগিল না। তাহারা আসিয়া হায় হায় করিতে করিতে পুরোচন আর দুর্যোধনকে গালি দিতে লাগিল। পাণ্ডবদিগকে পোড়াইয়া মারিবার জন্যই যে পুরোচন দুর্যোধনের কথায় এই ঘর প্রস্তুত করিয়াছিল, এ কথা আর তাহাদের বুঝিতে বাকি রহিল না। তাহারা বলিল, "দুষ্ট নিজেও পুড়িয়া মরিয়াছে ; বেশ হইয়াছে! যেমন কর্ম তেমন ফল।"

এতক্ষণ পাণ্ডবেরা কি করিতেছেন? তাঁহারা প্রাণপণে বনের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছেন। কিন্তু চলা কি যায়? একে ভয়ে অস্থির, তাহাতে রাত জাগিয়া দুর্বল। অন্ধকার রাত্রি; ঝড় বহিতেছে। তাঁহারা পদে পদে হুঁচট খাইতেছেন, পা আর চলে না। তখন ভীম আর উপায় না দেখিয়া মাকে লইলেন কাঁধে, আর নকুল সহদেবকে কোলে। তারপর যুধিষ্ঠির আর অর্জুনের হাতে ধরিয়া লইয়া ঝড়ের মতন ছুটিয়া চলিলেন।

এদিকে বিদুর পাণ্ডবদিগের সাহায্য করিবার জন্য আর-একজন খুব পাকা লোক পাঠাইয়া দিলেন। সে খুঁজিতে খুঁজিতে গঙ্গার ধারে আসিয়া দেখিল যে, তাঁহারা নদী পার হইবার চেষ্টায় জল মাপিতেছেন। তখন সে সেই ম্লেচ্ছ ভাষার ঘটনার কথা বলিতেই তাহার প্রতি পাণ্ডবদের বিশ্বাস জন্মিল। তারপর একটি সুন্দর নৌকা আনিয়া তাঁহাদিগকে বলিল, "চলুন আপনাদিগকে পার করিয়া দিই।"

নৌকা বাহিতে বাহিতে সেই লোকটি তাঁহাদিগকে বলিল, "বিদুর মহাশয় আপনাদিগকে অনেক আশীর্বাদ জানাইয়াছেন, আর বলিয়াছেন, আপনাদের কোনো ভয় নাই, শেষে আপনাদেরই জয় হইবে।"

পাণ্ডবেরা বলিলেন, "কাকাকে আমাদের প্রণাম জানাইবে।"

এইরূপ কথাবার্তায় নৌকা অপর পারে উপস্থিত হইলে, লোকটিকে বিদায় দিয়া পাণ্ডবেরা আবার পথ চলিতে লাগিলেন।

এদিকে সকালবেলায় বারণাবতের লোকেরা পাণ্ডবদিগকে খুঁজিতে আসিয়া গালার ঘরের ছাইয়ের ভিতরে পুরোচন আর সেই নিষাদী আর তাহার পাঁচ ছেলের পোড়া হাড় পাইল। তাহারা নিষাদীর কথা জানিত না, কাজেই এই হাড় কুন্তী আর পাঁচ পাণ্ডবের মনে করিয়া তাহারা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "চল আমরা দুষ্ট ধৃতরাষ্ট্রকে গিয়া বলি, 'তোমার সাধ পূর্ণ হইয়াছে, পাণ্ডবদিগকে পোড়াইয়া মারিয়াছ'।"

ইহার মধ্যে সেই যে লোকটি গর্ত খুঁড়িয়াছিল, সে তাড়াতাড়ি ছাই উল্টাইবার ছল করিয়া সেই গর্ত কখন বুজাইয়া দিয়াছিল, কাজেই তাহার কথা কেহ জানিতে পারিল না।

ধৃতরাষ্ট্র শুনিলেন যে, পুরোচন আর পাণ্ডবেরা জতুগৃহের (গালার ঘরের) সঙ্গে পুড়িয়া মারা গিয়াছেন, তখন তিনি মনে মনে খুবই খুশি হইলেন, কিন্তু বাহিরে দেখাইলেন যেন পাণ্ডবদের দুঃখে তাঁহার বুক একেবারে ফাটিয়া গেল! তিনি কাঁদেন আর বলেন, "হায় হায়! শীঘ্র উহাদের শ্রাদ্ধ কর! হায় হায়! ঢের টাকা খরচ কর! হায় হায়! একটা নদী খোঁড়াও! হায় হায়! পাণ্ডবেরা ভালো করিয়া স্বর্গে যাউক!"

আর-একজন লোক এমনি কপট কান্না কাঁদিয়াছিলেন, কিন্তু সে অন্য কারণে। বিদুর তো জানেনই যে পাণ্ডবেরা বাঁচিয়া আছেন, কাজেই তাঁহার কেন দুঃখ হইবে? কিন্তু দেশসুদ্ধ লোক পাণ্ডবদের জন্য হায় হায় করিয়া কাঁদিতেছে, ইহার মধ্যে তিনি চুপ করিয়া থাকিলে তো ভারি সন্দেহের কথা হয়। কাজেই তিনি আসল কথা জানিয়াও লোকের সন্দেহ দূর করিবার জন্য একটু কাঁদিলেন।

এদিকে পাণ্ডবেরা গঙ্গা পার হইয়া আবার ক্রমাগত দক্ষিণ দিকে চলিয়াছেন। তখনো রাত্রি প্রভাত হয় নাই, চারিদিকে ঘোর অন্ধকার আর ভয়ংকর বন। পিপাসায়, পরিশ্রমে আর ঘুমে ভীম ছাড়া আর সকলেই নিতান্ত কাতর। যুধিষ্ঠির বলিলেন, "ভীম! ভাই, আর যে পারি না। এখন উপায়?"

ভীম বলিলেন, "ভয় কি দাদা? এই যে আমি আপনাদিগকে লইয়া যাইতেছি।" এই বলিয়া তিনি পূর্বের ন্যায় সকলকে বহিয়া লইয়া ছুট দিলেন।

ভীম সেদিন কি ভয়ানক বেগেই চলিয়াছিলেন! তাঁহার দাপটে গাছ ভাঙে, মাটি উড়ে, আর যুধিষ্ঠিরেরা তো প্রায় অজ্ঞান! বনের পর বন পার হইয়া যাইতেছেন, তবুও তাঁহার বিশ্রাম নাই। রাত চলিয়া গেল, তারপর সমস্তটা দিন চলিয়া গেল। সন্ধ্যার সময় একটা বনের ভিতরে আসিয়া ভীম

থামিলেন। ক্রমে ঘোর অন্ধকার আসিল, ঝড় উঠিল, চারি দিকে বাঘ ভাল্লুক ডাকিতে লাগিল, কিন্তু পাণ্ডবেরা আর কিছুতেই চলিতে পারেন না; কাজেই সেখানে বিশ্রাম করা ভিন্ন আর উপায় নাই।

এমন সময় কুন্তী বলিলেন, "আর তো পারি না! পিপাসায় যে প্রাণ গেল!" মায়ের দুঃখ ভীমের সহ্য হয় না; অথচ সে পোড়া বনে জল বা ফলমূল কিছুই নাই। কাজেই তিনি আবার সকলকে লইয়া আর-একটা সুন্দর বনে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে এক প্রকাণ্ড বটগাছের তলায় তাঁহাদিগকে রাখিয়া তিনি বলিলেন, "এইখানে তোমরা বিশ্রাম কর। ঐ সারসের ডাক শুনা যাইতেছে; জল কাছেই পাইব।"

ভীম সারসের ডাক শুনিয়া খুঁজিতে খুঁজিতে দুই ক্রোশ দূরে একটা জলাশয়ে উপস্থিত হইলেন। সেখানে স্নান আর জলপানের পর আর সকলের জন্য জল লইয়া আসিয়া দেখেন, তাঁহারা ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন।

হায়! রাজরানী, রাজার ছেলে, তাঁহারা কিনা আজ মাটিতে গড়াগড়ি যাইতেছেন! দুঃখে ভীমের চোখে জল আসিল। তখন শত্রুদিগের হিংসার কথা ভাবিয়া তিনি রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, "দুষ্ট দুর্যোধন! তোর বড় ভাগ্য যে দাদা আমাকে বলেন না। নহিলে আজই তোদের সকলকে যমের বাড়ি পাঠাইতাম।" বলিতে বলিতে ভীমের ঝড়ের মতো নিশ্বাস বহিতে লাগিল।

এত কষ্টের পর সকলে ঘুমাইয়াছেন, কাজেই তাঁহাদিগকে জল খাওয়াইবার জন্য জাগাইতে ভীমের ইচ্ছা হইল না। তিনি জল হাতে করিয়া সেইখানে পাহারা দিতে লাগিলেন।

সেই বনের কাছে, এক প্রকাণ্ড শাল গাছের উপরে, হিড়িম্ব নামে একটা বিকট রাক্ষস থাকিত। তাহার তালগাছের মতো বিশাল দেহে ভয়ানক জোর, আগুনের মতো চোখ, জালার মতো মুখ, মূলার মতো দাঁত, গাধার মতো কান, ঝাঁকড়া তামাটে চুল-দাড়ি; বেলুনের মতো প্রকাণ্ড ভুঁড়ি। অনেকদিন মানুষের মাংস খায় নাই, তাই পাণ্ডবদিগকে দেখিয়া তাহার মুখে জল আর ধরে না। সে খালি মাথা চুলকায়, আর হাই তোলে, আর বারবার তাঁহাদিগকে চাহিয়া দেখে। শেষে আর থাকিতে না পারিয়া সে তাহার বোন হিড়িম্বাকে বলিল, "বাঃ! কিএ মিঠ্ঠারে গন্ধো! ও বোহিন্, ঝাট্ কোরে ধোরে লিয়ে আয়! মোরা খাবো! আর পেটমে ঢাক পিট্টায়কে নাচ্চ্বো!"

হিড়িম্বা তাহার কথায় পাণ্ডবদের কাছে আসিল। কিন্তু রাক্ষসের মেয়ের প্রাণেও দয়া-মায়া খুব থাকিতে পারে। পাণ্ডবদিগকে মারিবার কোনো চেষ্টা করা দূরে থাকুক, বরং সে আসিয়াই ভীমকে সকল কথা জানাইয়া বলিল, "শীঘ্র সকলকে জাগাও। আমি তোমাদিগকে রাক্ষসের হাত হইতে বাঁচাইয়া দিতেছি।"

ভীম বলিলেন, "আমি রাক্ষস-টাক্ষসকে ভয় করি না। ইঁহারা অনেক পরিশ্রমের পর ঘুমাইয়াছেন, ইঁহাদিগকে কি এখন জাগানো যায়? নাহয় তোমার ভাইকে পাঠাইয়া দাও, আমার তাহাতে আপত্তি নাই।"

এদিকে রাক্ষসের আর বিলম্ব সহ্য না হওয়ায়, সে নিজেই আসিয়া উপস্থিত । তাহাতে হিড়িম্বা নিতান্ত ভয় পাইয়া বলিল, "শীঘ্র তোমরা আমার পিঠে উঠ, আমি এখনো তোমাদিগকে লইয়া আকাশে উড়িয়া যাইতে পারি।"

ভীম বলিলেন, "তোমার কোনো ভয় নাই, আমার গায় ঢের জোর আছে। মানুষ বলিয়া আমায় অবহেলা করিও না।"

হিড়িম্বা বলিল, "ঐ দুষ্ট মানুষকে ধরিয়াই মারিয়া ফেলে, তাই আমি ভয় পাই। তোমাকে অবহেলা করিতেছি না।"

এ-সকল কথা শুনিয়া রাক্ষসের কিরূপ রাগ হইল, বুঝিতেই পার। সে ভীমকে আগে মারিবে, না হিড়িম্বাকেই আগে মারিবে ঠিক করিতে পারিতেছে না। হাউ-মাউ করিয়া সে বন মাথায় করিয়া তুলিল।

ভীম বলিলেন, "মাটি করিল! আরে চুপ চুপ! হতভাগা, ইঁহাদের ঘুম ভাঙিগয়া দিবি?"

রাক্ষস ষাঁড়ের মতন শব্দ করিয়া বলিল, "মুহি তো তোন্ধেরুরুকে খাবো, ওহারুরু লোকের ঘুম ভেঙিগবেক কেনে?" এই বলিয়া সে দুই হাত ছড়াইয়া ভীমকে ধরিতে গেল।

ভীম তাহার হাত দুটা ধরিয়া হাসিতে হাসিতে তাহাকে খানিক দূরে লইয়া গেলেন।

তখন বন তোলপাড় গাছপালা চুরমার করিয়া দুজনে কি বিষম যুদ্ধই আরম্ভ হইল। পাণ্ডবদের আর নিদ্রা যাওয়া হইল না। হিড়িম্বা সেইখানে বসিয়াছিল। কুন্তী চক্ষু মেলিয়া তাহাকে দেখিয়া যারপরনাই আশ্চর্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা! তুমি কি এই বনের দেবতা, না কোনো অপ্সরা? এমন সুন্দর তো আমি কখনো দেখি নাই! তুমি কে, কিজন্য আসিয়াছ?"

হিড়িম্বা বলিল, "মা! আমি রাক্ষসের মেয়ে, আমার নাম হিড়িম্বা, আমার দাদা হিড়িম্ব আর আমি এই বনে থাকি। আপনাদিগকে দেখিয়া দাদা বলিল, 'উহাদিগকে ধরিয়া আন্, খাইব।' আপনারা ঘুমাইতেছিলেন, আর আপনার একটি ছেলে জাগিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে সকল কথা বলিয়া আপনাদিগকে পিঠে করিয়া এখান হইতে কোনো ভালো জায়গায় লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি কিছুতেই রাজি হইলেন না। শেষে আমার দেরি দেখিয়া দাদা নিজেই আসিয়া উপস্থিত হইল। ঐ দেখুন, আপনার সেই ছেলেটির সঙেগ কেমন যুদ্ধ চলিতেছে!"

এ কথা শুনিবামাত্র যুধিষ্ঠির, অর্জুন, নকুল আর সহদেব ভীমের নিকট ছুটিয়া চলিলেন। অর্জুন ভীমকে ডাকিয়া বলিলেন, "দাদা! পরিশ্রম হইয়াছে কি? ভয় নাই, আমি তোমায় সাহায্য করিতেছি?"

ভীম বলিলেন, "ভয় নাই ভাই! হতভাগাকে কাবু করিয়া আনিয়াছি!"

অর্জুন বলিলেন, "শীঘ্র উহাকে মারিয়া ফেল। নহিলে দুষ্ট আবার কোনো ফাঁকি-টাকি দিয়া বসিবে; ইহারা বড়ই ধূর্ত। তুমি নাহয় একটু বিশ্রাম কর, আমিই উহাকে মারিতেছি।"

ইহাতে ভীম তখনই ক্রোধভরে রাক্ষসকে তুলিয়া সাংঘাতিক এক আছাড় দিলেন। তারপর উহার দেহটাকে মট্ করিয়া ভাঙ্গিতেই উহার প্রাণ বাহির হইয়া গেল। মরিবার সময় রাক্ষসটা এমনি ভয়ানক চ্যাচাইতেছিল যে কি বলিব!

অমন ভীষণ স্থানে না থাকাই ভালো ; আর, বোধ হইল যেন কাছেই নগর আছে। সুতরাং রাক্ষস মরিবার পরেই পাণ্ডবেরা তাড়াতাড়ি সে স্থান ছাড়িয়া চলিলেন। হিড়িম্বাও তাঁহাদের সঙ্গে চলিল।

হিড়িম্বাকে সঙ্গে আসিতে দেখিয়া ভীম বলিলেন, "রাক্ষসেরা বড়ই দুষ্ট ; উহাদিগকে বিশ্বাস করিতে নাই। তোর ভাইকে মারিয়াছি, আয়, তোকে মারি।"

এ কথায় যুধিষ্ঠির বলিলেন, "ছি ভীম! এমন কাজ করিতে নাই। স্ত্রীলোককে মারা বড় পাপ।"

ভীমের রাগ দেখিয়া হিড়িম্বা নিতান্ত দুঃখের সহিত জোড়হাতে কুন্তীকে বলিল, "মা, আমার কোনো দোষ নাই। আপনার ভীমকে আমি প্রাণের চেয়েও ভালোবাসি, আর আশা করিয়াছিলাম, তিনি আমাকে বিবাহ করিবেন। আমাকে রক্ষা করুন।"

তখন যুধিষ্ঠির বলিলেন, "ঠিক কথা। ভীম! তোমার ইঁহাকে বিবাহ করা উচিত।"

ততক্ষণে ভীমের রাগ চলিয়া গিয়াছে, আর দাদার কথা তিনি কখনো অমান্য করেন না। কাজেই তিনি হিড়িম্বাকে বিবাহ করিলেন।

ভীম আর হিড়িম্বার ঘটোৎকচ নামক এক পুত্র হইয়াছিল ; তাহার কথা আরো শুনিতে পাইবে। ঘটোৎকচ ধার্মিক, বিদ্বান আর অসাধারণ বীর ছিল। জন্মমাত্রেই ঘটোৎকচ বড় মানুষের মতন করিয়া ভীমকে বলিল, "বাবা, এখন যাই। দরকার হইলে, যখন ডাকিবেন তখনই আসিব।" এই বলিয়া সে সকলকে প্রণাম করিয়া তাহার মায়ের সহিত উত্তর দিকে চলিয়া গেল।

তারপর পাণ্ডবেরা গাছের ছাল পরিয়া আর মাথায় জটা পাকাইয়া তপস্বীর বেশে বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। হরিণ শিকার করিয়া খাওয়া, বেদ, উপনিষৎ প্রভৃতি পড়া, আর মায়ের সেবা করা, ইহাই তখন তাঁহাদের প্রধান কাজ ছিল। এইরূপে মৎস্য, ত্রিগর্ত, পাঞ্চাল, কীচক প্রভৃতি নানা দেশ ঘুরিয়া শেষে একদিন তাঁহারা ব্যাসদেবকে দেখিতে পাইলেন। ভীষ্ম যেমন ইঁহাদের ঠাকুরদাদা, ব্যাসও তেমনি। কাজেই পাণ্ডবদিগকে ব্যাস অনেক আদর করিলেন। তিনি বলিলেন, "আমি সব জানি। যদিও আমার কাছে তোমরা আর দুর্যোধনেরা দুইই সমান, তথাপি ইহাদের ব্যবহার দেখিয়া এখন আমি তোমাদিগকেই অধিক ভালোবাসি ; আর তোমাদের উপকারের জন্যই এখানে আসিয়াছি। আমি আবার না আসা পর্যন্ত তোমরা ঐ নিকটের নগরটিতে গিয়া বাস কর।"

এই বলিয়া ব্যাস পাণ্ডবদিগকে একচক্রা নামক একটি নগরে পৌঁছাইয়া

দিয়া, কুন্তীকে বলিলেন, "মা, আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি, তোমার পুত্রেরা সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়া পরম সুখে দিন কাটাইবে।"

ব্যাস তাঁহাদিগকে এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে রাখিয়া চলিয়া গেলেন। এক মাস পরে তাঁহার ফিরিয়া আসিবার কথা রহিল।

সেই ব্রাহ্মণের বাড়িতে পাণ্ডবেরা বাস করিতে লাগিলেন। দিনেরবেলা পাঁচ ভাই ভিক্ষা করিয়া আর নানা স্থান দেখিয়া বেড়ান। সন্ধ্যা হইলে মায়ের কাছে ফিরিয়া আসেন। ভিক্ষার জিনিসগুলির সমান দুই ভাগ হয়। ইহার এক ভাগের সমস্তই ভীম খান, অপর ভাগ আর পাঁচজনে বাঁটিয়া খান। এইরূপে দিন যায়।

ইহার মধ্যে একদিন কি হইল শুন। সেদিন যুধিষ্ঠির, অর্জুন, নকুল আর সহদেব ভিক্ষায় বাহির হইয়াছেন। ভীমের সেদিন যাওয়া হয় নাই, তিনি মায়ের কাছেই রহিয়াছেন। ইহার মধ্যে হঠাৎ সেই ব্রাহ্মণের বাড়ির ভিতরে ভয়ানক কান্না উঠিল।

কান্না শুনিয়া কুন্তী ভীমকে বলিলেন, "না জানি ব্রাহ্মণের কি ভয়ানক বিপদ উপস্থিত হইয়াছে! ইঁনি আমাদিগকে এত স্নেহ করেন, আমরা কি ইঁহার কোনো উপকার করিতে পারি না, বাবা?"

ভীম বলিলেন, "মা, তুমি জানিয়া আইস, বিষয়টা কি? সাধ্য হইলে অবশ্য ব্রাহ্মণের উপকার করিব।" কথা শেষ হইতে না হইতেই আবার সেই কান্না। তখন কুন্তী ব্যস্তভাবে ছুটিয়া বাড়ির ভিতর গিয়া দেখিলেন, ব্রাহ্মণ স্ত্রী কন্যা আর পুত্র লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিতেছেন, "হায়, কেন বাঁচিয়া আছি? বাঁচিয়া থাকায় কি সুখ? আমি আগেই এখান হইতে চলিয়া যাইতে চাহিয়াছিলাম ; গিন্নি! তুমিই তো দিলে না! তোমার বাপের বাড়ি বলিয়া এ স্থান ছাড়িতে তোমার কষ্ট হইয়াছিল, তাহার ফলে দেখ এখন কি কষ্ট উপস্থিত! হায় হায়! আমি কাহাকে ছাড়িব? আর তোমাদিগকে বিপদে ফেলিয়া নিজেই-বা কি করিয়া যাইব? তাহার চেয়ে চল' আমরা সকলেই একসঙ্গে মরি।"

তাহা শুনিয়া ব্রাহ্মণী বলিলেন, "ওগো, তুমি এমন কথা বলিও না। তোমরা থাক, আমি যাই! তুমি গেলে আমরা কেহই বাঁচিব না। কিন্তু আমি গেলে তুমি মেয়েটিকে আর ছেলেটিকে মানুষ করিতে পারিবে।"

বাপ মায়ের কথা শুনিয়া মেয়েটি বলিল, "মা, বাবা, তোমরা কেন কাঁদিতেছ? আমি যাহা বলিতেছি, তাহা কর। দেখ বাবা, আমাকে আর তোমরা কয়দিন রাখিতে পারিবে? বিবাহ হইলে তো আমি তোমাদিগকে ছাড়িয়া যাইব। তাহাই যদি হইল, তবে এখনই কেন আমি যাই না? তোমরা কেহ গেলে কি ভাইটি বাঁচিবে? ভাবিয়া দেখ, আমি গেলে সকল দিকই রক্ষা হয়।"

তখন ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণী মেয়েটিকে জড়াইয়া ধরিয়া আরো ভয়ানক কাঁদিতে লাগিলেন।

ছোট ছেলেটি ইহার মধ্যে কোথায় একগাছি খড় কুড়াইয়া পাইয়াছে, সেই

খড় দেখাইয়া সে সকলকে বলিল, "থি! তাঁদে না! এই দান্দা দে আমি নাখচ্ মাল্‌বো!" শিশুর কথায় সেই দুঃখের ভিতরেও সকলের হাসি পাইল।

কুন্তী এতক্ষণ দাঁড়াইয়াছিলেন। উঁহাদিগকে একটু হাসিতে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা কিজন্য কাঁদিতেছেন? আপনাদের কিসের দুঃখ বলুন ; আমাদের সাধ্য থাকিলে তাহা দূর করিব।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "মা, আমাদের দুঃখ কি মানুষে দূর করিতে পারে? এই নগরের কাছেই বক বলিয়া একটা রাক্ষস থাকে। সে আমাদিগকে বাঘ ভাল্লুক আর শত্রুর হাত হইতে রক্ষা করে, কিন্তু তাহার বদলে আমাদিগকে তাহার খাবার জোগাইতে হয়। রোজ একটি মানুষ, বিশ খারি ভাত আর দুটা মহিষ তাহার নিকট যাওয়া চাই। সে সেই ভাত মহিষ আর মানুষ সব খাইয়া শেষ করে। আমাদিগকে পালা করিয়া এক-একদিন এক-এক বাড়ি হইতে এ-সকল জিনিস পাঠাইতে হয়। যে না পাঠায়, দুষ্ট তাহার ছেলেপিলেসুদ্ধ সব মারিয়া খায়। এদেশের রাজা আমাদের কোনো খবর নেন না, তাই রাক্ষসের হাতে আমাদের এই দুর্দশা। আজ আমার পালা। আমার টাকা নাই যে একজন মানুষ কিনিয়া পাঠাইব। আপনার লোক কাহাকেই-বা কেমন করিয়া পাঠাই! তাই মনে করিয়াছি, আমরা সকলে মিলিয়া তাহার কাছে গিয়া একেবারে সকল দুঃখ দূর করিব।"

কুন্তী বলিলেন, "ঠাকুর! আপনার কোনো চিন্তা নাই। আমার পাঁচ ছেলের একটি আজ রাক্ষসের নিকট যাইবে।"

ব্রাহ্মণ কহিলেন, "তাহা কি হয় মা? আপনারা একে ব্রাহ্মণ[১], তাহাতে অতিথি। আপনাদিগকে কিছুতেই আমি রাক্ষসের কাছে যাইতে দিব না।"

কুন্তী বলিলেন, "আপনার ভয় কি? রাক্ষস আমার ছেলের কিছুই করিতে পারিবে না। সে আরো বড়-বড় রাক্ষস মারিয়াছে। কিন্তু ঠাকুর এ কথা কাহাকেও বলিবেন না। তাহা হইলে লোকে খামখা আসিয়া আমার ছেলে-দিগকে কুস্তি শিখাইবার জন্য বিরক্ত করিবে।"

ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন। কুন্তীর প্রতি তাহাদের কিরকম ভক্তি হইল বুঝিতেই পার। এদিকে কুন্তী আসিয়া ভীমকে সকল কথা বলাতে ভীম উৎসাহের সহিত রাক্ষসের নিকট যাইতে প্রস্তুত হইলেন।

যুধিষ্ঠির ভিক্ষা হইতে ফিরিয়া আসিয়া প্রথমে এই সংবাদে বড় ভয় পাইলেন। তিনি বলিলেন, "মা! তুমি কি পাগল হইয়াছ যে, ভীমকে এমন কাজে পাঠাইতে রাজি হইলে? ভীমের যদি কিছু হয়, তবে আমাদের কি দশা হইবে?"

কুন্তী বলিলেন, "ভীমের গায় দশহাজার হাতির জোর। সে যে-সকল কাজ করিয়াছে তাহা দেখ নাই? এ-সব কথা জানিয়া শুনিয়াও ব্রাহ্মণের

[১] পান্ডবদিগের কিনা তপস্বীর বেশ ছিল, তাই ব্রাহ্মণ ইঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ মনে করিয়াছিলেন। আসলে ইঁহারা যে ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ নহেন, তাহা তো জানই।

উপকার না করা ভালো বোধ হয় না।"

তখন যুধিষ্ঠির বলিলেন, "মা তুমি ঠিক বলিয়াছ, ভীমের যাওয়াই উচিত।"

পরদিন ভোরে ভীম রাক্ষসের খাবার লইয়া বনে গিয়াছেন। সেখানে গিয়া তিনি ডাকিতে লাগিলেন, "কোথায় হে! বক কাহার নাম?" "ও বক! খাবে নাকি



এসো গো!" ডাকিতেছেন, আর এদিকে নিজেই ভাত খাইয়া শেষ করিতেছেন। ডাক শুনিয়া রাক্ষস দাঁত কড়মড় করিতে করিতে হাজির! কি বিকট চেহারা! এক কান হইতে আর-এক কান পর্যন্ত তাহার খালি দাঁত!

একেই তো রাগিয়া আসিয়াছে, তাহার উপর আবার আসিয়া দেখে ভীম তাহার ভাত প্রায় শেষ করিয়াছেন। কাজেই বুঝিতেই পার। সে গর্জন করিয়া বলিল, "মোর ভাতটি খাইছিস্? তোকে যোম ঘর পেঠ্‌ঠাইব নি?"

কিন্তু তাহার কথা কে শোনে? ভীম খালি হাসেন আর খান। রাক্ষস হাত তুলিয়া ভয়ানক শব্দে ভীমকে মারিতে চলিল। ভীম তখনো হাসেন আর খান। রাক্ষস দুই হাতে ধাঁই ধাঁই করিয়া প্রাণপণে তাঁহার পিঠে চাপড় মারিতে লাগিল। তিনি তবুও খালি হাসেন আর খান! তখন রাক্ষস এক প্রকাণ্ড গাছ তুলিয়া লইয়া ভীমকে মারিতে আসিল। ততক্ষণে ভীমেরও ভাত কয়টি শেষ হইয়াছে। তখন তিনি ধীরে-সুস্থে হাত মুখ ধুইয়া, হাসিতে হাসিতে রাক্ষসের হাত হইতে গাছটি কাড়িয়া লইলেন। তারপর দুজনের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। যুদ্ধ করিতে করিতে যখন আর গাছ রহিল না, তখন আরম্ভ হইল কুস্তি। দিন গেল, রাত্রিও যায়-যায়, তবু যুদ্ধ চলিয়াছে।

এইরূপে ক্রমে রাক্ষসকে কাবু করিয়া, শেষে ভীম তাহাকে মাটিতে আছড়াইয়া ফেলিলেন। তারপর তাহার পিঠে হাঁটু দিয়া, গলা আর কোমরের কাপড় ধরিয়া এমনি বিষম টান দিলেন যে, সেই টানেই তাহার মেরুদণ্ড একেবারে দুইখান! তখনই চিৎকার আর রক্তবমি করিতে করিতে রাক্ষস মরিয়া গেল।

বকের চিৎকারে তাহার লোকজন সব ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে ছুটিয়া আসিয়াছিল। ভীম তাহাদিগকে বলিলেন, "খবরদার! আর মানুষ খাইতে পাইবি না। তাহা হইলে তোদেরও এমনি দশা করিব!"

তাহারা বলিল, "ওরে ব্বাপ্পো! মোরা আর কখ্‌খনু মান্নুস্ খাবো নি!"

তখন হইতে উহারা ভদ্রলোক হইয়া গেল, আর মানুষ খায় না।

এদিকে ভীম রাক্ষস মারিয়া চুপিচুপি চলিয়া আসিয়াছেন। সকালবেলা সকলে উঠিয়া দেখিল, রাক্ষস মরিয়া পাহাড়ের মতো পড়িয়া আছে। সংবাদ পাইয়া একচক্রার ছেলে বুড়ো পুরুষ মেয়ে সকলে ছুটিয়া তাহা দেখিতে আসিল। কিন্তু এমন ভয়ানক কাজ কাহার? সকলে বলিল, "দেখ কাল কাহার পালা গিয়াছে।"

পালা সেই ব্রাহ্মণের, আর কাহার হইবে? সকলে মিলিয়া ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিল, "বলুন তো ঠাকুর, কিরকম হইয়াছিল।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "ঠিক কিরকমটি হইয়াছিল, তাহা তো জানি না। আমরা কান্নাকাটি করিতেছিলাম, এমন সময় এক মহাপুরুষ আসিয়া দয়া করিয়া আমাদিগকে বলিলেন, 'তোমাদের কোনো ভয় নাই, আমিই রাক্ষসের কাছে যাইব।' বোধহয় সেই মহাপুরুষ রাক্ষস মারিয়া থাকিবেন।"

এ কথায় সকলে অতিশয় আহ্লাদের সহিত নিজ নিজ ঘরে গিয়া দেবতার পুজো দিতে লাগিল।

ইহার কয়েকদিন পরে এক ব্রাহ্মণ পাণ্ডবদিগের ঘরে আসিয়া রাত্রিতে থাকিবার জন্য একটু জায়গা চাহিলেন। ব্রাহ্মণটি অনেক দেশ দেখিয়া

আসিয়াছেন। পাণ্ডবদিগের যত্নে তুষ্ট হইয়া তিনি সেই-সকল দেশের অনেক আশ্চর্য কথা তাঁহাদিগকে শুনাইতে লাগিলেন। সেই ব্রাহ্মণের নিকট তাঁহারা জানিতে পারিলেন যে, শীঘ্রই পাঞ্চাল দেশের রাজা দ্রুপদের মেয়ে কৃষ্ণার স্বয়ম্বর হইবে।

কৃষ্ণার কথা অতি সুন্দর। দ্রুপদ রাজার কথা তো আগেই শুনিয়াছ; দ্রোণের নিকট তিনি কেমন সাজা পাইয়াছিলেন তাহাও জান। সে সময়ে মুখে তিনি দ্রোণের সহিত বন্ধুতা করেন, কিন্তু মনে মনে সেই অবধি দ্রোণকে মারিবার উপায় খুঁজিতে থাকেন।

দ্রোণকে মারা যে সহজ কথা নহে, আর যুদ্ধ করিয়াও তাঁহাকে মারা যে একেবারেই অসম্ভব, এ কথা দ্রুপদের বুঝিতে বিলম্ব হইল না। তাই তিনি স্থির করিলেন যে, কোনো মুনিকে ধরিয়া ইহার উপায় করিতে হইবে।

কল্মাষী নদীর ধারে অনেক মুনি তপস্যা করেন। সেইখানে খুঁজিতে খুঁজিতে দ্রুপদ যাজ আর উপযাজ নামক দুই ভাইকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা বড়ই ধার্মিক আর উঁহাদের ক্ষমতাও অসাধারণ। দেখিয়া দ্রুপদ মনে করিলেন যে, 'ইঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে আমার কাজ হইবে।'

দ্রুপদ অনেক কষ্টে যাজ ও উপযাজকে পাঞ্চাল দেশে আনিয়া পুত্রেষ্টি যজ্ঞ আরম্ভ করেন। মুনি বলিলেন, "এই যজ্ঞে তোমার পুত্রও হইবে এবং কন্যাও হইবে।"

এই বলিয়া অগ্নিতে ঘৃত ঢালিবামাত্রই তাহার ভিতর হইতে, আশ্চর্য মুকুট আর বর্ম পরা পরম সুন্দর এক কুমার ঝক্‌ঝকে রথে চড়িয়া গর্জন করিতে করিতে বাহির হইয়া আসিল; তাহার হাতে ধনুর্বাণ আর ঢাল তলোয়ার। তখন আকাশ হইতে দেবতারা বলিলেন, "এই রাজপুত্র দ্রোণকে মারিবে।"

এদিকে আবার যজ্ঞের বেদী হইতে এক কন্যা উঠিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার শরীরের রঙ কালো, কিন্তু এমন অপরূপ সুন্দর কন্যা কেহ কখনো দেখে নাই। কালো কোঁকড়ানো চুল; পদ্মফুলের পাপড়ির মতো সুন্দর উজ্জ্বল দুটি চক্ষু, ভ্রূ দুটি যেন তুলি দিয়া আঁকা। শরীরের সদ্যফোটা পদ্মের গন্ধে, এক ক্রোশ পর্যন্ত ছাইয়া গিয়াছে। দেবতা ছাড়া মানুষ কখনো এমন সুন্দর হয় না। কন্যা জন্মিবামাত্র আকাশ হইতে দেবতারা বলিলেন, "এই কন্যা কৌরব-দিগের ভয়ের কারণ হইবে।"

ছেলেটির নাম ধৃষ্টদ্যুম্ন আর মেয়েটির নাম কৃষ্ণা, রাখা হইল। কৃষ্ণাকে লোকে দ্রৌপদী অর্থাৎ দ্রুপদের কন্যা বলিয়াই বেশি ডাকিত। এই দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরের কথা শুনিয়া, পাণ্ডবদিগের তাহা দেখিতে যাইবার ইচ্ছা হইল। তাহা দেখিয়া কুন্তী বলিলেন, "চল বাছা আমরা সেইখানে যাই। এখানে আমরা অনেকদিন রহিয়াছি। বেশিদিন এক জায়গায় থাকা ভালো নহে।" সুতরাং স্থির হইল, তাঁহারা দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর দেখিতে পাঞ্চাল দেশে যাইবেন।

এই সময়ে ব্যাসদেবও আগেকার কথামত পাণ্ডবদিগকে দেখিবার জন্য

একচক্রায় আসিলেন। ব্যাসেরও ইচ্ছা, পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে যান। কাজেই তাঁহারা সেই ব্রাহ্মণের নিকট বিদায় লইয়া মায়ের সঙ্গে পাঞ্চাল যাত্রা করিলেন।

গঙ্গার ধারে সোমাশ্রয়ায়ণ নামে এক তীর্থ আছে, সেখানে আসিয়া পাণ্ডবদিগের রাত্রি হইল। তখন পথ দেখাইবার জন্য অর্জুন মশাল হাতে আগে আগে চলিলেন।

সেখানে এক গন্ধর্ব সপরিবারে স্নান করিতেছিল। সে পাণ্ডবদিগকে ধমকাইয়া বলিল, "এইয়ো! এদিকে আইস! জান আমি কে? আমি কুবেরের বন্ধু অঙ্গারপর্ণ। আমার ক্ষমতা এখনি দেখিতে পাইবে। মানুষ হইয়া এখানে আসিয়াছ, তোমাদের সাহস কেমন?"

অর্জুন বলিলেন, "এই, তোমার বুদ্ধি যেমন! এটা গঙ্গার ধার, তোমার কেনা জায়গা তো নয়; এখান দিয়া সকলেই যাইতে পারে। জোর বুঝি খালি তোমারই আছে, আমাদের নাই!"

ইহাতে তো গন্ধর্ব ভারি চটিয়া একেবারে ধনুক বাগাইয়া তীর ছুঁড়িতে আরম্ভ করিল। অর্জুন তাড়াতাড়ি হাতের ঢাল আর মশাল ঘুরাইয়া তীর ফিরাইয়া দিলেন। তারপর ধনুকে আগ্নেয়াস্ত্র জুড়িয়া মারিতেই গন্ধর্ব মহাশয়ের রথ পুড়িয়া ছাই, আর তিনি নিজে মুখ থুবড়িয়া মাটিতে পড়িয়া একেবারে চক্ষু বুজিয়া অজ্ঞান! তখন অর্জুন তাঁহার চুলের মুঠি ধরিয়া তাঁহাকে যুধিষ্ঠিরের নিকট উপস্থিত করিলেন।

এদিকে গন্ধর্বের স্ত্রী কুম্ভীনসীও যুধিষ্ঠিরের নিকট আসিয়া কাঁদিয়া পড়িয়াছেন। কাজেই যুধিষ্ঠির অর্জুনকে বলিলেন, "ভাই, উহাকে ছাড়িয়া দাও।"

তখন অর্জুন গন্ধর্বকে বলিলেন, "কুরুরাজ যুধিষ্ঠির তোমাকে ক্ষমা করিয়াছেন। কাজেই তোমার আর কোনো ভয় নাই, নিশ্চিন্তে ঘরে চলিয়া যাও।"

তাহা শুনিয়া গন্ধর্ব বলিল, "আমি হার মানিলাম। ইহাতে আমার কোনো দুঃখ নাই বরং সুখের কথা। শত্রুকে কাবু করিয়া এমনভাবে দয়া কি যে-সে লোকে করিতে পারে?"

এই বলিয়া গন্ধর্ব অর্জুনকে চাক্ষুষী-বিদ্যা নামক এক আশ্চর্য বিদ্যা শিখাইয়া দিল। ত্রিভুবনের মধ্যে যে বস্তুই দেখিতে ইচ্ছা হইবে, এই বিদ্যা জানা থাকিলে তাহা তৎক্ষণাৎ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া পাণ্ডবদিগকে সে একশতটি এমন আশ্চর্য ঘোড়া দিল যে, তাহারা কখনো কাহিল বা বুড়া হয় না, তাহাদের কোনো অসুখ বা মৃত্যু নাই, তাহাদের সমান ছুটিতেও কিছুতেই পারে না।

অর্জুন এই-সকলের বদলে গন্ধর্বকে ব্রহ্মাস্ত্র দিলেন; আর স্থির হইল যে, ঘোড়াগুলি এখন গন্ধর্বের নিকটেই থাকিবে, পাণ্ডবদিগের দরকার হইলে তাঁহাদের নিকট আসিবে।

এইরূপে গন্ধর্ব আর অর্জুনে বন্ধুতা হইয়া গেল। গন্ধর্বের নাম অঙ্গারপর্ণ আর চিত্ররথ দুইই ছিল। চিত্ররথ বলিল, "এখন হইতে আমার চিত্ররথ নাম ঘুচিয়া দগ্ধরথ নাম হউক।"

চিত্ররথ অতিশয় পণ্ডিত লোক; পাণ্ডবেরা তাহার নিকট অনেক নূতন কথা শিখিলেন। পাণ্ডবদের একটি পুরোহিতের প্রয়োজন ছিল। তাই তাঁহারা চিত্ররথকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল দেখি কাহাকে পুরোহিত করি?"

চিত্ররথ বলিলেন, "ধৌম্যকে পুরোহিত কর, এমন লোক আর পাইবে না। উৎকোচক নামক তীর্থে গেলে তাঁহার দেখা পাইবে।"

সুতরাং পাণ্ডবেরা উৎকোচক তীর্থে ধৌম্যের সন্ধানে চলিলেন। তাঁহাকে পুরোহিত করিয়া তাঁহাদের যে কত উপকার হইয়াছিল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এখন হইতে তাহাদের দলে ধৌম্য সমেত সাতজন লোক হইল। সাতজনে মিলিয়া তাঁহারা দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর দেখিতে চলিলেন।

পথে কয়েকটি ব্রাহ্মণের সঙ্গে দেখা। তাঁহারাও স্বয়ম্বরেরই যাত্রী। তাঁহারা পাণ্ডবদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা কোথা হইতে আসিতেছেন?"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "আজ্ঞে, আমরা একচক্রা হইতে আসিতেছি।"

ব্রাহ্মণেরা বলিলেন, "আমাদের সঙ্গে চলুন! আজ পাঞ্চাল দেশে বড় ধুমধাম হইবে, আমরা তাহা দেখিতে চলিয়াছি। সেখানকার রাজা যজ্ঞসেনের[১] মেয়ের স্বয়ম্বর। সেই মেয়ের গায়ের গন্ধ পদ্মের মতন। এক ক্রোশ দূর হইতে তাহা টের পাওয়া যায়। কত রাজা, কত পণ্ডিত, কত মুনি সেখানে আসিবেন, তাহার সীমা নাই। গান বাজনা বাজি কুস্তির কথা আর কি বলিব! পেট ভরিয়া ফলার পাইব, চোখ ভরিয়া তামাশা দেখিব, তারপর পুঁটলি ভরিয়া দান-দক্ষিণা লইয়া ঘরে ফিরিব। চলুন আমরা একসঙ্গেই যাই। আপনাদিগকে যেমন সুন্দর দেখিতেছি, চাই কি সেই মেয়ে আপনাদের কাহাকেও মালা দিয়া বসিতে পারে!"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "যে আজ্ঞা! আমরা আপনাদের সঙ্গে চলিলাম।"

পাঞ্চালদেশে উপস্থিত হইয়া পাণ্ডবেরা এক কুমারের বাড়িতে বাসা লইলেন। সেইখানে তাঁহারা থাকেন, আর ভিক্ষা করিয়া খান।

দ্রুপদের ইচ্ছা অর্জুনের সহিত দ্রৌপদীর বিবাহ হয়। সুতরাং যাহাতে অর্জুন ছাড়া আর কেহ দ্রৌপদীকে বিবাহ করিতে না পারে তিনি তাহার এক আশ্চর্য উপায় স্থির করিলেন।

একটা ভয়ংকর ধনুক, তাহাকে কেহই বাঁকাইতে পারে না : সেই ধনুক বাঁকাইয়া তাহাতে গুণ পরাইতে হইবে। তারপর সেই ধনুকে তীর চড়াইয়া খুব উঁচুতে ঝুলানো একটা জিনিসকে বিঁধিতে হইবে। পথের মাঝখানে আবার একটা কলের মতন আছে, সেটার ভিতর দিয়া তীর গেলে তবে সেই

[১] দ্রুপদের আসল নাম যজ্ঞসেন।

জিনিসটাতে পেঁছাইতে পারে।

এতখানি কাজ করিয়া যে লক্ষ্য (অর্থাৎ যে জিনিসটাকে বিঁধিবার কথা, তাহা) বিঁধিতে পারিবে, সে দ্রৌপদীকে পাইবে। দ্রুপদ বুঝিয়াছিলেন যে, অর্জুন ছাড়া আর কাহারো সে ক্ষমতা নাই, কিন্তু তিনি এ কথা কাহাকেও বলিলেন না।

স্বয়ম্বরের সংবাদ পাইয়া পৃথিবীতে যত রাজা আর রাজপুত্র আর যোদ্ধা আর বড়লোক সকলেই আসিয়া পাঞ্চাল দেশে উপস্থিত হইয়াছেন। কর্ণ, দুর্যোধন, ভীষ্ম, দ্রোণ কেহই আসিতে বাকি নাই। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আর মুনি-ঋষিতে পাঞ্চাল দেশ ছাইয়া গিয়াছে। দেবতারা পর্যন্ত না আসিয়া থাকিতে পারেন নাই।

স্বয়ম্বরের স্থানটি যে কি সুন্দর করিয়া করিয়াছে আর সাজাইয়াছে, তাহা না দেখিলে বলা কঠিন। বড়-বড় জমকালো ফটক, কাজকরা উঁচু পাঁচিল, রংবিরঙের ঝালর, নিশান, পর্দা আর চাঁদোয়া, এই-সকলের একটা খুব ঘটা মনে করিয়া লও। আর মনে কর, ইহার চারিধারে খাল, তাহাতে জল টলটল করিতেছে, পদ্মফুল ফুটিয়াছে, হাঁস চরিতেছে আর লাল মাছ খেলিতেছে। রাজারাজড়ার জন্য উঁচু উঁচু জায়গা হইয়াছে, তাহাতে বসিয়া তাঁহারা ভালো মতে দেখিতে পাইবেন। সাধারণ লোকেরও ভালোমতেই দেখিবার ইচ্ছা, কিন্তু তাহাদের জন্য আর কে উঁচু জায়গা রাখিবে? কাজেই তাহারা গাছে উঠিয়া রাজাদের চেয়েও ভালো দেখিবার জোগাড় করিল। যাহারা দেখিবার বেশি সুবিধা পাইল না, তাহারা খালি গোলমাল করিয়াই সাধ মিটাইতে লাগিল। উহাদের গলার শব্দই বেশি হইয়াছিল, না বাজনার শব্দই বেশি হইয়াছিল, তাহা ঠিক করিয়া বলা শক্ত।

পনেরোদিন খালি গান-বাজনাই চলিল। ষোল দিনের দিন দ্রৌপদী স্নানের পর আশ্চর্য পোশাক এবং অলংকার পরিয়া সোনার মালা হাতে সভায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। অমনি গোলমাল থামাইয়া, বাজনা থামাইয়া সারা সভাটি চুপচাপ।

তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রৌপদীকে সভার মাঝখানে আনিয়া গম্ভীরস্বরে বলিতে লাগিলেন, "আপনারা সকলে শুনুন। এই ধনুর্বাণ আর ঐ লক্ষ্য আপনারা দেখিতেছেন। ঐ যে একটা কলের মতন, তাহাতে ছিদ্র আছে, তাহাও দেখুন। ঐ ছিদ্রের ভিতর দিয়া পাঁচটি তীর মারিয়া লক্ষ্য বিঁধিয়া মাটিতে ফেলিতে হইবে। এ কাজ যিনি করিতে পারিবেন, তিনিই দ্রৌপদীকে পাইবেন।"

সভার সকলেই ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। এত রাজারাজড়ার মধ্যে না জানি কে আজ দ্রৌপদীকে লইয়া যায়। সেই সভায় কৃষ্ণ আর বলরামও উপস্থিত ছিলেন। কৃষ্ণ চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন যে, পাণ্ডবেরা পাঁচ ভাই ছদ্মবেশে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বসিয়া আছেন। ইহাতে যারপরনাই আনন্দিত হইয়া তিনি চুপিচুপি বলরামকে এ কথা জানাইলেন। কিন্তু তাঁহারা দুভাই ভিন্ন আর

কেহই পাণ্ডবদিগকে চিনিতে পারিল না। তাহারা তামাশা দেখিতেই ব্যস্ত ছিল।

এদিকে বাজনা বাজিতেছে, আর রাজাদিগের মধ্য হইতে এক-একজন করিয়া লক্ষ্য বিঁধিয়া বিদ্যার পরীক্ষা দিতে যাইতেছেন। হায় হায়! সে সর্বনেশে ধনুক কাহারো হাতে বাগ মানিতে চাহে না! বরং তাহাঁর ধাক্কায় রাজামহাশয়েরাই ঠিকরাইয়া পড়েন। বড়-বড় রাজা পর্যন্ত কেহ চিৎপাৎ হইয়া, কেহ ডিগবাজি খাইয়া, কাহারো পাগড়ি উড়িয়া গিয়া, নাকালের একশেষ। তাঁহাদের মুখে আর কথাটি নাই।

এমন সময় কর্ণ আসিয়া দেখিতে দেখিতে সেই ধনুকে গুণ আর তীর চড়াইয়া লক্ষ্য বিঁধিতে প্রস্তুত হইলেন। তাহা দেখিয়া পাণ্ডবেরা মনে করিলেন, 'এই বুঝি লক্ষ্য বিঁধিয়া দ্রৌপদীকে লইয়া যায়।'

কিন্তু কর্ণকে দেখিয়া দ্রৌপদী বলিলেন, "আমি সারথির ছেলের গলায় মালা দিতে পারিব না।" কাজেই কর্ণকে লক্ষ্য না বিঁধিয়াই ফিরিয়া যাইতে হইল।

সেদিন রাজামহাশয়দের যে দুর্দশা! শিশুপালের তো হাঁটুই ভাঙিয়া গেল! জরাসন্ধ গুঁতা খাইয়া চিৎপাৎ! তারপর তাড়াতাড়ি উঠিয়া ধুলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে সেই যে তিনি সেখান হইতে চলিলেন, আর একেবারে নিজের ঘরে না পৌঁছিয়া থামিলেন না। শল্যেরও প্রায় সেই দশা!

অর্জুন এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন, রাজামহাশয়দের দুরবস্থা দেখিয়া এইবার তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন। অর্জুনকে লক্ষ্য বিঁধিতে যাইতে দেখিয়া ব্রাহ্মণদিগের আনন্দের আর সীমা-পরিসীমা রহিল না। তাঁহারা তাঁহাদের বসিবার হরিণের ছাল ঘুরাইয়া চিৎকার আরম্ভ করিলেন। কেহ কেহ যে আবার বিরক্তও না হইলেন এমন নহে। তাঁহারা বলিলেন, "আরে কর কি ঠাকুর? থামো, থামো! এ ব্যক্তি দেখিতেছি আমাদের সকলকে অপদস্থ করাইবে। বড়-বড় রাজারা যাহা পারিল না, সেটা ইহার না করিলেই নয়। বেঁচারার মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে আর কি!"

তাহা শুনিয়া আর অনেকে বলিলেন, "তোমরা ব্যস্ত হইয়াছ কেন? ইঁহাকে যাইতে দাও। ব্রাহ্মণে না করিতে পারে এমন কাজ আছে? ইনি কোনো মহাপুরুষ হইবেন। দেখিতেছ না, ইঁহার কেমন চেহারা? ওঃ! গায় কি তেজ! কাঁধ কি চওড়া! হাত কি লম্বা! এমন সুন্দর আর-একটা মানুষ এখানে খুঁজিয়া বাহির কর দেখি। ইনি নিশ্চয় পারিবেন। তোমরা চুপ করিয়া দেখ। ঐ তিনি ধনুকে গুণ চড়াইতেছেন।"

অর্জুন ধনুকের কাছে একটু থামিয়া ব্রাহ্মণদিগের কথাবার্তা শুনিতে-ছিলেন। তারপর তিনি দেবতাকে স্মরণ করিয়া ধনুকখানি হাতে লইলেন। সে ধনুকে গুণ চড়ানো কি আর অর্জুনের কাছে একটা কঠিন কাজ? তিনি চক্ষের পলকে গুণ চড়াইয়া, পাঁচটি তীর হাতে লইলেন। তারপর দেখিতে দেখিতে লক্ষ্য বিঁধিয়া মাটিতে পড়িল। সকলে দেখিয়া অবাক!

তখন আকাশ হইতে দেবতারা জয়-জয় শব্দে অর্জুনের মাথায় পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন আর ব্রাহ্মণদিগের কথা কি বলিব! হরিণের ছাল, কুশাসন, চাদর, কোঁচা কিছুই তাঁহারা ঘুরাইতে বাকি রাখিলেন না। তারপর বাজনদারেরা যে তাহাদের সকলগুলি ঢাক, ঢোল, সানাই, কাড়া আর কাঁসি একসঙ্গে মিলাইয়া একটা কাণ্ড করিয়াছিল, তাহা যদি শুনিতে!

সেই আনন্দ কোলাহলের ভিতরে দ্রৌপদী হাসিতে হাসিতে অর্জুনকে মালা দিয়া তাঁহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

এদিকে কিন্তু রাজামহাশয়দের মুখ ভার আর চোখ লাল। তাঁহারা নিজে যে সকলেই সেদিন কি অদ্ভুত বিদ্যা দেখাইয়াছেন, সে কথা আর তাঁহাদের মনে নাই। তাঁহারা থাকিতে ব্রাহ্মণ কেন মেয়ে লইয়া গেল, তাই তাঁহাদের রাগ! "এমন কথা? আমাদিগকে ডাকিয়া আনিয়া অপমান করিল? অ্যাঁ! বলেন কি মহাশয়?"

"তাইতো! এমন কথা? অপমান করিল? অ্যাঁ!—মার্! মার্! দ্রুপদকে মার্ আর ঐ হতভাগা মেয়েটাকে পোড়াইয়া ফেল্?"

এই বলিয়া সকল রাজা একজোটে দ্রুপদকে আক্রমণ করিতে আসিল। দ্রুপদ আর উপায় না দেখিয়া ব্রাহ্মণদিগের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। অর্জুন ইহার পূর্বেই ধনুক-বাণ লইয়া প্রস্তুত। ততক্ষণে ভীমও একটা বড়গোছের গাছ উপড়াইয়া ডাল-পাতা ঝাড়িয়া বেশ মজবুত একটি লাঠি প্রস্তুত করিয়া লইয়াছেন।

এদিকে এ-সকল কাণ্ড দেখিয়া কৃষ্ণ বলরামকে বলিতেছেন, "দাদা, এ ধনুক অর্জুন ভিন্ন আর কেহই এমন করিয়া বাগাইতে পারে না। আর এমন করিয়া গাছ ভাঙিয়া লাঠি তয়ের করাও ভীম ছাড়া আর কাহারো কর্ম নহে। আর ঐ তিনজন নিশ্চয় যুধিষ্ঠির, নকুল আর সহদেব। শুনিয়াছিলাম, পিসীমা (অর্থাৎ কুন্তী; ইনি কৃষ্ণ বলরামের পিসীমা) আর পাণ্ডবেরা জতুগৃহ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। এখন দেখিতেছি তাহা সত্য।"

বলরাম বলিলেন, "পিসীমা বাঁচিয়া আছেন শুনিয়া বড়ই সুখী হইলাম।"

রাজারা যুদ্ধ করিতে আসিতেছে দেখিয়া ব্রাহ্মণদিগের বড়ই রাগ হইল। তাঁহারা হরিণের ছাল আর কমণ্ডলু ঘুরাইয়া ভীম অর্জুনকে বলিলেন, "তোমাদের কোনো ভয় নাই। আমরা তোমাদের হইয়া যুদ্ধ করিব।"

অর্জুন তাহাতে একটু হাসিয়া বলিলেন, "আপনারা দাঁড়াইয়া দেখুন, আমরাই ইহাদিগকে তাড়াইয়া দিতেছি।"

তারপর যুদ্ধ আরম্ভ হইল, কর্ণ অর্জুনকে আর শল্য ভীমকে মারিবার জন্য দাঁত কড়মড় করিতে করিতে ছুটিলেন, আর অন্য সকলে মিলিয়া ব্রাহ্মণদিগকে তাড়া করিলেন।

কর্ণও খুব রাগিয়া তীর মারেন, অর্জুনও তেমনি তেজের সহিত তাঁহাকে সাজা দেন। তাহা দেখিয়া কর্ণ বলিলেন, "আপনি কে ঠাকুর? আমার মনে হয় আপনি স্বয়ং ধনুর্বেদ বা পরশুরাম বা সূর্য বা বিষ্ণু মানুষ সাজিয়া

আসিয়াছেন। আমি রাগিয়া দাঁড়াইলে ইন্দ্র আর অর্জুন ছাড়া কেহ তো আমার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারে না।"

অর্জুন বলিলেন, "আমি ধনুর্বেদও নহি, পরশুরামও নহি। আমি সাদা-সিধা ব্রাহ্মণ, গুরুর কাছে অস্ত্র শিখিয়া তোমাকে সাজা দিতে আসিয়াছি।"

এ কথায় কর্ণ বলিলেন, "আপনার ব্রাহ্মণের তেজ, আপনার সঙ্গে আমি পারিব কেন? এই বলিয়া তিনি যুদ্ধ ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

এদিকে শল্য আর ভীমে মল্লযুদ্ধ চলিয়াছে। এক-একটা কিল পড়ে যেন পাহাড় ভাঙিয়া পড়ে। ক্রমাগত কেবল ধুপ্‌ধাপ্, ঢিপঢাপ্, ঠকাঠক্ চটাপট্ ছাড়া আর কথাই নাই। এমন সময়ে ভীম শল্যকে তুলিয়া এক আছাড় দিলেন, আর তাহা দেখিয়া ব্রাহ্মণেরা হো হো করিয়া হাসিতে লাগিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য, ভীম শল্যকে এমনি কাবু করিয়াও তাহাকে মারিলেন না।

এ-সকল কাণ্ড দেখিয়া রাজামহাশয়েরা ভয়ে জড়সড়। তাঁহারা আর যুদ্ধ করিবেন কি, এখন কোনো মতে ভীম আর অর্জুনের প্রশংসা করিয়া মানে মানে ফিরিতে পারিলে বাঁচেন। কাজেই তাঁহারা বলিলেন, "বাঃ! ইঁহারা খুব যুদ্ধ করিয়াছেন! যে-সে লোক তো কর্ণ আর শল্যকে আঁটিতে পারে না। ইঁহারা ব্রাহ্মণ; ব্রাহ্মণ হাজার দোষী হইলেও তাঁহাকে মাপ করিতে হয়। ইঁহাদের সহিত আমাদের যুদ্ধ করিয়া কাজ নাই, যদিও দরকার হইলে অবশ্য আমরা একটা কাণ্ড-কারখানা করিয়া ফেলিতে পারিতাম!"

তাহা শুনিয়া কৃষ্ণ বলিলেন; "রাজামহাশয়েরা ঠিক বলিয়াছেন। ইঁহারা উচিত মতেই রাজকন্যাকে পাইয়াছেন, ইঁহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আপনাদের কাজ নাই।"

কাজেই তখন রাজারা চলিয়া গেলেন।

এদিকে কুন্তী সেই কুমারের ঘরে বসিয়া ভাবিতেছেন, "পুত্রেরা কেন এখনো ভিক্ষা লইয়া ঘরে ফিরিল না? দুষ্ট ধৃতরাষ্ট্রের লোকেরা কি তাহা-দিগকে মারিয়া ফেলিল, না রাক্ষসেরা তাঁহাদের কোনো অনিষ্ট করিল?"

এমন সময় ভীম আর অর্জুন আসিয়া বাহির হইতে বলিলেন, "মা! আজ ভিক্ষায় গিয়া বড় সুন্দর জিনিস আনিয়াছি।"

কুন্তী ভিতরে ছিলেন, দেখিতে পান নাই। তিনি বেশি না ভাবিয়াই বলিলেন, "যাহা পাইয়াছ, তাহা তোমাদের সকলেরই হউক।"

বলিতে বলিতেই দেখেন, ওমা! কি সর্বনাশ! এতো সাধারণ জিনিস নহে, এযে রাজকন্যা!

এখন উপায়? কুন্তী যে 'সকলেরই হউক' বলিয়া বসিয়াছেন, এখন উপায় কি? এ কথা মিথ্যা হইয়া গেলে কুন্তীর পাপ হয়। সত্য হইতে হইলে পাঁচ ভাই মিলিয়া দ্রৌপদীকে বিবাহ করিতে হয়।

পাণ্ডবেরা বলিলেন, "তাহাই হউক! দ্রৌপদীকে আমরা সকলে মিলিয়া বিবাহ করিব; তবু মায়ের কথা মিথ্যা হইতে দিব না!"

তাঁহাদের এইরূপ কথাবার্তা ঠিক হইয়াছে, এমন সময় কৃষ্ণ আর বলরাম

সেইখানে আসিয়া উপস্থিত। কৃষ্ণকে দেখিয়া যুধিষ্ঠির বলিলেন, "কি আশ্চর্য! আমরা এখানে লুকাইয়া রহিয়াছি, তোমরা আমাদের কথা কি করিয়া জানিলে?"

কৃষ্ণ বলিলেন, আগুন কি কাপড়ে চাপা থাকিতে পারে? যে কাণ্ড-কারখানা আজ হইয়াছে, আপনারা নহিলে আর কে তাহা করিবে? কি ভাগ্য যে আপনারা সেই দুষ্টদের হাত হইতে বাঁচিয়া আসিয়াছেন!"

এইরূপ খানিক কথাবার্তা কহিয়া কৃষ্ণ আর বলরাম সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

এখানকার ঘটনা তো এইরূপ। ওদিকে দ্রুপদ আর তাঁহার লোকেরা না জানি কি করিতেছেন! তাঁহাদের মনে খুবই চিন্তা, তাহাতে আর ভুল কি? দ্রৌপদী কাহার হাতে পড়িলেন, যে দুজনে তাঁহাকে লইয়া গেল, তাহারা কে, কিরূপ লোক, কিছুই জানা নাই। এমন অবস্থায় আপনার লোকের মন কি স্থির থাকিতে পারে? কাজেই ধৃষ্টদ্যুম্ন কয়েকটি লোক লইয়া চুপিচুপি সেই দুজনের পিছু পিছু চলিলেন। চল আমরাও ইঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে যাই।

ঐ সেই দুজন দ্রৌপদীকে লইয়া চলিয়াছে। ব্রাহ্মণেরা অনেকেই উহাদের সঙ্গে যাইতেছেন। যে লক্ষ্য বিঁধিয়াছিল, দ্রৌপদী যেন খুব আহ্লাদের সহিত তাঁহার আসনখানি বহিয়া চলিয়াছেন। উহারা কোথায় যায়, দেখিতে হইবে।

তাইতো উহারা যে কুমারের বাড়ি ঢুকিল! আচ্ছা দেখা যাউক এরপর কি করে। সেখানে আরো কাহারা আছে। তিনজন পুরুষমানুষ। ঠিক ইহাদেরই মতো তাহাদেরও চেহারা, নিশ্চয় ইহাদের ভাই হইবে। আর ঐ বুড়া স্ত্রীলোকটি কে? তাহার শরীরে কেমন তেজ দেখিয়াছ? খুব বড়ঘরের মেয়ে, তাহাতে সন্দেহ নাই, বোধ হয় ইহাদের মা, নহিলে উহারা আসিয়া তাহাকে প্রণাম করিবে কেন?

দ্রৌপদীকে সেই স্ত্রীলোকটির কাছে রাখিয়া উহারা কোথায় বাহির হইয়া গেল? বোধ হয় ভিক্ষায়।

ঐ তাহারা ভিক্ষা লইয়া ফিরিয়াছে; আর দেখ, ছোট চারিজন তাহাদের ভিক্ষার জিনিস তাহাদের বড় ভাইটির সামনে আনিয়া রাখিতেছে উহারা নিশ্চয় খুব ধার্মিক লোক! দেখ না, সকলের আগে ভিক্ষার জিনিস দেবতাকে দিল। আর দেখ কেমন দাতা, উহার ভিতর হইতে আবার ব্রাহ্মণদিগকে ভিক্ষা দিতেছে!

আচ্ছা উহারা তো সাতজন লোক, কিন্তু ভিক্ষার জিনিস মোটে দুইভাগ করিল কেন? ওহ্! দেখিয়াছ? একভাগের তাবতই ঐ ষণ্ডাটি একলা নিল! তা উহার যেমন শরীর, আহারটি তো তেমনই চাই। কম খাইলে কি আর এত বড় গাছ লইয়া রাজামহাশয়দিগকে এমন সাজাটি দিতে পারিত? উহার ওটুকু চাই। বাকি অর্ধেকের ছয়ভাগ হইল, আর ছয়জনে খাইবে।

বাঃ! ভিখারির খাওয়া-দাওয়া তো বেশ সহজ! ঐ শেষ হইয়া ইহারই মধ্যে সব পরিষ্কার। ছোট দুটি ভাই কুশ বিছাইতেছে। বিছানাও বেশ পরিষ্কার, কুশের উপর হরিণের ছাল, বেশ তো! পাঁচ ভাই দক্ষিণশিয়রী হইয়া শুইল।

উহাদের মা উহাদের মাথার কাছে, আর ঐ দেখ দ্রৌপদী পায়ের কাছে শুইলেন। কিন্তু দেখিলে? পায়ের কাছে শুইয়াই কেমন সুখী!

শোন, শোন! উহারা কি কথাবার্তা বলে। যুদ্ধের কথা, অস্ত্র-শস্ত্রের কথা। কি সুন্দর কথাবার্তা! ইহারা নিশ্চয় ক্ষত্রিয় আর বড়লোক! চল যাই, রাজাকে বলি গিয়া।

এইরূপ দেখিয়া শুনিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন ও তাঁহার দলের লোক চলিয়া আসিলেন।

এদিকে দ্রুপদ যারপরনাই ব্যস্ত হইয়া আছেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন আসিতেই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি দেখিলে বাবা? আমাদের কৃষ্ণা কাহার হাতে পড়িল? সে লোকটি কি অর্জুন হইবে? আহা! কৃষ্ণা আমার কোনো ছোটলোকের হাতে পড়ে নাই তো?"

ধৃষ্টদ্যুম্ন বলিলেন, "বাবা! কোনো চিন্তা করিবেন না। কৃষ্ণা যে সে লোকের হাতে পড়ে নাই। উহারা নিশ্চয় ক্ষত্রিয় আর খুবই বড়লোক হইবেন, তাহাতে ভুল নাই। শুনিয়াছি পাণ্ডবেরা নাকি সেই আগুনে পোড়া হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। আমার মনে হয় ইঁহারাই পাণ্ডব!"

আহা! কি আনন্দের কথা! ইঁহারা কি তবে পাণ্ডব? যাহা হউক ইঁহাদিগকে উচিত আদর দেখাইতে হইবে।

তখনই রাজপুরোহিত ছুটিয়া সেই কুমারের বাড়িতে চলিলেন। সেখানে আসিয়া যখন যুধিষ্ঠিরের নিকট সকল কথাই জানিতে পারিলেন, তখন তাঁহার আনন্দ দেখে কে!

ইহারই মধ্যে রাজবাড়ি হইতে সোনার রথ লইয়া লোক উপস্থিত। সেই রথে চড়িয়া সকলে রাজবাড়ি আসিলেন। সেখানে কতরকম জিনিস দিয়া যে তাঁহাদিগকে আদর করিল, তাহার সীমা নাই। আর আহারের আয়োজনের কথা কি বলিব? তেমন মিঠাই সন্দেশ আমি কখনো দেখি নাই। পাণ্ডবেরা দামী পোশাক পরিয়া সোনার থালায় সেই-সকল মিষ্টান্ন আহার করিলেন। যে-সকল জিনিস তাঁহাদিগকে দেওয়া হইয়াছিল, তাহার মধ্যে অস্ত্র-শস্ত্র ছাড়া আর কিছু তাঁহারা লইলেন না। ইহাতে নিশ্চয় বুঝা গেল যে ইঁহারা ক্ষত্রিয়: তথাপি দ্রুপদ তাঁহাদিগকে বিনয় করিয়া বলিলেন, "আপনারা কে, আমরা তাহা জানি না। আপনারা নিজের পরিচয় দিয়া আমাদিগকে সুখী করুন।"

এ কথার উত্তরে যুধিষ্ঠির বলিলেন, "মহারাজ! আপনি কোনো চিন্তা করিবেন না। আমরা ক্ষত্রিয়, মহাত্মা পাণ্ডুর পুত্র। কুন্তীদেবী আমাদের মাতা। আমি সকলের বড়, আমার নাম যুধিষ্ঠির। ইঁহার নাম ভীম। ইঁনি অর্জুন, যিনি লক্ষ্য বিঁধিয়াছিলেন। মা আর দ্রৌপদীর সঙ্গে যে দুটি আছেন, তাঁহাদের নাম নকুল আর সহদেব।"

যুধিষ্ঠিরের কথা শুনিয়া দ্রুপদ আহ্লাদে কিছুকাল কথা কহিতে পারিলেন না। তারপর কথাবার্তায় সকল ঘটনা জানিতে পারিয়া ধৃতরাষ্ট্রের নিন্দা করিতে করিতে বলিলেন, "তোমাদের রাজ্য নিশ্চয় তোমাদিগকে লইয়া দিব!"

তারপর বিবাহের কথা। পাঁচ ভাই মিলিয়া দ্রৌপদীকে বিবাহ করিবেন শুনিয়া তো সকলে অবাক। এমন কথা তো কেহ কখনো শুনে নাই। এও কি হয়?

সকলে এইরূপ কথাবার্তা কহিতেছেন, এমন সময় ব্যাসদেব সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্যাসদেব সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, "তোমরা কেন ব্যস্ত হইয়াছ? এ কাজে কোনো মুস্কিলই নাই। দ্রৌপদীর সহিত যে ইঁহাদের বিবাহ হইবে, ইহা তো শিব অনেকদিন আগেই বলিয়া রাখিয়াছেন। আর-এক জন্মে দ্রৌপদী এক মুনির কন্যা ছিলেন। যাহাতে খুব গুণবান লোকের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়, এইজন্য সেই কন্যা শিবের তপস্যা করেন। শেষে যখন শিব বর দিতে আসিলেন, তখন কন্যা ব্যস্ত হইয়া ক্রমাগত পাঁচবার বলিলেন, 'সকল গুণ যাঁহার আছে, এমন লোকের সহিত আমার বিবাহ হউক।' শিব বলিলেন, 'তুমি পাঁচবার এ কথা বলিলে, কাজেই পাঁচজনের সহিত তোমার বিবাহ হইবে।' সেই কন্যা এখন দ্রৌপদী হইয়াছেন। আর শিবের আজ্ঞা, কাজেই পাঁচজনের সহিত তাঁহার বিবাহ হইতেই হইবে।"

তারপর বিবাহের আয়োজন আরম্ভ হইল। কত লোক, কত বাদ্য, কত গান, কত সাজ, কত আলো, কত পূজা, কত আনন্দ! হাতি ঘোড়া, রত্ন অলংকার, দাস দাসী প্রভৃতি যৌতুকই (অর্থাৎ দ্রুপদ পাণ্ডবদিগকে যাহা দিলেন)-বা কত! যাহারা দেখিতে আসিয়াছিল, এত আয়োজন আর এমন সুন্দর বর-কন্যা দেখিয়া তাহাদের চক্ষু জুড়াইয়া গেল; আর দামী পোশাক আর অলংকার উপহার পাইয়া তাহাদের মন খুশি হইয়া গেল।

দুর্যোধন আর তাঁহার দলের লোকেরা দেখিলেন যে, পাণ্ডবদিগকে তাঁহারা পোড়াইয়া মারিয়াছেন বলিয়া মনে মনে এত সুখ বোধ করিয়াছিলেন, সেই পাণ্ডবদিগের সহিতই দ্রৌপদীর বিবাহ হইয়াছে। যিনি লক্ষ্য বিঁধিয়াছিলেন তিনি অর্জুন, আর যিনি শল্যকে আছড়াইয়াছিলেন, তিনি ভীম ছাড়া আর কেহ নহেন!

তখন তাঁহাদের যে দুঃখ! তাঁহারা এত চেষ্টা করিলেন, তবুও পাণ্ডবেরা মরিলেন না, কি অন্যায়! সেই পুরোচনটা নিতান্তই গাধা ছিল, তাহারই বুদ্ধির দোষে পাণ্ডবেরা বাঁচিয়া গিয়াছেন!

ক্রমে এই সংবাদ বিদুরের নিকট পৌঁছিল। তাহা শুনিবামাত্রই তিনি ধৃতরাষ্ট্রের নিকট গিয়া বলিলেন, "মহারাজ! স্বয়ম্বর সভায় কৌরবেরাই জিতিয়াছে।"

অবশ্য পাণ্ডবেরাও তো কৌরব, কাজেই বিদুর ঠিকই বলিয়াছেন। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র তাহা বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন, "কি সৌভাগ্য! কি সৌভাগ্য! বিদুর কি সুখের সংবাদই শুনাইলে! শীঘ্র দুর্যোধন আর দ্রৌপদীকে এখানে নিয়া আসুক।"

বিদুর বলিলেন, "মহারাজ, পাণ্ডবরা দ্রৌপদীকে পাইয়াছেন। তাঁহারা সকলেই ভালো আছেন; আর সেখানে তাঁহাদের অনেক বন্ধু জুটিয়াছে।"

এই সংবাদে ধৃতরাষ্ট্রের মনে খুবই দুঃখ হইল। কিন্তু তিনি সামলাইয়া গিয়া বলিলেন, "তা ভালোই হইয়াছে। আমি আমার নিজের ছেলেদের চেয়েও পাণ্ডবদিগকে ভালোবাসি। আমার ছেলেগুলি বড় দুষ্ট; উহারা পাণ্ডবদের হাতে খুবই সাজা পাইবে।"

বিদুর বলিলেন, "মহারাজ, সকল সময়ই যেন আপনার এইরূপ বুদ্ধি থাকে।"

এই কথাবার্তার কথা জানিতে পারিয়া দুর্যোধন আর কর্ণ গোপনে ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন, "আপনি বিদুরের কাছে শত্রুর প্রশংসা করিলেন কেন? উহাদিগকে এইবেলা জব্দ না করিতে পারিলে যে শেষে আমাদের বিপদ হইবে।"

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, "আমারও সেই মত। কেবল বিদুরের কাছে মনের কথা লুকাইবার জন্য পাণ্ডবদের প্রশংসা করি। ও তাহা কিছুই বুঝিতে পারে না। সুযোধন! তুমি কি করিতে চাহ, বল।"

সুযোধন কে, বুঝিলে?—দুর্যোধন! বাপ কিনা ছেলেকে আদর করিয়া মিষ্টনামে ডাকিয়া থাকে, তাই ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনকে বলিতেন, 'সুযোধন'।

দুর্যোধন পাণ্ডবদিগকে মারিবার জন্য কতরকম উপায়ের কথাই ভাবিয়া রাখিয়াছেন—

'পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে ঝগড়া বাধাইয়া দিলে উহারা নিজেরাই কাটাকাটি করিয়া মরিবে।'

'দ্রুপদকে ধন দিয়া বশ করিলেও কাজ চলিতে পারে।'

'গুণ্ডা লাগাইয়া ভীমকে মারিয়া ফেলিতে পারিলে তো আর কথাই নাই।'

'আর কিছু না হয়, তাঁহাদিগকে ভুলাইয়া এখানে আনিয়া মারিবার ফন্দি করিলেও মন্দ হয় না।'

এ-সকল পরামর্শ কর্ণের তত ভালো লাগিল না। তাঁহার ইচ্ছা, এখনই যুদ্ধ করিয়া পাণ্ডবদিগকে বধ করেন।

যাহা হউক, ধৃতরাষ্ট্র ইঁহাদের কথায় নিশ্চিন্ত হইতে না পারিয়া ভীষ্ম, দ্রোণ আর বিদুরকে ডাকাইলেন।

ভীষ্ম আর দ্রোণ দুইজনেই বলিলেন, "পাণ্ডবদিগকে অর্ধেক রাজ্য ছাড়িয়া দিয়া তাঁহাদের সহিত বন্ধুতা করা উচিত, নহিলে বিপদ হইবে।" কিন্তু এ কথা কর্ণের একেবারেই পছন্দ হইল না। রাগের চোটে ভদ্রতা ভুলিয়া গিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ! ইঁহারা আপনার টাকা খান, অথচ কি পরামর্শ দিলেন দেখুন। ইঁহারা কেমন লোক, আর আপনার কেমন বন্ধু, ইহাতেই বুঝিয়া লইবেন।"

বিদুর বলিলেন, "মহারাজ! ভালো কথা কেবল বলিলে কি হয়, তাহার মতো কাজ হইলে তবে তো উপকার হইবে। ভীষ্ম দ্রোণ ইঁহারা এক-একজন কিরূপ মহাপুরুষ, ভাবিয়া দেখুন। দুর্যোধন, কর্ণ, শকুনি ইহারা গোঁয়ার; ইহাদের কথা শুনিয়া চলিলে আপনার সর্বনাশ হইবে, এ কথা আমি বলিয়া রাখিতেছি।"

কাজেই তখন ধৃতরাষ্ট্র আর কি করেন? তিনি ভীষ্ম, দ্রোণ আর বিদুরের মতেই মত দিয়া বলিলেন, "বিদুর! তুমি গিয়া ইহাদের সকলকে আদরের সহিত লইয়া আইস।"

বিদুর এই সংবাদ লইয়া পাঞ্চালদেশে যাইতে আর কিছুমাত্র বিলম্ব করিলেন না। অনেকদিন পরে পাণ্ডবদিগকে দেখিয়া তাঁহার যেমন সুখ হইল, পাণ্ডবদেরও তাহাকে দেখিয়া তেমনি, বরং তাহার চেয়ে অধিক, সুখ হইল। দ্রুপদ, কৃষ্ণ, বলরাম ইঁহারা বিদুরকে যারপরনাই সম্মান দেখাইলেন।

ধৃতরাষ্ট্রের ভালো বুদ্ধি হইয়াছে, ইহা তো বেশ সুখেরই বিষয়। কাজেই পাণ্ডবেরা দ্রুপদের অনুমতি লইয়া বিদুর, কৃষ্ণ আর বলরামের সঙ্গে হস্তিনায় আসিলেন। আহা নগরের লোকগুলির তাঁহাদিগকে দেখিয়া যে আনন্দ! তাহারা যেন হাতে হাতে স্বর্গ পাইল।

তারপর ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, "বাবা যুধিষ্ঠির! তোমরা অর্ধেক রাজ্য লইয়া খাণ্ডবপ্রস্থে গিয়া বাস কর; তাহা হইলে আর দুর্যোধনের সহিত তোমাদের কোনোরূপ ঝগড়া হইবে না।" সুতরাং ধৃতরাষ্ট্রকে প্রণামপূর্বক পাণ্ডবেরা খাণ্ডবপ্রস্থে আসিয়া অর্ধেক রাজ্য লইয়া সুখে বাস করিতে লাগিলেন।

খাণ্ডবপ্রস্থ দেখিতে দেখিতে হস্তিনার চেয়েও বড় আর সুন্দর হইয়া উঠিল। মঠ-মন্দির, লোকজন, হাট-বাজার, দীঘি-পুকুর-বাগানে এমন শোভা আর অতি অল্প স্থানেই দেখা যায়।

এইরূপ সুখে তাঁহাদিগকে খাণ্ডবপ্রস্থে রাখিয়া কৃষ্ণ আর বলরাম দ্বারকায় (যেখানে তাঁহাদের বাড়ি) চলিয়া গেলেন।

ইহার মধ্যে কি হইল শুন।

পাণ্ডবেরা পাঁচ ভাই আর দ্রৌপদী, ইঁহাদের নিজেদের মধ্যে ব্যবহার অতিশয় মিষ্ট ছিল। দ্রৌপদীর সঙ্গে তাঁহারা যারপরনাই ভদ্রতা করিয়া চলিতেন। তিনি তাঁহাদের কোনো একজনের সহিত কথাবার্তা কহিবার সময় কখনো আর-একজন গিয়া তাহাতে বাধা দিতেন না। এমন-কি, তাঁহাদের নিয়ম ছিল যে, যদি তাঁহাদের কেহ এরূপ অভদ্রতা করেন, তবে তাঁহাকে বারো বৎসর সন্ন্যাসী হইয়া বনে বাস করিতে হইবে।

ইহার মধ্যে একদিন এক ব্রাহ্মণের গোরু চোরে লইয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণ তো খাণ্ডবপ্রস্থে আসিয়া মহাকান্না জুড়িয়াছেন, "হে পাণ্ডবগণ! আমার গোরু চোরে লইয়া গেল! হায় হায়! আমার গোরু যে চোরে লইয়া গেল!"

ব্রাহ্মণের কান্না শুনিয়া অর্জুন বলিলেন, "ভয় নাই ঠাকুর! এই আমি চোরকে সাজা দিতেছি।"

এই বলিয়া তিনি অস্ত্র আনিতে ছুটিয়া চলিয়াছেন, এমন সময় তাঁহার মনে হইল যে, অস্ত্রের ঘরে দ্রৌপদী আর যুধিষ্ঠির কথাবার্তা কহিতেছেন। তখন অর্জুন ভাবিলেন যে, 'এখন গিয়া ইঁহাদের কথাবার্তায় বাধা দিলে অভদ্রতা হইবে, আর বারো বৎসরের জন্য বনে যাইতে হইবে বটে, কিন্তু চোখের সামনে

ব্রাহ্মণের গোরু চোরে লইয়া যাইতেছে, ইহা সহ্য হইবার নহে। বরং বনেই যাইব, তথাপি ব্রাহ্মণের গোরু চোরে নিতে দিব না।'

এই মনে করিয়া তিনি অস্ত্র লইয়া চোর ধরিতে বাহির হইলেন। চোরকে মারিয়া ব্রাহ্মণের গোরু আনিয়া দিতে তাঁহার বেশি বিলম্ব হইল না। ব্রাহ্মণ গোরু পাইয়া চিৎকারপূর্বক অর্জুনকে প্রশংসা আর আশীর্বাদ করিতে করিতে ঘরে ফিরিলেন।

তারপর অর্জুন যুধিষ্ঠিরের নিকট গিয়া বলিলেন, "দাদা, নিয়ম যে ভাঙিগল! এখন অনুমতি করুন, বনে যাই।"

যুধিষ্ঠির তো শুনিয়াই অবাক! তাঁহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। তিনি বলিলেন, "সে কি ভাই, তোমার তো কিছুমাত্র অভদ্রতা হয় নাই। আর তুমি ব্রাহ্মণের কাজ করিতে গিয়াছিলে, সুতরাং একটা নিয়ম থাকিলেও তোমার না গেলেই দোষ হইত। আমি তো তোমার দাদা, আমার কথা তো মান্য কর, আমি বলিতেছি তোমার বনে যাওয়ার দরকার নাই। লক্ষ্মী ভাই! তুমি কোনো চিন্তা করিও না।"

অর্জুন বলিলেন, "দাদা! আপনিই তো কহিয়াছেন, মিথ্যা বলিয়া ধর্ম-কর্মও করিবেন না। নিয়ম করিয়া তাহা ভাঙিগলে অন্যায় কাজ করা হইবে; আমি অস্ত্র ছুঁইয়া বলিতেছি, আমি তাহা পারিব না।"

কাজেই যুধিষ্ঠির আর বিদায় না দিয়া থাকিতে পারিলেন না। অর্জুন তাঁহার পায়ের ধুলা লইয়া বারো বৎসরের জন্য বনে চলিয়া গেলেন।

অর্জুন বনে থাকার সময় অনেক আশ্চর্য ঘটনা ঘটিয়াছিল। একদিন তিনি গঙ্গায় নামিয়া স্নান করিতেছেন, এমন সময় নাগরাজ কৌরবের কন্যা উলুপী তাঁহাকে ধরিয়া জলের ভিতর দিয়া একেবারে তাঁহাদের দেশে (অর্থাৎ পাতালে) নিয়া উপস্থিত করেন। তারপর যতক্ষণ না অর্জুন উলুপীকে বিবাহ করিতে রাজি হন, ততক্ষণ তিনি তাঁহাকে আসিতে দেন নাই।

ইহার কিছুদিন পরে অর্জুন মণিপুর[১] যান, আর সেখানকার রাজার কন্যা চিত্রাঙ্গদার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

ইহার পরে অর্জুন গঙ্গার ধারে আসিয়া পাঁচটি তীর্থ দেখিতে পাইলেন। তীর্থগুলি খুব সুন্দর, অথচ তাহাতে লোকজন নাই। ইহাতে তিনি আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহার কারণ কি?" তাহা শুনিয়া কয়েকজন মুনি বলিলেন, "এই পাঁচ তীর্থে পাঁচটা কুমির আছে, কেহ জলে নামিলেই তাহারা তাহাকে ধরিয়া খায়। তাই এখানে কেহ স্নান করিতে আসে না।"

এ কথা শুনিয়া অর্জুন কুমির দেখিতে চলিলেন। মুনিরা অনেক নিষেধ করিলেও শুনিলেন না।

এই পাঁচ তীর্থের একটাতে গিয়া অর্জুন স্নান করিবার জন্য যেই জলে নামিয়াছেন, অমনি এক প্রকাণ্ড কুমির আসিয়া তাঁহার পা কামড়াইয়া ধরিয়াছে।

১। এই মণিপুর উড়িষ্যার কাছে ছিল।

আর অর্জুনও সেই মুহূর্তেই কুমিরকে ধরিয়া টানিতে টানিতে একেবারে ডাঙগায় আনিয়া তুলিয়াছেন।

কিন্তু একি আশ্চর্য! ডাঙগায় আসিয়াই কুমির আর কুমির নাই; সে পরমসুন্দরী একটি কন্যা হইয়া গিয়াছে। অর্জুন তো দেখিয়া অবাক! তিনি কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহার অর্থ কি? তুমি কে?"

কন্যা বলিল, "মহাশয়, আমি অপ্সরা। আমার নাম বর্গা। আমার চারিটি সখী আছে, তাহাদের নাম—সৌরভেয়ী, সমীচি, বুদ্বুদা আর লতা। আমরা এক তপস্বীকে অমান্য করিয়াছিলাম, তাহাতে তিনি রাগিয়া আমাদিগকে কুমির করিয়া দেন। তপস্বী বলিয়াছিলেন যে, কোনো মানুষ আমাদিগকে জল হইতে টানিয়া তুলিতে পারিলেই আমাদের শাপ দূর হইবে। তাই আমরা পাঁচজন এই পাঁচ তীর্থে বাস করি, আর মানুষ জলে নামিলেই তাহাকে ধরিয়া লইয়া যাই। কিন্তু এ পর্যন্ত আর কেহ আমাদিগকে টানিয়া ডাঙগায় তুলিতে পারে নাই, কাজেই আমরাও এতদিন কুমির থাকিয়া গিয়াছি। আজ আপনি আমাকে রক্ষা করিলেন। এখন আমার সখী চারিটিকে দয়া করিয়া উদ্ধার করুন।"

অর্জুন তখনই আর চারি তীর্থে গিয়া সেখানকার চারিটি কুমিরকে টানিয়া তুলিলেন। পাঁচটি অপ্সরা পাপের দায় হইতে রক্ষা পাইয়া স্বর্গে চলিয়া গেল।

ইহার পর নানাপ্রকার তীর্থ দেখিতে দেখিতে অর্জুন ক্রমে প্রভাসতীর্থে উপস্থিত হইলেন। এই তীর্থ কৃষ্ণের রাজ্যের মধ্যে। কৃষ্ণ অর্জুনের সংবাদ পাইয়া সেখানে আসিয়া তাঁহাকে দ্বারকায় লইয়া গেলেন।

বলরাম এবং কৃষ্ণের একটি ভগিনী ছিলেন, তাঁহার নাম সুভদ্রা। সুভদ্রার সহিত যেমন করিয়া অর্জুনের বিবাহ হইয়াছিল, সে এক আশ্চর্য কথা। রূপে-গুণে সুভদ্রার মতো মেয়ে অতি কমই দেখা যায়। তাঁহাকে দেখিয়া অর্জুনের বড়ই ভালো লাগিল।

কৃষ্ণ অসাধারণ বুদ্ধিমান লোক ছিলেন, তিনি সহজেই বুঝিতে পারিলেন যে, অর্জুন সুভদ্রাকে বিবাহ করিতে চাহেন। ইহাতে তাঁহার মনে অতিশয় আনন্দ হইল; কারণ, অর্জুনকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, আর জানিতেন যে, সুভদ্রার সহিত বিবাহ দিবার জন্য এমন গুণবান লোক আর পাওয়া যাইবে না।

এখন এ বিবাহ কিরূপে হইতে পারে, কৃষ্ণ তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। ক্ষত্রিয়দের বিবাহের নানারূপ নিয়ম আছে; কন্যাকে বলপূর্বক লইয়া গিয়া বিবাহ করা তাহার মধ্যে একটি। কৃষ্ণ বলিলেন, "এ নিয়মটি আমার বেশ লাগে। কেননা, ইহাতে বুঝা যায় যে বর খুব বীরপুরুষ আর কন্যার জন্য সে অনেক বিপদ আর পরিশ্রম সহ্য করিতে প্রস্তুত।"

সুতরাং স্থির হইল যে, যুধিষ্ঠিরের অনুমতি পাইলে অর্জুন সুভদ্রাকে জোর করিয়া বিবাহ করিবেন।

যুধিষ্ঠিরের অনুমতি সহজেই পাওয়া গেল, এখন বিবাহ হইলেই হয়। এ বিষয়ের সকল কথা কৃষ্ণ আর অর্জুন দুজনে ঠিক করিলেন; দ্বারকার আর কেহ

জানিতে পারিল না।

ইহার মধ্যে একদিন সুভদ্রা রৈবতক পর্বতে দেবতার পূজা করিতে গিয়াছেন। অর্জুন দেখিলেন এই তাঁহার সুযোগ। তিনি তাড়াতাড়ি যুদ্ধের বেশে অস্ত্র-শস্ত্র হাতে সুন্দর রথে চড়িয়া সেইখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

সুভদ্রার পূজা-অর্চনা শেষ হইয়াছে, এখন দ্বারকায় ফিরিতে হইবে, এমন সময় অর্জুন আসিয়া তাঁহাকে রথে তুলিয়া দে ছুট! সঙ্গের লোকেরা তখন মহা কোলাহল আরম্ভ করিয়া দিল। কেহ দ্বারকায় সংবাদ দিতে যায়, কেহ প্রহরী-দিগকে ডাকে, আর সকলে খালি হাউ-মাউ আর ছুটাছুটি করে!

এদিকে দ্বারকার বড়-বড় বীরেরা রাগে অস্থির! "এত বড় আস্পর্ধা! আমাদিগের এমন অপমান?" এই বলিয়া তাঁহারা সকলে বর্ম-চর্ম লইয়া রথ সাজাইয়া প্রস্তুত! বলরাম তো এতই রাগিয়াছেন যে, সেইদিনেই-বা সকল কৌরব মারিয়া শেষ করেন!

এমন সময় কৃষ্ণ বলিলেন, "তোমরা যে চটিয়াছ, বল দেখি অর্জুনের কি দোষ? ক্ষত্রিয়েরা তো এইরূপ বিবাহকেই খুব ভালো বিবাহ মনে করে; অর্জুন তাহাই করিয়াছেন। অর্জুন সুভদ্রাকে বিবাহ করিবেন ইহা আমাদের পক্ষে নিতান্ত সুখেরই কথা। আর তিনি বীরপুরুষ, সুতরাং জোর দেখানো তাঁহার মতো লোকের উপযুক্ত কাজই হইয়াছে। তোমরা যে ইহাতে অপমান মনে করিতেছ, অপমান কিসে হইবে, জান? যদি অর্জুন সুভদ্রাকে লইয়া দেশে চলিয়া যায়, তবেই অপমান। আর সে কেমন বীর, তাহাও তো জান। জোর করিয়া তাহাকে কিছুতেই আটকাইতে পারিবে না। আমার কথা যদি শুন, তবে এই-বেলা তাঁহাকে মিষ্ট কথায় খুশি করিয়া ফিরাও। তাহাকে ঘরে আনিয়া আদর করিয়া বিবাহ দাও; তাহা হইলে আর অপমানের কথা থাকিবে না, আনন্দের কথা হইবে।"

কৃষ্ণের কথায় যাদবেরা[১] তাড়াতাড়ি অর্জুনকে মিষ্ট কথায় ডাকিয়া ফিরাইলেন। তারপর ধুমধামের সহিত তাঁহার আর সুভদ্রার বিবাহ হইল।

বিবাহের পর অর্জুন দ্বারকা হইতে পুরুষতীর্থে যান। এইরূপে ক্রমে তাঁহার বারো বৎসর বনবাস শেষ হওয়াতে তিনি সুভদ্রা এবং কৃষ্ণ, বলরাম প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া খাণ্ডবপ্রস্থে চলিয়া আসিলেন! সেখানে কয়েকদিন খুব আনন্দেই কাটিল। তারপর কৃষ্ণ ছাড়া যাদবদিগের আর সকলে চলিয়া গেলেন।

ইহার পর একদিন কৃষ্ণ আর অর্জুন, দ্রৌপদী, সুভদ্রা প্রভৃতিকে লইয়া যমুনার ধারে বেড়াইতে যান। সেখানে সকলেই আমোদ-প্রমোদ করিতেছেন দেখিয়া কৃষ্ণ আর অর্জুন খানিক দূরে একটি নির্জন স্থানে বসিয়া কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন।

এমন সময় জটাচীরধারী (অর্থাৎ মাথায় জটা আর গাছের ছাল পরা) আর

১। অর্থাৎ কৃষ্ণ যে বংশে জন্মিয়াছেন সেই বংশের লোকেরা; ইঁহাদের পূর্বপুরুষের নাম ছিল যদু। তাই ইঁহারা সকলে যাদব।।

পিঙ্গলবর্ণের দাড়ি-গোঁফওয়ালা এই লম্বা এক ব্রাহ্মণ তঁহাদের সামনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার রঙ কাঁচা সোনার মতো, আর তেজ প্রভাতের সূর্যের মতো।

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আমি ব্রাহ্মণ, আমার একটু বেশি করিয়া খাওয়া অভ্যাস। আপনাদের নিকট আমি কিছু জলযোগের প্রার্থনা করি।"

কৃষ্ণ আর অর্জুন বলিলেন, "আপনি কি খাইতে চাহেন বলুন, আমরা আনিয়া দিতেছি।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "মিঠাই মণ্ডা, ভাত ব্যঞ্জন আমি কিছুই খাই না! আমি খাণ্ডব নামক বনটিকে খাইব, আপনারা তাহারই উপায় করিয়া দিন।"

কি অদ্ভুত জলযোগ! আর ব্রাহ্মণটিও যে কম অদ্ভুত নহেন, তাহা তাঁহার পরিচয় শুনিলেই বুঝিতে পারিবে। ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আমি অগ্নি। আমার নিতান্ত ইচ্ছা, খাণ্ডব বনটাকে খাই! কিন্তু সেই বনে ইন্দ্রের বন্ধু তক্ষক নাগ আর তাহার পরিবার থাকাতে, আমি সেখানে গেলেই ইন্দ্র বৃষ্টি ফেলিয়া আমাকে নিবাইয়া দেন। তাই আমি আপনাদের নিকট আসিয়াছি। আপনারা যদি বৃষ্টি থামাইয়া আর বনের জন্তুগুলিকে আটকাইয়া রাখিতে পারেন, তবে আমার কিঞ্চিৎ ভোজন হয়।"

ব্যাপারখানা কি জান? শ্বেতকী বলিয়া এক রাজা ছিলেন, তাঁহার প্রধান কাজ ছিল কেবল যজ্ঞ করা। সে কি যেমন-তেমন যজ্ঞ? তাঁহার যজ্ঞে খাটিয়া-খাটিয়া মুনিরা রোগা হইয়া গেলেন, ধোঁয়ায় তাঁহাদের চোখে ছানি পড়িল, শেষে আর না পারিয়া তাঁহারা রাজার কাজই ছাড়িয়া দিলেন।

ইহাতে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া শ্বেতকী শিবের তপস্যা আরম্ভ করাতে, শিব বলিলেন, "তুমি বারো বৎসর ক্রমাগত অগ্নিকে ঘি খাওয়াইয়া খুশি কর, তারপর দেখা যাইবে।"

রাজা ক্রমাগত বারো বৎসর অগ্নিকে ঘি খাওয়াইলেন। তাহাতে শিব সন্তুষ্ট হইয়া দুর্বাশা মুনিকে দিয়া তাঁহার যজ্ঞ করাইয়া দিলেন।

রাজার যজ্ঞ হইল বটে, কিন্তু এত ঘি অগ্নির সহ্য হইল না। তাঁহার পেট ভার হইল, ক্ষুধা মরিয়া গেল ; কাজেই তখন বেচারা ব্যস্তভাবে ব্রহ্মার নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মা তাঁহার কথা শুনিয়া বলিলেন, "এত ঘি খাইয়াছ, তাই তোমার মন্দাগ্নি হইয়াছে (অর্থাৎ ক্ষুধা চলিয়া গিয়াছে)। এখন খুব খানিকটা মাংস খাও গিয়া, তবেই সারিয়া যাইবে। খাণ্ডব বনে অনেক জন্তু থাকে, সেটাকে পোড়াইতে পার তো তোমার কাজ হয়!"

অগ্নি তখনই খাণ্ডব বনে চলিয়া আসিলেন। সেখানে আসিয়া তাঁহার কিরূপ দশা হইয়াছিল, তাহা শুনিয়াছ। তিনি কেবল ইন্দ্রের কথাই বলিয়াছেন, কিন্তু সেই বনের জন্তুরাও তাঁহাকে কম নাকাল করে নাই। সেখানকার হাতি-গুলি শুঁড়ে করিয়া জল ঢালিয়া তাঁহাকে নিবাইয়া দিল। অন্য জন্তুরাও তাঁহার কতই দুর্গতি করিল। সাতবার সেই বন পোড়াইতে গিয়া, সাতবারই তিনি এইরূপে জব্দ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন।

শেষে ব্রহ্মা তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি কৃষ্ণ আর অর্জুনের কাছে যাও; তাহারা চেষ্টা করিলে ইন্দ্রকেও আটকাইতে পারেন, জন্তুদিগকেও থামাইয়া রাখিতে পারেন!" তারপর কি হইয়াছে তোমরা জান।

অগ্নির কথা শুনিয়া অর্জুন বলিলেন, "আমার তেমন ভালো ধনুক বা রথ নাই, আর কৃষ্ণের হাতেও অস্ত্র নাই। আমাদিগকে এ-সকল জিনিস আনিয়া দিলে আমরা আপনার কাজ করিতে প্রস্তুত আছি।"

এ কথায় অগ্নি বরুণের নিকট হইতে গাণ্ডীব নামক ধনুক, অক্ষয় তূণ ও কপিধ্বজ নামক রথ আনিয়া অর্জুনকে দিলেন। সেই রথের উপরে এক ভয়ংকর বানরের মূর্তি থাকাতে উহার 'কপিধ্বজ' নাম হয়। অতি আশ্চর্য রথ, বিশ্বকর্মার তৈরি; ঘোড়াগুলি গন্ধর্বের দেশের! আর ধনুকের কথা কি বলিব? নিজে ব্রহ্মা উহা প্রস্তুত করেন। অর্জুন সে ধনুকে গুণ চড়াইবার সময় তাহার ভীষণ শব্দে ত্রিভুবন কাঁপিয়া উঠিল।

অগ্নি অর্জুনকে এই-সকল জিনিস আর কৃষ্ণকে সুদর্শন নামক একখানি চক্র (অর্থাৎ চাকার ন্যায় অস্ত্র) আর কৌমদকী নামক একটি গদা দিলেন। সে চক্রকে কিছুতেই আটকাইতে পারে না। যাহাকে মারিবে, তাহার আর রক্ষা নাই। চক্র তাহাকে বধ করিয়া আবার হাতে ফিরিয়া আসিবেই আসিবে। অস্ত্র পাইয়া কৃষ্ণ আর অর্জুন অগ্নিকে বলিলেন, "আচ্ছা, তবে এখন আপনি গিয়া বন পোড়াইতে থাকুন। আমরা আপনার সাহায্য করিতেছি।"

অমনি খাণ্ডব বনের চারি দিকে ভয়ানক আগুন জ্বলিয়া উঠিল। খাণ্ডব দহনের (অর্থাৎ খাণ্ডব পোড়ানোর) ন্যায় ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড খুব কমই হইয়াছে। আগুনের শিখা হড়্-হড়্ ঘড়্-ঘড়্ গর্জনে আকাশ ছাইয়া ফেলিল, আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে পর্বতাকার কালো ধোঁয়া উঠিয়া দিনকে অমাবস্যার রাত্রির মতো করিয়া দিল। জীব-জন্তু সকলে চিৎকার করিতে করিতে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়াও কৃষ্ণ আর অর্জুনের ভয়ে পলাইতে পারিল না। কৃষ্ণের চক্র এমনি যে, কোনো জন্তু বাহিরে দেখা দিতে না দিতেই সে তাহাকে কাটিয়া দুইখান করে। অর্জুনের তীর এমনি যে, ফড়িংটিকে পর্যন্ত উড়িয়া পলাইতে দেয় না। তাঁহার রথ সে সময়ে এমনি বেগে সেই বনের চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল যে, উঁহাদিগকে স্পষ্ট করিয়া দেখিতেই পাওয়া যায় না। কত জন্তু, কত পাখি যে পুড়িয়া মরিল, তাহা ভাবিয়াও শেষ করা যায় না! খাল-বিলের জল টগবগ করিয়া ফুটিতে লাগিল; মাছ, কচ্ছপ, কুমির সকলই সিদ্ধ হইয়া গেল। আগুনের শব্দ আর জন্তুদিগের চিৎকার মিলিয়া ঝড় বজ্রপাত আর সমুদ্রের গর্জনকেও হারাইয়া দিল।

আগুনের তেজে দেবতারা ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে ইন্দ্রের নিকট গিয়া বলিলেন, "হে ইন্দ্র! আজ অগ্নি কিজন্য পৃথিবীকে ভস্ম করিতে গিয়াছেন? আজ কি সৃষ্টির শেষ দিন উপস্থিত?"

তাঁহাদের কথায় ইন্দ্র অমনি উনপঞ্চাশ পবন আর ঘোরতর কালো মেঘ সকলকে লইয়া আগুন নিবাইতে চলিলেন। কিন্তু সে আগুনের তেজে তাঁহার

মেঘ-বৃষ্টি আকাশেই শুষিয়া গেল। মেঘ হারিলে ইন্দ্র মহামেঘদিগকে ডাকিলেন—যাহারা মনে করিলে ব্রহ্মাণ্ড তল করিয়া দিতে পারে। কিন্তু সেই সাংঘাতিক মেঘও অর্জুনের বাণে উড়িয়া গেল।

সেই বনে ইন্দ্রের বন্ধু তক্ষক সাপের বাড়ি। তক্ষক তখন বাড়ি ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার স্ত্রী-পুত্র ছিলেন। তক্ষকের পুত্র অশ্বসেনের মা তো পুড়িয়া মারাই গেলেন। ইহার মধ্যে ইন্দ্র একবার ফাঁকি দিয়া অর্জুনকে অজ্ঞান করিতে পারিয়াছিলেন, তাই রক্ষা, নহিলে অশ্বসেনকেও তাঁহার মায়ের সঙ্গেই যাইতে হইত।

বৃষ্টি করিয়া, বাজ ফেলিয়া, পর্বত ছুঁড়িয়া কিছুতেই ইন্দ্র কৃষ্ণ আর অর্জুনকে জব্দ করিতে পারিলেন না। ইন্দ্রের পর্বত অর্জুনের বাণে ফাটিয়া খণ্ড খণ্ড হইল, তখন বোধ হইল, যেন আকাশের গ্রহগুলি ছুটিয়া পড়িতেছে!

দেবতাদের বড় খোলা মন। তাই ইন্দ্র যখন দেখিলেন যে তিনি কিছুতেই কৃষ্ণ আর অর্জুনকে আঁটিতে পারিতেছেন না, তখন তিনি যারপরনাই সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে প্রশংসা করিতে করিতে চলিয়া গেলেন।

তখন খাণ্ডব বন পোড়াইতে কোনো বাধাই রহিল না। সেই ভয়ানক আগুনের হাত হইতে কেবল ছয়টি প্রাণী রক্ষা পাইয়াছিল।

এই ছয়টির একটি অবশ্য অশ্বসেন, আর-একটি ময় নামক দানব। এই ব্যক্তি হাত জোড় করিয়া অর্জুনকে এমনি মিনতি করিতে লাগিল যে, অর্জুন দয়া করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন।

আর চারিটি প্রাণী চারিটি বকের ছানা। ইহাদিগকে অগ্নি দয়া করিয়া পোড়ান নাই।

খাণ্ড বন খাইয়া অগ্নির অসুখ ছাড়িয়াছিল কি না, তাহা মহাভারতে লেখা নাই। সে যাহা হউক, তিনি ভোজন শেষ করিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন। ইন্দ্র যে কৃষ্ণ আর অর্জুনের উপর খুব খুশি হইয়াছিলেন, এ কথা তো আগেই বলিয়াছি। তিনি বলিলেন, "তোমরা যাহা করিলে দেবতারাও তাহা করিতে পারেন না। এক্ষণে তোমরা কি বর চাও?"

তাহাতে অর্জুন বলিলেন, "আমাকে সকলরকম অস্ত্র দিন, এই আমার প্রার্থনা।"

ইন্দ্র বলিলেন, "তুমি তপস্যা করিয়া শিবকে তুষ্ট কর। তাহা হইলেই আমি অস্ত্র দিব।"

কৃষ্ণ বলিলেন, "অর্জুনের সহিত আমার বন্ধুতা যেন চিরদিন থাকে।"

ইন্দ্র বলিলেন, "তথাস্তু।" (অর্থাৎ "তাহাই হউক")।

তারপর অগ্নি, কৃষ্ণ আর অর্জুনের অনেক প্রশংসা করিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন; আর কৃষ্ণ, অর্জুন এবং ময়দানব যমুনার ধারে বসিয়া কথাবার্তা বলিতে লাগিলেন।



অগ্নি আর ইন্দ্র চলিয়া গেলে পরে ময়দানব জোড়হাতে অর্জুনকে বলিলেন, "আপনি আমার প্রাণ বাঁচাইয়াছেন; অনুমতি করুন, আমি আপনার কি উপকার করিব?"

অর্জুন বলিলেন, "তুমি যে সন্তুষ্ট হইয়াছ, ইহাই আমার উপকার। আর কিছু করিতে হইবে না।"

কিন্তু ময় ইহাতে সন্তুষ্ট হইল না। সে যে-সে লোক নহে। দেবতা-দের মধ্যে বিশ্বকর্মা যেমন সকলরকম কারিকুরির ওস্তাদ, আর অসাধারণ ক্ষমতাশালী লোক, দানবদিগের মধ্যে ময়ও সেইরূপ। তাহার নিতান্ত ইচ্ছা যে অর্জুনের জন্য সে বড়রকমের কোনো কাজ করে। তাহার মিনতি দেখিয়া, শেষে অর্জুন বলিলেন, "তুমি কৃষ্ণের কোনোকাজ করিয়া দাও, তবে আমাদের উপকার হইবে।"

কৃষ্ণ বলিলেন, "তুমি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের জন্য এমন একটা সভা-ঘর করিয়া দাও যে আর কেহ তেমন করিতে না পারে।"

ময় সন্তোষের সহিত এ কথায় রাজি হইল। তারপর কৃষ্ণ আর অর্জুন তাহাকে সঙ্গে করিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট লইয়া গেলেন। সেখানে অবশ্য তাহার আদর যত্নের কোনো ত্রুটি হইল না।

তারপর সভা-গৃহের আয়োজন আরম্ভ হইল। সভাটি যে কিরূপ তাহা ইহাতেই বুঝিতে পারিবে যে, সেটি পাঁচহাজার হাত লম্বা ছিল। এমন সভার আয়োজন কি যেখানে-সেখানে মিলে? এ দেশে সে-সব জিনিস জন্মায়ই না। বহুকাল পূর্বে দানবরাজ বৃষপর্বা যজ্ঞের জন্য কৈলাস পর্বতের উত্তরে এই ময়কে দিয়াই এক অতি আশ্চর্য সভা প্রস্তুত করান। যুধিষ্ঠিরের সভার জন্য ময় সেই সভার মণি-মুক্তা আর স্ফটিক লইয়া আসিল। সেখানে বিন্দু সরোবর নামে একটি সরোবরের ভিতরে বৃষপর্বার সোনার গদা আর বরুণের দেবদত্ত নামক বিশাল শঙ্খও ছিল।

ময় ভীমের জন্য সেই গদা আর অর্জুনের জন্য বরুণের শঙ্খটিও আনিতে ভুলিল না।

চৌদ্দ মাসে সভা-ঘর প্রস্তুত হইল। সে সভা কিরূপ সুন্দর হইয়াছিল,

তাহা আমি কি বলিব! ইঁটের বদলে তাহা স্ফটিক দিয়া গাঁথা। সেই স্ফটিকের উপরে সূর্যের আলোক পড়িয়া না জানি কেমন ঝক্-ঝক্ করিত! সেখানে বাগান তো ছিলই; তাহার গাছপালা ছিল সোনার, ফুল মণি-মাণিক্যের। আর ভিতরের সাজ কাজ, সে-যে কি আশ্চর্যরকমের ছিল, তাহা বুঝাইব কি, আমিই বুঝিতে পারিতেছি না। আমি তো গরিব মানুষ, বড়-বড় রাজাদেরই তাহাতে ধোঁকা লাগিয়া গিয়াছিল। স্ফটিকের পুকুর দেখিয়া তাঁহারা তাহাকে পুকুর বলিয়া বুঝিতে পারেন নাই, তাঁহারা গিয়াছিলেন তাহার উপর দিয়া হাঁটিতে। তারপর একটা হাসির কাণ্ড হইয়া গেলে তবে বুঝিলেন যে উহা জল!

এমনি সুন্দর বাড়ি, এমনি সুন্দর বাগান, আর তাহাতে তেমনি সুন্দর মাছের খেলা, ফুলের গন্ধ আর পাখির গান। বুঝিয়া লও, সভাটি কেমন ছিল। আটহাজার বিকট রাক্ষস সেই সভায় পাহারা দিত।

সভা দেখিয়া পাণ্ডবেরা খুশি হইবেন তাহা আশ্চর্য কি? তেমন সভা খালি স্বর্গেই আছে, পৃথিবীতে তেমন আর কেহ দেখে নাই। পৃথিবীর রাজা-রাজড়া, মুনি-ঋষি, ইঁহারা সকলেই সে সভা দেখিতে আসিলেন। স্বর্গ হইতে নারদ, পারিজাত, রৈবত, সুমুখ, ধৌম্য প্রভৃতি দেবর্ষিরা অবধি সভা দেখিতে আসিবার লোভ সামলাইতে পারিলেন না।

নারদ যুধিষ্ঠিরকে ইন্দ্র, যম, বরুণ, কুবের আর ব্রহ্মার সভার সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য সংবাদ শুনাইলেন। ইহা ছাড়া মহারাজ পাণ্ডুরও দু-একটি সংবাদ ছিল। স্বর্গ হইতে আসিবার সময় মহারাজ পাণ্ডুর সহিত তাঁহার দেখা হয়। তখন পাণ্ডু তাঁহাকে বলেন, "মহর্ষি! আপনি পৃথিবীতে যাইতেছেন, যুধিষ্ঠিরকে বলিবেন, যেন রাজসূয় যজ্ঞ করে। রাজসূয় যজ্ঞের গুণে রাজা হরিশ্চন্দ্র ইন্দ্রের সভায় কত সুখে বাস করিতেছেন। যুধিষ্ঠির সে যজ্ঞ করিলে আমিও সেইরূপ সুখে সেখানে থাকিতে পাইব।"

নারদ যুধিষ্ঠিরকে এই সংবাদ দিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

রাজসূয় অতি কঠিন যজ্ঞ। পৃথিবীর তাবৎ রাজার নিকট হইতে কর আদায় করিয়া তাহার দ্বারা এই যজ্ঞ করিতে হয়; সুতরাং এই যজ্ঞে বাধা দিতে অন্য রাজারা বিধিমতে চেষ্টা করে। নিজের বল-বুদ্ধি আর বন্ধু-বান্ধব খুব বেশিরকম না থাকিলে ইহা করা সম্ভবই হয় না। কাজেই রাজসূয়ের কথা শুনিয়া পাণ্ডবেরা বড়ই ভাবনায় পড়িলেন। এ যজ্ঞ না করিলেই নয়, অথচ কাজটি ভারি কঠিন।

বল-বুদ্ধি পাণ্ডবদের যথেষ্ট, বন্ধু-বান্ধবেরও অভাব নাই। যুধিষ্ঠিরকে সকলে প্রাণ ভরিয়া ভালোবাসে। ভীম অর্জুনের সাহস আর ক্ষমতায় প্রজার সকল ভয় দূর হইয়াছে, শত্রুরা দেশ ছাড়িয়া পলাইয়াছে। নকুলের ন্যায়বিচারে আর সহদেবের মিষ্ট ব্যবহারে লোক মোহিত। সুতরাং এ-সকল বিষয়ে পাণ্ডবদের বেশ ভরসার কথাই ছিল। মন্ত্রীরা একবাক্যে যুধিষ্ঠিরকে যজ্ঞ করিতে উৎসাহ দিলেন।

কিন্তু ইঁহাদের কথায় যুধিষ্ঠিরের চিন্তা দূর হইল না। পরামর্শ দিবার

একটি লোক আছেন—কৃষ্ণ। তিনি বলিলে তবে একাজে হাত দেওয়া যায়। এই ভাবিয়া যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে আনাইলেন।

কৃষ্ণ আসিলে যুধিষ্ঠির তাঁহাকে বলিলেন, "ভাই, রাজসূয় যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, তুমি কি বল? আর সকলে তো খুবই উৎসাহ দিতেছে, কিন্তু ইহাদের কথায় আমার ভরসা হয় না। তুমি যাহা বলিবে, তাহাই আমি বুঝিব ঠিক।"

কৃষ্ণ বলিলেন, "মহারাজ! আপনি রাজসূয় করিবার উপযুক্ত লোক তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার মধ্যে ভয়ের একটা কথা আছে। মগধের রাজা জরাসন্ধের এখন অসাধারণ ক্ষমতা। পৃথিবীর সকল রাজাকে সে পরাজয় করিয়াছে। শিশুপাল উহার সেনাপতি, সেও একজন অসাধারণ যোদ্ধা। তারপর বক্র, ভগদত্ত, শল্য, পৌণ্ডক, ভীষ্মক, প্রভৃতি অনেক বড় যোদ্ধা উহার বন্ধু। উহার ভয়ে কত শত রাজা যে দেশ ছাড়িয়া পলাইয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। এমন-কি, আমরা নিজে উহার ভয়ে মথুরা ছাড়িয়া দ্বারকায় আসিয়া বাস করিতেছি। অনেক রাজাকে ধরিয়া আনিয়া দুষ্ট তাহার দুর্গের ভিতরে বন্দী করিয়াছে। এ ব্যক্তি বাঁচিয়া থাকিতে আপনার রাজসূয় হওয়া অসম্ভব। ইহাকে আগে মারিয়া বন্দী রাজাদিগকে ছাড়াইয়া দিতে চেষ্টা করুন, নহিলে রাজসূয় করিতে পারিবেন না।"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "এই জরাসন্ধকে লইয়া তো বড় মুস্কিল দেখিতেছি, তুমি নিজে উহাকে এত ভয় কর, আমাদের সাহস কিসে হইবে? তুমি, বলরাম, ভীম আর অর্জুন, এই চারিজনের কেহ কি উহাকে মারিতে পার না?"

ইহা শুনিয়া ভীম বলিলেন, "কৃষ্ণের বুদ্ধি আছে, আমার বল আছে, আর অর্জুনের সাহস আছে। আমরা তিনজনে মিলিয়া জরাসন্ধকে বধ করিব।"

কৃষ্ণ বলিলেন "জরাসন্ধ ছিয়াশিটি বড়-বড় রাজাকে আনিয়া ছাগলের মতো বাঁধিয়া রাখিয়াছে। আর চৌদ্দটিকে আনিতে পারিলেই একশতটি হয়; তখন উহাদিগকে বলি দিবে। এই-সকল রাজাকে ছাড়াইতে চেষ্টা করা উচিত হইতেছে। যে জরাসন্ধকে মারিয়া এ কাজ করিতে পারিবে, সে সম্রাট হইতে পারিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "আমি সম্রাট হওয়ার লোভে তোমাদিগকে এমন বিপদে ফেলিতে পারিব না। আমার রাজসূয়ে কাজ নাই।"

এই সময়ে অর্জুন সেখানে আসিলেন। তিনি বলিলেন, "আমরা ভালো ভালো অস্ত্র পাইয়াছি, আমাদের বলও যথেষ্ট আছে। এ-সব থাকিতে শত্রুর সামনে চুপ করিয়া থাকা ভালো নহে। আমরা যুদ্ধ করিব।"

জরাসন্ধ মগধের রাজা, উহার পিতার নাম বৃহদ্রথ। বৃহদ্রথের দুই রানী ছিলেন। অনেকদিন পর্যন্ত ইঁহাদের সন্তান না হওয়ায় রাজার মনে বড় দুঃখ ছিল। ইহার মধ্যে একদিন মহর্ষি চণ্ডকৌশিক রাজবাড়ির নিকটে এক আম-গাছের তলায় বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। এ কথা শুনিবামাত্র রাজা মুনির নিকটে গিয়া তাঁহার অনেক সেবাপূর্বক নিজের দুঃখের কথা জানাইলেন।

তখন মুনি ধ্যানে বসিতেই গাছ হইতে একটি সুন্দর আম তাঁহার কোলের উপর পড়িল। সেই আমটি রাজাকে দিয়া তিনি বলিলেন, "মহারাজ, রানীরা এই আম খাইলেই তোমার পুত্র হইবে।"

দুই রানী সেই আমটিকে ভাগ করিয়া খাইলেন। ইহাতে তাঁহাদের দুজনের দুটি ছেলে হইল বটে, কিন্তু সে অতি অদ্ভুতরকমের ছেলে। তাহাদিগকে মানুষ বলা যায় না, আধখানা মানুষ বলিতে হয়। একখানা করিয়া পা, একটি মাত্র হাত, একটি চোখ, একটি কান, আধখানি মাথা, আধখানি শরীর। এমন ছেলে দিয়া কি হইবে? কাজেই তাহাদিগকে কাপড়ে মুড়িয়া চৌমাথায় ফেলিয়া দেওয়া হইল।

জরা নামে এক রাক্ষসী সেই দুইখানি অর্ধেক ছেলে কুড়াইয়া পায়। রাক্ষসী ভাবিল, দুটাকে এক সঙ্গে জড়াইয়া লইলে বহিবার সুবিধা হইবে। এই ভাবিয়া যেই সে দুই অর্ধেক একত্র করিয়াছে, অমনি তাহা জুড়িয়া একটি ছেলে হইয়া গেল। বজ্রের মতো শক্ত প্রকাণ্ড খোকা, রাক্ষসী তাহাকে কি সহজে বহিয়া নিতে পারে? সে খোকা আস্ত হইয়াই হাতের মুঠি মুখে ঢুকাইয়া ষাঁড়ের মতো চ্যাঁচাইতে আরম্ভ করিল!

খোকার সেই ভয়ংকর চিৎকার শুনিয়া রাজা, মন্ত্রী, লোকজন সকলে সেখানে ছুটিয়া আসিল। রাক্ষসীও ছেলেটি অমনি রাজাকে দিয়া বলিল, "এই নাও, তোমার ছেলে।'

সেই ছেলেই জরাসন্ধ (অর্থাৎ জরা যাহাকে জুড়িয়াছিল)। বড় হইয়া সে বড়ই ভয়ংকর লোক হইয়াছে। হংস আর ডিম্ভক নামক দুই বীর তাহার বন্ধু ছিল। এই তিনজন একত্র হইলে ত্রিভুবন জয় করিতে পারিত।

হংস আর ডিম্ভকের ভালোবাসার কথা বড় সুন্দর। হংস নামক আর-একজন লোকের মৃত্যুর কথা শুনিয়া ডিম্ভক ভাবিল, বুঝি তাহার বন্ধুই মরিয়া গিয়াছে। সেই দুঃখে সে যমুনায় ডুবিয়া প্রাণত্যাগ করিল। সে সংবাদ পাইয়া হংসও যমুনায় ডুবিয়া মারা গেল।

ইহাদের মৃত্যুতে জরাসন্ধের বল অনেক কমিয়া গেল বৈকি, কিন্তু তাহার একেলার ক্ষমতাও কম নহে! একবার সে কৃষ্ণকে মারিবার জন্য একটা প্রকাণ্ড গদা নিরানব্বইবার ঘুরাইয়া মগধ হইতে ছুঁড়িয়া মারে। সেই গদা মথুরার কাছে আসিয়া পড়িয়াছিল।

মগধের চারিধারে বৈহার, বরাহ, বৃষভ, ঋষিগিরি ও চৈত্যক নামে পাঁচটি প্রকাণ্ড পর্বত থাকাতে সৈন্য লইয়া গিয়া সে দেশ জয় করা একেবারে অসম্ভব। তাহার উপরে আবার জরাসন্ধ নিজে এমন বীর আর তাহার এত সহায়। এইজন্য কৃষ্ণ বলিলেন যে, উহাকে অন্য উপায়ে মারিতে হইবে। কৃষ্ণ, ভীম আর অর্জুন এই তিনজন সাধারণ লোকের মতো মগধ দেশে গেলে সহজেই জরাসন্ধের দেখা পাওয়ার কথা। তখন ভীম যুদ্ধ করিয়া তাহাকে মারিবেন।

এইরূপে পরামর্শের পর তিনজনে স্নাতক ব্রাহ্মণের বেশে ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে যাত্রা করিলেন। সেখান হইতে তাঁহারা ক্রমে কুরুজাঙ্গল দেশে, তারপর

গণ্ডকী, সরযূ প্রভৃতি নদী পার হইয়া কোশলায়, সেখান হইতে মিথিলায়, মিথিলা হইতে মালয়, তারপর চর্মণ্বতী, গঙ্গা আর শোন পার হইয়া শেষে মগধে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নগরের সিংহদ্বারের পাশেই একটি সুন্দর চৈত্য (জয়স্তম্ভ) আর তিনটা বিশাল দুন্দুভি (ডঙ্কা) ছিল। সেখানে আসিয়া তাঁহাদের প্রথম কাজই হইল সেই জিনিসগুলিকে চুরমার করা। তারপর তাঁহারা খুব খুশি হইয়া নগরে প্রবেশ করিলেন। রাজপথের দুইধারে ময়রা, সওদাগর, মালাকর প্রভৃতির দোকান ছিল, তাহা হইতে জোর করিয়া মালা লইয়া তাহারা গলায় পরিলেন! এ-সকল কাণ্ড দেখিয়া সকলে আশ্চর্য হইয়া ভাবিতে লাগিল, না জানি ইঁহারা কে!

এইরূপে ক্রমে তাহারা জরাসন্ধের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলে, জরাসন্ধ তাঁহাদিগকে স্নাতক ব্রাহ্মণ ভাবিয়া অনেক আদর-যত্ন করিল। কিন্তু ভীম আর অর্জুন তাহার কোনো কথার উত্তর দিলেন না। কৃষ্ণ বলিলেন, "ইঁহাদের নিয়ম আছে, এখন কথা কহিবেন না। দুই প্রহর রাত্রির সময় আপনার সহিত ইঁহাদের কথাবার্তা হইবে।"

রাত্রি দুই প্রহরের সময় জরাসন্ধের সহিত কথাবার্তা আরম্ভ হইলে জরাসন্ধ বলিল, "আপনাদের পোশাক স্নাতক ব্রাহ্মণের মতো। কিন্তু স্নাতক ব্রাহ্মণেরা তো এমন সময়ে মালা-চন্দন পরেন না। আপনাদের হাতে ধনুর্গুণের দাগ দেখিয়া ক্ষত্রিয় বলিয়াই বোধ হয়। অথচ আপনারা ব্রাহ্মণের বেশে আসিয়াছেন, আবার চৈত্যটি ভাঙিয়াছেন! আমি আদর-যত্ন করিলাম তাহারও আপনারা ভালো করিয়া উত্তর দেন নাই! যাহা হউক, আপনারা কিজন্য আসিয়াছেন?"

কৃষ্ণ বলিলেন, "স্নাতক তো ক্ষত্রিয় আর বৈশ্যেরাও হইতে পারে, আমাদিগকে ব্রাহ্মণ মনে করিবার প্রয়োজন কি? মালা পরিলে দেখায় ভালো, তাই আমরা মালা পরিয়াছি। গায়ের জোর দেখানো ক্ষত্রিয়ের উচিত কাজ, তাই কিছু দেখাইয়াছি : আপনার দেখিবার ইচ্ছা থাকিলে আজই আরো ভালো, করিয়া দেখিতে পাইবেন। শত্রুর ঘরে আসিয়া তাহার নিকট হইতে আদর লওয়া আমরা ভালো মনে করি না, তাই আপনার আদর-যত্নের উত্তর দেই নাই।"

এ কথায় জরাসন্ধ আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমি কি করিয়া আপনাদের শত্রু হইলাম তাহা তো বুঝিতে পারিতেছি না! আপনাদের বোধ হয় ভুল হইয়া থাকিবে।"

কৃষ্ণ বলিলেন, "তুমি ক্ষত্রিয় রাজাদিগকে ধরিয়া বলি দিতে আনিয়াছ, সুতরাং তুমি সকল ক্ষত্রিয়েরই শত্রু। তাই আমরা তোমাকে বধ করিতে আসিয়াছি। আমরা ব্রাহ্মণ নহি! আমি বসুদেবের পুত্র কৃষ্ণ, আর ইঁহারা দুজন মহারাজ পাণ্ডুর পুত্র। এখন, হয় এই-সকল রাজাদিগকে ছাড়িয়া দাও, নাহয় আমাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া যমের বাড়ি যাও।"

জরাসন্ধ বলিল, "আমি যাহাদিগকে ধরিয়া আনিয়াছি, তাহাদিগকে লইয়া আমার যাহা খুশি করিব। আমি কাহাকেও ভয় করি না। আমি একেলা দুই

তিন মহারথীর (খুব বড় বীরের) সহিত যুদ্ধ করিতে পারি।

কৃষ্ণ বলিলেন, "আমাদের কাহার সহিত যুদ্ধ করিবে?"

জরাসন্ধ ভীমকে দেখাইয়া বলিল, "ইহার সহিত।"

তখন পুরোহিত আসিয়া স্বস্ত্যয়ন (জরাসন্ধের মঙ্গলের জন্য দেবতার পূজা) করিলে, জরাসন্ধ বর্ম আঁটিয়া, চুল বাঁধিয়া, বলিল, "আইস ভীম! যুদ্ধ করি।"

তারপর দুজনে কি ভয়ানক যুদ্ধই আরম্ভ হইল! যতরকম কুস্তির প্যাঁচ আছে, সমস্তই দুজনে দুজনের উপর খাটাইলেন। ঝড়ের মতন করিয়া তাঁহাদের নিশ্বাস বহিতে লাগিল ; কপালে কপালে ঠেকিয়া আগুন বাহির হইতে লাগিল।

তেরো দিন এইরূপ যুদ্ধের পর চৌদ্দ দিনের রাত্রিতে জরাসন্ধ ক্লান্ত হইয়া পড়িল। তাহা দেখিয়া কৃষ্ণ বলিলেন, "আহা! বড় কাহিল হইয়া পড়িয়াছ! ভীম, আর মারিও না, তাহা হইলে মরিয়া যাইবে!"

আসল কথা ভীমকে জানাইয়া দেওয়া যে জরাসন্ধ কাহিল হইয়াছে। তাহা বুঝিতে পারিয়া ভীম বলিলেন, "হতভাগা এমনি কাপড় জড়াইয়াছে যে উহাকে বধ করা কঠিন দেখিতেছি।"

কৃষ্ণ বলিলেন, "তোমার জোর একবার ভালো করিয়া দেখাও না।"

তখন ভীম আগে জরাসন্ধকে শূন্যে তুলিয়া একশত পাক ঘুরাইলেন। তারপর হাঁটু দিয়া তাহার পিঠ ভাঙ্গিলেন। শেষে দুই পা ধরিয়া তাহাকে দুই ভাগে চিরিয়া ফেলিলেন। সে সময়ে জরাসন্ধের চিৎকারে অতি অল্প লোকই টিকিয়া থাকিতে পারিয়াছিল।

আর সেই বন্দী রাজাদের কথা কি বলিব? তাঁহারা দারুণ অপমান আর মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত, ইহার মধ্যে হঠাৎ তাঁহাদের সকল দুঃখ দূর হইয়া গেল। তাঁহারা কৃষ্ণ, ভীম আর অর্জুনের অশেষ স্তুতি করিয়া জোড়হাতে বলিলেন, "এখন আপনাদের এই ভৃত্যেরা আপনাদের কি সেবা করিবে, অনুমতি করুন।"

কৃষ্ণ বলিলেন, "মহারাজ যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করিতে চাহেন, আপনারা অনুগ্রহ করিয়া তাহাতে সাহায্য করিবেন।"

রাজারা পরম আনন্দের সহিত এ কথায় সম্মত হইলেন। জরাসন্ধের পুত্র সহদেব কৃষ্ণ আর ভীমার্জুনকে বিস্তর ধনরত্ন উপহার দিয়া বিনয়ের সহিত বলিলেন, "আমিও যজ্ঞে সাহায্য করিব।" তাঁহারা তাঁহাকে মগধের সিংহাসনে বসাইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরিলেন।

তারপর যজ্ঞের আয়োজন আরম্ভ হইল। রাজাদিগের নিকট হইতে কর আনাই প্রথম কাজ। এজন্য মহাবীর চারি ভাই অসংখ্য সৈন্য লইয়া চারিদিকে ছুটিয়া চলিলেন। অর্জুন উত্তরে, ভীম পূর্বদিকে, সহদেব দক্ষিণে, নকুল পশ্চিমে।

অর্জুন ক্রমে কুলন্দ, কালকূট, আনর্ত, শাকলদ্বীপ প্রভৃতি জয় করিয়া শেষে প্রাগ্‌জ্যোতিষ দেশে উপস্থিত হইলেন। সেখানকার রাজা ভগদত্ত কিরাত, চীন ও সাগরপারী সৈন্য লইয়া আটদিন তাঁহার সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করেন।

তারপর অর্জুনের ক্ষমতা আর সাহসে আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, "আমি ইন্দ্রের বন্ধু! লোকে বলে, আমার ইন্দ্রের সমান ক্ষমতা। কিন্তু তবুও তো তোমাকে কিছুতেই আঁটিতে পারিতেছি না! তুমি কি চাও?"

অর্জুন বলিলেন, "আপনি ইন্দ্রের বন্ধু, সুতরাং আমার গুরু লোক। আপনাকে কি আমি কিছু বলিতে পারি? আপনি স্নেহ করিয়া কিছু কর দিন।"

ভগদত্ত অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন, "কর তো দিবই। আর কি করিতে হইবে বল।"

এইরূপে ভগদত্তকে বশ করিয়া, অর্জুন আবার উত্তর দিকে চলিলেন। অন্তর্গিরি, বহির্গিরি, উলূক, কাশ্মীর, ত্রিগর্ত, দারু, কোকনদ, বাহ্লিক, দরদ, কাম্বোজ, লোহ, পরম, ঋষিক প্রভৃতি কত দেশ জয় হইল ; করই-বা কতরকম আদায় হইল। হিমালয় পর্বতের ওপারে কিম্পুরুষবর্ষ, হাটক প্রভৃতি কোনো দেশ হইতেই কর না লইয়া ছাড়া হইল না। তারপর অর্জুন উত্তর কুরুদেশে উপস্থিত হইলেন। সে অতি অদ্ভুত দেশ, সেখানে কোথায় কি আছে, কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না ; সুতরাং যুদ্ধ কি করিয়া হইবে? সেখানে তিনি উপস্থিত হইবামাত্র পর্বত প্রমাণ প্রহরীগণ আসিয়া হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে কহিল, "আপনি যে এখানে আসিয়াছেন, তাহাতেই বুঝিয়াছি যে আপনি সামান্য মানুষ নহেন। ইহাতেই আপনার এ দেশ জয় করা হইয়াছে। এখন আপনার কি চাই বলুন, আমরা তাহাই দিতেছি।"

অর্জুন বলিলেন, "মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের জন্য আমাকে কিছু কর দিলেই হইবে, আমি আর কিছু চাহি না।"

এই কথা শুনিয়াই উহারা নানারূপ আশ্চর্য কাপড় আর হরিণের ছাল প্রভৃতি আনিয়া অর্জুনের নিকট উপস্থিত করিল। এইরূপে ক্রমে সমস্ত উত্তর দিক জয় করিয়া অর্জুন কত ধনরত্ন যে দেশে আনিলেন, তাহার লেখাজোখা নাই।

ভীম পূর্বদিকে গিয়া, পাঞ্চাল বিদেই, গণ্ডক, দশার্ণ, অশ্বমেধ, পুলিন্দ, চেদী, কুমার, কোশল, অযোধ্যা, গোপালকক্ষ, মল্ল প্রভৃতি অল্পদিনের ভিতরেই জয় করিয়া ফেলিলেন।

ভল্লাট, শক্তিমান, বৎসদেশ, ভর্গ প্রভৃতি আরো কত দেশ দেখিতে দেখিতে তাঁহার বশে আসিল। কর্ণকেও যুদ্ধে পরাজয় করিয়া তাঁহার নিকট হইতে কর আনিতে বাকি রহিল না।

এইরূপে মণি-মুক্তা, চন্দন, কাপড়, কম্বল, সোনা, রূপা প্রভৃতি নানারূপ জিনিস আনিয়া ভীম ভাণ্ডার বোঝাই করিয়া ফেলিলেন।

সহদেবও সমস্ত দক্ষিণদিক জয় করিয়া কর আনিলেন। কিষ্কিন্ধ্যার বানরদিগের সহিত তাঁহার ক্রমাগত সাতদিন ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল ; তথাপি বানরেরা হটে নাই বা ভয় পায় নাই। কিন্তু সহদেবের যুদ্ধ দেখিয়া তাহারা বড়ই সন্তুষ্ট হইল। আর সহদেবকে অনেক ধনরত্ন দিয়া বলিল, "এ-সব লইয়া

তুমি এখান হইতে চলিয়া যাও। তোমার ভালো হউক।"

দক্ষিণে যাইতে যাইতে সহদেব শেষে সমুদ্রের ধারে উপস্থিত হ'ন। সেইখানে লঙ্কা; বিভীষণ তখনো সেখানে রাজত্ব করিতেছিলেন। এখানে কোনোরূপ যুদ্ধের প্রয়োজন হয় নাই; কারণ, বিভীষণ সংবাদ পাইবামাত্র আহ্লাদের সহিত বোঝায় বোঝায় মহামূল্য মণি-মুক্তা দিয়া সহদেবকে বিদায় করিলেন।

নকুলও পশ্চিমদিক হইতে কম কর আনেন নাই। একহাজার হাতি সে-সকল ধন অতিকষ্টে বহিয়া আনিয়াছিল।

যজ্ঞের সময় ক্রমে যতই কাছে আসিল, ততই নানা দেশের রাজারা, মুনিরা আর ব্রাহ্মণেরা দলে দলে উপস্থিত হইতে লাগিলেন।

কৃষ্ণ ইহার পূর্বেই আসিয়া, সকলরকম আয়োজন আরম্ভ করাইয়াছেন। রাজাদিগের নিকট নিমন্ত্রণ গিয়াছে, পুরোহিতেরা প্রস্তুত হইয়াছেন.; যজ্ঞের জন্য চমৎকার স্থান প্রস্তুত হইয়াছে; ভোজনের ঘটা লাগিয়া গিয়াছে।

নকুল হস্তিনায় গিয়া জোড়হাতে, মিষ্ট কথায়, ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, দুর্যোধন প্রভৃতিকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহারাও আনন্দের সহিত যজ্ঞে উপস্থিত হইয়াছেন। অন্য রাজারাজড়া কত আসিয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই। ইঁহাদের জন্য সুন্দর বাগানে ঘেরা, মণি-মুক্তার কাজ করা, সোনার দরজা জানালা দেওয়া বিশাল বিশাল পুরী পূর্বেই বহুমূল্য আসন, গালিচা, পালঙ্ক প্রভৃতি দিয়া সাজানো ছিল। মিঠাই মণ্ডার তো কথাই নাই। আর সুগন্ধের কথা কি বলিব! ফুলের গন্ধ, চন্দনের গন্ধ, ধূপের গন্ধ, লুচি সন্দেশের গন্ধ!

এক-একজন এক-একটা কাজে বিশেষ মজবুত; তাঁহাদের উপরে সেই সেই কাজের ভার পড়িয়াছে। দুঃশাসনের উপর খাবার জিনিস দেখাশুনার ভার; অশ্বত্থামার উপর ব্রাহ্মণদিগের আদর-যত্নের ভার; সঞ্জয়ের উপর রাজাদিগের সেবার ভার। ভীষ্ম, দ্রোণ কাজের হুকুম দিবেন; কৃপাচার্য ধনরত্ন রক্ষা করিবেন। উপহার আসিলে দুর্যোধন লইবেন; আর নিজে কৃষ্ণ ব্রাহ্মণদিগের পা ধোওয়ার ব্যবস্থা করিবেন।

ক্রমে যজ্ঞের পূজা অর্চনার কাজ শেষ হইয়া গেল। মহারাজ যুধিষ্ঠির, যে যাহা চাহিল, তাহাকে তাহাই দিয়া সন্তুষ্ট করিলেন।

তারপর ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, "রাজাদিগকে এবং যাঁহারা অর্ঘ্য (মান্য দেখাইবার জন্য উপহার) পাইবার উপযুক্ত, তাঁহাদিগকে এক-একটি করিয়া অর্ঘ্য আনিয়া দাও। তারপর এখানে যিনি সকলের চেয়ে বড় তাঁহাকে আর-একটি অর্ঘ্য দিতে হইবে।"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "সকলের বড় বলিয়া অর্ঘ্য কাহাকে দিব?"

ভীষ্ম বলিলেন, "কৃষ্ণই সকলের চেয়ে বড়। তাঁহার সমান মান্য লোক এখানে আর কেহই উপস্থিত নাই।"

তারপর ভীষ্মের কথায় সহদেব কৃষ্ণকে অর্ঘ্য আনিয়া দিলেন। কিন্তু চেদীর রাজা শিশুপালের ইহা কিছুতেই সহ্য হইল না। তিনি যুধিষ্ঠিরকেই-ব

কত বকিলেন, ভীষ্মেরই-বা কত নিন্দা করিলেন, আর কৃষ্ণকেইকেই-বা কত অপমানের কথা বলিলেন। তারপর আর-আর রাজাদিগকে লইয়া সেখান হইতে চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেও ছাড়িলেন না।

রাজাদের মধ্যে অনেকে শিশুপালের সঙ্গে জুটিয়া যজ্ঞ ভাঙিবার আর কৃষ্ণকে মারিবার জন্য পরামর্শ আরম্ভ করিলেন। যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম, ইঁহারা শিশুপালকে বুঝাইয়া থামাইতে পারিলেন না, তাহাতে সহদেব রাগিয়া বলিলেন, "যে কৃষ্ণের সম্মান সহ্য করিতে না পারে, আমি তাহার মাথায় পা তুলিয়া দিই।"

এইরূপ তর্ক আরম্ভ হইয়া ক্রমে বিষম কাণ্ড উপস্থিত হইল। কৃষ্ণের উপর শিশুপালের অনেকদিন হইতেই রাগ ছিল, আর তিনি নানারকমে তাঁহাকে অপমান করিতেও ত্রুটি করেন নাই। কৃষ্ণ এতদিন তাহা সহিয়া থাকিবার কারণ এই যে, তিনি শিশুপালের মায়ের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, 'আপনার পুত্রের একশত অপরাধ ক্ষমা করিব।'

শিশুপালের একশত অপরাধ ইহার পূর্বেই হইয়া গিয়াছে, সুতরাং আর তাঁহাকে ক্ষমা করিবার কোনো কারণ নাই।

শিশুপাল ভয়ানক অপমানের কথা বলিয়া কৃষ্ণকে গালি দিতে দিতে শেষে বলিলেন, "আইস! আজ তোমাকে আর পাণ্ডবদিগকে যমের বাড়ি পাঠাইতেছি!"

তখন কৃষ্ণ সভার সকলকে বলিলেন, "আমি অনেক সহিয়াছি; কিন্তু এতগুলি রাজার সম্মুখে এমন অপমান আমি কিছুতেই সহিতে পারিব না।"

তাহা শুনিয়া শিশুপাল হো হো শব্দে হাসিতে হাসিতে আরো বেশি অভদ্রভাবে কৃষ্ণকে গালি দিতে লাগিলেন।

এমন সময় চাকার মতন একটা অতি ভয়ংকর জিনিস সভায় আসিয়া উপস্থিত হইল! কৃষ্ণ তাহাকে হাতে করিয়া লইলেন। ইহা কৃষ্ণের সেই সুদর্শন চক্র নামক অস্ত্র, কৃষ্ণ তাহাকে মনে মনে ডাকাতে অমনি ছুটিয়া আসিয়াছে। আজ আর শিশুপালের রক্ষা নাই।

চক্র হাতে লইয়া কৃষ্ণ সকলকে বলিলেন, "এই দুষ্টের একশত অপরাধ ক্ষমা করিয়াছি, আর ক্ষমা করিব না। এই দেখুন, ইহাকে বধ করিলাম।"

এ কথা বলিবামাত্রই চক্র ছুটিয়া গিয়া শিশুপালের মাথা কাটিয়া ফেলিল। সভার সকল লোক পুতুলের ন্যায় দাঁড়াইয়া তাহা দেখিল, কাহারো মুখে কথা সরিল না।

এইরূপে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ শেষ হইল। তারপর রাজারা দেশে চলিয়া গেলেন।

সকলে চলিয়া গিয়াছেন, দুর্যোধন আর শকুনি তখনো যান নাই, তাঁহারা সভা দেখিতেছেন। এমন সভা দুর্যোধন আর কখনো দেখেন নাই; যত দেখেন, ততই তাঁহার ধাঁধা লাগিয়া যায়। ইহারই মধ্যে কয়েকবার তিনি স্ফটিকের মেঝেকে জল মনে করিয়া কাপড় গুটাইয়াছেন; আবার জলকে স্ফটিক ভাবিয়া, কাপড়-চোপড়সুদ্ধ তাহাতে হাবুডুবুও খাইয়াছেন। সকলে হাসিয়াছে ও যুধিষ্ঠিরের চাকরেরা তাড়াতাড়ি তাঁহাকে অন্য কাপড় আনিয়া দিয়াছে।

স্ফটিকের দেওয়াল, তাহাকে দুর্যোধন মনে করিলেন, বুঝি দরজা। তাহার ভিতর দিয়া বাহির হইতে গিয়া মাথায় ঠকাস্ করিয়া এমনি লাগিল যে, একেবারে মাথা ঘুরিয়া পড়িবার গতিক! তারপর বেচারার আর ভালো করিয়া চলিতেই ভরসা হয় না, খালি 'কানা মাছি ভোঁ ভোঁ'র মতন হওয়াতে হাত বুলাইতে বুলাইতে পা বাড়াইতেছেন। এমনি করিয়া শেষে একবার একেবারে বাহিরে গিয়া ধপাস্! তারপর দরজা দেখিলেই আগে থাকিতে দাঁড়ান!

বাস্তবিক এমন করিয়া নাকাল হইলে বড্ড রাগ হয়! অথচ সে রাগ দেখাইবার জো নাই, কারণ তাহাতে লোকে আরো হাসে। কাজেই দুর্যোধন জিব ঠোঁট কামড়াইয়া কোনোমতে রাগ হজম করিয়া সেখান হইতে বিদায় হইলেন। এদিকে কিন্তু হিংসায় তিনি জ্বলিয়া মরিতেছেন। পথে শকুনি তাঁহাকে কত কথা বলিয়াছেন, তিনি কিছুরই উত্তর দেন নাই। শেষে শকুনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে দুর্যোধন? কথা কহিতেছ না যে?"

দুর্যোধন বলিলেন, "মামা! কথা কহিব কোন লজ্জায়? আমার কি আর বাঁচিয়া লাভ আছে? যে শত্রুকে মারিতে এত চেষ্টা করিলাম, তাহারই কিনা শেষে এত বাড়াবাড়ি!"

শকুনি বলিলেন, "সে কি কথা দুর্যোধন? উহারা নিজের গুণে বড় হইয়াছে, তাহাতে তোমার দুঃখ কেন? ইচ্ছা করিলে তুমিও তো ঐরূপ করিতে পার।"

দুর্যোধন বলিলেন "মামা! যুদ্ধ করিয়া উহাদের সভা আর রাজ্য কাড়িয়া লই।"

শকুনি বলিলেন, "কৃষ্ণ, অর্জুন, ভীম, যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব, দ্রুপদ আর ধৃষ্টদ্যুম্ন ইঁহাদিগকে দেবতারাও যুদ্ধে পরাজয় করিতে পারেন না। তুমি কি করিয়া করিবে? ইঁহাদিগকে জব্দ করিবার অন্য উপায় আছে।"

দুর্যোধন বলিলেন, "কি উপায় মামা?"

শকুনি বলিলেন, "যুধিষ্ঠিরের পাশা খেলায় বড় সখ, অথচ তিনি ভালো খেলিতে জানেন না। আবার, পাশা খেলায় ডাকিলে তাঁহার 'না' বলিবারও জো থাকিবে না। একটিবার আনিয়া তাঁহাকে খেলিতে বসাইতে পারিলে, আমি ফাঁকি দিয়া তাঁহার রাজ্য-পাট সব জিতিয়া লইতে পারি। আমার মতো পাশা পৃথিবীতে কেহ খেলিতে জানে না। আগে তুমি তোমার বাবাকে বলিয়া খেলার অনুমতি লও, তারপর আমি সব ঠিক করিয়া দিব।"

দুর্যোধন বলিলেন, "আমার বাবাকে বলিতে সাহস হয় না, আপনি বলুন।"

শকুনি বাড়ি আসিয়াই ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন, "দুর্যোধন তো বড়ই রোগা হইয়া যাইতেছে! আপনি সে খবর নেন না?"

অমনি ধৃতরাষ্ট্র নিতান্ত ব্যস্ত হইয়া দুর্যোধনকে বলিলেন, "আহা! বাছার তো তবে বড়ই অসুখ হইয়াছে! কি অসুখ তোমার বাবা?"

দুর্যোধন বলিলেন, "বাবা! আমার ভয়ানক অসুখ হইয়াছে! আপনার চেয়ে পাণ্ডবেরা বড় হইয়া গেল, এ কথা ভাবিলে কি আর আমি ভালো থাকিতে পারি? উহাদের বাড়িতে রোজ দশহাজার লোক সোনার থালায় পোলাও খায়।

উহাদের মতো এত ধন ইন্দ্রেরও নাই, যমেরও নাই, বরুণেরও নাই, কুবেরেরও নাই। কাজেই আমার যারপরনাই ভয়ানক অসুখ হইয়াছে।"

তখন শকুনি বলিলেন, "আমি পাশা খেলিয়া উহাদের সব ধন জিতিয়া দিতে পারি। ক্ষত্রিয়কে যুদ্ধে বা পাশায় ডাকিলে তাহার 'না' বলিবার জো থাকে না। যুধিষ্ঠিরকে আমরা পাশায় ডাকিলে তাহার আসিতেই হইবে। অথচ সে খেলিতে জানে না, কাজেই আমি ফাঁকি দিয়া তাহার সর্বস্ব কাড়িয়া লইতে পারিব।"

এ কথায় ধৃতরাষ্ট্র সহজে রাজি হন নাই। তাঁহার নিজেরও এ কাজটা ভালো লাগিল না, তারপর বিদুরকে ডাকিলে, তিনিও বারবার নিষেধ করিলেন। কিন্তু দুর্যোধনের পীড়াপীড়িতে ধৃতরাষ্ট্র আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। আর তাঁহার নিজের মনেও পান্ডবদের প্রতি যথেষ্ট হিংসা ছিল। কাজেই তিনি শেষে বলিলেন, "হাজার থাম আর একশত দুয়ারওয়ালা একটা খুব জমকালো সভা প্রস্তুত করাও।"

সভা অল্পদিনের মধ্যেই প্রস্তুত হইল। তখন ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে বলিলেন, "বিদুর! শীঘ্র ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়া যুধিষ্ঠিরকে পাশা খেলিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া আইস।"

বিদুর বলিলেন, "মহারাজ! ইহা তো ভালো কথা হইল না। পাশা খেলা বড় অন্যায়। উহাতে বিবাদ উপস্থিত হইতে পারে।"

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, "কি হইবে? আমরা তো থাকিব। তুমি শীঘ্র যাও।"

বিদুর আর কি করেন? তিনি কাজেই ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, "ধৃতরাষ্ট্র তোমাকে পাশা খেলিতে ডাকিয়াছেন, তুমি চল।"

এ কথা শুনিয়া যুধিষ্ঠির বলিলেন, "কাকা, পাশা খেলা কি ভালো? আপনি কি অনুমতি করেন?"

বিদুর বলিলেন, "আমি অনেক নিষেধ করিয়াছিলাম, তথাপি আমাকে পাঠাইলেন। এখন তোমার যাহা ভালো মনে হয়, কর।"

যুধিষ্ঠির অনেক চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আমাকে যখন পাশা খেলিতে ডাকিয়াছে, তখন আর না গিয়া উপায় নাই। কিন্তু উহারা বড় ধূর্ত; খেলার সময় ফাঁকি দেয়। না যাইবার উপায় থাকিলে আমি কখনই যাইতাম না।"

পরদিন ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব, কুন্তী, দ্রৌপদী প্রভৃতিকে লইয়া যুধিষ্ঠির বিদুরের সহিত হস্তিনায় আসিলেন। তাহার পরের দিন সকালে খেলা হওয়ার কথা। এই খেলা পণ অর্থাৎ বাজি রাখিয়া হয়। খেলিবার পূর্বে কথা থাকে যে, 'আমি হারিলে তোমাকে এই জিনিস দিব, আর তুমি হারিলে আমাকে এই জিনিস দিবে।' এইভাবে যথা সময়ে খেলা আরম্ভ হইল।

যুধিষ্ঠিরের পাশা খেলা দেখিবার জন্য সভায় লোকের বড়ই ভিড় হইয়াছে। অনেক রাজা, ব্রাহ্মণ, পন্ডিত এবং সাধারণ লোক সেখানে উপস্থিত। পান্ডবেরা পাঁচ ভাই সভার মাঝখানে বসিয়াছেন, তাঁহাদের সামনেই শকুনিকে সর্দার করিয়া দুর্যোধনের দল। শকুনি বলিলেন, "যুধিষ্ঠির, সকলে বসিয়া আছেন, খেলা আরম্ভ কর।"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "তোমরা সরল ভাবে খেলা করিও, ফাঁকি দিও না যেন।"

শকুনি বলিলেন, "যাহার বেশি বুদ্ধি সেই ফাঁকি দেয়। ইহাতে দোষের কথা কি হইল? তোমার যদি ভয় থাকে, তবে নাহয় খেলিও না।"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "ডাকিয়াছ যখন, তখন খেলিতেই হইবে। কাহার সহিত খেলিব, বল।"

এ কথায় দুর্যোধন বলিলেন, "পণের জিনিস সব আমি দিব, কিন্তু আমার হইয়া মামা খেলিবেন।"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "একজনের হইয়া আর-একজনের খেলা অন্যায়। যাহা হউক, খেলা আরম্ভ কর।"

খেলা আরম্ভ হইলে পর ধৃতরাষ্ট্র সভায় আসিলেন। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বিদুর প্রভৃতিও দুঃখিত ভাবে তাঁহার সঙ্গে আসিলেন।

তারপর যুধিষ্ঠির দুর্যোধনকে বলিলেন, "আমার এই গলার হার পণ রাখিলাম, তুমি কি রাখিলে?"

দুর্যোধন বলিলেন, "আমারও ধনরত্ন অনেক আছে। এখন তুমি বাজি জিতিলেই হয়।"

এই কথা বলিতে বলিতেই অমনি শকুনি পাশা ফেলিলেন, "এই দেখ, জিতিলাম।" সকলে দেখিল বাস্তবিকই শকুনির জিত।

ইহাতে যুধিষ্ঠির বলিলেন, "আইস, আবার খেলিতেছি। এবারে এক লক্ষ আট হাজার সোনার কুম্ভ, আর আমার ভাণ্ডারের সকল ধনরত্ন পণ রহিল।"

শকুনি তখনই "এই জিতিলাম" বলিয়া সে-সব জিতিয়া লইলেন। তাঁহার ফাঁকি কেহ ধরিতে পারিল না।

হায় হায়! পাশায় কি সর্বনাশ হইল! যুধিষ্ঠির যত হারেন, ততই তাঁহার জেদ চড়িয়া যায়, আর ততই তিনি বলেন, "আরো খেলিব!" ধূর্ত শকুনির জুয়াচুরি কাহারো ধরিবার সাধ্য নাই। পণ রাখিবামাত্রই তিনি "এই জিতিলাম" বলিয়া পাশা ফেলেন, আর যুধিষ্ঠির হারিয়া যান।

এইরূপে ক্রমে তাঁহার দাসী গেল, চাকর গেল, হাতি গেল, ঘোড়া গেল, রথ গেল, সৈন্য গেল—সব গেল।

সর্বনাশ উপস্থিত দেখিয়া বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন, "মহারাজ! মরিবার সময় রোগী ঔষধ খাইতে চাহে না, আমার কথাও হয়তো আপনার ভালো লাগিবে না। দুর্যোধন যে মারা যাইবার জোগাড় করিতেছে, তাহা কি আপনি বুঝিতে পারিতেছেন না? পাণ্ডবেরা একবার ক্ষেপিয়া দাঁড়াইলে ছেলেপিলে চাকরবাকর সুদ্ধ যমের বাড়ি যাইতে হইবে। এই বেলা দুর্যোধনকে সাজা দিয়া পাণ্ডবদিগকে তুষ্ট করুন। একে তো পাশা খেলায় এত দোষ, তাহাতে শকুনি এমন জুয়াচোর, উহাকে শীঘ্র চলিয়া যাইতে বলুন।"

এ কথায় দুর্যোধন ক্রোধভরে বিদুরকে গালি দিতে আরম্ভ করিলে বিদুর বলিলেন, "তোমাদের ভালোর জন্যই দুটা কথা বলিয়াছিলাম। দেখিতেছি তাহা

তোমার পছন্দ হয় নাই। কাজ কি বাপু, তোমার যাহা খুশি তাহাই কর। তোমাকে নমস্কার!"

কাজেই আবার খেলা চলিল। যে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের মতো বিদ্বান, বুদ্ধিমান, আর ধার্মিক এই পৃথিবীতে ছিল না, সেই যুধিষ্ঠির পাশার ধাঁধায় পড়িয়া শেষে অবোধ মাতালের মতো কাজ করিতে লাগিলেন।

ধন গেলে গাই বাছুর, তারপর লোকজন, তারপর রাজ্য। এইরূপে সর্বস্ব হারিয়া ফকির হইয়াও চেতন্য নাই। শেষে একটি-একটি করিয়া ভাইদিগকে হারিতে লাগিলেন।

কি দুর্দশা! শেষে শকুনিই তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "পাশা খেলিতে গিয়া লোকে এমন পাগলামি করিতে পারে, এ কথা তো স্বপ্নেও জানিতাম না।"

কিন্তু ইহাতেও যুধিষ্ঠিরের দুর্গতির শেষ হয় নাই। ভাইদিগকে হারিয়া শেষে নিজেকে পর্যন্ত হারিলেন, তথাপি তাঁহার জেদ থামে না!

ভাবিতেও দুঃখ আর লজ্জা হয় ; যখন আর কিছুই অবশিষ্ট রহিল না তখন দয়া, ধর্ম, সদাচার সকল ভুলিয়া যুধিষ্ঠির বলিলেন, "এবার দ্রৌপদীকে পণ রাখিলাম।"

এ কথা শুনিবামাত্র সভার লোক 'ছি! ছি!' করিয়া উঠিল, রাজাগণের চোখে জল আসিল, লাজে দুঃখে আর অপমানে ভীষ্ম, দ্রোণ এবং কৃপের শরীর ঘামিয়া গেল ; বিদুর হেঁট মুখে বসিয়া সাপের মতন নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন।

ভালোলোকেদের মনে এইরূপ কষ্ট আর নির্লজ্জ ধৃতরাষ্ট্র আনন্দে অস্থির হইয়া বার বার জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "জয় হইল নাকি? জয় হইল নাকি?"

কর্ণ, দুঃশাসন প্রভৃতি তখন কিরূপ আনন্দ করিতেছিলেন তাহা ধৃতরাষ্ট্রের ব্যবহারেই বুঝিতে পার।

ধূর্ত শকুনি যখন পাশা ফেলিয়া দ্রৌপদীকে অবধি জিতিয়া লইলেন অমনি দুর্যোধন বিদুরকে বলিলেন, "শীঘ্র দ্রৌপদীকে লইয়া আইস, হতভাগী আমাদের চাকরানীদের সঙ্গে গিয়া ঘর ঝাঁট দিক।"

বিদুর বলিলেন, "মূর্খ! তোমার যে মরিবার গতিক হইয়াছে, এ কথা না বুঝিতে পারিয়াই তুমি এরূপ বলিতেছ। এমন কথা নিতান্ত নীচ লোক ছাড়া আর কেহ বলে না।"

ইহাতে দুর্যোধন বিদুরকে গালি দিয়া একটা দরোয়ানকে বলিলেন, "তুই দ্রৌপদীকে লইয়া আয়! তোর কোনো ভয় নাই।"

দরোয়ান দ্রৌপদীর নিকট গিয়া বলিল, "যুধিষ্ঠির পাশা খেলায় আপনাকে দুর্যোধনের নিকট হারিয়াছেন। আপনি আমার সঙ্গে চলুন, ধৃতরাষ্ট্রের ঘর ঝাঁট দিতে হইবে।"

এ কথায় দ্রৌপদী আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, "তুই একি পাগলের মতো কথা বলিতেছিস! রাজারা কি স্ত্রীকে পণ রাখিয়া খেলা করে? যুধিষ্ঠিরের কি আর জিনিস ছিল না?"

দরোয়ান বলিল, "যুধিষ্ঠির আগে ধনদৌলত, তারপর ভাইদিগকে, তারপর নিজেকে হারিয়া, শেষে আপনাকে হারিয়াছেন।"

দ্রৌপদী বলিলেন, "তুই সভায় গিয়া যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি আগে নিজেকে, কি আমাকে হারিয়াছেন।"

দরোয়ান আবার সভায় আসিয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিল, "দ্রৌপদী আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, আপনি কাহাকে আগে হারিয়াছেন ? আপনার নিজেকে, না দ্রৌপদীকে ?"

যুধিষ্ঠির চুপ করিয়া রহিলেন, এ কথার কোনো উত্তর দিলেন না। তখন দুর্যোধন বলিলেন, "দ্রৌপদীর কিছু জিজ্ঞাসা করিবার থাকে, এখানে আসিয়া জিজ্ঞাসা করুক।"

দরোয়ান নিতান্ত দুঃখিত হইয়া আবার দ্রৌপদীর নিকট গিয়া বলিল, "মা! এবার দেখিতেছি কৌরবদের সর্বনাশ হইবে। দুষ্ট দুর্যোধন আপনাকে সভায় ডাকিয়াছেন।"

দ্রৌপদী বলিলেন, "বাছা, ভগবানই সব করেন। এ সময়ে আমি যেন ধর্ম রাখিয়া চলিতে পারি। তুমি আর একটিবার সভায় গিয়া ধার্মিক গুরুজনদিগকে জিজ্ঞাসা কর, এখন আমার কি করা উচিত। তাঁহারা যাহা বলিবেন, আমি তাহাই করিব।"

দরোয়ান সভায় আসিয়া দ্রৌপদীর কথা বলিলে, সকলে মাথা হেঁট করিয়া রহিলেন। দুর্যোধনের ভয়ে কাহারো মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। সেই দুষ্ট আবার বলিল, "তুই দ্রৌপদীকে এখানে লইয়া আয়।"

দরোয়ান দুর্যোধনের চাকর, তথাপি সে তাঁহার কথায় কান না দিয়া আবার সকলকে জিজ্ঞাসা করিল, "আমি দ্রৌপদীকে কি বলিব ?"

তখন দুর্যোধন বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "এ বেটা দেখিতেছি বড়ই ভীতু! দুঃশাসন, তুমি গিয়া দ্রৌপদীকে লইয়া আইস।"

বলিবামাত্র সেই দুষ্ট দুই চোখ লাল করিয়া দ্রৌপদীর নিকট গিয়া বলিল, "আমরা তোমাকে জিতিয়া লইয়াছি। চল! সভায় চল!"

দুঃশাসনের ভাবগতিক দেখিয়া দ্রৌপদী ভয়ে তাড়াতাড়ি গান্ধারী প্রভৃতির নিকট আশ্রয় লইতে গেলেন। কিন্তু সেখানে পৌঁছিবার পূর্বেই দুরাত্মা তাঁহার চুলের মুঠি ধরিয়া টানিতে টানিতে তাঁহাকে সভায় লইয়া চলিল। তিনি ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে কত মিনতি করিয়া বলিলেন, "দুঃশাসন, তুমি আমাকে এমন করিয়া সভায় লইয়া যাইও না!" কিন্তু হায়! সে দুষ্টের মনে কিছুতেই দয়া হইল না। সে দাঁত কড়মড় করিয়া বলিল, "তোকে জিতিয়া লইয়াছি! এখন তো তুই আমাদের দাসী! চল্!" এই বলিয়া দুরাত্মা আরো নিষ্ঠুরভাবে তাঁহার চুল ধরিয়া টানিতে লাগিল।

হায় হায়! তখন কেহই সেই দুরাত্মার মাথা কাটিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিতে আসিলেন না! দ্রৌপদী "হা কৃষ্ণ! হা অর্জুন!" বলিয়া কত কাঁদিলেন, সকলই বৃথা হইল।

এইরূপে দুঃশাসন তাঁহাকে সভায় উপস্থিত করিলেও কেহই তাহাকে নিষেধ করিলেন না। তখন দ্রৌপদী বলিলেন, "ক্ষত্রিয়ের যে ধর্ম, আমার স্বামী তাহার মতোই কাজ করিয়াছেন, তাঁহার দোষ কি? কিন্তু এই দুরাত্মা আমাকে অপমান করিতেছে, দেখিয়াও যখন সভার সকলে চুপ করিয়া আছেন, তখন বুঝিলাম যে কুরুবংশের লোকেরা ধর্ম ভুলিয়া গিয়াছে, ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর, ইঁহাদের আর কিছু তেজ নাই।"

দ্রৌপদীর অপমানে পান্ডবেরা ক্রোধে অধীর হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের মুখে কথা নাই। এদিকে সেই পাষণ্ড দুঃশাসন দ্রৌপদীর চুল ধরিয়া টানিতে টানিতে তাঁহাকে অজ্ঞানপ্রায় করিয়া 'দাসী! দাসী!' বলিয়া হাসিতেছে, আর কর্ণ শকুনি বলিতেছেন, 'বেশ! বেশ!'

ভীষ্ম দ্রৌপদীকে বলিলেন, "যুধিষ্ঠির তোমাকে পণ রাখিয়া খেলিতে পারেন কি না, এ কথা আমি ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। তিনি অতিশয় ধার্মিক, কখনো অধর্মের কাজ করেন নাই। তিনি নিজেই শকুনির সহিত খেলিতে আসিয়াছেন, আর তোমার অপমান দেখিয়াও চুপ করিয়া আছেন। কাজেই আমি বুঝিতেছি না, কি বলিব।"

দ্রৌপদী বলিলেন, "উঁহাকে দুষ্টেরা ডাকিয়া আনিল, তথাপি কি করিয়া বলিতেছেন যে উনি নিজেই খেলিতে আসিয়াছেন? আর তাঁহাকে ফাঁকি দিয়া হারাইয়াছে! আপনাদের অনেকেরই পুত্র আর পুত্রবধূ আছেন, তাঁহাদের দিকে চাহিয়া আমার কথার বিচার করুন।" এই বলিয়া তিনি কাঁদিতে থাকিলে, দুঃশাসন তাঁহাকে আরো অপমান করিতে লাগিল।

তখন ভীম আর সহিতে না পারিয়া বলিলেন, "দেখ যুধিষ্ঠির! তোমার দোষেই দ্রৌপদীর এত অপমান হইল। যে হাতে তুমি পাশা খেলিয়াছ, সে হাত আজ পোড়াইয়া ফেলিব! সহদেব! শীঘ্র আগুন আন!"

অর্জুন তখনি ভীমকে বুঝাইয়া বলিলেন, "কর কি দাদা! চুপ চুপ! ক্ষত্রিয়ের ধর্ম রাখিতে গিয়াই উনি এরূপ করিয়াছেন, তাহা কি বুঝিতেছ না?"

ভীম বলিলেন, "ধর্ম রাখিতে গিয়াছিলেন বলিয়াই তো এতক্ষণ উঁহার হাত পোড়াই নাই।"

এমন সময় ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র বিকর্ণ বলিলেন, "আপনারা চুপ করিয়া আছেন কেন? দ্রৌপদীর কথার বিচার করুন। আমার তো বোধ হয় যুধিষ্ঠিরের দ্রৌপদীকে ওরূপ করিয়া পণ রাখার কোনো ক্ষমতা ছিল না! সুতরাং তিনি হারিলেও দ্রৌপদীর তাহা মানিয়া চলার কথা নহে।"

এ কথায় সভার লোক চিৎকার করিয়া বিকর্ণের প্রশংসা আর শকুনির নিন্দা করিতে লাগিল। কিন্তু কর্ণ বিকর্ণকে গালি দিয়া, দুঃশাসনকে বলিলেন, "দুঃশাসন, তুমি ইহাদের সকলের গায়ের কাপড় কাড়িয়া লও।"

এ কথা বলিবামাত্র পান্ডবেরা নিজ নিজ চাদর কয়খানি ছাড়িয়া দিলেন। দ্রৌপদীর গায়ের কাপড় দুঃশাসন নিজেই কাড়িয়া লইতে গিয়াছিল। কিন্তু কি আশ্চর্য! দেবতার কৃপায় সে সময়ে তাঁহার গায় এতই কাপড় হইল যে, দুঃশাসন

প্রাণপণে টানিয়াও তাহা শেষ করিতে পারে না। সে যত টানে, ততই লাল, নীল, হলদে, সোনালি, নানা রঙের হইয়া কাপড় বাড়িয়া যায়। শেষে অপ্রস্তুত হইয়া হতভাগা বসিয়া পড়িল।

এদিকে এই আশ্চর্য ব্যাপার দেখিয়া সভায় ঘোরতর কলরব উপস্থিত হইয়াছে। রাজাগণ দ্রৌপদীর প্রশংসা করিতে করিতে দুঃশাসনকে গালি দিতেছেন, আর ভীম রাগে অস্থির হইয়া কাঁপিতেছেন। তারপর সভার সকলকে ডাকিয়া তিনি বলিলেন, "তোমরা সকলে শোন! আমি ভীষণ যুদ্ধে এই দুরাত্মা দুঃশাসনের বুক চিরিয়া তাহার রক্ত খাইব, তবে ছাড়িব। যদি না খাই, তবে যেন আমার স্বর্গলাভ না হয়।"

এমন সময় বিদুর দু হাত তুলিয়া সকলকে থামাইয়া বলিলেন, "দ্রৌপদী এমন করিয়া কাঁদিতেছেন, তবুও আপনারা কথা কহিতেছেন না, একাজটা কি ভালো হইল? শীঘ্র ইঁহার কথার বিচার করুন।"

তথাপি সকলে চুপ করিয়া রহিলেন। তখন কর্ণের কথায় আবার দুরাত্মা দুঃশাসন দ্রৌপদীকে ঘরে লইয়া যাইবার জন্য টানাটানি করিতে লাগিল। এইরূপে তাহারা দ্রৌপদীকে কত অপমান, আর পাণ্ডবদিগকে কতপ্রকার বিদ্রূপ করিল, তাহা বলিয়া আর তোমাদিগকে কষ্ট দিব না। যুধিষ্ঠির, অর্জুন, নকুল আর সহদেব সমস্তই চুপ করিয়া সহ্য করিলেন। কিন্তু ভীম রাগী লোক, তিনি তাহা সহিতে পারিবেন কেন? যখন যুধিষ্ঠিরকে অপমান করিয়াও দুর্যোধনের মন উঠিল না, তখন হাসিতে হাসিতে আবার দ্রৌপদীকে পা দেখাইলেন—আবার তাহা দেখিয়া কর্ণ হাসিতে লাগিলেন—তখন ভীম আর কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি ভয়ংকর শব্দে সভা কাঁপাইয়া বলিলেন, "আমি যদি গদা দিয়া এই দুষ্টের ঊরু না ভাঙ্গি, তবে যেন আমার স্বর্গে যাওয়া না হয়!"

এতক্ষণে আর কাহারো বুঝিতে বাকি রহিল না যে এ-সকল ঘটনার ফল বড়ই ভয়ংকর হইবে। তখন ধৃতরাষ্ট্র প্রাণের ভয়ে আর নিন্দার ভয়ে দুর্যোধনকে তিরস্কার করিয়া দ্রৌপদীকে বলিলেন, "মা! তুমি আমার বধূগণের সকলের বড়। বল, তুমি কি চাহ।"

দ্রৌপদী বলিলেন, "যদি আপনার দয়া হইয়া থাকে, তবে যুধিষ্ঠিরকে ছাড়িয়া দিন।"

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, "তাহাই হইবে। তুমি আর কি চাহ, বল!"

দ্রৌপদী বলিলেন, "ভীম, অর্জুন, নকুল আর সহদেবকে তাঁহাদের অস্ত্র-শস্ত্র সুদ্ধ ছাড়িয়া দিন।"

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, "তাহাই হইবে। তুমি আর কি চাহ, বল!"

দ্রৌপদী বলিলেন, "আমি আর কিছুই চাহি না। ইঁহারা মুক্তি পাইলেই আমার সব পাওয়া হইল।"

তারপর যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন, "মহারাজ! এখন আমাদিগকে কি অনুমতি করেন?"

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, "তোমার মঙ্গল হউক। তুমি তোমার রাজ্যধন সমস্ত

লইয়া গিয়া সুখে রাজত্ব কর।"

এইরূপে যুধিষ্ঠির সেখান হইতে বিদায় হইয়া ইন্দ্রপ্রস্থ যাত্রা করিলেন। কিন্তু দুর্যোধন, কর্ণ আর শকুনির ইহা সহ্য হইবে কেন? তাঁহারা বলিলেন, "এত কষ্ট করিয়া যাহা জিতিলাম, এত সহজেই তাহা লইয়া যাইবে? এ কখনই হইতে পারে না।"

দুষ্ট লোকে না করিতে পারে এমন কাজ নাই। তিন দুষ্ট মিলিয়া তখনই আবার ধৃতরাষ্ট্রের মত ফিরাইয়া দিলেন; স্থির হইল, আবার যুধিষ্ঠিরকে পাশায় ডাকিতে হইবে। এবারের পণ বনবাস। যে হারিবে সে হরিণের ছাল পরিয়া তেরো বৎসর বনবাস করিবে। এই তেরো বৎসরের শেষ বৎসর অজ্ঞাতবাস, অর্থাৎ এমনভাবে লুকাইয়া থাকা, যেন কেহ সন্ধান না পায়। সন্ধান পাইলে আবার বারো বৎসর বনবাস। বনবাসের পরে অবশ্য আবার আসিয়া রাজ্য পাইবার কথা রহিল। কিন্তু দুর্যোধন স্থির করিয়া রাখিলেন যে, একবার পাণ্ডবদিগকে তাড়াইতে পারিলে আর তাঁহাদিগকে রাজ্যে ঢুকিতে দিবেন না।

ডাকিলেই যখন খেলিতে হইবে, তখন কাজেই যুধিষ্ঠিরকে আবার আসিতে হইল, আর সেই ধূর্ত শকুনির ফাঁকিতে হারিয়া তেরো বৎসরের জন্য বনেও যাইতে হইল! যাইবার সময় দুষ্টেরা সকলে মিলিয়া পাণ্ডবদিগকে কম বিদ্রূপ করে নাই। পাণ্ডবেরা তখন কিভাবে চলিতেছেন, দুর্যোধন কতই ভঙ্গিতে তাহার নকল করিলেন।

তাহাতে ভীম বলিলেন, "মূর্খ! তোমার বিদ্রূপে আমাদের কোনো ক্ষতি হইবে না। আমি আবার বলিতেছি, যুদ্ধের সময় তোমাকে বধ করিব, আর দুঃশাসনের বুক ভাঙিয়া রক্ত খাইব।"

অর্জুন বলিলেন, "আমি কর্ণকে মারিব। হিমালয়ও যদি নড়িয়া যায়, সূর্যও যদি নিভিয়া যায়, তথাপি আমার এ কথা মিথ্যা হইবে না।"

সহদেব শকুনিকে বলিলেন, "দুষ্ট! তুই নিশ্চয় জানিস, আমি তোকে বধ করিব।"

যুধিষ্ঠির সকলের নিকট, এমন-কি, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের নিকটেও বিনয়ের সহিত বিদায় চাহিয়া বলিলেন, "আবার আসিয়া আপনাদের সহিত দেখা করিব।" লজ্জায় কেহ তাঁহার কথার উত্তর দিতে পারিলেন না। কিন্তু মনে মনে সকলেই তাঁহাকে অনেক আশীর্বাদ করিলেন। বিদুর বলিলেন, "কুন্তী বনে গেলে বড় ক্লেশ পাইবেন, তাঁহাকে আমার নিকটে রাখিয়া যাও।"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "আমাদের পিতা নাই, আপনিই আমাদের পিতার মতন। আপনি যাহা বলিলেন, তাহাই হউক। আমাদিগকে আর কি উপদেশ দেন?"

বিদুর বলিলেন, "তোমাদের মতো ধার্মিক লোককে আর বেশি উপদেশ কি দিব? আশীর্বাদ করি, তোমাদের ভালো হউক।"

কুন্তীর নিকট বিদায় লইবার সময় সকলেরই খুব কষ্ট হইয়াছিল, বিশেষত কুন্তীর। তাঁহার কান্নায় বুঝি তখন পাষাণও গলিয়াছিল।

এইরূপে সকলের নিকট বিদায় হইয়া পাণ্ডবেরা দ্রৌপদী ও ধৌম্যের সহিত

বনবাসে যাত্রা করিলেন।

দুষ্ট দুঃশাসনের টানে দ্রৌপদীর মাথার বেণী খুলিয়া গিয়াছিল, সে বেণী আর তিনি বাঁধেন নাই; প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, এই দুরাত্মাগণের উচিত শাস্তি না হওয়া পর্যন্ত তাহা আর বাঁধিবেন না।

পাণ্ডবেরা চলিয়া গিয়াছেন, ধৃতরাষ্ট্র বিদুর প্রভৃতিকে লইয়া কথাবার্তা কহিতেছেন; এমন সময় হঠাৎ নারদ অন্যান্য অনেক মুনির সহিত তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "আজ হইতে তেরো বৎসর পরে, চতুর্দশ বৎসরে, দুর্যোধনের দোষে ভীমার্জুনের হাতে কৌরবদের সকলের মৃত্যু হইবে।"

এই বলিয়া নারদ চলিয়া গেলেন, আর ধৃতরাষ্ট্র বসিয়া নিজের দুর্বুদ্ধির কথা ভাবিতে লাগিলেন।



ণ্ডবেরা সকলের নিকট বিদায় হইয়া, অস্ত্র হাতে ক্রমাগত উত্তর দিকে চলিতে লাগিলেন। ইন্দ্রসেন প্রভৃতি চৌদ্দজন চাকরও সপরিবারে গাড়ি চড়িয়া তাঁহাদের সঙ্গে চলিল। তখন অনেক ধার্মিক ব্রাহ্মণ কৌরবদিগের উপরে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "এই দুষ্টগণের রাজ্যে বাস করিতে নাই, আমরাও পাণ্ডবদিগের সঙ্গে যাইব।"

এই-সকল ব্রাহ্মণকে সঙ্গে আসিতে দেখিয়া যুধিষ্ঠিরের আনন্দও হইল, কষ্টও হইল। নিজেদের এইরূপ অবস্থা, কি খাইবেন তাহার ঠিক নাই, তাহার মধ্যে রোজ এতগুলি ব্রাহ্মণের আহার জোগান তো সহজ কথা নহে; তাই যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগকে বিনয় করিয়া বলিলেন, "আপনারা আমাদিগকে এত স্নেহ করিয়া আমাদের সঙ্গে আসিয়াছেন, কিন্তু বনের ভিতরে আপনাদিগকে কি দিয়া খাওয়াইব, তাহা ভাবিয়া আমি অস্থির হইতেছি। আমাদের সঙ্গে আসিলে আপনাদের ক্লেশ হইবে, আপনারা ঘরে ফিরিয়া যান।"

ব্রাহ্মণেরা বলিলেন, "মহারাজ, আমরা আপনাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না। আমাদের আহারের জন্য আপনার কোনো চিন্তা নাই, আমরা নিজে ভিক্ষা করিয়া খাইব।"

এইরূপ অবস্থা দেখিয়া যুধিষ্ঠির ধৌম্যকে বলিলেন, "ইঁহাদিগকে খাইতে দিবার শক্তি আমার নাই, অথচ ইঁহাদিগকে ছাড়িতেও পারিতেছি না! এখন উপায় কি, বলুন।"

ধৌম্য বলিলেন, "মহারাজ, সূর্যের পূজা করুন; ইহার উপায় হইবে।"

এ কথায় যুধিষ্ঠির সূর্যের পূজা আরম্ভ করিলে, সূর্যদেব সেখানে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "মহারাজ, আমি তোমার পূজায় তুষ্ট হইয়া এই থালিখানা আনিয়াছি। আমার আশীর্বাদে, এবং এই থালির গুণে, বারো বৎসর তোমার অন্নের চিন্তা থাকিবে না। প্রতিদিন, দ্রৌপদী যতক্ষণ না আহার করিবেন, ততক্ষণ এই থালির নিকট ফল, ফুলুরি, মাংস, মিঠাই যত চাও ততই পাইবে। তেরো বৎসর পরে তোমার রাজ্য ফিরিয়া পাইবে।" এই বলিয়া তিনি আকাশে মিলাইয়া গেলেন।

সে আশ্চর্য থালি পাইয়া আর যুধিষ্ঠিরের কোনো চিন্তা রহিল না। বারো বৎসর পর্যন্ত, যতক্ষণ দ্রৌপদীর খাওয়া না হইত, ততক্ষণ উহা নানারূপ খাবার জিনিসে পরিপূর্ণ থাকিত। যত লোকই আসুক না কেন, উহা শেষ করিতে পারিত না। কিন্তু দ্রৌপদীর খাওয়া শেষ হওয়ামাত্রই সব ফুরাইয়া যাইত।

পাণ্ডবেরা প্রথমে যে বনে বাস করেন, তাহার নাম কাম্যক বন। সেইখানে একদিন বিদুর আসিয়া তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইলেন। দূর হইতে বিদুরকে দেখিয়া যুধিষ্ঠিরের ভয় হইয়াছিল, বুঝি-বা আবার পাশা খেলিবার ডাক আসে। কিন্তু বিদুর সেজন্য আসেন নাই। পাণ্ডবদিগের সহিত বন্ধুতা করার কথা বলাতে, ধৃতরাষ্ট্র রাগিয়া তাঁহাকে বলিয়াছেন, "তুমি এখান হইতে চলিয়া যাও। খালি পাণ্ডবদের হইয়া কথা বল, তোমার মন বড় কুটিল।" তাই বিদুর পাণ্ডবদিগকে খুঁজিতে খুঁজিতে কাম্যক বনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

এদিকে বিদুর চলিয়া আসাতে ধৃতরাষ্ট্র বড়ই কাতর হইয়া পড়িলেন। বিদুরকে তিনি ভালোবাসিতেন, আর বিদুরের মতন একজন বুদ্ধিমান লোক পাণ্ডবদের দলে গেলে তাঁহাদের বল খুবই বাড়িয়া যাইবে, ইহা ভাবিয়া তাঁহার যথেষ্ট হিংসাও হইয়াছিল। সুতরাং তিনি সঞ্জয়কে ডাকিয়া বলিলেন, "সঞ্জয়! শীঘ্র বিদুরকে ফিরাইয়া আন, নহিলে আমি বাঁচিব না।"

কাজেই আবার বিদুরকে ফিরিয়া আসিতে হইল। তাহা দেখিয়া দুর্যোধন বলিলেন, "ঐ দেখ, আপদ আবার আসিয়াছে। বন্ধুসকল! শীঘ্র একটা কিছু কর, নহিলে এ কখন বাবাকে দিয়া পাণ্ডবদিগকে ফিরাইয়া আনে তাহার ঠিক কি!"

কিন্তু কর্ণের এ কথা পছন্দ হইল না; তাঁহার ইচ্ছা, পাণ্ডবদিগকে এখনই গিয়া মারিয়া আসেন। কারণ, এখন তাঁহাদের দুঃখের অবস্থা; সহায় নাই, আর মনে কষ্ট, কাজেই তেজ কম। এইবেলা তাঁহাদিগকে মারিবার খুব সুবিধা।

এ কথায় সকলেই যারপরনাই উৎসাহের সহিত রথ সাজাইয়া পাণ্ডবদিগকে মারিতে চলিয়াছিল, ইহার মধ্যে হঠাৎ ব্যাসদেব সেখানে আসিয়া তাহাদিগকে থামাইয়া দিলেন।

এদিকে কাম্যক বনে পাণ্ডবদের কিরূপে দিন যাইতেছে? বনটি বড়ই ভয়ানক। রাক্ষসের ভয়ে মুনি-ঋষিরা সেখান হইতে পলাইয়া গিয়াছেন। পাণ্ডবেরা সেখানে গিয়াই দেখিলেন, ভয়ানক একটা রাক্ষস হাঁ করিয়া তাঁহাদের পথ আগলাইয়া গর্জন করিতেছে। দ্রৌপদী তো তাহাকে দেখিয়াই চক্ষু বুজিয়া পায় অজ্ঞান!

যুধিষ্ঠির রাক্ষসটাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে? তোমার কি কাজ করিতে হইবে বল।"

রাক্ষস বলিল, "আরুরুরে মুহি কিড়্মিড়্ রে! মোর নাম কিড়্মিড়্ আছে! বগ্গের ভাই। তোহরা কে বটেক্? তোন্দেরুরুকে মুহি মজ্জাসে খাবো!"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "কীর্মির! আমরা পাণ্ডুর পুত্র। আমাদের নাম



ণ্ডবেরা সকলের নিকট বিদায় হইয়া, অস্ত্র হাতে ক্রমাগত উত্তর দিকে চলিতে লাগিলেন। ইন্দ্রসেন প্রভৃতি চৌদ্দজন চাকরও সপরিবারে গাড়ি চড়িয়া তাঁহাদের সঙ্গে চলিল। তখন অনেক ধার্মিক ব্রাহ্মণ কৌরবদিগের উপরে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "এই দুষ্টগণের রাজ্যে বাস করিতে নাই, আমরাও পাণ্ডবদিগের সঙ্গে যাইব।"

এই-সকল ব্রাহ্মণকে সঙ্গে আসিতে দেখিয়া যুধিষ্ঠিরের আনন্দও হইল, কষ্টও হইল। নিজেদের এইরূপ অবস্থা, কি খাইবেন তাহার ঠিক নাই, তাহার মধ্যে রোজ এতগুলি ব্রাহ্মণের আহার জোগান তো সহজ কথা নহে; তাই যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগকে বিনয় করিয়া বলিলেন, "আপনারা আমাদিগকে এত স্নেহ করিয়া আমাদের সঙ্গে আসিয়াছেন, কিন্তু বনের ভিতরে আপনাদিগকে কি দিয়া খাওয়াইব, তাহা ভাবিয়া আমি অস্থির হইতেছি। আমাদের সঙ্গে আসিলে আপনাদের ক্লেশ হইবে, আপনারা ঘরে ফিরিয়া যান।"

ব্রাহ্মণেরা বলিলেন, "মহারাজ, আমরা আপনাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না। আমাদের আহারের জন্য আপনার কোনো চিন্তা নাই, আমরা নিজে ভিক্ষা করিয়া খাইব।"

এইরূপ অবস্থা দেখিয়া যুধিষ্ঠির ধৌম্যকে বলিলেন, "ইঁহাদিগকে খাইতে দিবার শক্তি আমার নাই, অথচ ইঁহাদিগকে ছাড়িতেও পারিতেছি না! এখন উপায় কি, বলুন।"

ধৌম্য বলিলেন, "মহারাজ, সূর্যের পূজা করুন; ইহার উপায় হইবে।"

এ কথায় যুধিষ্ঠির সূর্যের পূজা আরম্ভ করিলে, সূর্যদেব সেখানে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "মহারাজ, আমি তোমার পূজায় তুষ্ট হইয়া এই থালি-খানা আনিয়াছি। আমার আশীর্বাদে, এবং এই থালির গুণে, বারো বৎসর তোমার অন্নের চিন্তা থাকিবে না। প্রতিদিন, দ্রৌপদী যতক্ষণ না আহার করিবেন, ততক্ষণ এই থালির নিকট ফল, ফুলুরি, মাংস, মিঠাই যত চাও ততই পাইবে। তেরো বৎসর পরে তোমার রাজ্য ফিরিয়া পাইবে।" এই বলিয়া তিনি আকাশে মিলাইয়া গেলেন।

সে আশ্চর্য থালি পাইয়া আর যুধিষ্ঠিরের কোনো চিন্তা রহিল না। বারো বৎসর পর্যন্ত, যতক্ষণ দ্রৌপদীর খাওয়া না হইত, ততক্ষণ উহা নানারূপ খাবার জিনিসে পরিপূর্ণ থাকিত। যত লোকই আসুক না কেন, উহা শেষ করিতে পারিত না। কিন্তু দ্রৌপদীর খাওয়া শেষ হওয়ামাত্রই সব ফুরাইয়া যাইত।

পাণ্ডবেরা প্রথমে যে বনে বাস করেন, তাহার নাম কাম্যক বন। সেইখানে একদিন বিদুর আসিয়া তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইলেন। দূর হইতে বিদুরকে দেখিয়া যুধিষ্ঠিরের ভয় হইয়াছিল, বুঝি-বা আবার পাশা খেলিবার ডাক আসে। কিন্তু বিদুর সেজন্য আসেন নাই। পাণ্ডবদিগের সহিত বন্ধুতা করার কথা বলাতে, ধৃতরাষ্ট্র রাগিয়া তাঁহাকে বলিয়াছেন, "তুমি এখান হইতে চলিয়া যাও। খালি পাণ্ডবদের হইয়া কথা বল, তোমার মন বড় কুটিল।" তাই বিদুর পাণ্ডবদিগকে খুঁজিতে খুঁজিতে কাম্যক বনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

এদিকে বিদুর চলিয়া আসাতে ধৃতরাষ্ট্র বড়ই কাতর হইয়া পড়িলেন। বিদুরকে তিনি ভালোবাসিতেন, আর বিদুরের মতন একজন বুদ্ধিমান লোক পাণ্ডবদের দলে গেলে তাঁহাদের বল খুবই বাড়িয়া যাইবে, ইহা ভাবিয়া তাঁহার যথেষ্ট হিংসাও হইয়াছিল। সুতরাং তিনি সঞ্জয়কে ডাকিয়া বলিলেন, "সঞ্জয়! শীঘ্র বিদুরকে ফিরাইয়া আন, নহিলে আমি বাঁচিব না।"

কাজেই আবার বিদুরকে ফিরিয়া আসিতে হইল। তাহা দেখিয়া দুর্যোধন বলিলেন, "ঐ দেখ, আপদ আবার আসিয়াছে। বন্ধুসকল! শীঘ্র একটা কিছু কর, নহিলে এ কখন বাবাকে দিয়া পাণ্ডবদিগকে ফিরাইয়া আনে তাহার ঠিক কি!"

কিন্তু কর্ণের এ কথা পছন্দ হইল না; তাঁহার ইচ্ছা, পাণ্ডবদিগকে এখনই গিয়া মারিয়া আসেন। কারণ, এখন তাঁহাদের দুঃখের অবস্থা; সহায় নাই, আর মনে কষ্ট, কাজেই তেজ কম। এইবেলা তাঁহাদিগকে মারিবার খুব সুবিধা।

এ কথায় সকলেই যারপরনাই উৎসাহের সহিত রথ সাজাইয়া পাণ্ডবদিগকে মারিতে চলিয়াছিল, ইহার মধ্যে হঠাৎ ব্যাসদেব সেখানে আসিয়া তাহাদিগকে থামাইয়া দিলেন।

এদিকে কাম্যক বনে পাণ্ডবদের কিরূপে দিন যাইতেছে? বনটি বড়ই ভয়ানক। রাক্ষসের ভয়ে মুনি-ঋষিরা সেখান হইতে পলাইয়া গিয়াছেন। পাণ্ডবেরা সেখানে গিয়াই দেখিলেন, ভয়ানক একটা রাক্ষস হাঁ করিয়া তাঁহাদের পথ আগলাইয়া গর্জন করিতেছে। দ্রৌপদী তো তাহাকে দেখিয়াই চক্ষু বুজিয়া পায় অজ্ঞান!

যুধিষ্ঠির রাক্ষসটাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে? তোমার কি কাজ করিতে হইবে বল।"

রাক্ষস বলিল, "আর্‌র্‌রে মুহি কিড়্‌ম্মিড়্‌ড়্‌ রে! মোর নাম কিড়্‌ম্মিড়্‌ড়্‌ আছে! বগ্‌গেব ভাই। তোহরা কে বটেক্? তোন্দের্‌র্‌কে মুহি মজ্জাসে খাবো!"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "কীর্মির! আমরা পাণ্ডুর পুত্র। আমাদের নাম

যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল আর সহদেব।" ভীমের নাম শুনিয়াই রাক্ষস বলিল, "হুঁ—অ—অঃ? বুভীম্? কোন্ বেটা বুভীম্ রে? ওহারুকেই তো মুহি আগ্গেমে খাবো। বেট্টা মোর ভাইটাকে মারিলেক।"

ভীমের তাহাতে ভয় পাওয়ার কোনো কথাই নাই; তিনি ইহার পূর্বেই একটা গাছ লইয়া প্রস্তুত আছেন। তারপর যুদ্ধটাও খুব জমাটরকমই হইল, তাহার কথা আর বাড়াইয়া বলিবার দরকার নাই। এ রাক্ষসটা খুব জোয়ান; হাত দিয়া, দাঁত দিয়া, নখ দিয়া, পাথর ছুঁড়িয়া, সে অনেকক্ষণ যুদ্ধ করিল। শেষে ভীম তাহার হাত-পা মোচড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে বন্ বন্ শব্দে ঘুরাইতে আরম্ভ করিলে সে চ্যাঁচাইতে চ্যাঁচাইতে অজ্ঞান হইয়া গেল। তারপর তাহার গলায় ভীমের হাতের দুই টিপ পড়িতেই কার্য শেষ।

পান্ডবদের বনবাসের সংবাদে সকলে নিতান্তই দুঃখিত হইলেন। কৃষ্ণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি যদুবংশের আর পাঞ্চাল দেশের আত্মীয়েরা এবং আরো অনেকে তাঁহাদিগকে দেখিতে আসিয়া আক্ষেপ করিতে করিতে কৌরবদিগকে অনেক ধিক্কার দিলেন। উঁহারা সকলেই বলিলেন, "এই দুষ্টদিগকে মারিয়া আমরা আবার যুধিষ্ঠিরকে রাজা করিব।"

মুনি-ঋষিরা সর্বদাই পান্ডবদিগকে দেখিতে আসিতেন। সাধারণ লোকেরাও দলে দলে তাঁহাদিগকে দেখিতে আসিয়া তাঁহাদের সঙ্গে সেই বনেই থাকিয়া যাইত।

কাম্যক বনেই যে তাঁহারা আগাগোড়া ছিলেন, তাহা নহে, কখনো কাম্যক বনে, কখনো দ্বৈত বনে, কখনো-বা নানান্ তীর্থে, এইরূপে ঘুরিয়া ফিরিয়া তাঁহারা সময় কাটাইতেন। একস্থানে অধিক দিন থাকিলে ফল-মূল মিলানো কঠিন হয়, শিকারও ফুরাইয়া যায়; কাজেই ঘুরিয়া বেড়াইবার বিশেষ দরকার ছিল।

বনে থাকায় খুবই কষ্ট তাহাতে সন্দেহ কি? আর শত্রুদিগকে সাজা দিবার ইচ্ছাও সকলেরই হয়। সুতরাং দ্রৌপদী যে পান্ডবদিগের দুঃখ দেখিয়া কাতর হইবেন, আর শত্রুদিগকে তাড়াইয়া নিজের রাজ্য লইবার জন্য যুধিষ্ঠিরকে বার বার পীড়াপীড়ি করিবেন, ইহা আশ্চর্য নহে। এ-সকল সময়ে ভীম সর্বদাই দ্রৌপদীর কথায় সায় দিতেন। কিন্তু যুধিষ্ঠির তাহাতে ব্যস্ত না হইয়া, মিষ্ট কথায় তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিতেন যে, উহারা অন্যায় কাজ করিয়াছে বলিয়া পান্ডবদিগেরও তাহা করা উচিত নহে। ক্ষমা করাই যথার্থ ধর্ম, রাগের বশ হইয়া কাজ করিলে ধর্ম নষ্ট হয়।

তাহা ছাড়া, যুধিষ্ঠির বেশ জানিতেন যে, দুর্যোধনের পক্ষে কর্ণ প্রভৃতি বড়-বড় যে-সকল বীর আছেন, তাঁহাদিগকে ইচ্ছা করিলেই হারাইয়া দেওয়া যায় না। ইহার জন্য বিশেষ আয়োজন চাই। তাই তিনি ভীমকে বলিতেন, "ভাই! কর্ণ যে কত বড় যোদ্ধা, এ কথা ভাবিয়া আমার ঘুম হয় না।"

এ কথার উত্তর দেওয়া ভীমের পক্ষেও সহজ ছিল না, তাই তিনি মুখভার করিয়া চুপ করিয়া থাকিতেন।

এই সময়ে ব্যাসদেব পাণ্ডবদিগকে দেখিতে আসেন। তিনি যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, "তোমাকে প্রতিস্মৃতি নামক বিদ্যা শিখাইয়া দিতেছি। তুমি অর্জুনকে ইহা শিখাইবে। ইহার গুণে তিনি মহাদেব, ইন্দ্র, যম, বরুণ, কুবের প্রভৃতি দেবতাকে তপস্যায় তুষ্ট করিয়া সহজেই বড়-বড় অস্ত্রলাভ করিতে পারিবেন।"

এই বিদ্যা পাইয়া পাণ্ডবদের মনে খুবই আশা হইল। যুধিষ্ঠিরের নিকট ইহা শিখিবার পর অর্জুন তখনই তপস্যায় বাহির হইতে আর বিলম্ব করিলেন না। কবচ, গাণ্ডীব, অক্ষয় তূণ প্রভৃতি লইয়া তপস্যায় বাহির হইলেন। যাত্রা করিবার সময় সকলে তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্বাদ করিলেন, "তোমার সিদ্ধিলাভ হউক।"

তারপর হিমালয় আর গন্ধমাদন পর্বত পার হইয়া ইন্দ্রকীল নামক পর্বতে উপস্থিত হইলেন। এমন সময় কোথা হইতে একটি কৃষ্ণকায় তপস্বী আসিয়া তাঁহাকে বাধা দিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "কে হে তুমি, ধনুর্বাণ লইয়া এখানে আসিয়াছ? এখানে ধনুর্বাণ দিয়া কি করিবে? উহা ফেলিয়া দাও!"

অর্জুন ইহাতে ধনুক বাণ না ফেলায় তপস্বী খুশি হইয়া বলিলেন, "বাছা, বর লও। আমি ইন্দ্র।"

অর্জুন জোড়হাতে ইন্দ্রকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "আপনার নিকট অস্ত্র-শিক্ষা করিতে আসিয়াছি। দয়া করিয়া আমাকে সেই বর দিন।"

ইন্দ্র বলিলেন, "আগে শিবকে সন্তুষ্ট কর, তারপর অস্ত্র পাইবে।" এই বলিয়া ইন্দ্র চলিয়া গেলেন, অর্জুনও হিমালয়ের নিকটে আসিয়া শিবের তপস্যা আরম্ভ করিলেন।

ক্রমাগত চারি মাস ধরিয়া তিনি অতি ভয়ংকর তপস্যা করিয়াছিলেন। প্রথম মাসে তিনদিন অন্তর আহার করিতেন, দ্বিতীয় মাসে ছয়দিন অন্তর, তৃতীয় মাসে পনেরো দিন অন্তর। চতুর্থ মাসে কেবল বাতাস ভিন্ন আর কিছুই খান নাই; অঙ্গুষ্ঠমাত্র ভর করিয়া ঊর্ধ্ব হস্তে, সারাটি মাস দাঁড়াইয়া, কেবলই তপস্যা করিয়াছিলেন।

এদিকে সেখানকার মুনি-ঋষিগণের মনে বড়ই ভাবনা উপস্থিত! অর্জুনের সেই ভয়ানক তপস্যার তেজে ইহারই মধ্যে চারিদিক ধোঁয়ার মতো হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহারা সকলে ব্যস্তভাবে শিবের নিকট গিয়া বলিলেন, "প্রভো! আমরা অর্জুনের তপস্যার তেজ সহিতে পারিতেছি না। ইঁহাকে শীঘ্র থামাইয়া দিন।"

মহাদেব কহিলেন, "তোমরা ব্যস্ত হইও না। আমি আজই অর্জুনকে সন্তুষ্ট করিয়া দিতেছি।" সুতরাং মুনিরা নিশ্চিন্ত মনে ঘরে ফিরিয়া গেলেন।

ততক্ষণে শিব আর দুর্গাও কিরাত-কিরাতিনীর বেশে অর্জুনের তপস্যার স্থানে গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ভূতগুলিও নানা সাজে সঙ্গে চলিয়াছে।

এদিকে আবার কোথাকার একটা দানব শূকর সাজিয়া অর্জুনকে মারিতে আসিয়াছে, অর্জুনও গাণ্ডীব টানিয়া তাহাকে বধ করিতে প্রস্তুত। এমন সময় ব্যাধের বেশে মহাদেব আসিয়া তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, "আরে থামো

ঠাকুর! আমি আগে নিশানা করিয়াছি (ধনুক উঠাইয়াছি)।"

সামান্য ব্যাধের কথা অর্জুনের গ্রাহ্যই হইল না। তিনি তাহা তুচ্ছ করিয়া শূকরের উপর তীর ছুঁড়িলেন। ব্যাধও ঠিক তাহার সঙ্গে সঙ্গেই এক তীর ছুঁড়িল। এখন এই কথা লইয়া দুজনে ভয়ানক তর্ক উপস্থিত।



অর্জুন বলিলেন, "আমার শিকারে তুমি কেন তীর ছুঁড়িতে গেলে? দাঁড়াও, তোমাকে সাজা দিতেছি।"

ব্যাধ হাসিতে হাসিতে বলিল, "আমি আগে নিশানা করিয়াছিলাম, আমার

তীরেই শূকর মরিয়াছে! তুমি দেখিতেছি বেয়াদব! দাঁড়াও তোমাকে সাজা দিতেছি।”

এ কথায় অর্জুন বিষম রাগিয়া ব্যাধের উপরে কতই বাণ মারিলেন। ব্যাধ বাণ খাইয়া খালি হাসে, আর বলে, “আরো মার্! দেখি তোর কত অস্ত্র আছে!'

অর্জুনের যত বড়-বড় বাণ আর ভারি-ভারি অস্ত্র ছিল, তিনি তাহার কোনোটাই ছুঁড়িতে বাকি রাখিলেন না। ব্যাধ বাণ খায়, আর কেবলই হাসে। অর্জুনের এমন যে অক্ষয় তূণ, ক্রমে তাহাও খালি হইয়া গেল। কিরাত তাহার সকল বাণ গিলিয়া খাইয়া তখনো হাসিতেছে! বাণ ফুরাইলে অর্জুন গাণ্ডীব দিয়াই কিরাতকে মারিতে গেলেন, সে সর্বনেশে মানুষ তাহাও কাড়িয়া লইল! তারপর খড়্গ লইয়া দু হাতে কিরাতের মাথায় মারিলেন, খড়্গ দুখানা হইয়া গেল! সকল অস্ত্র শেষ হইলে গাছ পাথর ছুঁড়িতে লাগিলেন, তাহাতেও কিছু ফল হইল না। শেষে ভয়ানক রাগের ভরে কিরাতকে জড়াইয়া ধরিতে গেলে, সে তাঁহাকে ধরিয়া এমনি চাপিয়া দিল যে, তাহাতে তিনি একেবারে অজ্ঞান হইয়া গেলেন।

জ্ঞান হইলে অর্জুন মাটির শিব গড়িয়া, ফুলের মালা দিয়া তাহার পূজা করিতে বসিলেন। সেই ফুলের মালা অর্জুনের গড়া শিবে না পড়িয়া, একেবারে সেই কিরাতের মাথায় গিয়া উপস্থিত! তাহা দেখিয়া অর্জুনও তাড়াতাড়ি তাহার পায়ে গিয়া পড়িলেন। কারণ, তখন আর তাঁহার বুঝিতে বাকি রহিল না যে, 'এ ব্যাধ নয়, স্বয়ং শিব।' অর্জুন বলিলেন, “প্রভো, না জানিয়া যুদ্ধ করিয়াছি. অপরাধ ক্ষমা করুন।”

মহাদেব বলিলেন, “অর্জুন! আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি। এই লও, তোমার গাণ্ডীব। তোমার তূণও আবার অক্ষয় হইল। তুমি যথার্থ বীর পুরুষ, এখন বর লও।”

অর্জুন বলিলেন, “দয়া করিয়া আমাকে আপনার পাশুপত নামক অস্ত্র দান করুন।”

তখন মহাদেব তাঁহাকে সেই অস্ত্র দিয়া, তাহা ছাড়িবার এবং থামাইবার মন্ত্র শিখাইয়া দিলেন ; সেই ভয়ংকর অস্ত্রের তেজে তখন ভূমিকম্প আর বজ্রপাতের মতো শব্দ হইয়াছিল।

অর্জুনকে অস্ত্র দিয়া মহাদেব চলিয়া গেলে পর, বরুণ, কুবের, যম আর ইন্দ্রও সেখানে আসিয়া তাঁহাকে নানারূপ অস্ত্র দিলেন। যমের দণ্ড, বরুণের পাশ, প্রভৃতি অতি আশ্চর্য এবং ভয়ংকর অস্ত্র। এ অস্ত্রসকল তো অর্জুন পাইলেনই, তারপর স্বর্গে গিয়া ইন্দ্রের এবং দেবতাদিগের নিকটে কত আদর. কত মান্য, কত শিক্ষা পাইলেন, তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। ইন্দ্রের নিকটে যে-সকল আশ্চর্য অস্ত্র পাইয়াছিলেন, তাহা দ্বারা অর্জুন নিবাত কবচ নামক দৈত্যদিগকে বধ করেন। তাহাতে দেবতাদের অনেক উপকার হয়। ইহা ছাড়া চিত্রসেন নামক গন্ধর্বের নিকট শিক্ষা করিয়া, তিনি সংগীত বিদ্যায় অসাধারণ পণ্ডিত হইয়াছিলেন, আর ইহাতে তাঁহার কত উপকার হইয়াছিল. তাহা শীঘ্রই

দেখিতে পাইবে। এইরূপে স্বর্গে তাঁহার পাঁচ বৎসর পরম সুখে কাটিয়া যায়।

এদিকে কাম্যক বনে পাণ্ডবেরা অর্জুনের কথা ভাবিতে ভাবিতে নিতান্ত দুঃখিতভাবে দিন কাটাইতেছেন। তিনি কোথায় কিভাবে আছেন, কত দিনে ফিরিবেন, কিছুই তাঁহাদের জানা নাই, সুতরাং দুঃখ হইবারই কথা। মাঝে মাঝে কোনো ধার্মিক মুনি-ঋষি আসিলে, তাঁহার সহিত কথাবার্তায় কয়েকদিন তাঁহাদের মন একটু ভালো থাকে। একবার বৃহদশ্ব মুনি আসিয়া তাঁহাদের নিকট কিছুদিন রহিলেন। ইনি আশ্চর্যরকম পাশা খেলা জানিতেন। এই সুযোগে তাঁহার নিকট খুব ভালো করিয়া সেই খেলা শিখিয়া লওয়ায়, যুধিষ্ঠিরের অনেক উপকার হইল।

ইহার কিছুদিন পরে লোমশ মুনি স্বর্গ হইতে অর্জুনের সংবাদ লইয়া কাম্যক বনে আসেন। তাঁহার নিকটে সকল কথা শুনিয়া অর্জুনের সম্বন্ধে পাণ্ডবদের ভয় দূর হইল।

লোমশ বলিলেন যে, 'অর্জুন পাণ্ডবদিগকে নানারূপ তীর্থ দেখিয়া বেড়াইতে বলিয়াছেন।' সুতরাং তাঁহারা লোমশ মুনির সঙ্গেই তীর্থ ভ্রমণে বাহির হইলেন। ভারতবর্ষের প্রায় কোনো তীর্থই তাঁহারা দেখিতে বাকি রাখিলেন না। প্রভাস নামক তীর্থে কৃষ্ণ বলরাম প্রভৃতির সহিত তাঁহাদের দেখা হইল। সেই সময়ে যদুবংশের সকলে পাণ্ডবদিগের দুঃখে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যত শীঘ্র পারেন তাঁহারা কৌরবদিগকে মারিয়া পাণ্ডবদিগকে রাজা করিবেন। তাঁহারা তখনই যুদ্ধ আরম্ভ করিতে প্রস্তুত ছিলেন, কৃষ্ণ অনেক বলিয়া কহিয়া তাঁহাদিগকে থামাইয়া রাখিলেন। কারণ, পাণ্ডবেরা নিজের কথামত বনবাস শেষ না করিয়া কিছুতেই রাজ্য লইতে সম্মত হইতেন না।

এইরূপে তীর্থ দেখিতে দেখিতে ক্রমে তাঁহারা কৈলাস পর্বতের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এ-সকল স্থান অতি ভয়ানক। একে তো পর্বতের উপর দিয়া চলাই খুব কঠিন, তাহাতে আবার রক্ষ রাক্ষসেরা ক্রমাগত সেখানে পাহারা দেয়। সুতরাং ভয়ের কথাই বটে, এ সময়ে ভীম সকলকে সাহস দিয়া বলিলেন, "ভয় কি? চলিতে না পারিলে আমি পিঠে করিয়া লইব।"

পাণ্ডবেরা গন্ধমাদন পর্বতে উঠিবামাত্র ভয়ানক ঝড় উপস্থিত হইল। ঘোরতর গর্জনে হাওয়া চলিয়াছে, পাথর ছুটিয়া আসিতেছে, চারিদিক অন্ধকার, প্রাণ থাকে কি যায়। ভীম অনেক কষ্টে দ্রৌপদীকে লইয়া একটা গাছ ধরিয়া রহিলেন। অন্যেরাও কেহ গাছ ধরিয়া, কেহ উইঢিপি আঁকড়াইয়া, কেহ-বা গুহার ভিতর ঢুকিয়া প্রাণ বাঁচাইলেন। এত শ্রম আর কষ্টের পর দ্রৌপদীর আর চলিবার শক্তি রহিল না। তাঁহার দুঃখে অন্য সকলেরও দুঃখের একশেষ হইল। তখন ভীম মনে মনে ঘটোৎকচকে ডাকিলেন। ডাকিবামাত্র ঘটোৎকচ অনেক রাক্ষস-সহ আসিয়া বলিল, "বাবা! কেন ডাকিতেছ? কি করিতে হইবে?"

ভীম বলিলেন, "বাছা! দ্রৌপদী চলিতে পারিতেছেন না, তাঁহাকে বহিয়া লইয়া চল।"

ঘটোৎকচ তখনই দ্রৌপদীকে আর তাহার সঙ্গের রাক্ষসেরা অন্য সকলকে

কাঁধে লইয়া চলিল। ইহাদের সাহায্য না পাইলে পাণ্ডবদিগের খুবই কষ্ট হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। উহারা তাঁহাদিগকে অনেক কঠিন স্থান পার করিয়া বদরী নামক তীর্থে পৌঁছাইয়া দিল। এই স্থানের নিকট হইতেই অর্জুন স্বর্গে গিয়াছিলেন, আর এখানেই তাঁহার ফিরিয়া আসিবার কথা। সুতরাং পাণ্ডবেরা এইখানে তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

ইহার মধ্যে একদিন কোথা হইতে এক আশ্চর্য পদ্মফুল আসিয়া দ্রৌপদীর নিকট পড়িল। সে ফুলের এমনি চমৎকার গন্ধ যে তাহা নাকে ঢুকিবামাত্র প্রাণ ঠাণ্ডা হইয়া যায়। দ্রৌপদী ফুলটি পাইয়া ভীমকে বলিলেন, "কি চমৎকার ফুল! আমাকে এইরূপ আরো অনেকগুলি ফুল আনিয়া দিতে হইবে। আমি কাম্যক বনে লইয়া যাইব।"

এ কথায় ভীম আহ্লাদের সহিত তখনই ফুল আনিতে চলিলেন। ফুলটি ঈশান কোণ (অর্থাৎ উত্তর-পূর্ব কোণ) হইতে হাওয়ায় উড়িয়া আসিয়াছিল সুতরাং ভীম বুঝিতে পারিলেন যে, ঐদিকে গেলে আরো ফুল পাওয়া যাইবে। সেদিকে অনেক দূর গিয়া তিনি একটা প্রকাণ্ড সরোবরে উপস্থিত হইলেন। সরোবরে স্নান করিয়া তিনি আবার ফুলের খোঁজে চলিয়াছেন, এমন সময় দেখিলেন যে মস্ত একটা বানর তাঁহার পথের উপরে শুইয়া আছে।

বানরটাকে তাড়াইবার জন্য ভীম সিংহনাদ করিতে লাগিলেন, কিন্তু বানর তাহা বড়-একটা গ্রাহ্য করিল না। সে খালি একটু মিটি-মিটি চাহিয়া বলিল, "আহা! অমন চ্যাঁচাইও না, একটু ঘুমাইতে দাও ; আমার অসুখ করিয়াছে।"

ভীম বলিলেন, "আমি পাণ্ডুর পুত্র। লোকে আমাকে পবনের পুত্রও বলে। আমার নাম ভীম। তুমি কে?"

বানর একটু হাসিয়া বলিল, "আমি বানর।"

ভীম বলিলেন, "পথ ছাড় নহিলে সাজা পাইবে।"

বানর বলিল, "বড় অসুখ করিয়াছে; উঠিতে পারি না। আমাকে ডিঙাইয়া চলিয়া যাও।"

ভীম বলিলেন, "সকল প্রাণীর শরীরেই ভগবান আছেন: তোমাকে ডিঙাইলে তাঁহার অমান্য করা হইবে। আমি তাহা পারিব না।"

বানর বলিল, "বুড়া হইয়াছি, উঠিতে পারি না। আমার লেজটা সরাইয়া পাশ দিয়া চলিয়া যাও।"

ভীম মনে মনে বলিলেন, 'বটে! আচ্ছা দাঁড়াও, এই লেজ ধরিয়া তোমাকে ধোপার কাপড় কাচা দেখাইতেছি।'

এই মনে করিয়া তিনি বাঁ হাতে বানরের লেজ ধরিলেন, কিন্তু তাহা নাড়িতে পারিলেন না! তারপর দু হাতে ধরিয়া টানিলেন, তবুও নাড়িতে পারিলেন না। প্রাণপণ করিয়া টানিলেন, তাঁহার চোখ বাহির হইয়া আসিবার গতিক হইল, ভ্রূ আর কপাল ভয়ানক কোঁচকাইয়া গেল, মুখ কালো হইয়া উঠিল, গা দিয়া ঘাম ঝরিতে লাগিল—তবুও লেজ নড়িল না। তখন তিনি নিতান্ত লজ্জিত হইয়া জোড়হাতে বলিলেন, "মহাশয়, আমার অপরাধ হইয়াছে, আমাকে ক্ষমা

করুন। আপনি কে?"

বানর বলিল, "আমি পবনের পুত্র, আমার নাম হনুমান।"

তখন ভীম তাড়াতাড়ি হনুমানের পায়ের ধুলা লইতে পারিলে বাঁচেন। হনুমান বড় ভাই, ভীম ছোট ভাই, কাজেই দুজনে দুজনকে দেখিয়া যারপরনাই আনন্দিত হইলেন। ভীম বলিলেন, "দাদা, শুনিয়াছি সমুদ্র পার হইবার সময় আপনার বড় ভয়ংকর চেহারা হইয়াছিল। সেই চেহারাটি আমি একবার দেখিতে চাই।"

হনুমান বলিলেন, "ভাই, ও চেহারা দেখিয়া কাজ নাই; তুমি ভয় পাইবে।"

কিন্তু ভীম ছাড়িবেন কেন? তাঁহার যে বীর বলিয়া বেশ একটু অহংকার আছে। কাজেই শেষটা হনুমানকে সেই চেহারা দেখাইতে হইল।

কি ভয়ংকর বিশাল চেহারা! কোথায়-বা তাহার মাথা, কোথায়-বা তাহার লেজ। সে শরীর বন ছাড়াইয়া, পর্বত ছাড়াইয়া আকাশ পর্যন্ত ঢাকিয়া ফেলিল। জ্বলন্ত সোনার মতো তাহার তেজে ভীমের চক্ষু আপনা হইতেই বুজিয়া আসিল। তাহা দেখিয়া হনুমান বলিলেন, "আর কাজ নাই, তাহা হইলে ভয় পাইবে।"

ভীম বলিলেন, "সত্যি দাদা, আমি আর তাকাইতে পারিতেছি না। এখন ওটাকে গুটাইয়া লউন।"

তখন হনুমান তাঁহার শরীর ছোট করিয়া ভীমের সহিত কোলাকুলি করিলেন, তারপর বলিলেন, "ভাই, ঘরে যাও। দরকার হইলে আমাকে ডাকিও, আমি উপস্থিত হইব। যুদ্ধের সময় তুমি সিংহনাদ করিলে আমি তাহা বাড়াইয়া দিব, আর অর্জুনের রথের চূড়ায় বসিয়া এমন চিৎকার করিব যে, তাহাতেই শত্রু আধমরা হইয়া যাইবে।"

হনুমান ভীমকে এই কথা বলিয়া, আর তাঁহাকে পদ্মফুলের সন্ধান বলিয়া দিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

কৈলাস পর্বতের উপরে কুবেরের সরোবরে এই ফুল ফোটে। ফুলগুলি সোনার, তাহার বোঁটা বৈদূর্যমণির ; আর তাহার গন্ধের কথা তো পূর্বেই বলিয়াছি। কুবেরের শত শত রাক্ষস প্রহরী সরোবরে পাহারা দেয়। ইহারা ভীমকে নিষেধ করিয়া বলিল, "হারে ই কিমন লোক বটেক্? কুব্বের্‌র্ মহারাজ্জ্বকু বলিলেক্ নি, পুছিছলেক্ নি, আউ ফুল লেবেকে চলিলেক্!"

ভীম বলিলেন, "কোথায় তোদের কুবের মহারাজ, যে তাহার নিকট জিজ্ঞাসা করিব? আমার নাম ভীম, পান্ডুর পুত্র। আমরা ক্ষত্রিয় কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিয়া কাজ করি না। পাহাড়ের উপরে ফুল ফুটিয়াছে তাহা তোদের কুবেরের যেমন, আমারও তেমনি; জিজ্ঞাসা আবার কাহাকে করিব?"

এই বলিয়া ভীম জলে নামিলেন। আর রাক্ষসেরাও অমনি "ধর! মার! কাট! বাঁধ! খা!" বলিতে বলিতে তোমর পট্টিশ হাতে দাঁত কড়মড়াইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল! কিন্তু ভীমের গদা যে কেমন জিনিস তাহা তাহারা জানিত না! সেই গদা ঘুরাইয়া ভীম যখন নিমেষের মধ্যে একশোটা রাক্ষসের

মাথা ফাটাইয়া ফেলিলেন, তখন আরগুলি অস্ত্র-শস্ত্র ফেলিয়া চ্যাঁচাইতে চ্যাঁচাইতে ঊর্ধ্বশ্বাসে কুবেরের কাছে গিয়া উপস্থিত হইল। কুবের তাহাদের নিকট সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, "আমি জানি, ভীম দ্রৌপদীর জন্য ফুল নিতে আসিয়াছে। উঁহার যত ইচ্ছা ফুল লইয়া যাইতে দাও।"

সুতরাং রাক্ষসেরা আর ভীমকে বাধা দিল না, তিনি সাধ মিটাইয়া ফুল লইলেন।

এদিকে পাণ্ডবেরা ভীমের বিলম্ব দেখিয়া তাঁহাকে খুঁজিতে খুঁজিতে ঘটোৎকচের সাহায্যে সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। কুবেরের কথায় কিছুদিন তাঁহাদিগকে সেই স্থানে থাকিতে হইল। তারপর সেখান হইতে বিদায় লইয়া আবার বদরিকাশ্রমে আসিয়া তাঁহারা অর্জুনের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে ভীম আর-একটা রাক্ষস মারেন। এটার নাম জটাসুর। হতভাগা এমনি চমৎকার ব্রাহ্মণ সাজিয়া আসিয়াছিল যে, পাণ্ডবেরা তাহাকে রাক্ষস বলিয়া চিনিতেই পারেন নাই। তাঁহারা তাহাকে ব্রাহ্মণ মনে করিয়া আদরের সহিত সঙ্গে রাখিয়াছেন, আর ইহার মধ্যে দুষ্ট কোন্ সুযোগে একদিন যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব আর দ্রৌপদীকে লইয়া ছুট দিয়াছে। তাহার সাজাটাও ভীমের হাতে সে তেমনি করিয়া পাইল!

তারপর ক্রমে অর্জুনের ফিরিবার সময় কাছে আসিলে, পাণ্ডবেরা আবার গন্ধমাদন পর্বতে যান। ইহার কিছুদিন পরেই ইন্দ্রের রথে চড়িয়া অর্জুন স্বর্গ হইতে তাঁহাদের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অর্জুনকে পাইয়া পাণ্ডবদের এবং দ্রৌপদীর সুখের সীমা রহিল না।

ইহার পরে আবার পাণ্ডবেরা কাম্যক বনে ফিরিয়া আসিলেন। ফিরিবার সময় অবশ্য পথে অনেক ঘটনা হইয়াছিল, কিন্তু তাহার কথা বিশেষ করিয়া বলিবার দরকার নাই। কেবল ভীম একটা সাপের মুখে পড়িয়া কিরূপ নাকাল হইয়াছিলেন, তাহা একটু শুন।

বদরিকাশ্রম হইতে যাত্রা করিয়া কিছুদিন পরে পাণ্ডবেরা সুবাহু নামক এক কিরাত রাজার দেশে আসিয়া উপস্থিত হন। এই স্থানে যামুন নামক একটা পর্বত আছে, তাহার কাছে বনের ভিতরে নানারকম শিকার মিলে। ভীম খুবই উৎসাহের সহিত শিকার করিয়া বেড়ান। ইহার মধ্যে একদিন এক ভয়ংকর সাপ তাঁহাকে ধরিয়া বসিয়াছে। ধরিবামাত্রই ভীমের বল সাহস সব কোথায় যেন চলিয়া গেল; তিনি কিছুতেই সাপের বাঁধন এড়াইতে পারিলেন না।

সাপটা আবার মানুষের মতো কথা কয়। সে বলিল যে বহুকাল পূর্বে পাণ্ডবদেরই বংশে সে নহুস নামে রাজা ছিল, অগস্ত্য মুনির শাপে এখন সাপ হইয়াছে। ভীমের পরিচয় পাইয়া সে বলিল, "দেখিতেছি, তুমি আমারই বংশের লোক! কিন্ত তথাপি তোমাকে না খাইয়া থাকিতে পারিতেছি না।"

ভীমের বড় ভাগ্য যে, সেই সময়ে যুধিষ্ঠির তাঁহাকে খুঁজিতে খুঁজিতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভীমের দশা দেখিয়া তো তিনি একেবারে অবাক! তিনি তাঁহাকে ছাড়িয়া দিবার জন্য সাপকে অনেক মিনতি করিলেন,

করুন। আপনি কে?"

বানর বলিল, "আমি পবনের পুত্র, আমার নাম হনুমান।"

তখন ভীম তাড়াতাড়ি হনুমানের পায়ের ধুলা লইতে পারিলে বাঁচেন। হনুমান বড় ভাই, ভীম ছোট ভাই, কাজেই দুজনে দুজনকে দেখিয়া যারপরনাই আনন্দিত হইলেন। ভীম বলিলেন, "দাদা, শুনিয়াছি সমুদ্র পার হইবার সময় আপনার বড় ভয়ংকর চেহারা হইয়াছিল। সেই চেহারাটি আমি একবার দেখিতে চাই।"

হনুমান বলিলেন, "ভাই, ও চেহারা দেখিয়া কাজ নাই; তুমি ভয় পাইবে।"

কিন্তু ভীম ছাড়িবেন কেন? তাঁহার যে বীর বলিয়া বেশ একটু অহংকার আছে। কাজেই শেষটা হনুমানকে সেই চেহারা দেখাইতে হইল।

কি ভয়ংকর বিশাল চেহারা! কোথায়-বা তাহার মাথা, কোথায়-বা তাহার লেজ। সে শরীর বন ছাড়াইয়া, পর্বত ছাড়াইয়া আকাশ পর্যন্ত ঢাকিয়া ফেলিল। জ্বলন্ত সোনার মতো তাহার তেজে ভীমের চক্ষু আপনা হইতেই বুজিয়া আসিল। তাহা দেখিয়া হনুমান বলিলেন, "আর কাজ নাই, তাহা হইলে ভয় পাইবে।"

ভীম বলিলেন, "সত্যি দাদা, আমি আর তাকাইতে পারিতেছি না। এখন ওটাকে গুটাইয়া লউন।"

তখন হনুমান তাঁহার শরীর ছোট করিয়া ভীমের সহিত কোলাকুলি করিলেন, তারপর বলিলেন, "ভাই, ঘরে যাও। দরকার হইলে আমাকে ডাকিও, আমি উপস্থিত হইব। যুদ্ধের সময় তুমি সিংহনাদ করিলে আমি তাহা বাড়াইয়া দিব, আর অর্জুনের রথের চূড়ায় বসিয়া এমন চিৎকার করিব যে, তাহাতেই শত্রু আধমরা হইয়া যাইবে।"

হনুমান ভীমকে এই কথা বলিয়া, আর তাঁহাকে পদ্মফুলের সন্ধান বলিয়া দিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

কৈলাস পর্বতের উপরে কুবেরের সরোবরে এই ফুল ফোটে। ফুলগুলি সোনার, তাহার বোঁটা বৈদূর্যমণির; আর তাহার গন্ধের কথা তো পূর্বেই বলিয়াছি। কুবেরের শত শত রাক্ষস প্রহরী সরোবরে পাহারা দেয়। ইহারা ভীমকে নিষেধ করিয়া বলিল, "হারে ই কিমন লোক বটেক্? কুবেরের্ মহারাজ্জুকু বলিলেক্ নি, পুছিছলেক্ নি, আউ ফুল লেবেকে চলিলেক্!"

ভীম বলিলেন, "কোথায় তোদের কুবের মহারাজ, যে তাহার নিকট জিজ্ঞাসা করিব? আমার নাম ভীম, পাণ্ডুর পুত্র। আমরা ক্ষত্রিয় কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিয়া কাজ করি না। পাহাড়ের উপরে ফুল ফুটিয়াছে তাহা তোদের কুবেরের যেমন, আমারও তেমনি; জিজ্ঞাসা আবার কাহাকে করিব?"

এই বলিয়া ভীম জলে নামিলেন। আর রাক্ষসেরাও অমনি "ধর! মার! কাট! বাঁধ! খা!" বলিতে বলিতে তোমর পট্টিশ হাতে দাঁত কড়মড়াইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল! কিন্তু ভীমের গদা যে কেমন জিনিস তাহা তাহারা জানিত না! সেই গদা ঘুরাইয়া ভীম যখন নিমেষের মধ্যে একশোটা রাক্ষসের

মাথা ফাটাইয়া ফেলিলেন, তখন আরগুলি অস্ত্র-শস্ত্র ফেলিয়া চ্যাঁচাইতে চ্যাঁচাইতে ঊর্ধ্বশ্বাসে কুবেরের কাছে গিয়া উপস্থিত হইল। কুবের তাহাদের নিকট সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, "আমি জানি, ভীম দ্রৌপদীর জন্য ফুল নিতে আসিয়াছে। উঁহার যত ইচ্ছা ফুল লইয়া যাইতে দাও।"

সুতরাং রাক্ষসেরা আর ভীমকে বাধা দিল না, তিনি সাধ মিটাইয়া ফুল লইলেন।

এদিকে পাণ্ডবেরা ভীমের বিলম্ব দেখিয়া তাঁহাকে খুঁজিতে খুঁজিতে ঘটোৎকচের সাহায্যে সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। কুবেরের কথায় কিছুদিন তাঁহাদিগকে সেই স্থানে থাকিতে হইল। তারপর সেখান হইতে বিদায় লইয়া আবার বদরিকাশ্রমে আসিয়া তাঁহারা অর্জুনের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে ভীম আর-একটা রাক্ষস মারেন। এটার নাম জটাসুর। হতভাগা এমনি চমৎকার ব্রাহ্মণ সাজিয়া আসিয়াছিল যে, পাণ্ডবেরা তাহাকে রাক্ষস বলিয়া চিনিতেই পারেন নাই। তাঁহারা তাহাকে ব্রাহ্মণ মনে করিয়া আদরের সহিত সঙ্গে রাখিয়াছেন, আর ইহার মধ্যে দুষ্ট কোন্ সুযোগে একদিন যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব আর দ্রৌপদীকে লইয়া ছুট দিয়াছে। তাহার সাজাটাও ভীমের হাতে সে তেমনি করিয়া পাইল!

তারপর ক্রমে অর্জুনের ফিরিবার সময় কাছে আসিলে, পাণ্ডবেরা আবার গন্ধমাদন পর্বতে যান। ইহার কিছুদিন পরেই ইন্দ্রের রথে চড়িয়া অর্জুন স্বর্গ হইতে তাঁহাদের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অর্জুনকে পাইয়া পাণ্ডবদের এবং দ্রৌপদীর সুখের সীমা রহিল না।

ইহার পরে আবার পাণ্ডবেরা কাম্যক বনে ফিরিয়া আসিলেন। ফিরিবার সময় অবশ্য পথে অনেক ঘটনা হইয়াছিল, কিন্তু তাহার কথা বিশেষ করিয়া বলিবার দরকার নাই। কেবল ভীম একটা সাপের মুখে পড়িয়া কিরূপ নাকাল হইয়াছিলেন, তাহা একটু শুন।

বদরিকাশ্রম হইতে যাত্রা করিয়া কিছুদিন পরে পাণ্ডবেরা সুবাহু নামক এক কিরাত রাজার দেশে আসিয়া উপস্থিত হন। এই স্থানে যামুন নামক একটা পর্বত আছে, তাহার কাছে বনের ভিতরে নানারকম শিকার মিলে। ভীম খুবই উৎসাহের সহিত শিকার করিয়া বেড়ান। ইহার মধ্যে একদিন এক ভয়ংকর সাপ তাঁহাকে ধরিয়া বসিয়াছে। ধরিবামাত্রই ভীমের বল সাহস সব কোথায় যেন চলিয়া গেল; তিনি কিছুতেই সাপের বাঁধন এড়াইতে পারিলেন না।

সাপটা আবার মানুষের মতো কথা কয়। সে বলিল যে বহুকাল পূর্বে পাণ্ডবদেরই বংশে সে নহুস নামে রাজা ছিল, অগস্ত্য মুনির শাপে এখন সাপ হইয়াছে। ভীমের পরিচয় পাইয়া সে বলিল, "দেখিতেছি, তমি আমারই বংশের লোক। কিন্ত তথাপি তোমাকে না খাইয়া থাকিতে পারিতেছি না।"

ভীমের বড় ভাগ্য যে, সেই সময়ে যুধিষ্ঠির তাঁহাকে খুঁজিতে খুঁজিতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভীমের দশা দেখিয়া তো তিনি একেবারে অবাক! তিনি তাঁহাকে ছাড়িয়া দিবার জন্য সাপকে অনেক মিনতি করিলেন,

কিন্তু সে তাহাতে রাজি হইল না। শেষে যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইলে তুমি ভীমকে ছাড়িতে পার?"

সাপ বলিল, "আমার কথার উত্তর দিতে পার তো ইহাকে ছাড়িয়া দিই; কেননা, তাহা হইলে আমার শাপ দূর হইবে।"

যুধিষ্ঠির তাহাতেই সম্মত হইলেন। কিন্তু সে সর্বনেশে সর্প আবার এমনি ভয়ানক পণ্ডিত যে ব্রহ্মাণ্ডের যত উৎকট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া সে যুধিষ্ঠিরকে ব্যস্ত করিয়া তুলিল। যাহা হউক, সে তাঁহাকে ঠকাইতে পারিল না! শেষে খুশি হইয়া বলিল, "তোমার বিদ্যা দেখিয়া আমি খুব সন্তুষ্ট হইয়াছি, সুতরাং তোমার ভাইকে খাইব না।"

বাস্তবিক যুধিষ্ঠির না আসিলে সেদিন সাপের হাতে পড়িয়া নিশ্চয় ভীমের প্রাণ যাইত।

পাণ্ডবেরা কাম্যক বন হইতে দ্বৈত বনে গিয়া একটি সুন্দর সরোবরের ধারে এক কুঁড়ে ঘরে বাস করিতে লাগিলেন। ইহার মধ্যে কি-এক ঘটনা হইল শুন। দুষ্ট লোকেরা সাধুদিগকে কেবল ক্লেশ দিয়াই সন্তুষ্ট হয় না, ক্লেশটা কেমন হইতেছে, তাহা আবার দেখিতে চাহে। পাণ্ডবেরা নিতান্ত কষ্টে বনবাস করিতেছেন, এ কথা দুর্যোধন প্রভৃতিরা শোনেন, আর তাঁহাদের খালি দুঃখ হয়, 'আহা উহারা কেমন কষ্ট পাইতেছে, তাহার তামাশাটা একবার দেখিতে পাইলাম না, আর আমাদের জাঁকজমকটাও উহাদিগকে দেখাইতে পারিলাম না।' যতই তাঁহাবা এ কথা ভাবেন, ততই তাঁহাদের মনে হয় যে, এ কাজটা না করিলেই চলিতেছে না। কিন্তু তাহা কেমন করিয়া হইতে পারে? ধৃতরাষ্ট্র কি সহজে তাঁহাদিগকে দ্বৈত বনে যাইতে দিবেন?

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে তাঁহারা ইহার এক উপায় স্থির করিলেন। দ্বৈত বনে দুর্যোধনের অনেক গোয়ালা প্রজা বাস করে, রাজার গোরু-বাছুর রাখার ভার তাহাদের উপরে। এ-সকল গোরুর খবর নেওয়া রাজার একটা কাজ; সুতরাং এই কাজের ছল করিয়া দুর্যোধন দ্বৈত বনে যাইতে চাহিলে ধৃতরাষ্ট্রের অমত হইবে না।

এই প্রস্তাব শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্র প্রথমে বলিলেন, "ওখানে গিয়া কাজ নাই। ওখানে পাণ্ডবেরা আছেন; কি জানি, যদি কোনো কথায় তাঁহাদের সহিত ঝগড়া হয়।"

এ কথায় শকুনি বলিলেন, "রাম রাম! আমরা কি তাহাদের কাছে যাইব? আমরা গোরু দেখিয়া আর দূরে দূরে একটু শিকার করিয়াই চলিয়া আসিব. উঁহাদের সঙ্গে আমাদের দেখাই হইবে না।"

কাজেই ধৃতরাষ্ট্র শেষে রাজি হইলেন। হুকুম পাওয়ামাত্র হাতি ঘোড়া, লোকজন, সৈন্য-সামন্ত, সাজিয়া প্রস্তুত। একলক্ষ গোরু দেখিতে হইবে, তাহার জন্য দশলক্ষ লোক পৃথিবী কাঁপাইয়া দ্বৈত বনে যাত্রা করিল। রাজপুত্রেরা নিজে গিয়া সন্তুষ্ট হইলেন না, আবার পরিবারদিগকেও সঙ্গে লইয়া চলিলেন।

গোরু দেখার কাজ দেখিতে দেখিতেই শেষ হইয়া গেল, শিকারেও খুব বেশি

সময় লাগিল না। তারপর ক্রমে তাঁহারা সেই সরোবরের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, যাহার ধারে পাণ্ডবদিগের আশ্রম। সে সময়ে সেই সরোবরে গন্ধর্বরাজ চিত্রসেন সপরিবারে স্নান করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গের মেয়েদের স্নানের সুবিধার জন্য সরোবরটিকে বেড়া দিয়া ঘেরা হইয়াছিল।

গন্ধর্বের দরোয়ানেরা দুর্যোধনের লোকদিগকে সরোবরে যাইতে নিষেধ করে; দুর্যোধন আবার তাহা শুনিয়া গন্ধর্বদিগকে তাড়াইয়া দিবার হুকুম দেন। এইরূপে ক্রমে দুই দলে গালাগালি হইয়া শেষে ভয়ানক যুদ্ধ উপস্থিত হইল।

কৌরবদের সাহস খুব ছিল, আর কর্ণ, দুর্যোধন ইঁহারা যোদ্ধাও কম ছিলেন না: কাজেই প্রথমে তাঁহারা গন্ধর্বের লোকদিগকে বেশ একটু জব্দই করিয়া তোলেন। কিন্তু তারপর যখন চিত্রসেন নিজে অসংখ্য গন্ধর্ব লইয়া ক্রোধ-ভরে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন, তখন কৌরবদের আর দুর্দশার সীমাই রহিল না। সৈন্যেরা তো প্রাণপণে তাহাদের মা-বাপের নাম লইয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুট দিলই: এমন যে কর্ণ, তিনিও শেষে আর দুর্যোধনের দিকে না চাহিয়াই তাহাদের পিছু পিছু পলায়ন করিলেন।

আর দুর্যোধন? সে লজ্জার কথা আর কি বলিব? গন্ধর্বেরা তাঁহাকে আর তাঁহাব ভাইদিগকে তাঁহাদের সমস্ত জাঁকজমক সুদ্ধ সপরিবারে বাঁধিয়া লইয়া চলিল।

এদিকে যাহারা পলাইয়াছিল, তাহারা কাঁদিতে কাঁদিতে পাণ্ডবদিগের নিকট আসিয়া দুর্যোধনের দুর্দশার কথা জানাইল। তাহাদের কথা শুনিয়া ভীম বলিলেন, "বাঃ! আমরা অনেক কষ্টে যাহা করিতাম, গন্ধর্বেরাই আজ আমাদের সে কাজ করিয়া দিল। যেমন দুষ্ট তাহাদের তেমনি সাজা হইয়াছে।"

যুধিষ্ঠির তখন একটা যজ্ঞ করিতেছিলেন। ভীমের কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন, "ছিঃ, ভীম! এমন সময় কি এরূপ কথা বলিতে আছে? উহাদের অপমান হইলে তো আমাদেরই বংশের অপমান। তাহা ছাড়া উহারা এখন আমাদের আশ্রয় চাহিতেছে। তুমি, অর্জুন, নকুল আর সহদেব শীঘ্র গিয়া উহাদিগকে ছাড়াইয়া আন। আমি যজ্ঞে ব্যস্ত আছি নহিলে আমি নিজে যাইতাম।" কাজেই তখন অর্জুন, নকুল আর সহদেব ছুটিয়া চলিলেন।

তাঁহারা প্রথমে মিষ্টকথায় গন্ধর্বদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করেন। গন্ধর্বেরা তাহা না শুনাতে যুদ্ধ আরম্ভ হইল, আর অর্জুনের সহিত খানিক যুদ্ধ করিয়া তাহাদের এমনি দুর্দশা হইল যে, বেচারাদের টিঁকিবারও সাধ্য নাই, পলাইবারও পথ নাই, মাটি ছাড়িয়া আকাশে উঠিয়াও স্থির হইবার জো নাই। ইহা দেখিয়া তাহাদের রাজা বিষম রাগে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। কিন্তু অর্জুনের কাছে তাঁহারও পরাভবের বিলম্ব হইল না। মুহূর্তের মধ্যেই তিনি বিপাকে পড়িয়া বলিলেন, "অর্জুন! আমি যে তোমার বন্ধু চিত্রসেন।"

তখন অর্জুন দেখেন সত্যিই তো, এ যে চিত্রসেন—সেই স্বর্গে যাঁহার নিকট গান বাজনা শিখিয়াছিলেন। অমনি যুদ্ধ ছাড়িয়া দুই বন্ধুতে কোলাকুলি আরম্ভ হইল।

তারপর অর্জুন বলিলেন, "একি, বন্ধু, কৌরবদিগকে কেন বাঁধিয়া আনিলে?"

চিত্রসেন বলিলেন, "হতভাগারা তোমাদিগকে অপমান করিতে আসিয়াছিল, তাই ইন্দ্রের কথায় ইহাদিগকে বাঁধিয়া নিয়া যাইতেছি।"

অর্জুন বলিলেন, "তাহা হইবে না! দুর্যোধন আমাদের ভাই; যুধিষ্ঠিরের নিতান্ত ইচ্ছা, ইহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।"

চিত্রসেন বলিলেন, "এমন দুষ্টকে কখনই ছাড়া উচিত নহে। চল আমরা গিয়া যুধিষ্ঠিরকে সকল কথা বলি, তারপর তিনি যাহা বলেন, তাহাই হইবে।"

যুধিষ্ঠির যে উঁহাদিগকে ছাড়িয়া দিলেন, তাহা বোধহয় আর না বলিলেও চলে। তাঁহাদের দুষ্টবুদ্ধির কথা শুনিয়া তিনি কেবল বলিলেন, "ভাই, আর কখনো এমন সাহস করিও না, এখন সুখে বাড়ি চলিয়া যাও।"

হায় রে মহারাজ দুর্যোধন! যে পাণ্ডবদিগকে জব্দ করিবার জন্য এত জাঁক-জমকের সহিত আসিলেন, এখন সেই পাণ্ডবদের কৃপায় প্রাণ লইয়া তিনি চোরের মতন ঘরে ফিরিতেছেন। আর ঘরে ফিরিবেনই-বা কোন্ মুখে? তাহার চেয়ে বরং মৃত্যুই তাঁহার ভালো বোধ হইল। সঙ্গের লোকদিগকে তিনি বলিলেন, "আমার আর বাঁচিয়া কাজ কি? তোমরা ঘরে যাও, দুঃশাসন রাজা হউক; আমি এইখানেই পড়িয়া মরিব।"

দুঃশাসন তাঁহার পায়ে ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, কর্ণ আর শকুনি তাহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, "সে কি দুর্যোধন, তোমার কিসের লজ্জা? পাণ্ডবেরা তোমার রাজ্যে বাস করে, কাজেই তাহারা তোমার প্রজা, সুতরাং আপদ-বিপদে তোমাকে রক্ষা করা তো তাহাদের কাজ হইল! ইহাতে তাহাদেরই বাহাদুরী কি, আর তোমারই-বা লজ্জার কথা কি?"

তবুও সহজে দুর্যোধন শান্ত হইতে পারেন নাই। তাঁহাকে বুঝাইতে দুটি দিন লাগিয়াছিল।

দুষ্টলোকের সাজা হয়, কিন্তু তাহাতে তাহার শিক্ষা হয় না। দুর্যোধন কোথায় ইহার পর হইতে পাণ্ডবদিগের সহিত ভালো ব্যবহার করিবেন, না তাঁহার হিংসা আরো বাড়িয়া চলিল।

ইহার মধ্যে একদিন দুর্বাশা মুনি দশহাজার শিষ্য সমেত হস্তিনায় আসিলেন। এমন বিষম বদরাগী সর্বনেশে মানুষ এই পৃথিবীতে আর জন্মায় নাই। কথায় কথায় তিনি যাহাকে তাহাকে শাপ দিয়া বসেন! রাত দুপুর হউক-না কেন, 'খাইব' বলিতেই খাবার আনিয়া উপস্থিত করিতে না পারিলে নিশ্চয় শাপ দিয়া ভস্ম করিবেন। আবার তাড়াতাড়ি আনিতে পারিলে হয়তো বলিবেন 'খাইব না'। সঙ্গে সঙ্গে দুটা গালি দেওয়াও আশ্চর্য নহে।

দুর্যোধন প্রাণপণে এই দুর্বাশা মুনির সেবা করিয়া তাঁহাকে যারপরনাই খুশি করিয়া ফেলিলেন। দুর্বাশা বলিলেন, "আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি, তুমি কি চাহ?"

দুর্যোধন বলিলেন, "আপনি যদি দয়া করিয়া একটিবার দ্রৌপদীর খাওয়া

শেষ হইবার পরে, আপনার এই দশহাজার শিষ্য লইয়া পাণ্ডবদিগের আশ্রমে আহার করিতে যান, তবেই আমার ঢের হয়, আমি আর কিছু চাহি না।"

দুর্বাশা বলিলেন, "আচ্ছা, আমি অবশ্য যাইব।"

এই বলিয়া দুর্বাশা চলিয়া গেলেন; আর দুর্যোধনও এই ভাবিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন যে, 'দ্রৌপদীর খাওয়া শেষ হইলে আর পাণ্ডবেরা দুর্বাশাকে খাইতে দিতে পারিবে না, সুতরাং মুনি তাঁহাদিগকে শাপ দিয়া ভস্ম করিবেন।'

ইহার পর একদিন সত্যসত্যই দুর্বাশা গিয়া পাণ্ডবদিগের আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছেন। তখন দ্রৌপদীর খাওয়া শেষ হইয়া গিয়াছে, থালায় আর খাবার নাই। সে যাত্রা কৃষ্ণ পাণ্ডবদিগকে রক্ষা না করিলে তাঁহাদের বড়ই বিপদ হইত। একজনেরও ভাত নাই, অথচ দশহাজার শিষ্য লইয়া মুনি উপস্থিত; এখন উপায়? যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগকে স্নান-আহ্নিক করিবার জন্য গঙ্গায় পাঠাইয়া দিলেন; আর দ্রৌপদী মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে লাগিলেন, 'হায় হায়! স্নান করিয়া আসিলে ইঁহাদিগকে কি খাওয়াইব?'

উপায় না দেখিয়া দ্রৌপদী মনে মনে কৃষ্ণকে ডাকিলেন। কৃষ্ণ সাধারণ মানুষ নহেন, তিনি দেবতা; কাজেই দ্রৌপদীর দুঃখের কথা জানিতে পারিয়া সেই মুহূর্তেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণ আসিয়াই বলিলেন, "দ্রৌপদী, বড় ক্ষুধা হইয়াছে, কিছু খাইতে দাও।"

দ্রৌপদী লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "থালায় তো কিছুই নাই, কি খাইতে দিব।"

কৃষ্ণ বলিলেন, "অবশ্য কিছু আছে, থালাখানি আন তো।"

কাজেই দ্রৌপদী থালা আনিয়া উপস্থিত করিলেন। উহার একপাশে তখনো এক কণা শাক-ভাত লাগিয়াছিল। কৃষ্ণ সেই এক বিন্দু শাক-ভাত মুখে দিয়া বলিলেন, "ইহাতেই বিশ্বাত্মা তুষ্ট হউন।" তারপর ভীমকে বলিলেন, "মুনি-দিগকে ডাক।"

এ-সকল কথা বলিতে যত সময় লাগিল, কাজেও তাহার চেয়ে বড় বেশি লাগে নাই। মুনিরা ততক্ষণে সবে স্নান শেষ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে হঠাৎ তাঁহাদের পেট ভরিয়া গেল! সকলে আশ্চর্য হইয়া মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিলেন। পেটে আর একটি হজমিগুলিরও স্থান নাই। এদিকে যুধিষ্ঠির হয়তো কত কষ্ট করিয়া আহারের আয়োজন করিয়াছেন, তাঁহার নিকট গিয়া কি করিয়া মুখ দেখাইবেন? ভাবিয়া-চিন্তিয়া দুর্বাশা বলিলেন, "এ যাত্রা আমরা বড়ই বেল্লিক হইয়া গেলাম। এখন যুধিষ্ঠিরের নিকট যাইতে অতিশয় লজ্জা-বোধ হইতেছে, চল এখান হইতেই পলায়ন করি।" কাজেই বিপদ কাটিয়া গেল।

এই সময়ে পাণ্ডবেরা কাম্যক বনে বাস করিতেছিলেন। সেখানে আর-একটা ঘটনা হয়, তাহার কথা এখন বলিতেছি।

দুর্যোধনের ভগিনী দুঃশলাকে যে বিবাহ করিয়াছিল, তাঁহার নাম জয়দ্রথ। এই হতভাগা একদিন অনেক সৈন্য আর বন্ধু-বান্ধব লইয়া পাণ্ডবদিগের আশ্রমের নিকট দিয়া যাইতেছিল। পাণ্ডবেরা তখন শিকার করিতে গিয়াছেন,

দ্রৌপদীর নিকট এক ধৌম্য ছাড়া আর কেহই নাই। দ্রৌপদীকে দেখিবামাত্র জয়দ্রথ 'কেমন আছ? সব ভালো তো?' বলিয়া তাঁহার সহিত কথাবার্তা আরম্ভ করিল।

একজন ভদ্রলোক বাড়িতে আসিলে তাহার আদর-যত্ন না করিলে নয়। কাজেই দ্রৌপদী জয়দ্রথকে বসিবার জায়গা আর পা ধুইবার জল দিয়া বলিলেন, "জলযোগ করিয়া বিশ্রাম করুন, পাণ্ডবেরা শীঘ্রই আসিবেন।" কিন্তু জয়দ্রথ বসিবার জন্য আসে নাই। দুষ্ট ভাবিয়াছে, পাণ্ডবেরা আসিবার পূর্বেই দ্রৌপদীকে লইয়া প্রস্থান করিবে।

সে প্রথমে দ্রৌপদীকে অনেক মিনতি করিল, তারপর লোভ দেখাইল, শেষে ভয় দেখাইতেও ছাড়িল না। দ্রৌপদী রাগে, ভয়ে, ঘৃণায়, তাহাকে গালি দিতে দিতে ধৌম্যকে ডাকিতে লাগিলেন। কিন্তু দুরাত্মা তাহা গ্রাহ্য না করিয়া দ্রৌপদীকে টানিয়া লইয়া চলিল। দ্রৌপদী তাঁহার গায় হাত দিতে বার বার নিষেধ করিলেন। তাহা শুনিল না দেখিয়া ভয়ানক রাগের ভরে তাহাকে টানিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিলেন। কিন্তু সেই দস্যুর সহিত যুদ্ধ করা কি তাঁহার কাজ? পাপিষ্ঠ ধৌম্যের সম্মুখেই তাঁহাকে রথে তুলিয়া লইয়া চলিল।

ধৌম্য পুরুত মানুষ, তিনি আর কি করিবেন? তিনি তাহাকে গালি দিতে দিতে রথের পিছু পিছু চলিলেন।

এদিকে পাণ্ডবদিগের আর শিকার ভালো লাগিতেছে না; আর তাঁহাদের মনেও যেন কেমন একটা ভয় আসিয়াছে—যেন তাঁহাদের কোনো বিপদ উপস্থিত। তাঁহারা তাড়াতাড়ি আশ্রমে ফিরিয়া দেখিলেন, দাসী ধাত্রেয়িকা কাঁদিতেছে। সে কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাদিগকে সকল কথাই জানাইল। পাঁচ ভাই তাহা শুনিয়া আর এক মুহূর্তও বিলম্ব করিলেন না।

কোথায় সে দুরাত্মা? আজ তাহার মাথাটা না জানি কয় টুকরা হয়! পাঁচ ভাই গর্জন করিতে করিতে রথ হাঁকাইয়া চলিয়াছেন। কোথায় সে দুরাত্মা? ঐ ধূলা উড়িতেছে! ঐ পথে দুষ্ট পলায়ন করিতেছে! ঐ শুন ধৌম্যের গলার শব্দ! মার্, মার্! কাট্, কাট্! হতভাগ্যদের একটারও বুঝি আর মাথা থাকিবে না। ইহার মধ্যে কত সৈন্য কাটা গিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। একটা প্রকাণ্ড হাতি শুঁড় উঠাইয়া নকুলকে মারিতে আসিল, নকুল খড়্গ দিয়া তাহার দাঁতসুদ্ধ শুঁড় কাটিয়া ফেলিলেন।

কিন্তু দুরাত্মা জয়দ্রথ কোথায়? ঐ দেখ, পাষণ্ড দ্রৌপদীকে ফেলিয়া পলাইতেছে! যুধিষ্ঠির, দ্রৌপদী, ধৌম্য আর নকুলকে রথে তুলিয়া লইয়াছেন। কিন্তু সেই দুরাত্মা পলাইয়া গেল নাকি? কোথায় যাইবে? ভীম আর অর্জুন যাহার পিছু ছুটিয়াছেন, তাহার কি আর পলাইবার জো আছে? এখনই তাঁহারা পাপিষ্ঠের চুলের মুঠি ধরিবেন। আর তাহাকে কি আস্ত রাখিবেন?

যুধিষ্ঠিরও ভাবিতেছেন যে, ভীমার্জুনের হাতে পড়িলে আর হতভাগা আস্ত থাকিবে না। তাই তিনি বলিতেছেন, "উহাকে মারিও না যেন, তাহা হইলে দুঃশলার আর জ্যাঠাইমার বড়ই কষ্ট হইবে।"

কিন্তু সে দুরাত্মা গেল কোথায়? দুষ্ট বনের ভিতরে লুকাইয়াছিল।

সেইখানে গিয়া ভীম তাহার চুলের মুঠি ধরিয়া তাহাকে কি আছড়ান আছড়াইলেন! আছাড় খাইয়া উঠিতে না উঠিতেই আবার তাহার মাথায় বিষম লাথি! তারপর বুকে হাঁটু দিয়া, উঃ! কি ভয়ানক সাজা! হতভাগা চ্যাঁচাইতে চ্যাঁচাইতে শেষে অজ্ঞান হইয়া গেল।

অর্জুন দেখিলেন যে জয়দ্রথ মারা যায়, তাই তিনি ভীমকে তাড়াতাড়ি যুধিষ্ঠিরের কথা মনে করাইয়া দিলেন। তখন ভীম তাহাকে আর মারিলেন না বটে, কিন্তু অর্ধচন্দ্র বাণ দিয়া তাহার মাথার খানিক মুড়াইয়া আর পাঁচ জায়গায় পাঁচটি ঝুঁটি রাখিয়া তাহাকে এমনি উৎকট সঙ সাজাইলেন যে, দেখিলে বুঝিতে! তারপর তাহাকে দুই ধমক দিয়া বলিলেন, "খবরদার! ভুলিস না যেন—সকলের কাছে বলিবি তুই আমাদের গোলাম।"

জয়দ্রথ কাঁপিতে কাঁপিতে তাহাতেই রাজি!

এইভাবে তাহাকে আনিয়া যুধিষ্ঠিরের সামনে উপস্থিত করা হইল। তাহার চেহারা দেখিয়া কি আর কেহ হাসি থামাইয়া রাখিতে পারে? যুধিষ্ঠির অবধি হাসিয়া অস্থির! ভীম বলিলেন, "মহারাজ, এই হতভাগা আমাদের গোলাম হইয়াছে! এখন ইহাকে ছাড়িব কিনা, দ্রৌপদীকে জিজ্ঞাসা করুন।"

সাজাটা যে ভালোরকমই হইয়াছে, তাহাতে আর ভুল নাই! কাজেই উহাকে ছাড়িয়া দেওয়াই মত হইল। যুধিষ্ঠির বলিলেন, "যাও এমন কাজ আর করিও না।"

সেখান হইতে বিদায় হইয়াই জয়দ্রথ শিবের তপস্যা আরম্ভ করিল। তপস্যায় তুষ্ট হইয়া যখন শিব বর দিতে আসিলেন তখন সে বলিল, "আমি পাঁচ পাণ্ডবকে যুদ্ধে পরাজয় করিব।"

শিব বলিলেন, "তুমি চারিজনকে পরাজয় করিবে, কিন্তু অর্জুনকে পারিবে না। অর্জুনকে পরাজয় করিবার শক্তি দেবতাদিগেরও নাই।" এই বলিয়া শিব চলিয়া গেলেন, জয়দ্রথও বাড়ি ফিরিল।

এই সময়ে আর-একটা ঘটনা ঘটে। কর্ণ কেমন বীর ছিলেন, তাহা শুনিয়াছ। কর্ণ কানে অতি আশ্চর্য কুণ্ডল আর শরীরে কবচ (বর্ম) লইয়া জন্মগ্রহণ করেন। এই কুণ্ডল আর কবচ শরীরে থাকিতে তাঁহাকে মারিবার ক্ষমতা কাহারো ছিল না। অর্জুনকে ইন্দ্র বিশেষ স্নেহ করিতেন, আর কর্ণের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হইলে তাঁহার বড়ই বিপদের আশংকা দেখিয়া দুঃখিত থাকিতেন। তাই তিনি ভাবিলেন, 'এই কুণ্ডল আর কবচ লইয়া আসিব।'

কর্ণ গঙ্গায় স্নান করিয়া সূর্যের স্তব করিতেন। সে সময়ে কেহ তাঁহার নিকট কিছু চাহিলে, তিনি তাহাকে ফিরাইতেন না, এই তাঁহার নিয়ম ছিল। একদিন ঠিক এইরূপ সময়ে, ইন্দ্র ব্রাহ্মণের বেশে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন।

ইন্দ্র যে কর্ণকে ফাঁকি দিয়া কুণ্ডল আর কবচ আনিতে যাইবেন, এ কথা সূর্যদেব আগেই জানিতে পারিয়া কর্ণকে সাবধান করিয়া দেন, আর উহা দিতে নিষেধ করেন। কিন্তু কর্ণ কখনো নিয়ম ভঙ্গ করিতেন না, কাজেই তিনি

বলিলেন, "আমার যখন নিয়ম আছে, তখন না দিয়া পারিব না।"

এ কথায় সূর্য বলিলেন, "তাহাই যদি হয়, তবে কুণ্ডল আর কবচের বদলে ইন্দ্রের নিকট হইতে 'এক-পুরুষ-ঘাতিনী' নামক শক্তি চাহিয়া লইবে।"

কর্ণ প্রথমে ইন্দ্রকে সামান্য ব্রাহ্মণ মনে করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুর, আপনার কি চাই?"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "তোমার ঐ কুণ্ডল আর কবচ আমাকে দাও।"

কর্ণ কুণ্ডল আর কবচের বদলে কত কিছু দিতে চাহিলেন—ধনরত্ন, গোরু বাছুর, এমন-কি, রাজ্যের কথা পর্যন্ত বাকি রাখিলেন না। ব্রাহ্মণ কি তাহা শোনেন? তিনি কেবলই বলেন, "আমার ঐ কুণ্ডল আর কবচটি চাই।"

তখন কর্ণ বুঝিতে পারিলেন, এ ব্রাহ্মণ যে-সে ব্রাহ্মণ নহে; স্বয়ং ইন্দ্র। কাজেই তিনি বলিলেন, "আমি যদি কুণ্ডল আর কবচ দেই তাহা হইলে আমাকে আপনার 'এক-পুরুষ-ঘাতিনী' শক্তি দিতে হইবে।"

ইন্দ্র বলিলেন, "আচ্ছা তাহাই হউক! এই আমার 'এক-পুরুষ-ঘাতিনী' শক্তি তোমাকে দিতেছি, কিন্তু ইহার একটা নিয়ম আছে। যেখানে আর কোনো অস্ত্রেই কাজ হইবার নহে, কেবল সেই স্থলেই এ অস্ত্র ছুঁড়িলে নিশ্চয় মৃত্যু। যেখানে-সেখানে ছুঁড়িয়া বসিলে ইহা তোমারই গায়ে পড়িবে। এ অস্ত্রে এক-জনের বেশি লোক মরে না। সেই একজন শত্রু যত বড় যোদ্ধাই হউক, তাহাকে মারিয়া আমার শক্তি আমার নিকটে চলিয়া আসিবে।"

কর্ণ তাহাতেই রাজি হইয়া ইন্দ্রের নিকট হইতে শক্তি লইলেন, এবং নিজের কুণ্ডল আর কবচ তাঁহাকে খুলিয়া দিলেন।

ইন্দ্র কর্ণের কুণ্ডল আর কবচ লইয়া গিয়াছেন, এ কথা শুনিয়া দুর্যোধনের দলের যেমন দুঃখ হইল, পাণ্ডবেরা তেমনই আনন্দ পাইলেন।

এই সময়ে পাণ্ডবেরা কাম্যক বন হইতে দ্বৈত বনে চলিয়া আসেন। ইহার কিছুদিন পরে একটি অতি আশ্চর্য ঘটনা হইয়াছিল।

কাঠে কাঠে ঘষিলে আগুন বাহির হয়। এই উপায়ে পূর্বকালের মুনি-ঋষিরা অনেক সময় আগুন জ্বালিতেন। যাঁহাদের গৃহে প্রত্যহ অগ্নির পূজা হইত, তাঁহাদের যখন-তখন আগুন জ্বালিবার একটা ব্যবস্থা না রাখিলেই চলিত না। তাঁহাদের সকলেরই 'অরণী' নামক দুখানি কাঠ থাকিত। এই কাঠ দুখানি ঘষিয়া তাঁহারা আগুন জ্বালিতেন।

ইহার মধ্যে হইয়াছিল কি—দ্বৈত বনের এক তপস্বী ব্রাহ্মণ একটা গাছে তাঁহার অরণীটি ঝুলাইয়া রাখিয়াছিলেন। একটা হরিণ আসিয়া সেই গাছে গা ঘষিতে আরম্ভ করে। ঘষিতে ঘষিতে ব্রাহ্মণের অরণীখানি কেমন করিয়া তাহার শিঙে আটকাইয়া যায়; তাহাতে হরিণও ভয় পাইয়া সেই অরণীসুদ্ধ বেগে পলায়ন করে।

তখন ব্রাহ্মণটি অতিশয় ব্যস্ত হইয়া পাণ্ডবদিগকে তাঁহার অরণী আনিয়া দিতে বলায়, পাঁচ ভাই মিলিয়া সেই হরিণের পিছু পিছু তাড়া করিলেন। কিন্তু তাহাকে তাঁহারা ধরিতে বা মারিতে তো পারিলেনই না, লাভের মধ্যে এই হইল

যে, পিপাসা আর পরিশ্রমে তাহাদের প্রাণ যায়-যায়। তখন তাঁহারা বিশ্রামের জন্য একটা গাছের তলায় বসিয়া নকুলকে জল আনিতে পাঠাইলেন।

নিকটেই একটি জলাশয় ছিল। নকুল তাহাতে নামিয়া জল খাইতে যাইতেছেন, এমন সময় এক যক্ষ আকাশ হইতে তাঁহাকে বলিল, "বাছা নকুল! ও জল আগে আমি দখল করিয়াছি। আমার কথার উত্তর দিয়া, তবে জল খাও।"

নকুল যক্ষের কথা গ্রাহ্য না করিয়া জল তুলিয়া মুখে দিলেন। সে জল পান করিবামাত্র তাঁহার মৃত্যু হইল।

এদিকে যুধিষ্ঠির নকুলের বিলম্ব দেখিয়া, সহদেবকে বলিলেন, "নকুলের কেন এত বিলম্ব হইতেছে? তুমি শীঘ্র তাহার অনুসন্ধান কর।"

সহদেব নকুলকে খুঁজিতে খুঁজিতে সেই জলাশয়ে উপস্থিত হইয়া তাঁহার মৃতদেহ দেখিবামাত্র কাঁদিয়া অস্থির হইলেন; তারপর ভয়ানক পিপাসা হওয়াতে, তিনিও জলাশয়ে নামিয়া জল খাইতে গেলেন। তখন সেই যক্ষ তাঁহাকেও বাধা দিয়া বলিল, "আগে আমার কথার উত্তর দাও, তারপর জল খাইতে পাইবে।"

যক্ষের সে কথা অমান্য করিয়া সহদেব যেই জল খাইলেন অমনি তাঁহারও মৃত্যু হইল।

এইরূপে ক্রমে সহদেবকে খুঁজিতে আসিয়া, অর্জুন, এবং অর্জুনকে খুঁজিতে আসিয়া, ভীম, সেই যক্ষের নিষেধ অমান্য করিয়া জলাশয়ের জল খাওয়ায় প্রাণত্যাগ করিলেন।

সর্বশেষে যুধিষ্ঠিরও তাঁহাদের অন্বেষণে সেই জলাশয়ের ধারে আসিয়া তাঁহাদের মৃত শরীর দর্শনে অনেক দুঃখ করার পর, জল পান করিতে উদ্যত হওয়ায়, একটা বক তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিল, "বাছা যুধিষ্ঠির! আমিই তোমার ভাইদিগকে মারিয়াছি। আমার কথার উত্তর দিয়া তবে জল খাও।"

বকের কথা শুনিয়া যুধিষ্ঠির বলিলেন, "এ-সকল মহাবীরকে বধ করা পাখির কর্ম নহে! আপনি কে?"

তখন সেই বক তালগাছপ্রায় বিশাল যক্ষরূপ ধরিয়া বলিল, "আমি যক্ষ। তোমার ভ্রাতারা আমার কথা অবহেলা করিয়া জল পান করাতে, তাহাদিগকে বধ করিয়াছি। তুমি আগে আমার কথার উত্তর দিয়া, তারপর জল খাও।"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "আপনার প্রশ্ন কি বলুন, যথাসাধ্য উত্তর দিতে চেষ্টা করিব।"

এ কথায় যক্ষ যুধিষ্ঠিরকে অনেক প্রশ্ন করিল, যুধিষ্ঠির তাহার সকল-গুলিরই উত্তর দিলেন। সকল প্রশ্নের কথা লিখিবার স্থান এ পুস্তকে নাই: দু-একটির কথা মাত্র বলিতেছি।

যক্ষ জিজ্ঞাসা করিল, "পৃথিবীর চেয়ে ভারি কে? স্বর্গের চেয়ে উঁচু কে? বাতাসের চেয়েও দ্রুতগামী কে? তৃণের চেয়েও কাহার সংখ্যা বেশি?"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "মাতা পৃথিবীর চেয়ে ভারি, পিতা আকাশের চেয়ে উঁচু, মন বাতাসের চেয়েও দ্রুতগামী, আর চিন্তার সংখ্যা তৃণের চেয়েও বেশি।"

যক্ষ জিজ্ঞাসা করিল, "কে ঘুমাইলে চোখ বোজে না? কে জন্মিয়া নড়ে-চড়ে না? কাহার হৃদয় নাই? কে নিজের বেগেতেই বড় হয়?"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "মাছ ঘুমাইলে চোখ বোজে না, ডিম জন্মিয়া নড়ে-চড়ে না, পাথরের হৃদয় নাই, নদী নিজের বেগের দ্বারা বড় হয়।"

যক্ষ জিজ্ঞাসা করিল, "সুখী কে? আশ্চর্য কি? পথ কি? সংবাদ কি?"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "যাহার ঋণ নাই, আর নিজের ঘরে থাকিয়া দিনের শেষে যে চারিটি শাক-ভাত খাইতে পায়, সেই সুখী। প্রতিদিন জীবের মৃত্যু হইতেছে, তথাপি যে, লোকে চিরদিন বাঁচিতে চায়, ইহাই আশ্চর্য। মহা-পুরুষেরা যে পথে যান, তাহাই পথ। সময় যেন পাচক, সে যেন প্রাণীদিগকে দিয়া ব্যঞ্জন রাঁধিতেছে, ইহাই সংবাদ।"

যুধিষ্ঠিরের উত্তরে সন্তুষ্ট হইয়া যক্ষ বলিল, "তোমার ইচ্ছামত একটি ভাইকে বাঁচাইতে পার।"

এ কথায় যুধিষ্ঠির বলিলেন, "তবে দয়া করিয়া নকুলকে বাঁচাইয়া দিন।"

যক্ষ জিজ্ঞাসা করিল, "ভীম আর অর্জুনকে ছাড়িয়া তুমি নকুলকে বাঁচাইতে বলিলে, ইহার কারণ কি?"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "মাতা কুন্তীর এক পুত্র আমি জীবিত রহিয়াছি, এখন নকুল বাঁচিলে মাতা মাদ্রীরও একটি পুত্র থাকে; এইজন্য আমি নকুলকে বাঁচাইতে বলিয়াছি।"

এ কথায় যক্ষ অতিশয় তুষ্ট হইয়া, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব চারিজনকেই বাঁচাইয়া দিল। তারপর সে নিজের পরিচয় দিয়া বলিল, "বাছা! আমি ধর্ম। তোমার মহত্ত্ব দেখিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম, তুমি বর লও।"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "তবে সেই ব্রাহ্মণ যাহাতে তাঁহার অরণীখানি পান, তাহা করুন।"

ধর্ম বলিলেন, "তোমাকে পরীক্ষা করিবার জন্য আমিই হরিণ সাজিয়া অরণী হরণ করিয়াছিলাম; ব্রাহ্মণ তাহা পাইবেন। এক্ষণে তুমি অন্য বর চাহ।"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "আমাদের বনবাসের বারো বৎসর শেষ হইয়াছে, ইহার পরে আর-এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিতে হইবে। সে সময়ে যেন কেহ আমা-দিগকে চিনিতে না পারে, দয়া করিয়া এই বর দিন।"

ধর্ম বলিলেন, "বাছা! তোমরা ছদ্মবেশ না করিয়াও যদি পৃথিবীময় ঘুরিয়া বেড়াও, তথাপি তোমাদিগকে কেহ চিনিতে পারিবে না। এখন আর-একটি বর চাহ।"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "আমার যেন পাপে মতি না হয়, সর্বদা যেন ধর্মপথে চলিতে পারি।"

ধর্ম বলিলেন, "এ-সকল তো তোমার আছেই, এখন তাহা আরো বেশি করিয়া হইবে।" এই বলিয়া তিনি আকাশে মিলাইয়া গেলেন। তাহার পূর্বে অবশ্য ব্রাহ্মণের অরণীখানি ফিরিয়া দিতে ভুলিলেন না।

এইরূপে পাণ্ডবদিগের বনবাসের বারো বৎসর কাটিয়া গেল। আর একটি

বৎসর ভালোয়-ভালোয় কাটিলেই তাঁহাদের দুঃখের শেষ হয়। কিন্তু এই শেষের বৎসরটি অতি ভয়ানক বৎসর। এই সময়টুকু এমনভাবে কাটাইতে হইবে, যেন কেহই তাঁহাদের খবর জানিতে না পারে; জানিতে পারিলে আবার বারো বৎসর বনবাস। এ সময়ে দুর্যোধনের লোকেরা নিশ্চয়ই তাঁহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিবে। এই-সকল ধূর্তকে ফাঁকি দিয়া, একটা বৎসর কিরূপে কাটানো যায়, সকলে মিলিয়া সাবধানে তাহার পরামর্শ করিতে লাগিলেন।



জ্ঞাতবাসের সময় উপস্থিত। এই একটি বৎসর বড়ই বিপদের সময়। কোন্ দেশে কি ভাবে থাকিলে এ বিপদে রক্ষা পাওয়া যায়?

পাঞ্চাল, চেদী, মৎস্য, সুরাষ্ট্র অবন্তী প্রভৃতি অনেক ভালো ভালো দেশ আছে। ইহাদের মধ্যে মৎস্য দেশের রাজা বিরাট অতি ধার্মিক লোক। ধার্মিকেরা ধার্মিকের আশ্রয় ছাড়িয়া আর কোথায় থাকিবে? সুতরাং পাণ্ডবেরা বিরাটের নিকটেই কোনোরূপ কাজ লইয়া থাকা স্থির করিলেন।

যুধিষ্ঠির সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কে কি কাজ করিতে পারিবে, বল তো?" এ কথার উত্তরে অর্জুন বলিলেন, "আপনি কি কাজ করিবেন?"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "আমি ব্রাহ্মণ সাজিয়া বিরাটের সভাসদ (অর্থাৎ সভার লোক) হইব। বলিব, 'আমার নাম কঙ্ক, খুব পাশা খেলিতে পারি।' আরো জিজ্ঞাসা করিলে বলিব, 'আমি যুধিষ্ঠিরের বন্ধু ছিলাম।' এখন ভীম বল তো. তুমি কি বলিবে?" ভীম বলিলেন, "আমি রাঁধুনি ব্রাহ্মণ সাজিয়া যাইব। পরিচয় চাহিলে বলিব, 'আমার নাম বল্লভ, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের পাচক ছিলাম. একটু-আধটু পালোয়ানীও জানি।' সে দেশের রাঁধুনিদের চেয়ে ঢের ভালো ব্যঞ্জন রাঁধিয়া, আর এই-বড় কাঠের বোঝা বহিয়া আনিয়া, হুকুম পাইলে দু-একটা পালোয়ান বা খ্যাপা হাতিকেও ঠ্যাঙ্গাইয়া আমি রাজাকে খুশি রাখিব।"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "আচ্ছা, অর্জুন কি করিবে?" অর্জুন বলিলেন. "আমি রাজবাড়ির মেয়েদের সঙ্গীতের শিক্ষক হইয়া থাকিব। এ-সব লোকে স্ত্রীলোকের পোশাক পরে, আমিও তাহাই পরিব। ধনুকের গুনের ঘষায় হাতে যে দাগ হইয়াছে, বালা পরিয়া তাহা ঢাকিব। স্ত্রীলোকের মতন কাপড় পরিব, মাথায় বেণী রাখিব, কানে কুন্ডল দুলাইব, কথাবার্তাও স্ত্রীলোকের মতন করিয়া কহিব। তাহা হইলেই আর কেহ আমাকে চিনিতে পারিবে না। পরিচয় চাহিলে বলিব, 'আমার নাম বৃহন্নলা, আমি দ্রৌপদীর নিকট ছিলাম'।"

তারপর যুধিষ্ঠির নকুলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "নকুল! তুমি কি করিবে?"

নকুল বলিলেন, "আমি বলিব, 'আমার নাম গ্রন্থিক; মহারাজ যুধিষ্ঠিরের ঘোড়াশালের কর্তা ছিলাম। ঘোড়ার কথা আমার মতন কেহই জানে না'।"

তারপর যুধিষ্ঠির সহদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সহদেব কি করিবে?"

সহদেব বলিলেন, "আমি গোরু দেখা-শোনার কাজ লইব। বলিব, 'আমার নাম তন্ত্রিপাল। আমি গোরু সম্বন্ধে সকলরকম কাজ বিশেষরূপে জানি'।"

সকলের শেষে যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন, "দ্রৌপদী তো কখনো কোনো ক্লেশের কাজ করেন নাই, তিনি এই এক বৎসর কি করিয়া কাটাইবেন?"

দ্রৌপদী বলিলেন, "আমি বিরাট রাজার রানী সুদেষ্ণার নিকট কাজ লইব। জিজ্ঞাসা করিলে বলিব, 'আমি সৈরিন্ধ্রী (অর্থাৎ যে চুল বাঁধা, মালা গাঁথা ইত্যাদি কাজ করে,) মহারাজ যুধিষ্ঠিরের বাড়িতে দ্রৌপদীর নিকট ছিলাম'।"

এইরূপে সকল পরামর্শ স্থির করিয়া পাণ্ডবেরা সঙ্গের লোকদিগকে বিদায় দিলেন। চাকরদিগকে বলিলেন, "তোমরা দ্বারকায় চলিয়া যাও।" ধৌম্যকে বলিলেন, "সারথি, পাচকগণ, আর দ্রৌপদীর দাসীকে লইয়া আপনি রাজা দ্রুপদের বাড়িতে গিয়া থাকুন।"

তারপর তাঁহারা উপস্থিত ব্রাহ্মণ ও মুনিদিগের আশীর্বাদ লইয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। কোথায় গেলেন, তাহা কেহই জানিতে পারিল না।

অবশ্য আমরা জানি, তাঁহারা মৎস্যদেশে গিয়াছিলেন। সঙ্গে তাঁহাদের অস্ত্র-শস্ত্র ও বর্ম প্রভৃতি ছিল।

পাহাড়ের আড়াল দিয়া, বনের ভিতর দিয়া, বহু কষ্টে, অতি সাবধানে পথ চলিয়া পাণ্ডবেরা ক্রমে দশার্ণ, পাঞ্চাল, শূরসেন প্রভৃতি দেশ অতিক্রম পূর্বক শেষে বিরাট নগরের কাছে উপস্থিত হইলেন। তখন তাঁহাদের মনে এই চিন্তা হইল যে, 'এই-সকল অস্ত্র লইয়া নগরের ভিতরে গেলে, লোকে আমাদিগকে চিনিয়া ফেলিবে। সুতরাং এইগুলিকে একটা ভালো জায়গায় লুকাইয়া রাখা আবশ্যক।'

সেইখানে একটা শ্মশানের পাশে পাহাড়ে উপরে প্রকাণ্ড শমী গাছ ছিল। অর্জুন বলিলেন, "এই গাছে অস্ত্র-শস্ত্র রাখিলে কেহই জানিতে পারিবে না।"

সেই শমী গাছে উঠিয়া, নকুল তাঁহাদের সকলের ধনুক, তূণ, শঙ্খ, বর্ম, খড়্গ প্রভৃতি বেশ করিয়া বাঁধিয়া রাখিলেন। তারপর শ্মশান হইতে একটা মড়া আনিয়া তাহাও ঐ গাছে বাঁধিলেন। মড়া বাঁধিবার কারণ এই যে, তাহা হইলে গন্ধে, আর ভূতের ভয়ে, কেহ আর সে গাছের নিকটে আসিবে না।

তারপর তাঁহারা তাঁহাদের প্রত্যেকের আর-একটি করিয়া নাম রাখিলেন। যুধিষ্ঠির, 'জয়' ; ভীম, 'জয়ন্ত' ; অর্জুন, 'বিজয়' ; নকুল, 'জয়ৎসেন' ; সহদেব, 'জয়দ্বল' ; এগুলি হইল তাঁহাদের গোপনীয় নাম, অর্থাৎ এ-সকল নামের কথা আর কেহ জানিতে পারিল না। কাজেই ইহার কোনো-একটা নাম লইলে কেহ বুঝিয়া ফেলিবারও ভয় রহিল না।

মহারাজ বিরাট পাত্রমিত্র সমেত সভায় বসিয়া আছেন, এমন সময় যুধিষ্ঠির

ব্রাহ্মণের বেশে, পাশা হাতে ধীরে ধীরে তথায় উপস্থিত হইলেন। দূর হইতে তাঁহাকে দেখিয়া, বিরাট সভার লোকদিগকে বলিলেন, "উনি কে আসিতেছেন? গরিবের মতো পোশাক বটে, কিন্তু চেহারা দেখিলে মনে হয় যেন কোনো রাজা হইবেন।"

যুধিষ্ঠির আস্তে আস্তে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, "মহারাজের জয় হউক। দুঃখে পড়িয়া আপনার কাছে আসিয়াছি। দয়া করিয়া আশ্রয় দিলে বড় উপকার হয়।"

বিরাট বলিলেন, "তুমি কে বাপু? কোথা হইতে আসিতেছ? কি কাজ করিতে পার?"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "মহারাজ, আমি ব্রাহ্মণ; আমার নাম কঙ্ক। রাজা যুধিষ্ঠিরের বন্ধু ছিলাম। আমি পাশা খেলায় বিশেষ দক্ষ।"

বিরাট যুধিষ্ঠিরকে দেখিয়াই ভালোবাসিয়াছিলেন, তাহাতে আবার তাঁহার নিজের পাশা খেলার খুব সখ। কাজেই তিনি যুধিষ্ঠিরকে আদর করিয়া কাছে রাখিলেন। সকলকে বলিয়া দিলেন, "ইনি আমার বন্ধু; তোমরা আমাকে যেমন মান্য কর, ইঁহাকে তেমনি মান্য করিবে।"

তারপর রসুয়ে বামুনের সাজে ভীম আসিয়া উপস্থিত; হাতা-বেড়ি হাতে, সিংহের মতন চেহারা। দূর হইতে তাঁহাকে দেখিয়াই বিরাট ভারি আশ্চর্য হইয়া গেলেন। রাজার হুকুমে কয়েকজন লোক ছুটিয়া ভীমের পরিচয় লইতে গেল; ভীম তাহাদিগকে গ্রাহ্য না করিয়া, একেবারে রাজার সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আমার নাম বল্লভ, আমি পাচক, অতি উত্তম ব্যঞ্জন রাঁধিতে পারি, আমাকে রাখিতে আজ্ঞা হউক।"

বিরাট কহিলেন, "তোমার চেহারা দেখিয়া তো তোমাকে রাঁধুনি বলিয়া মনে হয় না!"

ভীম বলিলেন, "মহারাজ! আমি রাঁধুনিই বটে; আপনার চাকর। পূর্বে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের প্রধান পাচক ছিলাম। অল্প অল্প পালোয়ানীও জানি। মহারাজ আমার কাজ দেখিলে সন্তুষ্ট হইবেন।"

এইরূপে ভীম বিরাট রাজার রসুই মহলের কর্তা হইয়া, পরম সুখে সেখানে বাস করিতে লাগিলেন।

এদিকে দ্রৌপদী একখানি ময়লা কাপড় পরিয়া সৈরিন্ধ্রীর বেশে রাজপথ দিয়া চলিয়াছেন। পথের লোক এমন সুন্দর মানুষ আর কখনো দেখে নাই। তাহারা আশ্চর্য হইয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করে; তিনি বলেন, "আমি সৈরিন্ধ্রী; কাজ খুঁজিতেছি।" কিন্তু তাঁহার এ কথা কেহ বিশ্বাস করে না।

রানী সুদেষ্ণাও ছাদ হইতে দ্রৌপদীকে দেখিতে পাইয়াছিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি তাঁহাকে ডাকাইয়া, পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

দ্রৌপদী বলিলেন, "আমার স্বামী পাঁচজন গন্ধর্ব। কোনো কারণে তাঁহারা এখন বড়ই দুঃখে পড়িয়াছেন, আর আমি সৈরিন্ধ্রীর কাজ করিয়া দিন কাটাইতেছি। আগে আমি সত্যভামা আর দ্রৌপদীর নিকট কাজ করিয়াছিলাম।

এখন আপনার নিকট আসিয়াছি ; দয়া করিয়া আশ্রয় দিলে এখানে থাকিব।"

সুদেষ্ণা আহ্লাদের সহিত দ্রৌপদীকে সৈরিন্ধ্রীর কাজে নিযুক্ত করিলেন। দ্রৌপদী বলিলেন, "মা, আমি কখনো উচ্ছিষ্ট ছুঁই না, বা কোনো নীচ কাজ করি না। আমার গন্ধর্ব স্বামীরা যদিও দুঃখে পড়িয়াছেন, তবুও তাঁহারা আমাকে সর্বদা রক্ষা করেন। কেহ আমার অপমান করিলে, তাঁহারা তাহাকে মারিয়া ফেলেন।"

এইরূপে ক্রমে অর্জুন, সহদেব আর নকুল এক-একজন করিয়া বিরাট রাজার নিকট কাজ লইলেন। অর্জুন হইলেন রাজকুমারী উত্তরার গানের শিক্ষক। সহদেব আর নকুল হইলেন গোশাল আর ঘোড়াশালের কর্তা। অর্জুন এখন স্ত্রীলোকের মতন পোশাক পরেন, আর বাড়ির ভিতরেই থাকেন। ভীমও তাঁহার কাজ সারিয়া রান্নার মহলের বাহিরে আসিবার অবসর পান না। কাজেই তাঁহাদের কথা কেহ জানিতেও পারিল না।

এইরূপে দিন যায়। পাণ্ডবদের কাজ দেখিয়া বিরাট তাঁহাদের সকলের উপরেই বিশেষ সন্তুষ্ট। ভীম ইহার মধ্যেই জীমূত নামক একটা পালোয়ানকে হারাইয়া রাজার নিকট অনেক পুরস্কার পাইয়াছেন! সুতরাং মোটের উপরে তাঁহারা সুখেই আছেন বলিতে হইবে।

কিন্তু হায়! দ্রৌপদীর সময় নিতান্তই কষ্টে কাটিতে লাগিল। সুদেষ্ণা তাঁহাকে খুবই স্নেহ করিতেন, কিন্তু সুদেষ্ণার ভাই কীচক তাঁহাকে দেখিতে পাইলেই অপমান করিত। দ্রৌপদী তাহা সহিতে না পারিয়া তাহাকে কত গালি দিতেন, কত মিনতি করিতেন, কত ভয় দেখাইতেন। দুরাত্মা তথাপি আরো বেশি করিয়া তাঁহাকে অপমান করিত।

একদিন সুদেষ্ণা কিছু খাবার আনিবার জন্য দ্রৌপদীকে কীচকের বাড়িতে পাঠান। সেদিন তাঁহার প্রতি সে এত অভদ্রতা করে যে, তিনি রাগ থামাইতে না পারিয়া তাহাকে ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দেন। তারপর ভয়ে তিনি ছুটিয়া একেবারে রাজসভায় গিয়া উপস্থিত হন।

পাপিষ্ঠ সেইখানে তাঁহার পিছু পিছু ছুটিয়া গিয়া, তাঁহার চুলের মুঠি ধরিয়া তাঁহাকে মাটিতে ফেলিয়া, তাঁহার গায়ে লাথি মারিল। সেখানে যুধিষ্ঠির আর ভীম উপস্থিত ছিলেন ; তাঁহাদের মনে ইহাতে কি ভয়ানক ক্লেশ হইল বুঝিতে পার। ভীম রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে ক্রমাগত একটা গাছের দিকে তাকাইতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠির দেখিলেন সর্বনাশ উপস্থিত! ভীম হয়তো তখন ঐ গাছ লইয়া সভার সকলকে গুঁড়া করিবেন। তাই তিনি ভীমকে শান্ত হইতে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, "কি পাচক ঠাকুর, কাঠের জন্য গাছের দিকে তাকাইতেছ? কাঠের গাছ বাহিরে গিয়া খোঁজ।"

সভার লোকেরা কীচকের অনেক নিন্দা করিতে লাগিল, কিন্তু রাজা তাহাকে কিছুই বলিলেন না। কীচককে তিনি বড়ই ভয় করিতেন। সে তাঁহার সেনাপতি ছিল ; তার জোরেই তিনি রাজ্য করিতেন। বাস্তবিক বিরাট কেবল নামেই সে দেশের রাজা ছিলেন, দেশ শাসন করিত কীচক।

দ্রৌপদীর কষ্ট দেখিয়া যুধিষ্ঠির বলিলেন, "সৈরিন্ধ্রী! ঘরে যাও, তোমার গন্ধর্ব স্বামীরা সময় বুঝিয়া হয়তো ইহার বিচার করিবেন।"

এ কথায় দ্রৌপদী চোখের জল মুছিয়া বাড়ির ভিতর চলিয়া গেলেন। সেখানে সুদেষ্ণা তাঁহার নিকট সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, "তুমি যদি বল তবে দুষ্টকে এখনই কাটিয়া ফেলি।"

দ্রৌপদী বলিলেন, "আমার যাঁহারা আছেন, তাঁহারাই তাহাকে বধ করিবেন।"

রাত্রিতে দ্রৌপদী চুপিচুপি ভীমের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। ভীম আগে হইতেই প্রস্তুত হইয়া আছেন! এতক্ষণ যে কীচককে মারেন নাই, সে কেবল লোকে জানিতে পারার ভয়ে। নির্জন স্থানে তাহাকে পাইলে আর তিনি এক মুহূর্তও দেরি করিতেন না।

রাজবাড়ির মেয়েদের সঙ্গীতের ঘরটি ঠিক এইরূপ নিরিবিলি স্থান ছিল। সে স্থানে দিনের বেলায় মেয়েরা নাচ-গান করিত, রাত্রিতে কেহ সেখানে থাকিত না। কোনো কারণে সেদিন ভোর রাত্রে কীচকের একেলা সেই ঘরে যাওয়ার দরকার ছিল। ভীম তাহা জানিতে পারিয়া তাহার আগেই চুপিচুপি সেখানে গিয়া, চাদর মুড়ি দিয়া শুইয়া রহিলেন।

অনেক রাত্রে কীচক সেখানে আসিয়াছে। অন্ধকারে ভীমকে দেখিয়া সে মনে করিল, বুঝি দ্রৌপদী সেখানে শুইয়া আছেন। তাই দুষ্ট তাঁহার সঙ্গে তামাশা আরম্ভ করিল। সে বলিল, "বাড়ির লোক বলে, আমার মতন সুন্দর মানুষ আর নাই।"

তাহাতে ভীম বলিলেন, "আর আমার এই হাতখানির মতো মোলায়েম হাতও আর কো—থা—ও নাই!"

এই বলিয়াই তিনি সেই দুষ্টের চুলের মুঠি ধরিলেন। তারপর কি হইল বুঝিয়া লও।

কীচকও যেমন-তেমন বীর ছিল না, সে খানিকক্ষণ খুবই যুদ্ধ করিল। কিন্তু ভীমের কাছে তাহার বড়াই আর কতক্ষণ খাটিবে? সেই 'মোলায়েম' হাতের চড় ভালো মতে খাইয়া আর তাহার বেশি কথা কহিতে হইল না। তখন ভীম সেই দুষ্টকে ধরিয়া তাহার এমনি সাজা করিলেন যে, তাহার হাড়গোড় ভাঙিয়া, হাত-পা আর মাথা পেটের ভিতর ঢুকিয়া, একতাল মাংস মাত্র অবশিষ্ট রহিল। আজও কেহ কাহাকেও নিতান্ত ভয়ানক সাজা দিলে, লোকে বলে, 'কীচক বধ করিয়াছে।'

তারপর দ্রৌপদীকে ডাকিয়া কীচকের দশা দেখাইয়া ভীম চুপিচুপি নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন। লোকে দ্রৌপদীর নিকট শুনিল যে, তাঁহার গন্ধর্ব স্বামিগণের হাতেই কীচকের সাজা হইয়াছে।

এই ঘটনার সংবাদে কীচকের ভাইয়েরা সেখানে আসিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে তাহাকে শ্মশানে লইয়া চলিল। তাহারা তাহাকে লইয়া ঘরের বাহিরে আসিবার সময় দ্রৌপদী সেখানে দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র দুষ্টেরা বলিল,

"এই হতভাগীর জন্যই তো আমাদের দাদার প্রাণ গেল। চল তাঁহার সঙ্গে ইহাকেও নিয়া পোড়াই।" এই বলিয়া তাহারা তাড়াতাড়ি বিরাটের নিকট গিয়া বলিল, "যাহার জন্য কীচক মরিয়াছেন, সেই হতভাগী সৈরিন্ধ্রীকেও আমরা তাঁহার সঙ্গে পোড়াইতে চাহি।"

বিরাট এই-সকল দুষ্ট লোককে বড়ই ভয় করিতেন, সুতরাং তিনি উহাদের কথায় রাজি হইলেন।

হায় হায়! যাঁহার পায়ের ধূলা পাইলে লোকে আপনাকে ধন্য মনে করিত, দেবতারা পর্যন্ত যাঁহাকে সম্মান করিয়া চলিতেন, সেই দ্রৌপদী দেবীর কপালে কিনা এতই দুঃখ আর অপমান ছিল! দুরাত্মারা তাঁহাকে কীচকের সঙ্গে শ্মশানে লইয়া চলিল, একটি লোকও তাহাদিগকে বারণ করিল না। দ্রৌপদী কেবল এই বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, "হে জয়, জয়ন্ত, বিজয়, জয়ৎসেন, জয়দ্বল তোমরা কোথায়? আমাকে রক্ষা কর!"

ভীম তাঁহার ভয়ানক কার্য শেষ করিয়া সবে গিয়া একটু নিদ্রার আয়োজন করিতেছেন, এমন সময় দ্রৌপদীর সেই কান্না তাঁহার কানে গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ তাড়াতাড়ি পোশাক বদলাইয়া একটা গোপনীয় পথে শ্মশানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে দশ ব্যাম (পঁয়ত্রিশ হাত ; সাড়ে তিন হাতে এক ব্যাম) লম্বা প্রকাণ্ড একটা গাছ ছিল ; সেই গাছ তুলিয়া লইয়া তিনি যখন ঘোরতর গর্জনে সেই দুরাত্মাদিগকে তাড়া করিলেন, তখন তাঁহাকে নিতান্তই ভয়ংকর দেখা গিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহারা তাঁহাকে দেখিবামাত্রই "বাবা গো, ঐ গন্ধর্ব আসিতেছে!" বলিয়া দ্রৌপদীকে ফেলিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে পলাইতে লাগিল। কিন্তু পলাইয়া আর কতদূর যাইবে? ভীম সেই গাছ দিয়া দেখিতে দেখিতে তাহাদের মাথা গুঁড়া করিয়া দিলেন। উহারা একশত পাঁচজন ছিল : তাহারা একটিও প্রাণ লইয়া ঘরে ফিরিতে পারিল না।

তারপর দ্রৌপদীকে শান্ত করিয়া ভীম পুনরায় ঘরে চলিয়া আসিলেন।

এদিকে দেশের সকল লোক গন্ধর্বের ভয়ে নিতান্তই ব্যস্ত হইয়া উঠিল। নিজে রাজা আসিয়া রানীকে বলিলেন, "এই মেয়েটি আমাদের এখানে থাকিলে তো বড়ই ভয়ের কথা দেখিতেছি। ইহাকে বল, সে অন্যত্র চলিয়া যাউক।"

দ্রৌপদী ঘরে ফিরিবামাত্রই সুদেষ্ণা তাঁহাকে এ কথা জানাইলেন। তাহা শুনিয়া দ্রৌপদী বলিলেন, "মা, আর তেরোটি দিন দয়া করিয়া অপেক্ষা করুন, তারপর আমি এখান হইতে চলিয়া যাইব। এই সময়ের মধ্যেই আমার স্বামিগণের দুঃখ দূর হইবে।"

দুঃখ দূর হওয়ার অর্থ বোধহয় বুঝিয়াছ। অর্থাৎ আর তেরো দিন গেলেই অজ্ঞাতবাসের এক বৎসর শেষ হইবে।

অজ্ঞাতবাসের সময় ফুরাইয়া আসিল। এতদিন দুর্যোধনের দলের লোকেরা কি করিতেছিলেন? তাঁহারা দেশ-বিদেশে লোক পাঠাইয়া প্রাণপণে পাণ্ডবদিগকে খুঁজিয়াছেন, কিন্তু কোনোমতেই তাঁহাদের সন্ধান করিতে পারেন নাই! দূতেরা ফিরিয়া আসিয়া খালি এক কথাই বলে, "মহারাজ, কত খুঁজিলাম, কোথাও

পাণ্ডবদিগকে দেখিতে পাইলাম না।"

দূতগণের কথা শুনিয়া কৌরবেরা যারপরনাই চিন্তিত হইলেন। যাহা হউক, দূতেরা এই একটা ভালো সংবাদ আনিল যে বিরাটের সেনাপতি কীচক মারা গিয়াছে। এই কীচকের জন্য সকল রাজাই বিরাটকে ভয় করিয়া চলিতেন। দুর্যোধনের সভায় তখন ত্রিগর্ত দেশের রাজা সুশর্মা উপস্থিত ছিলেন। বিরাট কীচকের সাহায্যে এই সুশর্মাকে বার বার পরাজয় করাতে, ইঁহার মনে বিরাটের উপরে চিরকালই ভারি রাগ ছিল। এখন কীচক মারা যাওয়াতে সুশর্মা ভাবিলেন যে, সেই-সকল পরাজয়ের শোধ লওয়ার উত্তম সুযোগ উপস্থিত। তাই তিনি, এই বেলা বিরাটের রাজ্য আক্রমণ করিয়া তাঁহার ধনরত্ন ও গোরুবাছুর কাড়িয়া লইবার জন্য কৌরবদিগকে খ্যাপাইয়া তুলিলেন।

কৌরবদিগের মধ্যে দুর্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ প্রভৃতির মতো লোক থাকিতে কি আর অন্যায় কাজের জন্য তাঁহাদিগকে খ্যাপাইয়া তুলিতে বেশি সময় লাগে? সুশর্মা কথাটা প্যাড়িতে না পাড়িতেই স্থির হইল যে, তিনি তখনই বিরাটের গোয়ালাদিগকে তাড়াইয়া দিয়া তাঁহার গোরু চুরি করিতে যাইবেন, কৌরবেরা তাহার পরের দিনই দলবল সমেত গিয়া সেই সৎকার্যের সহায়তা করিবেন। এমন সুযোগ পাইয়া সুশর্মা আর একটুও সময় নষ্ট করিলেন না।

বিরাট সভায় বসিয়া আছেন, এমন সময় এক গোয়ালা ঊর্ধ্বশ্বাসে সেখানে আসিয়া সংবাদ দিল, "মহারাজ! ত্রিগর্ত দেশের লোকেরা আমাদিগকে পরাজয় করিয়া হাজার হাজার গোরু লইয়া গিয়াছে।"

যেই এ সংবাদ দেওয়া, অমনি রাজ্যময় হুলস্থূল পড়িয়া গেল। চারিদিকে কেবলই 'সাজ, সাজ!' 'ধর, ধর!' 'মার, মার!' শব্দ। সিপাহী, সৈন্য, রথ, হাতি, ঘোড়া, সব সাজিয়া প্রস্তুত হইল ; নিশান উড়িতে লাগিল। মেঘের গর্জনের ন্যায় রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল। তাহার সহিত অস্ত্রের ঝন্ ঝন্ মিশিয়া গেল।

যোদ্ধারা বর্ম আঁটিয়া অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া প্রস্তুত। নিজে বিরাট সাজিয়াছেন ; তাঁহার ভাই শতানিক সাজিয়াছেন ; জ্যেষ্ঠ পুত্র শঙ্খও সাজিয়াছেন।। আর আর যোদ্ধার তো কথাই নাই। যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল আর সহদেবকেও রাজা যুদ্ধের পোশাক পরাইয়া উত্তম-উত্তম অস্ত্র দিয়া চমৎকার রথে চড়াইয়া সঙ্গে লইয়াছেন।

বেলা প্রায় শেষ হইয়াছে, এমন সময় দুই দলের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অন্ধকারের সহিত সেই যুদ্ধ আরো ঘনাইয়া আসিল।

দুঃখের বিষয়, আয়োজনের ঘটা যেমন হইয়াছিল, আসল যুদ্ধটা তেমন করিয়া হইতে পারে নাই। প্রথমে কয়েক ঘণ্টা খুবই যুদ্ধ হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার পরেই দেখা গেল যে, সুশর্মা বিরাটের সারথিকে মারিয়া তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছেন। তখন বিরাটের সৈন্যগণ রণস্থল ছাড়িয়া, যে যেদিকে পারিল, পলায়ন করিল।

এদিকে যুধিষ্ঠির ভীমকে বলিতেছেন, "ভীম, দেখিতেছ কি? বিরাটকে তো লইয়া গেল! শীঘ্র তাঁহাকে ছাড়াইয়া আন! এতদিন যাঁহার আশ্রয়ে সুখে

বাস করিলাম, এ সময়ে তাঁহার উপকার করা উচিত।"

ভীম বলিলেন, "হাঁ নিশ্চয়! এই দেখুন না ; আমি এই গাছ দিয়া—"

গাছের নাম শুনিয়া যুধিষ্ঠির ব্যস্তভাবে বলিলেন, "না না! গাছ লইয়া নয়। তাহা হইলেই তোমাকে চিনিয়া ফেলিবে। তুমি সাধারণ লোকের মতো অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া যাও। নকুল তোমার সঙ্গে যাউক।"

ভীম তাহাতেই রাজি হইয়া চলিয়া গেলেন। হাতে গাছ না থাকিলেই কি! ভীম তো! বিরাটকে তিনি ডাকিয়া বলিলেন, "ভয় নাই!" তাহা শুনিয়া সুশর্মা পিছনের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, একটা কি অদ্ভুত মানুষ ঝড়ের মতন ছুটিয়া আসিতেছে! দেখিতে দেখিতে সেই অদ্ভুত মানুষ গদার ঘায় তাঁহার হাতি, ঘোড়া, সিপাহী প্রায় শেষ করিয়া ফেলিল!

সুশর্মা আর উপায় না দেখিয়া ভীমের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। কিন্তু যুদ্ধ আর করিবেন কি, তাহার পূর্বেই ভীমের গদার ঘায় তাঁহার রথের ঘোড়া আর সারথি চুরমার হইয়া গিয়াছে। ততক্ষণে সহদেব প্রভৃতিও ভীমের সাহায্য করিতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন ; নিজে বিরাটও ভরসা পাইয়া ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছেন।

সুশর্মা ভাবিলেন, 'বড় বিপদ! এই বেলা পলাই!'

কিন্তু হায়! যুদ্ধের সময় ভীমের সম্মুখ হইতে পলাইবার যেমন দরকার হয়, কাজটি তেমনি কঠিন হইয়া উঠে! সুশর্মা কয়েক পা যাইতে না যাইতেই ভীম তাঁহার চুলের মুঠি ধরিয়া বসিলেন! তারপর আছাড়, কীল, চড় প্রভৃতি কোনো সাজাই বাকি রহিল না—বাকি রহিল খালি প্রাণ বাহির করিয়া দেওয়া।

তখন বিরাটের গোরু ও সুশর্মাকে লইয়া সকলে এক জায়গায় আসিয়া মিলিলেন। সেখানে যুধিষ্ঠিরের ইচ্ছামত সুশর্মাকে কিছু মিষ্ট উপদেশ দিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইল। এই ঘটনায় বিরাট যে পাণ্ডবদের উপর নিতান্তই সন্তুষ্ট হইলেন, এ কথা বলাই বাহুল্য। তিনি বলিলেন, "আপনাদের কৃপায় আজ আমার প্রাণ, মান সবই বজায় রহিল। এখন বলুন, আপনাদিগকে কি দিয়া সন্তুষ্ট করিব?"

এ কথার উত্তরে যুধিষ্ঠির বলিলেন, "মহারাজ যে শত্রুর হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছেন, ইহাই আমাদের যথেষ্ট পুরস্কার। আপনি সুখে থাকুন।"

তারপর যুদ্ধ জয়ের সংবাদ লইয়া দূতেরা বিরাট নগরের দিকে ছুটিয়া চলিল। অন্য সকলে সে রাত্রি যুদ্ধক্ষেত্রে কাটাইয়া পরদিন বাড়ি ফিরিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

এদিকে বিরাট নগরে অনেক বড়-বড় ঘটনা ঘটিতেছিল। বিরাট দলবল লইয়া ত্রিগর্ত দেশে যুদ্ধ করিতে গিয়াছেন, বাড়িতে রাজপুত্র উত্তর আর কয়েকজন কর্মচারি ছাড়া আর কেহ নাই। ইহার মধ্যে দুর্যোধন অসংখ্য সৈন্য আর ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, শকুনি, দুঃশাসন প্রভৃতি বড়-বড় বীর সমেত আসিয়া মৎস্য দেশে উপস্থিত। তাঁহারা আসিয়াই বিরাটের গোয়ালাদিগকে ঠেঙ্গাইয়া, একেবারে ষাট হাজার গোরু লইয়া প্রস্থান করিলেন। গোয়ালারা মার খাইয়া

চ্যাঁচাইতে চ্যাঁচাইতে আসিয়া রাজবাড়িতে খবর দিল।

পূর্বেই বলিয়াছি, তখন রাজবাড়িতে আর যোদ্ধা ছিল না ; ছিলেন কেবল রাজপুত্র উত্তর। তিনি বাড়ির ভিতর হইতে এই সংবাদ শুনিয়া স্ত্রীলোকদিগের নিকট বাহাদুরি লইবার জন্য বলিতে লাগিলেন, "কি করি, একজন সারথি নাই। ভালো একজন সারথি পাইলে, আমি ভীষ্ম-টিষ্মকে মারিয়া, এখনই গোরু ছাড়াইয়া আনিতাম। কৌরবেরা দেশ খালি পাইয়া গোরু চুরি করিয়া নিতেছে ; আমি সেখানে থাকিলে দেখিতাম, কেমন করিয়া নেয়।"

এ কথা শুনিয়া অর্জুন চুপিচুপি দ্রৌপদীকে কি যেন শিখাইয়া দিলেন, তারপর দ্রৌপদী আসিয়া উত্তরকে বলিলেন, "রাজপুত্র, আপনাদের বৃহন্নলা নামক ঐ হাতি হেন সুশ্রী ওস্তাদটি আগে অর্জুনের সারথি ছিলেন, উনি তাঁহারই শিষ্য, আর যুদ্ধেও তাঁহার চেয়ে বড় কম নহেন। পাণ্ডবদের ওখানে থাকার সময় তাঁহার কথা আমি বেশ করিয়া জানিয়াছি। এমন সারথি আর কোথাও নাই।"

উত্তর বলিলেন, "তাহা তো বুঝিলাম ; কিন্তু আমি নিজে উঁহাকে কেমন করিয়া আমার সারথি হইতে বলি?"

দ্রৌপদী বলিলেন, "আপনার ভগ্নী উত্তরা বলিলে, উনি নিশ্চয় রাজি হইবেন। আর উঁহাকে সঙ্গে নিলে, আপনারও যুদ্ধে জিতিয়া আসা নিশ্চিত।"

উত্তরাকে অর্জুন নিজের কন্যার মতো স্নেহ করিতেন ; তাঁহার আব্দার তিনি কিছুতেই না রাখিয়া পারিতেন না। উত্তরের কথায় রাজকুমারী যখন অর্জুনের নিকট আসিয়া, মধুর স্নেহ আর আদরের সহিত, তাঁহাকে সারথি হইবার জন্য অনুরোধ করিলেন, তখন আর তাঁহার "না" বলিবার উপায় রহিল না। আর তাঁহার "না" বলিবার ইচ্ছাও ছিল না। সুতরাং তিনি উত্তরার সঙ্গে সঙ্গেই রাজপুত্রের নিকট চলিলেন। উত্তর তাঁহাকে বলিলেন, "বৃহন্নলা! আমি কৌরবদের হাত হইতে গোরু ছাড়াইয়া আনিতে যাইব। তুমি আমার সারথি হইবে?"

অর্জুন বলিলেন, "আমি গাইয়ে-বাজিয়ে মানুষ, সারথি-ফারথি হওয়া কি আমার কাজ? নাচিতে বলিলে বরং চেষ্টা করিতে পারি।"

উত্তরা বলিলেন, "আগে তো সারথির কাজটা চালাইয়া দাও শেষে নাচিবে এখন।"

এইরূপে হাসি তামাশার ভিতরে অর্জুন সারথির সাজ পরিতে লাগিলেন। ভঙ্গির আর সীমা নাই। যেন কতই আনাড়ি, জন্মেও যেন বর্ম চোখে দেখেন নাই ; সেটাকে উল্টা করিয়া পরিয়াই বসিলেন। মেয়েরা তো তাহা দেখিয়া হাসিয়া কুটিপাটি।

যাহা হউক, শেষে সাজগোজ করিয়া দুজনেই রওয়ানা হইলেন। যাইবার সময় উত্তরা বলিলেন, "ভীষ্ম, দ্রোণ, এদের পোশাকগুলি কিন্তু আনা চাই ; আমরা পুতুল সাজাইব।"

তাহাতে অর্জুন হাসিয়া বলিলেন, "তোমার দাদা যদি উঁহাদিগকে পরাজয়

করিতে পারেন, তবে আনিব।”

এইরূপে তাঁহারা যাত্রা করিলেন। উত্তরের উৎসাহ আর ধরে না ; তিনি ক্রমাগতই বলিতেছেন, “কোথায় গেল কৌরবেরা? বৃহন্নলা, শীঘ্র চল! এখনই গোরু ছাড়াইয়া আনিব!”

অর্জুন রথ চালাইতে কিছুমাত্র ত্রুটি করিলেন না। খানিক পরেই তাঁহারা সেই শ্মশানে আর শমী গাছের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখান হইতে কৌরবদিগের সৈন্য দেখা যাইতেছিল, যেন সাগরের জল, পৃথিবী ছাইয়া ফেলিয়াছে!

সেই সৈন্যের দল দেখিয়াই ভয়ে উত্তরের মুখ শুকাইয়া গেল! তিনি বলিলেন, “ও বৃহন্নলা! আমাকে এ কোথায় আনিলে? আমি ছেলেমানুষ, এত এত সৈন্য আর ভয়ানক বীরের সহিত কেমন করিয়া যুদ্ধ করিব? ওমা! আমার কি হইবে? আমাকে ঘরে নিয়া চল!”

অর্জুন বলিলেন, “সে কি রাজপুত্র! এত বড়াই করিয়াছিলেন, সে-সব এখন কোথায়? এখন খালি হাতে ফিরিলে লোকে বলিবে কি? আমি তো গোরু না লইয়া ঘরে ফিরিতে পারিব না।”

উত্তর বলিলেন, “গোরু যায়, সেও ভালো! গালি খাই, সেও ভালো! আমি যুদ্ধ করিতে পারিব না।”

এই বলিয়া রাজপুত্র রথ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া দে ছুট!

কি বিপদ! বুঝি বেচারা সবই মাটি করে। কাজেই অর্জুনকেও তাঁহার পিছু পিছু ছুটিতে হইল। ছুটিতে ছুটিতে তাঁহার মাথার লম্বা বেণী এলাইয়া গেল ; গায়ের চাদর হাওয়ায় উড়িতে লাগিল।

এদিকে কৌরবের লোকেরা এ-সকল ঘটনার অর্থ কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না। উত্তরকে পলাইতে আর অর্জুনকে ছুটিতে দেখিয়া, প্রথমে কেহ কেহ হাসিয়াছিল। কিন্তু তাহার পরেই তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল, “এ ব্যক্তি কে? স্ত্রীলোকের মতো কতকটা চেহারা বটে, কিন্তু আবার পুরুষের মতোও দেখিতেছি। মাথা, ঘাড়, আর হাত ঠিক অর্জুনের মতো। এ ব্যক্তি নিশ্চয় অর্জুন ; নহিলে এমন তেজীয়ান চেহারা কাহার? আর এমন সাহসই-বা কাহার, যে একেলা আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে?”

এদিকে অর্জুন একশত পা গিয়াই উত্তরের চুল ধরিয়াছেন। তখন যে উত্তরের কান্না! “ও বৃহন্নলা! শীঘ্র ঘরে চল! তোমাকে মোহর দিব, হীরা দিব, ঘোড়া দিব, রথ দিব, হাতি দিব, আমাকে ছাড়িয়া দাও!”

অর্জুন তাহাকে সাহস দিয়া বলিলেন, “রাজপুত্র, তোমার কোনো ভয় নাই। তুমি যুদ্ধ করিতে না চাহ আমার সারথি হও। আমি যুদ্ধ করিয়া গোরু ছাড়াইব।”

এইরূপে উত্তরকে শান্ত করিয়া অর্জুন তাঁহাকে রথে তুলিয়া লইয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে দ্রোণ ভীষ্মকে বলিতেছেন, “ভীষ্ম! আজ কিন্তু অর্জুনের হাতে

আমাদের রক্ষা নাই। যুদ্ধে শিবকে খুশি করিয়াছে, তারপর এতদিন ক্লেশ পাইয়া রাগিয়া আছে, ও কি আমাদিগকে সহজে ছাড়িবে?"

এ কথায় কর্ণ বলিলেন, "আমার আর দুর্যোধনের যে ক্ষমতা, অর্জুনের তাহার একআনাও নাই।"

দুর্যোধন বলিলেন, "এ যদি অর্জুন হয়, তবে তো ভালোই হইল। অজ্ঞাত-বাস শেষ না হইতেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, কাজেই আবার বারো বৎসর ইহাদিগকে বনবাস করিতে হইবে।"

ইঁহাদের এইরূপ কথাবার্তা চলিয়াছে। ততক্ষণে অর্জুন উত্তরকে লইয়া সেই শমীগাছের নিকটে উপস্থিত হইয়াছেন। শমীগাছের তলায় আসিয়া তিনি বলিলেন, "রাজপুত্র, গাছে উঠিয়া ঐ অস্ত্রগুলি নামাও।"

এ কথায় উত্তর ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "ও গাছে তো মড়া বাঁধা রহিয়াছে ; ছুঁইলে অশুচি হইবে যে।"

অর্জুন বলিলেন, "উহা মড়া নহে, অস্ত্র। মড়া ছুঁইতে আমি তোমাকে কেন বলিব?"

তখন উত্তর গাছে উঠিয়া অস্ত্র নামাইলেন। তারপর তাহাদের বাঁধন খুলিয়া তাহাদের চেহারা দেখিয়া, তিনি তো একেবারে অবাক। এমন অস্ত্র তিনি আর কখনো দেখেন নাই, তাই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৃহন্নলা, এ-সকল কাহার অস্ত্র?"

অর্জুন বলিলেন, "এ-সব অস্ত্র পাণ্ডবদিগের।"

পাণ্ডবদিগের নাম শুনিয়া উত্তর আরো আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, "এ-সব যদি পাণ্ডবদিগের অস্ত্র হয়, তবে তাঁহারা এখন কোথায়?"

অর্জুন বলিলেন, "তাঁহারা তোমাদের বাড়িতেই আছেন। আমি অর্জুন ; তোমার পিতার যে কঙ্ক নামে সভাসদ আছেন, তিনি যুধিষ্ঠির ; বল্লভ নামক ঐ ষণ্ডা পাচকটি ভীম ; গ্রন্থিক নামক যে লোকটি ঘোড়াশালে কাজ করে সে নকুল ; আর গোশালার-কর্তা তন্ত্রিপাল সহদেব ; তোমাদের বাড়িতে যিনি সৈরিন্ধ্রীর কাজ করেন, তিনি দ্রৌপদী।"

উত্তরের নিকট এ-সকল কথা স্বপ্নের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। পাণ্ডব-দিগের ন্যায় মহাপুরুষেরা তাঁহাদের বাড়িতে সামান্য চাকরের মতো বাস করিতেন, এ কথা কি সহজে বিশ্বাস হয়? কাজেই উত্তর অর্জুনের কথা পরীক্ষা করিবার জন্য বলিলেন, "শুনিয়াছি, অর্জুনের দশটি নাম আছে, আপনি যদি সেই অর্জুন হন, তবে সেই দশটি নাম আর তাহাদের অর্থ বলুন দেখি।"

অর্জুন বলিলেন, "অর্জুন মানে সাদা, নির্মল। আমি নির্মল কাজ করি, এইজন্য আমি অর্জুন। দেশ জয় করিয়া ধন আনি, তাই আমি 'ধনঞ্জয়'। যুদ্ধে আমি সর্বদাই জয়লাভ করি, তাই আমি 'বিজয়'। আমার রথের ঘোড়াগুলি সাদা, তাই আমি 'শ্বেতবাহন'। আমার জন্মের দিন উত্তরফাল্গুনী নক্ষত্র ছিল, তাই আমি 'ফাল্গুন'। দৈত্যদিগকে হারাইয়া ইন্দ্রের নিকট কিরীট, অর্থাৎ মুকুট পুরস্কার পাইয়াছিলাম, তাই আমি 'কিরীটী'। যুদ্ধের সময় আমি 'বীভৎস'

অর্থাৎ নিষ্ঠুর কাজ করি না, তাই আমি 'বীভৎসু'। আমি সব্য অর্থাৎ বাম হাতেও ডান হাতের ন্যায় তীর ছুঁড়িতে পারি, তাই আমি 'সব্যসাচী'। ভয়ানক শত্রুকেও আমি জয় করিয়া থাকি, তাই আমি 'বিষ্ণু'। আর রঙ কালো বলিয়া আমি 'কৃষ্ণ'।"

তখন উত্তর জোড়হাতে অর্জুনকে নমস্কার করিয়া, বিনয়ের সহিত বলিলেন, "মহাশয়! আমি না জানিয়া আপনার নিকট অনেক অপরাধ করিয়াছি, আমাকে ক্ষমা করুন।"

অর্জুন বলিলেন, "আমি তোমার উপর কিছুমাত্র অসন্তুষ্ট হই নাই। ভয় পাইও না ; অস্ত্রগুলি রথে তোল, তোমার গোরু ছাড়াইয়া দিতেছি।"

এতক্ষণে উত্তরের খুবই সাহস হইয়াছে; কারণ অর্জুন সঙ্গে থাকিলে আর কিসের ভয়? এরপর আর সারথির কাজ করিতে তিনি কিছুমাত্র আপত্তি করিলেন না।

তারপর অর্জুন হাত হইতে বালার গোছা খুলিয়া, ঝকঝকে সোনালি কবচ আঁটিয়া পরিলেন। সাদা কাপড় দিয়া মাথার বেণী বেশ করিয়া বাঁধিলেন। শেষে সেই সুন্দর রথে চড়িয়া, নানারূপ অস্ত্র মনে মনে ডাকিবামাত্র তাহারা উপস্থিত হইয়া জোড়হাতে বলিল, "আমরা আসিয়াছি, কি করিতে হইবে অনুমতি করুন।"

অর্জুন বলিলেন, "তোমরা যুদ্ধের সময় আমার সঙ্গে থাকিয়া আমার কাজ করিবে।"

এইরূপে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া, অর্জুন গাণ্ডীবে টঙ্কার ও তাঁহার বিশাল শঙ্খে ফুঁ দিবামাত্র, উত্তর ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে রথের ভিতরে বসিয়া পড়িলেন।

তাহা দেখিয়া অর্জুন বলিলেন, "কি হইয়াছে? ভয় পাইতেছ কেন?"

উত্তর বলিলেন, "উঃ! আমার কান ফাটিয়া গেল! মাথা ঘুরিয়া গেল! শঙ্খের আর ধনুকের শব্দ এমন ভয়ানক হইতে পারে তাহা তো আমি জানিতাম না!"

যাহা হউক, শেষে উত্তরের ভয় গেল।

এদিকে সেই ধনুকের টঙ্কার আর শঙ্খের শব্দ শুনিয়া, কৌরবদের আর বুঝিতে বাকি রহিল না যে, উহা অর্জুনেরই ধনুক আর শঙ্খ। দুর্যোধনের তখন ভারি আনন্দ। তিনি ভাবিলেন যে, অর্জুন সময় ফুরাইবার পূর্বেই দেখা দিয়াছেন, সুতরাং পাণ্ডবদিগকে আবার বারো বৎসর বনবাস করিতে হইবে।

কর্ণের খুবই উৎসাহ। তিনি ভাবিলেন যে, অর্জুনকে মারিয়া একটা নিতান্তই বাহাদুরির কাণ্ড করিবেন।

যাঁহারা একটু শান্ত আর ধার্মিক, তাঁহারা বলিলেন, "আজ অর্জুনের হাতে বড়ই বিপদ দেখা যাইতেছে, সকলে সাবধানে থাকুন!"

এইরূপ নানারকম কথাবার্তা হইতেছে। কেহ বলিতেছেন, "অজ্ঞাতবাসের এখনো বাকি আছে।" কেহ বলিতেছেন, "না, বাকি নাই, তাহা হইলে অর্জুন কখনোই এমন করিয়া আসিতেন না।" শেষে ভীষ্ম ভালোমতে হিসাব করিয়া

বলিলেন, "আমি দেখিতেছি পাণ্ডবদের তেরো বৎসর পূর্ণ হইয়া পাঁচ মাস ছয় দিন বেশি হইয়াছে। সুতরাং তাঁহাদের যাহা করার কথা ছিল, তাহা ভালো-রূপেই করিয়াছেন, তাহাতে ভুল নাই।"

তারপর ভীষ্মের কথায় সৈন্যদিগকে চারি ভাগ করিয়া, এক ভাগের সহিত দুর্যোধন নিজেকে বাঁচাইবার জন্য, হস্তিনায় যাত্রা করিলেন; আর একভাগ গোরু লইয়া চলিল; আর দুইভাগ লইয়া ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ প্রভৃতি অর্জুনকে আটকাইতে প্রস্তুত হইলেন।

এমন সময়ে অর্জুনের দুটি বাণ আসিয়া দ্রোণের পায়ের কাছে পড়িল। আর দুটি বাণ তাঁহার কানের কাছ দিয়া চলিয়া গেল। দ্রোণ হইলেন অর্জুনের গুরু; এতদিন পরে দেখা হইল, প্রণাম করিয়া দুটি কুশল মঙ্গল তো জিজ্ঞাসা করা চাই। এত দূরে থাকিয়া সে কাজ আর কিরূপে হইবে? তাই অর্জুন গুরুর পায়ের কাছে বাণ ফেলিয়া তাঁহাকে প্রণাম জানাইলেন, আর কানের কাছে বাণ পাঠাইয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। আর এই-সব কাজের অর্থ বুঝিতে পারিয়া দ্রোণের বিশেষ আনন্দ হইল।

এদিকে অর্জুন যখন দেখিলেন যে দুর্যোধনের পলায়ন করিবার চেষ্টা, তখন তিনি উত্তরকে বলিলেন, "আগে ঐ হতভাগার কাছে চল।"

অর্জুনের রথকে দুর্যোধনের দিকে ছুটিতে দেখিয়া কৃপ দ্রোণকে বলিলেন, "আর গোরুর ভাবনা ভাবিয়া কাজ নাই। ঐ দেখ দুর্যোধনের এখন বড়ই বেগতিক।"

অর্জুন দুর্যোধনের দিকে চলিয়াছেন, তাঁহাকে আটকাইবার জন্য চেষ্টার কিছুমাত্র ত্রুটি হইতেছে না। কিন্তু অর্জুনকে আটকায় কাহার সাধ্য? যে তাঁহার সামনে আসিতেছে, তাহারই তিনি দুর্দশার একশেষ করিতেছেন। কেহ পলাইতেছে, কেহ মারা যাইতেছে। অনেকে ভ্যাবাচেকা লাগিয়া নাহক মার খাইতেছে।

অর্জুনকে আটকাইতে গিয়া কর্ণের এক ভাই মারিয়া গেল। কর্ণ তাহাতে বিষম রাগের সহিত আসিয়া অর্জুনকে আক্রমণ করিলেন। দুজনে কিছুকাল এমনি ভয়ানক যুদ্ধ হইল যে, তাহার আর তুলনা নাই। শেষে দেখা গেল যে, কর্ণ, হাতে, মাথায়, ঊরুতে, কপালে আর ঘাড়ে, বিষম বাণের খোঁচা খাইয়া, ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিতেছেন।

এইরূপে একে একে সকলেই অর্জুনের হাতে নাকাল হইতে লাগিলেন। কর্ণ পলাইলে আসিলেন কৃপ; কৃপ পলাইলে দ্রোণ। দ্রোণকে অর্জুন কিছুতেই আগে অস্ত্র মারিতে চাহেন নাই। কিন্তু দ্রোণ অর্জুনের গায় বাণ মারিতে আরম্ভ করিলে কাজেই অর্জুনকেও যুদ্ধ করিতে হইল। তাহার ফলে দ্রোণও বেশ ফাঁপরে পড়িয়াছিলেন। ইহার মধ্যে অশ্বত্থামা আসিয়া অর্জুনের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করাতে, সেই ফাঁকে সেখান হইতে প্রস্থান করিয়া রক্ষা পান!

তারপর কর্ণ আবার আসিয়াছিলেন, আর তাঁহার তেমনি সাজাও হইয়াছিল। এবার বুকে সাংঘাতিক বাণ খাইয়া তিনি রণস্থলেই অজ্ঞান হইয়া যান।

তারপর কোনোমতে উঠিয়া পলায়ন করেন।

এইরূপে কত লোক অর্জুনের কাছে জব্দ হইল, তাহা কত বলিব? সকলে একসঙ্গে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াও তাঁহার কিছুই করিতে পারিলেন না। নিজে ভীষ্ম অজ্ঞান হইয়া গেলেন, তখন সারথি রথ হাঁকাইয়া তাঁহাকে লইয়া প্রস্থান করিল।

দুর্যোধন দুবার অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করেন। প্রথম বারে পলায়ন করিয়াছিলেন। তাহাতে অর্জুন অনেক ঠাট্টা করায় রাগের ভরে আবার আসেন। এবারে ভীষ্ম প্রভৃতি সকলে তাঁহার সাহায্য করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সকলে মিলিয়া অর্জুনের উপরে বাণ মারিতে আরম্ভ করিলে অর্জুন অতি চমৎকার উপায়ে তাঁহাদিগকে জব্দ করেন। এবার কাহাকেও মারিবার চেষ্টা না করিয়া, তিনি 'সম্মোহন' নামক অস্ত্র ছুঁড়িয়া মারিলেন। সেই আশ্চর্য অস্ত্র ছাড়িয়া শঙ্খে ফুঁ দিবামাত্রই, সকলে অজ্ঞান হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল। তখন উত্তরার সেই কথা মনে করিয়া, তিনি উত্তরকে বলিলেন, "তুমি শীঘ্র গিয়া দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা আর দুর্যোধনের গায়ের কাপড়গুলি লইয়া আইস। সাবধান ভীষ্মের কাছে যাইও না। তিনি এই অস্ত্র থামাইবার সঙ্কেত জানেন; হয়তো তিনি অজ্ঞান হন নাই।"

অর্জুনের কথা যে ঠিক, তাহার পরিচয় হাতে হাতেই পাওয়া গেল। কর্ণ, দুর্যোধন প্রভৃতির কাপড় আনিয়া, উত্তর ভালো করিয়া রথে বসিতে না বসিতেই, ভীষ্ম উঠিয়া আবার যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু অর্জুনের দশ বাণ খাইয়া বুড়ার আর যুদ্ধ করিতে হইল না।

এদিকে দুর্যোধন জাগিয়া উঠিয়াই ভারি চোটপাট আরম্ভ করিয়াছেন, "আপনারা কিজন্য অর্জুনকে এত সহজে ছাড়িয়া দিতেছেন? শীঘ্র উহার ঘাড় ভাঙিয়া দিন।"

তখন ভীষ্ম হাসিয়া বলিলেন, "দুর্যোধন, এতক্ষণ তোমার বুদ্ধি কোথায় ছিল? অজ্ঞান হইয়া যখন গড়াগড়ি যাইতেছিলে, তখন অর্জুন ইচ্ছা করিলেই তো তোমাদের কর্ম শেষ করিয়া দিতে পারিত! সে ধার্মিক লোক, তাই দয়া করিয়া তোমাদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছে। তাই ঢের; এখন প্রাণ থাকিতে ঘরে ফিরিয়া চল।

আর কি দুর্যোধনের মুখে কথা আছে! তাঁহার মাথা হেঁট হইয়া গিয়াছে, লম্বা নিশ্বাস বহিতেছে। এদিকে অর্জুন বাণের দ্বারা ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ প্রভৃতিকে নমস্কার করিয়া, আর-এক বাণে দুর্যোধনের মুকুটটি দুইখান করিয়া গোরু লইয়া শঙ্খ বাজাইতে বাজাইতে ঘরে ফিরিলেন।

ফিরিবার সময় পথে অর্জুন উত্তরকে বলিলেন, "সাবধান! ঘরে ফিরিয়া কিন্তু আমার নাম করিও না। আমরা যে তোমাদের এখানে আছি, তাহা যেন তোমাদের লোকেরা না জানিতে পারে।"

তারপর সেই শমী গাছের নিকটে আসিয়া অর্জুন আবার বৃহন্নলার বেশে, রাজপুত্রের সারথি হইয়া বসিলেন। গোয়ালারা তাঁহাদিগকে বিশ্রাম করিতে

বসাইয়া, তাড়াতাড়ি নগরে সংবাদ পাঠাইল যে, "যুদ্ধে জিতিয়া গোরু ছাড়ানো হইয়াছে।"

এদিকে রাজা বিরাট দেশে ফিরিয়া, মেয়েদের নিকট শুনিলেন যে, উত্তর বৃহন্নলাকে সারথি করিয়া, কৌরবদিগের নিকট হইতে গোরু ছাড়াইয়া আনিতে গিয়াছেন। এই সংবাদে তাঁহার মনে কিরূপ চিন্তা ও ভয় হইল, তাহা বুঝিতেই পার। তিনি তাড়াতাড়ি সৈন্যদিগকে বলিলেন, "তোমরা শীঘ্র তাহাকে খুঁজিতে যাও। হায় হায়! একে ছেলেমানুষ, তাহাতে বৃহন্নলা সারথি ; সে কি আর এতক্ষণ বাঁচিয়া আছে?"

এ কথায় যুধিষ্ঠির বলিলেন, "মহারাজ, কোনো ভয় নাই। বৃহন্নলা যখন সারথি, তখন দেব, দানব, যক্ষ প্রভৃতি সকলে মিলিয়াও রাজকুমারের কিছু করিতে পারিবে না।"

এই সময় সংবাদ আসিল, "যুদ্ধ জিতিয়া গোরু ছাড়ানো হইয়াছে।" তাহা শুনিয়া যুধিষ্ঠির বলিলেন, "বৃহন্নলা যাহার সারথি তাহার তো জয় হইবেই।"

এই সংবাদ শুনিয়া বিরাটের কি আনন্দই হইল! তিনি দূতগণকে পুরস্কার দিয়া, তখনই নগরে একটা ভারি ধুমধামের ব্যবস্থা করিলেন।

তারপর সৈরিন্ধ্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, "পাশা আন ; আমি কঙ্কের সহিত পাশা খেলিব।"

পাশা আসিল ; খেলা আরম্ভ হইল। রাজার মন আজ আনন্দে অধীর হইয়া উঠিয়াছে। তিনি পাশা খেলিতে খেলিতে বলিলেন, "কঙ্ক, আজ আমার পুত্র কৌরবদিগকে হারাইয়া দিয়াছে!"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "মহারাজ! বৃহন্নলা সারথি, হারাইবেন না তো কি?"

এ কথায় রাজা তো একেবারে চটিয়া লাল!—"কি? আমার পুত্র কি উহাদিগকে হারাইতে পারে না, তুমি যে বারবার কেবল 'বৃহন্নলা' 'বৃহন্নলা' করিতেছ? খবরদার! প্রাণের মায়া থাকে তো আর এমন বেয়াদবি করিও না!"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, এ-সকল বীরকে কি বৃহন্নলা ছাড়া আর কেহ হারাইতে পারে?"

ইহার পর রাজা আর রাগ থামাইতে না পারিয়া, যুধিষ্ঠিরের মুখে পাশা ছুঁড়িয়া মারিলেন। পাশার ঘায় যুধিষ্ঠিরের নাক দিয়া দর দর ধারে রক্ত পড়িয়া, তাঁহার অঞ্জলি ভরিয়া গেল। দ্রৌপদী তাড়াতাড়ি সোনার গামলায় জল আনিয়া, তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে দ্বারী আসিয়া বলিল, "রাজকুমার বৃহন্নলার সহিত দরজায় উপস্থিত হইয়াছেন।" তাহা শুনিয়া রাজা বলিলেন, "শীঘ্র তাহাদিগকে এখানে লইয়া আইস।"

যুধিষ্ঠির দেখিলেন যে সর্বনাশ উপস্থিত ; অর্জুন আসিয়া তাঁহার সেই অবস্থা দেখিলে, আর বিরাটকে আস্ত রাখিবেন না। কাজেই তিনি দ্বারীর কানে কানে বলিয়া দিলেন, 'বৃহন্নলা যেন এখন এখানে না আসে।' সুতরাং উত্তর একাই সেখানে আসিলেন।

উত্তর যুধিষ্ঠিরের মুখে রক্ত দেখিয়াই ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা! এমন অন্যায় কাজ কে করিল? ইঁহাকে কে আঘাত করিল?"

রাজা বলিলেন, "আমি করিয়াছি! আমি যতই তোমার প্রশংসা করি, ততই এ বামুন খালি বৃহন্নলার কথা বলে। কাজেই শেষে আমি উহাকে মারিয়াছি।"

উত্তর বলিলেন, "ব্রাহ্মণ রাগিলে সর্বনাশ হইবে। শীঘ্র ইঁহাকে সন্তুষ্ট করুন।"

এ কথায় রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করাতে, যুধিষ্ঠির বলিলেন, "মহারাজ, আমি ইহার পূর্বেই ক্ষমা করিয়াছি।"

যুধিষ্ঠিরের রক্ত পরিষ্কার হইলে, বৃহন্নলা সেখানে আসিয়া রাজাকে নমস্কার করিলেন। রাজা বৃহন্নলার সামনেই উত্তরকে বলিতে লাগিলেন, "বাবা, তুমি আমার নাম রাখিয়াছ। তোমার মতন পুত্র কি আর কাহারো হয়! এতগুলি মহা মহা বীরের সহিত না জানি কেমন করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলে!"

উত্তর বলিলেন, "বাবা! আমার কিছুই করিতে হয় নাই। এক দেবপুত্র আসিয়া আমার হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন; তিনিই কৌরবদিগকে তাড়াইয়া গোরু ছাড়াইয়া আনিয়াছেন।"

এ কথা শুনিয়া বিরাট বলিলেন, "তবে তো সেই দেবপুত্রের পূজা করিতে হয়! তিনি কোথায়?"

উত্তর বলিলেন, "তিনি কাল পরশু আবার আসিবেন।"

যুদ্ধের সংবাদে সকলেই খুব খুশি হইল। আর উত্তরা সেই কাপড়গুলি পাইয়া যে কত খুশি হইলেন, তাহা আর লিখিয়া কি বুঝাইব?

এইরূপে অজ্ঞাতবাস শেষ হইল। পাঁচ ভাই উত্তরকে লইয়া পরামর্শ করিলেন যে, আর দুদিন পরে তাঁহারা নিজের পরিচয় দিবেন। কিরূপ করিয়া পরিচয় দেওয়া হইবে, তাহাও স্থির হইল।

যেদিন পরিচয় দিবার কথা, সেদিন পাণ্ডবেরা স্নানের পর সুন্দর সাদা পোশাক আর অলংকার পরিয়া, বিরাটের সিংহাসনে গিয়া বসিলেন। বিরাট সভায় আসিয়া দেখেন, একি আশ্চর্য ব্যাপার! সভাসদ কঙ্ক সাজগোছ করিয়া তাঁহার সিংহাসনে বসিয়া আছেন। তিনি বিরক্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি কঙ্ক! আমার সিংহাসনে কেন বসিতে গেলে?"

এ কথায় অর্জুন হাসিয়া বলিলেন, "মহারাজ যুধিষ্ঠির ইন্দ্রের সিংহাসনেও বসিতে পারেন। আপনার সিংহাসনে বসাতে তাঁহার অন্যায় কি হইল?"

বিরাট বলিলেন, "ইঁনিই যদি রাজা যুধিষ্ঠির হন তবে তাঁহার ভ্রাতাগণ আর দ্রৌপদী দেবী কোথায়?"

এ প্রশ্নের উত্তরে অর্জুন একে-একে সকলেরই পরিচয় দিলেন। তারপর উত্তর অর্জুনের অনেক প্রশংসা করিয়া বলিলেন, "যে দেবপুত্র কৌরবদিগের সহিত ভয়ংকর যুদ্ধ করিয়া গোরু ছাড়াইয়াছিলেন, তিনি এই অর্জুন।"

সকল কথা শুনিয়া বিরাটের যেমন আশ্চর্য বোধ হইল, তেমনি তিনি আনন্দিতও হইলেন। পাণ্ডবদিগকে যতপ্রকারে আদর দেখানো সম্ভব মনে

হইল, তিনি তাহার কিছুই বাকি রাখিলেন না। তিনি কেবলই বলিতে লাগিলেন, "আমার কি সৌভাগ্য! কি সৌভাগ্য!" বিশেষত, অর্জুনের প্রতি তাঁহার যে কিরূপ স্নেহ হইল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তাঁহার নিতান্ত ইচ্ছা হইল, নিজের কন্যা উত্তরার সহিত তাঁহার বিবাহ দেন।

কিন্তু এ কথায় অর্জুন রাজি হইলেন না। তিনি বলিলেন, "আমি উত্তরার গুরু; তাঁহাকে সর্বদা আমার কন্যার মতো ভাবিয়া স্নেহ করিয়াছি। তিনিও আমাকে পিতার ন্যায় ভক্তি করিয়াছেন। তাঁহার সহিত কি আমার বিবাহের কথা হইতে পারে? আমার পুত্র অভিমন্যুর সহিত উত্তরার বিবাহ হউক।"

এ প্রস্তাবে সকলেই সন্তুষ্ট হইলেন। রূপে, গুণে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, বীরত্বে অভিমন্যুর মতো এমন সুপাত্র আর হয় না। কাজেই, সুন্দর দিন দেখিয়া, মহা সমারোহে অভিমন্যু আর উত্তরার বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহে নানা দেশ হইতে বিরাট এবং পাণ্ডবদিগের আত্মীয়-স্বজন আর রাজারা আসিয়াছিলেন। কৃষ্ণ, বলরাম, দ্রুপদ, ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি কেহই আসিতে বাকি ছিল না।



অভিমন্যু আর উত্তরার বিবাহের পরে, বিরাটের বাড়িতে রাজা এবং যোদ্ধাদিগের মস্ত এক সভা হইল। বিবাহে যাহারা আসিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই বড়-বড় বীর এবং সকলেই পাণ্ডবদিগের বন্ধু। ইঁহারা পরামর্শ করিতে লাগিলেন যে, এখন কি উপায়ে পাণ্ডবেরা নিজ রাজ্য ফিরিয়া পাইতে পারেন। সেই কপট পাশা খেলায় হারিয়া, পাণ্ডবেরা বারো বৎসর বনবাস আর এক বৎসর অজ্ঞাতবাসের প্রতিজ্ঞা করেন। সে প্রতিজ্ঞা তাঁহারা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছেন। তথাপি দুরাত্মা দুর্যোধনের দল এখন বলিতেছে যে, তেরো বৎসর না যাইতেই তাঁহাদের সন্ধান পাইয়াছে। আসলে তাহাদের রাজ্য ছাড়িয়া দিবার কিছুমাত্র ইচ্ছা নাই। তাই পাণ্ডবদিগের বন্ধুগণ স্থির করিলেন যে, যদি সহজে উহারা রাজ্য ছাড়িয়া না দেয়, তবে যুদ্ধ করিয়া তাহা আদায় করিতে হইবে।

এদিকে দুর্যোধন প্রভৃতিও চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন না। পাণ্ডবেরা যে তাঁহাদের রাজ্য সহজে ছাড়িবেন না, এ কথা তাঁহারা বেশ জানিতেন। সুতরাং দুই দলেই যুদ্ধের আয়োজন আরম্ভ হইল। একদিকে যেমন সৈন্য-সামন্ত এবং অস্ত্র-শস্ত্রের জোগাড় হইতে লাগিল, অন্যদিকে তেমন বড়-বড় বীরদিগকে ডাকিয়া নিজেদের দলে আনিবার চেষ্টারও ত্রুটি হইল না।

কৃষ্ণের সাহায্য পাওয়া একটা মস্ত কথা। সেজন্য দুর্যোধন আর অর্জুন প্রায় এক সময়েই দ্বারকায় যাত্রা করেন, একই সময়ে সেখানে উপস্থিত হন। কৃষ্ণ তখন নিদ্রায়। দুর্যোধন আগেই তাঁহার শয়ন-ঘরে গিয়া, তাঁহার মাথার নিকটে একটি বড় আসন অধিকার করিলেন : পরে অর্জুন আসিয়া বিনীতভাবে কৃষ্ণের পায়ের কাছে বসিলেন।

ঘুম ভাঙিলে প্রথমে পায়ের দিকেই চোখ পড়ে। কাজেই কৃষ্ণ জাগিয়া আগে দেখিলেন অর্জুনকে, তারপর দেখিলেন দুর্যোধনকে। দুজনকেই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিজন্য আসিয়াছ?"

দুর্যোধন হাসিমুখে বলিলেন, "যুদ্ধে আপনার সাহায্য চাহিতে আসিয়াছি। আর আমি আগে আসিয়াছি, কাজেই আমার কথাই আপনাকে রাখিতে হইবে।"

কৃষ্ণ বলিলেন, "আপনি আগে আসিয়াছেন সত্য। আর আমি আগে

অর্জুনকে দেখিয়াছি, এ কথাও সত্য। সুতরাং আমি দুজনকেই সাহায্য করিব। একদিকে 'নারায়ণী সৈন্য' নামক আমার অতি ভয়ংকর এক অর্বুদ সৈন্য থাকিবে, অপরদিকে আমি নিজে শুধু হাতে থাকিব, কিন্তু যুদ্ধ করিব না। এই দুয়ের মধ্যে যাহার যাহা ইচ্ছা নিতে পার। অর্জুন বয়সে ছোট, সুতরাং তাহাকেই আগে জিজ্ঞাসা করি। বল তো অর্জুন, ইহার কোন্‌টা তোমার পছন্দ হয়?"

অর্জুন বলিলেন, "আমি সৈন্য চাহি না, আপনাকেই চাহি।"

কাজেই অর্জুন পাইলেন কৃষ্ণকে, আর দুর্যোধন পাইলেন এক অর্বুদ সৈন্য। দুজনেই মনে করিলেন, 'আমি খুব জিতিয়াছি।'

সেখান হইতে দুর্যোধন বলরামের নিকট গেলেন। কিন্তু বলরাম বলিলেন, "আমি তোমাদের কাহাকেও সাহায্য করিব না, তোমরা প্রস্থান কর।"

এদিকে কৃষ্ণ আর অর্জুন স্থির করিলেন যে যুদ্ধের সময় কৃষ্ণ অর্জুনের সারথি হইবেন।

শল্য কি করিয়াছিলেন শুনিবে? সে হাসির কথা, শল্য পাণ্ডবদিগের মাতুল; মাদ্রীর ভাই। তিনি, পাণ্ডবদিগের সাহায্য করিবার জন্য, বিস্তর সৈন্য লইয়া তাঁহার রাজ্য মদ্রদেশ হইতে যাত্রা করিলেন। পথে দুর্যোধন, তাহাকে হাত করিবার জন্য, তাঁহার এতই সমাদর করিতে লাগিলেন যে, তাহাতে দেবতারও মন ভুলিয়া যায়। যেখানেই শল্য বিশ্রাম করিবেন, সেইখানেই দুর্যোধন চমৎকার একটি বৈঠকখানা করিয়া রাখিয়াছেন। বৈঠকখানাগুলি দেখিয়া শল্য ভাবিলেন, 'বাঃ! পাণ্ডবেরা আমার কতই যত্ন করিতেছে!' এ যে দুর্যোধনের চাতুরি, তাহা তিনি বুঝিতেই পারিলেন না। একটা বৈঠকখানার কারুকার্য তাঁহার বড়ই ভালো লাগায়, তিনি বলিলেন, ইহার কারিগরকে ডাক, বকশিস দিব।" অমনি নিজে দুর্যোধন কারিগর সাজিয়া আসিয়া উপস্থিত! শল্য তাঁহাকে বলিলেন, "কারিগর বল, তুমি কি পুরস্কার চাও? আমি তাহাই দিতেছি।"

দুর্যোধন বলিলেন, "মামা! আপনার কথা যেন মিথ্যা না হয়! আমি এই চাই যে, আপনি আমার দলে আসিয়া সেনাপতি হউন।"

সে-সকল লোক কথায় বড় খাঁটি ছিলেন। শল্যের আর পাণ্ডবদিগের সাহায্য করা হইল না। দুর্যোধনকে তিনি বলিলেন, "আচ্ছা তুমি ঘরে যাও, আমি যুধিষ্ঠিরের সহিত দেখা করিয়া আসিতেছি।"

যুধিষ্ঠিরের সহিত দেখা হইলে, শল্য তাহাকে এই বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন, "তোমাদের দুঃখের শেষ হইয়াছে, এখন তোমাদের শত্রুদিগকে মারিয়া সুখে রাজ্য কর।" তারপর, পথে দুর্যোধনের ফাঁকিতে পড়িয়া যে-সকল কথা বলিয়া আসিয়াছেন, তাহা জানাইলেন। সে কথায় যুধিষ্ঠির বলিলেন, "মামা! আপনি আপনার কথা রাখিয়া ভালোই করিয়াছেন; কিন্তু আমাদের একটি উপকার করিতে হইবে। কর্ণ আর অর্জুনের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, আপনি কর্ণের সারথি হইয়া, এমন উপায় করিবেন, যাহাতে তাহার তেজ কমিয়া যায়।"

শল্য বলিলেন, "সে বিষয়ে তোমরা কোনো চিন্তা করিও না। আমার যতদূর সাধ্য তোমাদের উপকার নিশ্চয় করিব।"

এইরূপে বড়-বড় বীরগণ ক্রমে দুই দলের সাহায্যার্থ উপস্থিত হইতে লাগিলেন।

পান্ডবদিগের দলে প্রথমে আসিলেন সাত্যকি। ইনি অসাধারণ যোদ্ধা, কৃষ্ণের আত্মীয় এবং অর্জুনের ছাত্র ও বন্ধু। ইঁহার সঙ্গে এক অক্ষৌহিণী[1] সৈন্য আসিল। তারপর চেদি দেশের রাজা মহাবীর ধৃষ্টকেতু এক অক্ষৌহিণী সৈন্য লইয়া আসিলেন। তারপর মগধের রাজা জরাসন্ধের পুত্র জয়ৎসেন এক অক্ষৌহিণী সৈন্য লইয়া আসিলেন। তারপর মহাবীর পান্ড্য এক অক্ষৌহিণী সৈন্য লইয়া আসিলেন।

তারপর দ্রুপদ, বিরাট ইঁহারাও অনেক লক্ষ যোদ্ধা আর সৈন্যের জোগাড় করিলেন। এইরূপে পান্ডবদের পক্ষে সাত অক্ষৌহিণী সৈন্য হইল।

দুর্যোধনের দলে--ভগদত্তের এক অক্ষৌহিণী, ভূরিশ্রবার এক অক্ষৌহিণী, শল্যের এক অক্ষৌহিণী, কৃতবর্মার এক অক্ষৌহিণী, জয়দ্রথের এক অক্ষৌহিণী, কম্বোজের রাজা সুদক্ষিণের এক অক্ষৌহিণী, ইহা ছাড়া দক্ষিণাপথ, অবন্তী প্রভৃতি নানা দেশ হইতে আরো পাঁচ অক্ষৌহিণী, সবসুদ্ধ এগারো অক্ষৌহিণী সৈন্য হইল।

এইরূপে দুই দল যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। আর অল্পদিনের মধ্যেই ভয়ংকর মারামারি কাটাকাটি আরম্ভ হইবে, রক্তে দেশ ভাসিয়া যাইবে, ঘরে ঘরে কান্না উঠিবে। দেশের যত ক্ষত্রিয় বীর, প্রায় সকলেই যুদ্ধের জন্য ব্যস্ত হইয়াছে। হায়! আর অল্পদিন পরে হয়তো উহাদের কেহই বাঁচিয়া থাকিবে না।

যুদ্ধ কি ভয়ংকর কাজ, আর ক্ষত্রিয়ের কর্ম কি কঠিন! মানুষকে মারিয়া মানুষ মনে করিবে যে, 'ধর্ম করিলাম!' কয়েকজন লোক একটা রাজ্য লইয়া ঝগড়া করিতেছে, তাহার জন্য দেশসুদ্ধ লোক কাটাকাটি করিয়া মরিবে!

এমন যুদ্ধ কে সহজে করিতে চায়? পান্ডবেরা তো তাহা চাহেন নাই। তাঁহারা বলিয়াছিলেন, "আমাদের সমুদয় রাজ্য না দেয়, কেবল আমরা নিজ হাতে

১		১ হাতি	১ রথ	৩ ঘোড়া	৫ পদাতি লইয়া	এক 'পত্তি'
৩ পত্তি	অর্থাৎ	৩ হাতি	৩ রথ	৯ ঘোড়া	১৫ পদাতিতে	এক 'সেনামুখ'
৩ সেনামুখ	,,	৯ ,,	৯ ,,	২৭ ,,	৪৫ ,,	,, 'গুল্ম'
৩ গুল্ম	,,	২৭ ,,	২৭ ,,	৮১ ,,	১৩৫ ,,	,, 'গণ'
৩ গণ	,,	৮১ ,,	৮১ ,,	২৪৩ ,,	৪০৫ ,,	,, 'বাহিনী'
৩ বাহিনী	,,	২৪৩ ,,	২৪৩ ,,	৭২৯ ,,	১২১৫ ,,	,, 'পৃতনা'
৩ পৃতনা	,,	৭২৯ ,,	৭২৯ ,,	২১৮৭ ,,	৩৬৪৫ ,,	,, 'চমূ'
৩ চমূ	,,	২১৮৭ ,,	২১৮৭ ,,	৬৫৬১ ,,	১০৯৩৫ ,,	,, 'অনিকিনী'
১০ অনিকিনী	,,	২১৮৭০ ,,	২১৮৭০ ,,	৬৫৬১০ ,,	১০৯৩৫০ ,,	,, 'অক্ষৌহিণী'

যেটুকু জয় করিয়া লইয়াছিলাম তাহাই দেউক। তাহাও যদি না দেয়, পাঁচজনকে পাঁচখানি গ্রাম মাত্র দিলেও আমরা সন্তুষ্ট হই।"

কিন্তু দুষ্ট লোকে লোভে পড়িলে কি আর তাহার ভালো-মন্দ জ্ঞান থাকে? কত লোক দুর্যোধনকে বুঝাইল, কিছুতেই তাঁহার চৈতন্য হইল না। ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর, সঞ্জয় প্রভৃতি সকলে মিলিয়া কত চেষ্টা করিলেন? কিন্তু যে ইচ্ছা করিয়া শুনিবে না, তাহার কাছে কথা বলিয়া কি ফল? কর্ণ শকুনি প্রভৃতিরা, দুর্যোধনকে ক্রমাগত যুদ্ধ করিবার জন্য উৎসাহ দিয়া, এমন করিয়া তুলিয়াছেন যে, তিনি আর কাহারো কথায় কান দিতে চাহেন না।

ধৃতরাষ্ট্র মুখে দুর্যোধনের নিন্দা করিয়াছিলেন, আর পাণ্ডবদিগের সহিত বন্ধুতা করার কথা বারবার বলিয়াছেন। কিন্তু তিনি তাহা সরলভাবে বলেন নাই, কাজেই তাঁহার কথায় কোনো ফল হয় নাই।

সকলের শেষে কৃষ্ণ এই যুদ্ধ থামাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহার কথা রাখা দূরে থাকুক, দুর্যোধন তাঁহাকে অপমান করিতেও ত্রুটি করেন নাই। রাজ্য দিবার কথায় রাজি করিতে না পারিয়া, কৃষ্ণ দুর্যোধনের নিকট পাঁচ ভাইয়ের জন্য পাঁচখানি গ্রাম মাত্র চাহিলেন। তাহার উত্তরে দুর্যোধন বলিলেন কি যে, "খুব সরু ছুঁচের আগায় যতটুকু জায়গা বিঁধে, তাহার অর্ধেকও বিনা যুদ্ধে দিব না!"

ইহার উপরে আবার বুদ্ধিমানেরা কৃষ্ণকে বাঁধিয়া রাখিতে চাহিয়াছিলেন! কিন্তু তাঁহার চেহারা দেখিয়া, আর কাজে তাহা করিতে সাহস হয় নাই। তিনি ধমকের চোটে দুষ্টদিগকে জব্দ করিয়া, সেখান হইতে চলিয়া আসেন।

আসিবার পূর্বে কৃষ্ণ কর্ণকে নির্জনে ডাকিয়া বলিলেন, "কর্ণ, তুমি কাহার সহিত যুদ্ধ করিতে যাইতেছ? জান কি, পাণ্ডবেরা তোমার ছোট ভাই? তুমি এখনই আমার সঙ্গে চল, তোমার ভাইদের সহিত তোমার পরিচয় করিয়া দিই। পাণ্ডবেরা তোমাকে চিনিতে পারিলে, তোমায় মাথায় করিয়া রাখিবেন। তখন এই পৃথিবীর রাজা হইবে তুমি, আর পাণ্ডবদের প্রধান কাজ হইবে, তোমার সেবা করা, আর তোমার আজ্ঞা পালন করা। তুমি আর অর্জুন দুভাই মিলিয়া এই পৃথিবীতে কত বড়-বড় কাজ করিবে আর তাহা দেখিয়া আমাদের চক্ষু জুড়াইয়া যাইবে।"

কর্ণ বলিলেন, "কৃষ্ণ! তোমার সকল কথাই সত্য। কিন্তু তুমি আমাকে কি মনে করিয়াছ? দুর্যোধনের অনুগ্রহে আমি রাজ্য পাইয়া সুখে বাস করিতেছি। এই দুর্যোধনকে আমার ভরসায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করিয়া দিয়া, আমি তাহাকে ছাড়িয়া যাইব? আমাদ্বারা তাহা কখনই হইবে না। পাণ্ডবেরা আমার ভাই হইলেই কি? লোকে তো জানে, আমি অধিরথ সারথির পুত্র। এখন যুদ্ধের আরম্ভেই যদি আমি পাণ্ডবদিগের সহিত মিলিতে যাই, তবে সকলে বলিবে, আমি কাপুরুষ। না কৃষ্ণ! তোমার কথা আমি রাখিতে পারিব না!"

বনবাসে যাইবার সময় কুন্তীকে পাণ্ডবেরা বিদুরের বাড়িতেই রাখিয়া যান। কৃষ্ণও যুদ্ধ থামাইবার চেষ্টায় আসিয়া এবারে বিদুরের বাড়িতেই ছিলেন।

কাজেই তাঁহার নিকট কুন্তীর কোনো কথাই জানিতে বাকি থাকে নাই।

কৃষ্ণ চলিয়া যাইবার পরে, যুদ্ধের কথা ভাবিয়া কুন্তীর প্রাণে বড়ই ক্লেশ হইতে লাগিল। পুত্রগণ যুদ্ধ করিয়া একজন আর-একজনকে মারিবে, মার প্রাণে এ কথা কি সহ্য হইতে পারে? তাই তিনি মনে করিলেন তিনি নিজে একবার চেষ্টা করিয়া দেখিবেন।

কর্ণ রোজ গঙ্গায় স্নান করিয়া সূর্যের স্তব করিতেন। স্নানের সময় কুন্তী গঙ্গার ধারে গিয়া, এই স্তবের শব্দে তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিলেন, এবং তাঁহারই ছায়ায় বসিয়া, স্তব শেষ হইবার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। স্তবের শেষে কর্ণ তাঁহাকে নমস্কার করিয়া জোড়হাতে কহিলেন, "হে দেবি, আমি অধিরথ এবং রাধার পুত্র কর্ণ; আপনাকে নমস্কার করিতেছি। আপনার কি চাহি?"

কুন্তী বলিলেন, "বাছা, তুমি আমারই পুত্র। রাধার পুত্র তুমি কখনই নহ; সারথির ঘরে তোমার জন্মও হয় নাই। নিজের ভাইদিগকে না চিনিতে পারিয়া, কেন বাবা তুমি দুর্যোধনের সেবা করিতেছ? তোমার ভাইদের কাছে তুমি আইস। যেমন কৃষ্ণ বলরাম দুভাই, তেমনি আমার কর্ণ আর অর্জুন হউক! পাঁচ ভাইয়ের প্রভু হইয়া সুখে রাজ্য কর। সারথির পুত্র বলিয়া যেন তোমার দুর্নাম না থাকে।"

এ কথায় কর্ণ বলিলেন, "আপনার কথায় আমার শ্রদ্ধা হইতেছে না। জন্মকালে আপনি আমাকে ফেলিয়া দিয়াছিলেন; মায়ের কাজ আমার প্রতি কিছুই করেন নাই। এখন যে আমাকে স্নেহ দেখাইতেছেন, তাহাও কেবল আপনার পুত্রদিগের উপকারের জন্য। এমন অবস্থায়, আমি আপনার কথায় দুর্যোধনকে ছাড়িতে যাইব কেন? তবে, আপনি কষ্ট করিয়া আসিয়াছেন, তাই এই পর্যন্ত বলিতে পারি যে, যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেব ইহাদের কাহারো আমি কোনো অনিষ্ট করিব না। কিন্তু অর্জুনকে ছাড়িতে আমি কিছুতেই প্রস্তুত নহি। যুদ্ধে হয় আমি তাহাকে মারিব, নাহয় সে আমাকে মারিবে। আপনার পাঁচ পুত্রই লোকে জানে, তাহার অধিক পুত্র আপনার থাকা ভালো নহে।"

এই বলিয়া কর্ণ সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। কুন্তীও কাঁদিতে কাঁদিতে ঘরে ফিরিলেন।

যুদ্ধ আর কিছুতেই থামিল না। সুতরাং তাহার আয়োজন বিধিমতেই হইতে লাগিল। কুরুক্ষেত্রের প্রকাণ্ড মাঠের ভিতর দিয়া হিরণ্বতী নদী বহিতেছে। সেই নদীর ধারে যুধিষ্ঠির তাহার সৈন্য সাজাইতে লাগিলেন। দুর্যোধনের লোকেরাও তাহারই সামনে আসিয়া শিবির প্রস্তুত করিল। দেখিতে দেখিতে সেই মাঠের চেহারা এমনি বদলাইয়া গেল যে, তাহাকে চেনা ভার। খাল, পুকুর, রাস্তা, তাঁবু ইত্যাদিতে সে মাঠ নগরের মতো হইয়া গিয়াছে। তাহার ভিতরে মিস্ত্রী, মজুর, পাচক, বৈদ্য, কিছুরই অভাব নাই। আটা, ঘি, ডাল, চাউল, ঔষধ-পত্র, কাঠ, কয়লা ইত্যাদি কোনো দরকারি জিনিসেরই ত্রুটি দেখা

যায় না।

আর অস্ত্রের কথা কি বলিব? মানুষের বুদ্ধিতে মানুষকে মারিবার যত-রকম উৎকট উপায় হইতে পারে, সকলই প্রস্তুত। রাশি রাশি তোমর (লোহার কাঁটা পরানো ডান্ডা) আছে; ইহার ঘায় হাড় গুঁড়ো এবং বুক ফোঁড়া এক সঙ্গেই হইতে পারে। ভালো মতে এপিঠ-ওপিঠ করিয়া ফুঁড়িতে হইলে তাহার জন্য শক্তির (লোহার বল্লম) আয়োজন যথেষ্ট রহিয়াছে। পাশ (ফাঁস) আছে আঁটি আঁটি। এ জিনিস শত্রুর গলায় লাগাইয়া টানিলে, বুঝিতেই পার। আর যদি শত্রুর চুলে ধরিয়া টানিয়া তাহাকে কাবু করিতে হয়, তাহার জন্য অসংখ্য 'কচ-গ্রহ-বিক্ষেপ' (লম্বা লাঠির আগায় সাংঘাতিক আঠা) রহিয়াছে। কিংবা যদি আঁকশি লাগাইয়া তাহাকে টানিবার দরকার পড়ে, সে আঁকশিরও ঐ পর্বতাকার ঢিপি! এ অস্ত্রের নাম 'কর-গ্রহ-বিক্ষেপ'। বালি তৈল আর ঝোলা গুড়ের অন্তই নাই। এ-সব জিনিস গরম করিয়া শত্রুর গায় ঢালিয়া দিতে হইবে; তাহার জন্য এই বড়-বড় হাতাও আছে। মুখবাঁধা ভারী ভারী হাঁড়ির ভিতরে ভয়ানক ভয়ানক সাপ। শত্রুর ভিড়ের মধ্যে এই-সকল হাঁড়ি ফেলিয়া দিতে পারিলে বেশ কাজ দেয়! ধুপ-ধুনা জ্বালাইয়া ফেলিতে পারিলেও মন্দ হয় না, তাহার ঢিপি পর্বত প্রমাণ, কুল কাঁটার মতন বাঁকানো কাঁটা পরানো ভয়ানক বল্লম, তাহার নাম 'অঙ্কুশ তোমর', এ অস্ত্র শত্রুর পেটে বিঁধাইয়া টানিলে পেটের ভিতরের জিনিস তখনই বাহির হইয়া আসে।

ইহা ছাড়া, ঢাল, তলোয়ার, খাঁড়া, বর্শা, লাঠি, গদা, তীর, ধনুক প্রভৃতি সাধারণ অস্ত্র যে কত আছে, তাহার তো হিসাবই হয় না। দা, কুড়াল, খুন্তি, কোদাল, এমন-কি, লাঙগল পর্যন্ত বাদ যায় নাই।

এ-সকল অস্ত্র বোধ হয় সাধারণ সৈন্যদের জন্য। বড়-বড় ক্ষত্রিয় যোদ্ধারা এ-সকল অস্ত্রের কোনো-কোনোটা ব্যবহার করিতেন না, এমন নহে; মোটের উপর তাঁহাদের যুদ্ধ-কৌশল ইহা অপেক্ষা অনেক উঁচুদরের। আর তাঁহাদের অস্ত্র-শস্ত্রও যে অতি আশ্চর্যরকমের, তাহাও আমাদের দেখিতে বাকি নাই।

সকল আয়োজন শেষ হইলে দুর্যোধন জোড়হাতে ভীষ্মকে বলিলেন, "হে পিতামহ! আপনি যুদ্ধবিদ্যায় শুক্রের সমান পন্ডিত, আপনি আমাদের সেনাপতি হউন। আপনার পশ্চাতে আমরা নির্ভয়ে যুদ্ধ করিতে যাইব।"

ভীষ্ম বলিলেন, "আচ্ছা তাহাই হউক। তোমাকে কথা দিয়াছি, সুতরাং তোমার হইয়া যথাসাধ্য যুদ্ধ করিব; কিন্তু আমার কাছে তোমরা যেমন, পান্ডবেরাও তেমনি। এইজন্য আমি কখনো তাহাদিগকে বধ করিতে পারিব না। তোমার অপর শত্রু আমি রোজ হাজার হাজার মারিব।"

কর্ণের বড়ই লম্বা-চওড়া কথা কহিবার অভ্যাস, সেজন্য তিনি ভীষ্মের নিকট অনেক বকুনি খান, কাজেই দুজনের মধ্যে একটু চটাচটি আছে। তাহার উপরে আবার দুর্যোধনের দলের রথী এবং মহারথীদিগের নাম করিতে গিয়া, ভীষ্ম কর্ণকে অর্ধরথ (অর্থাৎ আধখানা রথী) বলাতে এই বিরোধ আরো বাড়িয়া গেল।

শেষে ভীষ্ম বলিলেন, "কর্ণ আমার সঙ্গে বড়ই রেষারেষি করে, আমি তাহার সঙ্গে মিলিয়া যুদ্ধ করিতে পারিব না।" তাহাতে কর্ণ বলিলেন, "আমিও ভীষ্ম থাকিতে এ যুদ্ধে হাত দিতেছি না। উনি মারা যাউন, তারপর আমি অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিব।"

এইরূপে দুর্যোধনের পক্ষে ভীষ্মকে সেনাপতি করিয়া, অন্যান্য যোদ্ধারা তাঁহার অধীনে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইলেন।

পাণ্ডবদিগের পক্ষে দ্রুপদ, বিরাট, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, ধৃষ্টকেতু, শিখণ্ডী ও জরাসন্ধের পুত্র সহদেব, এই সাতজনকে সেনাপতি করা হইল; ধৃষ্টদ্যুম্ন হইলেন প্রধান সেনাপতি। ইঁহাদের আবার পরিচালক হইলেন অর্জুন।

এই সময়ে দুর্যোধন একদিন উলূক নামক এক দূতকে বলিলেন, "তুমি পাণ্ডবদিগকে আর কৃষ্ণকে, খুব করিয়া গালি দিয়া আইস।"

কিরূপ গালি দিতে হইবে, তাহাও দুর্যোধন অবশ্য বলিয়া দিলেন; তত কথা লিখিবার স্থান নাই। আর থাকিলেই-বা তাহা লিখিয়া দরকার কি? ভালো কথা হইত তবে নাহয় লিখিতাম। দুর্যোধনের হুকুম পাওয়ামাত্র উলূক পাণ্ডবদিগের নিকট গিয়া, তাঁহার কথাগুলি অবিকল মুখস্থ বলিয়া দিল।

এই-সকল গালির উত্তরে পাণ্ডবেরা বলিলেন, "উলূক! দুর্যোধনকে বলিবে যে তাহার উচিত সাজা পাওয়ার সময় উপস্থিত হইয়াছে, আর বেশি বিলম্ব নাই।"

উলূক চলিয়া গেলে পাণ্ডবেরা সৈন্য ভাগ করিয়া গুছাইতে লাগিলেন। বড়-বড় সেনাপতিগণ কে কোন্ কোন্ দলের কর্তা হইবেন, এ-সকল ঠিক করাই সকলের প্রথম কাজ। এ কাজ শেষ হইয়া গেলে আর আয়োজনের কিছুই বাকি রহিল না; এখন শত্রু আসিলেই হয়।

দুর্যোধনের দলেও অবশ্য এইরূপ আয়োজন চলিতেছিল। দুই পক্ষের যোদ্ধাদিগের কে কেমন বীর, ভীষ্ম দুর্যোধনকে তাহা সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন, "তোমার জন্য আমি পাণ্ডবদিগের সহিত যথাসাধ্য যুদ্ধ করিব। কৃষ্ণই হউন, আর অর্জুনই হউন, কাহাকেই আমি সহজে ছাড়িব না। উহাদের মধ্যে কেবল শিখণ্ডীর গায়ে আমি অস্ত্রাঘাত করিতে প্রস্তুত নহি, আর সকলের সহিতই যুদ্ধ করিব।"

এ কথায় দুর্যোধন আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন? শিখণ্ডীর গায়ে আপনি যে অস্ত্রাঘাত করিবেন না, তাহার কারণ কি?"

ভীষ্ম বলিলেন, "স্ত্রীলোকের গায়ে হাত তুলিতে নাই, তাই মারিব না।"

দুর্যোধন বলিলেন, "শিখণ্ডী তো দ্রুপদের পুত্র। সে স্ত্রীলোক হইল কিরূপে?"

ভীষ্ম বলিলেন, "শিখণ্ডীর কথা তবে বলি, শুন। আমার ভাই বিচিত্র-বীর্যের সহিত বিবাহ দিবার জন্য আমি কাশীরাজার তিনটি কন্যাকে স্বয়ম্বর সভা হইতে জোর করিয়া লইয়া আসি। ইহাদের বড়টির নাম অম্বা। অম্বা বলিল, 'আমি মনে মনে শাল্বকে বিবাহ করিয়াছি।' কাজেই আমি তাহাকে

ছাড়িয়া দিয়া আর দুটি মেয়ের সহিত ভাইয়ের বিবাহ দিলাম।

"অম্বা শাল্বের কাছে গেল, কিন্তু আমি তাহাকে জোর করিয়া আনায় অপমান বোধ করিয়া, আর হয়তো কতকটা আমার ভয়েও, সে তাহাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইল না। এইরূপে সেই কন্যা নিতান্ত দুঃখে পড়িয়া ভাবিল, 'এখন কোথায় যাই? শাল্ব অপমান করিল, পিতার ঘরে গেলেও তাহারা আমাকে ঘৃণা করিবে। হায়! ভীষ্মই আমার এই দুঃখের কারণ? উহাকে শাস্তি দিতে পারিলে তবে আমার মন শান্ত হয়।' এই মনে করিয়া সে কত দেশ যে ঘুরিল, কত মুনি-ঋষির নিকট নিজের দুঃখের কথা বলিয়া কাঁদিল। শেষে আমার গুরু পরশুরাম, তাহার প্রতি দয়া করিয়া আমায় শাসন করিতে আসিলেন। তাঁহার সহিত আমার ঘোর যুদ্ধ হইয়াছিল। তাহাতে তিনি আমাকে হারাইতে না পারিয়া, অম্বাকে বলিলেন, 'আমি তো অনেক যুদ্ধ করিলাম, কিন্তু ভীষ্ম আমাকে হারাইয়া দিল। আমার আর ক্ষমতা নাই, তুমি চলিয়া যাও।'

"তারপর অম্বা, অনেক তপস্যা করিয়া, আমাকে মারিবার জন্য শিবের নিকট বরলাভ করে। সেই বরের জোরে সে এখন শিখণ্ডী হইয়া জন্মিয়াছে। আমি জানি, এ সেই অম্বা--এ পুরুষমানুষ নহে। কাজেই আমি ইহার গায়ে অস্ত্রাঘাত করিতে পারিব না।"

যুদ্ধের পূর্বে দুর্যোধন ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দাদামহাশয়, আপনি একেলা যথাসাধ্য যুদ্ধ করিলে কত সময়ের মধ্যে পাণ্ডবদিগের সকল সৈন্য মারিয়া শেষ করিতে পারেন?"

ভীষ্ম বলিলেন, "আমি ইচ্ছা করিলে এক মাসে পাণ্ডবদের সকল সৈন্য মারিতে পারি।"

এই কথা একে একে দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা আর কর্ণকে জিজ্ঞাসা করিলে, দ্রোণ বলিলেন, "আমিও এক মাসে পারি।"

কৃপ বলিলেন, "আমার দুমাস লাগে।"

অশ্বত্থামা বলিলেন, "আমার দশদিন লাগে।"

কর্ণ বলিলেন, "আমি পাঁচদিনেই উহাদের সকল সৈন্য মারিয়া শেষ করিতে পারি।"

কর্ণের কথা শুনিয়া ভীষ্ম হো হো শব্দে হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "অর্জুনের সঙ্গে কিনা এখনো দেখা হয় নাই, তাই তুমি এমন কথা বলিতেছ।"

যুধিষ্ঠিরের চরেরা ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতির এই-সকল কথা শুনিয়া তাহা যুধিষ্ঠিরের নিকট গিয়া বলাতে, তিনি অর্জুনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অর্জুন, তুমি কতক্ষণে কৌরবদিগের সৈন্য মারিয়া শেষ করিতে পার?"

অর্জুন বলিলেন, "কৃষ্ণ সহায় থাকিলে, আমি এক নিমিষে সকল শেষ করিয়া দিতে পারি। শিব আমাকে পাশুপত নামক যে অস্ত্র দিয়াছিলেন তাহা আমার নিকট আছে। ইহা দিয়া তিনি প্রলয়ের সময় সকল সৃষ্টি নাশ করেন। এ অস্ত্রের সংকেত ভীষ্মও জানেন না, দ্রোণও জানেন না, কৃপ, অশ্বত্থামা বা কর্ণও জানেন না। এ-সকল বড়-বড় অস্ত্র সাধারণ যুদ্ধে ব্যবহার করিতে নাই। আমরা সাদাসিধা

যুদ্ধ করিয়াই জয়লাভ করিব।"

কুরুক্ষেত্রের পশ্চিমভাগে, দুর্যোধনের শিবির হইয়াছিল। যুদ্ধের দিনের, নির্মল প্রভাতে, তাঁহার লোকেরা স্নানান্তে মালা আর সাদা কাপড় পরিয়া অসীম উৎসাহভরে সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

মাঠের পূর্বভাগে পশ্চিমমুখ হইয়া যুধিষ্ঠিরের দলও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। সহস্র সহস্র ঢাক আর অযুত শঙ্খ মহাঘোররবে তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করিতেছে।



দ্ধ আরম্ভ করিবার পূর্বে এইরূপ নিয়ম হইল যে, যে ব্যক্তি অস্ত্র ফেলিয়া যুদ্ধ ছাড়িয়া দিয়াছে, যে আশ্রয় চাহিতেছে, আর যে অন্যের সহিত যুদ্ধে ব্যস্ত, এরূপ লোককে কেহ বধ করিবে না। যুদ্ধের সময় ছাড়া অন্য সময় দুই দলের লোকই বন্ধুর মতো ব্যবহার করিবে। গালির উত্তরে শুধু গালিই দিবে, অস্ত্রাঘাত করিবে না। যুদ্ধের স্থান হইতে কেহ বাহির হইয়া গেলে, আর তাহাকে মারিবে না। রথী রথীর সহিত, হাতি হাতির সহিত, ঘোড়া ঘোড়ার সহিত, পদাতি পদাতির সহিত, এইভাবে যুদ্ধ হইবে। মারিবার সময় বলিয়া মারিবে। অচেতন লোককে, আর সারথি, সহিস, অস্ত্রবাহক, বাজনদার ইহাদিগকে কখনো প্রহার করিবে না।

এই সময়ে, ভয়ানক যুদ্ধ উপস্থিত জানিয়া, ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্রকে দেখিতে আসিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের তখন নিতান্তই দুঃখের অবস্থা। পুত্রগণের ব্যবহার, আর যুদ্ধের ভীষণ ফলের কথা ভাবিয়া তিনি আর কূল কিনারা পাইতেছেন না। এমন সময় ব্যাসদেব আসিয়া তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া বলিলেন, "যাহা হইবার, তাহা হইবেই ; তুমি দুঃখ করিও না। যদি যুদ্ধ দেখিতে চাও, আমি তোমাকে চক্ষু দিতে পারি।"

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, "আত্মীয়গণের মৃত্যু আমি দেখিতে পারিব না। আপনার কৃপায় যুদ্ধের সকল সংবাদ যেন শুনিতে পাই।"

এ কথায় ব্যাস সঞ্জয়কে দেখাইয়া বলিলেন, "তোমার এই সঞ্জয়ের নিকট তুমি সকল কথাই শুনিতে পাইবে। আমার বরে, যুদ্ধের কোনো সংবাদই ইহার অজানা থাকিবে না। দেখা হউক, অদেখা হউক, সকল ঘটনাই, এমন-কি, লোকের মনের কথা পর্যন্ত, সে জানিতে পারিয়া তোমাকে শুনাইবে। যুদ্ধের ভিতর গিয়াও সে সুস্থ শরীরে ফিরিয়া আসিবে ; অস্ত্রে তাহার কোনো অনিষ্ট হইবে না।"

এই কথা বলিয়া ব্যাসদেব আবার ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন, "এ কাজটা ভালো হইতেছে না ; তুমি ইহাদিগকে বারণ কর। তোমার রাজ্যের এতটা কি প্রয়োজন যে, তাহার জন্য এমন পাপ করিতে যাইতেছ? পাণ্ডবদের রাজ্য তাহাদিগকে ফিরাইয়া দাও।"

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, "আমি তো যাহাতে ধর্ম হয় তাহাই চাই, কিন্তু উহারা

যে আমার কথা শুনে না।"

এইরূপ কথাবার্তার খানিক পরে ব্যাসদেব সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

এদিকে পাণ্ডব ও কৌরবদিগের সৈন্য সকল যুদ্ধক্ষেত্রে সামনাসামনি ব্যূহ বাঁধিয়া দাঁড়াইয়াছে; যুদ্ধ আরম্ভ হইতে আর বিলম্ব নাই।

'ব্যূহ' বাঁধা কাহাকে বলে জান? সৈন্যেরা তো যুদ্ধের সময় তাহাদের ইচ্ছামত এলোমেলো ভাবে দাঁড়াইতে পায় না; তাহাদিগকে কোনো একটা বিশেষ নিয়মে, বেশ জমাটরূপে গুছাইয়া দাঁড় করাইতে হয়। এইরূপ কায়দা করিয়া দাঁড়ানোর নাম 'ব্যূহ'। এক-এক রকম ব্যূহের এক-এক রকম নাম; যেমন 'চক্র' ব্যূহ, 'গরুড়' ব্যূহ ইত্যাদি।

পাণ্ডবদিগের ব্যূহ দেখিয়া দুর্যোধন দ্রোণকে বলিলেন, "গুরুদেব! দেখুন, পাণ্ডবদের কত সৈন্য; ধৃষ্টদ্যুম্ন তাহাদের ব্যূহ নির্মাণ করিয়াছে। উহাদের দলে খুব বড় বীর আছে; তেমনি আমাদেরও তাহার চেয়ে বেশি আছে। তাহা ছাড়া, আমাদের সৈন্য ঢের, উহাদের সৈন্য কম। আমাদের ব্যূহের মাঝখানে ভীষ্ম রহিয়াছেন; তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য ব্যূহে ঢুকিবার পথে পথে আপনারা সকলে আছেন।"

এ কথা শুনিয়া ভীষ্ম সিংহনাদপূর্বক তাঁহার শঙ্খে ফুঁ দিলেন। সেই শঙ্খের সঙ্গে সঙ্গে, হাজার হাজার শঙ্খ, শিঙ্গা, ঢাক প্রভৃতি বাজিয়া রণস্থলে তুমুল কাণ্ড উপস্থিত করিল।

ইহার উত্তরে পাণ্ডবদিগের পক্ষ হইতে, কৃষ্ণের 'পাঞ্চজন্য', অর্জুনের 'দেবদত্ত', ভীমের 'পৌণ্ড্র', যুধিষ্ঠিরের 'অনন্তবিজয়', নকুলের 'সুঘোষ', আর সহদেবের 'মণিপুষ্পক' নামক মহাশঙ্খের ভয়ংকর শব্দের সহিত, দ্রুপদ, বিরাট, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী প্রভৃতি সকলের শঙ্খের শব্দ মিলিয়া আকাশ পাতাল কাঁপাইয়া কৌরবদিগের আতঙ্ক জন্মাইয়া দিল।

তখন অর্জুন গাণ্ডীব হাতে করিয়া কৃষ্ণকে বলিলেন, "একবার দুই দলের মাঝখানে রথ লইয়া চলুন, কে কে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে—দেখিয়া লই।"

এ কথায় কৃষ্ণ দুই দলের মাঝখানে রথ লইয়া গেলে, অর্জুন দেখিলেন যে, খুড়া, জ্যাঠা, মামা, ভাই, পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র, বন্ধু প্রভৃতি যত ভক্তি, মান্য, স্নেহ এবং ভালোবাসার পাত্র, সকলেই যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত; রাজ্যের জন্য সকলেই কাটাকাটি করিয়া প্রাণ দিতে আসিয়াছে। ইহা দেখিয়া দুঃখে তাঁহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে কৃষ্ণকে বলিলেন, "হায়! আমি কাহাকে মারিয়া রাজ্য লইতে আসিয়াছি! এমন রাজ্য পাইয়া ফল কি? এইরূপ ভয়ানক পাপ করার চেয়ে, শত্রুর হাতে মারা যাওয়াই তো ভালো।"

এই বলিয়া তিনি গাণ্ডীব ফেলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

সেদিন কৃষ্ণ সঙ্গে না থাকিলে, আর কি অর্জুনের যুদ্ধ করা হইত? তাঁহার মনের দুঃখ দূর করিয়া, তাঁহাদ্বারা যুদ্ধ করাইতে, কৃষ্ণকে অনেক পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। তখন কৃষ্ণ তাঁহাকে যে-সকল উপদেশ দেন, তাহাতে 'ভগবদ্গীতা' নামক অমূল্য পুস্তকই হইয়া গিয়াছে; বড় হইয়া তোমরা তাহা

পড়িবে। যাহা হউক, কৃষ্ণের উপদেশে অর্জুনের মন শান্ত হওয়াতে, আবার তাঁহার যুদ্ধের উৎসাহ আসিল।

এমন সময় মহারাজ যুধিষ্ঠির, বর্ম আর অস্ত্র পরিত্যাগপূর্বক রথ হইতে নামিয়া, কিসের জন্য ভীষ্মের রথের দিকে হাঁটিয়া চলিয়াছেন। তাঁহাকে ঐরূপ করিতে দেখিয়া কৃষ্ণ, অর্জুন, ভীম, নকুল, সহদেব আর অন্যান্য বীরেরাও তাঁহার সঙ্গে চলিয়াছেন ; কিন্তু ইঁহাদের কেহই যুধিষ্ঠিরের কার্যের অর্থ বুঝিতে পারিতেছেন না। ভীম, অর্জুন, নকুল আর সহদেব বলিলেন, "দাদা! যুদ্ধ আরম্ভ হয়-হয়, এমন সময় আপনি আমাদিগকে ফেলিয়া কোথায় চলিয়াছেন?"

যুধিষ্ঠির তাঁহাদের দিকে ফিরিয়া চাহিলেন, কিন্তু কথা বলিলেন না। তখন কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া, তাঁহাদিগকে বলিলেন, "উনি যুদ্ধারম্ভের পূর্বে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, শল্য প্রভৃতি গুরুজনকে প্রণাম করিতে চলিয়াছেন, ইহাতে উঁহার জয়লাভ হইবে।"

এদিকে কৌরবপক্ষের লোকেরাও, যুধিষ্ঠিরকে ঐরূপ করিতে দেখিয়া, নানা কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে। কেহ বলিল, 'কাপুরুষ! ভয় পাইয়াছে!' কেহ বলিল, 'তাই ভীষ্মের পায়ে ধরিতে চলিয়াছে!' কেহ বলিল, 'এমন সব ভাই থাকিতে এত ভয়, ছিঃ!'

যাহা হউক, যুধিষ্ঠির ততক্ষণে ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হইয়া, তাঁহার পায়ে ধরিয়া বলিলেন, "দাদামহাশয়! আপনার সহিত যুদ্ধ করিব, অনুমতি দিন আর আশীর্বাদ করুন।"

ভীষ্ম বলিলেন, "আশীর্বাদ করি ভাই, তোমার জয় হউক! তুমি না আসিলে হয়তো আমার রাগ থাকিত, কিন্তু তুমি আসাতে বড়ই সুখী হইলাম। বল, তোমার আর কি চাই। ভাই, মানুষ টাকার দাস। দুর্যোধনের টাকায় আমি আটকা পড়িয়াছি, কাজেই তোমার হইয়া যুদ্ধ করিতে পারিব না। আর যাহা চাও তাহাই দিব।"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "আপনাকে কি করিয়া পরাজয় করিব, দয়া করিয়া তাহা বলিয়া দিন।"

ভীষ্ম বলিলেন, "আমাকে পরাজয় করার সাধ্য কাহারো নাই, আর এখন আমার মরিবার সময়ও উপস্থিত হয় নাই। তুমি আবার আমার নিকট আসিও।"

তখন যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে প্রণাম করিয়া দ্রোণের নিকট গেলেন। দ্রোণের সহিতও তাঁহার ঐরূপ কথাবার্তা হইল। তাঁহাকে পরাজয় করিবার উপায়ের কথা জিজ্ঞাসা করিলে দ্রোণ বলিলেন, "আমি বাঁচিয়া থাকিতে আমাকে পরাজয় করিতে পারিবে না; আমাকে মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা কর। সত্যবাদী লোকের মুখে নিতান্ত অপ্রিয় সংবাদ শুনিলেই, আমি অস্ত্র ছাড়িয়া দিব। এমনি সময় আমাকে মারিবার সুযোগ।"

সেখান হইতে যুধিষ্ঠির কৃপের নিকট গেলেন। সেখানেও ঐরূপই কথাবার্তা হইল। কৃপ বলিলেন, "আমি অমর, কাজেই আমাকে মারা সম্ভব হইবে না।

কিন্তু তথাপি নিশ্চয় তোমার জয় হইবে; আমি সর্বদা তোমাকে আশীর্বাদ করিব।"

কৃপের নিকট হইতে যুধিষ্ঠির শল্যের নিকট গেলেন, এবং যুদ্ধের সময় কর্ণের তেজ কমাইয়া দিবার কথা তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন। শল্য বলিলেন, "আমি তাহা নিশ্চয় করিব। নির্ভয়ে যুদ্ধ কর, তোমার জয় অবশ্য হইবে।"

ইহার মধ্যে কৃষ্ণ কর্ণকে বলিলেন, "কর্ণ, ভীষ্ম থাকিতে তো তুমি আর এ পক্ষে যুদ্ধ করিতেছ না, ততদিন আমাদের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ কর-না কেন?"

এ কথার উত্তরে কর্ণ বলিলেন, "আমি কিছুতেই দুর্যোধনের অনিষ্ট করিতে পারিব না।"

ফিরিয়া আসিবার সময় যুধিষ্ঠির উচ্চৈঃস্বরে কৌরবদিগকে বলিলেন, "এখানে যদি আমার বন্ধু কেহ থাকেন, তবে তিনি আসুন ; আমরা পরম আদরে তাঁহাকে আমাদের দলে লইব।"

এ কথায় ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র যুযুৎসু আহ্লাদের সহিত বলিলেন, "মহারাজ! আমি আপনার হইয়া যুদ্ধ করিব।"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "এস ভাই। তুমি আমাদের হইলে।"

তারপর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সে যে কি ভয়ানক যুদ্ধ, তাহা লিখিয়া বুঝাইবার সাধ্য আমার নাই। সে যুদ্ধে বৃষ্টির ধারার ন্যায় ক্রমাগত বাণ পড়িয়াছিল ; ঝড়ের সময় যেমন গাছের ফল পড়ে, সেইরূপ করিয়া লোকের মাথা কাটিয়া পড়িয়াছিল, কাটা মানুষের পাহাড় হইতে রক্তের নদী বহিয়া চলিয়াছিল। তখনকার ভয়ানক শব্দের কথা আর কি বলিব! তেমন শব্দ আর কখনো হয় নাই।

সে সময়ে ভীষ্ম, দ্রোণ, অর্জুন, ভীম প্রভৃতি বড়-বড় যোদ্ধাদের বীরত্ব ও ক্ষমতা দেখিয়া, দেবতারা পর্যন্ত আশ্চর্য হইয়া যান। অনেকবারই তাঁহাদিগকে এ কথা মানিতে হইয়াছে যে, 'এমন অদ্ভুত কাজ আমরাও করিতে পারি কি না সন্দেহ।' ইঁহাদের এক-একজনে যখন রাগিয়া দাঁড়াইয়াছেন, তখন শত যোদ্ধা মিলিয়াও তাঁহাকে আটকাইতে পারে নাই। হাজার হাজার লোক মারিয়া তবে তাঁহারা থামিয়াছেন। ভীষ্ম, দ্রোণ বা অর্জুনের এক-এক বাণে, অথবা ভীমের এক-এক গদাঘাতে, এক-একটা হাতি তৎক্ষণাৎ মারা যাইতে ক্রমাগতই দেখা গিয়াছে।

পাণ্ডবদের পুত্রেরাই[১] কি কম যুদ্ধ করিয়াছিলেন? অভিমন্যুর যুদ্ধ দেখিয়া ভীষ্ম প্রভৃতিরা বার বার বলিয়াছেন, "ঠিক যেন অর্জুন!" ভীষ্মের সহিত তাঁহার খুবই যুদ্ধ হয়। তখন ভীষ্ম অনেক চেষ্টা করিয়াও তাঁহার কিছু করিতে পারেন নাই। অভিমন্যু তাঁহার সমুদয় বাণ কাটিয়া রথের ধ্বজা উড়াইয়া

[১] দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র জন্মিয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম প্রতিবিন্ধ্য, সুতসোম, শ্রুতকর্মা, শতানিক আর শ্রুতসেন। সুভদ্রার এক পুত্র, তাঁহার নাম অভিমন্যু।

দিয়াছিলেন।

আহা! উত্তরের কথা মনে করিয়া বাস্তবিকই দুঃখ হয়। বেচারা সেদিন ভালো করিয়া যুদ্ধ করিতে না করিতেই শল্যের হাতে মারা গেলেন। তিনি এক প্রকান্ড হাতিতে চড়িয়া শল্যকে আক্রমণ করেন। হাতি শল্যের রথের ঘোড়াগুলিকে মারিয়া ফেলিল। কিন্তু শল্য তাহার পরেই উত্তরকে এমন ভয়ংকর একটা শক্তি ছুঁড়িয়া মারিলেন যে, তাহা তাঁহার বর্ম ভেদ করিয়া, একেবারে তাঁহার দেহের ভিতর ঢুকিয়া গেল। সেই শক্তির ঘায়েই উত্তর হাতি হইতে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

উত্তরের দাদা শ্বেত ইহাতে অসহ্য শোক পাইয়া রাগের সহিত কৌরবদিগকে আক্রমণ করেন। খানিক যুদ্ধের পর একটা ভয়ানক বাণের ঘায় তিনি অজ্ঞান হইয়া গেলে, তাঁহার সারথি তাঁহাকে লইয়া প্রস্থান করে। কিন্তু অল্পক্ষণের ভিতরেই তিনি আবার আসিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করেন। এবার তিনি শল্যকে এমন তেজের সহিত আক্রমণ করিলেন যে, ভীষ্ম প্রভৃতি বীরেরা আসিয়া সাহায্য না করিলে, শল্যের প্রাণ রক্ষা করাই কঠিন হইত। ভীষ্মের দল আসাতে শল্যও বাঁচিয়া গেলেন, আর যুদ্ধও আবার অতি ঘোরতর হইয়া উঠিল! সেই যুদ্ধে ভীষ্ম কত লোককে যে মারিলেন, তাহার সংখ্যা নাই।

শ্বেতও সেই সময়ে অসাধারণ বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন। সৈন্যরা তাঁহার তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া, ভীষ্মের নিকট গিয়া আশ্রয় লয়। ভীষ্ম ছাড়া আর কেহই শ্বেতের সম্মুখে স্থির থাকিতে পারেন নাই। এমন-কি, ভীষ্মও এক-একবার শ্বেতের হাতে রীতিমত জব্দ হইতে লাগিলেন। একবার তো সকলে মনে করিল, বুঝি-বা শ্বেতের হাতে তাঁহার মৃত্যুই হয়।

তখন ভীষ্ম যারপরনাই রাগের সহিত শ্বেতকে অনেকগুলি বাণ মারিলেন ; শ্বেতও তাহার সব আটকাইয়া, ভল্ল দ্বারা তাঁহার ধনুক কাটিয়া ফেলিলেন। ভীষ্ম অমনি আর-এক ধনুক লইয়া, শ্বেতের রথের ঘোড়া ধ্বজ আর সারথিকে মারিয়া ফেলাতে কাজেই তাঁহাকে রথ হইতে লাফাইয়া পড়িতে হইল। তখন তিনি ধনুক রাখিয়া ভীষ্মকে একটা ভয়ংকর শক্তি ছুঁড়িয়া মারেন, কিন্তু তাহা ভীষ্মের বাণে খন্ড খন্ড হইয়া যায়। শক্তি বৃথা হওয়ায়, শ্বেত গদা লইয়া যেই ভীষ্মের উপরে তাহা ছুঁড়িতে যাইবেন, অমনি ভীষ্ম তাহা এড়াইবার জন্য রথ হইতে লাফাইয়া পড়িলেন। সে গদা রথের উপরে পড়িলে আর রথ, ঘোড়া, সারথি, কিছুই অবশিষ্ট রহিল না।

এদিকে দ্রোণ, কৃপ, শল্য প্রভৃতি যোদ্ধারা ভীষ্মের সাহায্যের জন্য সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন : ভীষ্মের নূতন রথ আসিয়াছে। শ্বেতের পক্ষেও সাত্যকি, ভীম, ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। সুতরাং কিছু-কাল সকলে মিলিয়া আবার যুদ্ধ চলিল। এমন সময় ভীষ্ম কি যে এক সাংঘাতিক বাণ ছুঁড়িয়া বসিলেন, শ্বেতের তাহা বারণ করিবার কোনো ক্ষমতাই হইল না, সে বাণ তাঁহার বর্ম ও শরীর ভেদ করিয়া মাটির ভিতরে ঢুকিয়া গেল।

শ্বেতের মৃত্যুর পর সেদিন আর পান্ডবদের যুদ্ধে উৎসাহ রহিল না।

এদিকে ভীষ্ম শ্বেতকে মারিয়া, এতই তেজের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন যে, মনে হইল, বুঝি এখনি তিনি সকলকে মারিয়া শেষ করেন। তখন সন্ধ্যাও হইয়াছিল, কাজেই যুধিষ্ঠির সেদিনের মতন যুদ্ধ শেষ করিয়া দিয়া দুঃখের সহিত শিবিরে ফিরিলেন।

সে রাত্রিতে যুধিষ্ঠিরের মনে বড়ই চিন্তা হইতে লাগিল। তিনি সকলকে বলিলেন, "এমনভাবে বন্ধুবান্ধবকে মরিতে দেখিয়া আমার বড়ই কষ্ট হইতেছে। কাল হইতে তোমরা আরো ভালো করিয়া যুদ্ধ কর।"

যুধিষ্ঠিরের চিন্তা দেখিয়া সকলে মিলিয়া তাঁহাকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। ইহাতে তাঁহার মন অনেকটা শান্ত হওয়ায়, পরদিনের যুদ্ধের পরামর্শ আরম্ভ হইল। তখন যুধিষ্ঠির ধৃষ্টদ্যুম্নকে বলিলেন, "এবারে 'ক্রৌঞ্চারুণ' ব্যূহ করিয়া সৈন্য সাজাইবে।"

পরদিন 'ক্রৌঞ্চারুণ' ব্যূহ করিয়া পাণ্ডবদিগের সৈন্য সাজান হইল। কৌরবেরাও তাহাদের সৈন্য দিয়া অনুরূপ এক ব্যূহ প্রস্তুত করিলেন। সেদিনকার যুদ্ধও নিতান্তই ভয়ানক হইয়াছিল।

সেইদিন অর্জুনের যুদ্ধে কৌরবেরা বড়ই অস্থির হইয়া উঠে। তাহা দেখিয়া দুর্যোধন ভীষ্মকে বলিলেন, "দাদামহাশয়! আপনারা থাকিতে কি অর্জুন সব সৈন্য মারিয়া শেষ করিবে? একটু ভালো করিয়া যুদ্ধ করুন।"

তখন অর্জুন আর ভীষ্মে এমনি ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল যে, তেমন যুদ্ধ আর হয় নাই। সে যুদ্ধ দেখিয়া অন্য সকলের উৎসাহ বাড়িয়া যাওয়াতে, তাহারা পাগলের মতো হইয়া কাটাকাটি আরম্ভ করিল।

ধৃষ্টদ্যুম্ন আর দ্রোণেও সেদিন কম যুদ্ধ হয় নাই। যুদ্ধ করিতে করিতে ধৃষ্টদ্যুম্নের সারথি ঘোড়া আর ধনুক কাটা গেল। তখন তিনি ভাবিলেন যে, গদা লইয়া দ্রোণকে আক্রমণ করিবেন। কিন্তু রথ হইতে নামিবার পূর্বেই দ্রোণ সেই মহাগদা কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিলেন। তারপর ধৃষ্টদ্যুম্ন ঢাল তলোয়ার লইয়া দ্রোণকে মারিতে চলিলেন কিন্তু তাঁহার বাণের মুখে অগ্রসর হয়, কাহার সাধ্য? ধৃষ্টদ্যুম্ন ঢাল দিয়া বাণ কাটাইতে ব্যস্ত রহিলেন, তাঁহার আর যুদ্ধ করা হইল না।

এই সময় ভীম ধৃষ্টদ্যুম্নের সাহায্য করিতে আসিয়া কি অদ্ভুত কাণ্ডই দেখাইলেন! কলিঙ্গ আর তাঁহার পুত্র শত্রুদেব কিছুকাল তাঁহার সহিত খুব যুদ্ধ করিয়াছিলেন, এমন-কি, তাঁহাদের ভয়ে তাঁহার সঙ্গের চেদি দেশীয় সৈন্যগুলি তাঁহাকে ফেলিয়া পলায়ন করিতেও ত্রুটি করে নাই। শত্রুদেব ভীমের ঘোড়া অবধি মারিয়া ফেলেন। কিন্তু তাহার পরেই ভীম এমন এক গদা ছুঁড়িয়া মারিলেন যে, তাহাতে শত্রুদেব আর তাঁহার সারথির শরীর চূর্ণ হইয়া গেল।

তারপর ভানুমানের সহিত ভীমের যুদ্ধ হয়। ভানুমান ছিলেন হাতির উপরে আর ভীম মাটির উপরে। ভীম খড়্গ হাতে একলাফে সেই হাতির উপরে উঠিয়া, ভানুমান এবং হাতি উভয়কেই কাটিয়া ফেলিলেন। তারপর ভীম হাতি, ঘোড়া যাহা সম্মুখে পান, তাহাই খড়্গ দিয়া খণ্ড খণ্ড করেন। লাথির চোটে

কত মানুষ পুঁতিয়া গেল। হাঁটুর গুঁতায় কত যোদ্ধা ঠিকরাইয়া পড়িতে লাগিল। এ-সকল কাণ্ড দেখিয়া কে কোথায় পলাইবে তাহার ঠিকানাই রহিল না।

তারপর ভীম কলিঙ্গ আর কেতুমানকে মারিয়া, দুইহাজার সাতশত কলিঙ্গ সেনা বধ করিলেন।

আর-এক স্থানে দুর্যোধন অনেক যোদ্ধা লইয়া অভিমন্যুকে ঘিরিয়াছেন। অভিমন্যুর তাহাতে কিছুমাত্র ভয় হয় নাই। কিন্তু অর্জুন যখন দেখিলেন যে তাঁহার পুত্রকে দুরাত্মারা ঘিরিয়া ফেলিয়াছে তখন আর তিনি তাঁহার কাছে না আসিয়া থাকিতে পারিলেন না। এদিকে ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি বড়-বড় বীরেরা অর্জুনকে আটকাইবার জন্য আসিয়া উপস্থিত। তখন অর্জুন এমনি ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন যে, তাঁহাকে আটকান দূরে থাকুক, উহাদের নিজের প্রাণ বাঁচানোই ভার হইল। চারিদিকে খালি যোদ্ধাদের মাথা কাটিয়া পড়িতেছে, ইহা ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। সর্বনাশ উপস্থিত দেখিয়া, ভীষ্ম তাড়াতাড়ি দ্রোণাচার্যকে ডাকিয়া বলিলেন, "ঐ দেখ, অর্জুন কি আরম্ভ করিয়াছে! আজ আর উহার সঙ্গে পারা যাইবে না। বেলাও শেষ হইয়াছে ; শীঘ্র যুদ্ধ থামাইয়া দাও।"

কাজেই তখন যুদ্ধ শেষের শিঙ্গা বাজিয়া উঠিল ; কৌরব সৈন্যেরাও বলিল, "আঃ বাঁচিলাম!"

পরদিন কৌরবেরা 'গরুড়' ও পাণ্ডবেরা 'অর্ধচন্দ্র' ব্যূহ করিয়া সৈন্য সাজাইলেন। সেদিন ভীষ্ম, দ্রোণ, অর্জুন, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র, ভীম, ঘটোৎকচ. ধৃষ্টদ্যুম্ন, যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব প্রভৃতি সকলেই খুব যুদ্ধ করেন। যুধিষ্ঠির আর ধৃষ্টদ্যুম্ন এমনি যুদ্ধ করিয়াছিলেন যে, ভীষ্ম আর দ্রোণ দুজনে মিলিয়াও তাঁহাদিগকে নিবারণ করিতে পারেন নাই। কৌরব-সৈন্যেরা ভীষ্ম দ্রোণের কথা না শুনিয়া, তাঁহাদের সম্মুখে পলাইতে লাগিল।

ইহা দেখিয়া দুর্যোধন ভীষ্মকে বলিলেন, "সৈন্য সব মারা যাইতেছে, আর আপনারা চুপ করিয়া আছেন! ইহাতে বোধ হয়, পাণ্ডবদের উপকার করাই আপনাদের উদ্দেশ্য। এমন জানিলে আমি কখনোই যুদ্ধ করিতে আসিতাম না।"

এ কথায় ভীষ্ম বলিলেন, "পাণ্ডবেরা যে কত বড় বীর, তাহা তোমাকে বারবার বলিয়াছি। আমি বুড়া মানুষ, তথাপি আমার যথাসাধ্য যুদ্ধ করিতেছি, দেখ।"

এই বলিয়া ভীষ্ম ক্রোধভরে এমনি যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন যে কাহার সাধ্য তাঁহার সামনে দাঁড়ায়! চারিদিকে কেবল 'হায় হায়!' 'রক্ষা কর!' 'বাবা গো!' এইরূপ শব্দ। পাণ্ডবপক্ষের এক-এক যোদ্ধার নাম করিয়া তিনি বলেন, "এই তোমাকে কাটিলাম!" আর অমনি তাহার মাথা কাটিয়া পড়ে! সেই বুড়া মানুষ তখন এমনি বেগের সহিত ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন যে, তাঁহার বাণই কেবল দেখা গিয়াছিল, কিন্তু তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় নাই।

এইরূপ অবস্থা দেখিয়া কৃষ্ণ অর্জুনকে বলিলেন, "অর্জুন! এই তো সময়। তুমি বলিয়াছিলে ভীষ্ম, দ্রোণ সকলকে মারিবে ; এখন তোমার কথা

রাখ।”

অর্জুন বলিলেন, “শীঘ্র ভীষ্মের নিকট রথ লইয়া চলুন।”

কিন্তু অর্জুন অনেক যুদ্ধ করিয়াও ভীষ্মকে পরাজয় করিতে পারিলেন না। বুড়া বাণে বাণে কৃষ্ণ অর্জুনকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া হাসিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ বলিয়াছিলেন যুদ্ধ করিবেন না ; কিন্তু ভীষ্মের কাণ্ড দেখিয়া তাঁহার মনে হইল যে, চুপ করিয়া থাকিলে-বা তিনি এখনই পাণ্ডবদিগের সকলকে মারিয়া শেষ করেন। কাজেই তিনি রাগে অস্থির হইয়া বলিলেন, “আজই আমি কৌরবদিগের সকলকে মারিয়া যুধিষ্ঠিরকে রাজা করিব।”

এই বলিয়া তিনি তাঁহার সেই সুদর্শন চক্র নামক আশ্চর্য অস্ত্র হাতে ভীষ্মকে মারিবার জন্য ছুটিয়া চলিলেন। ভীষ্মের তাহাতে কিছুমাত্র ভয় বা দুঃখের চিহ্ন দেখা গেল না। তিনি কৃষ্ণকে নমস্কার করিয়া বলিলেন, “তুমি সকল দেবতার শ্রেষ্ঠ, তোমার হাতে মরিলে তো আমি অমনি স্বর্গে যাইব। এখনই আমাকে কাট।”

এমন সময় অর্জুন, নিতান্ত লজ্জিত ও কাতরভাবে আসিয়া কৃষ্ণের পায়ে ধরিয়া বলিলেন, “আপনি শান্ত হউন, আমি আর যুদ্ধে অবহেলা করিব না।”

এ কথায় কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হইয়া, আবার আসিয়া ঘোড়ার রাশ হাতে লইলেন। ইহার পর সন্ধ্যা পর্যন্ত অর্জুন যে কি ভীষণ যুদ্ধ করিলেন, তাহা আর কি বলিব। তাঁহার গাণ্ডীব হইতে অদ্ভুত ইন্দ্র-অস্ত্র, এবং আগুনের মতন উজ্জ্বল আরো অসংখ্য বাণ উল্কা ধারার ন্যায় অবিরাম ছুটিয়া গিয়া কৌরব-দিগকে ধানের মতো কাটিতে লাগিল। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, শল্য, ভূরিশ্রবা, বাহ্লীক প্রভৃতি সকলে হারিয়া গেলেন। তাহা দেখিয়া কৌরব-সৈন্যেরা সেই যে রণস্থল হইতে চ্যাঁচাইয়া ছুট দিল, আর শিবিরের ভিতরে না গিয়া থামিল না।

পরদিন আবার মহারণ আরম্ভ হইল। প্রথমে ভীষ্ম, অর্জুন আর অভিমন্যু প্রভৃতি ঘোর যুদ্ধ করেন। তারপর ধৃষ্টদ্যুম্ন কিছুকাল সাংযমনির পুত্রের সহিত যুদ্ধ করিয়া, গদাঘাতে তাঁহার মাথা গুঁড়া করিয়া দেন।

কিন্তু সেদিনকার যুদ্ধে বাস্তবিক ভয়ানক কাণ্ড যদি কেহ করিয়া থাকেন, তবে সে ভীম! ভীম গদা হাতে হাতি, ঘোড়া, রথী, পদাতি সকলকে পিষিতে আরম্ভ করিলে দুর্যোধন তাঁহাকে মারিবার জন্য অনেকগুলি সৈন্য পাঠাইয়া দেন। সে-সকল সৈন্য মারা গেলে, কিছুকাল ভীষ্ম আর অলম্বুষের সহিত সাত্যকির যুদ্ধ চলে। তারপর দুর্যোধনের সহিত ভীমের দেখা হয়। দুর্যোধন একবার বাণাঘাতে ভীমকে অজ্ঞান করিয়া দেন। ভীম অবিলম্বে আবার উঠিয়া দুর্যোধনকে মারেন আট বাণ, আর শল্যকে পঁচিশ। শল্য বেগতিক দেখিয়া তখনই পলায়ন করিলেন।

তখন সেনানী, সুষেণ, জলসন্ধ, সুলোচন, উগ্র, ভীমরথ, ভীম, বীরবাহু, আলোপুর, দুর্মুখ, দুষ্প্রধর্ষ, বিবিৎসু, বিকট এবং সম নামক দুর্যোধনের চৌদ্দ ভাই একসঙ্গে আসিয়া ভীমকে আক্রমণ করেন। ভীমের তাহাতে সন্তোষ

ভিন্ন অসন্তোষের কোনো কারণ ছিল না। তিনি তাঁহাদিগকে হাতের কাছে পাইয়া, মনের সুখে এক-একটি করিয়া সংহার করিতে লাগিলেন। প্রথমে সেনানী, তারপর জলসন্ধ, তারপর সুষেণ, তারপর উগ্র, বীরবাহু, ভীমরথ, সুলোচন—দেখিতে দেখিতে সাতটির প্রাণ গেল। ইহার পর আর বাকি সাতটির ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন ভিন্ন উপায় রহিল না।

এ-সকল কাণ্ড দেখিয়া ভীষ্ম কৌরবদিগকে কহিলেন, "ঐ দেখ, ভীম বোকা-গুলিকে পাইয়া একেবারে শেষ করিল! তোমরা শীঘ্র যাও।"

সে কথায় ভগদত্ত ভীমকে আক্রমণ করিয়া, খানিক যুদ্ধের পর, একেবারে তাঁহাকে অজ্ঞান করিয়া ফেলেন। ভীম অজ্ঞান হওয়ামাত্রই বিশাল বিশাল হাতির উপরে অগণ্য রাক্ষস লইয়া ঘোর বেগে ঘটোৎকচ আসিয়া উপস্থিত। তখন ভগদত্তকে বাঁচানোই কঠিন হইল। ততক্ষণ সন্ধ্যাও হইয়া আসিতেছিল। সুতরাং ভীষ্ম তাড়াতাড়ি যুদ্ধ শেষ করিয়া সেদিনকার মতন কৌরবদিগকে ঘটোৎকচের হাত হইতে রক্ষা করিলেন।

পরদিন প্রভাতে কৌরবেরা 'মকর' ব্যূহ ও পাণ্ডবেরা 'শ্যেন' ব্যূহ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।

প্রথমে ভীমার্জুন আর ভীষ্মের যুদ্ধ হইল, তারপর দ্রোণ আর সাত্যকির। সাত্যকি দ্রোণের হাতে একটু জব্দ হইয়া আসিলে ভীম দ্রোণকে অনেক বাণ মারিয়া তাঁহাকে ছাড়াইয়া দেন। ইহাতে ভীষ্ম, দ্রোণ আর শল্য রোষভরে ভীমকে আক্রমণ করায় অভিমন্যু দ্রৌপদীর পুত্রগণসহ ভীমের সাহায্য করিতে লাগিলেন।

এমন সময় শিখণ্ডী ধনুর্বাণ হাতে ভীষ্মকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু ভীষ্ম তো আর তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবেন না। শিখণ্ডী যতই বাণ মারেন, ভীষ্মের তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। ততক্ষণে দ্রোণ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হওয়ায়, শিখণ্ডীকে পলায়ন করিতে হইল।

তারপর সকলে যুদ্ধে মাতিয়া রণস্থলে ভীষণ কাণ্ড উপস্থিত করিলেন। বেলা যায়, তথাপি যুদ্ধের বিরাম নাই। সেদিন সাত্যকি দুর্যোধনের অনেক সৈন্য মারেন। দুর্যোধন দশহাজার সৈন্য পাঠাইয়া তাঁহাকে থামাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেই দশহাজার সৈন্যও তাঁহার হাতে মারা গেল।

এই সময়ে ভূরিশ্রবা আসিয়া সাত্যকিকে ঘোরতর রূপে আক্রমণ করাতে তাঁহার সঙ্গের লোকেরা তাঁহাকে ফেলিয়া পলায়ন করিল। সাত্যকির দশ পুত্র তাঁহার সাহায্যের জন্য ছুটিয়া আসিলেন। কিন্তু ভূরিশ্রবার বজ্রসম বাণের আঘাতে, দেখিতে দেখিতে তাঁহাদের দেহ চূর্ণ হইয়া গেল। তারপর বেলা আর অতি অল্পই অবশিষ্ট ছিল, কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই, অর্জুন পঁচিশ হাজার মহারথী মারিয়া শেষ করিলেন। এইরূপে সেদিনকার যুদ্ধ শেষ হইল।

পরদিন পাণ্ডবদের 'মকর' ব্যূহ এবং কৌরবদের 'ক্রৌঞ্চ' ব্যূহ করিয়া সৈন্য সাজানো হইল। সেদিনকার যুদ্ধে ভীম এবং ধৃষ্টদ্যুম্নের যে বীরত্ব দেখা গিয়াছিল, তাহার তুলনা দুর্লভ। ভীমকে দেখিতে পাইয়াই দুঃশাসন তাঁহার

আর বারোটি ভাইকে ডাকিয়া বলিলেন, "এস ভাইসকল। আজ ইহাকে মারিব।"

তখন হাজার হাজার রথী লইয়া তেরো বীর ভীমকে আক্রমণ করিলেন। ভীমের তাহা গ্রাহ্যই হইল না; তিনি ভাবিলেন, 'আগে রথীগুলিকে শেষ করিয়া লই!' তারপর তিনি গদা হাতে রথ হইতে নামিয়া, একদিক হইতে কৌরব-সৈন্য মারিতে আরম্ভ করিলেন।

এদিকে ধৃষ্টদ্যুম্ন যুদ্ধ করিতে করিতে সেখানে আসিয়া ভীমের শূন্য রথখানি দেখিয়া ব্যস্তভাবে সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হায়! হায়! শূন্য রথ কেন? ভীম কোথায়?"

সারথি বলিল, "তিনি কৌরব মরিবার জন্য গদা হাতে নামিয়া গিয়াছেন।"

ভীম যে পথে গিয়াছেন, গদার ঘায় ক্রমাগত হাতি মারিয়া গিয়াছেন। সেই হাতিগুলি দেখিয়া তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে বিলম্ব হইল না। ভীম তখন ছোট সৈন্য শেষ করিয়া রাজা মারিতে ব্যস্ত। অতঃপর তাঁহারা দুজনে মিলিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে দুর্যোধনের কতকগুলি ভাই সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইবামাত্র, ধৃষ্টদ্যুম্ন সম্মোহন অস্ত্র দ্বারা তাহাদিগকে অজ্ঞান করিয়া ফেলাতে বেচারারা যুদ্ধ করিতে পাইল না!

ইহার পর দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া পাণ্ডবদিগকে বড়ই অস্থির করিয়া তোলেন। পাণ্ডবগণ কিছুতেই তখন তাঁহাকে বারণ করিতে পারেন নাই। তারপর ভীষ্ম আর অর্জুন কিছুকাল ভয়ানক যুদ্ধ হয়। এইরূপে সমস্ত দিনই নানা স্থানে তুমুল যুদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু কোনো ঘটনা সেদিন ঘটে নাই।

সেদিনকার যুদ্ধ শেষ হইলে, যুধিষ্ঠির ভীম আর ধৃষ্টদ্যুম্নকে আদর করিয়া মনের সুখে শিবিরে গেলেন।

পরদিন কৌরবদিগের হইল 'মণ্ডপ' ব্যূহ আর পাণ্ডবদের 'বজ্র' ব্যূহ। সেদিন প্রথম বেলায় বিরাটের পুত্র শঙ্খ দ্রোণের হাতে মারা যান।

সাত্যকি আর অলম্বুষে সেদিন খুব যুদ্ধ হইয়াছিল। অলম্বুষ রাক্ষস, ঘোর মায়াবী। তাই সে আগে মায়া দ্বারা সাত্যকিকে ভুলাইতে চেষ্টা করে। কিন্তু সাত্যকি অর্জুনের ছাত্র, তাঁহার নিকট ইন্দ্র-অস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন: সেই ইন্দ্র-অস্ত্র দিয়া তিনি রাক্ষসের সকল মায়া উড়াইয়া দিলেন। তখন সে পলাইতে পারিলে বাঁচে।

অর্জুনের পুত্র ইরাবান, বিন্দ ও অনুবিন্দের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগকে পরাজয় করেন। ঘটোৎকচ ভগদত্তকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ভগদত্ত অসাধারণ যোদ্ধা; তাঁহার যুদ্ধ কেহ সহিতে পারে না। ঘটোৎকচ কিছুকাল তাঁহার সহিত খুব তেজের সহিত যুদ্ধ করিয়া শেষে পলায়ন করিতে বাধ্য হইল।

শল্য সেদিন নকুল ও সহদেবকে আক্রমণ করিতে গিয়া, শেষে একটু জব্দ হন। মেঘ যেমন সূর্যকে ঢাকে, সহদেব তেমনি করিয়া বাণের দ্বারা শল্যকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছিলেন। শল্য সহদেবের মামা; কাজেই তাঁহার বাণে আচ্ছন্ন

হইয়াও তিনি অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। খানিক বেশ জোরের সহিতই যুদ্ধ চলিয়াছিল। তারপর সহদেবের এক বাণ খাইয়া শল্য আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। সারথি দেখিল, মদ্ররাজ অজ্ঞান হইয়া গিয়াছেন, সুতরাং সে রথ লইয়া প্রস্থান করিল।

বেলা দুই প্রহরের সময় শ্রুতায়ু যুধিষ্ঠিরের বাণ খাইয়া পলায়ন করেন। ভীষ্ম, দ্রোণ আর অর্জুনও সেদিন বহু সৈন্য বধ করেন। তারপর ক্রমে সন্ধ্যা হইল, সেদিনকার যুদ্ধও থামিল।

পরদিন প্রভাতে কৌরবেরা সাগরের মতো ভয়ানক এক ব্যূহ প্রস্তুত করিলেন। তাহা দেখিয়া যুধিষ্ঠির ধৃষ্টদ্যুম্নকে বলিলেন, "তুমি 'শৃঙ্গাটক' ব্যূহ রচনা কর।"

সেদিন সকালবেলায় ভীষ্ম অসীম তেজের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সে সময়ে এক ভীম ছাড়া আর এমন কেহই উপস্থিত ছিল না যে তাঁহাকে আটকায়। ভীম ভীষ্মকে আক্রমণ করিলেন; আর দুর্যোধন ভ্রাতাগণসহ তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। ভীমের প্রথম কাজই হইল, ভীষ্মের সারথিটিকে সংহার করা। সারথি নাই, ঘোড়া কে থামাইবে? তাহারা রথ লইয়া রণস্থলময় ছুটা-ছুটি করিতেছে। সেই ফাঁকে ভীমও দুর্যোধনের ভাই সুনাভের মাথাটি কাটিয়া বসিয়া আছেন। সুনাভের মৃত্যুতে আদিত্যকেতু, বহ্বাশী, কুণ্ডধার, মহোদর, অপরাজিত, পণ্ডিত ও বিশালাক্ষ নামক দুর্যোধনের আর সাত ভাই ক্ষেপিয়া ভীমকে মারিতে লাগিল। ভীমও তাহাদিগকে সম্মুখে পাইয়া আর সংহার করিতে বিলম্ব করিলেন না।

তাহা দেখিয়া দুর্যোধন কাঁদিতে কাঁদিতে ভীষ্মকে বলিলেন, "দাদামহাশয়, ভীম তো ভাইগুলিকে মারিয়া ফেলিল। আপনার যুদ্ধে উৎসাহ নাই!"

ভীষ্ম বলিলেন, "আগে তো শুন নাই! ভীম কি তোমাদিগকে পাইলে ছাড়িবে? আমি আর দ্রোণ যথাসাধ্য যুদ্ধ করিতেছি, করিবও।"

অর্জুনের পুত্র ইরাবান সেদিন অসাধারণ বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন। শকুনি আর তাঁহার ছয় ভাই মিলিয়া ইরাবানকে আক্রমণ করেন। সাতজনে মিলিয়া চারিদিক হইতে মারে, কাজেই ইরাবান প্রথমে তাহাদিগের কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাঁহার শরীর অস্ত্রের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গেল, দর দর ধারে রক্ত পড়িতে লাগিল। তখন ইরাবান অসিচর্ম (খড়্গ ও ঢাল) হাতে রথ হইতে নামিলেন। শত্রুরা এই সুযোগে তাঁহাকে মারিতে চেষ্টার ত্রুটি করে নাই। কিন্তু তাহারা আর কোনো অনিষ্ট করিবার পূর্বে শকুনি ছাড়া তাহাদের আর সকলে ইরাবানের খড়্গে খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল।

ভাইদিগের মৃত্যুতে শকুনি পলায়ন করিলে, দুর্যোধন ইরাবানকে মারিবার নিমিত্ত আর্যশৃঙ্গ নামক এক ভয়ংকর রাক্ষসকে পাঠাইয়া দিলেন। দুরাত্মা যুদ্ধ করিতে আসিয়াই মায়াবলে দুইহাজার অশ্বারোহী রাক্ষস আনিয়া ফেলিল! রাক্ষসের দল মারামারি করিতেছে, সেই অবসরে মায়াবী আর্যশৃঙ্গ আকাশে উঠিয়া গিয়াছে। কিন্তু ইরাবানও মায়া জানিতেন, কাজেই আকাশে উঠিয়াও

রাক্ষস তাঁহার কিছু করিতে পারিল না, তিনি খড়্গ দিয়া দুষ্টকে ক্ষত-বিক্ষত করিতে লাগিলেন।

ইরাবান নাগের দেশের লোক। নাগেরা যুদ্ধের সংবাদ পাইয়া দলে দলে তাঁহার সাহায্য করিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। রাক্ষসও তখন গরুড় হইয়া সেই-সকল সাপ গিলিতে আরম্ভ করিল।

হায়! ইহাতে কি সর্বনাশ হইল! এই ব্যাপার দেখিয়া ইরাবান এমন আশ্চর্য হইয়া গেলেন যে, যুদ্ধের কথা আর তাঁহার একেবারে মনে নাই! সেই সুযোগে দুষ্ট রাক্ষস তাঁহার মাথা কাটিয়া ফেলিল। অর্জুন অন্যদিকে ভয়ানক যুদ্ধে ব্যস্ত, ইরাবানের মৃত্যুর কথা তিনি তখন জানিতে পারিলেন না। ভীষ্ম, দ্রোণ, ভীম, দ্রুপদ প্রভৃতিও তখন প্রত্যেকে হাজার হাজার করিয়া সৈন্য মারিতেছেন। সে সময়ের অবস্থা কি ভীষণ! যোদ্ধাদিগের কি বিষম রাগ, যেন সকলকে ভূতে পাইয়াছে। ঘটোৎকচ, ভীম, দ্রোণ, ভগদত্ত ইঁহারা সকলেই অতি অদ্ভুত বীরত্ব দেখাইলেন। সেদিন বিকালবেলার অর্ধেক যুদ্ধ ঘটোৎকচ একেলাই করিয়াছিল। তখন তাহার ভয় বা ক্লান্তি কিছুই দেখা যায় নাই।

ভীমকে মারিবার জন্য দুর্যোধনের ভ্রাতারা দ্রোণকে সহায় করিয়া খুবই তেজের সহিত যুদ্ধ করিতে আসেন। কিন্তু ভীম যখন দ্রোণের সাক্ষাতেই তাঁহাদের এক-একটি করিয়া ক্রমাগত বৃঢ়োরস্ক, কুণ্ডলী, অনাধৃষ্য, কুণ্ডভেদী, বৈরাট, বিশালাক্ষ্য, দীর্ঘবাহু, সুবাহু ও কনকধ্বজ এই নয়টিকে বধ করিলেন, তখন অবশিষ্টেরা তাঁহাকে সাক্ষাৎ যমের মতো ভাবিয়া আর পলাইবার পথ পান না।

ইঁহারা পলাইয়া গেলে, ভীম অন্যান্য যোদ্ধাগণকে মারিতে আরম্ভ করিলেন। তখন ভীষ্ম, দ্রোণ, ভগদত্ত, কৃপ ইঁহাদের সাধ্য হইল না যে তাঁহাকে বারণ করেন।

রাত্রি হইল, তথাপি যুদ্ধের শেষ নাই। ঘোর অন্ধকার হইলে তবে সেদিন সকলে শিবিরে গেলেন।

রাত্রিতে দুর্যোধন কর্ণ আর শকুনিকে বলিলেন, "পাণ্ডবদিগকে কেহই মারিতে পারিতেছে না, ইহার কারণ কি? আমার মনে বড়ই ভয় হইয়াছে।"

এ কথায় কর্ণ বলিলেন, "ভীষ্ম কেবল বড়াই করেন; আসলে তাঁহার ক্ষমতা নাই। উঁহাকে অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে বলুন, দেখিবেন, আমি দুদিনের মধ্যে পাণ্ডবদিগকে মারিয়া শেষ করিব।"

দুর্যোধন তখনই ভীষ্মের শিবিরে গিয়া তাঁহাকে প্রণামপূর্বক বলিলেন, "দাদামহাশয়! পাণ্ডবদিগকে মারিতে বিলম্ব করিতেছেন কেন? আপনার যদি তাহাদিগকে মারিতে ইচ্ছা না থাকে, তবে নাহয় একবার কর্ণকে বলিয়া দেখুন-না। তিনি তাহাদিগকে বধ করিবেন।"

এমন অপমানের কথায় ভীষ্মের মনে নিতান্তই ক্লেশ হইবে, তাহা আশ্চর্য কি? তিনি খানিক চক্ষু বুজিয়া চুপ করিয়া রহিলেন; তারপর বলিলেন, "আমি প্রাণপণে তোমার উপকার করিতেছি, তথাপি তুমি কেন আমাকে এমন কঠিন কথা বলিতেছ? যে পাণ্ডবেরা খাণ্ডবদাহ করিল, নিবাত কবচগণকে

মারিল, তোমাকে গন্ধর্বের হাত হইতে বাচাইল, বিরাটনগরে তোমাদিগকে হারাইয়া গোরু ছাড়াইয়া নিল, আর তোমাদের পোশাক লইয়া উত্তরাকে পুতুল খেলিতে দিল, তাহারা যে অসাধারণ বীর ইহা কি বুঝিতে পার না? যাহা হউক, কাল আমি এমন যুদ্ধ করিব যে লোকে চিরদিন সেই যুদ্ধের কথা বলিবে।"

পরদিন যুদ্ধ বড়ই ভয়ানক হইল। সকালবেলায় দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র আর অভিমন্যুকে মারিতে আসিয়া রাক্ষস অলম্বুষ খুব জব্দ হয়। তারপর দ্রোণ, অর্জুন, সাত্যকি, অশ্বত্থামা প্রভৃতি অনেকক্ষণ যুদ্ধ করেন। মধ্যাহ্নকাল হইতে যুদ্ধ ক্রমেই ঘোরতর হইয়া উঠিতে লাগিল। অর্জুন তখন এমন যুদ্ধ করিয়াছিলেন যে কৌরব-সৈন্যেরা পলাইবারও অবসর পায় নাই।

কিন্তু শেষ বেলায় একেলা ভীষ্ম পাণ্ডবদিগকে একেবারে অস্থির করিয়া তুলিলেন। কাহারো এমন ক্ষমতা হইল না যে তাঁহাকে আটকায়। ভীষ্মের ধনুষ্টঙ্কার অন্য-সকল শব্দকে ডুবাইয়া দিল। তাঁহার বাণ যাহার গায়ে লাগিল, তাহাকে ভেদ না করিয়া ছাড়িল না। পাণ্ডব-সৈন্যেরা অস্ত্র ফেলিয়া এলোচুলে চ্যাঁচাইয়া পলাইতে লাগিল; কাহার সাধ্য তাহাদিগকে ফিরায়। কৃষ্ণ ক্রমাগত অর্জুনকে বলিতেছেন, "অর্জুন, কি দেখিতেছ? ভীষ্মকে মার!"

অর্জুন বলিলেন, "রাজ্যের জন্য যদি এমন কাজই করিতে হয়, তবে আর বনে গিয়া ক্লেশ পাইলাম কেন? আচ্ছা চলুন আপনার কথাই রাখিতেছি।"

কিন্তু অর্জুন কিছুতেই ভীষ্মকে বারণ করিতে পারিলেন না। তাহা দেখিয়া কৃষ্ণ চাবুক হাতে নিজেই ভীষ্মকে মারিতে চলিলেন। ইহাতে অর্জুন লজ্জিত হইয়া আরো উৎসাহের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে ভীষ্মের তেজ কমা দূরে থাকুক, বোধ হইল যেন আরো বাড়িয়া গিয়াছে। আগুন লাগিলে উলুবনের যেমন দশা হয়, ভীষ্মের হাতে পড়িয়া পাণ্ডব-সৈন্যদেরও প্রায় তেমনি হইল।

যতক্ষণ আলো ছিল, ততক্ষণ ভীষ্ম এইরূপ করিয়া যুদ্ধ করেন। তারপর অন্ধকার আসিয়া সৈন্যদিগকে বাঁচাইয়া দিল।

সেরাত্রে পাণ্ডবেরা ভীষ্মের নিকট গিয়া, তাঁহাকে প্রণামপূর্বক কাতরভাবে বলিলেন, "দাদামহাশয়! আমরা তো কিছুতেই আপনার সঙ্গে পারিয়া উঠিতেছি না। আমাদের রাজ্য পাওয়ার কি উপায় হইবে? আর এত লোক যে মরিতেছে, তাহাই-বা কিরূপে বারণ হইবে? আপনাকে বধ করিবার উপায় বলিয়া দিন।"

ভীষ্ম বলিলেন, "আমার হাতে অস্ত্র থাকিলে দেবতারাও আমাকে পরাজয় করিতে পারে না। আমি অস্ত্র ত্যাগ করিলে আমাকে মারা সম্ভব হইতে পারে। সুতরাং এক উপায় বলিয়া দিই। শিখণ্ডীকে দেখিলে আমি অস্ত্র ত্যাগ করি, অর্জুন এই শিখণ্ডীকে সম্মুখে রাখিয়া আমার গায় বাণ মারুক। এই আমার বধের উপায়: আমি অনুমতি দিতেছি, তোমরা মনের সুখে আমায় প্রহার কর। আমার এই কথামত কাজ করিলে, নিশ্চয় তোমাদের জয়লাভ হইবে।"

এইরূপ কথাবার্তার পর পাণ্ডবেরা সেখান হইতে চলিয়া আসিলেন।

শিবিরে আসিয়া অর্জুন কৃষ্ণকে বলিলেন, "ছেলেবেলায় খেলা করিতে করিতে, ধুলোসুদ্ধ দাদামহাশয়কে জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহার গায়ে ধুলো মাখাইয়া দিতাম। কোলে উঠিয়া ডাকিতাম, 'বাবা!' তিনি বলিতেন, 'আমি তোমার বাবা নই, তোমার বাবার বাবা!' সেই দাদামহাশয়কে কি করিয়া মারিব? আমি তাহা পারিব না। মরি সেও ভালো।"

যাহা হউক, কৃষ্ণের উপদেশে অর্জুনের মনের এই দুঃখ শীঘ্রই দূর হইয়া গেল। ভীষ্মকে না মারিলে জয় নাই; সুতরাং যে উপায়েই হউক তাঁহাকে মারিতে হইবে।

রাত্রি প্রভাত হইলে পাণ্ডবেরা রণবাদ্য বাজাইয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। আজ শিখণ্ডী সকলের আগে, অপর যোদ্ধারা তাঁহার পশ্চাতে।

যুদ্ধ আরম্ভ হইবামাত্র, ভীষ্ম পূর্বদিনের ন্যায় একধার হইতে পাণ্ডব-সৈন্য শেষ করিতে লাগিলেন। শিখণ্ডী তাঁহাকে বারণ করিবার জন্য ক্রমাগত বাণ মারিতেছেন, তাহাতে তাঁহার ভ্রূক্ষেপ মাত্র নাই। শিখণ্ডীর বাণ খাইয়া তিনি হাসেন আর বলেন, "তোমার যাহা খুশি কর, আমি তোমার সহিত যুদ্ধ করিব না।"

শিখণ্ডী তাহার উত্তরে বলিলেন, "তুমি যুদ্ধ কর আর না কর আমার হাতে আজ তোমার রক্ষা নাই।"

এইরূপে শিখণ্ডী ভীষ্মকে বাণ মারিতেছেন, আর ভীষ্ম তাঁহার দিকে না তাকাইয়া ক্রমাগত পাণ্ডবদিগের সৈন্য মারিতেছেন; পাণ্ডবেরা তাঁহাকে কোনোমতেই বারণ করিতে পারিতেছেন না। তাহা দেখিয়া অর্জুন মহারোষে কৌরব-সৈন্য মারিতে আরম্ভ করিলেন।

দুর্যোধনের নিজের এমন ক্ষমতা নাই যে তিনি অর্জুনকে আটকান, কাজেই তিনি ভীষ্মকে বলিলেন, "দাদামহাশয়! অর্জুন তো সব মারিয়া শেষ করিল, আপনি ভালো করিয়া যুদ্ধ করুন!"

তাহা শুনিয়া ভীষ্ম বলিলেন, "আমি তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, রোজ দশহাজার সৈন্য মারিব। তাহার মতে আমি রোজ দশহাজার সৈন্য মারিয়াছি। আজ যুদ্ধে প্রাণ দিয়া, তুমি যে এতদিন আমাকে অন্ন দিয়াছ, সেই ঋণ শোধ করিব।"

এই বলিয়া তিনি প্রাণপণে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন।

এদিকে শিখণ্ডীর বাণের বিরাম নাই। অর্জুন ক্রমাগত তাঁহাকে উৎসাহ দিয়া বলিতেছেন, "ভয় নাই! দাদামহাশয়কে আক্রমণ কর! আমি বাণ মারিয়া তাঁহাকে বধ করিব।"

অর্জুনকে বারণ করিবার জন্য দুঃশাসন প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু খানিক যুদ্ধের পরেই অর্জুনের বাণ সহিতে না পারিয়া, ভীষ্মের রথে গিয়া তাঁহাকে আশ্রয় নিতে হইয়াছে।

এদিকে ভগদত্ত, কৃপ, শল্য, কৃতবর্মা, বিন্দ, অনুবিন্দ, জয়দ্রথ, চিত্রসেন, বিকর্ণ, দুর্মর্ষণ, ইঁহারা সকলে মিলিয়া ভীমকে আক্রমণ করিয়াও তাঁহার কিছুই

করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের হাজার হাজার বাণ সহ্য করিয়া ভীম তাঁহাদের সকলকে বাণে বাণে অস্থির করিয়া দিয়াছেন।

এমন সময় অর্জুন আসিয়া ভীমের সহিত মিলিলেন। তখন কৌরবদেরও ভীষ্ম, দুর্যোধন, বৃহদ্বল প্রভৃতি সকলে সেখানে আসিলে, যুদ্ধ বড়ই ভীষণ হইয়া উঠিল। এই গোলমালের ভিতরে শিখণ্ডী তাঁহার নিজের কাজ ভুলেন নাই। সুযোগ পাইলেই তিনি ভীষ্মের গায়ে বাণ মারিতেছেন।

যুধিষ্ঠির এই সময়ে ভীষ্মের খুব কাছে ছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া ভীষ্ম বলিলেন, "যুধিষ্ঠির! অনেক প্রাণী বধ করিয়াছি, আমার আর বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা নাই। আমাকে যদি সুখী করিতে চাহ, তবে শীঘ্র অর্জুনকে লইয়া আমাকে বধ কর।"

যুধিষ্ঠির ভীষ্মের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া, সকলকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমরা শীঘ্র আইস। আজ ভীষ্মের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিতে হইবে।"

ইহার পর হইতে শিখণ্ডীকে সম্মুখে করিয়া, পাণ্ডবগণ ভীষ্মের বধের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কৌরবেরাও সকলে মিলিয়া তাঁহাদিগকে বাধা দিবার কোনোরূপ আয়োজনই করিতে বাকি রাখিলেন না। তখন যে কিরূপ ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করিবার শক্তি আমার আর নাই।

আর ভীষ্মের কথা কি বলিব? 'আজ মরিতে হইবে', এই তাঁহার প্রতিজ্ঞা। যেমন করিয়া মরিলে ক্ষত্রিয় স্বর্গে যায়, সেইরূপ করিয়া মরিতে হইবে। রণস্থলে ধর্মযুদ্ধে শত্রু সংহার করিতে করিতে প্রাণ দেওয়া অপেক্ষা, ক্ষত্রিয়ের আর গৌরবের কথা হইতে পারে না। ভীষ্মের ন্যায় মহাবীর আর মহাপুরুষ আজ সেই গৌরবের সুযোগ পাইয়া, আর তাহা ছাড়িতে প্রস্তুত নহেন। তাই তিনি আজ মরিবার জন্য যুদ্ধ করিতেছেন। ঐ দেখ, পাণ্ডবদের দলের সোমক নামক সৈন্যগণ দেখিতে দেখিতে তাঁহার বাণে শেষ হইয়া গেল। ঐ শুন, মেঘগর্জনের ন্যায় তাঁহার ধনুকের শব্দ অবিরাম শুনা যাইতেছে। কৃষ্ণ, অর্জুন আর শিখণ্ডী ব্যতীত কেহই সে ধনুকের সম্মুখে টিকিতে পারিতেছে না।

শিখণ্ডী ভীষ্মের বুকে দশ বাণ মারিলেন। ভীষ্ম তাহা গ্রাহ্য করিলেন না। অর্জুন ক্রমাগত তাঁহাকে বলিতেছেন, "মার! মার!" শিখণ্ডী উৎসাহ পাইয়া বাণে বাণে ভীষ্মকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। সেই মহাপুরুষ, সে-সকল বাণের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, একদিকে অর্জুনকে নিবারণ, আর-একদিকে পাণ্ডব-সৈন্য সংহার করিতে ব্যস্ত।

এই সময়ে দুঃশাসন একা পাণ্ডবদিগের সকলের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া ভীষ্মকে রক্ষা করিতেছিলেন। তখন তাঁহার বীরত্ব দেখিয়া কেহই প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারে নাই। অর্জুন ভিন্ন আর কেহই তাঁহাকে এড়াইয়া যাইতে পারিলেন না।

শিখণ্ডী ভীষ্মকে বাণ মারিতে এক মুহূর্তও অবহেলা করিতেছেন না। ভীষ্ম হাসিতে হাসিতে তাঁহার সকল বাণ অগ্রাহ্য করিয়া, ক্রমাগত পাণ্ডব-সৈন্য বধ করিতেছেন। দুর্যোধন প্রভৃতি সকলে প্রাণপণে ভীষ্মের সাহায্যের জন্য

ব্যস্ত ; কিন্তু অর্জুনের তেজে তাঁহাদের সকল চেষ্টাই বিফল হইতেছে। অর্জুনের গাণ্ডীব হইতে ভীষণ বাণ-বৃষ্টির আর বিরাম নাই, কৌরব-সৈন্যদের আর বুঝি কিছু অবশিষ্ট থাকিল না। কৃপ, শল্য, দুঃশাসন, বিকর্ণ, বিংশতি, সকলেই পলাইয়া গেলেন। মৃতদেহে রণস্থল ছাইয়া গেল।

কিন্তু ভীষ্ম একাই যে অদ্ভুত কাজ করিতেছিলেন, অন্যেরা পলাইয়া যাওয়াতে তাহার কিছুমাত্র ক্ষতি হইল না।

অর্জুনের কাছে পাণ্ডবপক্ষের যে-সকল রাজা ছিলেন, ভীষ্ম তাঁহাদের সকলকেই মারিয়া শেষ করেন। দশহাজার গজারোহী, সাতজন মহারথ, চৌদ্দ-হাজার পদাতি, একহাজার হাতি, দশহাজার ঘোড়া, তাহা ছাড়া বিরাটের ভাই শতানীক প্রভৃতি হাজার হাজার যোদ্ধা সেদিন তাঁহার হাতে মারা যান।

এমন সময় কৃষ্ণ অর্জুনকে বলিলেন, "অর্জুন, তুমি শীঘ্র ভীষ্মকে বারণ কর। উঁহাকে মারিতে পারলেই জয় হইবে।"

অমনি অর্জুন বাণে বাণে ভীষ্মকে আচ্ছন্ন করিলেন। ভীষ্মও সে-সকল বাণ খণ্ড খণ্ড করিতে কিছুমাত্র বিলম্ব করিলেন না। তারপর ভীম, ধৃষ্টদ্যুম্ন, অভিমন্যু, সাত্যকি, ঘটোৎকচ প্রভৃতি পাণ্ডবপক্ষের সকলে তাঁহার বাণে অস্থির হইয়া উঠিলে, অর্জুন তাঁহাদিগকে রক্ষা করিলেন।

শিখণ্ডীর বিশ্রাম নাই, আবার অর্জুন তাঁহার সাহায্য করিতেছেন। সাত্যকি চেকিতান, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, দ্রুপদ, নকুল, সহদেব, অভিমন্যু, দ্রৌপদীর পুত্রগণ প্রভৃতি সকলে মিলিয়াও তাঁহাকে বাণ মারিতে ত্রুটি করিতেছেন না। তথাপি ভীষ্ম কিছুমাত্র কাতর নহেন। তাঁহার যুদ্ধ তেমনি চলিয়াছে।

এমন সময় অর্জুন ভীষ্মের ধনুক কাটিয়া ফেলিলেন। তাহা দেখিয়া দ্রোণ, কৃতবর্মা, জয়দ্রথ, ভূরিশ্রবা, শল, শল্য ও ভগদত্ত মিলিয়া অর্জুনকে আক্রমণ করিতে যাওয়ায়, সাত্যকি, ভীম, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, ঘটোৎকচ আর অভিমন্যু অর্জুনের সাহায্যের জন্য ছুটিয়া আসিলেন।

এদিকে শিখণ্ডী বাণে বাণে ভীষ্মকে আচ্ছন্ন করিয়াছেন। ভীষ্ম ধনুক হাতে লইলেই অর্জুন তাহা কাটিয়া ফেলিতেছেন। তাহাতে ভীষ্ম এক শক্তি ছুঁড়িয়া মারিলে, তাহাও তিনি কাটিতে বাকি রাখেন নাই।

তখন ভীষ্ম মনে মনে বলিলেন, 'কৃষ্ণ না থাকিলে এখনো আমি এক বাণেই পাণ্ডবদিগকে মারিতে পারি। কিন্তু আমি পাণ্ডবদিগকে মারিব না, শিখণ্ডীর সহিতও যুদ্ধ করিব না। এই আমার মরিবার সুযোগ।'

ভীষ্মের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া, অপর বসুগণ আকাশ হইতে বলিলেন, "তাহাই ঠিক, ভীষ্ম! আর যুদ্ধে কাজ নাই।"

এ কথায় স্বর্গে দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। দেবতারা ভীষ্মের উপর পুষ্প-বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। আর এই সময় হইতে ভীষ্ম অর্জুনের সহিত যুদ্ধের চেষ্টা ছাড়িয়া দিলেন। এতক্ষণ শিখণ্ডী তাঁহাকে যে-সকল বাণ মারিতেছিলেন তাহা তাঁহার গ্রাহ্যই হয় নাই। অতঃপর অর্জুন গাণ্ডীব লইয়া তাঁহার গায়ে ভয়ংকর বাণসকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ভীষ্ম তখনো অন্যান্য যোদ্ধাগণের

সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন, কিন্তু অর্জুনের বাণে জর্জরিত হইয়াও, তিনি তাঁহাকে আর আঘাত করিলেন না। অর্জুন অবসর পাইয়া ক্রমাগত তাঁহার ধনুক কাটিয়া তাঁহার উপর বাণ মারিতে লাগিলেন।

এই সময় দুঃশাসন ভীষ্মের কাছে ছিলেন। ভীষ্ম তাঁহাকে বলিলেন, "দুঃশাসন! এ-সকল তো শিখণ্ডীর বাণ নয়, এগুলি নিশ্চয় অর্জুনের। দেখ আমার বর্ম ভেদ করিয়া বাণগুলি শরীরের ভিতরে প্রবেশ করিতেছে।"

এই বলিয়া তিনি অর্জুনের প্রতি একটা শক্তি ছুঁড়িয়া মারিলে, অর্জুন তিন বাণে তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তারপর ভীষ্ম ঢাল আর খড়্গ হাতে লইয়া মনে করিলেন, 'হয় মরিব, নাহয় সকলকে মারিব।' কিন্তু তিনি খড়্গ চর্ম হাতে রথ হইতে নামিবার পূর্বেই তাহাও অর্জুন কাটিয়া শত খণ্ড করিলেন।

এদিকে কৌরবেরা ভীষ্মকে রক্ষার জন্য কত চেষ্টাই করিতেছেন, কিন্তু পাণ্ডবেরা তাঁহাদিগকে কিছুই করিবার অবসর দিতেছেন না। অর্জুনের বাণে ভীষ্মের শরীর এরূপ ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছে যে, আর দু আঙ্গুল স্থানও অবশিষ্ট নাই। এইরূপে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া, সূর্যাস্তের কিঞ্চিৎ পূর্বে, ভীষ্ম রথ হইতে পড়িয়া গেলেন। পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিল। 'হায় হায়!' শব্দে দেবতারা চিৎকার করিয়া উঠিলেন। 'হায় হায়!' শব্দে যোদ্ধাগণ কাঁদিতে লাগিল। শরীরে এত বাণ বিঁধিয়া ছিল যে, রথ হইতে পড়িয়াও ভীষ্ম শূন্যেই রহিয়া গেলেন ; তাঁহার শরীর মাটি ছুঁইতে পাইল না। লোকে মৃত্যুর সময় কোমল বিছানায় শয়ন করে ; কিন্তু ভীষ্মের হইল 'শর-শয্যা', অর্থাৎ বাণের বিছানা।

সেই মহাবীর শর-শয্যায় শুইয়া স্বর্গের কথা ভাবিতে লাগিলেন। তখন আকাশ হইতে দেবতারা জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে মহাবীর! হে মহাপুরুষ! সূর্য এখনো আকাশের দক্ষিণভাগে রহিয়াছেন। মহাপুরুষের মৃত্যুর ইহা সময় নহে। তুমি এমন সময়ে প্রাণত্যাগ করিবে?"

ভীষ্ম বলিলেন, "আমি তো প্রাণত্যাগ করি নাই!"

মানস সরোবরবাসী হংসগণ আকাশে উড়িয়া যাইতেছিল। তাহারা বলিল, "এখনো সূর্যদেব আকাশের দক্ষিণভাগেই রহিয়াছেন : মহাত্মা ভীষ্ম কি এমন সময়ে প্রাণত্যাগ করিবেন?"

ভীষ্মদেব সেই হংসগণকে দেখিয়া ক্ষণকাল চিন্তা করিলেন। উহারা তাঁহারই মাতা গঙ্গাদেবীর প্রেরিত হংসরূপী মহর্ষিগণ।

তাই তিনি বলিলেন, "হে হংসগণ! পিতার বরে আমি মৃত্যুকে বশ করিয়াছি। সত্য কহিতেছি, সূর্যদেব আকাশের উত্তরভাগে না গমন করিলে আমি প্রাণত্যাগ করিব না।"

ভীষ্ম রথ হইতে পড়িবামাত্র যুদ্ধ থামিয়া গেল। পাণ্ডবদের দলে মহাশঙ্খ বাজিয়া উঠিল ; ভীম আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। দ্রোণ এ সংবাদ শুনিবা-মাত্র অজ্ঞান হইয়া রথ হইতে পড়িয়া গেলেন। তারপর যোদ্ধাগণ কবচ পরিত্যাগ করিয়া হেঁটমুখে জোড়হাতে, সেই মহাবীরের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন।

তখন ভীষ্ম বলিলেন, "হে মহারথগণ! তোমাদের মঙ্গল তো? তোমাদিগকে দেখিয়া বড়ই সুখী হইলাম। দেখ, আমার মাথা ঝুলিয়া পড়িয়াছে, বালিশ দাও।"

রাজামহাশয়েরা তৎক্ষণাৎ রাশি রাশি কোমল রেশমী বালিশ আনিয়া উপস্থিত করিলেন। তাহা দেখিয়া ভীষ্ম হাসিয়া বলিলেন, "এ বালিশ তো এ বিছানার উপযুক্ত নয়। বৎস অর্জুন, উপযুক্ত বালিশ দাও।"

অর্জুন কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "দাদামহাশয়! কি করিতে হইবে আজ্ঞা করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! তুমি ধনুর্ধরগণের শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধিমান আর ক্ষত্রিয়ের ধর্মে শিক্ষিত। মাথা ঝুলিতেছে, উপযুক্ত বালিশ দাও।"

তখন অর্জুন, ভীষ্মের পদধূলি লইয়া, তিন বাণে তাঁহার মাথা উঁচু করিয়া দিলেন। তাহাতে ভীষ্ম পরম সন্তোষের সহিত অর্জুনকে আশীর্বাদ করিয়া সকলকে বলিলেন, "এই দেখ, অর্জুন আমার উপযুক্ত বালিশ দিয়াছেন।"

তারপর ভীষ্ম আবার বলিলেন, "যতদিন না সূর্যদেব আকাশের উত্তরভাগে যাইবেন, ততদিন আমি এইভাবেই থাকিব; সূর্যদেব আকাশের উত্তরভাগে আসিলে আমি প্রাণত্যাগ করিব। আমার চারিদিকে পরিখা করিয়া (অর্থাৎ খাল কাটিয়া) দাও। আর তোমরা শত্রুতা ছাড়িয়া যুদ্ধে ক্ষান্ত হও।"

তারপর দুর্যোধন ভালো-ভালো চিকিৎসক ও ঔষধ লইয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলে, ভীষ্ম বলিলেন, "উহা দিয়া আমার কি হইবে? এখন আমার চিকিৎসার সময় নহে, আমাকে পোড়াইবার সময়।"

সুতরাং চিকিৎসকেরা তাহাদের ঔষধ লইয়া ফিরিয়া গেল। তারপর রাত্রি হইলে সে স্থানে প্রহরী রাখিয়া সকলে শিবিরে গমন করিলেন।

রাত্রি প্রভাত হইলে, পুনরায় সকলে ভীষ্মের নিকট আসিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিলেন। ক্রমে স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ সকলে তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত সেখানে আসিতে লাগিল। কন্যাগণ তাঁহার উপরে ফুলের মালা চন্দনচূর্ণ ও খই ছড়াইতে লাগিল। গায়ক নর্তক ও বাদ্যকরগণ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজারা বিনীতভাবে তাঁহার চারিদিক ঘিরিয়া বসিলেন। তখন সেখানকার শোভা হইল যেন স্বর্গের শোভা।

এমন সময় ভীষ্ম বলিলেন, "জল দাও।"

অমনি সকলে ব্যস্ত হইয়া নানারূপ মিষ্টান্ন এবং সুশীতল জল আনিয়া উপস্থিত করিল। তাহা দেখিয়া ভীষ্ম কহিলেন, "এ পৃথিবী হইতে আমি বিদায় লইয়াছি; সুতরাং এখানকার মানুষেরা যে জল খায় আমি আর তাহা খাইব না। অর্জুন কোথায়?"

অর্জুন জোড়হাতে বলিলেন, "কি করিতে হইবে দাদামহাশয়?"

ভীষ্ম বলিলেন, "দাদা! বিছানা দিয়াছ, বালিশ দিয়াছ, এখন তাহার উপযুক্ত জল দাও!"

অর্জুন ভীষ্মের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া, অমনি গাণ্ডীবে পর্জন্যাস্ত্র

যোজনা করিলেন। সে অস্ত্র ভীষ্মের দক্ষিণপার্শ্বের ভূমিতে নিক্ষেপ করামাত্রই, তথা হইতে অতি পবিত্র নির্মল জলের উৎস উঠিতে লাগিল। আহা, কি সুগন্ধ! কি মধুর শীতল জল! সে জল পান করিয়া ভীষ্মের প্রাণ জুড়াইল। তিনি অর্জুনকে বার বার আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, "তোমার সমান ধনুর্ধর এ জগতে আর নাই। দুর্যোধন আমাদের কথা শুনিল না ; সুতরাং সে নিশ্চয় মারা যাইবে।"

দুর্যোধন কাছেই ছিলেন, আর ভীষ্মের কথা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিতও হইয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া ভীষ্ম বলিলেন, "দুর্যোধন! অর্জুন যাহা করিল, দেখিলে তো? এমন কাজ আর কেহই করিতে পারে না। এই পৃথিবীতে অর্জুন আর কৃষ্ণ ভিন্ন আগ্নেয়, বরুণ, সৌম্য, বায়ব্য, বৈষ্ণব, ঐন্দ্র পাশুপত, পারমেষ্ঠ, প্রাজাপাত্য, ধাত্র, ত্বাষ্ট্র, সাবিত্র ও বৈবস্বত অস্ত্রসকলের কথা কেহ জানেন না। তুমি এইবেলা পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধি কর, আমার মৃত্যুতেই এই যুদ্ধের শেষ হউক। আমি সত্য কহিতেছি, আমার কথা না শুনিলে নষ্ট হইবে।"

এই কথা বলিয়া ভীষ্ম চুপ করিলেন ; সকলে শিবিরে চলিয়া গেলেন। এমন সময় কর্ণ সেখানে আসিয়া ভীষ্মকে প্রণাম করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "হে কুরুশ্রেষ্ঠ! যে প্রতিদিন আপনার দৃষ্টিপথে পড়িয়া আপনাকে ক্লেশ দিত, আমি সেই রাধেয় (রাধার পুত্র)।"

ভীষ্ম কষ্টে চক্ষু মেলিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, সেখানে অপর লোক নাই, কেবল প্রহরীরা আছে। তখন প্রহরীদিগকে সরাইয়া দিয়া এক হাতে কর্ণকে আলিঙ্গনপূর্বক তিনি বলিলেন, "কর্ণ! তুমি আসিয়া ভালো করিয়াছে। আমি নারদ আর ব্যাসের মুখে শুনিয়াছি, তুমি রাধার পুত্র নহ, তুমি কুন্তীর পুত্র। তুমি দুষ্টের দলে জুটিয়া পাণ্ডবদিগের নিন্দা করিতে, তাই আমি তোমাকে কঠিন কথা কহিতাম ; কিন্তু আমি কখনো তোমার মন্দ ভাবি নাই। তোমার মতন ধার্মিক, দাতা, আর বীর এ পৃথিবীতে নাই এ কথা আমি জানি। এখন তুমি তোমার ভাইদিগের সহিত মিলিয়া থাক ; আমার মৃত্যুতেই এই যুদ্ধ শেষ হইয়া যাউক।"

কিন্তু এ কথায় কর্ণের মন ফিরিল না। তিনি বলিলেন, "পাণ্ডবদের সহিত আমার শত্রুতা কিছুতেই দূর হইবার নহে। আপনি অনুমতি করুন, আমি যুদ্ধ করিব। আর, আপনার নিকট যদি কোনো অপরাধ করিয়া থাকি, তাহা ক্ষমা করুন।"

ভীষ্ম বলিলেন, "যদি যুদ্ধ করিবেই, তবে রোষহীন মনে পুণ্য কামনায় যুদ্ধ করিয়া ক্ষত্রিয়ধর্ম পালনপূর্বক স্বর্গে চলিয়া যাও।"



ষ্মের পতন হইলে কর্ণ আসিয়া কৌরবদিগের পক্ষে যোগ দিলেন। কর্ণকে পাইয়া তাঁহাদের উৎসাহের সীমা রহিল না। অনেকে বলিল, "ভীষ্ম ইচ্ছা করিয়া পাণ্ডবদিগকে মারেন নাই, কিন্তু কর্ণ উঁহা-দিগকে নিশ্চয় বধ করিবেন।"

দুর্যোধন বলিলেন, "কর্ণ! এক-জন সেনাপতি স্থির কর।" কর্ণ বলিলেন, "দ্রোণ থাকিতে আর কাহাকে সেনাপতি করিবেন? দ্রোণই সর্বাপেক্ষা একাজের উপযুক্ত।"

একথায় দুর্যোধন দ্রোণকে বলিলেন, "গুরুদেব! এখন আপনি সেনাপতি হইয়া আমাদিগকে রক্ষা করুন।"

দ্রোণ বলিলেন, "আচ্ছা, আমি সেনাপতি হইয়া যথাসাধ্য যুদ্ধ করিব। কিন্তু আমি ধৃষ্টদ্যুম্নকে বধ করিতে পারিব না। সে আমাকে মারিবার জন্যই জন্মিয়াছে।"

দ্রোণকে সেনাপতি করিয়া কৌরবগণ বলিতে লাগিল, "এবারে পাণ্ডবদের পরাজয় নিশ্চয়!" দ্রোণ দুর্যোধনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল দেখি, আমি তোমার জন্য কি করিব?"

দুর্যোধন বলিলেন, "আপনি যুধিষ্ঠিরকে জীবন্ত ধরিয়া দিন।"

দ্রোণ ইহাতে আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, "যুধিষ্ঠিরই ধন্য; তাঁহার শত্রু কোথাও নাই! তুমিও তাঁহাকে মারিতে না চাহিয়া, কেবল ধরিয়া আনিতে চাহিতেছ।"

ভালো লোকে ভালোভাবেই কথা নেয়, দ্রোণ মনে করিলেন যে, দুর্যোধন বুঝি যুধিষ্ঠিরকে ভালোবাসিয়াই তাঁহাকে মারিতে চাহেন নাই। কিন্তু দুর্যোধনের পেটে যে বাঁকা বুদ্ধি, তাহা তাঁহার কথাতেই ধরা পড়িল। তিনি বলিলেন, "যুধিষ্ঠিরকে মারিলে কি অর্জুন আর আমাদিগকে রাখিবে? তাহার চেয়ে তাঁহাকে জীবন্ত ধরিয়া আনিতে পারিলে, আবার পাশা খেলিয়া বনে পাঠাইতে পারিব।"

এ কথায় দ্রোণ বলিলেন, "অর্জুন থাকিতে যুধিষ্ঠিরকে ধরিয়া আনার শক্তি দেবতাদেরও নাই। অর্জুনকে যদি সরাইতে পার, তবে যুধিষ্ঠিরকে নিশ্চয় আজ ধরিয়া আনিব।"

চরের মুখে এই সংবাদ শুনিয়া যুধিষ্ঠির অর্জুনকে বলিলেন, "তুমি আজ আমার নিকট থাকিয়া যুদ্ধ কর। আমাকে ছাড়িয়া যাইও না।"

অর্জুন বলিলেন, "আমি বাঁচিয়া থাকিতে আপনার কোনো ভয় নাই। দেবতার সাহায্য পাইলেও কৌরবেরা আপনাকে ধরিয়া নিতে পারিবে না।"

তারপর আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইল, এবং প্রথম হইতেই দ্রোণের তেজে পাণ্ডবেরা নিতান্ত অস্থির হইয়া উঠিলেন। সৈন্য যে কত মারল তাহার সীমা সংখ্যা নাই! ইহাতে যুধিষ্ঠির প্রভৃতি বীরগণ দ্রোণকে আক্রমণ করায়, যুদ্ধ ক্রমেই ঘোরতর হইয়া উঠিল।

অভিমন্যুকে আক্রমণ করিতে গিয়া হার্দিক্য বড়ই জব্দ হইলেন। প্রথমে ধনুর্বাণ লইয়া তিনি মন্দ যুদ্ধ করেন নাই; এমন-কি, তিনি অভিমন্যুর ধনুক অবধি কাটিয়া ফেলেন। তখন অভিমন্যু খড়্গ চর্ম হাতে তাহার রথে উঠিয়া এক হাতে তাহার কেশাকর্ষণ, এক লাথিতে সারথিকে সংহার, এবং খড়্গাঘাতে রথের ধ্বজাটি নাশ করিলেন। তারপর হার্দিক্যের চুল ধরিয়া তাঁহাকে ঘুরাইতে ঘুরাইতে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন।

হার্দিক্যের পরে জয়দ্রথ আসিয়াও কম নাকাল হন নাই। তারপর শল্য আসিতেই অভিমন্যুর হাতে তাঁহার সারথিটি মারা গেল। তাহাতে শল্য ক্রোধ-ভরে গদাহাতে অভিমন্যুকে মারিতে আসিলে, অভিমন্যুও বজ্র হেন মহাগদা উঠাইয়া বলিলেন, "আইস!" এমন সময় ভীম আসিয়া তাঁহাকে থামাইয়া শল্যের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন।

সে অতি আশ্চর্য যুদ্ধ হইয়াছিল। গদায় গদায় ঠোকাঠুকিতে এমনি আগুনের ফিনকি ছুটিয়াছিল যে, কামারের দোকানেও তেমন হয় না। শেষে দুজনের গদার বাড়িতে দুজনেই ঠিকরাইয়া পড়িলেন। ভীম তখনই আবার উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু শল্যের জ্ঞান না থাকায় তাঁহার আর উঠা হইল না।

তারপর ভীম, কর্ণ, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি প্রভৃতির ঘোর যুদ্ধ চলিল। এই সময়ে কৌরব সেনাগণ ক্ষত-বিক্ষত শরীরে পলায়ন করিতেছিল, দ্রোণ তাহাদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, "ভয় নাই!" বলিয়াই তিনি যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করিতে চলিলেন। সে সময়ে শিখণ্ডী, উত্তমৌজা, নকুল, সহদেব প্রভৃতির কেহই তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিলেন না।

ইঁহাদিগকে পরাজয় করিয়া তিনি যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করিবামাত্র বিরাট, দ্রুপদ, কৈকেয়গণ, সাত্যকি, শিবি, ব্যাঘ্রদত্ত, সিংহসেন প্রভৃতি ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার পথ আটকাইলেন। কিন্তু তাঁহাদের বাণে দ্রোণের কি হইবে? তিনি দেখিতে দেখিতে ব্যাঘ্রদত্ত আর সিংহসেনের মাথা কাটিয়া একেবারে যুধিষ্ঠিরের রথের কাছে গিয়া উপস্থিত হইলেন। পাণ্ডব-সৈন্যেরা তখন "মহারাজকে মারিল!" বলিয়া চ্যাঁচাইতে লাগিল, আর কৌরব-সৈন্যেরা "এই ধরিয়া আনিল!" বলিয়া আকাশ ফাটাইল।

এমন সময় অর্জুন শত্রুসৈন্য কাটিতে কাটিতে আসিয়া সেখানে দেখা দিলেন। তারপর আর কি কেহ ধনুক ধরিতে পাইল? সকলে ভয়েই অস্থির, যুদ্ধ

করিবে কে? অর্জুনের ভীষণ বাণবৃষ্টিতে চারিদিক আঁধার হইয়া গেল। তখন আর এতটুকুও বুঝিবার সাধ্য রহিল না যে, 'এই পৃথিবী, ঐ আকাশ'।

আর তখন সন্ধ্যাও হইতেছিল। কাজেই দ্রোণ তখনি যুদ্ধ থামাইয়া দিলেন। সেদিন আর তাঁহার যুধিষ্ঠিরকে ধরা হইল না।

দ্রোণের পক্ষে ইহা লজ্জার কথা বটে; আর অর্জুন থাকিতে এ লজ্জা দূর হওয়াও দুর্ঘট। সুতরাং যুক্তি হইল যে, পরদিন কৌশলে অর্জুনকে যুধিষ্ঠিরের নিকট হইতে সরাইয়া, আর-একবার চেষ্টা করিতে হইবে। দ্রোণ বলিলেন, "অর্জুনকে কেহ যুদ্ধের ছলে দূরে লইয়া যাউক। তখন সে ব্যক্তিকে পরাজয় না করিয়া অর্জুন কখনোই ফিরিবে না। সেই অবসরে আমি যুধিষ্ঠিরকে ধরিয়া আনিব।"

এ কথায় সুশর্মা, সত্যরথ, সত্যধর্মা, সত্যব্রত, সত্যেষু, সত্যকর্মা প্রভৃতি বীরগণ পঞ্চাশ হাজার সৈন্য সমেত, তখনই অগ্নির সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করিলেন, "কাল আমরা অর্জুনকে না মারিয়া যুদ্ধ হইতে ফিরিব না। যদি ফিরি তাহা হইলে, যত মহাপাপ আছে, সকলের শাস্তি যেন আমরা পাই!"

এমন প্রতিজ্ঞা যে করে, তাহাকে বলে "সংশপ্তক"। পরদিন যুদ্ধের সময় এই সংশপ্তকগণ অর্জুনকে ডাকিয়া বলিল, "আইস অর্জুন! যুদ্ধ করি!"

তাহা শুনিয়া অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, "দাদা! আমাকে যখন ডাকিতেছে, তখন তো আমি না গিয়া পারি না।" যুধিষ্ঠির বলিলেন, "দ্রোণ আমাকে ধরিয়া নিতে আসিবেন, তাহার কি হইবে?" অর্জুন বলিলেন, "আপনার কাছে সত্যজিৎকে রাখিয়া যাইতেছি। ইঁনি জীবিত থাকিতে আপনার কোনো ভয় নাই। সত্যজিৎ মরিলে আপনারা কেহ রণস্থলে থাকিবেন না।"

সেদিন সংশপ্তকেরা মিলিয়া কি অর্জুনকে কম ব্যস্ত করিয়াছিল? দলে দলে তাহারা আসিয়া প্রাণের মায়া ছাড়িয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। এক-এক দলকে শেষ করিয়া অর্জুন যেই যুধিষ্ঠিরের নিকটে ফিরিতে যান, অমনি আর-একদল আসিয়া বলে, "কোথায় যাও? এই যে আমরা আছি!"

আর তাহারা যুদ্ধও এমনি ভয়ানক করিয়াছিল যে কি বলিব! ইহার মধ্যে আবার নারায়ণীসেনারা আসিয়া তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। তখন অর্জুন রোষভরে "ত্বাষ্ট্র" অস্ত্র ছুঁড়িয়া মারিলেন। সে অতি অদ্ভুত অস্ত্র। উহা ছুঁড়িবামাত্র শত্রুদিগের মাথায় গোল লাগিয়া গেল! তখন তাহারা নিজ নিজ সঙ্গীকেই দেখিয়া বলে, "এই অর্জুন! কাট ইহাকে!" এইরূপে তিলেকের মধ্যে তাহারা নিজে নিজে কাটাকাটি করিয়া মরিল।

তথাপি সে যুদ্ধের শেষ নাই। দেখিতে দেখিতে ললিত্থ, মালব, মাবেল্লক প্রভৃতি যোদ্ধাগণ আসিয়া বাণে বাণে আকাশ ঢাকিয়া ফেলিল। তখন কৃষ্ণ বলিলেন, "অর্জুন! তুমি বাঁচিয়া আছ? আমি তো তোমাকে দেখিতে পাইতেছি না। অমনি অর্জুন বায়ব্যাস্ত্র মারিয়া শত্রুগণের বাণ তো উড়াইয়া দিলেনই, তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ ঘূর্ণী বাতাস বহিয়া হাতি ঘোড়া সংশপ্তক অবধি সকলকেই শুক্‌না পাতার মতো উড়াইয়া নিল!

এদিকে দ্রোণাচার্য তাঁহার কাজ ভুলেন নাই। তিনি যুধিষ্ঠিরকে ধরিতে গিয়া ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছেন। পাণ্ডব-সৈন্যগণ তাঁহাকে কিছুতেই আটকাইতে পারিতেছে না। দ্রোণের হাতে পাণ্ডবপক্ষের বৃক্ষ মরিয়াছেন, সত্যজিৎ মরিয়াছেন, দৃঢ়সেন, ক্ষেম, বসুদান ইঁহারাও মরিয়াছেন। যুধিষ্ঠির দেখিলেন বড়ই বিপদ। দ্রোণ সকলকে পরাজিত করিয়া এখন তাঁহারই দিকে ঝড়ের মতন ছুটিয়া আসিতেছেন। সুতরাং তিনি অবিলম্বে ঘোড়া হাঁকাইয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন।

এই সময়ে দুর্যোধন অনেক হাতি লইয়া ভীমকে আক্রমণ করেন। ভীম ক্ষণকালের মধ্যেই সে-সকল হাতি মারিয়া ফেলাতে, অঙ্গদেশের ম্লেচ্ছরাজা হাতি চড়িয়া দুর্যোধনকে সাহায্য করিতে আসেন। ইনি মরিলে আসেন ভগদত্ত।

ভগদত্ত ইন্দ্রের বন্ধু, এবং ভয়ানক যোদ্ধা ছিলেন, আর তদপেক্ষাও অতি ভয়ানক একটা হাতিতে চড়িয়া আসিয়াছিলেন। ভীম এত হাতি মারিয়াছেন, কিন্তু এ হাতিকে মারা দূরে থাকুক, বরং হাতিই তাঁহাকে শুঁড়ে জড়াইয়া, পায়ের নীচে ফেলিবার জোগাড় করিয়াছিল। অনেক কষ্টে শুঁড় ছাড়াইয়া ভীম হাতির পায়ের তলায় গিয়া লুকাইয়াছিলেন, তাই রক্ষা। আর সকলে তো মনে করিয়াছিল, তাঁহাকে বুঝি মারিয়াই ফেলিয়াছে।

এদিকে ভীমকে বাঁচাইবার জন্য যুধিষ্ঠির, ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন অন্যান্য লোকের সহিত ভগদত্তের যুদ্ধ হইতে লাগিল। দশার্ণের রাজা ভগদত্তের হাতে মারা গেলেন। ভগদত্তের হাতি সাত্যকির রথখানিকে শুঁড় জড়াইয়া ছুঁড়িয়া মারিলে সাত্যকি ও তাঁহার সারথি তাহা হইতে লাফাইয়া পড়িয়া পলায়ন করিলেন। তারপর হাতিটি রাজামহাশয়দিগকে লইয়া লুফালুফি করিতে লাগিল।

তখন না জানি কিরূপ কাণ্ড হইয়াছিল, আর সকলে কিরূপ চিৎকার করিয়াছিল। সে চীৎকার অর্জুনের কানে গিয়া উপস্থিত হইল। তাহা শুনিয়া তিনি বলিলেন, "ঐ বুঝি ভগদত্ত তাঁহার হাতি লইয়া সকলকে শেষ করিলেন। শীঘ্র ওখানে চলুন।"

কিন্তু এদিকে আবার চৌদ্দহাজার সংশপ্তক আসিয়া উপস্থিত! অর্জুন ব্রহ্মাস্ত্রে তাহাদিগকে মারিয়া ফিরিতে চলিয়াছেন, এমন সময় আবার সুশর্মা ছয় ভাই সমেত আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। যাহা হউক, সুশর্মার ছয় ভাইকে মারিয়া এবং তাঁহাকে অজ্ঞান করিয়া, চলিয়া আসিতে অর্জুনের অধিক সময় লাগিল না।

এদিকে ভগদত্ত তাঁহার হাতি লইয়া পাণ্ডব-সৈন্য শেষ করিতে ব্যস্ত, এমন সময় অর্জুন কৌরবসেনা মারিতে মারিতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তারপর দুজনে কি ভীষণ যুদ্ধই হইল! ভগদত্ত হাতির উপরে, অর্জুন রথের উপরে। অর্জুনের রথ তো আর যুদ্ধ করিতে জানে না, কিন্তু ভগদত্তের হাতিটি এক-একবার ক্ষেপিয়া, রথ গুঁড়া করিয়া দিতে আসে, কৃষ্ণ তখন অনেক কৌশলে পাশ কাটিয়া তাহাকে এড়ান।

এমন সময় অর্জুন ভগদত্তের ধনুক ও তূণ কাটিয়া, তাঁহার গায়ে সত্তরটি বাণ বিঁধাইয়া দিলেন। তখন ভগদত্তও রাগে অস্থির হইয়া, 'বৈষ্ণব অঙ্কুশ' নামক অস্ত্র অর্জুনের বুকের দিকে ছুঁড়িয়া মারিলেন। ইহা অতি ভয়ানক অস্ত্র। বিষ্ণু ইহা নরকাসুরকে দেন, নরকাসুর ভগদত্তকে দেয়। এ অস্ত্রের ঘা খাইলে ইন্দ্রেরও প্রাণ বাহির হইয়া যায়। একমাত্র বিষ্ণু ইহা সহ্য করিতে পারেন।

তাই সে অস্ত্রকে অর্জুনের দিকে আসিতে দেখিয়া কৃষ্ণ (যিনি নিজেই বিষ্ণু) নিজের বুক পাতিয়া দিলেন। তাঁহার বুকে পড়িয়া তাহা একটি সুন্দর মালা হইয়া গেল।

ইহাতে অর্জুন একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "আপনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যুদ্ধে যোগ দিবেন না। এখন সে প্রতিজ্ঞা কিজন্য ভাঙিলেন? আমি অস্ত্র বারণ করিতে পারিতাম না?"

কৃষ্ণ তাঁহাকে সে অস্ত্রের কথা বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন, "ভগদত্তের হাতে আর তাহা নাই। এখন তুমি উহাকে মার।"

ইহার অল্পক্ষণ পরেই অর্জুন রাগে ভগদত্তের হাতিকে মারিয়া, অর্ধচন্দ্র বাণে ভগদত্তকেও বধ করিলেন।

তারপর অচল ও বৃষক নামক শকুনির দুই ভাই অর্জুনের হাতে মারা গেলে, শকুনির সহিত তাঁহার যুদ্ধ আরম্ভ হয়।

শকুনি নানারূপ মায়া জানিতেন। প্রথমে তিনি এমন এক কৌশল করিলেন যে তাহাতে নানারূপ উৎকট অস্ত্র কোথা হইতে আসিয়া, কৃষ্ণ আর অর্জুনের গায়ে পড়িতে লাগিল। আর ভয়ংকর জন্তু এবং রাক্ষসগণ তাঁহাদিগকে মারিতে আসিল। কিন্তু অর্জুনের বাণের সম্মুখে এ-সকল অস্ত্র বা জন্তু এক মুহূর্তও টিকিতে পারিল না।

তখন শকুনি হঠাৎ চারিদিক অন্ধকার করিয়া ফেলিলেন।

অর্জুন জ্যোতিষ্ক অস্ত্রে সে অন্ধকার দূর করিলে, সেই ধূর্ত কোথা হইতে জলের বন্যা আনিয়া সকলকে ভাসাইয়া দিবার আয়োজন করিলেন। অর্জুনের আদিত্যাস্ত্রে জল সহজেই দূর হইল। তারপর আর শকুনির মায়ায় কুলাইল না; তিনি অর্জুনের বাণ খাইয়া পলায়ন করিলেন।

এইরূপে অর্জুন ক্রমে কৌরব-সৈন্যদিগকে নিতান্ত অস্থির করিয়া তোলায় তাহারা আর রণস্থলে টিকিয়া থাকিতে পারিল না। পাণ্ডব-সৈন্যগণ ইহাতে উৎসাহ পাইয়া দ্রোণকে আক্রমণ করিবার আয়োজন করিল। তখন যে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা বড়ই সাংঘাতিক। একদিকে দ্রোণ মহারোষে হাজার-হাজার সৈন্য মারিতেছেন, অপরদিকে অশ্বত্থামা নীলকে সংহার করিয়াছেন। ইহার মধ্যে আবার একদল সংশপ্তক আসিয়া, অর্জুনকে ডাকিয়া লইয়া গিয়াছে।

বাস্তবিক তখন পাণ্ডব-সৈন্যদের একটু বিপদই হইয়াছিল। কিন্তু এমন সময় ভীম সেখানে আসিয়া উপস্থিত হওয়ায়, আবার তাহাদের উৎসাহ দেখা দিল। ততক্ষণে অর্জুনও, সংশপ্তকদিগকে মারিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়াছেন। তখন তাঁহার বাণে কৌরবদের কি দুর্গতিই হইল! তাহারা চ্যাঁচায় আর শুধু

বলে 'কর্ণ! কর্ণ!'

সে ডাক শুনিয়া কর্ণ তখনই তিনটি ভাই সমেত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভাই তিনটি তো আসিয়াই অর্জুনের হাতে মারা গেল ; নিজে কর্ণও বুকে হাতে সাত্যকির বাণ খাইয়া কম শিক্ষা পাইলেন না। দ্রোণ, দুর্যোধন আর জয়দ্রথ ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে না ছাড়াইলে বিপদ হইত।

তারপর সন্ধ্যা পর্যন্ত দুইপক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ চলিল। সন্ধ্যার সময় যুদ্ধ থামাইয়া সকলে শিবিরে আসিলেন।

সেদিনও যুধিষ্ঠিরকে ধরিতে না পারায়, দুর্যোধনের নিকট লজ্জা পাইয়া, দ্রোণ প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, পরদিন 'চক্র' ব্যূহ নামক অতি ভয়ংকর ব্যূহ প্রস্তুত করিয়া তিনি পাণ্ডবপক্ষের একজন মহারথীকে বধ করিবেন।

সেদিন প্রভাত হইবামাত্রই সংশপ্তকেরা আসিয়া অর্জুনকে ডাকিয়া লইয়া গেল। এই অবসরে দ্রোণ সেই সাংঘাতিক 'চক্র' ব্যূহ রচনা করিয়া পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। পাণ্ডবেরা তখন এমনই বিপদে পড়িলেন যে কি বলিব! অর্জুন অনুপস্থিত, এখন শুধু অভিমন্যু ছাড়া আর কেহই সে ব্যূহে প্রবেশ করিতে জানে না। সুতরাং দ্রোণ সুবিধা পাইয়া সকলকে অস্থির করিয়া তুলিলেন।

যুধিষ্ঠির আর উপায় না দেখিয়া, অভিমন্যুকেই বলিলেন, "বাবা! আমরা তো এ ব্যূহে প্রবেশ করিবার কোনো উপায় জানি না। এখন অর্জুন আসিয়া যাহাতে আমাদের নিন্দা না করেন, তাহা কর।"

অভিমন্যু বলিলেন, "আমি এ ব্যূহে প্রবেশ করিতে ভয় পাই। কিন্তু আপনি যখন বলিতেছেন, তখন অবশ্যই যাইব।"

এ কথায় যুধিষ্ঠির আর ভীম বলিলেন, "তুমি কেবল পথটুকু করিয়া দাও তারপর তোমার পিছু পিছু আমরা ঢুকিয়া বাকি যাহা করিবার সব করিব।"

এ কথায় অভিমন্যু তাঁহার সারথি সুমিত্রকে চক্রব্যূহের দিকে রথ চালাইতে বলিলে, সুমিত্র বিনয় করিয়া বলিল, "কুমার, বড়ই কঠিন এবং ভয়ংকর কাজে হাত দিতেছেন ; একবার ভাবিয়া দেখুন।"

অভিমন্যু বলিলেন, "তুমি চল। নিজে ইন্দ্র দেবতাদিগকে লইয়া আসিলেও আজ আমি যুদ্ধ করিব।"

সুতরাং সারথি আর বিলম্ব না করিয়া রথ চালাইয়া দিল। আর অমনি, হরিণের ছানা পাইলে বাঘ যেমন করিয়া আসে, সেইরূপ করিয়া কৌরব-যোদ্ধাগণ বালক অভিমন্যুকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু বয়সে বালক হইলে কি হয়? সেই আঠারো বৎসরের ছেলে দ্রোণের সামনেই ব্যূহ ভেদ করিয়া বড়-বড় কৌরবদিগকে একধার হইতে বাণের ঘায়ে অচল করিতে লাগিলেন। কত লোক মরিল, কত পলাইয়া গেল, তাহার কি সংখ্যা আছে? অশ্মকেশ্বর মরিলেন, কর্ণ অজ্ঞান হইলেন, শল্য অজ্ঞান হইলেন, শল্যের ভাই মারা গেলেন, ছোট-খাট যোদ্ধার তো কথাই নাই।

অভিমন্যুর বীরত্ব দেখিয়া দ্রোণ কৃপকে বলিলেন, "ইহার মতো যোদ্ধা

বোধহয় আর কোথাও নাই। এ ইচ্ছা করিলে আমাদের সকলকে মারিয়া শেষ করিতে পারে।"

এ কথা কিন্তু দুর্যোধনের সহ্য হইল না। তিনি বলিলেন, "অর্জুনের পুত্র বলিয়া দ্রোণ ইচ্ছা করিয়াই ইহাকে মারিতেছেন না। তাই এই মূর্খের এত স্পর্ধা হইয়াছে। চল, আমরা সকলে মিলিয়া ইহাকে বধ করি।"

দুঃশাসন বলিলেন, "ইহাকে মারিলে, অর্জুন কাঁদিতে কাঁদিতে আপনিই মরিয়া যাইবে। অর্জুন মরিলে পাণ্ডবেরাও মরিবে। সুতরাং আমি এখনই ইহাকে মারিয়া আপনার সকল আপদ দূর করিয়া দিতেছি।"

দুঃশাসন এইরূপ গর্ব করিয়া অভিমন্যুকে মারিতে গেলেন, আর তাহার খানিকক্ষণ পরেই দেখা গেল যে তিনি চিৎ হইয়া রথে পড়িয়া খাবি খাইতেছেন, আর সারথি সেই রথ হাঁকাইয়া বায়ুবেগে পলায়ন করিতেছে!

কর্ণ দুবার আসিয়া দুবারই নাকালের একশেষ হইলেন; তাঁহার এক ভাই তো মরিয়াই গেল।

কিন্তু হায়! যাঁহারা এত উৎসাহ দিয়া অভিমন্যুকে ব্যূহের ভিতরে পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহাদের কেহই তাঁহার সঙ্গে ব্যূহে প্রবেশ করিতে পারিলেন না। একা জয়দ্রথ যুদ্ধ করিয়া তাঁহাদের সকলকে ফিরাইয়া দিতে লাগিলেন। তিন বাণে সাত্যকি, আট বাণে ভীম, ষাট বাণে ধৃষ্টদ্যুম্ন, দশ বাণে বিরাট, পাঁচ বাণে দ্রুপদ, দশ বাণে শিখণ্ডী, সত্তর বাণে যুধিষ্ঠির, এইরূপে সকলকেই তাঁহার নিকট পরাজিত হইতে হইল। দ্বৈত বনে ভীমের হাতে মার খাইয়া জয়দ্রথ শিবের তপস্যা করেন। তখন শিব তাঁহাকে বর দেন যে 'তুমি অর্জুন ভিন্ন আর চারি পাণ্ডবকে যুদ্ধে পরাজয় করিবে; সেই বরের জোরে আজ জয়দ্রথের এত পরাক্রম।

এদিকে অভিমন্যু বৃষসেনকে পরাজয়পূর্বক বসাতীকে মারিয়াছেন। তারপর কৌরবপক্ষের অনেকে মিলিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিলে, তাঁহাদিগকেও কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়াছেন; শল্যের পুত্র রুক্মরথকে মারিয়া গান্ধর্ব-অস্ত্রে অনেক যোদ্ধাকে অজ্ঞান করত, তাহাদিগকে বধ করিয়াছেন।

বাস্তবিক কেহই তাঁহার নিকট হইতে অক্ষত শরীরে ফিরিতে পায় নাই। দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, কৃতবর্মা ও হার্দিক্য এই ছয়জনে এক সঙ্গে তাঁহাকে আক্রমণ করিতে গিয়া ছয়জনই পরাজিত হইলেন। তারপর ক্রাথের পুত্র আসিয়া মারা গেল। তারপর আবার সেই দ্রোণ প্রভৃতি ছয়জনের পরাজয়; তারপর বৃক্ষারক এবং বৃহদ্বলের মৃত্যু। আর কত বলিব? ক্রমাগত যোদ্ধারা আসে, আর অভিমন্যুর অস্ত্রে মারা যায়। কৌরবেরা বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, আজ ইঁহার হাতে আর তাঁহাদের রক্ষা নাই।

তখন শকুনি বলিলেন, "চল সকলে মিলিয়া উহাকে মারি, নচেৎ ও আমাদের সকলকেই বধ করিবে।"

কর্ণ তখন দ্রোণকে বলিলেন, "শীঘ্র ইহাকে মারিবার উপায় করুন। নচেৎ আর রক্ষা নাই!"

এ কথায় দ্রোণ বলিলেন, "উহার কবচ ভেদ করা অসম্ভব। কিন্তু চেষ্টা করিলে, উহার ধনুক কাটিয়া, সারথি প্রভৃতি মারিয়া উহার যুদ্ধ বন্ধ করিয়া দিতে পার। উহার হাতে ধনুক থাকিতে দেবতাগণেরও উহাকে পরাজয় করিবার সাধ্য নাই। সুতরাং আগে উহার ধনুক কাট ; তারপর যুদ্ধ করিও।"

এই কথায় কর্ণ হঠাৎ বাণ মারিয়া, অভিমন্যুর ধনুকটি কাটিলেন, ভোজ তাঁহার ঘোড়াগুলিকে মারিলেন, কৃপ সারথিকে বধ করিলেন ; এইরূপে তাঁহাকে সঙ্কটে ফেলিয়া, নিষ্ঠুর ছয় মহারথ এককালে সেই বীর বালককে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন।

ধনুক নাই, রথ নাই। অভিমন্যু খড়্গ চর্ম লইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। তাহাও দ্রোণ আর কর্ণের ছলনায় দেখিতে দেখিতে কাটা গেল। চক্র নিলেন, তাহাও চারিদিক হইতে সকলে বাণ মারিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল।

তখন অভিমন্যু গদা হাতে অশ্বত্থামার দিকে ছুটিয়া চলিলে অশ্বত্থামা তিন লাফে সেখান হইতে পলায়ন করিলেন। এদিকে চারিদিক হইতে বাণ বিঁধিয়া অভিমন্যুর দেহ সজারুর দেহের মতো হইয়া গিয়াছে।

এই সময়েও অভিমন্যু গদাঘাতে সত্তরটি সঙ্গীসমেত কালিকেয় এবং অপর সতেরজন রথী ও দশটি হাতিকে মারিয়া দুঃশাসনের পুত্রের রথ ও ঘোড়া চূর্ণ করেন। তখন দুঃশাসনের পুত্রও গদা লইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করে। দুইজনেই দুজনের গদার বাড়িতে ঠিকরাইয়া পড়েন। কিন্তু দুঃশাসনের পুত্র আগে উঠিয়া অভিমন্যুর মাথায় সাংঘাতিক গদার আঘাত করে। এইরূপে অন্যায় যুদ্ধে সে বালক মহাবীরকে সকলে মিলিয়া নির্দয়ভাবে হত্যা করিল।

কৌরবগণ তাঁহাদের পাপকর্ম শেষ করিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন। আর পাণ্ডবদের কথা কি বলিব? তাঁহাদের দুঃখ লিখিয়া জানানো সম্ভব নহে। অভিমন্যুর মৃত্যুতে সৈন্যেরা ভয় পাইয়া পলায়ন করিতেছিল ; যুধিষ্ঠির অনেক কষ্টে তাহাদিগকে ডাকিয়া ফিরাইলেন। তারপর সকলে যুধিষ্ঠিরকে ঘিরিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন, কাহারো মুখে কথা বাহির হইল না।

এদিকে অর্জুন সংশপ্তকদিগকে মারিয়া ফিরিবার সময় কৃষ্ণকে বলিলেন, "আজ কেন আমার মন এত অস্থির হইতেছে? আমার শরীরও যেন অবশ হইয়া পড়িতেছে। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের কোনো অমঙ্গল হয় নাই তো?"

শিবিরে প্রবেশ করিয়াই তাঁহারা দেখিলেন, চারিদিক অন্ধকার, লোকজনের সাড়াশব্দ নাই। অন্যদিন বাদ্য আর কোলাহলে শিবির পরিপূর্ণ থাকে, আজ তাহার কিছুই নাই। বিশেষত, অভিমন্যু প্রত্যহ, অর্জুন শিবিরে আসিবামাত্র, ভাইদিগকে লইয়া হাসিমুখে তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হন ; আজ সেই অভিমন্যুই-বা কোথায়?

এ-সকল কথা আর বাড়াইয়া বলিয়া ফল কি? অভিমন্যুর মৃত্যুর সংবাদে অর্জুনের কিরূপ কষ্ট হইল, তাহা তোমরা কল্পনা করিয়া লও। অভিমন্যুর মতো পুত্র মরিলে যেমন দুঃখ হইতে পারে, তাহা তাঁহার অবশ্যই হইল। আর সেই দুঃখে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, "কল্য

আমি জয়দ্রথকে বধ করিব। যদি কল্য সেই পাপাত্মা জীবিত থাকিতে সূর্য অস্ত হয়, তবে আমি এইখানেই জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করিব।"

এই সংবাদ তখনই চরেরা দুর্যোধনের শিবিরে লইয়া গেল। তাহা শুনিয়া জয়দ্রথ ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে সকলকে বলিলেন, "রাজামহাশয়গণ! আপনাদের মঙ্গল হউক! আপনাদের অনুমতি পাইলেই আমি এই বেলা পলায়ন করি!"

কিন্তু দুর্যোধন তাহাকে সাহস দিয়া বলিলেন, "আমরা এতগুলি লোক থাকিতে তোমার ভয় কি? আমরা তোমাকে রক্ষা করিব।"

দুর্যোধনের কথায় ভরসা না পাইয়া, জয়দ্রথ দ্রোণের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। দ্রোণও তাঁহাকে খুব সাহস দিয়া বলিলেন, "ভয় নাই! আমি এমন ব্যূহ প্রস্তুত করিব যে, অর্জুন তাহা পারই হইতে পারিবে না। আর যদিই-বা অর্জুন তোমাকে মারে, তাহা হইলেও তো তোমার স্বর্গলাভ হইবে! সুতরাং ভয় কি?"

এ-সকল কথা আবার পান্ডবদিগের চরেরা তাঁহাদের কাছে গিয়া বলিলে কৃষ্ণ অর্জুনের জন্য বড়ই চিন্তিত হইলেন।

পরদিন দ্রোণ যে ব্যূহ প্রস্তুত করিলেন, তাহা বড়ই অদ্ভুত। এই ব্যূহ চব্বিশ ক্রোশ লম্বা, আর পিছনের দিকে দশ ক্রোশ চওড়া। ইহার সম্মুখ ভাগ শকটের ন্যায়, পশ্চাদ্ভাগ চক্র বা পদ্মের ন্যায়। ইহার ভিতরে আবার লুকাইয়া 'সূচী' নামক একটি ব্যূহ হইল। কৃতবর্মা, কাম্বোজ, জলসন্ধ, দুর্যোধন প্রভৃতি বীরেরা, জয়দ্রথকে তাঁহাদের পশ্চাতে রাখিয়া, এই 'সূচী' ব্যূহে লুকাইয়া রহিলেন। নিজে দ্রোণ বড় ব্যূহের মুখে, এবং ভোজ তাঁহার পশ্চাতে থাকিয়া সকলকে রক্ষা করিতে লাগিলেন।

সেদিন অর্জুন কি ভীষণ রণই করিলেন। কৌরব-সৈন্যের মধ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল। তাহারা পলাইবে কি, যেদিকে চাহে, সেইদিকেই দেখে অর্জুন! দুঃশাসন অনেক হাতি লইয়া অর্জুনকে আটকাইতে আসিলেন, মুহূর্তের মধ্যে সে-সকল হাতি অর্জুনের বাণে খন্ড খন্ড হইয়া গেল। তাঁহার এক-একটা বাণে দুই তিনটা করিয়া মানুষ কাটা যাইতে লাগিল।

এমন সময়, দুর্যোধনের তাড়ায় দ্রোণ অর্জুনকে আক্রমণ করিলেন। কিছু-কাল দুইজনে এমনি যুদ্ধ চলিল যে, তাহার আর তুলনা নাই। কিন্তু অর্জুনের আজ অন্য কাজ রহিয়াছে, দ্রোণের কাছে এত সময় নষ্ট করিলে তাঁহার চলিবে কেন? কাজেই তিনি হঠাৎ তাঁহার পাশ দিয়া রথ চালাইয়া দিলেন। তাহাতে দ্রোণ বলিলেন, "সে কি অর্জুন! তুমি না শত্রুকে জয় না করিয়া ছাড় না?" অর্জুন বলিলেন, "আপনি তো আমার শত্রু নহেন, আপনি আমার গুরু! আমি আপনার পুত্রের সমান শিষ্য। আর আপনাকে কে যুদ্ধে হারাইতে পারে?"

কিন্তু বুড়া কি সহজে ছাড়িবার লোক? তিনি অর্জুনের পশ্চাতে তাড়া করিলেন। তখন কাজেই অল্প-স্বল্প করিয়া তাঁহাকে বারণ করা আবশ্যক হইল। এরপর ভোজকে পার হইতে হইবে। কিন্তু কৃতবর্মা ইহার মধ্যে পথ আটকাইয়া

বসিয়াছেন। যাহা হউক, ইঁহাকে অজ্ঞান করিতে অর্জুনের অধিক সময় লাগিল না।

কৃতবর্মা অজ্ঞান হইলে আসিলেন শ্রুতায়ুধ। ইঁহার বরুণদত্ত একটা ভয়ংকর গদা আছে। সে গদা কেহই ফিরাইতে পারে না। কিন্তু উহার একটি দোষ এই যে, যুদ্ধে লিপ্ত নহে এমন লোককে মারিলে, উহা উল্টিয়া তাহার প্রভুরই মাথায় পড়ে। শ্রুতায়ুধ অর্জুনকে মারিতে গিয়া, সেই গদা কৃষ্ণের উপর ঝাড়িয়া বসিয়াছেন! কাজেই, বুঝিতেই পার, অর্জুনের আর শ্রুতায়ুধকে মারিবার জন্য পরিশ্রম করিতে হইল না।

শ্রুতায়ুধের পর সুদক্ষিণ; তারপর শ্রুতায়ু ও অচ্যুত; তারপর উঁহা-দিগের পুত্র নিয়তায়ু, দীর্ঘায়ু; তারপর সহস্র সহস্র অঙ্গদেশীয় গজারোহী সৈন্য; তারপর বিকটাকার অসংখ্য যবন, পারদ ও শক; তারপর আর-একজন শ্রুতায়ু—এইরূপ করিয়া কত যোদ্ধা মরিল। দুর্যোধন তো দ্রোণের উপর চটিয়াই অস্থির! তিনি বলিলেন, "আপনি আমাদের খান, আবার আমাদেরই অনিষ্ট করেন। আপনি যে মধু মাখানো ক্ষুরের মতো, তাহা আমি জানিতাম না। যাহা হউক, শীঘ্র জয়দ্রথকে বাঁচাইবার উপায় করুন।"

দ্রোণ বলিলেন, "আমি কি করিব? আমি বুড়া হইয়া এখন আর ছুটাছুটি করিতে পারি না। অর্জুন একটু ফাঁক পাইলেই রথ হাঁকাইয়া চলিয়া যায়। কৃষ্ণ এমনি তাড়াতাড়ি রথ চালান যে অর্জুনের বাণ তাহার এক ক্রোশ পিছনে পড়ে। বজ্র হাতে ইন্দ্র আসিলেও আমি তাঁহাকে পরাজয় করিতে পারি, কিন্তু অর্জুনকে পরাজয় করিতে কিছুতেই পারিব না। তুমিই নাহয় অনেক লোক লইয়া, একবার তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া দেখ-না। আমি তোমার গায়ে এক আশ্চর্য কবচ বাঁধিয়া দিতেছি; ইহাকে কোনো অস্ত্রই ভেদ করিতে পারিবে না।"

এই বলিয়া দ্রোণাচার্য, জল ছুঁইয়া মন্ত্র পড়িতে পড়িতে, দুর্যোধনের গায়ে সেই অদ্ভুত উজ্জ্বল কবচ বাঁধিয়া দিলে, দুর্যোধন মহোৎসাহে অর্জুনকে মারিতে চলিলেন।

এই সময় ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি পাণ্ডবপক্ষের যোদ্ধারা, অনেক সৈন্য লইয়া, দ্রোণকে ভয়ংকর তেজের সহিত আক্রমণ করাতে তাঁহার সৈন্যসকল তিন দলে ভাগ হইয়া গেল। দ্রোণ অনেক চেষ্টা করিয়াও আর তাহাদিগকে একত্র করিতে পারিলেন না। তখন কি ঘোর যুদ্ধই হইয়াছিল! অশ্বত্থামা, কর্ণ, সৌমদত্তি প্রভৃতি কয়েকজন বড়-বড় বীরের হাতে, সকল সৈন্যের পশ্চাতে জয়দ্রথকে রাখিয়া, আর প্রায় সকলেই যুদ্ধে লাগিয়া গিয়াছিলেন। কত যে লোক মরিয়াছিল তাহার গণনা নাই। দ্রোণাচার্যের সহিত ধৃষ্টদ্যুম্ন এই সময়ে খুব যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু সাত্যকি আসিয়া সাহায্য না করিলে, বুড়ার হাতে তাঁহার বড়ই দুর্দশা হইত। সাত্যকি দেখিলেন যে, দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্নের খড়্গ, চর্ম, ধ্বজ, ছত্র, ঘোড়া সারথি সমুদায় শেষ করিয়া এক সাংঘাতিক বাণ চড়াইয়া বসিয়াছেন। সেই বাণ ছুঁড়িবামাত্র সাত্যকি চৌদ্দ বাণে তাহা কাটিয়া ফেলাতেই ধৃষ্টদ্যুম্ন সে যাত্রা বাঁচিয়া গেলেন!

ইহার পর হইতে সাত্যকির সহিত দ্রোণের ভয়ানক যুদ্ধ চলিল। কিন্তু জয়-পরাজয় কাহারো হইল না। শেষে যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেব, বিরাট প্রভৃতি আসিয়া সাত্যকির সহিত যোগ দিলে, বহুতর কৌরব যোদ্ধাও আসিয়া দ্রোণের সহায় হইলেন।

এদিকে বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিল ; অর্জুন এতক্ষণ কি করিতেছেন? এখনো জয়দ্রথকে পাইতে তাঁহার অনেক বিলম্ব আছে ; কিন্তু তাঁহার চেষ্টার ত্রুটি নাই। তিনি ক্রমাগত বাণাঘাতে কৌরব-সৈন্য কাটিয়া পথ করিয়া দিতেছেন, আর সেই পথে কৃষ্ণ রথ চালাইতেছেন। অর্জুনের বাণ তাঁহার ধনুক হইতে ছুটিয়া শত্রুর বুকে পড়িতে যে সময় লাগে, তাহার মধ্যে রথ যাইতেছে এক ক্রোশ! সুতরাং ঘোড়াগুলির যে খুবই পরিশ্রম হইবে, তাহা আশ্চর্য কি? কৃষ্ণ দেখিলেন যে, এগুলিকে একটু বিশ্রাম না করাইলে আর কিছুতেই চলিতেছে না।

অর্জুনের কি আশ্চর্য ক্ষমতাই ছিল। তিনি ঘোড়ার বিশ্রামের জন্য, রথ হইতে নামিয়া সেই মাঠের মধ্যেই বাণের দ্বারা একটা ঘর গাঁথিয়া ফেলিলেন। সেখানে জল ছিল না, তাই একটি সুন্দর সরোবরও করিলেন। সে সরোবরে সুমধুর, সুবিমল জল তো ছিলই, তাহার উপর আবার তাহাতে হাঁসও চরিতে-ছিল, পদ্মফুলও ফুটিয়াছিল।

শত্রুরা অবশ্য অর্জুনের রথ থামিল এবং অর্জুনকে নামিতে দেখিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে ছাড়ে নাই। কিন্তু অর্জুনের বাণের কাছে তাহারা কি আর করিবে? কৃষ্ণ সেই বাণের ঘরের ভিতরে ঘোড়াগুলির সাজ খুলিয়া, আহাদিগকে দলিয়া মলিয়া, জল খাওয়াইয়া, আবার তাজা করিয়া লইলেন। ইহার পর হইতে রথ আবার বায়ুবেগে ছুটিয়া চলিল। জয়দ্রথ যাইবেন কোথায়? ঐ তাঁহাকে দেখা যাইতেছে।

এমন সময় দুর্যোধন জয়দ্রথকে বাঁচাইবার জন্য অর্জুনকে আক্রমণ করিলেন। এবারে তাঁহার আর সাহসের সীমা নাই ; তাঁহার গায়ে দ্রোণের বাঁধা সেই কবচ রহিয়াছে। বাস্তবিকই সে কবচের এমনি আশ্চর্য গুণ যে, অর্জুনের বাছা বাছা বাণগুলি ইহা হইতে ঠিকরাইয়া পড়িতে লাগিল। ইহাতে কৃষ্ণ আর অর্জুন প্রথমে খুবই আশ্চর্য হইয়া গেলেন। যাহা হউক, ব্যাপারখানা যে কি, তাহা বুঝিতে অর্জুনের বিলম্ব হইল না। তখন তিনি বলিলেন, "ঐ কবচসুদ্ধই উহাকে হারাইব।"

কিন্তু কি মুস্কিল! অর্জুন মন্ত্র পড়িয়া সাংঘাতিক অস্ত্র সকল নিক্ষেপ করেন, আর অশ্বত্থামা অন্য দিক হইতে বাণ মারিয়া, তাহা মধ্য পথেই কাটিয়া ফেলেন ; দুর্যোধনও সেই অবসরে অর্জুন এবং কৃষ্ণকে ক্ষত-বিক্ষত করেন। যাহা হউক, ইহার ঔষধ শীঘ্রই পড়িল। দুর্যোধনের সমস্ত শরীর কবচে ঢাকা, কিন্তু হাত দুখানি খালি। সেই দুখানি হাতেই অর্জুন বাণ মারিতে লাগিলেন। আর দুর্যোধন যাইবেন কোথায়? হাতে বাণ লাগাতে তাঁহার যুদ্ধ করাই অসম্ভব হইয়া উঠিল। সকলে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে রক্ষা না করিলে, তখনি

মহারাজের প্রাণটিও যাইত।

তারপর জয়দ্রথকে ধরিবার জন্য অর্জুন অতি ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিলে কৌরবদের প্রাণ কাঁপিতে লাগিল। অর্জুনের গাণ্ডীবের টঙ্কার ও কৃষ্ণের পাঞ্চজন্য শঙ্খের ভীষণ শব্দে কত লোক যে অজ্ঞান হইয়া গেল, তাহার সংখ্যা নাই। তখন ভূরিশ্রবা, শাল্ব, কর্ণ, বৃষসেন, জয়দ্রথ, কৃপ, শল্য, অশ্বত্থামা, এই আটজনে মিলিয়া, অর্জুনকে শরজালে আচ্ছন্ন করিলেন। তাঁহাদের সকল বাণ কাটিয়া সমুচিত প্রতিফল দিতে অর্জুনের কোনো ক্লেশ হইল না।

এদিকে দ্রোণের সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের বিষম যুদ্ধ চলিতেছিল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত কাহারো জয়-পরাজয় বুঝা গেল না। বাণ, শক্তি, গদা, দুজনে কতই ছুঁড়িলেন ; দুজনেরই সমান তেজ। কিন্তু ইহার পরেই দ্রোণ যুধিষ্ঠিরের ঘোড়া আর ধনুক কাটিয়া, তিনটি ভয়ংকর বাণ মারিলে তাঁহার এমনি বিপদ হইল যে, তখন রথ ছাড়িয়া অস্ত্র ফেলিয়া হাত তুলিয়া দাঁড়ানো ভিন্ন আর উপায় নাই। দ্রোণ দেখিলেন এই তাঁহার সুযোগ। অমনি তিনি, সিংহের ন্যায় যুধিষ্ঠিরকে ধরিতে ছুটিলেন। 'হায় হায়! মহারাজ ধরা পড়িলেন!' বলিয়া চারিদিকে চিৎকার উঠিল। ভাগ্যে সহদেবের রথ কাছে পাইয়া, যুধিষ্ঠির তাহাতে উঠিতে পারিলেন, আর সহদেবের ঘোড়াগুলি দ্রোণের ঘোড়ার চেয়ে অনেক ভালো ছিল, নহিলে সেদিন সর্বনাশই হইত।

এদিকে রাক্ষস অলম্বুষ, খানিক পাণ্ডবদিগকে খুবই জ্বালাতন করিয়া, ভীমের তাড়ায় পলায়ন করে। তারপর সে অন্যত্র গিয়া আবার দৌরাত্ম্য আরম্ভ করাতে, ঘটোৎকচের হাতে আছাড় খাইয়া চূর্ণ হয়। তারপর অনেকক্ষণ দ্রোণের সহিত পাণ্ডবদিগের তুমুল সংগ্রাম চলে।

এমন সময় দূর হইতে কৃষ্ণের পাঞ্চজন্য শঙ্খের শব্দ শুনা যাইতে লাগিল। গাণ্ডীবের শব্দ এত দূর পোঁছায় নাই, কাজেই তাহা কেহ শুনিতে পাইল না। এদিকে কৌরবেরাও সিংহনাদ করিতেছে। কাজেই যুধিষ্ঠির ভাবিলেন, বুঝি অর্জুনের কোনো বিপদ ঘটিল। তাই তিনি সাত্যকিকে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি শীঘ্র অর্জুনের কাছে যাও।"

সাত্যকি বলিলেন, "অর্জুন আমাকে আজ আপনার পাশ ছাড়িতে নিষেধ করিয়াছেন, আমি কি করিয়া যাই? আপনি অর্জুনের জন্য চিন্তা করিবেন না। আপনাকে রক্ষা করাই আমাদের প্রথম কাজ।"

কিন্তু যুধিষ্ঠিরকে অর্জুনের জন্য বড়ই ব্যস্ত দেখিয়া শেষে সাত্যকিকে যাইতে হইল। যুধিষ্ঠির ভীমকেও তাঁহার সঙ্গে পাঠাইতেছিলেন ; কিন্তু সাত্যকি তাঁহাকে বলিলেন, "আমার মতে যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করাই তোমার কর্তব্য।" কাজেই ভীম রহিয়া গেলেন।

সাত্যকি কৌরবদিগের সহিত ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়া অগ্রসর হইতেছেন, এমন সময় দ্রোণ আসিয়া তাঁহাকে আটকাইলেন। দ্রোণ বলিলেন, "অর্জুন আজ আমার সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে কাপুরুষের মতো পাশ কাটিয়া পলায়ন করিল। তুমি যুদ্ধ না করিলে আজ তোমাকে বধ করিব।" বুদ্ধিমান সাত্যকি অমনি

বলিলেন, "গুরু যাহা করেন, শিষ্যও তাহাই করে। আমি অর্জুনের কাছে চলিলাম।"

সেদিন সাত্যকির বিক্রম কৌরবেরা ভালো করিয়াই জানিতে পারিল। দ্রোণের নিকট হইতে ভোজের নিকট ; ভোজের সারথিকে কাটিয়া, কৃতবর্মাকে ঠেঙ্গাইয়া, জলসন্ধ ও মহামাত্রকে মারিয়া আবার দক্ষিণের দিকে, এইভাবে সাত্যকি চলিয়াছেন। এমন সময় আবার দ্রোণ আসিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত। সঙ্গে সঙ্গে দুর্মর্ষণ, দুঃসহ, বিকর্ণ, দুর্মুখ, দুঃশাসন, চিত্রসেন, দুর্যোধন প্রভৃতিও আসিয়া একসঙ্গে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাকে পরাজয় করে কাহার সাধ্য? দুর্যোধন পলায়ন করিলেন, কৃতবর্মা অজ্ঞান হইলেন। তারপর যুদ্ধ চলিল, কেবল দ্রোণ আর সাত্যকিতে। ভয়ংকর যুদ্ধের পর দ্রোণকে হার মানিতে হইল। তারপর সুদর্শন মরিল, কাম্বোজ, শক ও যবন—সৈন্যগণ পরাস্ত হইল, দুর্যোধন আবার আসিয়া যথেষ্ট সাজা পাইলেন। বিকটাকার পার্বতীয় সৈন্যগণ, বিশাল পাথর হাতে যুদ্ধ করিতে আসিয়া, তাহারাও সাত্যকির বাণে খণ্ড খণ্ড হইল। তখন কৌরবেরা কে কোথায় পলায়ন করিবেন তাহাই ভাবিয়া অস্থির।

এমন সময় দ্রোণ দুঃশাসনকে সম্মুখে পাইয়া বলিলেন, "কি দুঃশাসন! এখন তোমার বীরত্ব কোথায় গেল? সকলে সাত্যকির ভয়ে পলাইতেছে, অর্জুনের হাতে পড়িলে কি করিবে! এই মুখেই কি পাণ্ডবদিগের সহিত বিবাদ করিতে গিয়াছিলে?"

এই বলিয়া দ্রোণ পাণ্ডবদিগের সহিত আবার যুদ্ধ আরম্ভ করিলে বীরকেতু, সুধন্বা, চিত্রকেতু, চিত্রবর্মা ও চিত্ররথ নামক পাঞ্চাল রাজের পুত্রগণ দেখিতে দেখিতে তাঁহার হাতে প্রাণত্যাগ করিলেন। তাহাতে ধৃষ্টদ্যুম্ন মনের দুঃখে রাগের ভরে দ্রোণকে আক্রমণ করাতে, কিছুকাল দুজনে যুদ্ধ চলিল। কিন্তু ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণের সম্মুখে টিকিতে পারিলেন না।

এদিকে সাত্যকি ক্রমে দুঃশাসন, ত্রিগর্ত প্রভৃতিকে পরাজয় করিয়া অর্জুনের দিকে চলিয়াছেন, আর দ্রোণ পাণ্ডবপক্ষের যোদ্ধার পর যোদ্ধাকে মারিয়া প্রলয় কাণ্ড উপস্থিত করিয়াছেন। বৃহৎক্ষেত্র, ধৃষ্টকেতু, চেদিরাজের পুত্র, জরাসন্ধের পুত্র, ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্র ক্ষত্রবর্মা প্রভৃতি কত লোকের দ্রোণের হাতে প্রাণ গেল! সেই পঁচাশি বৎসরের বুড়া রণস্থলে এমনি ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন, যেন, তিনি ষোল বৎসরের বালক।

মহারাজ যুধিষ্ঠির এই সময়ে চারিদিকে চাহিয়া দেখিতেছিলেন। তখন তাঁহার মনে এই চিন্তা হইল যে, 'আমি অর্জুনের সন্ধানে সাত্যকিকে পাঠাইলাম, কিন্তু সাত্যকির সাহায্যের জন্য তো কাহাকেও পাঠাই নাই।'

অমনি তিনি ভীমকে সেই কার্যে পাঠাইয়া দিলেন। ভীম খানিক দূর অগ্রসর হইতে না হইতে দ্রোণ তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, "অর্জুনকে ছাড়িয়াছি, কিন্তু তোমাকে ছাড়িব না।" ভীম বলিলেন, "ঠাকুর! অর্জুনকে আপনি দয়া করিয়া ছাড়িয়াছেন বলিয়া তো আমার মনে হয় না। সে হয়তো

ভদ্রতা করিয়া আপনার মান রাখিয়া গিয়াছে। কিন্তু আমি তো ভালোমানুষ অর্জুন নহি, আমি ভীম! যুদ্ধ করিতে আসিলে গুরু বলিয়া মানিব না।" বলিতে বলিতেই ভীম এক বিশাল গদা ঘুরাইয়া দ্রোণকে ছুঁড়িয়া মারিয়াছেন। বুড়া তখন 'বাপ!' বলিয়া রথ হইতে এক লাফ! ততক্ষণে ভীম তাঁহার রথ. ঘোড়া সারথি প্রভৃতি একেবারে পুঁতিয়া ফেলিয়াছেন।

ইহাতে দুর্যোধনের ভ্রাতাগণ ভীমকে আক্রমণ করিলে, তিনি তাহাদের সাতজনকে বধ করিলেন। যাহাদিগকে তিনি সম্মুখে পাইলেন, তাহাদের অল্প লোকই বাঁচিয়া রহিল। এমন সময় তিনি দেখিলেন যে, দ্রোণাচার্য পাণ্ডব-পক্ষের যোদ্ধাদিগকে নিতান্ত অস্থির করিয়া তুলিয়াছেন। অমনি আর কথা-বার্তা নাই ; ভীম চক্ষু বুজিয়া দ্রোণের সেই বাণবৃষ্টির ভিতরেই তাঁহার রথের দিকে ছুটিয়া চলিলেন। তারপর সেই রথখানিসুদ্ধ—হেঁইয়োঃ হোঃ!—মার্ বুড়াকে ছুঁড়িয়া! কিন্তু বুড়ার হাড় কি অসম্ভব মজবুত! রথ গুঁড়া হইল, কিন্তু বুড়া মরিলেন না।

তারপর আর খানিক দূরে গিয়াই ভীম সাত্যকিকে দেখিতে পাইলেন। আরো খানিক দূরে গিয়া দেখিলেন, ঐ অর্জুন যুদ্ধ করিতেছেন! ওঃ! তখন যে ভীমের সিংহনাদ! সেই সিংহনাদ শুনিয়া কৃষ্ণ আর অর্জুনও সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। এই-সকল সিংহনাদ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের কানে পেঁাছাইলে তাঁহার যে খুবই আনন্দ হইল, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

এ-সকল সিংহনাদ কর্ণের সহ্য না হওয়ায়, তিনি আসিয়া ভীমের সহিত মহা যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিলেন। কিন্তু খানিক পরেই ভীমের বাণে তাঁহার ধনুক, ঘোড়া আর সারথি কাটা যাওয়াতে তাঁহাকে গিয়া বৃষসেনের রথে আশ্রয় লইতে হইল।

কিন্তু কর্ণ ছাড়িবার লোক নহেন। তিনি আবার আসিয়া ভীমকে বলিলেন, "কি হে পাণ্ডুপুত্র। তুমিও আবার যুদ্ধ করিতে জান নাকি! বড় যে পলাইতেছ?"

সুতরাং আবার তাঁহাদের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এবারেও কর্ণ অনেকক্ষণ যুদ্ধ করিয়া শেষে দেখিলেন যে, আবার তাঁহার ধনুক ঘোড়া সারথি সব কাটা গিয়াছে! তারপর ভীমের অস্ত্র বুকে বিঁধিয়া তাঁহার প্রাণ যায়-যায়! সুতরাং তিনি তাড়াতাড়ি অন্য রথে উঠিয়া পলায়ন করিলেন।

তথাপি কর্ণের লজ্জা নাই, তিনি আবার আসিয়া ভীমকে আক্রমণ করিলেন। এবারে ধনুক সারথি আর ঘোড়া কাটা গিয়া তাঁহার দুরবস্থার একশেষ হইতেছে দেখিয়া, দুর্যোধন তাড়াতাড়ি দুর্জয়কে সাহায্য করিতে পাঠাইলেন। কিন্তু সে বেচারা ভালো করিয়া সাহায্য করিবার পূর্বেই মরিয়া গেল।

যাহা হউক, এবারে কর্ণকে আর পলাইতে হইল না ; তাঁহার জন্য অস্ত্র-শস্ত্র সমেত এক নূতন রথ আসিয়া উপস্থিত হইল। দুঃখের বিষয় এই যে ভীম সে রথেরও ঘোড়া আর সারথি সংহার করাতে, তাহাতে চড়িয়া কর্ণের যুদ্ধ করা হইল খুব কমই। এমন সময় দুর্মুখ কর্ণের সাহায্য করিতে

আসিলেন। সাহায্য যাহা করিলেন তাহা একটু নূতনরকমের বটে, আর তিনি ইচ্ছা করিয়া যে সেরূপ করিয়াছিলেন, তাহাও অবশ্য কখনোই নহে, কিন্তু তাহাতেই কর্ণের প্রাণ রক্ষা হইল। দুর্মুখ আসিয়াই তো অমনি ভীমের হাতে প্রাণত্যাগপূর্বক, নিজের রথখানি খালি করিয়া দিলেন। সে রথের ঘোড়াগুলি ছিল বড়ই চমৎকার! সুতরাং কিঞ্চিৎ পরেই যখন ভীমের হাতে কর্ণেরও দুর্দশার একশেষ হইল, তখন ঐ ঘোড়াগুলির সাহায্যে তিনি সহজেই রণস্থল হইতে পলায়ন করিলেন।

তারপর ভীম দুর্যোধনের আর পাঁচটি ভাইকে বধ করিলে, কর্ণ আবার যুদ্ধ করিতে আসেন আর দেখিতে দেখিতে তাঁহার হাতে জব্দও হন। তাহা দেখিয়া দুর্যোধন তাঁহার সাতটি ভাইকে পাঠাইবামাত্র, তাহারাও ভীমের হাতে মারা যায়। তারপর আবার কর্ণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

এবারেও ভীমের হাতে কর্ণের দুর্দশা দেখিয়া দুর্যোধন তাঁহার আর সাতটি ভাইকে বলিলেন, "তোমরা শীঘ্র গিয়া উহাকে বাঁচাও!" হায়! কে কাহাকে বাঁচায়? সাতভাই ভালো করিয়া যুদ্ধ করিতে না করিতেই মরিয়া গেল। তারপর কর্ণের মাথায় কি যে গোল লাগিল তিনি পাণ্ডবদিগকে ছাড়িয়া কৌরবদিগকেই মারিতে আরম্ভ করিলেন।

কিন্তু ইহার পর হইতেই যেন কর্ণের তেজ আবার ফিরিয়া আসিল। তখন দেখা গেল যে, অনেকক্ষণ দুজনে সমানভাবে যুদ্ধ চলার পর, কর্ণ ক্রমেই ভীমকে কাবু করিয়া আনিতেছেন। ক্রমে ভীমের তূণ, ধনুর গুণ, ঘোড়ার রাশ, সবই কাটা গেল। সারথিটি বাণ খাইয়া অন্য রথে আশ্রয় লইল। ধ্বজ, পতাকা, কিছুই আস্ত রহিল না। একটা শক্তি ছুঁড়িয়া মারিলেন, তাহাও কাটা গেল। শেষে রহিল খড়্গ ও চর্ম। চর্মখানি কর্ণ কাটিয়া ফেলিলেন। খড়্গটি ভীম ছুঁড়িয়া মারিলে, তাহাতে কর্ণের ধনুক কাটিয়া গেল। কর্ণ তখনি আর এক ধনুক লইয়া, ভীমের উপরে বাণবৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

তখন ভীম কর্ণকে মারিবার জন্য লাফাইয়া তাঁহার উপর পড়িতে গেলেন। কিন্তু কর্ণ হঠাৎ গুঁড়ি মারিয়া রথের তলার সঙ্গে মিশিয়া পড়ায়, তাঁহাকে ধরিতে পারিলেন না। তারপর ভীমের হাত খালি দেখিয়া, কর্ণ তাঁহাকে তাড়া করাতে, তিনি এমনি বিপদে পড়িলেন যে, বিপদ যাহাকে বলে! কতকগুলি মরা হাতি সেখানে পড়িয়াছিল ; ভীম আর উপায় না দেখিয়া তাহারই পিছনে গিয়া লুকাইলেন। কিন্তু হাতি খণ্ড খণ্ড করিতে কর্ণের মতো বীরের আর কতক্ষণ লাগে? তাহাতে ভীম রথের চাকা হাতির মাথা প্রভৃতি কর্ণকে ছুঁড়িয়া মারিতে লাগিলেন। কিন্তু কর্ণের বাণের কাছে তাহাতেই বা কি ফল হইবে?

তখন ভীম বজ্রমুষ্টি উঠাইয়া এক কীলে কর্ণকে বধ করিতে যাইতেছিলেন। কিন্তু এই মনে করিয়া ক্ষান্ত হইলেন, 'আমি কর্ণকে মারিলে অর্জুনের প্রতিজ্ঞা মিথ্যা হইবে।' কর্ণও ইচ্ছা করিলে তখন ভীমকে মারিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহারও মনে হইল যে, কুন্তীর নিকটে তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে ইহাদিগকে মারিবেন না। তাই তিনি ভীমকে ধনুক দিয়া একটা খোঁচা মাত্র

মারিলেন। ভীমও তৎক্ষণাৎ সেই ধনুক কাড়িয়া লইয়া, সাঁই শব্দে এক ঘা লাগাইতে ছাড়িলেন না।

তখন কর্ণ রাগে চোখ লাল করিয়া বলিলেন, "মূর্খ! পেটুক! কাপুরুষ! তুই কেন আবার যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিস? তুই তো যুদ্ধের 'য'ও জানিস না! যা! পেট ভরিয়া খা গিয়া। আমার মতো লোকের সঙ্গে যুদ্ধ করা তোর কাজ নহে।"

তাহাতে ভীম বলিলেন, "ছোট লোক! এতবার আমার সঙ্গে হারিয়াছিস তবুও আবার বড়াই করিস! হারজিত তো ইন্দ্রেরও হয়। আয় না একবার মল্ল যুদ্ধ করি ; দেখি, তোকে কীচক বধ করিতে পারি কিনা।"

ভীমের সহিত মল্লযুদ্ধ করিতে কর্ণের সাহস হইল না। কিন্তু তিনি এই ঘটনা লইয়া অর্জুনের সামনেই খুব বড়াই করিতে লাগিলেন। যাহা হউক, অর্জুনের কয়েকটি বাণ আসিয়া গায়ে পড়িলে আর তাঁহার বড়াই রহিল না। তখন তাঁহার হঠাৎ মনে হইল যে, বড়াই করার চেয়ে পলায়ন করাতে বেশি কাজ দেয়।

এই সময়ে সাত্যকি অসাধারণ বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়া অর্জুনের মনে সুখ হইল না। তিনি সাত্যকিকে যুধিষ্ঠিরের কাছে রাখিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি চলিয়া আসাতে না জানি মহারাজের কি বিপদই হইয়াছে। বিশেষত এতক্ষণ যুদ্ধ করিয়া সাত্যকির অস্ত্র প্রায় শেষ হইয়া যাওয়ায়, এখন তাঁহারও খুবই বিপদ। এদিকে ভূরিশ্রবা রাশি রাশি অস্ত্র সমেত সুন্দর রথে চড়িয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিতেছেন, তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবার সম্বল সাত্যকির মোটেই নাই। কাজেই অর্জুনের রাগ হইবার কথা। এখন সাত্যকিকেই বা তিনি কি করিয়া ফেলিয়া যান, আর, যে সামান্য বেলাটুকু অবশিষ্ট আছে, ইহার মধ্যে জয়দ্রথকে মারিতে হইবে, তাহারই-বা কি করেন?

সাত্যকি একে অতিশয় ক্লান্ত, তাহাতে আবার অস্ত্রহীন, কাজেই ভূরিশ্রবা তাঁহাকে যেন নিতান্তই বাগে পাইলেন। তথাপি সাত্যকির যতক্ষণ কিছুমাত্র অস্ত্র অবশিষ্ট ছিল, ততক্ষণ তিনি কম যুদ্ধ করেন নাই। ভূরিশ্রবা যেমন তাঁহার ধনুক আর ঘোড়া কাটিলেন, তিনিও তেমন ভূরিশ্রবার ধনুক আর ঘোড়া কাটিতে ছাড়িলেন না। তারপর রথ ছাড়িয়া দুজনের খড়্গযুদ্ধ আরম্ভ হইল। কিন্তু ক্লান্ত শরীরে আর কত করা যায়? সাত্যকি খানিক খড়্গযুদ্ধ করিয়াই কাবু হইয়া পড়িলেন।

এমন সময় কৃষ্ণ অর্জুনকে বলিলেন, "ঐ দেখ! সাত্যকিকে দুর্বল পাইয়া ভূরিশ্রবা তাহাকে বধ করিতেছে? ইহা অতি অন্যায়। সাত্যকি তোমার শিষ্য, আর তোমার জন্যই আসিয়া বিপদে পড়িল। উহাকে রক্ষা করা তোমার কর্তব্য।"

এদিকে ভূরিশ্রবা সাত্যকিকে খড়্গাঘাতে ফেলিয়া দিয়া, তাঁহার চুলে ধরিয়া, বুকে লাথি মারিয়া তাঁহার মাথা কাটিতে উদ্যত ; সাত্যকি প্রাণপণে মাথা নাড়িয়া তাহার আঘাত এড়াইবার চেষ্টা করিতেছেন। এমন সময় অর্জুনের

বাণ উল্কার মতো আসিয়া ভূরিশ্রবার ডানহাত কাটিয়া ফেলিল।

তখন ভূরিশ্রবা অর্জুনকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "অর্জুন, আমি অন্যের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলাম, তুমি কেন আমার হাত কাটিলে?"

অর্জুন বলিলেন, "আমার শিষ্য আত্মীয় ও বন্ধুকে আমার সম্মুখে বধ করিতে দেখিয়াও নীরব থাকিলে মহাপাপ হইত, তাই কাটিলাম।"

তখন ভূরিশ্রবা অনাহারে প্রাণত্যাগের জন্য নিজ হাতে শরশয্যা প্রস্তুত করিয়া ইষ্ট দেবতার ধ্যানে বসিলে কৌরবেরা চারিদিক হইতে অর্জুনের নিন্দা আরম্ভ করিল।

তাহাতে অর্জুন আবার ভূরিশ্রবাকে বলিলেন, "হে ভূরিশ্রবা! আমার পক্ষের লোককে মৃত্যু হইতে রক্ষা করা আমার কর্তব্য কাজ, তাহাই আমি করিয়াছি! কিন্তু বল দেখি, তোমরা যে বালক অভিমন্যুকে মারিয়াছিলে, তাহা তোমাদের কিরূপ কাজ হইয়াছিল?"

ভূরিশ্রবা নতশিরে অর্জুনের কথা মানিয়া লইলেন, আর বাঁ হাতে নিজের কাটা ডান হাতখানি অর্জুনের সামনে ধরিয়া এ কথাও জানাইলেন যে, ও হাত কাটিয়া ফেলা উচিতই হইয়াছে।

এমন সময় সাত্যকি অসহ্য রাগের ভরে খড়্গ লইয়া ভূরিশ্রবার দিকে ছুটিয়া চলিলেন। সকলে চিৎকার করিয়া উঠিল, "আহা! আহা! কর কি?" কিন্তু সাত্যকি কাহারো নিষেধ না শুনিয়া ভূরিশ্রবার মাথা কাটিয়া ফেলিলেন।

আর বিলম্ব করা চলে না ; জয়দ্রথ বধের সময় যায়। তাই অর্জুন শীঘ্র সে কাজ শেষ করিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। দুর্যোধন, কর্ণ, শল্য, কৃপ, অশ্বত্থামা আর দুঃশাসন ইঁহারাও তখন জয়দ্রথকে পশ্চাতে রাখিয়া মহাতেজে তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন।

অর্জুন তাঁহাদের প্রত্যেকের বাণ দুই তিন খণ্ড করিয়া কাটিতেছেন, তাঁহারাও বারবার অর্জুনকে বাণে আচ্ছন্ন করিতেছেন। জয়দ্রথও তখন চুপ করিয়া নাই। কিন্তু অর্জুনকে বারণ করে কাহার সাধ্য? তিনি ক্রমে সকলকে হারাইয়া চৌষট্টি বাণে জয়দ্রথকে অস্থির করিলেন।

কিন্তু তখনো ছয় মহাবীরের মাঝখানে জয়দ্রথ লুকাইয়া রহিলেন। ইঁহা-দিগকে পরাজয় না করিয়া তাঁহাকে মারা অসম্ভব। এদিকে সূর্য অস্ত যাইতে আর অল্পই বাকি। তখন কৃষ্ণ অর্জুনকে বলিলেন, "আমি মায়াবলে সূর্যকে ঢাকিতেছি, তাহা হইলে জয়দ্রথ ভাবিবে, সূর্য অস্ত গেল, এখন তোমাকে মরিতে হইবে। সুতরাং তখন আর সে লুকাইবার চেষ্টা করিবে না। সেই অবসরে কিন্তু তাহাকে বধ করা চাই!"

এই বলিয়া কৃষ্ণ মায়াবলে সূর্যকে ঢাকিয়া ফেলিলে, অর্জুনের মৃত্যুকাল উপস্থিত মনে করিয়া কৌরবদিগের আনন্দের সীমা রহিল না। তখন জয়দ্রথ গলা উঁচু করিয়া দেখিতে লাগিলেন, সূর্য যথার্থই অস্ত গিয়াছে কিনা।

অমনি কৃষ্ণ বলিলেন, "অর্জুন, এই বেলা! ঐ দেখ জয়দ্রথ নিশ্চিন্তে গলা উঁচু করিয়া সূর্য দেখিতেছে। এই বেলা উহার মাথা কাটিয়া ফেল।"

কিন্তু জয়দ্রথের মাথা কাটা সহজ কাজ নহে। উহার জন্মকালে দেবতারা বলিয়াছিলেন, "যুদ্ধক্ষেত্রে কোনো মহাবীর ইহার মাথা কাটিবেন।" তখন উঁহার পিতা বৃদ্ধক্ষত্র বলেন, "যে ব্যক্তি আমার পুত্রের মাথা ভূমিতে ফেলিবে, তাহার মাথাও তখনই শতখণ্ড হইবে।" এই বলিয়া বৃদ্ধক্ষত্র বনে গিয়া তপস্যা আরম্ভ করেন। এখনো তিনি সমন্তপঞ্চক নামক তীর্থে তপস্যা করিতেছেন।

এ-সকল কথা মনে করিয়া কৃষ্ণ বলিলেন, "সাবধান অর্জুন! ইহার মাথাটা তোমার হাতে মাটিতে পড়িলে কিন্তু সর্বনাশ। মাথাটাকে সেই সমন্তপঞ্চক তীর্থে বুড়া বৃদ্ধক্ষত্রের কোলে নিয়া ফেলিতে হইবে।"

তখন অর্জুন এক বাণেই জয়দ্রথের মাথা কাটিয়া, তাহা মাটিতে পড়িবার পূর্বেই তিনি আর কয়েক বাণে সেটাকে উড়াইয়া সেই সমন্তপঞ্চক তীর্থে, জয়দ্রথের পিতার কোলে নিয়া ফেলিলেন। সেখান হইতে উহা মাটিতে পড়িবা-মাত্র বৃদ্ধক্ষত্রের মাথা কাটিয়া শতখণ্ড হইয়া গেল।

তারপর কৃষ্ণ অন্ধকার দূর করিয়া দিলে দেখা গেল যে, তখনো সূর্য একেবারে ডুবিয়া যায় নাই।

জয়দ্রথের মৃত্যুতে কৃপ আর অশ্বত্থামা রাগিয়া অর্জুনকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু অর্জুনের বাণ তাঁহারা সহ্য করিতে পারিলেন না।

সেদিন সন্ধ্যার পরেও আর কেহ শিবিরে যায় নাই। সমস্ত রাত্রি মশাল জ্বালিয়া যুদ্ধ চলিয়াছিল। সে রাত্রিতে দ্রোণ, সাত্যকি, অশ্বত্থামা, ভীম, ঘটোৎকচ প্রভৃতি অতি অদ্ভুত বীরত্ব দেখান, আর অর্জুনের হাতে অসংখ্য লোক মরে। সে সময়ে তাঁহার বড় ইচ্ছা ছিল যে, কর্ণের সহিত যুদ্ধ করেন ; কিন্তু কৃষ্ণের কৌশলে তাহা হয় নাই।

কর্ণ ঘোরতর যুদ্ধের পর সাত্যকির হাতে পরাজিত হইলেন। তারপর অশ্বত্থামা, কৃতবর্মা প্রভৃতি অনেকেই সাত্যকিকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে পরাজয় করিতে কাহারো শক্তি হইল না।

এদিকে দুর্যোধন যুদ্ধে কিছু করিতে না পারিয়া শেষে দ্রোণকে গালি দিতে আরম্ভ করায় দ্রোণ নিতান্ত দুঃখের সহিত বলিলেন, "দুর্যোধন! কেন বৃথা আমাকে কষ্ট দিতেছ? আমি তো সর্বদাই বলিতেছি যে, অর্জুনকে জয় করা অসম্ভব। পাপ তো কম কর নাই। এখন সে পাপের ফল ভোগ কর।" এই বলিয়া তিনি বাণে বাণে পাণ্ডবদিগকে অস্থির করিয়া তুলিলেন।

দুর্যোধনও তখন কম তেজ দেখান নাই! হাজার হাজার লোক তাঁহার হাতে প্রাণত্যাগ করে। তারপর যুধিষ্ঠির আসিয়া ধনুক কাটিয়া দশ বাণেই তাঁহাকে কাতর করিয়া দেন। যুধিষ্ঠির আবার বাণ মারিলে আর দুর্যোধন যুদ্ধ করিতে পারেন নাই।

দ্রোণ আর ভীমের কথা কি বলিব? দ্রোণ ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া কেকয়গণ, ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্রগণ ও শিবিকে বিনাশ করিলেন। আর ভীম কীল মারিয়া কলিঙ্গরাজের পুত্র ধ্রুব, আর লাথির চোটে দুর্মদ এবং দুষ্কর্ণকে সংহার করিলেন।

ঘটোৎকচ আর অশ্বত্থামার সে সময়ে যে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা বড়ই অদ্ভুত। রাত্রিতে রাক্ষসদের বল বাড়ে, আর রাক্ষসেরা নানারকম মায়াও জানে, তাহার উপর আবার ঘটোৎকচ অসাধারণ বীর। সুতরাং অশ্বত্থামা যে নিতান্ত সংকটে পড়িয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু এমন সংকটেও তিনি কিছুমাত্র কাতর হন নাই। ঘটোৎকচের সকল মায়া তিনি তিনবার চূর্ণ করিয়া দিলেন।

ঐ সময়ে ঘটোৎকচের পুত্র অঞ্জনপর্বা অশ্বত্থামাকে আক্রমণ করিয়া অল্পক্ষণের মধ্যেই মারা গেলে, ঘটোৎকচ অশ্বত্থামার উপরে ঘোরতর বাণবৃষ্টি আরম্ভ করে। সে-সকল বাণ অশ্বত্থামা কাটিয়া ফেলিলে সে এমনি অদ্ভুত এক পাহাড় আনিয়া উপস্থিত করিল যে, কি বলিব! সে পাহাড়ের ঝর্না সকল হইতে ক্রমাগত শেল, শূল, মুষল, মুদ্গর প্রভৃতি অস্ত্র অশ্বত্থামার উপর পড়িতে লাগিল।

পাহাড় অশ্বত্থামার বাণে চূর্ণ হইলে, ঘটোৎকচ মেঘের রূপ ধরিয়া ক্রমাগত অশ্বত্থামার উপরে প্রস্তরবৃষ্টি আরম্ভ করিল। কিন্তু অশ্বত্থামার 'বায়ব্য' অস্ত্রে সে-সকল পাথরসুদ্ধ মেঘ কোথায় উড়িয়া গেল, তাহার ঠিক নাই।

তখনি আবার কোথা হইতে বিকটাকার রাক্ষসগণ অশ্বত্থামাকে গিলিতে আসিল। কিন্তু অশ্বত্থামা তাহাতেও কাতর হইলেন না। রাক্ষসেরা দেখিতে দেখিতে তাঁহার বাণে খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল।

ইহা দেখিয়া ঘটোৎকচ অশ্বত্থামাকে একটা বজ্র ছুঁড়িয়া মারে। অশ্বত্থামা সেই বজ্র লুফিয়া লইয়া উল্টিয়া ঘটোৎকচকেই আবার তাহা ছুঁড়িয়া মারিলে তাহাতে ঘটোৎকচের ঘোড়া, সারথি আর ধ্বজ কাটিয়া গেল। এই সময় ধৃষ্টদ্যুম্ন ঘটোৎকচকে সাহায্য করিতেছিলেন, তথাপি অশ্বত্থামার বাণে সে এতই কাতর হইয়া পড়িল যে, ধৃষ্টদ্যুম্ন তাহার মৃত্যু হইল ভাবিয়া তাড়াতাড়ি সেখান হইতে পলাইয়া গেলেন।

এদিকে সোমদত্ত ও বাহ্লীকের সহিত ভীম আর সাত্যকির যুদ্ধ চলিয়াছে। সোমদত্তকে ভীম পরিঘের আঘাতে অজ্ঞান করিয়া ফেলিলে তাঁহার পিতা বাহ্লীক ভীমকে আক্রমণ করেন। বাহ্লীকের শক্তির ঘায়ে ভীম অচেতন হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু মুহূর্ত পরেই আবার উঠিয়া তিনি এমন এক গদা ছুঁড়িয়া মারিলেন যে, তাহাতে বাহ্লীকের মাথা চূর্ণ হইয়া গেল।

তারপর ভীম নাগদত্ত, দৃঢ়রথ, বীরবাহু প্রভৃতি দুর্যোধনের নয়টি ভাইকে মারিয়া কর্ণের ভ্রাতা বৃকরথ শকুনির ভাই শতচন্দ্র ও ধৃতরাষ্ট্রের আর সাতটি শ্যালককে সংহার করিলেন।

আর-এক স্থানে যুধিষ্ঠিরকে অনেক লোক মারিতে দেখিয়া, দ্রোণ আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে পরাজয় করিতে পারিলেন না। যুধিষ্ঠির তাঁহার বায়ব্য, বারুণ, যাম্য, আগ্নেয়, ত্বাষ্ট্র, সাবিত্রী প্রভৃতি সকল অস্ত্র কাটিয়া শেষ করিলেন। দ্রোণের ঐন্দ্র ও প্রাজাপত্য-অস্ত্র যুধিষ্ঠিরের মাহেন্দ্র-অস্ত্রে কাটা গেল। তখন দ্রোণ রোষভরে ব্রহ্মাস্ত্র হাতে

করিলে, যোদ্ধাদের আতঙ্কের সীমাই রহিল না। কিন্তু যুধিষ্ঠির তাহাতে কিছুমাত্র ভয় না পাইয়া, নিজের ব্রহ্মাস্ত্রে দ্রোণের ব্রহ্মাস্ত্র বারণ করিলেন। কাজেই দ্রোণের আর যুধিষ্ঠিরকে পরাজয় করা হইল না।

এই সময় কর্ণ পাণ্ডব-সৈন্যদিগকে বড়ই অস্থির করিয়া তোলেন। তাহারা তাঁহার বাণের জ্বালায় হতবুদ্ধি হইয়া পলায়ন করিতে থাকে। তখন অর্জুন না থাকিলে কি হইত, কে জানে? অর্জুন আসিয়া কর্ণের ধনুক, ঘোড়া আর সারথি কাটিয়া তাঁহাকে বাণে বাণে সজারুর প্রায় করিয়া দেন। কৃপের রথ সেখানে ছিল তাই রক্ষা, নহিলে সে যাত্রা কর্ণের প্রাণ বাঁচানোই ভার হইত!

ইহার পর ভীষণ যুদ্ধে সাত্যকির হাতে সোমদত্তের মৃত্যু হয়। যুধিষ্ঠিরও তখন দ্রোণের সহিত খুব যুদ্ধ করিতেছিলেন ; এমন-কি, মুহূর্তেকের জন্য তাঁহাকে অজ্ঞান করিতেও ছাড়েন নাই। কিন্তু কৃষ্ণ তাঁহাকে বারণ করিয়া বলিলেন, "উনি সর্বদা আপনাকে ধরিয়া নিবার চেষ্টায় আছেন, উঁহার সহিত আপনার যুদ্ধ না করাই ভালো।"

ইহার কিছু পরে কৃতবর্মার সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া যুধিষ্ঠির অজ্ঞান হইয়া যান ; অন্যেরা তাড়াতাড়ি তাঁহাকে সেখান হইতে লইয়া গিয়া তাঁহার প্রাণ বাঁচায়।

তারপর আবার অশ্বত্থামা এবং ঘটোৎকচের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। এবারেও জয় অশ্বত্থামারই হইল। দুর্যোধন এই সময়ে ভীমকে আক্রমণ করিয়া ক্রমাগত পাঁচবার তাঁহার ধনুক কাটিলেন। তাহাতে ভীম ধনুক ছাড়িয়া শক্তি ছুঁড়িয়া মারিলে তাহাও দুর্যোধন কাটিতে ছাড়িলেন না। তখন ভীম দুর্যোধনের রথের উপরে এমনি বিশাল এক গদা ছুঁড়িয়া মারিলেন যে তাহাতে রথ, ঘোড়া, সারথি সব চুরমার হইয়া গেল। দুর্যোধন ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে নন্দকের রথে উঠিয়া প্রাণ বাঁচাইলেন, কিন্তু ভীমের মনে হইল বুঝি রথ আর ঘোড়ার সহিত তিনিও চূর্ণ হইয়াছেন।

এই সময়ে সহদেবের সহিত কর্ণের যুদ্ধ হয় ; আর সহদেব দেখিতে দেখিতে তাহাতে হারিয়া যান। তখন কর্ণ ইচ্ছা করিলেই তাঁহাকে বধ করিতে পারিতেন, কিন্তু কুন্তীর কথা ভাবিয়া ক্ষান্ত রহিলেন।

শকুনি কিন্তু নকুলের হাতে খুবই সাজা পাইলেন। শিখণ্ডীরও কৃপের হাতে প্রায় সেইরূপ দশা হইল। তারপর দ্রোণ আর ধৃষ্টদ্যুম্নে, কর্ণ আর সাত্যকিতে ; এইরূপ করিয়া কত যে যুদ্ধ হইল, তাহার শেষ নাই। এদিকে, এ-সকল যুদ্ধের ভিতরেই, অর্জুনের গাণ্ডীবের ভয়ংকর শব্দ ক্রমাগত দূর হইতে শোনা যাইতেছিল। তিনি যে তখন কত লোক মারিতেছিলেন, তাহার সংখ্যা নাই। তাঁহাকে আটকাইতে আসিয়া শকুনি আর তাঁহার পুত্র উলূক বড়ই লজ্জা পাইলেন।

ইহাতে দুর্যোধনের নিকট বকুনি খাইয়া, দ্রোণ আর কর্ণ মহারোষে পাণ্ডব সৈন্য মারিতে আরম্ভ করিলেন। তখন বেচারারা দ্রোণের বিক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। যতক্ষণ না অর্জুন আসিয়া দ্রোণ আর কর্ণকে

আক্রমণ করিলেন, ততক্ষণ আর তাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে আসিতে সাহসই পায় নাই। খানিক পরে আবার কর্ণ এমনি ভয়ংকর হইয়া উঠিলেন যে, সৈন্যদের কথা দূরে থাকুক, স্বয়ং যুধিষ্ঠিরের ভাবনা হইল, 'এখন যুদ্ধ করি, না পলায়ন করি।'

অর্জুন আর সহ্য করিতে না পারিয়া কৃষ্ণকে বলিলেন, "শীঘ্র কর্ণের নিকট চলুন, আজ হয় আমি উহাকে বধ করিব, নাহয় ঐ আমাকে বধ করিবে।"

কিন্তু কৃষ্ণ তাহাতে অসম্মত হইয়া বলিলেন, "তোমাকে মারিবার জন্য কর্ণ ইন্দ্রের সেই একপুরুষঘাতিনী শক্তি রাখিয়া দিয়াছে, অতএব এখন তোমার তাহার কাছে যাওয়া উচিত নহে। ঘটোৎকচকে পাঠাও।"

তখন অর্জুনের কথায় ঘটোৎকচ গিয়া কর্ণের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল। এদিকে সেই জটাসুরের পুত্র অলম্বল নামক রাক্ষস আসিয়া দুর্যোধনকে বলিল, "হেই মোহার্ রাজ্জ! মোকে বোল্ না, মুহি পান্ডোধের্ র্ কে মারকে খাই। ই লোক মোর বাপ্পুকে মারিলেক্!"

দুর্যোধনের ইহাতে কোনো আপত্তি হওয়ার কথা ছিল না। সুতরাং তখন অলম্বল আর ঘটোৎকচে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। দুই রাক্ষস মিলিয়া কি অদ্ভুত যুদ্ধই করিয়াছিল! অস্ত্র দিয়া, নখ দিয়া, দাঁত দিয়া, কীল, লাথি, চড় মারিয়া সাদাসিধা যুদ্ধ তো প্রথমে তাহারা করিলই, শেষে আরম্ভ হইল মায়াযুদ্ধ এক-জন যেইমাত্র আগুন হইল, অমনি আর-একজন হইল জল! তখন এ হইল তক্ষক, অমনি ও হইল গরুড়! এ হইল মেঘ, ও হইল ঝড় ; মেঘ হইল পর্বত, ঝড় হইল বজ্র। পর্বত হইল হাতি, বজ্র হইল বাঘ! হাতি গেল সূর্য হইয়া বাঘকে পোড়াইতে, অমনি বাঘ আসিল রাহু হইয়া সূর্যকে গিলিতে!

এইরূপ অসম্ভব অদ্ভুত যুদ্ধের পর ঘটোৎকচ অলম্বলের মাথা কাটিয়া তারপর কর্ণকে আক্রমণ করিল। দুইজনেই বীর, কাহারো তেজ কম নহে। কত বাণ ঘটোৎকচ কর্ণকে মারিল, কত বাণ কর্ণ ঘটোৎকচকে মারিলেন। দুজনের কাঁসার কবচ ছিঁড়িয়া গেল। দুজনের শরীরই রক্তে লাল হইল। শেষে কর্ণ ঘটোৎকচের ঘোড়া মারিয়া আর রথ ভাঙিয়া দিলে, সে মায়াদ্বারা এমনি বিকট চেহারা করিল যে কি বলিব! কর্ণ বাণ মারেন, আর সে হাঁ করিয়া তাহা গিলে। দেখিতে দেখিতে সে বুড়া আঙ্গুলটির মতন ছোট হইয়া যায়, আবার তখনি বিশাল পর্বতের বেশে আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহার মধ্যে তাহার একশতটা মাথা হইয়া গেল। তারপর হঠাৎ আর সে নাই, সে পাতালে ঢুকিয়া গিয়াছে। আবার মুহূর্তেকের ভিতরেই, সে পাহাড় সাজিয়া শূন্যমার্গে আকাশে আসিয়া উপস্থিত। সেই পাহাড় হইতে কত শেল, কত শূল, কত গদা যে কর্ণের মাথায় পড়িল, তাহার অন্তই নাই। তারপর আবার অসংখ্য বিকট রাক্ষস কোথা হইতে আনিয়া উপস্থিত করিল! এইরূপে কত মায়া যে সে দেখাইল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না, কিন্তু কর্ণ কিছুতেই কাতর হইলেন না।

ইহার মধ্যে অলায়ুধ নামক একটা ভয়ংকর রাক্ষস আসিয়া ঘটোৎকচকে আক্রমণ করিল। তখন ভীম ঘটোৎকচের সাহায্য করিতে আসিলে, অলায়ুধের সহিত তাঁহার ভীষণ যুদ্ধ হইল। অলায়ুধ সেই বকের ভাই, কাজেই ভীমের

উপর তাহার বড়ই রাগ। আর সে রাগের উপযুক্ত বলও তাহার ছিল। সুতরাং সে ভীমকে সহজে ছাড়িল না। এই সময়ে ঘটোৎকচ কর্ণকে ছাড়িয়া আসিয়া তাহাকে আক্রমণ না করিলে, হয়তো সে ভীমকে পরাজয়ই করিত।

ঘটোৎকচ অনেক কষ্টে অলায়ুধকে বধ করিয়া, আবার কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে গেল। খানিক যুদ্ধের পর সে কর্ণের ঘোড়া আর সারথিকে মারিয়া হঠাৎ আর সেখানে নাই। তারপর আবার আসিয়া সে কি ভয়ংকর মায়াযুদ্ধই যে আরম্ভ করিল, তাহা কি বলিব! তখন অগ্নিবর্ণ মেঘসকল আকাশ হইতে ক্রমাগত বজ্র, উল্কা, বাণ, শক্তি, প্রাস, মুষল, পরশু, খড়্গ, পট্টিশ, তোমর, পরিঘ, গদা, শূল, শতঘ্নী, পাথর প্রভৃতি বর্ষণ করিতে লাগিল। কর্ণের আর তখন এমন শক্তি হইল না যে, তাহা বারণ করেন। ইহার উপরে আবার শত শত রাক্ষস আসিয়া, কৌরবদিগকে সংহার করিতে লাগিল। কর্ণ তথাপি যথাসাধ্য বাণ-বৃষ্টি করিতেছিলেন, কিন্তু তাহাতে বিশেষ কিছুই হইল না। এদিকে ঘটোৎকচ শতঘ্নী মারিয়া তাঁহার ঘোড়া কয়টিকে বধ করিয়াছে।

এমন সময় কৌরবেরা সকলে মিলিয়া কর্ণকে কহিলেন, "আর কি দেখিতেছ? শীঘ্র ইন্দ্রের সেই একপুরুষঘাতিনী শক্তি দিয়া এই রাক্ষসকে বধ কর।"

কর্ণ দেখিলেন যে, রাক্ষসের হাতে প্রাণ যায়-যায়; কাজেই তখন তিনি নিরুপায় হইয়া, সেই একপুরুষঘাতিনী শক্তি হাতে লইলেন।

সে শক্তি দেখিবামাত্র ঘটোৎকচ নিজের দেহকে বিশাল পর্বতের ন্যায় বড় করিয়া, ঊর্ধ্বশ্বাসে পলাইতে লাগিল। জীব-জন্তুরা চিৎকার করিয়া উঠিল, ঝড় বহিল, বজ্রপাত আরম্ভ হইল; আর সেই মহাশক্তি, কর্ণের হাত হইতে ছুটিয়া গিয়া ঘটোৎকচের বুক ভেদ করত, ঊর্ধ্বমুখে প্রস্থান করিল।

ঘটোৎকচ পড়িবার সময়, এক অক্ষৌহিণী কৌরব-সৈন্য তাহার সেই বিশাল শরীরের চাপে মারা গেল। তাহার মৃত্যুতে পাণ্ডবদের কিরূপ দুঃখ হইল, বুঝিতেই পার। কিন্তু কৃষ্ণ ইহার মধ্যে সিংহনাদপূর্বক অর্জুনকে আলিঙ্গন করিয়া, সেই রথের উপরেই নাচিতে লাগিলেন।

ইহাতে অর্জুন ব্যথিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এমন দুঃখের সময় কিজন্য আপনি এত আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন?"

কৃষ্ণ বলিলেন, "আনন্দ করিতেছি এইজন্য যে, কর্ণ সেই শক্তি ঘটোৎকচের উপর মারাতে, তোমার বিপদ কাটিয়া গেল। ঘটোৎকচকে না মারিলে ঐ শক্তি দিয়া সে তোমাকে বধ করিত। এখন উহা তাহার হাত হইতে চলিয়া গেল, এরপর তুমি অনায়াসেই তাহাকে মারিতে পারিবে।"

কিন্তু ঘটোৎকচের গুণের কথা মনে করিয়া কেহই স্থির থাকিতে পারিল না। জন্মাবধি সে এক মুহূর্তও নিজের সুখের দিকে না চাহিয়া, পাণ্ডবদিগের কত সেবা করিয়াছে, যুধিষ্ঠির সে-সকলের কথা বলিতে বলিতে, রাগে এবং দুঃখে অস্থির হইয়া কর্ণকে বধ করিতে চলিলেন। ভীম তো তখন হইতে কৌরবদিগকে এক ধার হইতে মারিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এ পর্যন্ত ক্ষান্ত

হন নাই।

এমন সময় অর্জুন সকলকে বলিলেন, "রাত্রি অনেক হইয়াছে, আর তোমরাও অন্ধকারে যুদ্ধ করিয়া নিতান্তই ক্লান্ত হইয়াছ। সুতরাং এই বেলা একটু বিশ্রাম করিয়া লও, চন্দ্র উঠিলে আবার যুদ্ধ করা যাইবে।" অর্জুনের কথায় সকলে সন্তুষ্ট হইয়া, যিনি যেমনভাবে ছিলেন, সেইভাবেই, কেহ ঘোড়ায়, কেহ রথে, কেহ হাতিতে, কেহ সেই রণস্থলের কাদার উপরেই ঘুমাইয়া পড়িলেন। অস্ত্র-শস্ত্র যোদ্ধাদিগের হাতেই রহিল।

শেষ রাত্রিতে চাঁদ উঠিলে, আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ভোরবেলায় দ্রুপদ, এবং তিনটি পৌত্র সহ বিরাট, দ্রোণের হাতে মারা গেলেন। তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন শোকে অধীর হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, "আজ যদি আমি দ্রোণকে বধ না করি, তবে যেন আমার স্বর্গলাভ না হয়।"

এই বলিয়া তিনি ভীমের সহিত দ্রোণ-সৈন্য আক্রমণ করিলেন। তখনকার যুদ্ধ কি ঘোরতরই হইয়াছিল! দুর্যোধন ও দুঃশাসন নকুল ও সহদেবের সহিত, কর্ণ ভীমের সহিত, দ্রোণ অর্জুনের সহিত, এমনই যুদ্ধ করিতে লাগিলেন যে, সকলে তাহা দেখিয়া অবাক হইয়া গেল!

দ্রোণ আর অর্জুনের যুদ্ধ কি আশ্চর্য ; তাঁহাদের হাতেরই-বা কি অদ্ভুত ক্ষমতা, রথেরই-বা কি বিচিত্র গতি, আর অস্ত্রেরই-বা কি চমৎকার গুণ। কত বড়-বড় অস্ত্র যে দ্রোণ অর্জুনকে মারিলেন, তাহার সংখ্যা নাই। অর্জুন তাহা সকলই কাটিয়া ফেলিলেন। যতই তিনি সে-সব অস্ত্র কাটেন, দ্রোণ ততই আহ্লাদিত হইয়া ভাবেন যে, 'আমি যত পরিশ্রম করিয়া উহাকে শিখাইয়াছিলাম, তাহা সার্থক হইয়াছে।'

সেদিন অনেকের সহিত অনেকের যুদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু দ্রোণ যেমন তেজের সহিত পাণ্ডব-সৈন্য সংহার করিয়াছিলেন, পাণ্ডবেরা তেমন করিয়া কৌরব-সৈন্য মারিতে পারেন নাই। দ্রোণের পরাক্রম দেখিয়া তাঁহাদের মনে আতঙ্ক উপস্থিত হইল।

এমন সময় কৃষ্ণ অর্জুনকে বলিলেন, "অর্জুন! দ্রোণের হাতে অস্ত্র থাকিতে দেবতারাও উঁহাকে মারিতে পারেন না। অতএব যাহাতে উনি অস্ত্র ছাড়েন, তাহার উপায় করিতে হইবে। কেহ গিয়া উঁহার কাছে বলুক যে, 'অশ্বত্থামা মরিয়া গিয়াছে' ; তাহা হইলে উনি অস্ত্র ছাড়িয়া দিবেন।"

অর্জুন এমন কাজ করিতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না, কিন্তু অন্য যোদ্ধারা ইহাতে মত দিলেন, এবং অনেক কষ্টে যুধিষ্ঠিরেরও মত করানো হইল।

তখন ভীম কি করিলেন শুন। পাণ্ডবপক্ষের ইন্দ্রবর্মার একটা হাতি ছিল, তাহার নাম 'অশ্বত্থামা'! ভীম গদাঘাতে সেই হাতিটাকে মারিয়া, লজ্জিতভাবে দ্রোণের নিকট আসিয়া চিৎকারপূর্বক বলিতে লাগিলেন, "অশ্বত্থামা মরিয়া গিয়াছে! অশ্বত্থামা মরিয়া গিয়াছে!"

এ কথায় দ্রোণ প্রথমে বড়ই কাতর হইলেন ; কিন্তু তারপর মনে করিলেন

যে 'অশ্বত্থামা অমর, সে কি মরিয়া যাইবে? তারপর খানিক যুদ্ধ করিয়া তিনি যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যুধিষ্ঠির! অশ্বত্থামা মরিয়াছে এ কথা কি সত্য?"

দ্রোণ জানেন যে, যুধিষ্ঠির কখনোই মিথ্যা কথা কহেন না, কাজেই তিনি যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু হায়! কৃষ্ণ যে ইহারমধ্যে যুধিষ্ঠিরকে কি শিখাইয়া রাখিয়াছেন, তাহা তিনি জানেন না। কৃষ্ণ তাঁহাকে বলিয়াছেন, "মহারাজ! আপনি এই মিথ্যা কথাটুকু না বলিলে, আমরা সকলে আজ দ্রোণের হাতে মারা যাইব। সুতরাং এইটুকু মিথ্যা কথা বলিয়া আমাদিগকে রক্ষা করুন।"

ইহার উপর আবার ভীম সেই অশ্বত্থামা নামক হাতিটাকে মারিয়া 'অশ্বত্থামা মরিয়াছে' এ কথা বলার সুবিধাও করিয়া দিয়াছেন। কাজেই যুধিষ্ঠিরের আর তাহা বলিতে তত আপত্তি নাই। তবে কথা এই যে, দ্রোণ তো আর হাতির কথা জিজ্ঞাসা করেন নাই, তিনি, তাঁহার পুত্রের কথাই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। সুতরাং কেবল 'অশ্বত্থামা মরিয়াছে', এ কথা তাঁহাকে বলিলে মিথ্যা কথাই বলা হয় বৈকি!

যাহা হউক, যুধিষ্ঠিরের চেষ্টা, যাহাতে দুই দিকই রক্ষা হয়। জয়ও লাভ করিতে হইবে, মিথ্যাও বলা হইবে না। এই ভাবিয়া তিনি দ্রোণকে বলিলেন, "অশ্বত্থামা মরিয়াছে......হাতি।"

'অশ্বত্থামা মরিয়াছে' এই কথাগুলি বলিলেন জোরে, দ্রোণ তাহাই শুনিতে পাইলেন। 'হাতি' কথাটি বলিলেন অতি মৃদু স্বরে; দ্রোণ তাহা শুনিতে পাইলেন না।

মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রথ কখনো মাটি ছুঁইত না, সর্বদাই চারি আঙুল উচে থাকিত। কিন্তু তিনি মিথ্যা কথা বলার পর হইতে, তাহা মাটিতে নামিয়া পড়িল।

যুধিষ্ঠিরের মুখে অশ্বত্থামার মৃত্যুর কথা শুনিয়া, দ্রোণ নিতান্তই কাতর হইয়া পড়িলেন। তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন, তিনি আর আগের মতো যুদ্ধ করিতে পারিলেন না। তথাপি তিনি অনেকক্ষণ যুঝিয়াছিলেন, এবং সহজে কেহ তাঁহার কিছু করিতে পারে নাই।

এমন সময় ভীম আবার আসিয়া বলিলেন, "কিসের জন্য এত যুদ্ধ করিতেছেন? অশ্বত্থামা তো মরিয়া গিয়াছে!"

তখন দ্রোণ অস্ত্র ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "হে মহাবীর কর্ণ! হে কৃপাচার্য! হে দুর্যোধন! আমি বারম্বার বলিতেছি, তোমরা ভালো করিয়া যুদ্ধ কর! তোমাদের মঙ্গল হউক; আমি অস্ত্রত্যাগ করিলাম।" এই বলিয়া তিনি ভগবানের চিন্তায় মন দিলেন।

এমন সময় দেখা গেল যে, ধৃষ্টদ্যুম্ন অসি হস্তে দ্রোণকে কাটিতে চলিয়াছেন। রণভূমিসুদ্ধ লোক তাহাতে শিহরিয়া উঠিল। সকলে চিৎকার করিয়া বলিল, "হায় হায়! এমন কাজ করিও না।" অর্জুন রথ হইতে লাফাইয়া

পড়িয়া তাহাকে বারণ করিতে ছুটিলেন। কিন্তু হায়! কিছুতেই কিছু হইল না ; অর্জুন তাঁহাকে ধরিবার পূর্বেই তিনি তাঁহার নিষ্ঠুর নীচ কাজ শেষ করিয়া ফেলিলেন।

দ্রোণের মৃত্যুতে কৌরবেরা ভয়ে হতবুদ্ধি হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। দুর্যোধন পলাইলেন, কর্ণ পলাইলেন, শল্য পলাইলেন, কৃপ কাঁদিতে কাঁদিতে রণস্থল ছাড়িয়া চলিলেন। সকলেই ভাবিলেন যে, আজ বুঝি কৌরব-সৈন্য নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে।

অশ্বত্থামা অন্যদিকে যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন ; তিনি এ বিপদের কিছুই জানিতে পারেন নাই। সকলকে পলায়ন করিতে দেখিয়া, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কিজন্য এমন করিয়া পলাইতেছ?"

ইহার উত্তরে যখন তাঁহাকে দ্রোণের মৃত্যু-সংবাদ শোনানো হইল, তখন তিনি অশ্রু মুছিতে মুছিতে বলিলেন, "আজ নিশ্চয় আমি পাণ্ডবপক্ষের সকলকে বিনাশ করিব।"

অশ্বত্থামার নিকট নারায়ণ-অস্ত্র নামক একখানি অতি ভয়ংকর অস্ত্র ছিল। সে অস্ত্র ছুঁড়িলে, কাহারো সাধ্য হয় না যে তাহাকে আটকায়। অমরই হউক আর দেবতাই হউক, সে অস্ত্র গায়ে পড়িলে, তাহাকে মরিতেই হইবে। স্বয়ং নারায়ণ এই অস্ত্র দ্রোণকে দেন, দ্রোণের নিকট হইতে তাহা অশ্বত্থামা পান। সেই অস্ত্র এখন তিনি ধনুকে জুড়িলেন।

নারায়ণ-অস্ত্র ছুঁড়িবামাত্র ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রপাত এবং ভূমিকম্প আরম্ভ হইল, সূর্য মলিন হইয়া গেল, চারিদিকে অন্ধকার ঘিরিয়া ফেলিল, সাগর উথলিয়া উঠিল, নদীসকলের স্রোত ফিরিয়া গেল। সেই সাংঘাতিক অস্ত্রের ভিতর হইতে, আগুনের মতো অসংখ্য অস্ত্র বাহির হইয়া, জ্বলিতে জ্বলিতে, ঘোর গর্জনে পাণ্ডবদিগকে তাড়া করিল। তখন আর কেহই মনে করিল না যে, তাঁহাদের রক্ষা পাওয়ার কোনো উপায় আছে।

কিন্তু উপায় ছিল ; তাহা কৃষ্ণ জানিতেন। তিনি সকলকে বলিলেন, "তোমরা শীঘ্র অস্ত্র ফেলিয়া নামিয়া দাঁড়াও, তাহা হইলে এ অস্ত্রে কিছুই করিতে পারিবে না। অমনি সকলে অস্ত্রত্যাগ করিয়া, হাতি, ঘোড়া, রথ, যিনি যাহার উপর ছিলেন, তাহা হইতে নামিয়া পড়িলেন। কিন্তু ভীম রোখা লোক, তিনি বলিলেন, "অস্ত্র ছাড়িব কেন? এই গদা দিয়া আমি নারায়ণ-অস্ত্রকে পিষিয়া দিব।" বিষম বিপদ আর কি! ভীম কিছুতেই অস্ত্র ছাড়িবেন না। নারায়ণাস্ত্রকে অগ্রাহ্য করিয়া তিনি অশ্বত্থামাকে আক্রমণ করিতে গেলেন ; আর নারায়ণ-অস্ত্রের ভীষণ অগ্নিও তৎক্ষণাৎ আসিয়া, রথসুদ্ধ তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। তখন কৃষ্ণ আর অর্জুন ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া গিয়া, তাঁহাকে রথ হইতে টানিয়া নামান, আর তাঁহার অস্ত্র কাড়িয়া ফেলিয়া দেন, নচেৎ না জানি সেদিন কি হইত!

এইরূপে ভীম বাঁচিয়া গেলেন বটে, কিন্তু জোর করিয়া নামাইবার আর অস্ত্র কাড়িয়া লইবার দরুন, তাঁহার ভয়ানক রাগ হওয়াতে, তিনি সাপের মতো ফোঁস

ফোঁস করিয়া নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন।

নারায়ণ-অস্ত্র বৃথা হওয়ায়, অশ্বত্থামা ক্রোধভরে অতি ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিলে ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি, ভীম ইঁহাদের কেহই তাঁহার সম্মুখে টিকিয়া থাকিতে পারিলেন না। তারপর অর্জুন তাঁহাকে আক্রমণ করিলে, তিনি মন্ত্র পড়িয়া আগ্নেয়-অস্ত্র নামক এক মহা-অস্ত্র তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করা মাত্র অতি ভীষণ কাণ্ড উপস্থিত হইল, যেন সৃষ্টি থাকে কি যায়! এরূপ অস্ত্র আর কেহ কখনো দেখে নাই। অশ্বত্থামা মনে করিয়াছিলেন যে, এ অস্ত্রে পাণ্ডবেরা নিশ্চয় মরিবে। কিন্তু অর্জুন তাহার পরক্ষণেই ব্রহ্মাস্ত্র মারিয়া সে অস্ত্রকে দূর করিয়া দিলেন। তখন অশ্বত্থামা নিতান্ত নিরাশভাবে "দূর হোক! সব মিথ্যা!" এই বলিতে বলিতে রণস্থল ছাড়িয়া প্রস্থান করিলেন।



৮ দিন ঘোরতর যুদ্ধের পর দ্রোণ প্রাণত্যাগ করিলেন। ইহার পর কাহাকে সেনাপতি করা যায়, এ বিষয়ে পরামর্শ আরম্ভ হইলে, অশ্বত্থামা বলিলেন, "মহাবীর কর্ণ অসাধারণ যোদ্ধা, অতএব তাঁহাকেই আমরা সেনাপতি করিয়া, শত্রুদিগকে বিনাশ করিব।"

তখন দুর্যোধন বলিলেন, "হে কর্ণ! তোমার মতো যোদ্ধা তো আর কেহই নহে, সুতরাং তুমিই এখন আমাদের সেনাপতি হও।"

এ কথায় কর্ণ বলিলেন, "মহারাজ! আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, পাণ্ডবদিগকে পরাজয় করিব। এখন আমি তোমার সেনাপতি হইতেছি, সুতরাং মনে কর যেন পাণ্ডবেরা হারিয়া গিয়াছে।"

তখনই ধুমধামের সহিত কর্ণকে সেনাপতি করা হইল। তারপর রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র দেখা গেল যে, 'সাজ! সাজ!' বলিয়া সকলে যুদ্ধের জন্য ব্যস্ত। কর্ণকে সেনাপতি করিয়া, আবার কৌরবদিগের সাহস ফিরিয়া আসিয়াছে। তাহাদের এই বিশ্বাস হইয়াছে যে, ভীষ্ম আর দ্রোণ স্নেহ করিয়া পাণ্ডবদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু এবার কর্ণের হাতে আর তাঁহাদের রক্ষা নাই। সুতরাং সেদিন যুদ্ধ আরম্ভের সময় সকলেরই খুব উৎসাহ দেখা গেল।

আজ বিশাল হাতিতে চড়িয়া ভীম যুদ্ধে নামিয়াছেন। যাঁহার সহিত প্রথমে তাঁহার যুদ্ধ হইল, তাঁহার নাম ক্ষেমমূর্তি; তিনিও হাতির উপরে এবং অসাধারণ বীরও বটেন, প্রথমে যুদ্ধ অনেকটা সমানে সমানেই চলিল; এমন-কি, ক্ষেমমূর্তিই আগে নারাচের ঘায়ে ভীমের হাতিকে মারিয়া ফেলিলেন। ভীম সেই হাতি পড়িবার পূর্বেই তাহা হইতে লাফাইয়া পড়িয়া ক্ষেমমূর্তির হাতিকে এমনি লাথি মারিলেন যে, হাতি তাহাতে চেপ্টা হইয়া মাটির ভিতর ঢুকিয়া গেল। তখন ক্ষেমমূর্তি মাটিতে নামিয়া রোষভরে যুদ্ধে অগ্রসর হওয়ামাত্র ভীম গদাঘাতে তাঁহার প্রাণ বাহির করিয়া দিলেন।

তারপর অশ্বত্থামার সহিত ভীমের অনেকক্ষণ যুদ্ধ হয়। যুদ্ধ করিতে করিতে, শেষে দুজনেই অজ্ঞান হইয়া যাওয়ায়, সারথিরা তাঁহাদিগকে লইয়া প্রস্থান করে।

এদিকে অর্জুনকে অবশিষ্ট সংশপ্তকদিগের সহিত ঘোর যুদ্ধে রত দেখিয়া অশ্বত্থামা তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন, এবং বেশ একটু জব্দও হইলেন। তখন অর্জুন আবার সংশপ্তকদিগকে আক্রমণ করামাত্র আবার অশ্বত্থামা আসিয়া উপস্থিত। কিন্তু এবারে হাতে বুকে ও মাথায় বাণের খোঁচা খাইয়া অশ্বত্থামা একটু বিশেষরূপে সাজা পাইলেন। তাঁহার ঘোড়াগুলিরও কম দুর্দশা হইল না। ইহার উপর আবার তাহাদের রাশ কাটিয়া যাওয়াতে, তাহারা অশ্বত্থামাকে লইয়া সেখান হইতে যে ছুট দিল আর রণক্ষেত্রের বাহিরে না গিয়া থামিল না। অশ্বত্থমাও ভাবিলেন, 'ভালোই হইয়াছে।'

তারপর আর একজন অর্জুনকে আক্রমণ করিলেন, তাঁহার নাম দণ্ডধার। তিনি মরিলে আসিলেন তাঁহার ভাই দণ্ড। দণ্ড মরিলে আবার সংশপ্তকেরা আসিল।

অপর দিকে কর্ণও পাণ্ড্যকে বধ করিয়া বিস্তর পাণ্ডব-সৈন্য মারিয়াছেন। তারপর নকুলকে আক্রমণ করাতে দুজনে যুদ্ধ চলিয়াছে। দুজনেই দুজনের বাণে আচ্ছন্ন, মেঘের ছায়ার ন্যায় বাণের ছায়ায় রণস্থল ঢাকিয়া গিয়াছে। এমন সময় কর্ণের বাণে নকুলের ধনুঃ কাটা গেল, তারপর দেখিতে দেখিতে তাঁহার সারথি, ঘোড়া, রথ, অস্ত্র সকলই গেল, আর তাঁহার যুঝিবার ক্ষমতা রহিল না। তখন তিনি পলায়নের আয়োজন করামাত্র কর্ণ আসিয়া তাঁহার গলায় ধনুকের ফাঁস লাগাইয়া দেওয়াতে, বেচারার সে পথও বন্ধ হইয়া গেল। কর্ণ ইচ্ছা করিলেই তখন নকুলকে বধ করিতে পারিতেন, কিন্তু কুন্তীর কথা মনে করিয়া, কেবল এই বলিয়াই ছাড়িয়া দিলেন, "যাও, ঘরে যাও! আর বড়-বড় কৌরবদের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিও না!"

ইহার পর আর কর্ণের বিক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া, সৈন্যদের দুর্গতির একশেষ হইয়া উঠিল।

এদিকে কৃপের হাতে পড়িয়া ধৃষ্টদ্যুম্নেরও প্রায় সেই দশা। অনেকে ভাবিল, তিনি বুঝি-বা মারাই যান। সারথি তাঁহাকে বলিল, "বড়ই তো বিপদ দেখিতেছি, রথ ফিরাইব নাকি?" ধৃষ্টদ্যুম্ন বলিলেন, "আমি ঘামিয়া কাঁপিয়া আর মাথা ঠিক রাখিতে পারিতেছি না। চল এই বামুনকে ছাড়িয়া শীঘ্র ভীম বা অর্জুনের কাছে যাই।" সারথি তাহাই করিল।

দুর্যোধন আর যুধিষ্ঠিরের যুদ্ধ অতি অদ্ভুত হইয়াছিল। দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরের ধনুক কাটিলেন, যুধিষ্ঠির তৎক্ষণাৎ অন্য ধনুক লইয়া দুর্যোধনের ধনুক কাটিয়া তাহার উত্তর দিলেন। যুধিষ্ঠিরের তিন বাণ দুর্যোধনের বুকে আসিয়া পড়িল, দুর্যোধন তাহা গ্রাহ্য না করিয়া, উল্টিয়া যুধিষ্ঠিরকে পাঁচ বাণ আর একটা শক্তি মারিলেন। সেই শক্তি কাটা গেলে, দুর্যোধন মারিলেন একটা ভল্ল; তাহার উত্তরে যুধিষ্ঠিরের এক বাণ আসিয়া তাঁহার গায়ে বিষম বিঁধিয়া গেল। তখন দুর্যোধন বিশাল গদা হাতে যুধিষ্ঠিরকে মারিতে গিয়া তাঁহার শক্তির ভীষণ ঘায়ে রথের উপরে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছেন, এমন সময় ভীম আসিয়া যুধিষ্ঠিরকে বারণ করিয়া বলিলেন, "আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি

দুর্যোধনকে মারিব, সুতরাং আপনার এখন উহাকে মারা উচিত নহে।"

এ কথায় যুধিষ্ঠির দুর্যোধনকে ছাড়িয়া দিলেন। তারপর সন্ধ্যা পর্যন্ত বড়ই ভয়ানক যুদ্ধ চলিল। এই সময়ে সর্বাপেক্ষা অধিক বীরত্ব দেখান কর্ণ আর অর্জুন। দুজনেই অসংখ্য সৈন্য বিনাশ করেন। বিশেষত কর্ণের অত্যন্ত বাড়াবাড়ি আরম্ভ হইলে, অর্জুন এমনি অসাধারণ যুদ্ধ করেন যে কৌরবেরা তাহা দেখিয়া, ভয়ে চক্ষু বুজিয়া, আর্তনাদ করিতে থাকেন। তাঁহাদের ভাগ্যবলে এই সময়ে সন্ধ্যা আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন তাঁহারা যুদ্ধ শেষ করিতে আর কিছুমাত্র বিলম্ব করিলেন না।

কর্ণ সর্বদাই বড়-বড় কথা কহেন। সেদিন নাকালের একশেষ হইয়াও তিনি বলিলেন, "অর্জুন আজ হঠাৎ অস্ত্র-বৃষ্টি করিয়া আমাদিগকে ফাঁকি দিয়াছে, কিন্তু কাল আমি তাহাকে জব্দ করিব।"

রাত্রি প্রভাত হইলে কর্ণ দুর্যোধনকে বলিলেন, "আজ হয় আমি অর্জুনকে মারিব, নাহয় সে আমাকে মারিবে। কিন্তু আমার একজন ভালো সারথি চাই। আমার বিজয় নামক বিশ্বকর্মা-কৃত যে আশ্চর্য ধনুক আছে, তাহা অর্জুনের গাণ্ডীবের চেয়ে কম নহে। এখন কৃষ্ণের মতো একটি সারথি পাইলেই, আমি পাণ্ডবদিগকে অনায়াসে পরাজয় করিতে পারি।"

তারপর তিনি বলিলেন, "শল্য যদি আমার সারথি হন, তবে নিশ্চয় অর্জুনকে বধ করিব। মহাবীর শল্য কৃষ্ণ অপেক্ষাও ভালো সারথি আর আমি তো অর্জুনের চেয়ে বড় যোদ্ধা আছিই। সুতরাং শল্য আমার সারথি হইলে, দেবাসুরগণও আমার হাত হইতে বাঁচিয়া যাইতে পারিবেন না।"

তখন দুর্যোধন শল্যকে বলিলেন, "মামা! আপনাকে কর্ণের সারথি হইতে হইতেছে।"

এ কথায় শল্য রাগে চোখ ঘুরাইয়া বলিলেন, "কি এত বড় কথা! আমাকে বল সূতপুত্রের (সারথির ছেলে) সারথি হইতে! আমি কি তাহার চেয়ে কম, যে আমি তাহার সারথি হইতে যাইব? চলিলাম আমি এখান হইতে!"

ইহাতে দুর্যোধন ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "রাম রাম! আপনি কেন তাহার চেয়ে কম হইতে যাইবেন? কৃষ্ণ কি অর্জুনের চেয়ে কম? আমি তো মনে করি যে অর্জুনের চেয়ে বড়, আর আপনি কৃষ্ণের চেয়েও বড়!"

এ কথায় শল্য বলিলেন, "তুমি যে আমাকে কৃষ্ণের চেয়ে বড় বলিলে, ইহাতে আমি বড়ই তুষ্ট হইলাম। আচ্ছা তবে আমি কর্ণের সারথি হইব, কিন্তু আমার একটা নিয়ম থাকিল। আমার যাহা খুশি তাহাই আমি কর্ণকে বলিব।"

কর্ণ তাহাতেই রাজি হইয়া রথে উঠিলেন। আর উঠিয়াই শল্যকে বলিলেন, "রথ চালাও! আমি এখনি অর্জুন, ভীম, নকুল, সহদেব আর যুধিষ্ঠিরকে সংহার করিব।"

ইহাতে শল্য বলিলেন, "সূতপুত্র! ইন্দ্রও যাঁহাদিগকে ভয় করেন, তুমি কোন সাহসে তাঁহাদিগকে অবহেলা করিতেছ? যুদ্ধ আরম্ভ হইলে আর তোমার মুখে এমন কথা শুনা যাইবে না।"

কর্ণ বলিলেন, "আজ যদি যম, বরুণ, কুবের আর ইন্দ্রও বন্ধু-বান্ধব লইয়া অর্জুনকে রক্ষা করিতে আসেন, তথাপি আমি তাঁহাদিগকে সুদ্ধ অর্জুনকে পরাজয় করিব।"

শল্য বলিলেন, "তোমার ক্ষমতা খুব আছে বটে, কিন্তু কথা কও তাহার চেয়ে অনেক বেশি! তুমি কখনোই অর্জুনের সমান নহ। পলায়ন না করিলে, আজ তাহার হাতে তোমার প্রাণ যাইবে।"

কর্ণ বলিলেন, "যখন অর্জুন আমাকে পরাজয় করিবে, তখন আসিয়া তাহার বড়াই করিও।"

তখন শল্য, "বেশ কথা! তাহাই হইবে।" বলিয়া রথ চালাইয়া দিলেন।

কর্ণ পাণ্ডব-সৈন্য দেখিলেই বলিলেন, "তোমাদের মধ্যে যে অর্জুনকে দেখাইয়া দিবে, তাহাকে গাড়ি ভরিয়া রত্ন দিব, ছয় হাতির রথ দিব, একশত গ্রাম দিব, আর কৃষ্ণ আর অর্জুনকে মারিয়া তাহাদের সকল ধন দিব।"

এ কথায় শল্য হাসিয়া বলিলেন, "তোমার অত হাতি টাতি কিছুই দিতে হইবে না, অর্জুনকে অমনিই দেখিতে পাইবে।"

এতক্ষণে কর্ণের রাগ হইল, তিনি বলিলেন, "তুমি নিতান্ত মূর্খ, যুদ্ধের কিছুই জান না। তুমি চুপ কর ; তোমার মতো একশোজনে আসিয়া বকিলেও আমি ভয় পাইব না।"

শল্য বলিলেন, "তাই তো! তোমার দেখিতেছি মাথা খারাপ হইয়াছে! চিকিৎসার দরকার!"

এইরূপে ক্রমাগত উপহাস করিয়া, শল্য কর্ণের মন ভাঙিয়া দিলেন। ইহার অর্থ আর কিছুই নহে, কর্ণের তেজ কমাইয়া দিবার জন্য পাণ্ডবদিগের নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, সেই প্রতিজ্ঞা পালন করা। যুদ্ধের সময়ও একটু সুযোগ পাইলেই, "ঐ দেখ অর্জুন কেমন বীর, তুমি উহার সঙ্গে পারিবে না।" এইরূপ নানাকথা বলিয়া তিনি বেচারাকে ব্যস্ত করিয়া তোলেন।

তথাপি কর্ণ যেরূপ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন তাহা অতি অদ্ভুত। অর্জুন যত কৌরব-সৈন্য মারিলেন, কর্ণ তাহা অপেক্ষা কম পাণ্ডব-সৈন্য মারিলেন না। ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রৌপদীর পুত্রগণ, সাত্যকি, ভীম, সহদেব, শিখণ্ডী যুধিষ্ঠির ইহারা সকলে তাঁহার নিকট হইতে হটিয়া গেলেন।

যুধিষ্ঠির কর্ণের সহিত খুব যুদ্ধ করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠিরের বাণে কর্ণ একবার অজ্ঞান হইয়া যান, কিন্তু শীঘ্রই আবার উঠিয়া আসিয়া যুধিষ্ঠিরের পার্শ্বরক্ষক দুটিকে মারিয়া ফেলেন। তারপর যাট বাণে তাঁহাকে কাতর করিয়া কর্ণ সিংহনাদ করিতেছেন, এমন সময় সাত্যকি, চেকিতান, যুযুৎসু, ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি অনেক যোদ্ধা আসিয়া তাঁহাকে চারিদিক হইতে আক্রমণ করিলেন।

তথাপি কর্ণ কিছুমাত্র চিন্তিত হইলেন না। তাঁহার বাণে চারিদিক ছারখার হইয়া যাইতে লাগিল। যুধিষ্ঠিরের ধনুক আর বর্ম কাটিয়া, তিনি তাঁহাকে এমনি সংকটে ফেলিলেন যে কি বলিব! যুধিষ্ঠির এক শক্তি ছুঁড়িয়া মারিলেন, কর্ণের বাণে তাহাও দুই খণ্ড হইয়া গেল। তারপর যুধিষ্ঠির চারিটা তোমর

মারিয়া কর্ণকে কাতর করিলেন বটে, কিন্তু কর্ণ তথাপি তাঁহার ধ্বজ, তূণ, রথাদি নাশপূর্বক তাহাকে বাণাঘাতে ব্যাকুল করিতে ছাড়িলেন না।

তখন যুধিষ্ঠির অন্য রথে চড়িয়া পলায়নের আয়োজন করিলে, কর্ণ অমনি ছুটিয়া গিয়া, তাহার কাঁধে হাত দিলেন।

এমন সময় শল্য বলিলেন, "কর কি সূতপুত্র! উঁহাকে ধরিলেই উনি তোমাকে ভস্ম করিয়া ফেলিবেন।"

যাহা হউক, কুন্তীর কথা কর্ণের মনে ছিল : তাই তিনি যুধিষ্ঠিরের আর কোনো অনিষ্ট করিলেন না, কেবল কিছু গালি দিয়াই তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন। যুধিষ্ঠিরকে হারিতে দেখিয়া, কৌরবেরা তাঁহার সৈন্য মারিয়া শেষ করিতে লাগিল, আর ভীম, সাত্যকি প্রভৃতি বীরগণের হাতে তাহার শাস্তিও পাইল ভালো মতেই। দুর্যোধন চিৎকারপূর্বক তাহাদিগকে বলিতে লাগিলেন, "তোমরা পলায়ন করিও না, পলায়ন করিও না।" কিন্তু তাঁহার কথা কে শুনে।

ইহা দেখিয়া কর্ণ শল্যকে বলিলেন, "শীঘ্র ভীমের নিকট রথ লইয়া চল।" ভীম তখন কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য সিংহনাদপূর্বক সেই দিকেই আসিতেছিলেন। তাহা দেখিয়া শল্য কর্ণকে বলিলেন, "ঐ দেখ ভীম আসিতেছে। আজ সে তাহার বহুদিনের রাগ তোমার উপর ঝাড়িবে!"

তারপর ভীমের আর কর্ণের ঘোরতর যুদ্ধ হইল। যুদ্ধ করিতে করিতে ভীম কর্ণকে এমনি ভয়ংকর বাণ ছুঁড়িয়া মারিলেন যে, তাহা পর্বতে লাগিলে পর্বতও ফাটিয়া যাইত। সে বাণ খাইয়া আর কর্ণকে যুদ্ধ করিতে হইল না। তিনি তখনি চিৎ হইয়া রথের ভিতরে পড়িয়া অজ্ঞান হওয়ায় শল্য তাঁহাকে সেখান হইতে লইয়া গিয়া তাঁহার প্রাণরক্ষা করিলেন।

কর্ণের পরাভব দেখিয়া দুর্যোধন তাঁহার ভাইদিগকে যুদ্ধে পাঠাইলেন। তারপর সে বেচারাদের যে দুর্দশা। যুদ্ধ ভালো করিয়া আরম্ভ হইতে না হইতেই তাহাদের ছয়জন মরিয়া গেল। আর সকলে তখন ভাবিল, বুঝি যম আসিয়াছে। কাজেই তাহারা ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিল।

তখন আবার কর্ণ আসিয়া ভীমকে আক্রমণ করাতে, ভীম এক বিশিকের ঘায় তাঁহাকে অস্থির করিয়া দিলেন। কর্ণ তথাপি তাহাতে না চটিয়া ভীমের ধনুক আর রথ চূর্ণ করিলেন। তাহাতে ভীম মহারোষে গদা লইয়া এমনি যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন যে, কৌরবদিগের সাতশত হাতি দেখিতে দেখিতে ঘণ্ট হইয়া গেল। তখন আর কৌরবদের পলায়ন ভিন্ন কথা নাই।

এদিকে কর্ণ যুধিষ্ঠিরকে সামনে পাইয়া, তাঁহাকে এমনি তাড়া করিয়াছেন যে, তিনি পলাইবার পথ পান না। তাহাতে ভীম ছুটিয়া আসিয়া আবার কর্ণকে আক্রমণ করিলেন। ততক্ষণে কৃপ অশ্বত্থামা, কৃতবর্মা প্রভৃতি বীরগণও সেখানে উপস্থিত হইলে অনেকক্ষণ সাংঘাতিক যুদ্ধ চলিল!

অর্জুন এই সময়ে সংশপ্তক, নারায়ণী-সৈন্য প্রভৃতির সহিত ঘোরতর যুদ্ধে ব্যস্ত। উহাদের মধ্যে সুশর্মা অর্জুনের সহিত ভয়ানক যুদ্ধ করেন, এমন-কি, একবার তাঁহাকে অজ্ঞান করিতেও ছাড়েন নাই। কিন্তু অর্জুন ঐন্দ্রাস্ত্র মারিয়া

তাঁহাদের সকলকেই জব্দ করিয়া দিলেন।

অশ্বত্থামা আর যুধিষ্ঠিরে অনেকক্ষণ খুব যুদ্ধ হইয়াছিল। এই যুদ্ধে সাত্যকি মাঝে মাঝে যুধিষ্ঠিরের সাহায্য করিয়াছিলেন। কিন্তু অশ্বত্থামার বাণে যুধিষ্ঠির ক্রমে এমনই আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন যে, তখন আর তাঁহার সেখান হইতে প্রস্থান করা ভিন্ন উপায় রহিল না।

অশ্বত্থামা সেদিন অর্জুনের সঙ্গেও কম যুদ্ধ করেন নাই। এমন-কি, তাঁহার তেজে অর্জুনকে কাতর হইতে হয়। তখন কৃষ্ণ আশ্চর্য হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "আজ কেন তোমার তেজ কমিয়া গেল? গাণ্ডীব কি তোমার হাতে নাই? না কি হাতে লাগিয়াছে?"

যাহা হউক, এরূপভাবে অনেকক্ষণ যায় নাই। শেষে অশ্বত্থামাকে নিতান্তই নাকাল হইয়া সেখান হইতে চলিয়া যাইতে হয়।

ইহার পরে অশ্বত্থামা ধৃষ্টদ্যুম্নকে আক্রমণ করেন। ধৃষ্টদ্যুম্নের ধনুক, রথ, ঘোড়া, সারথি প্রভৃতি মুহূর্তের মধ্যে চূর্ণ হইয়া গেল। তারপর তাঁহাকে খালি হাতে পাইয়া, অশ্বত্থামা বাণে বাণে তাঁহাকে ক্ষত-বিক্ষত করিলেন। কিন্তু তথাপি তিনি তাঁহাকে বধ করিতে পারিলেন না। তখন তিনি ছুটিয়া তাঁহাকে ধরিতে আসিলে, কৃষ্ণ অর্জুনকে বলিলেন, "ঐ দেখ, ধৃষ্টদ্যুম্নের কি দুর্দশা!" তখন অর্জুন অশ্বত্থামাকে আক্রমণ করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রাণ রক্ষা করিলেন।

এই সময়ে কর্ণ প্রভৃতি বীরেরা, যুধিষ্ঠিরকে ধরিবার চেষ্টায়, তাঁহাকে আক্রমণ করেন। কর্ণের বাণে নিতান্ত ক্লেশ পাইয়াও যুধিষ্ঠির অনেকক্ষণ এমনি তেজের সহিত যুদ্ধ করেন যে, তাহাতে কৌরবদলে হাহাকার উপস্থিত হয়। কিন্তু শেষকালে কর্ণের বাণ একেবারেই অসহ্য হইয়া উঠাতে, তিনি সারথিকে বলিলেন, "শীঘ্র এখান হইতে রথ লইয়া চল।"

তাহাতে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা "ধর! ধর!" বলিয়া তাঁহার পিছু পিছু তাড়া করিল। কিন্তু পাণ্ডব-সৈন্যেরা ছুটিয়া আসিয়া তাহাদিগকে এমনি শিক্ষা দিল যে, আর তাহারা বেয়াদবি করিতে সাহস পাইল না।

এদিকে রাজা যুধিষ্ঠির, বাণাঘাতে নিতান্ত কাতর হইয়া, নকুল ও সহদেবের সঙ্গে ধীরে ধীরে শিবিরে চলিয়াছেন, ইতিমধ্যে আবার কর্ণ আসিয়া তাঁহার গায়ে বাণ মারিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা তিনজনে মিলিয়াও কর্ণকে কিছুতেই বারণ করিতে পারিলেন না। কর্ণের বাণে যুধিষ্ঠিরের ঘোড়া আর পাগড়ি, নকুলের ঘোড়া, রাশ আর ধনুক, দেখিতে দেখিতে কাটিয়া গেল। সর্বনাশের আর অধিক বাকি নাই, এমন সময় শল্য কর্ণকে বলিলেন, যুধিষ্ঠিরকে লইয়া ব্যস্ত হইয়াছ, অর্জুনের সহিত কখন যুদ্ধ করিবে? ইহাকে মারিয়া ফল কি? আগে অর্জুনকে মার। আর ঐ দেখ, দুর্যোধন ভীমের হাতে পড়িয়াছেন, ইহাদিগকে ছাড়িয়া আগে তাঁহাকে বাঁচাও!"

এ কথায় কর্ণ তাড়াতাড়ি দুর্যোধনকে সাহায্য করিতে গেলেন, যুধিষ্ঠিরও রক্ষা পাইলেন ; আঘাতের যাতনায় তিনি এতই কাতর হইয়াছিলেন যে, শিবিরে আসিয়াই তাঁহাকে শয়ন করিতে হইল।

এদিকে আবার অশ্বত্থামা আর অর্জুনের যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। এবারেও অশ্বত্থামার তেজের কোনো অভাব নেই ; কিন্তু তাঁহার সারথি হত আর ঘোড়া ক্ষিপ্ত হওয়ায় তিনি একটু বিপদে পড়িয়াছেন। ঘোড়াগুলি অর্জুনের বাণে অস্থির হইয়া, রথ রথী সকল সুদ্ধ রণস্থল হইতে ছুট দিল। তারপর পাণ্ডব-যোদ্ধাগণের তাড়া খাইয়া, কৌরবদিগের সৈন্যগুলিও পলায়ন করিতে পারিলে বাঁচে।

তখন দুর্যোধন কর্ণকে বিনয় করিয়া বলিলেন, "ঐ দেখ, তুমি থাকিতেই সৈন্যগুলি পলায়ন করিতেছে! আর তাহারা তোমাকেই ডাকিতেছে।"

এ কথায় কর্ণ তাঁহার বিজয় নামক বিশ্বকর্মানির্মিত সেই আশ্চর্য পুরাতন ধনুকে ভার্গব-অস্ত্র জুড়িয়া নিক্ষেপ করিলে আর পাণ্ডব-সৈন্যদের দুর্দশার অবধি রহিল না। তখন তাঁহারা দাবানলভীত জন্তুর ন্যায় চ্যাঁচাইতে লাগিল। সেই চিৎকার শুনিয়া অর্জুন কৃষ্ণকে বলিলেন, "ঐ দেখুন, ভার্গবাস্ত্রে সৈন্যগণের কি দুর্দশা হইতেছে। শীঘ্র কর্ণের নিকট রথ লইয়া চলুন।"

কিন্তু কৃষ্ণ ভাবিলেন যে, কর্ণ আরো খানিক যুদ্ধ করিয়া ক্লান্ত হইলে, অর্জুন সহজেই তাঁহাকে বধ করিতে পারিবেন ; কাজেই তিনি কর্ণের দিকে না গিয়া অর্জুনকে বলিলেন, "মহারাজ যুধিষ্ঠির কর্ণের বাণে বড়ই কাতর হইয়াছেন। আগে তাঁহাকে শান্ত করিয়া, তারপর কর্ণকে মারা যাইবে।"

তখন তাঁহারা তাড়াতাড়ি শিবিরের দিকে আসিতেছেন, এমন সময় অশ্বত্থামা আসিয়া মহারোষে অর্জুনকে আক্রমণ করিলেন। যাহা হউক, অশ্বত্থামাকে পরাজয় করিতে অনেক সময় লাগিল না। তারপর ভীমের হাতে কৌরবদিগের নিবারণের ভার দিয়া তাঁহারা যুধিষ্ঠিরকে দেখিতে গেলেন।

সেখানে অনেক কথাবার্তার পর তথা হইতে চলিয়া আসিবার সময় অর্জুন এই প্রতিজ্ঞা করিলেন, "আজ হয় আমি কর্ণকে মারিব, নাহয় কর্ণ আমাকে মারিবে।"

এদিকে ভীম সেই অবধি আর এক মুহূর্তের জন্যও যুদ্ধে ক্ষান্ত হন নাই। আজকার যুদ্ধে তাঁহার বড়ই আনন্দ বোধ হইতেছে। তিনি সারথি বিশোককে ডাকিয়া বলিলেন, "বিশোক, আমার বড়ই উৎসাহ হইতেছে, এখন আর কোন রথটা স্বপক্ষের কোনটা বিপক্ষের তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। একটু সতর্ক থাকিও, যেন শত্রু বোধে মিত্রকে মারিয়া না বসি। আজ প্রাণ ভরিয়া শত্রু মারিব। দেখ তো, অস্ত্র-শস্ত্র কি পরিমাণ আছে।"

বিশোক বলিল, "এখনো দশহাজার শর, দশহাজার ক্ষুর, দশহাজার ভল্ল, দুহাজার নারাচ, তিনহাজার প্রদর, আর অসংখ্য গদা, অসি, মুদ্গর, শক্তি আর তোমর রহিয়াছে। আপনি নিশ্চিন্তে যুদ্ধ করুন, অস্ত্র ফুরাইবার কোনো ভয় নাই।"

এই সময়ে অর্জুন কৌরব-সৈন্য ছারখার করিয়া, অতি ভয়ংকর যুদ্ধ করিতেছিলেন। সেই যুদ্ধের ঘোরতর শব্দ ভীমের নিকট আসিয়া পৌঁছিলে, তিনিও যারপরনাই উৎসাহ পাইয়া সিংহনাদ করিতে করিতে কৌরবদিগকে

একেবারে পিষিয়া দিতে লাগিলেন! তখন আর কেহই তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিল না।

অন্যদিকে কর্ণও পাণ্ডব-সৈন্যদিগকে মারিয়া আর কিছু রাখেন নাই। তাহারা তখন ভয়ে এমনি হইয়াছে যে, আর যুদ্ধ করিবার জন্য তাহাদের হাত উঠে না।

বাস্তবিক তখন দুই পক্ষের কত লোক যে মরিয়াছিল, তাহার সংখ্যা করে কাহার সাধ্য? দুই পক্ষের প্রায় প্রত্যেক বড়-বড় বীরই সে সময়ে হাজার হাজার সৈন্য বিনাশ করিয়াছিলেন।

ইহার মধ্যে একবার দুঃশাসন ভীমকে আক্রমণ করেন। ইহাতে প্রথমেই ভীমের বাণে তাঁহার ধনুক আর ধ্বজ কাটা যায়, নিজের কপালেও একটি বাণ বিঁধে, তারপর এক বাণ আসিয়া তাঁহার সারথির মাথা কাটিয়া ফেলে। তখন দুঃশাসন তাড়াতাড়ি অন্য ধনুক লইয়া ভীমকে বারোটি বাণ মারেন, এবং নিজ হাতে ঘোড়ার রাশ ধরিয়া এক ভীষণ বাণে তাঁহাকে অজ্ঞান করিতেও ছাড়েন নাই। ইহার উপর আবার তিনি এক বাণে ভীমের ধনুক কাটিয়া তাঁহার সারথিকে নয়টি, এবং তাঁহাকে বহুতর বাণ মারাতে, ভীম রাগের ভরে তাঁহাকে একটা শক্তি ছুঁড়িয়া মারেন।

দুঃশাসন আকর্ণ (কান অবধি, অর্থাৎ যথাসাধ্য) ধনুক টানিয়া দশ বাণে সেই জ্বলন্ত উল্কাবৎ শক্তি খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তারপর তিনি বাণে বাণে ভীমকে জর্জরিত করিতে থাকিলে ভীম তাহাতে বিষম ক্রোধভরে বলিলেন, "তুমি তো আমাকে খুবই মারিলে, এখন আমার এই গদাটিকে সামলাও দেখি!" বলিতে বলিতে তিনি এক বিশাল গদা দুঃশাসনকে ছুঁড়িয়া মারিলেন। দুঃশাসনও ভীমকে একটা শক্তি মারিলেন বটে, কিন্তু তাহা অর্ধপথে গদায় ঠেকিয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল। তারপর সেই দারুণ গদা, দুঃশাসনের রথ আর সারথিকে চূর্ণ করিয়া, তাঁহার মাথায় পড়িলে, তিনি তাহার আঘাতে দশ ধনু দূরে বিক্ষিপ্ত হইলেন।

এই অবস্থায় দুঃশাসনকে যাতনায় ছট্‌ফট্‌ করিতে দেখিয়া ভীমের সেই পুরাতন প্রতিজ্ঞার কথা মনে হইল। এই দুরাত্মাই দ্রৌপদীকে সেই সভায় চুলে ধরিয়া আনিয়া অপমান করিয়াছিল ; তখন ভীম বলিয়াছিলেন, 'আমি ইহার বুক চিরিয়া রক্ত খাইব।'

সেই প্রতিজ্ঞার কথা মনে হওয়া মাত্র ভীম কর্ণ, দুর্যোধন, কৃপ, অশ্বত্থামা প্রভৃতিকে ডাকিয়া বলিলেন, "আজ আমি এই পাপাত্মা দুঃশাসনকে বধ করিব, তোমাদের সাধ্য থাকে তো ইহাকে রক্ষা কর।" তারপর তিনি ঝড়ের ন্যায় আসিয়া দুঃশাসনকে পদতলে পেষণপূর্বক তাঁহার বুকে তলোয়ার বসাইয়া দিলেন। সেই তলোয়ারের ঘায়ে দুঃশাসনের গরম রক্ত সবেগে বাহির হওয়ামাত্র, ভীম মহানন্দে তাহা পান করিয়া বলিলেন, "আহা! কি মিষ্টি! দধি দুগ্ধ বা ঘৃত পানেও আমি এত সুখী হই না।"

ভীমকে দুঃশাসনের রক্ত খাইতে দেখিয়া, সৈন্যেরা "বাবা রে! রাক্ষস রে!"

বলিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে পলাইতে লাগিল। এদিকে ভীম তাঁহার ভীষণ প্রতিজ্ঞা পালনপূর্বক, দুঃশাসনের মাথা কাটিয়া বলিলেন, "অতঃপর দুর্যোধন পশুকে মারিয়া, পদাঘাতে তাহার মস্তক চূর্ণ করিতে হইবে।"

এই সময়ে দুর্যোধনের দশ ভাই, রোষভরে ভীমকে আক্রমণ করাতে ভীম দশ ভল্লে সেই দশজনকে সংহার করিলেন। এ-সকল কাণ্ড দেখিয়া, আর ভীমের তখনকার সিংহনাদ শুনিয়া, অন্যেরা তো পলায়ন করিতেই পারে, নিজে কর্ণই ভয়ে আড়ষ্ট, তাঁহার মুখে কথা সরে না! তখন শল্য তাঁহাকে বলিলেন, "এখন ওরূপ হইলে চলিবে না, তোমার কাজ কর।"

কিন্তু কর্ণের পুত্র বৃষসেন এই সময়ে খুব যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার বাণে নকুলের ধনুক, রথ, খড়্গ প্রভৃতি কাটা গিয়া অল্পক্ষণের ভিতরেই নিতান্ত সংকট উপস্থিত হইল। ভীম, অর্জুন, কৃষ্ণ প্রভৃতিও তাঁহার বাণে অক্ষত রহিলেন না। এইরূপে অর্জুনের সহিত তাঁহার যুদ্ধ বাধিয়া যাওয়াতে, অর্জুন কর্ণকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমরা সকলে মিলিয়া অভিমন্যুকে মারিয়াছিলে। আমি তোমাদের সম্মুখেই বৃষসেনকে মারিতেছি, ক্ষমতা থাকে তো রক্ষা কর।"

তারপর অর্জুন হাসিতে হাসিতে দশ বাণে বৃষসেনকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া, আর চারিটি ক্ষুরে তাঁহার ধনুক, দুটি হাত আর মাথা কাটিয়া ফেলিলেন। ইহাতে কর্ণের প্রাণে কিরূপে লাগিয়াছিল, বুঝিতেই পার। ইহার পরেও কি আর তিনি চুপ করিয়া থাকিতে পারেন? কাজেই তখন অর্জুনের সহিত তাঁহার যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

এ সময়ে অশ্বত্থামা দুর্যোধনের দুটি হাত ধরিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আর কেন? এখনো ক্ষান্ত হও! আর পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধের প্রয়োজন নাই। যুদ্ধের মুখে ছাই! আমাদের সকলেই মরিয়া গিয়াছেন, কয়েকটি মাত্র বাঁচিয়া আছি। এখন যুদ্ধ হইতে তুমি ক্ষান্ত হও, নহিলে নিশ্চয় মারা যাইবে।" কিন্তু দুর্যোধন সেই উপকারী বন্ধুর কথায় কান দিলেন না। তিনি বলিলেন, "অর্জুন বড়ই ক্লান্ত হইয়াছে : কর্ণ এখনি তাহাকে বধ করিবেন।"

এদিকে কর্ণ আর অর্জুনের যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। যোদ্ধারা সিংহনাদ করিয়া আর চাদর উড়াইয়া তাঁহাদিগকে উৎসাহ দিতেছেন। এমন যুদ্ধ কি সচরাচর হয়? তাই আজ দেবতারা অবধি, আকাশ পরিপূর্ণ করিয়া, তামাশা দেখিতে আসিযাছেন।

বাণ, বাণ! কেবলই বাণের পর বাণ। অর্জুন মারেন, কর্ণ কাটেন : কর্ণ মারেন, অর্জুন কাটেন। অর্জুনের এক বাণে পৃথিবী, আকাশ, সূর্য অবধি জ্বলিয়া উঠিল। যোদ্ধাদের কাপড়ে আগুন! বেচারারা বুঝি পলাইবার পূর্বেই মারা যায়। উহার নাম আগ্নেয়-অস্ত্র। উঃ! কি ঘোরতর হুড়্-হুড়্ ধক্-ধক্ শব্দ! গেল বুঝি সব!

ঐ দেখ, কর্ণ বরুণাস্ত্র ছুঁড়িয়াছেন। ঐ কালো কালো মেঘে আকাশ ছাইয়া গেল! কি ঘোর অন্ধকার! কি ভয়ানক বৃষ্টি! সৃষ্টি বুঝি তল হয়!

অমনি দেখ, কি বিষম ঝড় বহিল! মেঘ বৃষ্টি উড়াইয়া নিল ; সৃষ্টি বাঁচিল!

অর্জুন বায়ব্য-অস্ত্র মারিয়াছেন, তাহাতেই এত ঝড়!

আর একটা অস্ত্র আরো ভীষণ। ইহা অর্জুন ইন্দ্রের নিকট পাইয়াছিলেন। অস্ত্রের অদ্ভুত গুণে গাণ্ডীব হইতে কত ক্ষুরপ্র, কত নালীক, কত অঞ্জলীক, কত নারাচ, কত অর্ধচন্দ্রই বাহির হইতেছে। এবারে বুঝি আর কর্ণের রক্ষা নাই।

কিন্তু কর্ণ মরিলেন না! তিনি ভার্গবাস্ত্রে অর্জুনের সকল অস্ত্র দূর করিলেন। আর লোকও মারিলেন কতই। কর্ণের কি অসীম তেজ! কৃষ্ণ আর অর্জুনকে তিনি কি ব্যস্তই করিলেন! তখন ভীম ক্রোধভরে বলিলেন, "ও কি, অর্জুন! মন দিয়া যুদ্ধ কর!"

কৃষ্ণও বলিলেন, "অর্জুন! তোমার উৎসাহ দেখিতেছি না কেন?"

তাহাতে অর্জুন ব্রহ্মাস্ত্র মারিলে কর্ণ তাহাও কাটিতে ছাড়িলেন না। কিন্তু ইহার পর যে অর্জুন আর-একটা ব্রহ্মাস্ত্র মারিলেন, সে বড়ই ভয়ানক! কত যোদ্ধাই তাহাতে মরিল। কিন্তু তথাপি বাণক্ষেপে ত্রুটি নাই ; বৃষ্টিধারার মতো তাঁহার বাণ পড়িতেছে।

তখন অর্জুনের আঠারোটি বাণ ছুটিয়া চলিল। তাহার তিনটি বিঁধিল কর্ণের গায়ে, একটিতে কাটিল তাঁহার ধ্বজ, আর চারটি খাইলেন শল্য। বাকি দশটিতে রাজপুত্র সভাপতির মাথাটি কাটা গেল। বাণের আর অন্তই নাই ; হাতি, রথী, পদাতি সবই বুঝি কাটিয়া শেষ হয়। এবারে কর্ণ কাবু হইবেন। কিন্তু হায়! অর্জুনের ধনুকের গুণ যে ছিঁড়িয়া গেল, এখন উপায়? কর্ণ সুযোগ পাইয়া কত বাণই মারিতেছেন। কৃষ্ণকে ষাট, অর্জুনকে আট, ভীমকেও অনেক, সৈন্যগুলিকে তো অসংখ্য। সর্বনাশ হইল বুঝি ; দেখ কৌরবদের কত আনন্দ!

যাহা হউক, ঐ অর্জুনের ধনুকে আবার গুণ চড়িল। আর কর্ণের বাণের সে তেজ নাই, এখন অর্জুনের বাণেই আকাশ অন্ধকার। ঐ, কর্ণের গায়ে উনিশ বাণ পড়িল, শল্যের গায়ে দশটি বিঁধিল। কর্ণ রক্তে লাল হইয়া গিয়াছেন।

কিন্তু তথাপি তিনি অর্জুনকে তিন বাণ, আর কৃষ্ণকে পাঁচ বাণ মারিতে ছাড়েন নাই। ঐ পাঁচটি বাণ পাঁচটা মহাসর্প। কৃষ্ণকে বিঁধিয়া উহারা আবার কর্ণের নিকট ফিরিয়া যাইতে যাইতে, মধ্যপথে অর্জুনের ভল্লে খণ্ড খণ্ড হইল। অর্জুনের আর দশ বাণে কর্ণের কি দশা হইয়াছে, দেখ। অর্জুনের কি অতুল বিক্রম, কি ভীষণ বাণ-বৃষ্টি! আকাশ আঁধার হইল ; কর্ণের রথ কাটিয়া গেল। তাঁহার সঙ্গের একটি রক্ষকও বাঁচিয়া নাই ; অপর কৌরবেরা, অর্জুনের ভয়ে, তাঁহাকে ফেলিয়া পলায়ন করিতেছে। কৌরবদের মধ্যে কেবল কর্ণই ভয় পান নাই ; তিনি অর্জুনের সামনেই বাণ-বৃষ্টি করিতেছেন।

এমন সময় কোথা হইতে ঐ সাপটা আসিয়া কর্ণের তূণের ভিতরে ঢুকিল ; এ সেই অশ্বসেন, খাণ্ডব দাহের সময় সে অনেক কষ্টে পাতালে ঢুকিয়া প্রাণ বাঁচাইয়াছিল। সেই রাগে, সে আজ কর্ণের বাণের ভিতরে ঢুকিয়া অর্জুনকে বধ করিতে আসিয়াছে, কর্ণ ইহার কিছুই জানেন না। অশ্বসেন যে বাণের ভিতরে ঢুকিয়াছে, তাহারো চেহারা সাপের মতো। কর্ণ অর্জুনকে মারিবার জন্য এই বাণ বহুকাল যাবৎ পরম যত্নে চন্দন চূর্ণের ভিতরে রাখিয়াছেন।

এখন অর্জুনকে কিছুতেই আঁটিতে না পারিয়া, কর্ণ সেই দারুণ বাণ ধনুকে জুড়িয়া বসিয়াছেন। তাহার সঙ্গে সঙ্গেই, উল্কাবৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে, আকাশে আগুন ধরিয়া গিয়াছে। এ বাণ লাগিলে আর অর্জুনের রক্ষা নাই, ইহাকে আটকাইবার ক্ষমতাও কিছুরই নাই। তাই বাণ ছুঁড়িবার সময় কর্ণ বলিলেন, "অর্জুন! এইবারে তুমি গেলে!" উঃ! কি ভয়ংকর বাণ! সর্বনাশ হয় বুঝি।

এমন সময় কৃষ্ণ হঠাৎ পায়ে চাপিয়া, অর্জুনের রথখানিকে মাটির ভিতর বসাইয়া দিলেন ; ঘোড়াগুলি হাঁটু গাড়িয়া রহিল। আর কর্ণের বাণ অর্জুনের গায়ে পড়িতে পাইল না, তাঁহার সেই ইন্দ্রদত্ত আশ্চর্য মুকুটখানি গুঁড়া করিয়া দিল, অর্জুন বাঁচিয়া গিয়া সাদা পাগড়ি বাঁধিয়া লইলেন।

সাপের বাছা ঠকিয়া গিয়া বড়ই চটিল। সে কর্ণকে গিয়া বলিল, "কর্ণ, তুমি আমাকে না দেখিয়াই বাণ মারিয়াছিলে, তাই অর্জুনের মাথা কাটিতে পারি নাই। এবারে আমাকে দেখিয়া বাণ মার, নিশ্চয় উহাকে বধ করিব।"

কিন্তু কর্ণ বড় অহংকারী লোক, তিনি অন্যের সাহায্য নিতে প্রস্তুত নহেন ; কাজেই দুষ্ট সাপ নিরাশ মনে ফিরিয়া চলিল। কৃষ্ণকে ফাঁকি দিয়া সে কোথায় যাইবে? তিনি অমনি অর্জুনকে তাহার কথা বলিয়া দিলেন, আর দেখিতে দেখিতে দুষ্ট সাপ খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল। ততক্ষণে কৃষ্ণও রথখানিকে তুলিয়া লইয়াছেন, আর কি ভয়ানক যুদ্ধই চলিয়াছে! কৃষ্ণকে বারোটি আর অর্জুনকে নব্বুইটি বাণ মারিয়া, কর্ণের আনন্দের সীমা নাই। অর্জুন তাহা সহিবেন কেন? তিনি কর্ণকে তেমনি শিক্ষা দিলেন। ঐ কর্ণের মুকুট আর কুণ্ডল উড়িয়া গেল! ঐ তাঁহার বর্ম ছিন্নভিন্ন হইল! আহা! এখন না জানি ঐ দারুণ বাণগুলি তাঁহার গায়ে কিরূপ বিঁধিতেছে। রক্তে শরীর ভাসিয়া গেল। ঐ তাঁহার বুকে ভীষণ বাণ ফুটিল, আর তাঁহার জ্ঞান নাই। তখন আর অর্জুনের উদার হৃদয় তাঁহাকে বাণ মারিতে চাহিল না ; সেজন্য কৃষ্ণ তাঁহাকে তিরস্কার করিলেন।

কর্ণের জ্ঞান হইল, আবার যুদ্ধ চলিল। কিন্তু এবারে বুঝি আর তাঁহার রক্ষা নাই। ঐ তাঁহার রথের চাকা বসিয়া গেল! আহা! এই বিপদের সময় আবার বেচারা তাঁহার সেই পরশুরামের দেওয়া বড়-বড় অস্ত্রের কথা সব ভুলিয়া গিয়াছেন।

নিজেরই পাপের ফল! পরশুরামকে ফাঁকি দিয়া তিনি তাঁহার নিকট অস্ত্র শিখিতে গেলেন ; বলিলেন, "আমি ব্রাহ্মণ।" পরশুরাম যথার্থই ব্রাহ্মণ বোধে তাঁহাকে অশেষরূপ অস্ত্র-শস্ত্র দিয়া বিধিমতে যুদ্ধবিদ্যা শিখাইলেন। তারপর একদিন দেখেন কি যে এ ব্রাহ্মণ নয়, ক্ষত্রিয়! কাজেই তখন তিনি শাপ দিলেন, "মৃত্যুকালে তুই এ-সকল ভুলিয়া যাইবি।"

তারপর আর একবার দৈবাৎ এক ব্রাহ্মণের বাছুর মারিয়া ফেলাতে সেই ব্রাহ্মণ তাঁহাকে শাপ দেন, "যুদ্ধের কালে যখন তোর বড়ই আতঙ্ক হইবে, ঠিক সেই সময় তোর রথের চাকা বসিয়া যাইবে।"

সেই-সকল পুরাতন পাপের শাস্তি আজ আসিয়া একসঙ্গে উপস্থিত হইল। আহা! ঐ দেখ, তিনি হাত ছুঁড়িয়া আক্ষেপ করিতেছেন। কিন্তু বীরের

তেজ না কি বিপদেও লোপ পায় না, তাই এখনো তিনি অর্জুনের সহিত ঘোর যুদ্ধে মত্ত! ইহার মধ্যেও কৃষ্ণের হাতে তিন, আর অর্জুনকে সাত বাণ মারিতে ছাড়েন নাই। তাহাতে অর্জুনের বাণ খাইয়া মন্ত্রপূর্বক ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়িয়াছেন। তাহাতে অর্জুন ঐন্দ্রাস্ত্র মারিলে, তাহাও আটকাইয়াছেন। তারপর আবার অর্জুনের ব্রহ্মাস্ত্র প্রভৃতি অশেষ বাণে জর্জরিত হইয়াও না জানি কিরূপে কর্ণ তাঁহার ধনুকের গুণ কাটিলেন! অর্জুন তৎক্ষণাৎ নূতন গুণ পরাইয়াও, তাঁহাকে আঁটিতে না পারায় কৃষ্ণ তাঁহাকে আরো বড়-বড় অস্ত্র মারিতে বলিতেছেন।

হঠাৎ কর্ণের রথের চাকা আরো অনেক বসিয়া গেল! বেচারা, তাহা উঠাই-বার জন্য, প্রাণপণে কি টানাটানিই করিতেছেন! পৃথিবী তাহাতে চারি আঙ্গুল উঁচু হইয়া গেল, কিন্তু চাকা যে কিছুতেই উঠিতেছে না। এইবারে কর্ণের চোখে জল আসিল; তিনি অর্জুনকে বলিলেন, "অর্জুন! তুমি বড়ই ধার্মিক, আর মহাশয় লোক; একটু অপেক্ষা কর, আমার রথের চাকাটা তুলিয়া লই।"

তাহার উত্তরে কৃষ্ণ বলিলেন, "সূতপুত্র! বড় ভাগ্য যে এখন তোমার ধর্মের কথা মনে হইয়াছে! কিন্তু যখন ভীমকে বিষ খাওয়াইবার পরামর্শ দিয়াছিলে, দ্রৌপদীকে সভায় আনিয়া অপমান করিয়াছিলে, ছলপূর্বক যুধিষ্ঠিরকে পাশায় হারাইয়াছিলে, জতুগৃহে পান্ডবদিগকে পোড়াইতে গিয়াছিলে, আর সকলে মিলিয়া বালক অভিমন্যুকে বধ করিয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? এখন ধর্ম-ধর্ম করিয়া তালু ফাটাইলেও, আর তোমার রক্ষা নাই।"

এ কথার আর কি উত্তর দিবেন? তাই লজ্জায় কর্ণের মাথা হেঁট হইল! বিষমরোষে ব্রাহ্ম, আগ্নেয়, ব্যায়ব্যাদি অস্ত্র বর্ষণপূর্বক তিনি আবার যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন, এবং অচিরে ভীষণ একটা অস্ত্রে অর্জুনকে অজ্ঞান করিয়া ব্যস্তভাবে রথ হইতে নামিলেন, যদি এই অবসরে তাহার চাকা আবার উঠানো যায়। কিন্তু হায়! চাকা কিছুতেই উঠিল না।

কৃষ্ণ অর্জুনকে বলিলেন, "এই বেলা কর্ণকে মার। উহাকে রথে উঠিতে দিও না।" সে কথায় অর্জুন অঞ্জলীক নামক ভীষণ অস্ত্র গান্ডীবে জুড়িবামাত্র ভয়ে সকলের প্রাণ উড়িয়া গেল; আর দেখিতে দেখিতে সেই মহাস্ত্র ঘোর গর্জনে প্রচন্ড তেজে ছুটিয়া গিয়া কর্ণের মাথা কাটিয়া ফেলিল। তখন সকলে অবাক হইয়া দেখিলেন, কর্ণের দেহ হইতে অপরূপ দীপ্তি নির্গত হইয়া সূর্যের সহিত মিলাইয়া যাইতেছে।

আজ আর পান্ডবদের আনন্দের সীমা নাই। ভীম সিংহনাদপূর্বক নৃত্য করিতেছেন; আর সকলে শঙ্খ বাজাইয়া জয় ঘোষণায় মত্ত। বেচারা কৌরবগণ, ভয়ে বিহ্বল হইয়া, পলায়নের পথও পাইতেছে না। এমন সময় সন্ধ্যা আসিয়া পড়িল; দুর্যোধন, 'হা কর্ণ! হা কর্ণ!' বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে শিবিরে চলিলেন।

আজ সঞ্জয়ের মুখে এই সংবাদ শুনিবামাত্রই, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলেন। ভীষ্ম, দ্রোণের মৃত্যু-সংবাদেও তিনি এত ক্লেশ পান নাই।



র্ণের মৃত্যুতেও দুর্যোধন পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধি করিতে চাহিলেন না। তাঁহার পক্ষের বীরগণেরও বিলক্ষণ রণোৎসাহ দেখা গেল। সুতরাং সকলে, শল্যকে সেনাপতি করিয়া, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন।

সে রাত্রে আর তাঁহারা শিবিরে থাকেন নাই। যুদ্ধক্ষেত্রের প্রায় দুই যোজন দূরে, সরস্বতী নদীর তীরে, হিমালয়প্রস্থ নামক স্থানে, তাঁহারা রাত্রি কাটাইয়াছিলেন।

পরদিন নূতন সেনাপতি শল্য অসাধারণ বিক্রমের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। আজ এই নিয়ম হইল যে 'তাঁহাদের কেহই একাকী পাণ্ডবদিগকে আক্রমণ করিতে যাইবেন না ; সকলে মিলিয়া সাবধানে পরস্পরকে সাহায্য করা হইবে।'

মোটামুটি এইভাবেই যুদ্ধ চলিল। কিছুকাল যুদ্ধের পরই, কর্ণের পুত্র চিত্রসেন, সত্যসেন এবং সুষেণ নকুলের হাতে, এবং শল্যের পুত্র সহদেবের হাতে মারা গেলেন।

তারপর ভীমের সহিত শল্যের ঘোর গদাযুদ্ধ হয়। যুদ্ধ করিতে করিতে, শেষে দুইজনেই দুজনের গদাঘাতে অজ্ঞান হওয়ায়, কৃপাচার্য শল্যকে লইয়া প্রস্থান করিলেন, আর ভীম উঠিয়া গদা হাতে তাঁহাকে ডাকিতে লাগিলেন।

যুধিষ্ঠিরের সহিত শল্যের বারবার যুদ্ধ হয়! তখন পাণ্ডব-পক্ষের যোদ্ধারা সকলে মিলিয়াও শল্যের কিছুই করিতে পারেন নাই! অর্জুন এ সময়ে সেখানে উপস্থিত ছিলেন না ; তিনি অন্যস্থানে অশ্বত্থামা প্রভৃতির সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন। কিন্তু ইহার কিছুকাল পরে, অর্জুনের সম্মুখেই, সৈন্যেরা ভীমের নিষেধ অমান্য করিয়া, পলায়ন করিতে লাগিল।

এই সময়ে শল্যের বাণে নিজে নিতান্ত অস্থির হইয়া এবং সৈন্যদিগকে রক্তাক্ত শরীরে পলায়ন করিতে দেখিয়া, যুধিষ্ঠির প্রতিজ্ঞা করিলেন, "হয় শল্যকে বধ করিব, নাহয় নিজে প্রাণ দিব।" তারপর ভীমকে সম্মুখে অর্জুনকে পশ্চাতে এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন আর সাত্যকিকে দুপাশে লইয়া, তিনি শল্যের সহিত এমন ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন যে তাহাতে কৌরবদের আর আতঙ্কের সীমা রহিল না।

ইহার মধ্যে একবার শল্যের বাণে কঠিন বেদনা পাইয়াও যুধিষ্ঠির তাঁহাকে অজ্ঞান করিয়া দিলেন। কিন্তু শল্যের জ্ঞান হইতে অধিক সময় লাগিল না। তখন যুধিষ্ঠির তাঁহার কবচ ভেদ করিলে, তিনি উল্টিয়া যুধিষ্ঠির এবং ভীম দুইজনেরই কবচ ছিঁড়িয়া দিলেন।

এমন সময় শল্যের বাণে যুধিষ্ঠিরের ধনুক, এবং কৃপের বাণে তাঁহার সারথির মাথা কাটা গেল। ঘোড়া চারটি শল্যের বাণে মরিতেও আর বেশি বিলম্ব হইল না।

ইহাতে ভীম বিষম রোষে শল্যের ধনুক, সারথি, ঘোড়া সকল চূর্ণ করিয়া দিলেন। শল্যের বর্মও মুহূর্তেক পরেই কাটা যাওয়ায় তিনি অসি চর্ম হাতে, রথ হইতে নামিয়া, ক্রোধভরে যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করিতে গেলেন। এমন সময় ভীমের নয়টি বাণ, বিদ্যুদ্বেগে আসিয়া শল্যের খড়্গের মুষ্টি কাটিয়া ফেলিল। তথাপি তিনি যুধিষ্ঠিরের দিকে সিংহের ন্যায় ছুটিয়া চলিলে যুধিষ্ঠির মণিমণ্ডিত অতি ভীষণ করালবদন স্বর্ণময় জ্বলন্ত শক্তি গ্রহণ করিলেন।

তারপর তিনি তাঁহার বিশাল দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া, রোষভরে সেই শক্তি ছুঁড়িয়া মারিলে, শল্য তাহা লুফিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই সাংঘাতিক অস্ত্র, দেখিতে দেখিতে তাঁহার বক্ষ ভেদপূর্বক, প্রবল বেগে ভূতলে প্রবেশ করিল।

শল্যের মৃত্যুতে তাঁহার সহোদর সক্রোধে যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করিয়া মস্তক হারাইতে অধিক বিলম্ব হইল না। শল্যের সঙ্গের মদ্রদেশীয় লোকেরাও, অনেক যুদ্ধের পর পাণ্ডবদের হাতে মারা গেল। ইহার পরে আর কৌরব-সৈন্যেরা আর কিসের ভরসায় যুদ্ধ করিবে? তখন তাহারা সকলেই বুঝিল যে, আর পলায়ন ভিন্ন গতি নাই।

এ সময়ে দুর্যোধন, অনেক কষ্টে তাঁহার সৈন্যদিগকে ফিরাইয়া পাণ্ডবদিগের সহিত ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ করেন। তখন ম্লেচ্ছরাজ শাল্ব, এক ভয়ংকর হাতিতে চড়িয়া, অতি অদ্ভুত কাণ্ড করিয়াছিলেন। সৈন্যেরা তো সে হাতির ভয়ে চ্যাঁচাইয়া পলাইলই ; ভীম, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্নের মতো বীরেরাও তাহার তাড়ায় কম ব্যস্ত হইলেন না। সে হতভাগা হাতি ধৃষ্টদ্যুম্নকে এমনি তাড়া করিল যে, তিনি রথ ছাড়িয়াই দে চম্পট! বেচারা সারথি আর পলাইতে পারিল না। হাতি তাহাকে সুদ্ধ রথখানিকে আছড়াইয়া গুঁড়া করিল।

যাহা হউক, শেষে ধৃষ্টদ্যুম্নের গদায়ই হাতি মারা পড়ে। তারপরেই তীক্ষ্ন ভল্লে সাত্যকি শাল্বের মাথা কাটেন।

তারপর দুই দলে ভয়ানক যুদ্ধ চলিল। দুর্যোধন এ সময়ে খুবই বীরত্ব দেখাইলেন। শকুনিও কম যুদ্ধ করিলেন না। দশহাজার অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া তিনি দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র এবং সহদেবের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করেন। কিন্তু সেই দশহাজারের মধ্যে চারিহাজার অশ্বারোহী দেখিতে দেখিতেই মারা যাওয়াতে, তাঁহার মনে হইল যে, এখন সবেগে প্রস্থান করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

যাহা হউক, শকুনি অবিলম্বেই আবার ফিরিয়া আসিলেন। তারপর পলকের মধ্যে তাঁহার অশ্বারোহীর সংখ্যা সাতশতে নামিয়া আসায় তিনি অমনি দুর্যোধনকে গিয়া বলিলেন, "আমি অশ্বারোহীগণকে পরাজয় করিয়াছি। এখন তুমি গিয়া রথীদিগকে পরাজয় কর।"

দুর্যোধনের নিরেনব্বুই ভাইয়ের মধ্যে কেবল দুর্মর্ষণ, শ্রুতান্ত, জৈত্র, ভূরিবল, রবি, জয়ৎসেন, সুজাত, দুর্বিসহ, অরিহা, দুর্বিমোচন, দুষ্প্রধর্ষ আর শ্রুতর্বা এই বারোজন বাঁচিয়া ছিলেন। এই দিনের যুদ্ধে ভীমের হাতে তাঁহাদের মৃত্যু হইল। ইহার কিছুকাল পরেই সুশর্মা অর্জুনের বাণে, আর শকুনির পুত্র উলূক সহদেবের হাতে প্রাণত্যাগ করিলেন।

পুত্রের মৃত্যু সহ্য করিতে না পারিয়া শকুনি তখনি সহদেবকে আক্রমণ করেন, কিন্তু ভালোমতে যুদ্ধ আরম্ভ না করিতেই সহদেবের বাণে তাঁহার ধনুক কাটা যায়। তখন অসি গদা শক্তি প্রভৃতি যে অস্ত্রই তিনি হাতে করেন, সহদেব তাহাই কাটিয়া ফেলেন। কাজেই শকুনি আর এক মুহূর্তও সেখানে অপেক্ষা করিলেন না।

কিন্তু পলাইয়া তিনি যাইবেন কোথায়? সহদেব তাঁহার পিছু পিছু তাড়া করিয়া, বাণে বাণে তাঁহাকে ক্ষত-বিক্ষত করিতে লাগিলেন। তখন শকুনি একটা প্রাস লইয়া সহদেবকে আক্রমণ করিতে গেলে, সহদেব তাঁহার দুখানি হাতসুদ্ধ সেই প্রাস কাটিয়া, সিংহনাদ করিতে করিতে তাঁহার মাথায় এক ভয়ানক ভল্ল ছুঁড়িয়া মারিলেন। সে ভল্ল তাঁহার মাথা কাটিয়া, প্রাণ বাহির করিয়া দিল।

ইহার পর আর যুদ্ধের বড় বেশি বাকি রহিল না। দেখিতে দেখিতে কৌরবদিগের মধ্যে কেবলমাত্র দুর্যোধন, কৃপ, অশ্বত্থামা আর কৃতবর্মা অবশিষ্ট রহিলেন। তাঁহাদের এগারো অক্ষৌহিণী সৈন্যের সমস্তই মরিয়া শেষ হইল।

তখন রাজা দুর্যোধন, চারিদিক শূন্য দেখিয়া, প্রাণের ভয়ে পলায়নপূর্বক রণভূমির নিকটেই দ্বৈপায়ন নামক একটা হ্রদের জলে লুকাইতে চলিলেন। তখন তাঁহার মনে হইল যে, বিদুর পূর্বেই বলিয়াছিলেন, এইরূপ হইবে।

ইতিমধ্যে বেচারা সঞ্জয়, সাত্যকি আর ধৃষ্টদ্যুম্নের হাতে পড়িয়া প্রায় মারাই গিয়াছিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে কাটিতে যাইবেন, ইত্যবসরে ব্যাসদেব সেখানে আসিয়া বলিলেন, "ইহাকে ছাড়িয়া দাও।"

এই রূপে মুক্তি পাইয়া, সঞ্জয় তথা হইতে নগরের দিকে চলিয়াছেন, এমন সময়, রণস্থলের এক ক্রোশ দূরে, দুর্যোধনের সহিত তাঁহার দেখা হইল। দুই চক্ষু জলে পূর্ণ থাকায়, দুর্যোধন প্রথমে সঞ্জয়কে দেখিতে পান নাই। তারপর তাঁহার কণ্ঠস্বরে তাঁহাকে চিনিয়া বলিলেন, "সঞ্জয়, বাবাকে বলিও, আমি হ্রদের নিকট লুকাইয়া, প্রাণ বাঁচাইয়াছি।" এই বলিয়া তিনি গদা হাতে দ্বৈপায়ন হ্রদে লুকাইয়া রহিলেন।

সঞ্জয় সেখান হইতে চলিয়া যাইবার কিঞ্চিৎ পরেই কৃপ, অশ্বত্থামা আর

কৃতকর্মা তাঁহার নিকট দুর্যোধনের সংবাদ পাইয়া, সেই হ্রদের তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হ্রদের তীরে দাঁড়াইয়া তাঁহারা বলিলেন, "মহারাজ! জল হইতে উঠিয়া আইস, আমরা তিন জনে তোমাকে লইয়া পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ করিব। আজ উহারা নিশ্চয় পরাজিত হইবে।"

তাহা শুনিয়া দুর্যোধন বলিলেন, "বড় ভাগ্য যে, আপনাদিগকে জীবিত দেখিলাম! কিন্তু আমি অতিশয় ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছি, আর পাণ্ডবদিগের অনেক সৈন্য এখনো বাঁচিয়া আছে। সুতরাং আজ আমি যুদ্ধ করিতে পারিব না। আজিকার রাত্রিটি বিশ্রাম করি, কাল আপনাদিগকে লইয়া যুদ্ধ করিব।"

তখন অশ্বত্থামা বলিলেন, "মহারাজ! তুমি উঠিয়া আইস! আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, রাত্রি প্রভাত না হইতে তোমার শত্রুদিগকে বিনাশ করিব।"

এই সময়ে কয়েকজন ব্যাধ সেই হ্রদের ধারে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিল। কৃপ, অশ্বত্থামা আর কৃতবর্মা তাহাদিগকে দেখিতে পান নাই, কিন্তু তাহারা তাঁহাদের কথাবার্তা সকলই শুনিতে পাইল। সুতরাং দুর্যোধন যে সেই হ্রদের জলে লুকাইয়া রহিয়াছেন, এ কথা আর তাহাদের বুঝিতে বাকি রহিল না। একটু আগেই তাহারা পাণ্ডবদিগকে তাঁহার অন্বেষণ করিতে দেখিয়াছিল, আর তাঁহারা তাহাদিগকে দুর্যোধনের কথা জিজ্ঞাসাও করিয়াছিল। এমন সংবাদ তাঁহাদিগকে দিতে পারিলে, নিশ্চয়ই বিশেষ পুরস্কার মিলিবে, এই মনে করিয়া তাহারা অবিলম্বে ভীমের কাছে গিয়া, সকল কথা বলিয়া দিল।

পাণ্ডবদিগের তখনো দুহাজার রথী, সাতশত গজারোহী, পাঁচহাজার অশ্বারোহী আর দশহাজার পদাতি অবশিষ্ট ছিল। দুর্যোধন পলায়ন করা অবধি তাঁহারা তাঁহাকে খুঁজিয়া ক্লান্ত হইয়াছেন, কিন্তু কোথাও তাঁহার সন্ধান পান নাই। এমন সময় সেই ব্যাধেরা আসিয়া তাঁহাদিগকে সেই সংবাদ দিল।

ব্যাধদিগকে রাশি রাশি ধন দিয়া তখনি সকলে দ্বৈপায়ন হ্রদের ধারে আসিলেন। কৃপ, অশ্বত্থামা আর কৃতবর্মা, দূর হইতেই তাঁহাদের কোলাহল শুনিতে পাইয়াই, হ্রদের নিকট হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন। তারপর পাণ্ডবেরা সেখানে আসিয়া, চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এখন কি উপায়ে দুর্যোধনকে জলের ভিতর হইতে বাহির করা যায়।

দুর্যোধন বড়ই অহংকারী লোক ছিলেন, কটু কথা তিনি কিছুতেই সহিতে পারিতেন না। গালি দিলে তিনি বাহির হইয়া আসিবেন, এই ভাবিয়া যুধিষ্ঠির তাঁহাকে অতি কর্কশভাবে বলিলেন, "দুর্যোধন! তুমি যে সকলকে যমের হাতে দিয়া, নিজে প্রাণভয়ে পলায়ন করিলে, এ কাজটা ভালো হয় নাই ; আইস যুদ্ধ করি।"

এ কথার উত্তরে দুর্যোধন জলের ভিতর হইতে বলিলেন, "আমি পলায়ন করি নাই, বিশ্রাম করিতেছি। তোমরাও এখন গিয়া বিশ্রাম কর, তারপর যুদ্ধ হইবে।"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "আমাদের বিশ্রাম হইয়াছে, সুতরাং এখন আসিয়া হয় আমাদিগকে হারাইয়া রাজ্য ভোগ কর, নাহয় আমাদের হাতে মরিয়া স্বর্গে

যাও!"

দুর্যোধন বলিলেন, "আমি এখনো তোমাদিগকে পরাজয় করিতে পারি। কিন্তু আমার সব মরিয়া গেল, আর কাহার জন্য রাজ্য লইতে চাহিব? সুতরাং তোমরাই এখন রাজ্য ভোগ কর, আমি মৃগচর্ম পরিয়া বনে যাইতেছি।"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "তোমার ও কান্নায় আর আমার মন ভুলিবার নয়। এখন তুমি আমাকে রাজ্য দিবার কে? তোমাকে বধ করিয়া আমার রাজ্য কাড়িয়া লইব। আইস, যুদ্ধ করি!"

এরূপ কঠিন কথা দুর্যোধন আর তাঁহার জীবনে কখনো শোনেন নাই। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই জলের ভিতর হইতে বাহির হইয়া বলিলেন, "আমার বর্ম নাই, অস্ত্র নাই, রথ নাই; তোমাদের সকলই আছে। তোমরা সকলে আমায় ঘিরিয়া মারিলে, আমি কি করিয়া যুদ্ধ করিব? এক-একজন করিয়া আইস, দেখা যাইবে।"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "তোমার যেমন খুশি, অস্ত্র দেখিয়া লও। বর্ম পর, চুল বাঁধ; আর যাহা খুশি কর। তারপর আমাদের পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে যাহার সহিত ইচ্ছা যুদ্ধ কর। সেই একজনকে পরাজয় করিতে পারিলেই, সমুদয় রাজ্য তোমার হইবে।"

তখন দুর্যোধন বর্ম আর পাগড়ি পরিয়া, গদা হাতে লইয়া বলিলেন, "আমি এই গদা লইয়া যুদ্ধ করিব। তুমি বা ভীম বা অর্জুন বা নকুল বা সহদেব, যাহার খুশি, আসিয়া আমার সহিত গদাযুদ্ধ কর। ন্যায় মতে গদাযুদ্ধ করিয়া, তোমাদের কেহ আমার সঙ্গে পারিবে না। সত্য কি মিথ্যা, এখনি দেখিতে পাইবে।"

এই সময়ে কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, "আপনি কোন সাহসে দুর্যোধনকে আপনাদের যাহার সহিত ইচ্ছা যুদ্ধ করিতে বলিলেন? দুরাত্মা যদি আপনাকে, অর্জুনকে, নকুলকে বা সহদেবকে আক্রমণ করিয়া বসিত, তাহা হইলে আপনাদের কিরূপ দশা হইত? ভীমও গদাযুদ্ধে দুর্যোধনকে আঁটিতে পারে কি না সন্দেহ। ভীমের বল আর তেজ বেশি, কিন্তু দুর্যোধনের শিক্ষা অধিক, আর শিক্ষাতেই হারজিত। এখন বুঝিলাম যে, পাণ্ডবদের কপালে রাজ্য লাভ নাই, বিধাতা উহাদিগকে বনে থাকিবার জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন।"

এমন সময় ভীম গদা হাতে লইয়া দুর্যোধনকে বলিলেন, "ওরে নরাধম! সকল দুরাত্মা মরিয়া এখন কেবল তুমিই অবশিষ্ট রহিয়াছ; আজ এই গদার প্রহারে তোমাকেও বধ করিয়া, আমাদের সকল দুঃখের শোধ লইব!"

দুর্যোধন বলিলেন, "আর বড়াই করিও না! এখনি তোমার যুদ্ধের সাধ মিটাইয়া দিব। ন্যায় মতে গদাযুদ্ধে ইন্দ্রও আমাকে পরাজয় করিতে পারেন না। আইস দেখি, তোমার কত বিদ্যা!"

দুজনে প্রাণ ভরিয়া গালাগালি চলিতেছে, এমন সময় বলরাম সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভীম ও দুর্যোধন দুইজনেই বলরামের ছাত্র, তিনিই ইঁহাদের গদা শিক্ষার গুরু। সুতরাং, যুদ্ধের সময় তাঁহাকে উপস্থিত দেখিয়া

দুজনেরই খুব উৎসাহ হইল।

কুরুক্ষেত্র অতি পবিত্র স্থান, সেখানে মৃত্যু হইলে স্বর্গলাভ হয়। এইজন্য বলরাম বলিলেন যে, যুদ্ধ দ্বৈপায়ন হ্রদের ধারে না হইয়া কুরুক্ষেত্রে হওয়াই ভালো। তখন সকলে সেখান হইতে কুরুক্ষেত্রে আসিয়া, যুদ্ধের জন্য একটি স্থান দেখিয়া লইলেন।

তারপর দুজনে, দুই মত্ত হস্তীর ন্যায় গর্জন করিতে করিতে, কি ঘোর যুদ্ধই আরম্ভ করিলেন। সকলে স্তব্ধভাবে চারিদিকে বসিয়া সেই অদ্ভুত যুদ্ধ দেখিতে লাগিল।

সে কালের লোকেরা আগে খুব এক চোট বাক্য-যুদ্ধ, অর্থাৎ গালাগালি, না করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিত না। সুতরাং প্রথমে তাহাই কিছুকাল চলিল। তারপর ভীষণ ঠকাঠক শব্দে রণস্থল কাঁপাইয়া উভয়ে উভয়কে আঘাত করিতে লাগিলেন। সে সময়ে তাঁহাদের গদা হইতে ক্রমাগত আগুন বাহির হইতেছিল।

সে যুদ্ধের কি অদ্ভুত কৌশল! মণ্ডল, গতি, প্রত্যাগতি, অস্ত্র, যন্ত্র, পরিমোক্ষ, প্রহার, বঞ্জন, পরিবারণ, অভিদ্রাবণ, আক্ষেপ, বিগ্রহ, পরাবর্তন, সংবর্তন, অবপ্লুত, উপপ্লুত, উপন্যস্ত প্রভৃতি অশেষ প্রকার কৌশল দেখাইয়া তাঁহারা যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এ-সকল কৌশলে দুর্যোধনেরই অধিক ক্ষমতা দেখা গেল। তিনি একবার ভীমের বুকে এমনি গদা প্রহার করিলেন যে, কিছুকাল পর্যন্ত তাঁহার নড়িবার শক্তি রহিল না। যাহা হউক, ইহার পরেই ভীমও, এক গদাঘাতে দুর্যোধনকে অজ্ঞান করিলেন।

খানিক পরে দুর্যোধন উঠিয়াই, ভীমের কপালে এমন গদার আঘাত করিলেন যে, সে স্থান হইতে দর দর ধারে রক্ত পড়িতে লাগিল। কিন্তু ভীমের দেহে এমনি অসাধারণ শক্তি ছিল যে, সেই সাংঘাতিক আঘাতেও তাঁহার কিছুই হইল না। তাহার পরেই দেখা গেল যে, দুর্যোধন ভীমের গদার চোটে ঘুরিতে ঘুরিতে পড়িয়া যাইতেছেন। তখনি আবার দুর্যোধনের আঘাতে ভীমেরও সেই দশা হইল! তখন দুর্যোধন ঘোরনাদে পুনরায় গদাঘাত করত ভীমের কবচ ছিঁড়িয়া দিলেন। সে আঘাতের বেগ ভীম সহজে সামলাইতে পারিলেন না।

এতক্ষণে কৃষ্ণ স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে, ন্যায় যুদ্ধে ভীমের দুর্যোধনকে পরাজয় করা অসম্ভব। সুতরাং তিনি অন্যায় যুদ্ধেই তাঁহাকে বধ করিতে পরামর্শ দিলেন। তখন অর্জুন ইঙ্গিত করামাত্র ভীম বুঝিতে পারিলেন যে, দুর্যোধনের ঊরু ভাঙিয়া তাঁহাকে সংহার করিতে হইবে। গদাযুদ্ধে নাভির নীচে আঘাত নিষিদ্ধ বটে, কিন্তু ইহা ভিন্ন দুর্যোধনকে বধ করা যাইতেছে না। সুতরাং ভীম এইটুকু অন্যায় করিয়াই নিজের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে প্রস্তুত হইলেন।

আবার যুদ্ধ চলিল। তারপর উভয়েই ক্লান্ত হইয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিলেন। তারপর আবার যুদ্ধ চলিল। এই সময়ে ভীম ইচ্ছা করিয়াই দুর্যোধনকে একটু আঘাতের সুযোগ দিলেন। তাহাতে দুর্যোধন প্রবল বেগে ভীমকে আক্রমণ করিতে আসিবামাত্র ভীম তাঁহাকে গদা ছুঁড়িয়া মারিলেন ; দুর্যোধন বিদ্যুতের

মতো সেই গদা এড়াইয়া ভীমকে সাংঘাতিকভাবে আঘাত করিলেন। যাহা হউক, ভীম সেই ভয়ানক আঘাতও আশ্চর্যরূপে সহিয়া রহিলেন। তাঁহার শান্তভাব দেখিয়া দুর্যোধনের মনে হইল বুঝি তাঁহার কি অভিসন্ধি আছে। সুতরাং তিনি তাঁহাকে আর আঘাত না করিয়াই ত্বরায় ফিরিয়া আসিলেন।

তারপর কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া, ভীম অসীম রোষে দুর্যোধনকে আক্রমণ করিতে ছুটিলেন। দুর্যোধন তাঁহাকে এড়াইবার জন্য লাফ দিয়া শূন্যে উঠিবামাত্র ভীম দারুণ গদাঘাতে তাঁহার দুই ঊরু ভাঙিগয়া দিলেন। তখন ভগ্নপদে নিতান্ত অসহায়ভাবে দুর্যোধনকে ধরাশায়ী হইতে হইল। অমনি ভীম তাঁহার মাথায় পদাঘাতপূর্বক বলিলেন, "রে দুরাত্মা! সভার মধ্যে 'গোরু গোরু' বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছিলি, আর দ্রৌপদীকে অপমান করিয়াছিলি, তাহার এই সাজা।" এইরূপে গালি দিতে দিতে ভীম দুর্যোধনের মাথায় আবার পদাঘাত করিলেন।

ভীমের এই ব্যবহারে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া, যুধিষ্ঠির তাঁহাকে বলিলেন, "ভীম! সৎ উপায়েই হউক, আর অসৎ উপায়েই হউক, তোমার প্রতিজ্ঞা তুমি রাখিয়াছ ; এখন ক্ষান্ত হও। ইহার মাথায় পদাঘাত করিয়া আর পাপ কেন বাড়াও? ইহার অবস্থা দেখিলে এখন বড়ই দুঃখ হয়। এ আমাদের ভাই ; তুমি ধার্মিক হইয়া কেন উহাকে পদাঘাত করিতেছ?"

তারপর তিনি দুর্যোধনকে বলিলেন, "ভাই, তুমি দুঃখ করিও না। তোমার দোষেই যুদ্ধ হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু তুমি দেহত্যাগপূর্বক এখনি স্বর্গে যাইবে, আর আমরা এখানে সুহৃদ্‌গণের শোকে চিরকাল দারুণ দুঃখ ভোগ করিব।"

এই বলিয়া যুধিষ্ঠির চোখের জল ফেলিতে লাগিলেন।

ভীমের কাজটি অতি অন্যায় হইয়াছিল ; উপস্থিত যোদ্ধারাও ইহাতে সন্তুষ্ট হন নাই। বলরাম তো লাঙগল উঠাইয়া, তখনি ভীমকে বধ করিতে চাহিয়াছিলেন। কৃষ্ণের অনেক চেষ্টায় তিনি তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার রাগ দূর হইল না। তিনি কৃষ্ণকে বলিলেন, "তুমি যত চেষ্টাই কর না কেন, ভীম যে নিতান্ত অন্যায় করিয়াছেন, এ বিশ্বাস আমার মন হইতে দূর করিতে পারিবে না।"

এই বলিয়া বলরাম সেখান হইতে চলিয়া গেলে, যোদ্ধারা সকলে মিলিয়া দুর্যোধনের মৃত্যুতে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "হে ভীম! আজ তুমি দুষ্ট দুর্যোধনকে মারিয়া বড়ই ভালো কাজ করিলে। আমাদের ইহাতে যারপরনাই আনন্দ হইয়াছে।"

তখন কৃষ্ণ সেই যোদ্ধাদিগকে বলিলেন, "যে শত্রু মরিতে বসিয়াছে তাহাকে বকিলে কি হইবে? এ দুষ্ট এখন শত্রুতা বা বন্ধুতা কিছুরই উপযুক্ত নহে। আমাদের ভাগ্যের জোরে এত দিনে পাপী মারা গেল, এখন চল আমরা এ স্থান হইতে প্রস্থান করি।"

এ কথায় দুর্যোধন, দুহাতে মাটিতে ভর দিয়া, মাথা তুলিয়া, কৃষ্ণকে

বলিলেন, "হে কংসের দাসের পুত্র! তোমার দুষ্ট বুদ্ধিতেই আমাদের বীরেরা মারা গেলেন। তোমার মতো পাপী, নির্দয় আর নির্লজ্জ কে আছে?"

তাহার উত্তরে কৃষ্ণ বলিলেন, "তুমি অনেক পাপ করিয়াছ এখন তাহারই ফল ভোগ কর।"

তাহাতে দুর্যোধন বলিলেন, "রাজার যে সুখ, তাহা আমি ভালো মতোই ভোগ করিয়াছি। এখন আমি সবান্ধবে স্বর্গে চলিলাম, তোমরা শোকে দুঃখে আধমরা হইয়া এই পৃথিবীতে পড়িয়া থাক।"

এ কথা বলিবামাত্র স্বর্গ হইতে দুর্যোধনের উপর পুষ্পবৃষ্টি আরম্ভ হইলে পান্ডবেরা লজ্জিতভাবে শিবিরে ফিরিয়া চলিলেন। কিন্তু সে রাত্রিতে তাঁহাদের সকলের শিবিরের ভিতরে থাকা হইল না। কৃষ্ণের পরামর্শে, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব আর সাত্যকি তাঁহার সহিত শিবির ছাড়িয়া নদীর ধারে আসিয়া নিদ্রার আয়োজন করিলেন।

ইহার কিছুকাল পরেই কৃপ, অশ্বত্থামা আর কৃতবর্মা, দুর্যোধনের উরুভঙ্গের সংবাদ পাইয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দুর্যোধনের তখনকার অবস্থা দেখিয়া, সেই তিন বীরের বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল! তাঁহারা তাঁহার কাছে বসিয়া অনেক কাঁদিলে, দুর্যোধন তাঁহাদিগকে বলিলেন, "আপনারা আমার জন্য দুঃখ করিবেন না; আমি নিশ্চয়ই স্বর্গলাভ করিব। আপনারা প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছেন; কিন্তু আমার ভাগ্যে জয়লাভ ছিল না, কি করিব?"

এই কথা বলিয়া দুর্যোধন চুপ করিলে, অশ্বত্থামা দুঃখে ও রাগে অস্থির হইয়া বলিলেন, "আমাকে অনুমতি দাও, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আজ যেমন করিয়া হউক, শত্রুদিগকে মারিয়া শেষ করিব।"

এ কথায় দুর্যোধন তখনই অশ্বত্থামাকে সেনাপতি করিয়া দিলে তাঁহাকে সেই অবস্থায় রাখিয়াই, তিন বীর সিংহনাদ করিতে করিতে সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন।



র্যোধনের এখন নিতান্তই দুর-বস্থা। নিজে তো মরিতেই চলিয়াছেন ; তাঁহার পক্ষের যোদ্ধাদের মধ্যেও তিনজনমাত্র জীবিত।

এই তিনটি লোকে কি করিতে পারে? তাঁহারা দুর্যোধনের দুর্দশা আর পাণ্ডবদের পরাক্রমের কথা চিন্তা করিতে করিতে রথে চড়িয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, কিন্তু শত্রুসংহারের কোনো উপায় দেখিতেছেন না। তাঁহারা চুপি-চুপি শিবিরের কাছে গেলেন কিন্তু সেখানে পাণ্ডবদের সিংহ-নাদ শুনিয়া তাঁহাদের ভয় হইল। তারপর ঘুরিতে ঘুরিতে তাঁহারা একটা বনের ভিতরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সারাদিনের কঠিন পরিশ্রমের পর নিজেরাও অতিশয় ক্লান্ত, ঘোড়াগুলিও আর চলিতে পারে না। এখন একটু বিশ্রাম না করিলেই নয়। তাই সেই বনের ভিতরে একটা প্রকাণ্ড বটগাছ দেখিতে পাইয়া, তাঁহারা রথ হইতে নামিলেন। নিকটেই জলাশয় ছিল। ঘোড়াগুলিকে খুলিয়া দিয়া, তাঁহারা সেই জলাশয়ে মুখ হাত ধুইয়া, সন্ধ্যাপূজা সারিয়া, বটগাছের নীচে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণের ভিতরে কৃপ আর কৃতবর্মার ঘুম আসিল। কিন্তু দুঃখে আর চিন্তায় অশ্বত্থামার ঘুম হইল না। তিনি চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন।

রাত্রি হইয়াছে ; গাছের ডালে কাকেরা তাহাদের বাসায় সুখে নিদ্রা যাইতেছে। এমন সময় কোথা হইতে একটা প্রকাণ্ড পেচক আসিয়া, ঘুমের ভিতরে, অসহায় অবস্থায়, সেই কাকগুলিকে বধ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে পেচক কাকগুলিকে মারিয়া শেষ করিল, একটিও অবশিষ্ট রহিল না।

এই ঘটনা দেখিয়া অশ্বত্থামার মনে হইল, 'তাই তো আমিও তো এই উপায়ে শত্রুদিগকে বধ করিতে পারি।' ইহার পর আর অশ্বত্থামা চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি তখনই কৃপকে ডাকিয়া বলিলেন, "মামা! এইরূপ করিয়া আমরাও শত্রুদিগকে বধ করিব।"

কৃপাচার্য প্রথমে কিছুতেই এমন কাজে মত দেন নাই, কিন্তু ভাগিনেয়ের পীড়াপীড়িতে শেষটা তাঁহাকে সম্মত হইতে হইল। তখন তিনজনে মিলিয়া,

সেই নিষ্ঠুর পাপকার্য সাধনের জন্য, পাণ্ডব-শিবিরের দিকে যাত্রা করিলেন।

পাণ্ডব-শিবিরের কাছে আসিয়া অশ্বত্থামা দেখিলেন যে, একজন অতিশয় উজ্জ্বল পুরুষ শিবিরের দরজায় দাঁড়াইয়া আছেন। সেই উজ্জ্বল পুরুষ স্বয়ং মহাদেব ; কিন্তু অশ্বত্থামা তাঁহাকে চিনিতে না পারিয়া, তাঁহাকে সেখান হইতে তাড়াইবার জন্য, বাণ মারিতে লাগিলেন।

অস্ত্রে মহাদেবের কি হইবে? অশ্বত্থামা বাণ, শাক্ত, আস, গদা, যাহা কিছু মারিলেন, সমস্তই সেই উজ্জ্বল পুরুষ গিলিয়া ফেলিলেন। অশ্বত্থামা সকল ক্ষমতা শেষ করিয়া, তারপর আর কি করিবেন, ঠিক করিতে পারিলেন না।

এমন সময় তাঁহার মনে হইল, 'শিবের পূজা করি, তাহা হইলে আমার কাজ হইবে।'

এই মনে করিয়া তিনি শিবের স্তব করিতে করিতে, নিজ শরীর উপহার দিয়া তাঁহাকে তুষ্ট করিবার জন্য, আগুন জ্বালিয়া তাহাতে ঝাঁপ দিলেন। তখন শিব সন্তুষ্ট না হইয়া আর যান কোথায়? তিনি কেবল যে দরজা ছাড়িয়া দিলেন, তাহা নহে, তাঁহাকে একখানি ধারালো খড়্গও দিলেন, এবং নিজে তাঁহার শরীরে প্রবেশ করিয়া, তাঁহার বল বাড়াইতে ত্রুটি করিলেন না।

তারপর যাহা ঘটিল, বলিতে বড়ই ক্লেশ বোধ হয়। অশ্বত্থামা সেই খড়্গ হাতে শিবিরে প্রবেশ করিলেন ; কৃপ আর কৃতবর্মাকে দরজায় রাখিয়া গেলেন, যেন কেহ পলাইয়া যাইতে না পারে।

শিবিরে প্রবেশ করিয়াই অশ্বত্থামা সকলের আগে ধৃষ্টদ্যুম্নের ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। যে তাঁহার পিতাকে এমন নিষ্ঠুরভাবে বধ করিয়াছিল, তাহার উপর রাগ হওয়াই স্বাভাবিক। সেই রাগেই তিনি সকলের আগে, ধৃষ্টদ্যুম্নকে মারিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন।

সুন্দর কোমল শয্যার উপরে ধৃষ্টদ্যুম্ন নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাইতেছেন, এমন সময় অশ্বত্থামার পদাঘাতে তাঁহার ঘুম ভাঙিগয়া গেল। তিনি চমকিয়া উঠিয়া বসিবামাত্র, অশ্বত্থামা তাঁহাকে চুলে ধরিয়া মাটিতে আছড়াইতে লাগিলেন। তারপর তাঁহার গলা টিপিয়া ধরিয়া, বুকে লাথি মারিতে আরম্ভ করিলে, ধৃষ্টদ্যুম্ন অনেক কষ্টে বলিলেন, "আমাকে অস্ত্রাঘাতে শীঘ্র সংহার কর।" কিন্তু অশ্বত্থামা তাহা না শুনিয়া পদাঘাতে তাঁহার প্রাণ শেষ করিলেন।

ধৃষ্টদ্যুম্নের চীৎকারে সকলে জাগিয়া উঠিয়া কোলাহল করিতে লাগিল। স্ত্রীলোকেরা কাঁদিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু সেই ভীষণ রাত্রে ঘুমের ঘোরে, বিষম ত্রাসে কেহই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না, কি হইয়াছে।

এদিকে অশ্বত্থামা অস্ত্র হাতে সাক্ষাৎ শমনের ন্যায় সকলকে সংহার করিতেছেন। যোদ্ধারা যুদ্ধ করিবে কি? একে রাত্রিকাল, তাহাতে নিদ্রাকালে হঠাৎ আক্রমণ ; হতভাগ্যেরা ভালোমতে প্রস্তুত হওয়ার পূর্বেই, অশ্বত্থামা তাহাদিগকে আক্রমণপূর্বক বধ করিতে লাগিলেন।

সে নিষ্ঠুর নীচ ভীষণ কার্যের আর বর্ণনা করিয়া কি হইবে? শিবিরে যত লোক ছিল, স্ত্রীলোক ভিন্ন আর তাহাদের একজনও রক্ষা পাইল না।

পাণ্ডবদিগের পুত্রকয়টিকে অবধি অশ্বত্থামা নির্দয়ভাবে বিনাশ করিলেন। তিনি চুপি চুপি চোরের ন্যায় প্রবেশ করিবার সময় শিবির যেমন নিস্তব্ধ ছিল, দেখিতে দেখিতে আবার তাহা সেইরূপ নিস্তব্ধ হইয়া গেল। তখন তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার কার্য সম্পন্ন হইয়াছে, রাত্রিও শেষ হইয়াছে।

তারপর বাহিরে আসিয়া, অশ্বত্থামা কৃপ এবং কৃতবর্মাকে নিজ কীর্তি শুনাইলেন, আর জানিতে পারিলেন যে, তাঁহারা উভয়ে মিলিয়া একটি প্রাণীকেও পলায়ন করিতে দেন নাই। তখন তিনজনে মনের আনন্দে করতালি দিয়া কোলাহল করিতে লাগিলেন। এমন কাজের সংবাদটা দুর্যোধনকে তখনই জানানো চাই; সুতরাং তাঁহারা তাঁহার নিকট আসিতে আর তিলমাত্র বিলম্ব করিলেন না।

হায় মহারাজ দুর্যোধন! এখন তিনি কি করিতেছেন? এখনো তিনি মৃত্যুর অপেক্ষায় রণস্থলে শয়ান। প্রাণ বাহির হইতে বিলম্ব নাই, জ্ঞান লোপ হইয়া আসিতেছে, মুখ দিয়া ক্রমাগত রক্ত বাহির হইতেছে! বৃক প্রভৃতি ভয়ানক জন্তুগণ আসিয়া তাঁহার মাংসের লোভে তাঁহাকে ঘেরিয়াছে, তিনি দারুণ যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতে, অতি কষ্টে তাহাদিগকে বারণ করিতেছেন।

তাঁহার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া সেই তিন বীর আর চোখের জল থামাইয়া রাখিতে পারিলেন না। একাদশ অক্ষৌহিণীর যিনি অধিপতি ছিলেন, তাঁহার কিনা এই দশা! আর সেই বীরের মাংস খাইবার জন্য, বন্যজন্তুরা তাঁহাকে ঘেরিয়াছে! যাহা হউক, এ-সব কথা ভাবিয়া আর কি হইবে? এখন যে সংবাদ লইয়া তিনজন আসিয়াছিলেন তাহা তাঁহাকে শোনানো হউক। এই ভাবিয়া অশ্বত্থামা তাঁহাকে বলিলেন, 'হে কুরুরাজ! যদি জীবিত থাকেন, তবে এই আনন্দের সংবাদ শ্রবণ করুন। এখন পাণ্ডব-পক্ষে পাঁচ পাণ্ডব, কৃষ্ণ আর সাত্যকি, এই সাতজনমাত্র জীবিত। আজ রাত্রে আমি তাহাদের শিবিরে প্রবেশ করিয়া, আর সকলকে বধ করিয়াছি।"

এ কথায় দুর্যোধন চক্ষু মেলিয়া বলিলেন, "হে বীর! ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, যাহা করিতে পারেন নাই, আজ তুমি তাহা করিলে। তোমাদের কথা শুনিয়া নিজকে ইন্দ্রের ন্যায় সুখী মনে করিতেছি। এখন তোমাদের মঙ্গল হউক; আবার স্বর্গে দেখা হইবে।" এই বলিয়া দুর্যোধন সেই তিনজনকে আলিঙ্গন করিলে, তাঁহার আত্মা দেহ ছাড়িয়া স্বর্গে চলিয়া গেল।

ইহার কিঞ্চিৎ পরে সঞ্জয় কাঁদিতে কাঁদিতে এই সংবাদ লইয়া হস্তিনায় উপস্থিত হইলেন। সেদিন আর তিনি অন্যদিনের মতো স্থিরভাবে তাঁহার কথা বলিতে পারিলেন না। ধৃতরাষ্ট্রের পুরীতে প্রবেশমাত্রই, তিনি দুহাত তুলিয়া, "হা মহারাজ! হা মহারাজ!" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। তারপর তাঁহার মুখে সেই দারুণ সংবাদ শুনিয়া, সকলের, বিশেষত ধৃতরাষ্ট্র আর গান্ধারীর, যে অবস্থা হইল, তাহা বর্ণনাতীত। সে সংবাদে কেহ অজ্ঞান কেহ-বা হতবুদ্ধি হইয়া গেল। অনেকে পাগলের ন্যায় ছুটাছুটি করিতে লাগিল।

তারপর এমন কান্না আরম্ভ হইল যে. তাহা শুনিলে বুঝি পাথরও গলিয়া যায়।

এদিকে রাত্রির সেই ভীষণ ব্যাপারের সংবাদ পাইয়া, পাণ্ডবগণের কিরূপ কষ্ট হইল, তাহা আর বলিয়া কি হইবে? নকুল তখনই দ্রৌপদীকে আনিতে পাঞ্চাল দেশে চলিয়া গেলেন। দ্রৌপদী আসিলে পর অনেকক্ষণ পর্যন্ত এমন-ভাবে কাটিল যে, সে দুঃখের আর তুলনা নাই। দ্রৌপদী কাঁদিতে কাঁদিতে রাগে অস্থির হইয়া বলিলেন, "আজ যদি সেই পামরকে সংহার করা না হয়. তবে অনাহারে প্রাণত্যাগ করিব।"

যুধিষ্ঠির তখন তাঁহাকে বুঝাইতে অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তিনি তাহাতে শান্ত না হইয়া বলিলেন, "শুনিয়াছি অশ্বত্থামার জন্মাবধি তাহার মাথায় একটা মণি আছে। ঐ দুরাত্মার প্রাণ বধপূর্বক সেই মণি আনিয়া দিতে পারিলে, আমি তাহা তোমাকে পরাইয়া কিঞ্চিৎ শান্ত হইতে পারি।"

তিনি ভীমকেও বলিলেন, "অশ্বত্থামাকে মারিয়া এই মণি আনিয়া দিতে হইবে।" এ কথা বলামাত্রই ভীম নকুলকে সারথি করিয়া অশ্বত্থামার খোঁজে বাহির হইলেন। অশ্বত্থামার রথের চাকার দাগ স্পষ্টই দেখা যাইতেছিল, সুতরাং তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করা তেমন কঠিন কাজ বলিয়াও বোধ হইল না।

কিন্তু ভীমকে অশ্বত্থামার খোঁজে যাইতে দেখিয়া কৃষ্ণের বড়ই চিন্তা হইল। তিনি জানিতেন যে অশ্বত্থামাকে দ্রোণ ব্রহ্মশির নামক অস্ত্র দিয়া-ছিলেন। উহা এমনই ভয়ংকর যে, তাহার বদলে অশ্বত্থামা কৃষ্ণের চক্র চাহি-তেও লজ্জাবোধ করেন নাই। অশ্বত্থামা রাগের ভরে ভীমের উপরে এই অস্ত্র মারিয়া বসিলে, তাঁহার রক্ষা থাকিবে না। সুতরাং কৃষ্ণ তখনই, যুধিষ্ঠির আর অর্জুনকে লইয়া রথারোহণে ভীমের অনুগামী হইলেন। ভীমকে পাইতেও তাঁহাদের বিলম্ব হইল না। কিন্তু তিনি কি নিষেধ শুনিবার লোক? তিনি তাঁহাদের কথা না শুনিয়াই ছুটিয়া চলিলেন। তারপর গঙ্গার ধারে আসিয়া অশ্বত্থামাকে ব্যাসদেবের নিকট দেখিবামাত্র তিনি, "দাঁড়া বামুন, দাঁড়া!" বলিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে গেলেন।

অশ্বত্থামা দেখিলেন বড়ই বিপদ। একা ভীম হইতেই রক্ষা নাই, তাহাতে আবার ভীমের পশ্চাতে কৃষ্ণ, অর্জুন আর যুধিষ্ঠিরকেও দেখা যাইতেছে। কাজেই তিনি তখন প্রাণভয়ে তাড়াতাড়ি "পাণ্ডব বংশ নষ্ট হউক!" বলিয়া, সেই ব্রহ্মশির অস্ত্র ছুঁড়িয়া বসিলেন। তখন সর্বনাশ উপস্থিত দেখিয়া, কৃষ্ণ অর্জুনকে বলিলেন, "শীঘ্র তোমার দ্রোণদত্ত সেই মহাঅস্ত্র ছাড়।"

অর্জুন তৎক্ষণাৎ, "এই অস্ত্রে অশ্বত্থামার অস্ত্র বারণ হউক।" বলিয়া তাঁহার অস্ত্র ছাড়িলেন। অমনি সেই দুই অস্ত্রের তেজে এমন ভয়ংকর গর্জন, উল্কাবৃষ্টি আর বজ্রপাত আরম্ভ হইল যে, সকলে ভাবিল, বুঝি সৃষ্টি নষ্ট হয়।

তখন নারদ আর ব্যাসদেব, সৃষ্টি রক্ষার জন্য, সেই দুই অস্ত্রের মাঝখানে দাঁড়াইয়া অর্জুন এবং অশ্বত্থামাকে শীঘ্র তাঁহাদের অস্ত্র থামাইতে বলিলেন। অর্জুন বলিলেন, "অশ্বত্থামার অস্ত্র বারণের জন্য আমি অস্ত্র ছুঁড়িয়াছিলাম।

আমার অস্ত্র থামাইলেই উহার অস্ত্র আমাদিগকে ভস্ম করিবে। অতএব যাহাতে সকলে রক্ষা পাই আপনারা তাহা করুন।”

এ কথা বলিয়াই অর্জুন তাঁহার অস্ত্র থামাইয়া দিলেন। অতিশয় সত্যবাদী সাধুপুরুষ না হইলে সে অস্ত্র থামাইতে পারে না। মনের ভিতরে কিছু-মাত্র মন্দভাব লইয়া উহা থামাইতে গেলে, উহাতে তৎক্ষণাৎ নিজেরই মাথা কাটা যায়। অর্জুন অসাধারণ সাধুপুরুষ ছিলেন, তাই তিনি ইচ্ছামাত্রই তাঁহার অস্ত্র থামাইয়া দিলেন।

কিন্তু অশ্বত্থামা তাঁহার অস্ত্র থামাইতে না পারিয়া, মুনিদিগকে বলিলেন, “আমি ভীমের ভয়ে অস্ত্র ছাড়িয়াছিলাম, এখন তো আর থামাইতে পারিতেছি না; বড় অন্যায় কাজ করিয়াছি; এ অস্ত্র নিশ্চয়ই পাণ্ডবদিগকে বিনাশ করিবে।”

কিন্তু মুনিরা এরূপ অন্যায় কথায় কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তাঁহারা বলিলেন, “অর্জুন যখন তাঁহার অস্ত্র ফিরাইয়া লইয়াছেন, অশ্বত্থামারও পাণ্ডব-দিগকে রক্ষা করা নিতান্ত উচিত।”

বাস্তবিকই, কেবল পাণ্ডবদেরই ক্ষতি হইবে, অশ্বত্থামার কিছুই হইবে না, এমন হইলে অর্জুন তাঁহার অস্ত্র থামাইতে রাজি হইবেন কেন? অথচ এদিকে অশ্বত্থামার নিজের অস্ত্র থামাইবার শক্তি না থাকায় পাণ্ডবদিগের কিছু ক্ষতি না হইয়া যাইতেছে না। এ অবস্থায় অশ্বত্থামারও কিছু ক্ষতি হওয়া উচিত। সুতরাং শেষে এইরূপ স্থির হইল যে, অশ্বত্থামার অস্ত্রে অভিমন্যুর শিশু-পুত্রটি মারা যাইবে; আর অশ্বত্থামা তাঁহার মাথার মণি পাণ্ডবদিগকে দিবেন।

এইরূপে পাণ্ডবেরা অশ্বত্থামার মাথার মণি আনিয়া দ্রৌপদীকে দিলে, সেই মণি যুধিষ্ঠিরের মাথায় পরাইয়া, এত দুঃখের ভিতরেও তিনি কিঞ্চিৎ সুখ পাইলেন।

আর অভিমন্যুর সেই পুত্রটির কি হইল? শিশুটি তখনো জন্মে নাই, সেই অবস্থায়ই সে মারা গেল। তাহার জন্মের পর মরা ছেলে দেখিয়া সকলে কাঁদিতে আরম্ভ করিলে, কৃষ্ণ আসিয়া তাহাকে বাঁচাইয়া দিলেন। ছেলেটির নাম হইল পরীক্ষিৎ। যুধিষ্ঠিরের পরে এই পরীক্ষিৎ হস্তিনায় ষাট বৎসর রাজত্ব করিয়াছিল।



ঠারো দিনের পর কুরুক্ষেত্রের সেই ভীষণ যুদ্ধের শেষ হইল। আঠারো অক্ষৌহিণী লোক এই যুদ্ধে প্রাণ দিয়াছে। এখন সেই-সকল যোদ্ধার ঘরে ঘরে শোকের আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কেবল শোক করিয়া তো আর চলিবে না, মৃত লোকদের শ্রাদ্ধাদির আয়োজন করা চাই।

একশত পুত্রের শোক কি সহজ কথা? সামলাইয়া উঠিতে ধৃতরাষ্ট্রের বড়ই কষ্ট হইল। ব্যাস, বিদুর প্রভৃতি অনেকে বুঝাইয়াও তাঁহাকে সহজে শান্ত করিতে পারিলেন না।

যাহা হউক, অনেক কষ্টে শেষে তিনি কতক স্থির হইলেন, আর পান্ডবদের উপরও তাঁহার রাগ অনেকটা কমিল। ব্যাস তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, "তোমার পুত্রেরা নিতান্তই দুরাচার ছিল। তাহাদের দোষেই এই সর্বনাশ হইয়াছে; পান্ডবদের ইহাতে কিছুমাত্র অপরাধ নাই।"

তারপর শ্রাদ্ধের সময় উপস্থিত হইলে, সঞ্জয় আর বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে বুঝাইয়া বলিলেন, "মহারাজ, এখন শ্রাদ্ধাদির সময় উপস্থিত। শোকের মোহে সে-সকল কার্যে অবহেলা করিবেন না।"

তখন ধৃতরাষ্ট্র, পরিবারের স্ত্রী-পুরুষ সকলকে লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে যাত্রা করিলেন। কুলবধূগণ বিধবার বেশে পথে বাহির হইলে পৃথিবীসুদ্ধ লোক তাঁহাদের দুঃখে কাঁদিয়া আকুল হইল।

এদিকে পান্ডবেরাও, কৃষ্ণ, সাত্যকি আর দ্রৌপদী প্রভৃতিকে লইয়া কুরু-ক্ষেত্রের দিকে আসিতেছিলেন। কিছুদূর আসিয়া ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতির সহিত তাঁহাদের দেখা হইবামাত্র কৌরব-নারীগণের দুঃখ যেন দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল, কেননা পান্ডবেরাই এই দুঃখের কারণ।

পান্ডবেরা একে একে ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে যাইয়া নিজ নিজ নাম বলিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। ধৃতরাষ্ট্র বিরক্তভাবে যুধিষ্ঠিরকে আলিঙ্গন ও তাঁহার সহিত দু-একটি কথা কহিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভীম কোথায়?" তখন তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়াই বুঝা গিয়াছিল যে, ভীমকে পাইলে তিনি তাঁহাকে বধ না করিয়া ছাড়িবেন না। তাঁহার এরূপ অভিসন্ধির কথা কৃষ্ণ পূর্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাহার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিতেও ভুলেন

নাই। সুতরাং ধৃতরাষ্ট্র ভীমের কথা জিজ্ঞাসা করামাত্র, তিনি একটা লোহার ভীম আনিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। সেই লোহার মূর্তিটাকে আলিঙ্গন করিবার ছলে, ধৃতরাষ্ট্র তাহাকে এমনি চাপিয়া দিলেন যে, তাহা একেবারে চূর্ণ হইয়া গেল! ধৃতরাষ্ট্রের দেহে লক্ষ হাতির জোর ছিল, সুতরাং তিনি যে লোহার ভীম চূর্ণ করিবেন, তাহা আশ্চর্য নহে। আসল ভীমকে পাইলে না জানি তিনি তাঁহার কি দশা করিতেন!

যাহা হউক লোহার ভীম চূর্ণ করা লক্ষ হাতির জোরের পক্ষেও সহজ কথা নহে : সুতরাং ধৃতরাষ্ট্র সে কাজ শেষ করিয়াই রক্ত বমি করিতে করিতে পড়িয়া গেলেন। এদিকে ভীমের যথেষ্ট সাজা হইয়াছে মনে করিয়া, তাঁহার রাগ চলিয়া গেল, তখন আবার তিনি "হা-ভীম! হা-ভীম!" করিয়া কাঁদিতে ত্রুটি করিলেন না। তাহাতে কৃষ্ণ তাঁহাকে বলিলেন, "মহারাজ! দুঃখ করিবার কোনো প্রয়োজন নাই। ওটা লোহার ভীম, যথার্থ ভীম নহে। ভীমকে বধ করিতে যাওয়া আপনার উচিত হয় নাই। দেখুন, যুদ্ধ বারণ করিতে অশেষ চেষ্টা হইয়াছিল, তথাপি আপনার পুত্রেরা তাহাতে ক্ষান্ত হন নাই ; তাহার ফলেই এখন তাঁহাদের মৃত্যু ঘটিয়াছে। সুতরাং ভীমকে তাহার জন্য দোষী করেন কেন?"

কৃষ্ণের কথায় ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, "কৃষ্ণ! তোমার কথাই সত্য! শোকে বুদ্ধিনাশ হওয়াতেই আমি ঐরূপ করিয়াছিলাম।" এই বলিয়া ধৃতরাষ্ট্র ভীম, অর্জুন, নকুল আর সহদেবকে আলিঙ্গনপূর্বক আশীর্বাদ করিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র অপেক্ষা গান্ধারীর কথা ভাবিয়াই পাণ্ডবদের মনে অধিক ভয় হইয়াছিল। গান্ধারী সামান্য স্ত্রীলোক ছিলেন না। জীবনে তিনি কখনো একটি অধর্মের কাজ করেন নাই বা একটি অধর্মের কথা মুখে আনেন নাই। অন্ধ স্বামীর দুঃখে তিনি এতই দুঃখিত ছিলেন যে, বিবাহের পরেই তিনি নিজের চক্ষু মোটা কাপড় দিয়া বাঁধিয়া ফেলেন। সে বাঁধন তাঁহার চিরদিন একভাবে ছিল। যুদ্ধের সময় যখন দুর্যোধনেরা জয়লাভের জন্য তাঁহার আশীর্বাদ চাহিতে আসিলেন, তখন গান্ধারী তাঁহাদের মা হইয়াও এ কথা মুখে আনিতে পারিলেন না যে, 'তোমাদের জয় হউক', তিনি বলিলেন, 'ধর্মের জয় হউক!'

সেই দেবতার ন্যায় তেজস্বিনী ধার্মিকা রমণীর ক্রোধের কথা ভাবিয়াই পাণ্ডবেরা অত্যন্ত ভয় পাইয়াছিলেন। আর ক্রোধও তাঁহার খুবই হইয়াছিল। সেই ক্রোধে পাছে তিনি পাণ্ডবদিগকে শাপ দেন, এই ভয়ে ব্যাসদেব পূর্বেই তাঁহাকে সতর্ক করিয়া বলিয়াছিলেন, "মা! তুমিই বলিয়াছিলে 'ধর্মের জয় হউক', সেই ধর্মের জয় হইয়াছে। তোমার যে অসাধারণ ক্ষমাগুণ, তাহাই ধর্ম ; আর এখন যে ক্রোধ করিতেছ, তাহা অধর্ম। মা! ধর্মের উপর যেন অধর্মের জয় না হয়।"

ইহার উত্তরে গান্ধারী বলিলেন, "ভগবন্! পাণ্ডবদিগের উপর আমার ক্রোধ নাই, তাহাদের বিনাশ আমি চাহি না। কিন্তু ভীম যে অন্যায়পূর্বক দুর্যোধনকে মারিয়াছে, ইহা আমি সহ্য করিতে পারিতেছি না।"

তাই ভীম গান্ধারীর নিকট উপস্থিত হইয়া, ভয়ে ভয়ে, বিনয়ের সহিত বলিলেন, "মা! আমার অপরাধ হইয়াছে! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন! ভাবিয়া দেখুন, আপনার পুত্রেরা আমাদিগের বড়ই অনিষ্ট করিয়াছিল!"

গান্ধারী বলিলেন, "বাছা! আমার একশত পুত্রের মধ্যে যাহার কিছু কম অপরাধ, এমন একটিকেও যদি জীবিত রাখিতে, তাহা হইলেও সে এই দুই অন্ধের নড়ি স্বরূপ হইতে পারিত। এখন আমাদের পুত্র নাই, কাজেই তুমি আমাদের পুত্রের মতন হইলে।"

তারপর যুধিষ্ঠির তাঁহার নিকট আসিয়া জোড়হাতে বলিলেন, "দেবি! আমিই আপনাদের দুঃখের মূল। আমি অতি নরাধম ; আমাকে শাপ দিন!"

গান্ধারী এ কথায় কোনো উত্তর না দিয়া, কেবল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। সেই সময়ে যুধিষ্ঠির গান্ধারীর পায়ে ধরিতে গেলে, গান্ধারী তাঁহার চোখের বাঁধনের ফাঁক দিয়া যুধিষ্ঠিরের আঙ্গুলের নখ দেখিতে পান। তদবধি যুধিষ্ঠিরের নখ মরিয়া গেল। তাহা দেখিয়া অর্জুন, সহদেব এবং নকুল ভয়ে আর তাঁহার নিকট আসিলেন না। তখন গান্ধারী তাঁহাদিগকে ডাকিয়া স্নেহের সহিত কথাবার্তা বলিতে লাগিলেন।

তারপর পাণ্ডবেরা কুন্তীর নিকটে গেলেন। এত দুঃখ-কষ্টের পর তাঁহাদিগকে পাইয়া আর তাঁহাদিগকে অস্ত্রাঘাতে জর্জরিত এবং দ্রৌপদীকে পুত্রশোকে আকুল দেখিয়া, না জানি কুন্তীর কতই কষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু সে কষ্টের দিকে মন না দিয়া, তিনি দ্রৌপদীকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন।

তারপর সকলে মিলিয়া সেখান হইতে রণস্থলে গেলেন। তখন নিজ নিজ আত্মীয়গণের মৃত শরীর দেখিয়া তাঁহাদের যে দারুণ দুঃখ হইল, তাহার কথা অধিক বলিয়া আর কি হইবে? সেই মৃতদেহগুলির সৎকারই হইল তখনকার প্রথম কাজ। বহুমূল্য কাষ্ঠ, ঘৃত, চন্দনাদিতে অসংখ্য চিতা প্রস্তুত করিয়া, যত্নপূর্বক সে কাজ শেষ করা হইলে, সকলে স্নান ও জলাঞ্জলি (অর্থাৎ যাহারা মরিয়াছে, তাহাদের উদ্দেশে অঞ্জলি ভরিয়া জল) দিবার জন্য গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন।

এই সময় কুন্তী কাঁদিতে কাঁদিতে পাণ্ডবদিগকে বলিলেন, "বৎসগণ! কর্ণের জন্য জলাঞ্জলি দাও, সে তোমাদের জ্যেষ্ঠ ভাই ছিল।"

হায়! চিরকাল কর্ণের সহিত সাংঘাতিক শত্রুতা করিয়া তাঁহাকে আহ্লাদপূর্বক নিধনের পর ইহা কি নিদারুণ সংবাদ! সে সংবাদ শুনিয়া পাণ্ডবদিগের ন্যায় বীরপুরুষেরাও আর স্থির থাকিতে পারিলেন না।

তখন যুধিষ্ঠির দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে কুন্তীকে বলিলেন, "মা! তুমি আমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কথা গোপন করিয়া কি অন্যায় কাজই করিয়াছ! আমরা তাহাকে বধ করিয়াছি, এ কথা ভাবিয়া এখন বুক ফাটিয়া যাইতেছে। মা! এ কথা আগে বলিলে কি আর এ নিষ্ঠুর যুদ্ধ হইত?"

তাঁহ

পুে



দবধি যুধিষ্ঠির এ কথা জানিতে পারিলেন যে, কর্ণ তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ ভাই, সেই অবধি তাঁহার শোকে এবং না জানিয়া তাঁহাকে বধ করার জন্য দুঃখ আর অনুতাপে, তিনি একেবারে অধীর হইয়া পড়িলেন। যে রাজ্যের জন্য এমন ঘটনা ঘটে, তাহার প্রতি তাঁহার এতই ঘৃণা জন্মিয়া গেল যে, আর কিছুতেই সে রাজ্য ভোগ করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না। ভাইদিগকে ডাকিয়া তিনি বলিলেন, "আমার রাজ্য করিতে ইচ্ছা নাই, রাজ্য ছাড়িয়া বনে গিয়া আমি তপস্যা করিব।"

এ কথায় সকলের মাথায় যেন আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। যে রাজ্যের জন্য এত ক্লেশ, এত রক্তপাত, সে রাজ্য হাতে পাইয়া কোন রাজা তাহা পালন এবং রক্ষার অবহেলা করিতে পারে? বনে যাওয়াই যদি কর্তব্য হয়, তবে এত কাণ্ডের কি প্রয়োজন ছিল? নাহয় এই রাজ্য দ্বারা দান-যজ্ঞাদি, ধর্ম কাজই হউক-না, ইহা ছাড়িয়া দিলে কি প্রশংসার কাজ হইবে?

এইরূপে ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব, দ্রৌপদী সকলে মিলিয়া যুধিষ্ঠিরকে কত বুঝাইলেন, কিন্তু কিছুতেই যুধিষ্ঠিরের মন শান্ত হইল না। তিনি সবিনয়ে ব্যাসকে বলিলেন, "ভগবন্! ধর্মের কথা আমাকে আরো ভালো করিয়া বলুন। কিরূপে একজন লোকে রাজ্যও করিতে পারে, আর ধর্মও করিতে পারে, এ কথা না বুঝিতে পারিয়া আমার মনে বড়ই চিন্তা হইতেছে।"

তখন ব্যাস তাঁহাকে বলিলেন, "যদি ভালো করিয়া ধর্মের কথা শুনিতে তোমার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে কুরুকুলপিতামহ ভীষ্মের নিকটে যাও, তিনি তোমার সংশয় দূর করিবেন। তিনি দেহত্যাগ না করিতে করিতে শীঘ্র তাঁহার নিকট যাও।"

কৃষ্ণও বলিলেন, "মহারাজ! অতিশয় শোক করা আপনার মতো লোকের উচিত নহে। মহর্ষি ব্যাস যাহা বলিলেন, আপনি তাহাই করুন!"

যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর হইতে সকলে নগরের বাহিরেই বাস করিতেছিলেন, এ পর্যন্ত তাঁহাদের হস্তিনায় প্রবেশ হয় নাই। ব্যাস এবং কৃষ্ণের উপদেশ এবং ভীষ্মের কথা শুনিবার আশায় মনে কতকটা শান্তি লাভ করাতে, এখন

যুধিষ্ঠির হস্তিনায় যাইতে প্রস্তুত হইলেন।

তখন শুভ্র, সুন্দর, সুসজ্জিত ষোড়শ বৃষযুক্ত শ্বেত রথে যুধিষ্ঠিরকে তুলিয়া, অর্জুন তাহার উপরে নির্মল শ্বেত-ছত্র ধারণ করিলেন, নকুল, সহদেব শুভ্র চামর লইয়া ব্যজন করিতে লাগিলেন, ভীম বল্গা হস্তে সেই রথের সারথি হইলেন। কৃষ্ণ শ্বেত রথে চড়িয়া সঙ্গে চলিলেন.; ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী, দ্রৌপদী প্রভৃতি সকলে, কেহ শিবিকায়, কেহ রথে, তাঁহাদের অনুগামী হইলেন।

নগরবাসিগণের তখন আর আনন্দের সীমা রহিল না। তাহারা যত্নে রাজপথ, গৃহতোরণাদি সাজাইয়া কোলাহল করিতে লাগিল। জনতার জয়গীতে, দুন্দুভিরব শঙ্খনাদ আর দ্বিজগণের আশীর্বাদ মিলিয়া, সে সময়ে এমনি একটি সুখের ব্যাপার হইয়াছিল যে, তাহার আর তুলনাই নাই।

ইহার মধ্যে চার্বাক নামক একটা দুষ্ট রাক্ষস, ভিক্ষুকের বেশে আসিয়া বড়ই রসভঙ্গ করিয়া দিল। হতভাগা দুর্যোধনের বন্ধু, পাণ্ডবদিগের অনিষ্টের চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়ায়। ব্রাহ্মণেরা যুধিষ্ঠিরকে আশীর্বাদ করিতেছেন, তাহাতে দুষ্ট আসিয়া বলে কি, "মহারাজ! ব্রাহ্মণগণ জ্ঞাতি বধের জন্য আপনাকে দুষ্ট রাজা বলিয়া গালি দিতেছেন। আপনার জীবনে কোনো প্রয়োজন নাই, আপনার মৃত্যুই শ্রেয়।"

এ কথা শুনিয়া ক্রোধে অনেকক্ষণ পর্যন্ত ব্রাহ্মণগণের কথা সরিল না। ইহার মধ্যে যুধিষ্ঠির বলিলেন, "হে দ্বিজগণ! আপনারা দয়া করিয়া আমাকে গালি দিবেন না ; আমি অবিলম্বে প্রাণত্যাগ করিব!"

তখন ব্রাহ্মণেরা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "মহারাজ, আমরা আপনাকে গালি দেই নাই! আপনার মঙ্গল হউক! এই দুরাত্মা দুর্যোধনের বন্ধু, চার্বাক নামক রাক্ষস। দুর্যোধনের বন্ধু বলিয়াই দুষ্ট আপনাকে গালি দিয়াছে, আমরা কিছুই বলি নাই। আপনি কোনো ভয় করিবেন না।" এই বলিয়া ব্রাহ্মণেরা বিষম রোষনয়নে চার্বাকের দিকে চাহিবামাত্র দুরাত্মার প্রাণ বাহির হইয়া গেল।

তারপর বিধিমতে যুধিষ্ঠিরের অভিষেক হইয়া গেলে, তিনি উপযুক্ত লোক-দিগের হাতে রাজ্যের কাজ বাঁটিয়া দিলেন। ভীম হইলেন যুবরাজ, বিদুর হইলেন মন্ত্রী, সঞ্জয় আয়-ব্যয় পরীক্ষক, নকুল সৈন্য-পরিদর্শক, অর্জুন শত্রু ও দুষ্ট শাসক, সহদেব দেব-রক্ষক, ধৌম্য দেবসেবা সম্পাদক। সকলের প্রতিই আদেশ রহিল যে, 'ধৃতরাষ্ট্র যখন যেরূপ আজ্ঞা দেন, তাঁহারই মতে চলিতে হইবে।'

এইরূপে রাজকার্যের সুন্দর ব্যবস্থা করিয়া, যুধিষ্ঠির ভীষ্মের নিকট যাইতে প্রস্তুত হইলেন। সেই শরশয্যার দিন হইতে ভীষ্ম সেইভাবেই যুদ্ধক্ষেত্রে থাকিয়া, সূর্যের উত্তরায়ণের (অর্থাৎ আকাশের উত্তর ভাগে যাওয়ার) অপেক্ষা করিতেছেন। উত্তরায়ণ আরম্ভ হইলেই সেই মহাপুরুষের দেহত্যাগের সময় হইবে। তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব, সাত্যকি, কৃপ, সঞ্জয় প্রভৃতি রথে চড়িয়া যাত্রা করিলেন।

কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা দেখিলেন যে, সেই মহাবীরের মৃত্যুশয্যার

চারিদিকে মুনি-ঋষিগণ ঘিরিয়া বসায়, সে স্থানের এক অপূর্ব শোভা হইয়াছে। দূর হইতে তাহা দেখিয়াই, সকলে রথ হইতে নামিয়া, তথায় উপস্থিত হইলেন।

তখন কৃষ্ণ ভীষ্মের নিকটে গিয়া, বিনয়ের সহিত তাঁহাকে বলিলেন, "হে কুরুপিতামহ! আপনার তুল্য মহৎ লোক এই পৃথিবীতে কেহই নাই ; ধর্মের সকল তত্ত্বই আপনার জ্ঞাত। রাজা যুধিষ্ঠির শোকে অতিশয় কাতর হইয়াছেন ; এ সময়ে আপনি দয়া করিয়া তাঁহাকে উপদেশ দিলে, তাঁহার শান্তিলাভ হইতে পারে।"

যুধিষ্ঠির লজ্জায় ভীষ্মের নিকটে গিয়া কথা বলিতে সাহস পান নাই। কিন্তু ভীষ্মের মনে যুধিষ্ঠিরের প্রতি কিছুমাত্র বিরাগ ছিল না। যুধিষ্ঠিরের লজ্জার কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন, "যুধিষ্ঠির তো যুদ্ধ করিয়া ক্ষত্রিয়ের ধর্মই পালন করিয়াছেন। সুতরাং ইহাতে তাঁহার লজ্জিত হইবার কোনো কারণ নাই।"

তখন যুধিষ্ঠির ভীষ্মের নিকট আসিয়া ভক্তিভরে তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলে, ভীষ্ম তাঁহার মস্তক আঘ্রাণপূর্বক বলিলেন, "তোমার কোনো ভয় নাই ; মন খুলিয়া আমাকে সকল কথা জিজ্ঞাসা কর।"

এই সময় কৃষ্ণ ভীষ্মের সকল জ্বালা-যন্ত্রণা এবং দুর্বলতা দূর করিয়া দিলেন।

তারপর বহুদিন পর্যন্ত, যুধিষ্ঠির প্রত্যহ সেই মহাপুরুষের নিকট আসিয়া, যে-সকল অমূল্য উপদেশ পাইয়াছিলেন, তোমরা বড় হইয়া তাহার কথা পড়িবে। এমন উপদেশ যে-সে দিতে পারে না। তাই যুধিষ্ঠির উপদেশ লইতে আসিলে নারদ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "এই মহাত্মা ধর্মের সকল সংবাদ জানেন, ইনি বাঁচিয়া থাকিতে তাহা শুনিয়া লও।"



শেষ উপদেশ দ্বারা যুধিষ্ঠিরের মনের সকল সংশয় দূর করিয়া ভীষ্মদেব চুপ করিলে, চারিদিকের লোকেরা অনেকক্ষণ পর্যন্ত ছবির ন্যায় স্থির এবং নিঃশব্দ হইয়া রহিল। তারপর যুধিষ্ঠির তাঁহার পায়ের ধূলা ও আশীর্বাদ লইয়া, হস্তিনায় ফিরিলেন। বিদায়কালে ভীষ্ম তাঁহাকে বলিলেন, "সূর্যদেবের উত্তরায়ণ আরম্ভ হইলে আমার নিকট আসিও।"

তারপর কিছুদিন গেলে, যুধিষ্ঠির দেখিলেন যে, মাঘ মাসের শুক্লপক্ষ আসিয়াছে। ইহাই সূর্যের উত্তরায়ণের সময়, এই সময়েই ভীষ্মদেবের স্বর্গারোহণ করিবার কথা। সুতরাং তিনি অবিলম্বে পুরোহিত, পুরজন প্রভৃতি সকলকে সঙ্গে লইয়া, রত্ন, ঘৃত, গন্ধদ্রব্য, পট্টবস্ত্র, চন্দনাদি সহ কুরুক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র, কৃষ্ণ, বিদুর, সাত্যকি প্রভৃতিও তাঁহাদের সঙ্গে চলিলেন।

ভীষ্মদেবের শরশয্যার চারিধারে ব্যাস, নারদ প্রভৃতি মুনিরা ও নানা দেশের রাজাগণ বসিয়া আছেন, এমন সময় যুধিষ্ঠির প্রভৃতিরা আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। যুধিষ্ঠিরকে দেখিয়া ভীষ্ম বলিলেন, "তোমরা আসাতে আমি বড় সুখী হইলাম। এই শরশয্যায় আমার আটান্ন দিন কাটিয়াছে ; এখন মাঘ মাসের শুক্লপক্ষ উপস্থিত।"

তারপর তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন, "ধর্মের কথা তোমার অজানা নাই ; সুতরাং আর শোক করিও না। এখন তুমি পাণ্ডবদিগকে প্রতিপালন কর।"

কৃষ্ণকে তিনি বলিলেন, "আমার দেহত্যাগের সময় উপস্থিত। অতঃপর আমার যেন স্বর্গলাভ হয়।"

সকলের প্রতি তাঁহার শেষ কথা এই হইল, "তোমরা অনুমতি কর, আমি দেহত্যাগ করি। তোমাদের বুদ্ধি যেন কদাপি সত্যকে পরিত্যাগ না করে ; সত্যের তুল্য আর বল নাই।"

তারপর সেই মহাপুরুষ মৌনাবলম্বনপূর্বক দেহত্যাগে উদ্যত হইলে শর সকল একে একে তাঁহার শরীর হইতে খসিয়া পড়িতে লাগিল। ক্রমে তাঁহার দেহে একটি শরের দাগ পর্যন্ত রহিল না। দেখিতে দেখিতে তাঁহার উজ্জ্বল

আত্মা, তাঁহার মস্তক হইতে উঠিয়া স্বর্গাভিমুখে যাত্রা করিবামাত্র, দেবতাগণ পুষ্পবৃষ্টি এবং দুন্দুভি বাদ্য আরম্ভ করিলেন।

এমন মহাত্মার জন্য কি আর শোক করিতে হয়? বিদুর, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব প্রভৃতিরা তাঁহাকে মহামূল্য পট্টবস্ত্র ও উষ্ণীষ পরাইয়া, তাঁহার উপরে উৎকৃষ্ট ছত্র ধারণপূর্বক, চামর দোলাইতে লাগিলেন। নারীগণ তালবৃন্ত হস্তে চারিদিকে দাঁড়াইয়া ব্যজনে প্রবৃত্ত হইলেন।

এদিকে সুমধুর সামগান আরম্ভ হইয়াছে, চন্দন কাষ্ঠের চিতাও প্রস্তুত। সেই চিতার আগুনে ভীষ্মের দেহ শেষ করিয়া এবং তাঁহার উদ্দেশে জলাঞ্জলি দিয়া সকলে তথা হইতে চলিয়া আসিলেন।



জ্য লাভের পর যুধিষ্ঠিরের প্রথম কীর্তি হইল অশ্বমেধ যজ্ঞ। যুধিষ্ঠিরের শোক কিছুতেই একেবারে দূর না হওয়ায়, সকলে তাহাকে এই মহাযজ্ঞে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। কিন্তু ইহা অতি বৃহৎ এবং কঠিন ব্যাপার ; অল্প ধন লইয়া কিছুতেই ইহাতে হাত দেওয়া যাইতে পারে না। সুতরাং যুধিষ্ঠির এ যজ্ঞ করিতে নিতান্ত ইচ্ছুক হইয়াও, ইহা আরম্ভ করিতে ভয় পাইলেন।

ধনরত্ন যাহা কিছু ছিল, যুদ্ধে প্রায় তাহার সমস্তই ব্যয় হইয়া গিয়াছে। এখন অশ্বমেধ যজ্ঞের উপযুক্ত ধন কোথায় পাওয়া যাইবে? যুধিষ্ঠিরের এইরূপ চিন্তা দেখিয়া ব্যাস তাঁহাকে বলিলেন, "বৎস, তুমি চিন্তা করিও না ; ধন সহজেই পাওয়া যাইবে। পূর্বে মহারাজ মরুত্ত হিমালয় পর্বতে যজ্ঞ করিয়া, ব্রাহ্মণদিগকে এত অধিক সুবর্ণ দিয়াছিলেন যে, তাঁহারা তাহা বহিতে না পারিয়া সেইখানেই ফেলিয়া আসেন। সেই সুবর্ণ এখনো তথায় রহিয়াছে ; তাহা আনিলে অনায়াসে তোমার যজ্ঞ হইতে পারে।"

এ কথায় যুধিষ্ঠির হর্ষভরে অমাত্যগণের সহিত সেই ধন আনয়নের পরামর্শ করিতে লাগিলেন। ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব প্রভৃতি সকলেই বলিলেন, "ব্যাসদেবের পরামর্শ অতি উত্তম।" সুতরাং অবিলম্বে মরুত্তের যজ্ঞের সোনা আনিবার জন্য হিমালয় যাত্রার আয়োজন হইল। সেখানে গিয়া উহা খুঁজিয়া বাহির করিতেও বিশেষ ক্লেশ হইল না।

সেকালের লোকে এত ধন কোথায় পাইত? আর না জানি তাহারা কিরূপ মহাশয় লোক ছিল যে, এত ধন দান করিত! মরুত্ত রাজার যজ্ঞের সেই সোনা আনিতে, ষাটলক্ষ উট, এককোটি বিশলক্ষ ঘোড়া, দুইলক্ষ হাতি, একলক্ষ রথ, একলক্ষ গাড়ি লাগিয়াছিল। আর মানুষ আর গাধা যে কত লাগিয়াছিল, তাহার সংখ্যা নাই। এতগুলিতেও কি সে ধন সহজে আনিতে পারিয়াছিল? তাহারা সেই সোনার ভারে বাঁকা হইয়া, দিনে দুই ক্রোশের অধিক পথ চলিতে পারে নাই!

এত ধন যে যজ্ঞে ব্যয় হইয়াছিল, তাহা যে কত বড় যজ্ঞ, বুঝিয়া লও। একটি প্রশস্ত ভূমি খাঁটি সোনায় মুড়িয়া, তাহার উপর যজ্ঞের গৃহাদি প্রস্তুত

হইল। জমিটি যেমন, ঘর-বাড়িও অবশ্য তাহার উপযুক্তই হইয়াছিল। এদিকে অর্জুন, ইহার অনেক পূর্বেই, গাণ্ডীব হাতে, একটি সুন্দর ঘোড়ার পশ্চাতে পৃথিবীর সকল স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিয়াছেন। এক বৎসর দেশ-বিদেশে ঘুরিয়া ঘোড়া ফিরিয়া আসিবে। ইহার মধ্যে কাহাকেও সে ঘোড়া আটকাইতে দেওয়া হইবে না। আর, অর্জুন যাহার রক্ষক, তাহাকে কেহ আটকাইয়া রাখিবার আশঙ্কাও নাই।

অর্জুনের যাত্রাকালে যুধিষ্ঠির তাঁহাকে বলেন, "যাঁহারা কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহাদের পুত্র-পৌত্রদিগকে বধ করিও না।" অর্জুন যথাসাধ্য এই আজ্ঞা পালনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন ; সেজন্য তাঁহাকে বিস্তর ক্লেশও পাইতে হইল। কুরুক্ষেত্রে কত রাজাই পাণ্ডবদিগের হাতে মারা গিয়াছে ; তাহাদের দেশে গেলেই, তাহাদের পুত্র-পৌত্র আর দেশের লোকেরা ক্ষেপিয়া অর্জুনকে মারিতে আইসে। তিনি তাহাদিগকে অধিক বাণ মারেন না, পাছে বেচারারা মারা যায়। কিন্তু তাহাতে তাহারা মনে করে, বুঝি তিনি ভালোরূপ যুদ্ধই করিতে পারেন না ; কাজেই তাহারা মহোৎসাহে তাঁহাকে ক্ষত-বিক্ষত করে। সুতরাং তখন তিনি তাহাদের দু-চারজনকে মারিতে বাধ্য হন। তারপর তাহারা ভয়ে জড়সড় হইয়া তাঁহার নিকট হাতজোড় করিতে থাকে।

ত্রিগর্ত দেশে সুশর্মার পুত্র ধৃতবর্মার সহিত এইরূপ হইল। প্রাগ্‌জ্যোতিষে ভগদত্তের পুত্র বজ্রদত্তের সহিত এইরূপ হইল। সিন্ধুদেশে জয়দ্রথের আত্মীয়-গণও এইরূপ আরম্ভ করিল। শেষে তাহাদের অত্যাচার অসহ্য হওয়ায় তিনি তাহাদের মাথা কাটিতে আরম্ভ করিলে আর তাহাদের দুর্দশার সীমা নাই।

এমন সময় জয়দ্রথের স্ত্রী দুঃশলা, তাঁহার শিশু পৌত্রটিকে কোলে লইয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে অর্জুনের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দুঃশলা ধৃতরাষ্ট্রের কন্যা, সুতরাং অর্জুনের ভগিনী। তাঁহাকে দেখিবামাত্র অর্জুন গাণ্ডীব রাখিয়া দিয়া বলিলেন, "ভগিনী! তোমার কি কাজ করিব, বল।"

ইহার উত্তরে দুঃশলা যাহা বলিলেন, তাহাতে অর্জুনের মনে বড়ই ক্লেশ হইল! জয়দ্রথের সঙ্গে দুঃশলার বিবাহ হইয়াছিল। জয়দ্রথের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সুরথ, পিতার শোকে নিতান্ত কাতর হইয়া পড়েন। ইহার উপরে যখন তিনি শুনিলেন যে অর্জুন যজ্ঞের ঘোড়া সমেত আসিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছেন, তখনি তাঁহার মৃত্যু হইল। এখন দুঃখিনী বিধবা দুঃশলা, পতি-পুত্রের শোকে অস্থির হইয়া, পৌত্রটিকে অর্জুনের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন, যদি তাহাকে দেখিয়া অর্জুনের দয়া হয়।

ছেলেটি যখন মাথা হেঁট করিয়া কাতরভাবে অর্জুনকে প্রণাম করিল, তখন আর তিনি চক্ষের জল না রাখিতে পারিয়া বলিলেন, "ক্ষত্রিয়ের ধর্মকে ধিক্! এই ধর্ম পালন করিতে গিয়াই বন্ধু-বান্ধবদিগকে বধ করিয়াছি!"

এই বলিয়া তিনি দুঃশলাকে সাদর মধুর বাক্যে সান্ত্বনা দিয়া তথা হইতে বিদায় হইলেন।

মণিপুরের রাজকুমারী চিত্রাঙ্গদাকে অর্জুন বিবাহ করিয়াছিলেন। এখন

সেই চিত্রাঙ্গদার পুত্র বভ্রুবাহণ মণিপুরের রাজা। ঘোড়া মণিপুরে উপস্থিত হইলে বভ্রুবাহণ তাঁহার পিতার আগমন সংবাদ প্রাপ্তিমাত্রেই পাত্রমিত্র সমেত, অতি বিনীতভাবে, অর্জুনের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

কিন্তু অর্জুন ইহাতে কিছুমাত্র সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি বভ্রুবাহণকে বলিলেন, "আমি আসিলাম যুদ্ধ করিতে, আর তুমি করজোড়ে আসিয়া আমার নিকট উপস্থিত হইলে! ইহা কখনোই ক্ষত্রিয়ের কাজ নহে, ইহা কাপুরুষের কাজ। তোমাকে ধিক্। তোমার জীবনে প্রয়োজন কি?"

এ কথায় বভ্রুবাহণ নিতান্ত ব্যথিতচিত্তে মাথা হেঁট করিয়া রহিলেন। এমন সময় সেই যে উলুপী নাম্নী নাগকন্যার সহিত অর্জুনের বিবাহ হইয়াছিল, তিনি আসিয়া বভ্রুবাহণকে বলিলেন, "বাছা, আমি তোমার বিমাতা উলুপী। তোমার পিতা যখন যুদ্ধের বেশে আসিয়াছেন, তখন ইঁহার সহিত যুদ্ধ করাই তোমার উচিত। তাহাতে ইনি সন্তুষ্ট হইবেন।" তখন বভ্রুবাহণ, বিপুল যুদ্ধের আয়োজন করিয়া, সৈন্যগণকে আদেশ দিবামাত্রই তাহারা ঘোড়া আটকাইয়া ফেলিল। তাহাতে অর্জুন অতিশয় তুষ্ট হইয়া, তাঁহার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলে, ক্ষণেকের ভিতরেই বভ্রুবাহণের বাণে তাঁহাকে অজ্ঞান হইতে হইল।

জ্ঞান হইলে অর্জুন বভ্রুবাহণকে বলিলেন, "বাঃ! এই তো চাই! আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম! আচ্ছা, এখন আমি মারি, স্থির হইয়া সামলাও তো!"

তারপর অর্জুন অসংখ্য নারাচ ছুঁড়িয়া মারিলে, বভ্রুবাহণ তাহার সমস্তই কাটিলেন! কিন্তু তাহার পরে ভয়ানক বাণগুলি ফিরাইতে না পারায়, তাঁহার রথের ধ্বজ আর ঘোড়া কাটা গেল। তখন তিনি রথ হইতে নামিয়া এমনি ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন যে, তাহা দেখিয়া অর্জুনের আর আনন্দের সীমা রহিল না। এমন সময় বভ্রুবাহণ কি যে একটা বাণ মারিলেন, তাহাতে নিমেষ মধ্যে অর্জুনকে একেবারে মৃতপ্রায় করিয়া ফেলিল। বভ্রুবাহণও তাহা দেখিয়া দুঃখে অজ্ঞান হইয়া গেলেন।

এই বিষম বিপদের সময়, চিত্রাঙ্গদা কাঁপিতে কাঁপিতে সেখানে আসিয়া, উলুপীকে দেখিয়াই বলিলেন, "উলুপি! তোমার দোষেই এই বিপদ উপস্থিত হইল।" বভ্রুবাহণও সেই সময়ে জ্ঞানলাভ করিয়া, উলুপীকে তিরস্কারপূর্বক বলিলেন, "পিতাকে মারিয়াছি, সুতরাং আমিও এখনি প্রাণত্যাগ করিব। তাহা হইলে হয়তো তুমি সন্তুষ্ট হইবে।"

উলুপী যথাসাধ্য ইহাদিগকে সান্ত্বনা দিয়া, তখনি নাগলোক হইতে সঞ্জীবনী মণি আনাইলেন। সে মণির কি আশ্চর্য গুণ! উহা অর্জুনের বুকে স্থাপনমাত্রই তিনি চক্ষু মার্জনাপূর্বক উঠিয়া বসিলেন, যেন তাঁহার ঘুম ভাঙিগল।

তারপর অবশ্য খুব সুখের অবস্থাই হইল। আর তখন এ কথাও জানা গেল যে উলুপী অতি মহৎ অভিপ্রায়েই এই ব্যাপার ঘটাইয়াছিলেন। শিখণ্ডীর সহায়তার ভীষ্মকে বধ করায়, অর্জুনের যথেষ্ট অপরাধ হইয়াছিল। সেই অপরাধে বসুগণ এবং গঙ্গাদেবী তাঁহাকে শাপ দিতে প্রস্তুত হন। উলুপী সে সময়ে তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি এবং তাঁহার পিতা সেই দেবতাদিগকে

অর্জুনের প্রতি প্রসন্ন হওয়ার জন্য বিস্তর মিনতি করায়, তাঁহারা বলেন, "বভ্রুবাহন অর্জুনকে বধ করিলে, তবে তাঁহার শাপ কাটিবে।" এইজন্যই উলূপী বভ্রুবাহণকে অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে উৎসাহ দেন। তিনি জানিতেন যে, অর্জুনকে বাঁচাইবার ঔষধ তাঁহার ঘরে আছে। এ-সকল কথা জানিতে পারিয়া সকলেই যে উলূপীর উপর অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

তখন বভ্রুবাহণ, চিত্রাঙ্গদা আর উলূপীকে যজ্ঞে নিমন্ত্রণপূর্বক, অর্জুন পুনরায় তথা হইতে যাত্রা করিলেন।

মগধে জরাসন্ধের নাতি মেঘসন্ধিও অন্যান্য অনেক মূর্খের ন্যায়, মনে করিয়াছিলেন যে, অর্জুন অপেক্ষা তিনি নিজে অধিক যোদ্ধা। অর্জুন, যুধিষ্ঠিরের কথা মনে করিয়া যতই তাঁহাকে বাঁচাইয়া বাণ মারিতে যান, ততই তাঁহার আরো সাহস বাড়িয়া যায়। শেষে অবোধের যে দশা সচরাচর হয়, তাঁহারও তাহাই হইল, তাঁহার আর অস্ত্র নাই। তখন অর্জুন তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি ছেলেমানুষ হইয়া বেশ যুদ্ধ করিয়াছ, এখন ঘরে যাও! আমি তোমাকে বধ করিব না।" তাহাতে মেঘসন্ধি করজোড়ে কহিলেন, "মহাশয়! আমি পরাজিত হইয়াছি। এখন অনুমতি করুন, কি করিব।" অর্জুন বলিলেন, "চৈত্র মাসের পূর্ণিমার দিন মহারাজ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞ দেখিতে যাইবে।" এই বলিয়া তিনি সেখান হইতে চলিয়া আসিলেন।

গান্ধার দেশে শকুনির পুত্রও প্রথমে ভারি তেজ দেখাইয়াছিলেন। অর্জুন কৃপাপূর্বক, তাঁহার মাথা না কাটিয়া, পাগড়িটি উড়াইয়া দিলে, তাঁহার চৈতন্য হইল।

এইরূপে এক বৎসরকাল ঘোড়াটিকে দেশে দেশে ভ্রমণ করাইয়া তাহাকে হস্তিনায় ফিরাইয়া আনিলে, সেই ঘোড়ার মাংস দিয়া যজ্ঞ সম্পন্ন হইল। সেরূপ যজ্ঞ আর তাহার পরে কখনো হয় নাই। এমন কোনো আত্মীয়-স্বজন, এমন কোনো রাজারাজড়া এমন কোনো মুনি-ঋষি বা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন না, যিনি সেই যজ্ঞে না আসিয়াছিলেন।

আর ভোজনের বিষয় কি বলিব? অন্নের পর্বত, ঘৃত-দধির নদী, আর মিঠাই-মোণ্ডা কি পরিমাণ, তাহা বলিতে পারি না। হাজার হাজার লোক মণি, কুণ্ডল, আর সুবর্ণ মাল্যে সুসজ্জিত হইয়া সেই-সকল সুমধুর খাদ্য পরিবেশন করিয়াছিল। এক-একলক্ষ ব্রাহ্মণের ভোজন শেষ হইলে, এক-একবার দুন্দুভি বাজিত। এইরূপে যজ্ঞের কয়েকদিনের মধ্যে কত শত বার যে দুন্দুভি বাজিয়াছিল, তাহার সংখ্যা নাই।

এইরূপ সমারোহে সেই মহাযজ্ঞ শেষ হইল। এই যজ্ঞে একটি অদ্ভুত ঘটনা হয়। যজ্ঞ শেষে সকলেই যুধিষ্ঠিরের অতিশয় সুখ্যাতি করিতেছেন, এমন সময় একটি আশ্চর্য নকুল আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল। উহার চক্ষু দুটি নীল; মাথা আর শরীরের এক পাশ সোনার। নেউল আসিয়া ঠিক মানুষের মতো বলিতে লাগিল, "হে রাজামহাশয়গণ! উঞ্ছবৃত্তি নামক ব্রাহ্মণ যে ছাতু দান করিয়াছিলেন, সে কাজ আপনাদের যজ্ঞের চেয়ে অনেক বড়!"

এ কথায় সকলে আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এমন কি দেখিয়াছ বা শুনিয়াছ যে, এই যজ্ঞকে তাহা অপেক্ষা কম মনে করিলে?"

তাহাতে নেউল বলিল, "আপনারা মনোযোগ দিয়া শ্রবণ করুন। উঞ্ছবৃত্তি নামক এক ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহার স্ত্রী, এক পুত্র ও পুত্রবধূ ছিল। ক্ষেত্রের শস্য কাটিয়া নিলে যাহা পড়িয়া থাকে, উঞ্ছবৃত্তি এবং তাঁহার পরিবার সেই শস্যমাত্র আহার করিতেন; এইরূপে তাঁহাদের দিন যাইত।

"তারপর দেশে দুর্ভিক্ষ আসিল, ক্ষেত্রের শস্য নষ্ট হইল, ব্রাহ্মণের কষ্টও বৃদ্ধি পাইল। তখন কোনোদিন অতি কষ্টে তাঁহাদের কিঞ্চিৎ আহার জুটিত, কোনোদিন একেবারেই জুটিত না।

"এই সময়ে একবার সারাদিন ঘুরিয়া, শেষ বেলায় ব্রাহ্মণ কিঞ্চিৎ যব পাইলেন। তাহাতে তাঁহার পরিবারের লোকেরা আহ্লাদিত হইয়া, সেই যবের ছাতু প্রস্তুত করিল। তারপর সকলে স্নান, আহ্নিক অন্তে সেই ছাতু আহারের আয়োজন করিলেন।

"এমন সময় সেখানে এক অতিথি ব্রাহ্মণ ক্ষুধায় কাতর হইয়া উপস্থিত। ব্রাহ্মণ সেই অতিথিকে আদরের সহিত তাঁহার নিজের ছাতুর ভাগ আহার করিতে দিলেন, কিন্তু অতিথির তাহাতে তৃপ্তি হইল না।

"তাহা দেখিয়া ব্রাহ্মণী তাঁহার নিজের ভাগ অতিথিকে দিলেন, কিন্তু তাহাতেও তাঁহার তৃপ্তি হইল না।

"তাহা দেখিয়া ব্রাহ্মণের পুত্র তাঁহার নিজের ভাগ অতিথিকে দিলেন, কিন্তু তথাপি তাঁহার তৃপ্তি হইল না।

"তখন ব্রাহ্মণের পুত্রবধূ তাঁহার নিজের ভাগ আনিয়া অতিথিকে দিলেন।

"ইহাতে সেই অতিথি পরম পরিতুষ্ট হইয়া বলিলেন, 'হে ধার্মিক! ঐ দেখ স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতেছে; দেবতারা তোমার স্তব করিতেছেন। এখন তুমি পরম সুখে সপরিবারে স্বর্গে চলিয়া যাও।'

"সেই অতিথি ছিলেন, স্বয়ং ধর্ম। তাঁহার কথায় ব্রাহ্মণ স্ত্রী, পুত্র এবং পুত্রবধূ সহ তখনি স্বর্গে চলিয়া গেলেন। তারপর আমি গর্ত হইতে উঠিয়া, সেই অতিথির পাতের উপর গড়াগড়ি দিতে লাগিলাম। তাহাতেই এই দেখুন! আমার অর্ধেক শরীর স্বর্ণময় হইয়া গিয়াছে।

"সেই অবধি আমি, আমার অবশিষ্ট শরীরটুকু স্বর্ণময় করিবার আশায় যজ্ঞস্থান দেখিলেই তাহাতে গড়াগড়ি দিয়া থাকি। আজ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞের কথা শুনিয়া, অনেক আশায় এখানে আসিয়া গড়াগড়ি দিলাম: কিন্তু আমার শরীর সোনার হইল না! তাই বলিতেছি যে, সেই গরিব ব্রাহ্মণ যে অতিথিকে ছাতু খাওয়াইয়াছিল, তাহা ইহার চেয়ে বড় কাজ।"

এই বলিয়া সেই নেউল তথা হইতে প্রস্থান করিল।



জা হইয়া যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারীর সহিত এমন মিষ্ট ব্যবহার করিতে লাগিলেন যে তাহাতে তাহারা তাঁহাদের সকল দুঃখ ভুলিয়া গেলেন। দুর্যোধনের কথা মনে করিয়া এখন যুধিষ্ঠিরের উপরে তাঁহাদের রাগ হওয়া দূরে থাকুক, বরং যুধিষ্ঠিরের গুণের কথা ভাবিয়া দুর্যোধনকেই অতিশয় দুষ্ট লোক বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

যুধিষ্ঠির ইঁহাদের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিতেন, অর্জুন, নকুল, সহদেব, কুন্তী, দ্রৌপদী প্রভৃতিও, সেইরূপই ব্যবহার করিতেন। বাস্তবিক ইঁহাদের নিকট ধৃতরাষ্ট্র আর গান্ধারী যেমন ভক্তি ও ভালোবাসা পাইতে লাগিলেন, নিজ পুত্রগণের নিকটও তাহা পান নাই।

পনেরো বৎসর এইরূপে কাটিয়া গেল। ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদিগকে পূর্বে যে যন্ত্রণা দিয়াছিলেন, তাঁহার দুঃখের কথা ভাবিয়া ক্রমে আর সকলেই তাহা ভুলিয়া গেলেন ; কিন্তু ভীম তাহা কিছুতেই ভুলিতে পারিলেন না। এজন্য অন্য সকলের ন্যায় ধৃতরাষ্ট্রকে সম্মান এবং ভালোবাসা দানে তিনি অক্ষম হইলেন।

ভীমের এই ভাব ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। শেষে এমন হইল যে, তিনি গোপনে ধৃতরাষ্ট্রের অসম্মান করিতেও ত্রুটি করেন না। ইহাতে ধৃতরাষ্ট্রের কিরূপ কষ্টের কারণ হইল, তাহা বুঝিতেই পার।

এই সময়ে ভীম একদিন, যুধিষ্ঠির অর্জুন প্রভৃতির অসাক্ষাতে ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারীকে শুনাইয়া, নিজ বন্ধুগণের নিকট বলিতেছিলেন, "আমি আমার এই চন্দন মাখা দুখানি হাত দিয়াই ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদিগকে বধ করিয়াছি।"

এ কথা শুনিয়া গান্ধারী চুপ করিয়া রহিলেন। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র ইহা সহ্য করিতে না পারিয়া, তখনি নিজের বন্ধুদিগকে ডাকাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "হে বন্ধুগণ! আমিই যে এই কুরুবংশ নাশের মূল, তাহা তোমরা জান। সকলে যখন আমাকে হিতবাক্য বলিয়াছিল, তখন আমি তাহা শুনি নাই। এতদিনে সেই পাপের দণ্ড গ্রহণ করিতেছি। এখন আমি আর গান্ধারী

প্রতিদিন মৃগচর্ম পরিধান, মাদুরে শয়ন এবং দিনান্তে যৎকিঞ্চিৎ ভোজনপূর্বক ভগবানের নাম লইয়া দিন কাটাই। এ কথা জানিলে যুধিষ্ঠিরের অতিশয় ক্লেশ হইবে বলিয়া, কাহারো নিকট ইহা প্রকাশ করি নাই।"

তারপর তিনি যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, "বাবা যুধিষ্ঠির, তোমার মঙ্গল হউক। তোমার যত্নে এতদিন পরম সুখে কাল কাটাইলাম, এখন আমাদিগের পরকালের পথ দেখিবার সময় উপস্থিত। সুতরাং অনুমতি দাও, আমি আর গান্ধারী বনে গিয়া তপস্যা করি।"

এ কথায় যুধিষ্ঠির নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "জ্যাঠামহাশয়। আমার তুল্য নরাধম আর কেহ নাই। আপনি অনাহারে ভূমি-শয্যায় এত কষ্টে কাল কাটাইয়াছেন, আর আমি আপনার সংবাদ না লইয়া নিশ্চিন্ত রহিয়াছি। আপনি যদি কষ্ট পান, তবে আমার সুখের কি প্রয়োজন? দুর্যোধন আপনার যেরূপ পুত্র ছিল, আমাদিগকেও সেইরূপ মনে করিবেন। আপনি বনে গেলে, এই রাজ্য লইয়া আমি কিছুমাত্র সুখ পাইব না। আপনি আমাদিগের দিকে চাহিয়া মনকে শান্ত করুন, আমরা আপনার সেবা করিয়া কৃতার্থ হই।"

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, "বাবা! বৃদ্ধকালে বনে গিয়া তপস্যা করাই আমাদের কুলের ধর্ম। সুতরাং আমার তাহা করিতে বড়ই ইচ্ছা হইতেছে, তুমি ইহাতে আমাকে নিষেধ করিও না।"

অনাহারে ধৃতরাষ্ট্রের শরীর এতই দুর্বল হইয়াছিল যে, তিনি এইটুকু বলিতে বলিতে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলেন। তাহাতে যুধিষ্ঠিরের অতিশয় দুঃখ হইল বটে, কিন্তু তিনি বহু চেষ্টা, বিস্তর মিনতি করিয়াও ধৃতরাষ্ট্রের মত ফিরাইতে পারিলেন না। ইহার উপরে আবার ব্যাসদেব আসিয়া তাঁহাকে ধৃতরাষ্ট্রের কথায় সম্মত হইতে বলিলে, কাজেই শেষে তাঁহাকে তাহাই করিতে হইল! তখন ধৃতরাষ্ট্র বিনয়বচনে প্রজাদিগের নিকট বিদায় লইয়া, মৃত পুত্র এবং আত্মীয়গণের কল্যাণার্থে অনেক ধন দান-পূর্বক বনগমনে উদ্যত হইলেন।

কার্তিক মাসের পূর্ণিমার দিন, বল্কল এবং মৃগচর্ম পরিধানপূর্বক, ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারী, বিদুর এবং সঞ্জয়কে লইয়া গৃহের বাহির হইলে, স্ত্রী পুরুষ সকলে কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাদের সঙ্গে চলিল। কুন্তী এবং গান্ধারীর কাঁধে ভর দিয়া ধৃতরাষ্ট্র আগে আগে যাইতে লাগিলেন। তাঁহাদের পশ্চাতে যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব, দ্রৌপদী, সুভদ্রা, উত্তরা প্রভৃতি সকলেই চলিলেন। সকলেরই চোখে জল, কাহারো মন স্থির রাখিবার শক্তি নাই।

নগরের বাহিরে আসিয়া ধৃতরাষ্ট্র সকলকে বলিলেন, "এখন তোমরা ঘরে ফিরিয়া যাও।" এ কথায় আর অন্য সকলেই নিরস্ত হইল, কিন্তু বিদুর, সঞ্জয়, এবং কুন্তী আর ঘরে ফিরিলেন না।

কুন্তীকেও বনে যাইতে দেখিয়া পাণ্ডবদিগের যে কি দুঃখ হইল, আমার কি সাধ্য যে তাহা লিখিয়া জানাই। তাঁহারা অতি কাতরস্বরে সাশ্রুনয়নে কত মিনতি করিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে ফিরাইতে পারিলেন না। তখন

অগত্যা তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া সকলকে হস্তিনায় আসিতে হইল।

এদিকে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী, বিদুর আর সঞ্জয় অনেক পথ চলিয়া গঙ্গাতীরে এবং তথা হইতে কুরুক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে অনেক তপস্বীর আশ্রম ছিল। সেই-সকল আশ্রমের নিকটে থাকিয়া তাঁহারা বল্কল ও মৃগচর্ম ধারণপূর্বক কঠোর তপস্যায় রত হইলেন। এইরূপে কিছু-দিন গেল।

পাণ্ডবেরা ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী এবং কুন্তীকে বিদায় দিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা চলিয়া গেলে পর, আর কিছুতেই স্থির হইতে পারিলেন না। এমন-কি, ইঁহাদের শোকে যুধিষ্ঠিরের রাজকার্য করাই অসম্ভব হইয়া উঠিল। সুতরাং একদিন তিনি সকলকে লইয়া ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতিকে দেখিবার জন্য বনে যাত্রা করিলেন।

ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রমের কাছে আসিয়া, তাঁহারা তপস্বীগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাদের জ্যাঠামহাশয় কোথায়?" তপস্বীরা বলিলেন, তিনি যমুনায় স্নান করিতে গিয়াছেন। আপনারা এই পথে যান।"

সেই পথে খানিক দূর গিয়াই তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে, ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী আর সঞ্জয় স্নানান্তে কলসী হাতে আশ্রমে ফিরিতেছেন। সহদেব কুন্তীকে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন, অন্য সকলেরও চক্ষে জল আসিল। তখন তাঁহারা দ্রুতপদে গিয়া, ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী এবং কুন্তীকে প্রণামপূর্বক, তাঁহাদের হাত হইতে কলসী গ্রহণ করিলেন।

তারপর তাঁহারা ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রমে আসিয়া তাঁহাকে ঘেরিয়া বসিলে সেই সময়ের জন্য তাঁহাদের মনের সকল দুঃখ দূর হইয়া গেল। তখন ধৃতরাষ্ট্রের বোধ হইতে লাগিল, তিনি হস্তিনাতেই রহিয়াছেন। আশ্রমে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী আর সঞ্জয় মাত্রই আছেন, কিন্তু বিদুর কোথায়? বিদুরকে দেখিতে না পাইয়া, যুধিষ্ঠির ব্যাকুলচিত্তে ধৃতরাষ্ট্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "জ্যাঠামহাশয়! বিদুর কাকা কোথায়?"

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, "আহার ত্যাগপূর্বক ঘোরতর তপস্যা আরম্ভ করিয়াছেন। তপস্বীরা বনে মাঝে মাঝে তাঁহাকে দেখিতে পান।"

এমন সময় সেই আশ্রমের নিকটেই বিদুরকে দেখিতে পাওয়া গেল। তাঁহার মস্তক জটাকুল, শরীর কর্দমাক্ত, অস্থিচর্ম-সার এবং পরিচ্ছদ বিহীন। একটিবার মাত্র তিনি আশ্রমের দিকে তাকাইয়াই, আবার প্রস্থান করিলেন। যুধিষ্ঠিরও তৎক্ষণাৎ তাঁহার পশ্চাতে বনের দিকে ছুটিতে ছুটিতে বলিতে লাগিলেন, "কাকা! আমি যে আপনার যুধিষ্ঠির, আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছি।"

তখন সেই বিজন বনে বিদুর একটি গাছ ধরিয়া দাঁড়াইলে, যুধিষ্ঠির তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া আবার বলিলেন, "আমি আপনার যুধিষ্ঠির, আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছি।"

এই বলিয়া যুধিষ্ঠির তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইবামাত্র, সেই মহাপুরুষের আত্মা

তাঁহার দেহ ছাড়িয়া যুধিষ্ঠিরের দেহে আসিয়া প্রবেশ করিল। তাঁহার দেহটি তেমনিভাবে গাছ ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, কিন্তু যুধিষ্ঠিরের বোধ হইল যেন তাঁহার বল দ্বিগুণ বাড়িয়া গিয়াছে! অমনি দৈববাণী হইল, "মহারাজ! তুমি ইঁহার দেহ দাহ করিও না। ইঁহার জন্য শোকও করিও না, কেননা ইনি স্বর্গে আসিয়া অতি উচ্চ সম্মান লাভ করিবেন।"

তখন যুধিষ্ঠির আশ্রমে ফিরিয়া এই আশ্চর্য ঘটনার কথা সকলকে বলিলেন। বিদুর যে কে, তাহা পরদিন ব্যাসদেব সেখানে আসিলে তাঁহার নিকট জানা গেল। মাণ্ডব্য মুনির শাপে ধর্মকে মানুষ হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয়, তিনি ছিলেন বিদুর।

সেই সময়ে ব্যাসদেব, ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী প্রভৃতির মনে সান্ত্বনা দিবার নিমিত্ত, অতি আশ্চর্য কাজ করিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যত বীর মারা গিয়াছিলেন, সকলে ব্যাসের ডাকে, পরলোক হইতে ধৃতরাষ্ট্রের নিকট আসিয়া উপস্থিত হন। ইহাতে তখন সেই আশ্রমে কি আনন্দের ব্যাপার যে হইয়াছিল, তাহা কি বলিব! ব্যাসের বরে সে সময়ের জন্য ধৃতরাষ্ট্রের চক্ষুও ভালো হইয়া গেল। সুতরাং তিনিও পুত্রগণকে প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লইলেন।

এক মাস কাল ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রমে থাকিয়া, যুধিষ্ঠির প্রভৃতিরা হস্তিনায় ফিরিয়া আসেন। তারপর দুই বৎসর চলিয়া গেলে, একদিন দেবর্ষি নারদ যুধিষ্ঠিরের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নারদ ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রম দেখিয়া আসিয়াছেন, এ কথা জানিতে পারিয়া, যুধিষ্ঠির তাঁহাকে বলিলেন, "ভগবন্! যদি জ্যাঠামহাশয়, জ্যেঠিমা, মা এবং সঞ্জয়ের কোনো সংবাদ পাইয়া থাকেন, তবে দয়া করিয়া তাহা বলুন।"

নারদ বলিলেন, "তোমরা তপোবন হইতে চলিয়া আসিলে, ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী আর সঞ্জয় অতি কঠোর তপস্যা আরম্ভ করেন। সে সময়ে ধৃতরাষ্ট্র আর গান্ধারী জল ভিন্ন আর কিছুই খাইতেন না, কুন্তী মাসে একবার আহার করিতেন, সঞ্জয় পাঁচ দিনে একবার আহার করিতেন।

"একদিন ধৃতরাষ্ট্র আর গান্ধারী কুন্তীর সঙ্গে বনের দিকে যাত্রা করেন। তাঁহারা ফিরিয়া আসিবার সময় ভীষণ দাবানল জ্বলিয়া উঠিল। অনাহারে নিতান্ত দুর্বল থাকায় সে আগুন হইতে কোনোমতেই তাঁহাদের পলায়নের শক্তি হইল না! তখন ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে বলিলেন, 'সঞ্জয়! তুমি শীঘ্র এখান হইতে পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা কর। আমরা এই অগ্নিতেই দেহত্যাগ করিয়া স্বর্গে যাইব।'

"এই বলিয়া ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী এবং কুন্তী, পূর্বমুখে ভগবানের ধ্যান আরম্ভ করিলে, দেখিতে দেখিতে তাঁহাদের দেহ ভস্ম হইয়া গেল।

"সঞ্জয় অনেক কষ্টে সেই অগ্নি হইতে রক্ষা পাইয়া, তাপসগণের নিকট এই সংবাদ প্রদানকালে আমি তথায় উপস্থিত ছিলাম। তপস্বীদিগকে এই সংবাদ দিয়া, সঞ্জয় হিমাচলে চলিয়া গিয়াছেন। তারপর আমি, তোমাদিগকে এই সংবাদ দিবার জন্য এখানে আসিয়াছি। আসিবার সময় আমি ধৃতরাষ্ট্র,

গান্ধারী আর কুন্তীর শরীর দেখিয়া আসিয়াছি। তাঁহারা ইচ্ছাপূর্বকই অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জন করায় তাঁহাদের স্বর্গলাভ হইবে। অতএব তাঁহাদের জন্য তোমাদের শোক করা উচিত নহে।"

হায়, কি কষ্টের কথা! যুধিষ্ঠির এই দারুণ সংবাদে মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, হস্তিনায় হাহাকার উঠিল। পান্ডবদিগের মনে হইল যে, 'গুরুজনেরা যখন এইরূপে পুড়িয়া মরিলেন, তখন আমাদের রাজ্য, ধর্ম, বীরত্ব সকলই বৃথা।'

নারদ উপদেশ দ্বারা তাঁহাদিগকে শান্ত করিলে, সকলে গঙ্গাতীরে গিয়া ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী আর কুন্তীর তর্পণ ও শ্রাদ্ধাদি শেষ করিলেন।

বনবাসে ধৃতরাষ্ট্র, কুন্তী আর গান্ধারীর তিন বৎসর কাটিয়াছিল।



রপর আঠারো বৎসর চলিয়া গেল। যুধিষ্ঠিরের রাজত্বের ছত্রিশ বৎসর পূর্ণ হইলে অনেক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে, তাহাতে তিনি বুঝিতে পারেন যে শীঘ্রই কোনো বিপদ হইবে।

যে বিপদ হইল, তাহা পাণ্ডব-দের নহে, যাদবদের (অর্থাৎ কৃষ্ণ যে বংশে জন্মিয়াছেন, তাঁহাদের)। এইরূপ একটা বিপদ যে হইবে তাহা কৃষ্ণ আগেই জানিতেন, কিন্তু এমনি হওয়া আবশ্যক বুঝিয়া তিনি তাহাতে ব্যস্ত হন নাই।

বিপদের কারণ অতি সামান্য। যদুকুলের কয়েকটি বালক একটা লোহ-মুসলের কথা লইয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্র, কণ্ব ও নারদকে উপহাস করে। ইহাতে তাঁহারা বিষম ক্রোধভাবে এই দারুণ শাপ দেন, "এই মুসলের দ্বারাই, কৃষ্ণ আর বলরাম ভিন্ন তোমাদের বংশের সকলে নষ্ট হইবে!"

কৃষ্ণ জানিতেন যে এইরূপ হইবে, এবং হওয়া আবশ্যক, সুতরাং তিনি আর এই বিপদ নিবারণের কোনো চেষ্টা করিলেন না। মুসলটিকে চূর্ণ করিয়া সমুদ্রে ফেলিয়া দেওয়া হইল। যাদবদিগের মধ্যে অনেকে মদ খাইত। পাছে এই-সকল লোক মাতাল হইয়া কোনো একটা কিছু বিপদ ঘটায়, এজন্য তখন হইতেই মদ্যপানও বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। আশা ছিল, ইহাতে লোকের চরিত্র ভালো হইবে কিন্তু ফল হইল ঠিক ইহার বিপরীত।

এই সময়ে একদিন যাদবেরা সকলে প্রভাস তীর্থে যায়। তাহারা মনে করিয়াছিল যে, সেখানে গিয়া খুব আমোদ-প্রমোদ করিবে, সুতরাং তাহার আয়োজন সঙ্গে লইতে ভুলিল না। দুঃখের বিষয় এই যে, এত নিষেধ সত্ত্বেও তাহারা সেই আয়োজনের সঙ্গে মদও লইল, সেই মদে যে কি সর্বনাশ হইল, তাহার কথা শুন।

প্রভাস তীর্থে গিয়া বলরাম, সাত্যকি, কৃতবর্মা প্রভৃতি সকলে কৃষ্ণের সম্মুখেই সুরাপান করিতে লাগিলেন। ইহার পর তাঁহারা মাতাল হইয়া ঝগড়া আরম্ভ করিবেন, তাহা বিচিত্র কি? তখন সাত্যকি কৃতবর্মাকে বলিলেন, "তুই বড় নির্দয় লোক! ঘুমের ভিতরে লোককে মারিতে গিয়াছিলি!"

ইহাতে কৃতবর্মা চটিয়া বলিলেন, "তুই তো ভূরিশ্রবার মাথা কাটিয়াছিলি! তোর মতো নির্দয় কে আছে?"

এইরূপে কথায় কথায় বিবাদ আরম্ভ হইয়া, শেষে তাহা বড়ই সাংঘাতিক হইয়া দাঁড়াইল। সাত্যকি কৃতবর্মার মাথা কাটিয়া ফেলিলেন, তাহাতে কৃত-বর্মার পক্ষের লোকেরা, তাঁহাদের নিজ নিজ থালা হাতেই, সাত্যকিকে আক্রমণ করিলেন। তখন কৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্ন আসিয়া সাত্যকির সাহায্য করিতে লাগিলেন।

তারপর ক্রমে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইলে, কৃতবর্মার লোকেরা, কৃষ্ণের সম্মুখেই, সাত্যকি এবং প্রদ্যুম্নকে বধ করিল। তাহাতে কৃষ্ণ নিকটস্থ শরবণ হইতে এক মুষ্টি শর তুলিয়া লইবামাত্র তাহা একটা মুদ্গর হইয়া গেল! সেই মুদ্গর দিয়া তিনি কৃতবর্মার পক্ষের লোকদিগকে বিনাশ করিলেন!

মুনির শাপের কি বিষম তেজ! সে সময়ে কেহ একটিমাত্র শর তুলিয়া লইলেও, তাহা বজ্রের মতন হইয়া যাইতে লাগিল। সেই শরের ঘায়ে কৃষ্ণের সাক্ষাতেই তাঁহার পুত্র, ভাই, নাতি প্রভৃতির মৃত্যু হইলে, তিনি ক্রোধভরে সেখানকার প্রায় সকলকে মারিয়া শেষ করিলেন।

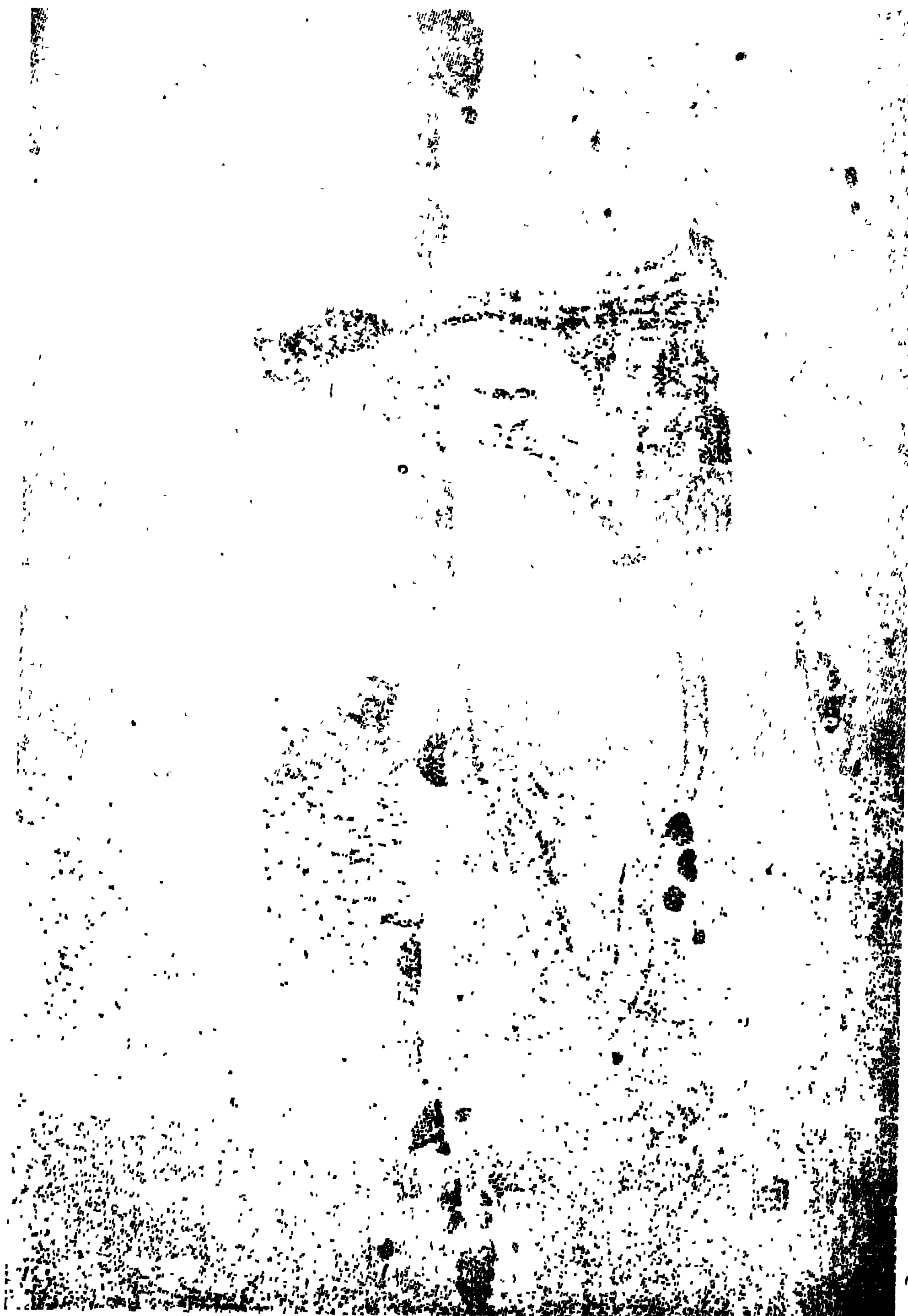
তারপর কৃষ্ণ, বভ্রু এবং দারুক, বলরামকে খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিলেন যে, তিনি এক বৃক্ষের তলায় বসিয়া চিন্তা করিতেছেন। তখন কৃষ্ণ, অর্জুনের নিকট সংবাদ দিবার জন্য দারুককে হস্তিনায় পাঠাইয়া বভ্রুকে বলিলেন, "বভ্রু, তুমি শীঘ্র গিয়া স্ত্রীলোকদিগকে রক্ষা কর।"

কিন্তু বভ্রু অধিক দূর না যাইতেই, এক ব্যাধের মুদ্গর আসিয়া তাঁহার উপরে পড়ায় তাঁহার মৃত্যু হইল। তাহা দেখিয়া কৃষ্ণ বলরামকে সেইখানে তাঁহার অপেক্ষা করিতে বলিয়া, নিজেই স্ত্রীলোকদিগকে রক্ষার ব্যবস্থা করিতে গেলেন।

নিজের পিতা বসুদেবের হাতে এই কার্যের ভার দিয়া কৃষ্ণ আবার বলরামের নিকট আসিয়া দেখেন যে তাঁহার মুখ দিয়া সহস্র ফণাযুক্ত ভয়ংকর এক সাপ নির্গত হইতেছে! উহার শরীর শ্বেতবর্ণ এবং মুখসকল লাল! বাহির হইয়াই সেই সাপ সমুদ্রের দিকে ছুটিয়া চলিলে, সমুদ্র, বরুণ এবং প্রধান প্রধান নাগগণ তাহার পূজা করিতে করিতে, তাহাকে লইয়া গেলেন। বলরামের অসার নির্জীব দেহ সেইখানেই পড়িয়া রহিল।

কৃষ্ণ বুঝিতে পারিলেন যে, বলরাম ঐ সর্পরূপেই নিজের দেহত্যাগ করিয়া গেলেন। ইহাতে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া, বন মধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে, তিনি এক স্থানে শয়ন করিয়াছেন, এমন সময় জরা নামক এক ব্যাধ, মৃগ মনে করিয়া, তাঁহার প্রতি এক বাণ মারিল। সেই বাণ তাঁহার পদতলে বিঁধিয়া গেল। ব্যাধ জানে, হরিণই পড়িয়াছে : কিন্তু তথায় উপস্থিত হইয়া বুঝিতে পারিল, সে কি সর্বনাশ করিয়াছে! অমনি সে কৃষ্ণের পায়ে লুটাইয়া পড়িল। কিন্তু কৃষ্ণ তাহার উপর কিছুমাত্র রাগ না করিয়া, তাহাকে সান্ত্বনাপূর্বক স্বর্গে চলিয়া গেলেন।

এদিকে দারুকের নিকট সংবাদ পাইয়া, অর্জুন দ্বারকায় আসিয়া দেখিলেন যে, দ্বারকাপুরী শ্মশান হইয়া গিয়াছে! বসুদেব তখনো জীবিত ছিলেন, কিন্তু পরদিন তিনিও মারা গেলেন।



তখন আর দুঃখ করিবার সময় ছিল না। বসুদেবের এবং প্রভাস তীর্থে নিহত যাদবগণের সৎকারের অন্য লোক উপস্থিত না থাকায়, অর্জুনকেই সর্বাগ্রে সে-সকল কাজের চেষ্টা দেখিতে হইল। তারপর কৃষ্ণের পৌত্র বজ্র এবং

দ্বারকার স্ত্রীলোকদিগকে লইয়া তিনি ইন্দ্রপ্রস্থ যাত্রা করিলেন। সেই সময়ে একটি অতি আশ্চর্য ঘটনা ঘটে। অর্জুন সকলকে লইয়া দ্বারকানগরের যে স্থানই ছাড়িয়া যান, অমনি সমুদ্র আসিয়া তাহা গ্রাস করিতে লাগিল।

তারপর কি নিদারুণ ব্যাপার হইল শুন। অর্জুন দ্বারকার স্ত্রীলোকদিগকে লইয়া ইন্দ্রপ্রস্থ যাত্রা করিলে পথমধ্যে একদল দস্যু আসিয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল। অর্জুন দস্যুনাশার্থ গাণ্ডীব তুলিতে গিয়া দেখেন, দেহে বল কিছুমাত্রও নাই, গুণচুকু পরানোই প্রায় অসাধ্য হইয়াছে। বহু কষ্টে যদি গুণ পরানো হইল, উৎকৃষ্ট অস্ত্রগুলির কথা কিছুতেই মনে পড়িল না। হা বিধাতঃ! এমন যে অক্ষয় তূণ, এই বিপদের সময় তাহাও শূন্য হইয়া গেল।

কাজেই দস্যুরা স্ত্রীলোকদিগের অনেককে ধরিয়া লইয়া গেল, অর্জুন তাহাদিগকে কিছুতেই বারণ করিতে পারিলেন না। তখন তিনি ভগ্নহৃদয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে আসিয়া, তথায় বজ্রকে রাজা করিলেন।

এই-সকল ঘটনার কথা ভাবিয়া অর্জুনের মন বড়ই অস্থির হইয়া উঠিল। তিনি কিছুতেই শান্তিলাভ করিতে না পারিয়া, ব্যাসদেবের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্যাস তাঁহার মলিন মুখ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে অর্জুন? আজ কেন তোমাকে এরূপ চিন্তিত এবং বিষণ্ণ দেখিতেছি?"

এ কথার উত্তরে অর্জুন তাঁহাকে কৃষ্ণ, বলরাম এবং অন্যান্য যাদবগণের মৃত্যুর সংবাদ দিয়া বলিলেন, "কৃষ্ণের শোকে আমার জীবনধারণ করাই ভার বোধ হইতেছে, আমি কিছুতেই শান্তি পাইতেছি না। তারপর দ্বারকার নারীগণকে আনয়নকালে একদল দস্যু আমাদিগকে আক্রমণ করে। ঐ সময়ে আমার গাণ্ডীবে গুণ চড়ানো অতীব ক্লেশকর হইল ; অক্ষয় তূণ শূন্য হইয়া গেল ; দিব্য অস্ত্রসকল কিছুতেই স্মরণে আসিল না। এই-সকল ঘটনার কথা ভাবিয়া আমি নিতান্ত অস্থির হইয়াছি। ভগবন্! এখন আমার কি কর্তব্য, তাহা বলুন।"

অর্জুনের কথা শুনিয়া ব্যাস বলিলেন, "এই পৃথিবীতে তোমাদের কার্য শেষ হইয়াছে। আমার মতে এখন তোমাদের এ-স্থান পরিত্যাগ করাই উচিত! তোমার কাজ শেষ হওয়াতেই, দিব্য অস্ত্রসকল তোমাকে ছাড়িয়া গিয়াছে, তাই তুমি তাহাদিগকে স্মরণ করিতে পার নাই। এখন তোমাদের স্বর্গারোহণের কাল উপস্থিত : সুতরাং তাহারই চেষ্টা দেখ।"



যদু বংশের বিনাশ ও কৃষ্ণের দেহত্যাগের কথা শুনিয়া আর যুধিষ্ঠির পৃথিবীতে থাকিতে চাহিলেন না। সুতরাং তিনি এখন মহাপ্রস্থানই (অর্থাৎ প্রাণত্যাগের উদ্দেশ্যে হিমালয়ে প্রস্থান) কর্তব্য বুঝিয়া, অর্জুনকে বলিলেন, "ভাই! আমি ভাবিয়াছি, শীঘ্রই দেহত্যাগ করিব। এখন তোমরা কি করিবে, স্থির কর।"

অর্জুন বলিলেন, "আমিও তাহাই স্থির করিয়াছি।"

এ কথা শুনিয়া ভীম, নকুল, সহদেব এবং দ্রৌপদী বলিলেন, "আমরাও তাহাই করিব।"

এইরূপে সকলের পরামর্শ স্থির হইলে, পরীক্ষিৎকে হস্তিনার রাজা করিয়া যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব এবং দ্রৌপদী মহাপ্রস্থানে উদ্যত হইলেন। প্রজাগণ কাতরস্বরে তাঁহাদিগকে বারণ করিল ; কিন্তু তাঁহারা আর মর্তবাসে সম্মত হইলেন না।

এইরূপ সময়ের করণীয় অনুষ্ঠানাদি শেষ হইলে, পাণ্ডবগণ এবং দ্রৌপদী মহামূল্য বস্ত্রাভরণ পরিত্যাগপূর্বক, বল্কল পরিয়া হস্তিনা নগরকে শোকসাগরে ভাসাইয়া চিরকালের জন্য তথা হইতে যাত্রা করিলেন। ঐ সময়ে একটি কুকুরও তাঁহাদের অনুগামী হইল। এ সময়ে পশ্চাৎ হইতে ডাকিতে নাই। নগরবাসীরা নীরবে, নতশিরে বহুদূর অবধি তাঁহাদের সঙ্গে চলিল, কিন্তু কেহ তাঁহাদিগকে ফিরিতে বলিল না।

ক্রমে সকলেই ঘরে ফিরিল, কিন্তু সেই কুকুরটি ফিরিল না।

পাণ্ডবেরা তথা হইতে ক্রমাগত পূর্বদিকে চলিতে চলিতে, অসংখ্য গিরিনদী পার হইয়া, শেষে লোহিত সাগরের[১] তীরে উপস্থিত হইলেন। এ পর্যন্ত গাণ্ডীব এবং অক্ষয় তূণ অর্জুনের সঙ্গেই ছিল। সেই সময়ে এক পর্বতাকার

[১] ইহা এখনকার লোহিত সাগর নহে। বোধহয় ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীন নাম ঐ রূপ ছিল।

পুরুষ পাণ্ডবদিগের পথরোধ করত বলিলেন, "হে পাণ্ডবগণ! আমি অগ্নি। কৃষ্ণ তাঁহার চক্র পরিত্যাগ করিয়াছেন ; এক্ষণে অর্জুনও গাণ্ডীব পরিত্যাগ করুন। উহাতে আর তাঁহার কোনো প্রয়োজন নাই ; উহা বরুণকে ফিরাইয়া দিতে হইবে।"

এ কথায় অর্জুন গাণ্ডীব ও অক্ষয় তূণ জলে নিক্ষেপ করায় অগ্নি চলিয়া গেলে, পাণ্ডবগণ দক্ষিণ মুখে চলিয়া শেষে লবণ সমুদ্রের তীরে উপস্থিত হইলেন। তথা হইতে সমুদ্রের তীর দিয়া দক্ষিণ-পশ্চিমে ও তারপর ক্রমাগত পশ্চিমদিকে, বহুদূর চলিয়া, আবার সমুদ্রতীর প্রাপ্ত হইলে, জলের উপরে দ্বারকার মঠাদির চূড়াসকল দেখা গেল।

তারপর তাঁহারা ক্রমাগত উত্তরদিকে চলিয়া, অবশেষে হিমালয়ে আরোহণ করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে সহসা দ্রৌপদীর অঙ্গ অবশ হইয়া গেল। তিনি আর চলিতে না পারিয়া সেই স্থানেই পড়িয়া গেলেন। তাহা দেখিয়া ভীম যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ! দ্রৌপদী তো কখনো কোনো অপরাধ করেন নাই, তবে কেন ইঁহার পতন হইল?"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "দ্রৌপদী আমাদের অপেক্ষা অর্জুনকে অধিক ভালোবাসিতেন, সেই পাপেই তাঁহার পতন হইয়াছে।"

এই বলিয়া যুধিষ্ঠির ভগবানের চিন্তা করিতে করিতে পথ চলিতে লাগিলেন। মহাপ্রস্থানের যাত্রীকে ফিরিয়া তাকাইতে নাই, সুতরাং তিনি দ্রৌপদীর পানে চাহিয়া দেখিলেন না।

কিছুকাল পরে সহদেবও অবশ হইয়া পড়িয়া গেলেন। তখন ভীম যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ! সহদেব অতি সুশীল ছিল এবং সর্বদাই আমাদের সেবা করিত। সে কি অপরাধে পতিত হইল?"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "সর্বপেক্ষা বিদ্বান বলিয়া সহদেবের অহংকার ছিল। তাহাতেই উহার পতন হইয়াছে।"

এই বলিয়া যুধিষ্ঠির একমনে ভগবানকে ভাবিয়া চলিতে লাগিলেন। সহদেবের দিকে ফিরিয়া চাহিলেন না।

তারপর দ্রৌপদী ও সহদেবের শোকে অবশ হইয়া নকুল পড়িয়া গেলে ভীম পুনরায় যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ! নকুল পরম ধার্মিক ছিল ; সে কিজন্য পতিত হইল?"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "নকুল ভাবিত, তাঁহার মতো সুন্দর লোক পৃথিবীতে নাই। তাহাতে তাহার পতন হইয়াছে। চল! উহাদের দিকে আর ফিরিয়া তাকাই-বার প্রয়োজন নাই।"

এই বলিয়া যুধিষ্ঠির, আর ফিরিয়া না চাহিয়া, একমনে পথ চলিতে লাগিলেন।

কিঞ্চিৎ পরে দ্রৌপদী, সহদেব এবং নকুলের জন্য শোক করিতে করিতে অর্জুনও পড়িয়া গেলেন। তাহাতে ভীম জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ! মহাত্মা

অর্জুন হাস্যচ্ছলেও কদাচ মিথ্যা কথা বলে নাই ; তাহার কেন পতন হইল?"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "অর্জুন অহংকারপূর্বক বলিয়াছিল যে, সে একদিনেই সকল শত্রু সংহার করিবে, কিন্তু তাহা করিতে পারে নাই। সে অন্য বীরগণকে তুচ্ছ করিত। এইজন্যই আজ তাহাকে পড়িতে হইল।"



এই বলিয়া যুধিষ্ঠির স্থিরচিত্তে ভীম আর সেই কুকুরকে লইয়া চলিতে লাগিলেন।

কিছুকাল পরে ভীমেরও শরীর অবশ হইয়া গেল। তিনি ভূপতিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে যুধিষ্ঠিরকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ! আমি আপনার অতি প্রিয়পাত্র, আমার কি অপরাধ হইয়াছিল?"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "তুমি অন্যকে না দিয়া নিজে অপরিমিত আহার করিতে আর তোমার তুল্য বলবান কেহ নাই, বলিয়া অহংকার করিতে। ইহাই তোমার অপরাধ!"

এই বলিয়া ভীমের দিকেও আর না চাহিয়া, যুধিষ্ঠির স্থিরচিত্তে পথ চলিতে লাগিলেন। সেই কুকুর তখনো তাঁহার সঙ্গে ছিল। অনন্তর যুধিষ্ঠির আর অল্প দূর গমন করিলেই ইন্দ্র উজ্জ্বল রথারোহণে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "এই রথে উঠ, তোমাকে স্বর্গে লইয়া যাইতেছি।"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "আমার দ্রৌপদী এবং প্রিয় ভাইসকল পথে পড়িয়া আছে। তাহাদিগকে ছাড়িয়া আমার স্বর্গে যাইতে ইচ্ছা নাই।"

তাহা শুনিয়া ইন্দ্র বলিলেন, "উঁহারা তো তোমার পূর্বেই স্বর্গে গিয়াছেন, উঁহাদের জন্য কেন দুঃখ করিতেছ? তুমি তোমার এই শরীর সমেতই স্বর্গে গিয়া তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইবে।"

তখন যুধিষ্ঠির বলিলেন, "দেবরাজ! এই কুকুর আমাকে ভালোবাসিয়া এতদূরে আমার সঙ্গে আসিয়াছে, ইহাকে ছাড়িয়া আমি কেমন করিয়া স্বর্গে যাইব? সুতরাং দয়া করিয়া ইহাকেও আমার সঙ্গে আসিতে দিন!"

ইন্দ্র বলিলেন, "আজ তুমি স্বর্গে গিয়া দেবোচিত সুখ লাভ করিবে, আজ কেন একটা কুকুরের জন্য চিন্তিত হইতেছ? ওটা থাকুক; তুমি আইস!"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "স্বর্গের সুখ লাভ করিতে হইলে যদি আমার পরম ভক্ত এই কুকুরটিকে পরিত্যাগ করিতে হয়, তবে সে সুখে আমার প্রয়োজন নাই।"

ইন্দ্র বলিলেন, "যে কুকুরের সঙ্গে বাস করে, সে স্বর্গে যাইতে পারে না। সুতরাং শীঘ্র ওটাকে পরিত্যাগ কর!"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "ও আমাকে ভালোবাসে, সুতরাং আমি নিজের সুখের জন্য উহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না।"

ইন্দ্র বলিলেন, "তুমি দ্রৌপদীকে আর তোমার ভাইদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারিলে, আর একটা কুকুরকে ছাড়িতে পারিবে না?"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "আমি তো উহাদিগকে পরিত্যাগ করি নাই, উহাদের মৃত্যু হইয়াছে। জীবিত থাকিতে আমি কখনো উহাদিগকে ছাড়িয়া যাই নাই। মৃত্যুর পর আর উহাদিগকে ছাড়া না ছাড়া আমার হাতে ছিল না, কাজেই কি করিব?"

তখন সেই কুকুর, হঠাৎ তাহার পশুবেশ পরিত্যাগপূর্বক, সাক্ষাৎ ধর্মরূপে পরম স্নেহভরে যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, "বৎস, আমি তোমাকে পরীক্ষা করিবার জন্যই কুকুরের বেশে তোমার সঙ্গে আসিয়াছিলাম। তুমি যে, তোমার ভক্ত কুকুরটির জন্য স্বর্গও ছাড়িতে প্রস্তুত হইয়াছ, ইহাতে বেশ বুঝিলাম, তোমার

মতো ধার্মিক আর স্বর্গেও নাই। তুমি এই দেহেই স্বর্গে যাইতে পাইবে।"

তখন সকল দেবতারা মিলিয়া, দিব্য রথে করিয়া মহানন্দে যুধিষ্ঠিরকে স্বর্গে লইয়া গেলেন। তিনি তথায় উপস্থিত হইবামাত্র, নারদ উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, "যুধিষ্ঠির ভিন্ন আর কেহই সশরীরে স্বর্গে আসিতে পারেন নাই! ইনিই সকল ধার্মিকের শ্রেষ্ঠ!"

নারদের কথা শেষ হইলে যুধিষ্ঠির বলিলেন, "আমার ভাইয়েরা যেখানে গিয়াছে, সে স্থান ভালোই হউক আর মন্দই হউক, আমিও সেইখানে যাইব। তাহাদিগকে ছাড়িয়া আমি থাকিতে চাহি না।"

তাহা শুনিয়া ইন্দ্র বলিলেন, "মহারাজ! তুমি নিজ পুণ্যবলে এখানে আসিয়াছ ; এইখানেই থাক। উঁহারা তোমার সমান পুণ্য সঞ্চয় করিতে পারেন নাই। উঁহারা কেমন করিয়া আসিবেন?"

যুধিষ্ঠির তথাপি বলিলেন, "দ্রৌপদী আর আমার ভাইসকল যেখানে, আমি সেইখানেই যাইতে চাহি। উঁহাদিগকে ছাড়িয়া এখানে থাকিতে আমার কিছুতেই ইচ্ছা হইতেছে না।"



ধিষ্ঠির স্বর্গে গিয়া দেখিলেন যে, দুর্যোধন সেখানে পরম সুখে বসিয়া আছেন, কিন্তু ভীমার্জুন প্রভৃতি কেহই তথায় নাই। ইহাতে তিনি নিতান্ত আশ্চর্য এবং দুঃখিত হইলে, নারদ তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, "দুর্যোধন ধর্মযুদ্ধে প্রাণ দিয়াছেন, আর তিনি ঘোর বিপদেও ভীত হন নাই। এই পুণ্যেই তাঁহার স্বর্গলাভ হইয়াছে!"

তখন যুধিষ্ঠির দেবতাদিগকে বলিলেন, "হে দেবতাগণ, আমি তো এখানে কর্ণকে দেখিতে পাইতেছি না। যে-সকল রাজা আমার জন্য যুদ্ধে প্রাণ দিয়াছিলেন, তাঁহারাই-বা এখন কোথায়? তাঁহারা কি স্বর্গে আসিতে পান নাই? তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া আমি এ-স্থানে কিরূপে থাকিব? কর্ণের জন্য আমার প্রাণে বড়ই ক্লেশ হইতেছে, আমি তাঁহাকে দেখিতে চাই। ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব, দ্রৌপদী ইঁহাদিগকে দেখিতে আমার বড়ই ইচ্ছা হইতেছে। আমি সত্য কহিতেছি, তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া আমি এখানে থাকিতে পারিব না। উঁহারা যেখানে নাই, সেখানে থাকিয়া আমার কি সুখ? উঁহারা যেখানে আছেন, সেই স্থানই আমার স্বর্গ!"

এ কথায় দেবগণ বলিলেন, "বৎস! তোমার যদি উঁহাদিগের নিকট যাইবার নিতান্ত ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে শীঘ্র সেখানে যাও। ইন্দ্র আমাদিগকে তোমার সকল ইচ্ছাই পূর্ণ করিতে বলিয়াছেন, সুতরাং আমরা তাহা করিব!"

এই বলিয়া তাঁহারা একজন দেবদূতকে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি শীঘ্র ইঁহাকে নিয়া ইঁহার আত্মীয়গণের সহিত দেখা করাও।"

দেবদূত তখনি যুধিষ্ঠিরকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল। সে বড়ই ভীষণ পথ; পাপীরা উহাতে চলাফেরা করে। মশা, মাছি, কীট, ভল্লুকাদিতে এবং অস্থি, রক্ত-মাংসের কর্দম ও পূতিগন্ধে সেই ঘোর অন্ধকার পথ পরিপূর্ণ। চারিদিকে ভীষণ অগ্নি। লৌহচঞ্চু কাক ও গৃধিনীগণ দলে দলে তথায় উড়িয়া বেড়াইতেছে। পর্বতাকার সূচিমুখ ভূতগণ তথায় ছুটাছুটি করিতেছে; তাহাদের কোনোটা রক্তমাখা, কোনোটার হাত-পা কাটা, কোনোটার নাড়ি-ভুঁড়ি

বাহির হইয়া পড়িয়াছে। সেখানকার নদীর জল আগুনের মতো গরম ; গাছের পাতা ক্ষুরের মতো ধারাল। চারিদিকে লোহার কলসীতে ফুটন্ত তেলের মধ্যে ভাজা হইতে হইতে পাপীরা চীৎকার করিতেছে।

কি ভয়ংকর স্থান! যুধিষ্ঠির তাহা দেখিয়া দূতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, এ পথে আর কতদূর যাইতে হইবে?"

দেবদূত বলিলেন, "মহারাজ, আপনার কষ্ট হইলে, দেবতারা আপনাকে ফিরাইয়া নিতে বলিয়াছেন। সুতরাং যদি বলেন, এখান হইতে ফিরি।"

এ কথায় যুধিষ্ঠির সেখান হইতে ফিরিলেন, আর অমনি চারিদিক হইতে, অতি কাতরস্বরে সকলে বলিতে লাগিল, "হে মহারাজ! দয়া করিয়া আর-এক মুহূর্ত অপেক্ষা করুন! আপনার আগমনে সুন্দর বাতাস বহিয়া আমাদিগকে অনেক শীতল করিয়াছে। অনেকদিন পরে আপনাকে দেখিয়া আমাদের বড় সুখ হইয়াছে, আপনি দয়া করিয়া আর-এক মুহূর্ত অপেক্ষা করুন।"

চারিদিক হইতে এইরূপ কাতর বাক্য শুনিয়া, যুধিষ্ঠিরের বড়ই দয়া হইল, কিন্তু উহা কাহার শব্দ, কোথা হইতে আসিতেছে, তিনি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তখন তিনি বলিলেন, "হে দুঃখী লোকসকল! তোমরা কে? আর কিজন্য তোমরা কষ্ট পাইতেছ?"

যুধিষ্ঠির এই কথা কহিবামাত্র চারিদিক হইতে একসঙ্গে, "আমি কর্ণ!" "আমি ভীম!" "আমি অর্জুন!" "আমি নকুল!" "আমি সহদেব!" "আমি দ্রৌপদী!" "আমরা আপনার পুত্রগণ!" এইরূপে সকলে পরিচয় দিতে লাগিলেন। তখন যুধিষ্ঠির ভাবিলেন, 'হায়! কি কষ্ট! আমার পুণ্যবান প্রিয়তমেরা এমন কি পাপ করিয়াছে যে, তাহাদিগকে এ স্থানে আসিতে হইল? আর দুষ্ট দুর্যোধনই-বা এমন কি পুণ্য করিয়াছে যে, সে সবান্ধবে স্বর্গে বসিয়া সুখ ভোগ করিতে পাইল? এ অতি অবিচার।'

এইরূপ চিন্তা করিয়া যুধিষ্ঠির দেবদূতকে বলিলেন, "মহাশয়! আপনি যাঁহাদের দূত, তাঁহাদিগকে বলুন যে, আমি এই স্থানেই থাকিলাম। আর আমি সেখানে যাইব না। আমার ভাইয়েরা আমাকে পাইয়া সুখী হইয়াছে।"

দেবদূত এ-সকল কথা ইন্দ্রকে জানাইলে, দেবতারা সকলে সেই ভয়ংকর স্থানে যুধিষ্ঠিরের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন দেখিতে দেখিতে সেখানকার সকল অন্ধকার, দুর্গন্ধ এবং ভয় দূর হইয়া, সে স্থান স্বর্গের ন্যায় সুন্দর হইয়া গেল।

তারপর ইন্দ্র যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, "মহারাজ! দেবতারা তোমার উপর অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছেন। আর তোমাকে কষ্ট পাইতে হইবে না ; তোমার পুণ্যের বলে সর্বাপেক্ষা উচ্চ ফল লাভ হইয়াছে। নরক দেখিতে হইল বলিয়া তুমি বিরক্ত হইও না। সকল রাজাকেই একবার নরক দেখিতে হয়। পাপ-পুণ্য সকলেরই থাকে। যাহার পাপ অধিক, সে আগে অল্পকাল স্বর্গে থাকিয়া, পরে নরক ভোগ করে। যাহার পুণ্য অধিক, সে আগে নরকে থাকিয়া, শেষে স্বর্গ ভোগ করে। এইজন্যই তোমাকে আগে নরক দেখাইয়াছি। তুমি

যে অশ্বত্থামার বধের কথা বলিয়া দ্রোণকে ফাঁকি দিয়াছিলে, সেই পাপে তোমাকে নরক দেখিতে হইল। এইরূপ অল্প-অল্প পাপ ভীমার্জুন, দ্রৌপদী প্রভৃতি সকলেরই ছিল, তাই সকলকেই কিছু কিছু কষ্ট পাইতে হইয়াছে। কিন্তু এখন আর তাহাদের কোনো কষ্ট নাই, তাহারা সকলেই স্বর্গে গিয়াছে। তোমার পক্ষের রাজাদেরও সকলেরই স্বর্গলাভ হইয়াছে। এখন তুমি শোক পরিত্যাগপূর্বক আমার সঙ্গে আইস, সকলকেই দেখিয়া সুখী হইবে। ঐ দেখ, দেবনদী মন্দাকিনী বহিয়া যাইতেছে, উঁহার জলে স্নান করিলে, আর তোমার শোক, তাপ, হিংসা, ক্রোধ প্রভৃতি কিছুই থাকিবে না।"

সকলের শেষে ধর্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, "বৎস! আমি তোমার উপর বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি। বারবার তোমাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম যে, তোমার তুল্য ধার্মিক আর নাই। তুমি যে তোমার ভাইদিগকে ছাড়িয়া স্বর্গ ভোগ করিতে চাহ নাই, ইহাতেও তোমার মহত্ত্বের প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। এখন তুমি আমার সঙ্গে ঐ মন্দাকিনীর পবিত্র জলে স্নান কর।"

মন্দাকিনীর জলে স্নান করামাত্র যুধিষ্ঠিরের মানুষ দেহ দূর হইয়া দেবতুল্য অপরূপ উজ্জ্বল মূর্তি দেখা দিল। তখন তিনি ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব, দ্রৌপদী, কুন্তী, মাদ্রী, পাণ্ডু, ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি আত্মীয়-গণ এবং কৃষ্ণের সহিত মিলিয়া স্বর্গের অতুল আনন্দে মগ্ন হইলেন।

ছোট্ট রামায়ণ

কৃত্তিবাসের রামায়ণের মূল কাহিনী সহজ সরল ভাষায়, এত সুন্দর করে বাংলায় কখনো লেখা হয় নি। ছোট-ছোট ঢেউ তুলে, আলো-ছায়ার খেলা দেখিয়ে, স্বয়ং তমসা-নদীই যেন ছলছল কলকল ছন্দে প্রবাহিত হয়েছে।

ছন্দের বৈচিত্র্যই-বা কত। কোথাও যেন পাহাড়ে নদী-পাথরের উপর দিয়ে লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে ঝরঝর করে চলেছে। কোথাও গভীর গম্ভীর প্রশস্ত নদী যেন উপত্যকাকে শ্যামল সজীব করে বয়ে চলেছে। আবার কোথাও যেন ঝড় উঠেছে। এই বইয়ের কাব্যগুণ উপলব্ধি করার একমাত্র উপায় হল আগাগোড়া বইটিকে পাঠ করা।

বাল্মীকির তপোবন তমসার তীরে
ছায়া তার মধুময়, বায়ু বহে ধীরে,
সুখে পাখি গায় গান ফোটে কত ফুল,
কিবা জল নিরমল, চলে কুল-কুল।
মুনির কুটিরখানি গাছের তলায়,
চঞ্চল হরিণ খেলে তার আঙিনায়।
রামায়ণ লিখিলেন সেথায় বসিয়া,
সে বড় সুন্দর কথা শুন মন দিয়া।

সরযূ নদীর তীরে অযোধ্যা নগর,
দেবতার পুরী হেন পরম সুন্দর।
সোনা মণি মুকুতায় করে ঝলমল,
ছায়া লয়ে খেলে তার সরযূর জল।
বড় ভালো দশরথ সে দেশের রাজা,
দুঃখী জনে দেন সুখ, শঠে দেন সাজা।
রানী তাঁর তিনজন, পরীর মতন,
দেবতা সেবায় সদা কৌশল্যার মন।
কৈকেয়ী রূপসী বড়, থাকেন আদরে,
সুমিত্রা সরলা তাঁর মুখে মধু ঝরে।

ছেলে নাই, আহা তাই ব্যথা বড় মনে,
কত পূজা করে রাজা আনি মুনিগণে।
আসিলেন ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিমহাশয়,
শিঙ নেড়ে কথা কন, দেখে লাগে ভয়।
ভারি যজ্ঞ করিলেন সেই মুনিবর,
'পুত্রেষ্টি' তাহার নাম, দেখিতে সুন্দর।
আগুনে ঢালিয়া ঘৃত, যত মুনিগণে
সুগভীর স্বরে মন্ত্র পড়েন সঘনে।
সে আগুন হতে তায়, পায়স লইয়া,
লালবেশে দেবদূত আসিল উঠিয়া।
কালো মুখে হাসি, তাহে ঘোর দাড়ি জট,
লাল চোখ পাকাইয়া তাকায় বিকট।
রাজারে পায়স দিয়া কহিল সেজন,
"রানীদের দাও গিয়া করিতে সেবন।"
এতেক বলিয়া দূত গেল মিলাইয়া,
সুখে খান রানীগণ পায়স বাঁটিয়া।

তাহার পরে বছর গেলে,
রাজার হল চারিটি ছেলে।
আদরে তুলে নিলেন বুকে,
সুখের হাসি ফুটিল মুখে।
বাজনা বাজে মধুর স্বরে,
শঙ্খ বাজে ঠাকুরঘরে।

কাঙাল হাসে কতই পেয়ে,
নড়িতে নারে মিঠাই খেয়ে।

মুনি রাখিলেন নাম, বড় ছেলে হল রাম,
মাতা হন কৌশল্যা যাহার,
কৈকেয়ী রানীর ঘরে জন্মে যে তাহার পরে
ভরত হইল নাম তার।
লক্ষ্মণ শত্রুঘ্ন আর, দুই ছেলে সুমিত্রার,
দুই ভাই ছোট সকলের,
চারিটি চাঁদের মতো চারি ভাই বাড়ে যত
দেখে চোখ জুড়ায় লোকের।
স্নেহে মিলে চারি ভাই, খেলা করে এক ঠাঁই,
হয়ে সবে এক প্রাণ মন,
লেখাপড়া যত হয়, সকল শিখিয়া লয়,
যাহা কিছু জানে গুরুজন।
তীর খেলা কত মতো, শিখিল তা, কব কত?
মহাবীর হল চারি ভাই,
যারে ধরে একবার, আকাশ পাতালে তার
পালাবার নাহি রহে ঠাঁই।

একদিন রাজা আছেন বসিয়া
সিংহাসনে আপনার,
বিশ্বামিত্র মুনি এমন সময়ে
এলেন সভায় তাঁর।
রাজা কন, "প্রভু, কিসের লাগিয়া,
আসিলেন মোর পাশ?"
মুনি কন, "হায় দুষ্ট নিশাচর
সকল করিল নাশ।
লুকায়ে আসিয়া রকত ঢালিয়া
মোর যজ্ঞ করে মাটি;
দিন কয় তরে দেহ গো রামেরে,
রাক্ষস দিবে সে কাটি।"
ত্রাসে দশরথ কহেন কাঁপিয়া,
"তাও কি কখনো হয়?

রাক্ষসের মুখে কেমনে বাছারে
পাঠাইব মহাশয় !"
শুনিয়া অমনি উঠিলেন মুনি
বিষম রোষেতে জ্বলি ;
হয় সর্বনাশ দেন বুঝি শাপ,
না জানি কি কথা বলি !
ভয়ে সভাজনে কহে, "মহারাজ !
দেহ দেহ রামে আনি,
ভালো হবে তার, মুনির কৃপায়,
না হবে কোনোই হানি।"
শুনিয়া তখনি রাম লক্ষ্মণেরে
দেন রাজা আনাইয়া।
মহা খুশি হয়ে যান মুনি তায়
দুইটি ভাইকে নিয়া।

রণবেশে দুই ভাই সাজি তারপর,
মুনির সহিত যান লয়ে ধনু-শর।
গুরুজন খান চুমো তাঁদের মাথায়,
দেবতার নাম লয়ে করেন বিদায়।
পথে রাম শিখিলেন সরযূর তটে
দুই বিদ্যা অদ্ভুত মুনির নিকটে।
এক তার 'বলা', তাহে যায় রোগ ভয়,
'অতিবলা' আর, তাতে হয় রণে জয়।
দুইদিন পরে তাঁরা হন গঙ্গা পার,
তারপরে ঘন বন, বড় অন্ধকার।
রামেরে বলেন মুনি, "হেথায়, রে ধন,
তাড়কা রাক্ষসী থাকে বিকট বদন।
রক্তখাকী হতভাগী ভারি বল ধরে,
লোকজন মেরে বন করেছে নগরে ;
এই পথে যেই যায়, তারে খায় গিলে,
আপদে মারহ বাপ দুই ভাই মিলে।"

মরিবে রাক্ষসী বুড়ি, রক্ষা নাই তার,
তখনি দিলেন রাম ধনুকে টংকার।
'টং-টং' রবে তার রুষি ভয়ংকর,

দাঁত কড়্মড়ি বুড়ি কাঁপে থর্-থর্!
"হাঁই-মাঁই-কাঁই" করি ধাঁই-ধাঁই ধায়,
হুড়্মুড়ি ঝোপঝাড় চুরমারি পায়।
গরজি-গরজি বুড়ি ছোটে, যেন ঝড়,
শ্বাস বয় ঘোরতর ঘড়র্-ঘড়র্।
কান যেন কুলো তার, দাঁত যেন মুলো,
জ্বল-জ্বল দুই চোখ জ্বলে যেন চুলো।
হাঁ করেছে দশ গজ, তাহে জিভ খান,
লকলকে চকচকে দেখে ওড়ে প্রাণ।
বিষম ধুলার ঘোরে দোঁহারে ঘেরিয়া,
পাথর ছুঁড়িয়া বুড়ি মারে চেঁচাইয়া।
কোনো ডর নাহি পায় তাহে দুই ভাই,
ডাক শুনি লাখ বাণ মারে সাঁই-সাঁই।
দেখা দিল বুড়ি তাই ফাঁপর হইয়া,
পাহাড় বেরুল যেন দাঁত খিঁচাইয়া।
হাত নাক কান কাটি, বুকে হানি বাণ,
দুজনে তখন তার বধিল পরান।
মুনির মুখেতে হাসি ধরে নাকো আর
"বেঁচে থাক" "বেঁচে থাক" বলে বারবার।
মহা-মহা শেল শূল দেন কত রামে,
দেবতা অসুর কাঁদি ভাগে যার নামে।
যতনে তখন লয়ে ভাই দুইজনে,
ফিরিয়া গেলেন মুনি নিজ তপোবনে।
যজ্ঞ করে মুনিগণ বসিয়া সেথায়,
রাক্ষস আসিয়া দেয় রক্ত ঢালি তায়।
তারপর পাঁচদিন মিলি দুইজনে,
পাহারা দিলেন সেথা বড়ই যতনে।
যজ্ঞের আগুন যেই জ্বলিল তখন,
মেঘের উপরে হল ভীষণ গর্জন।
তাহা শুনি দুই ভাই দেখেন চাহিয়া,
রাক্ষস খিঁচায় দাঁত আকাশ ছাইয়া।
জালাপানা মুখ আর ঝাঁটাপানা চুল,
কানে আঙুটির গোছা, হাতে শেল শূল।
মেঘের আড়ালে থাকি মারে উঁকি-ঝুঁকি,
পচা রক্ত ঢালি দেয় বারবার শুঁকি।
দুইটা পালের গোদা, বিষম বিকট,
মারীচ, সুবাহু নাম, অতি বড় শঠ।

মানব নামেতে বাণ জুড়িয়া ধনুকে,
ছুঁড়িয়া মারেন রাম মারীচের বুকে।
সেই বাণ খেয়ে বেটা, ঘোরে বন্-বন্,
সাগরে পড়িল গিয়া হয়ে অচেতন।
অগ্নিবাণ খেয়ে গেল সুবাহু মরিয়া,
বায়ুবাণে আরগুলো মরে চেঁচাইয়া।
যজ্ঞের আপদ গেল, দূর হল ভয়,
আনন্দেতে মুনিগণ বলে জয়-জয়।

তখন সবাই মিলে যান মিথিলায়
বোঝাই দিয়ে গাড়ি,
সেথায় যজ্ঞ হবে জবর জাঁকাল
জনক রাজার বাড়ি
আছে ধনুক সেথায় কেউ নাকি তায়
গুণ পরাতে নারে,
শুনে মুনির সাথে দুভাই সুখে
দেখতে চলে তারে।
কত সবুজ মাঠে, নদীর তীরে
পথ গিয়েছে ঘুরে,
আহা, শূন্য পড়ে তাহার ধারে
এ কোন মুনির কুঁড়ে?
মুনি তার কাহিনী কহেন রামে
গৌতমেরে স্মরে,
"জায়া অহল্যারে শাপেন তিনি
বিষম দোষের তরে।
হেথায় থাকবে পড়ে ছাইয়ের পরে
বাতাস কেবল খাবে।
হাজার বছর ধরে কেউ তোমারে
হেথায় থাকবে পড়ে ছাইয়ের পরে
দেখতে নাহি পাবে।
শেষে রামকে দেখে দুখ ফুরাবে
ফিরব আমি ঘরে।
বলেই অমনি চলে যান হিমালয়
দারুণ রাগের ভরে। '
দেবী ভাবেন হরি হেথায় পড়ি,
কঠিন সাজা সয়ে।
চল, তোমায় দেখে এবার তিনি
উঠুন সুখী হয়ে।"

তখন সবাই মিলে সেদিক পানে
চলেন তাঁরা ধেয়ে,
কুটির উজল করি উঠেন দেবী
রামের দেখা পেয়ে।
তাঁরে দেখতে পেয়ে দুভাই গিয়ে
পড়েন চরণ তলে,
দেবী অমনি তুলে নিলেন কোলে,
ভাসল নয়ন জলে।
গৌতম এলেন ঘরে সেই সময়ে
এলেন ততক্ষণ,
আবার দুজনে মিলে হরির পূজায়
দিলেন তাঁরা মন।

সেথা হতে মিথিলায় যান তিন
দু ভায়ে দেখিয়ে ভোলে সকলের মন।
জনক বলেন, "আহা কেমন সুন্দর!
কাহার কুমার এরা কহ মুনিবর।"
মুনি বলেন, "দশরথ রাজা অযোধ্যার,
শ্রীরাম, লক্ষ্মণ এরা তাঁহার কুমার।
তাড়কা মারীচে মারি এসেছে হেথায়,
তোমার ধনুকখানি দেখিবারে চায়।"
রাজা বলেন, "বাছা সব থাকুক বাঁচিয়া
ধনুক দেখাই আমি এখুনি আনিয়া।
শিবের ধনুক সেটি, দিল দেবগণ,
গুণ দিতে নাহি তায় পারে কোনোজন।
গুণ দিবে দূরে থাক, তুলিতে না পারে,
লাজ পেয়ে শেষে চায় মারিতে আমারে।
সে ধনুকে যদি রাম পারে গুণ দিতে,
সীতার বিবাহ দিব তাহার সহিতে।"

শুনহ সীতার কথা সবে মন দিয়া,
ডিম্বের ভিতরে কন্যা ছিল লুকাইয়া।
চাষ করে মহারাজ লইয়া লাঙ্গল,
সেই কালে চারিদিক হইল উজল।
তখন দেখিল রাজা চাহিয়া সম্মুখে,
আশ্চর্য উঠেছে ডিম্ব লাঙ্গলের মুখে।

দেবতা সমান কন্যা তাহার ভিতরে,
সুখে তারে মহারাজ নিল বুকে করে।
সীতে থেকে উঠে তাই নাম তার সীতা,
জনকেরে কয় সবে সে মেয়ের পিতা।
রাজা কন, "ধনুকেতে যেই গুণ দিবে,
সেই সে সীতারে মোর বিবাহ করিবে।"

না জানি কতই ভারি ছিল ধনুখানি!
অনেক হাজার লোকে আনে তারে টানি।
ভয়ংকর সেই ধনু তুলি বাম হাতে,
হাসিতে-হাসিতে রাম গুণ দেন তাতে।
তারপর গুণ ধরি দিল এক টান,
'মট্' করি হর-ধনু ভেঙে দুইখান।
ভয়ে তায় চোখ বুজি, কানে দিয়ে হাত,
'বাপ!' বলি কত বীর হয় চিৎপাত!
বড়ই হলেন সুখী জনক তখন,
রামেরে আদর করি কত কথা কন।
বিবাহের কথা স্থির হইল ত্বরায়,
লিখন লইয়া দূত যায় অযোধ্যায়।
পত্র পান দশরথ বসিয়া সভায়—
"শ্রীরাম-সীতার বিয়ে এস মিথিলায়।"
রাজা কন, "কি আনন্দ চলহ সকলে।"
অমনি সাজিল সবে 'রাম জয়' বলে।
হাতি ঘোড়া, লোকজন ঢাক ঢোল নিয়া,
মহানন্দে মহারাজ চলেন সাজিয়া।
চারদিনে যান রাজা মিথিলা নগরে,
জনক নিলেন তাঁরে পরম আদরে।

শুন কি সুন্দর কথা হইল তখন।
সেথা ছিল চারি কন্যা লক্ষ্মীর মতন।
ঊর্মিলা নামেতে কন্যা জনক রাজার,
ভাইঝি মাণ্ডবী তাঁর, শ্রুতকীর্তি আর।
সীতারে লইয়া তারা হয় চারিজন,
চারি পুত্র দশরথ রাজার তেমন।
মুনিগণ বলে, "আহা, কিবা চমৎকার,
ছেলে মেয়ে নাই হেন কোনোখানে আর।
এই-সব ছেলে যদি এই মেয়ে পায়,

বড় ভালো, মহারাজ, হইবেক তায়।"
জনক বলেন, "বেশ, ভালো তো কহিলা,
শ্রীরামেরে দেহ সীতা, লক্ষ্মণে ঊর্মিলা,
শত্রুঘ্নরে শ্রুতকীর্তি, মান্ডবী ভরতে,
একদিনে চারি বিয়ে হোক এই মতে।"

তখন মিথিলাপুরী করে টলমল,
কি আনন্দ, কত গান, পূজা কোলাহল।
লাগিল ভোজের ধূম বাজিল বাজনা,
ঢাক, ঢোল, কাড়া, কাঁসি, না হয় গণনা।
আলো করে ঝলমল, ধূপধুনা জ্বলে,
যতনে সাজায়ে কন্যা আনিল সকলে।
অগ্নির সম্মুখে বসি জনক তখন,
চারি বরে কন্যা দেন করিয়া যতন।
কতই মুক্তা মণি দাস-দাসী আর
মেয়েদের দেন রাজা শেষ নাই তার।
তারপর আশীর্বাদ করিয়া সকলে,
বিশ্বামিত্র মুনি যান হিমালয়ে চলে।
মহারাজ দশরথ ছেলে বউ নিয়া,
মনের সুখেতে যান বিদায় লইয়া।

নিয়ে বউ সকলে মনের সুখে
চলেন সবাই ঘরে,
তখন পথের মাঝে কাঁপেন তাঁরা
পরশুরামের ডরে।
সে যে বাঘের মতো বিষম রাগী,
কুড়াল নিয়ে ফেরে।
নাহি ডরায় কারে বড়ই চটে
দেখলে ক্ষত্রিয়েরে।
মুনি কুড়াল দিয়ে তাদের সবে
একুশবার।
তেহ ভয়েতে তারা হয় যে সারা
নামটি শুনেই তার।
রাজা কতই আদর করেন তারে
'আসুন-আসুন' বলে।
মুনি না চায় ফিরে, রামকে দেখে
গেল সে রাগে জ্বলে।

বলে, "শিবের ধনুক ভেঙেই বুঝি
হয়েছ ভারি বীর?
আমার ধনুকটিকে গুণ পরিয়ে
চড়াও দেখি তীর!"
শ্রীরাম ধনুক নিয়ে অমনি তাতে
দিলেন টেনে গুণ,
পরে বাণটি হাতে নিতেই মুনির
মুখ তো হল চুন!
তখন রাম ভাবিলেন, 'এ বাণ খেলেই
যাবেন ঠাকুর মরে,'
কাজেই অপর দিকে দিলেন ছুঁড়ে
সে তীর দয়া করে।
অনেক তপস্যাতে পেলেন মুনি
স্বর্গে যত স্থান,
সে তীর পড়ল গিয়ে সেইখানেতে
বাঁচল মুনির প্রাণ।
ঠাকুর হার মেনে তায় সেখান হতে
গেলেন লাজের ভরে,
রাজা সবায় নিয়ে মনের সুখে
এলেন আপন ঘরে।
তখন আদর করে রানীরা সবে
বউ লইলেন কোলে,
তাঁদের দিলেন কি যে বলতে হলে
পড়ব বড়ই গোলে।
পরে ভরত গেলেন মামার বাড়ি
শত্রুঘ্নরে লয়ে,
আর শ্রীরাম করেন পিতার সেবা
পরম সুখী হয়ে।

বয়স হইল ষাট হাজার বছর,
চলিতে কাঁপেন রাজা করি থর্-থর্।
ভাবিলেন তাই, 'মোর বল গেছে টুটি,
রামেরে বুঝায়ে কাজ আমি লই ছুটি।'
তখন বলেন রাজা, "শুন সভাজন,
যুবরাজ কর মোর রামেরে এখন।"
শুনিয়া সুখেতে সবে করে কোলাহল,
আনন্দে কৌশল্যা মা'র চোখে এল জল।
পুরোহিত মহামুনি বশিষ্ঠ তখন,
যতনেতে করিলেন যত আয়োজন।
সুন্দর বসন পরি সাজিল সকলে,
আনন্দে ধুইল মুখ চন্দনের জলে।
মনের সুখেতে তারা করে গণ্ডগোল,
'ডিম্বি-ডিম্বি' 'তাই-তাই' বাজে ঢাক ঢোল।
কৌশল্যা দেবীর স্নান হয়েছে কখন,
হরিনাম করে মাতা হয়ে এক মন।

কৈকেয়ীর ছিল এক আদরের দাসী,
বিষমুখী হতভাগী কুঁজী সর্বনাশী।
মন্থরা নামটি তার, লোকে কয় 'কুঁজী',
কার মেয়ে, কোথা ঘর নাহি পাই খুঁজি।
কুঁজী বলে, "হ্যাঁ গা, এত কিসের বাজনা?"
রামের ধাই-মা কয়, "তাও কি জানো না?
যুবরাজ হবে আজি আমাদের রাম,
তাই এত বাদ্য আর এত ধুমধাম।"
এই কথা ধাই তারে কহিল যখন,
হিংসায় কুঁজীর কুঁজ করে টনটন!
কৈকেয়ীর কাছে গিয়া তখনি সে কয়,
"শোনো, শোনো! আজি রাম যুবরাজ হয়!"
রানীর মনেতে বড় সুখ হল তায়,
খুলিয়া গলার হার দিল মন্থরায়।
দূরে ফেলি সেই হার কহে দুষ্ট কুঁজী,
"ভালো মন্দ কিসে হয়, নাহি জানো বুঝি!
কুটিল কৌশল্যা রানী রাজার মা হলে,
হেঁট মুখে রবে তুমি তার পদতলে।

রাম রাজা হলে তোর ভরতে মারিবে,
তখন তোমার দশা ভাব কি হইবে।”
শুকাল রানীর মুখ এ কথা শুনিয়া,
পরান কাঁপিল তার ভরতে ভাবিয়া।
বলে, “কুঁজী বল! বল! কি হবে উপায়?
কেমনে বাঁচাব বল! আমার বাছায়?”
কুঁজী বলে, “ভয় নাই, হবে সেই কাজ
দুই বর তোরে যদি দেয় মহারাজ।
ভরত হইলে রাজা, রাম গেলে বনে
ভয় না থাকিবে আর, ভাবি দেখ মনে।
যুদ্ধে গিয়ে মহারাজ ভারি ব্যথা পায়,
পরানে বাঁচে সে খালি তোমারই সেবায়।
দুই বর দিবে রাজা বলেছে তখন,
সে বর চাহিয়া কেন লহ-না এখন?
ভরতে করহ রাজা রামে বনে দিয়া,
তারপর সুখে থাক খাটেতে বসিয়া।”
রানী বলে, “ভালো যুক্তি দিলি কুঁজী মোর,
আজি বনে যাবে রাম, ভয় নাই তোর।”
তখন কুঁজীর সাথে করি কনাকানি,
বিপদ ঘটাল হায় সর্বনাশী রানী।
ভাঙিল হীরার বালা সানে আছাড়িয়া,
ময়লা কাপড় আনি পরিল খুঁজিয়া।
এলাইয়া কালো চুল শুইল ধুলায়
ভালোই পাতিল ফাঁদ মারিতে রাজায়।
আসিয়া দেখেন রাজা একি সর্বনাশ,
মাথায় পড়িল যেন ভাঙিয়া আকাশ।
কতই ডাকেন রাজা, “রানী, রানী, রানী।”
কৈকেয়ী আঁচল শুধু মুখে দেয় টানি।
রাজা কন, “হায়, রানী নাহি কয় কথা!
হল কি অসুখ ভারি? পাইল কি ব্যথা?
বল রানী, দুখ দিল কে তোমার মনে,
তলোয়ারে তার মাথা কাটি এইক্ষণে।”
বিনয় করিয়া রাজা কত কথা কয়,
কিন্তুতে রানীর হায় দয়া নাহি হয়।
তখন বলেন রাজা, “কি চাই তোমার?
এখনি পাইবে তাহা, বল একবার।”
শুনিয়া কৈকেয়ী তারে নাকি সুরে কয়,

"সত্য করি বল আগে, দিবে তা নিশ্চয়।"
রাজা কন, "দিব, দিব, দিব তা তোমারে।"
তাহা শুনি দুষ্ট রানী হাসি কয় তারে,
"মনে কর সেই যুদ্ধ অসুরের সাথে,
বড় খোঁচা মহারাজ খেলে তার হাতে।
করিয়া কতই সেবা বাঁচাই তোমায়,
দিতে মোরে দুই বর চাও তুমি তায়।
আজি মোরে সেই বর দেহ মহারাজ,
বিষ খাব, যদি নাহি কর এই কাজ।"
রাজা কন, "কহ-কহ কিবা সেই বর,
দিব তাহা এইক্ষণ, নাহি কোনো ডর।"
শুনিয়া কৈকেয়ী কয়, "আর কিছু নয়
ভরতেরে যুবরাজ কর মহাশয়।
চৌদ্দ বছরের তরে রাম বনে যাবে,
পরিয়া গাছের ছাল ফল মূল খাবে।"
হায় রে নিষ্ঠুর কথা! হায় দুষ্ট রানী!
কি ব্যথা রাক্ষসী দিল রাজারে না জানি!
অজ্ঞান হইয়া রাজা পড়িল ধুলায়,
জাগিয়া চাপড়ি বুক করে হায়-হায়।
অস্থির হইয়া রাগে কাঁপে থর্-থর্,
শিশুর মতন কাঁদে হইয়া কাতর।
পাগল হইয়া ধরে কৈকেয়ীর পায়,
আবার অজ্ঞান হয়ে লুটায় ধুলায়।
তবু হায় রাক্ষসীর দয়া নাহি হয়,
লাজ নাই, ভয় নাই, কটু কথা কয়।
এইভাবে গেল রাত কাঁদিয়া-কাঁদিয়া
সকালে আনিল রানী রামেরে ডাকিয়া।
ফাটিছে রামের বুক দেখিয়া রাজায়,
রানীরে বলেন, "মাগো, একি হল হায়?
কেন মা এমন দশা হইল পিতার?
কিসের লাগিয়া মুখে কথা নাহি তাঁর?"
রাক্ষসী বলিছে, "বাছা, ওটা কিছু নয়,
লাজেতে তোমার বাপ কথা নাহি কয়।
রাজা বলেছেন, আজ তুমি যাবে বনে,
জানাতে তোমায় তাহা লজ্জা হয় মনে।
পিতার মনের কথা শুনিলে এখন,
লক্ষ্মী ছেলে, বনে যাও ছাড়ি রাজাধন!

চৌদ্দ বছরের পর আসিও আবার
ততদিন হবে রাজা ভরত আমার।"
কহিল কঠিন কথা আদর করিয়া
খেতে যেন দিল বিষ মধু মাখাইয়া।
বারণ করিতে তারে না পারেন রাজা,
'বর দিব' বলেছেন, হায় তার সাজা!
শ্রীরাম বলেন, "এই যাই আমি বনে,
তার তরে ভয় মাতা করিও না মনে।
রাজা যদি নাহি হই, কিবা তায় দুখ।
থাকিলে পিতার কথা বনেতেও সুখ।
রাজা হয়ে সুখে থাক ভরত আমার,
পিতারে দেখিও মাগো, কি বলিব আর।"
অযোধ্যার প্রাণ রাম, তিনি যান বনে,
তাঁহাকে ছাড়িয়া লোক বাঁচিবে কেমনে?
রুষিয়া লক্ষ্মণ কন, "মারিব রাজায়!
কৈকেয়ী ভরতে মারি রাখিব দাদায়।"
আদরে বলেন রাম, তারে লয়ে বুকে,
"ভাই রে অমন কথা আনিয়ো না মুখে।
পিতা হন আমাদের দেবতা সমান,
রাখিব তাঁহার কথা দিয়া এই প্রাণ।"

কৌশল্যার দুঃখ আর কি বলিব হায়—
কথায় সে দুঃখ বলে বুঝানো কি যায়?
রামেরে বিদায় দিতে হইল যখন,
না জানি কেমন তাঁর করেছিল মন!
রাম কন, "দেখো মাগো পিতারে আমার,
চৌদ্দ বছরের পরে আসিব আবার।"
সীতা কন, "যেথা রাম, সেথা মোর ঘর,
দুজনে সুখেতে রব বনের ভিতর।"
লক্ষ্মণ বলেন, "দাদা, মোরে লও সাথে,
ফল মূল দিব আনি, তুলি নিজ হাতে।"
সুমিত্রা বলেন, "যাও, যাও রে লক্ষ্মণ,
রামেরে দেখিয়ো বাছা পিতার মতন।
সীতা যেন মা তোমার, এই রেখ মনে,
ঘর ভেবে সুখে বাপ থাক গিয়ে বনে।"
বনে যেতে তিনজন করি তাঁরা মন

কাঙালে করিলা দান যত ছিল ধন।
সুমন্ত্র সারথি আনে রথ সাজাইয়া,
কৈকেয়ী গাছের ছাল দিলেন আনিয়া।
তাহা পরি দুই ভাই করিলেন সাজ,
সীতারে পরাতে নাহি দেন মহারাজ।
বেলা হল, বয়ে যায় যাবার সময়,
প্রণাম করিয়া রাম দশরথে কয়,
"বনে যাই, মহারাজ, দেহ পদধূলি,
দুখিনী মায়ের পানে চেয়ো মুখ তুলি।"
তারপরে তিনজনে চড়ে গিয়ে রথে,
পাগল হইয়া লোকে ছুটে যায় পথে।
কাঁদিতে কাঁদিতে রাজা নিজে যান ধেয়ে,
ব্রাহ্মণ সকলে যান, আর যত মেয়ে।
কাঁদিয়া কৌশল্যা যান; হায় রে দুখিনী—
আলুথালু হয়ে মাতা ধায় পাগলিনী।
কেমনে এ দুখ দেখি পরানেতে সয়?
"চল, চল," বলি রাম সারথিরে কয়।
ছুটে যায় রথখানি তীরের মতন,
তার সাথে যেতে আর পারে কয়জন?
তবুও ছুটিয়া রাজা কতদূর যায়,
চলিতে না পারি আর বসিল ধুলায়
চাহিয়া রথের পানে কথা নাহি মুখে,
ঝরিয়া চোখের জল বয়ে যায় বুকে।
চলি গেল রথখানা, দেখা নাহি যায়,
অমনি লুটায়ে রাজা পড়িল ধুলায়!
কৈকেয়ী তুলিতে তারে আইল ছুটিয়া,
"দূর-দূর!" বলি রাজা দিল তাড়াইয়া।
তারপর কৌশল্যার হাতখানি ধরে,
ভাসিয়া চোখের জলে গেল তাঁর ঘরে।
সেথায় শুইল রাজা করি হায়-হায়,
ভাবিয়া রামের কথা বুক ফেটে যায়।

জানি রাম কতদূরে যান ততক্ষণ,
কেমনে ছাড়িল তাঁরে অযোধ্যার জন?
তীরের মতন তাঁর রথখানি যায়
কপাল চাপড়ি লোক পিছু-পিছু ধায়।
বলে, "এই ছাই দেশে কে রহিবে আর?

রাম যেথা যান, মোরা সাথে যাব তাঁর।"
বেলা শেষ হল, তারা তবু নাহি ফিরে,
আঁধার হইল আসি তমসার তীরে।
থামিল তখন রথ, বসিল সকলে,
ঘরে না ফিরিল তারা সাথে যাবে বলে।
শেষে রাতে উঠি রাম গেলেন চলিয়া,
কেহ না জানিল- সবে ছিল ঘুমাইয়া।
প্রভাতে উঠিয়া তারা করে হায়-হায়,
কাঁদিতে-কাঁদিতে শেষে ঘরে ফিরে যায়।
হেথায় চলেছে রথ তিনজনে লয়ে
নদী বন মাঠ কত যায় পার হয়ে।
শৃঙ্গবের পুরে যেই বেলা গেল চলে,
ইঙ্গুদী গাছের তলে বসিলা সকলে।
সে দেশে নিষাদ-রাজা, গুহ তার নাম,
বড়ই সরল সে যে, তার মিতা রাম।
'রাম এল' শুনে গুহ ছুটে এল সুখে,
"মিতা, মিতা", করি তাঁরে জড়াইল বুকে।
গুহ বলে, "খাবি মিতা? এনেছি মিঠাই!"
রাম কন, "হায় মিতা, কি করিয়া খাই?"
যেতে মোর হবে যে রে, যেথা ঘোর বন,
ফল মূল খেতে হবে মুনির মতন।"
শুনিয়া কাঁদিল গুহ হাউ-হাউ করে,
বিনয় করিয়া রামে কহিল সে পরে,
"থাক্ মিতা মোর হেথা, থাক্ মোর শিরে।
ঘর তোর, জন তোর, ডর তোর কি রে?
নাচি-নাচি বই জুতা, ফিরি তোর সনে,
রাজা হয়ে থাক্ মিতা, কেন যাবি বনে?"
রাম কন, "তা তো ভাই হয় না রে হায়,
তায় যে পিতার কথা মিছা হয়ে যায়!"
গঙ্গা জল খেয়ে রাম থাকেন সে রাতে,
জাগিয়া কাঁদিল গুহ লক্ষ্মণের সাথে।
প্রভাতে গুহের কাছে লইয়া বিদায়,
তিনজনে গঙ্গা পার হলেন নৌকায়।
বনের ভিতরে তাঁরা যান তার পরে
সুমন্ত্র কাঁদিল ফিরি অযোধ্যা নগরে।
বাঘ ভালুকের ঘর ঘোরতর বন,
তাহার ভিতর দিয়া যান তিনজন।

দিন গেল, রাত গেল, সন্ধ্যা এল ফিরে,
প্রয়াগে এলেন তাঁরা যমুনার তীরে।
যেথায় আসিয়া গঙ্গা মিলে যমুনায়,
মহামুনি ভরদ্বাজ থাকেন যেথায়।
মুনি বলে, "জানি রাম এলে কি কারণ,
আমার নিকটে বাপ থাক তিনজন।"
শ্রীরাম বলেন, "হেথা লোকজন চলে,
নিরিবিলি কোথা পাই মোরে দিন বলে।"
মুনি বলে, "চিত্রকূট পর্বতের তলে,
ছায়ায় লুকায়ে নদী মন্দাকিনী চলে।
দুই কূলে আছে গাছ ফল ফুলে ঝুঁকি,
হরিণ ময়ূর আসি দেয় সেথা উঁকি।
বনেতে কোকিল গায়, জলে হাঁস খেলে,
সুখেতে থাকিবে রাম সেইখানে গেলে।"
মুনির পায়ের ধুলা লইয়া তখন
যেথা সেই চিত্রকূট যান তিনজন।
সেথায় কুটির বাঁধি লতায়-পাতায়,
মনের সুখেতে তাঁরা রহিলেন তায়।

হেথা রাজা দশরথ পড়ে বিছানায়
ফেলেন চোক্ষের জল করি হায়-হায়।
এমন সময়ে তাঁরে করিয়া প্রণাম,
কাঁদিয়া সুমন্ত্র কয়, "গিয়াছেন রাম।"
সে কথা সহিতে রাজা নারিলেন আর,
সেই রাতে গেল প্রাণ দেহ ছাড়ি তাঁর।
কাঁদিয়া-কাঁদিয়া সবে ছিল অচেতন,
কেহ না জানিল রাজা মরিল কখন।
পাগল হইলা তারা সকালে উঠিয়া,
ভরতের লাগি লোক চলিল ছুটিয়া।
রাজারে ডুবায়ে রাখি তেলের ভিতরে,
পথ চেয়ে রয় তারা ভরতের তরে।

সবে কাঁদে, কৈকেয়ীর মুখে শুধু হাসি,
সে ভাবে, 'ভরত বড় সুখী হবে আসি!'
ভরত ফিরিয়া ঘরে কহিলেন তায়,
"কি বিপদ হল মাগো, বল তো আমায়।
কোথা পিতা দাদা আর লক্ষ্মণ আমার?

কেন এ সোনার পুরী হেরি ছারখার?"
রানী বলে, "পিতা তোর নাই রে বাছনি,"
কাঁদিয়া ভরত তায় পড়েন অমনি।
হায়-হায় করি কন কাতর হইয়া,
"না জানি গেলেন পিতা কি কথা কহিয়া।"
রানী বলে, "তিনি এই বলেন তখন--
'হায় রাম! হায় সীতা! হায় রে লক্ষ্মণ'!"
ভরত বলেন, "এ কি কথা ভয়ংকর
কি হল তাঁদের মাতা, বলহ সত্বর।"
রানী বলে, "মরে নাই, রয়েছে বাঁচিয়া,
দিয়াছি রাজায় বলি বনে পাঠাইয়া।
আপদ হইল দূরে বাছারে তোমার,
রাজা হয়ে সুখে থাক, ভয় নাই আর।"
এই কথা দুষ্ট রানী কয় হাসি মুখে,
ছুরি যেন মারে হায় ভরতের বুকে।
রুখিয়া বলেন তিনি, "কি বলিব হায়,
মা না হলে কাটিতাম এখনি তোমায়।
কভু না হইবে, যাহা আছে তোর মনে,
দাদারে আনিতে আমি এই যাই বনে।"
যাহার লাগিয়া রানী করে হেন কাজ,
খাইয়া তাহার গালি পায় বড় লাজ।

কুঁজী ভাবে, পায় জানি কিবা পুরস্কার,
যত ভাবে, তত কুঁজ উঁচু হয় তার।
মুখ ভরা হাসি আর গাল ভরা পান,
মাকড়ির ভারে যেন ছিঁড়ে দুই কান!
চকচকে চীন শাড়ি, চন্দনের ফোঁটা,
হাতে বালা, নাকে নথ, এই মোটা-মোটা।
দুয়ারে দাঁড়ায়ে ছিল সখীদের সাথে,
দরোয়ান ধরে দিল শত্রুঘ্নের হাতে।
শত্রুঘ্ন বলেন, "ভালো পাইলাম দেখা—
আজি কিছু সাজা তোর কপালেতে লেখা।"
চুল ধরি পরে যেই দিলেন আছাড়,
ভেড়ার মতন কুঁজী ডাকে চমৎকার।
মরিত সেদিন বেটি আছাড় খাইয়া,
ভাগ্যেতে ভরত আসি দেন ছাড়াইয়া।
ছাড়া পেয়ে তাড়াতাড়ি পলাইল ছুঁটি,

বাতাসেতে ফড়্‌ফড়্‌ উড়ে তার ঝঁুটি!
তখন সকলে মিলি, ভরতের সনে,
রামেরে আনিতে সুখে চলিলেন বনে।
বশিষ্ঠ সুমন্ত্র যান, যায় লোকজন,
কৌশল্যা সুমিত্রা আর দাসদাসীগণ।
কৈকেয়ী চলেন লাজে মাথা হেঁট করি,
লাখে-লাখে যায় সেনা খাঁড়া ঢাল ধরি।
গুহের দেশেতে যেই আসিল সকলে,
গুহ বলে, "দেখ, দেখ, ভরতীয়া চলে!
সেটি মোর মিতাটিকে মারিবেক বটে—
লাগা টাঙ্গি ঝট্‌পট্‌, ঘরে যাক হটে!"
ভরত কি চান গুহ শুনিল যখন,
আনন্দে করিল তাঁর কতই যতন।
পাঁচশত তরী দিয়া করে গঙ্গা পার,
নাচিতে-নাচিতে যায় সাথে-সাথে তাঁর।
ভরদ্বাজ মুনি সনে দেখা হয় পরে,
ভুলিল সবার মন মুনির আদরে।
ঘোল, চিনি, ক্ষীর, সর, দধি, মালপুয়া,
রাবড়ি, পায়স, পিঠা, পুরী, পানতুয়া।
যত চায়, তত পায়, নাহি ধরে পেটে,
গিলিতে না পারে আর, তবু দেখে চেটে।
মুনি বলিলেন, "রাম থাকে চিত্রকূটে",
অমনি চলিল সবে সেই পথে ছুটে।
আনন্দে চলেছে তারা হইয়া চঞ্চল,
রামের কুটিরে গেল তার কোলাহল।
গাছে উঠে দেখি তায় কহেন লক্ষ্মণ,
"ভরত আইল দাদা লয়ে লোকজন।
মোদের মারিতে দুষ্ট আসিছে হেথায়,
মাথা কেটে তার সাজা দিব আমি তায়।"
রাম কন, "ভরতের কোনো দোষ নাই,
তাহারে এমন কথা কেন বল ভাই?"
লাজেতে আসেন তায় নামিয়া লক্ষ্মণ,
কুটিরে গেলেন পরে ভাই দুইজন।
ভরত শত্রুঘ্ন আহা তখনি আসিয়া,
লুটায়ে ধুলার পরে পড়েন কাঁদিয়া।
গড়াগড়ি দিয়া তাঁরা কাঁদেন দুজন,
কাঁদেন তাঁদের লয়ে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।

পরে বলিলেন রাম, "ভাই রে ভরত,
কি লাগি সহিয়া দুঃখ এলে এত পথ?
কেন রে গাছের ছাল দেখি তোর গায়,
কেন রে আইলে হেথা ছাড়িয়ে পিতায়?"
ভরত কহেন, "হায়, কোথা পিতা আর?
কাঁদিয়া তোমার তরে প্রাণ গেল তাঁর।"
কাঁদেন তখন সবে 'পিতা' 'পিতা' বলে,
কাঁদিয়া তাঁদের ঘিরি আসিয়া সকলে।
দুঃখের ভিতরে রাম পান কিছু সুখ,
এমন সময়ে দেখি জননীর মুখ।
কৌশল্যা কৈকেয়ী আর সুমিত্রার পায়,
প্রণাম করেন রাম লুটায়ে ধুলায়।
কাঁদিয়া রামের পায় পড়ি তারপরে
ভরত বলেন, "দাদা, চল যাই ঘরে।"
রাম বলিলেন, "ওরে পরানের ভাই,
থাকুক পিতার কথা আমি এই চাই।
তুমি হবে রাজা, আর আমি রব বনে,
পিতার এ কথা ভাই পালিব দুজনে।"
ভরত যতই তাঁরে করেন বিনয়,
শ্রীরাম কহেন শুধু, "কেমনে তা হয়?"
বশিষ্ঠ বুঝান কত, কাঁদে রানীগণ,
কিছুতেই না ফিরিল শ্রীরামের মন।
ভরত কাঁদিয়া তাঁরে কহিলেন শেষে,
"যদি কিছুতেই দাদা না যাইবে দেশে,
তোমার খড়ম খুলে দাও দয়া করে,
তারেই করিব রাজা অযোধ্যা নগরে।
পরিয়া গাছের ছাল, ফল মূল খেয়ে
চৌদ্দ বছরের তরে রব পথ চেয়ে।
তারপরে তুমি যদি না আস ফিরিয়া,
নিশ্চয় মরিব দাদা আগুনে পুড়িয়া।"
রাম বলিলেন, "আমি আসিব তখন,
মায়েরে দেখিয়ো ভাই করিয়া যতন।"
এই বলি রাম তাঁরে করেন বিদায়,
ভরত খড়ম লয়ে যান অযোধ্যায়।
পুরীর ভিতরে কিন্তু নাহি যান আর,
নন্দীগ্রামে রহিলেন, নিকটেই তার।
রামের খড়ম রাখি উঁচু সিংহাসনে,

তাহার উপরে ছাতা ধরেন যতনে।
বাতাস করেন তারে চামর লইয়া,
না করেন কোনো কাজ তারে না বলিয়া।
পরেন গাছের ছাল, খান শুধু ফল,
মনের দুঃখেতে তাঁর চোখে ঝরে জল।

তার পরে সীতা আর লক্ষ্মণেরে নিয়া
দণ্ডক বনেতে রাম গেলেন চলিয়া।
দণ্ডক বনেতে যেতে লাগে বড় ডর,
হাতি সিংহ বাঘ সেথা ফেরে ভয়ংকর।
বিরাধ বলিয়া থাকে রাক্ষস সেথায়,
না বিঁধে ব্রহ্মার বরে অস্ত্র তার গায়।
খিঁচাইয়া রাখে দাঁত পথ-ঘাট জুড়ি।
কড়্মড়ি হাতি খায়—এই বড় ভুঁড়ি!
রামেদের দেখে বেটা আইল ধাইয়া,
তাড়াতাড়ি দিল ছুট সীতারে লইয়া।
শ্রীরাম কাঁদেন তায় করি হায়-হায়,
লক্ষ্মণ বলেন রুষি, "মারহ বেটায়।"
শুনিয়া বিরাধ কয়, "ঝাট্ পালা ঘরে!
হেথেরটি মোর গায়ে বিন্ধিবে না করে!"
সাত বাণ যদি রাম মারিলেন তারে,
খেঁকায়ে আইল বেটা রাখিয়া সীতারে।
ঝেড়ে ফেলে বাণ সব, ধায় শূল নিয়া,
রাম দেন সেই শূল বাণেতে কাটিয়া।
তাহে দুষ্ট দিল ছুট দুভাইকে লয়ে,
কতই তখন সীতা কাঁদিলেন ভয়ে।
ভাঙিলা দুভাই তবে রাক্ষসের হাত
অমনি চেঁচায়ে বেটা হল চিৎপাত।
কিন্তু সে আপদ যে রে কিছুতে না মরে,
পাথরে না পিষা যায়, খড়্গে নাহি ধরে।
পুঁতিলেন তাই তারে মিলি দুই ভাই,
চলিলেন তারপর ছাড়ি সেই ঠাঁই।
মুনিদের ঘরে-ঘরে ফিরি তারপর,
সুখেতে কাটিয়া গেল দশটি বৎসর।
পরে আসিলেন তাঁরা পঞ্চবটি বনে,
সেথায় হইল দেখা জটায়ুর সনে।
অতি বড় পাখি সে যে, সম্পাতির ভাই,
রামেরে বলিল, "বাবা থাক এই ঠাঁই।
তোমার পিতার বন্ধু আমি যে রে ধন,
সীতারে দেখিব আমি করিয়া যতন।"
ভারি চমৎকার সেই পঞ্চবটী বন,

নানা রঙে ফুল ফল, দেখে ভরে মন।
দুলিয়া সুন্দর পাখি খেলে ডাল ধরি,
কুলকুল করি বয় নদী গোদাবরী।
সেই পঞ্চবটী বনে, সুন্দর কুটিরে,
সুখেতে থাকেন তাঁরা গোদাবরী তীরে।

হেনকালে কি হইল শুনহ সকলে—
রাক্ষসী আইল সেথা সুর্পনখা বলে।
লঙ্কায় রাবণ থাকে, দশ মাথা যার,
এই বুড়ি হতভাগী বোন হয় তার!
হাঁ করে সীতারে বুড়ি কয় গিয়ে ধেয়ে,
"মুঁহি গিন্নী হব এই বুড়িডারে খেয়ে!"
খাইত সীতারে বুড়ি নিশ্চয় তখন,
ভাগ্যে তার নাক কান কাটেন লক্ষ্মণ।
ব্যথায় অভাগী তায় মরে মাথা কুটি,
"বাপ্পুরে! মাঁইরে!" বলি ঐ যায় ছুটি!
গেল বুড়ি খর আর দূষণের ঠাঁই।
সেই দুটা হয় তার মাসতুত ভাই।
লোকজন লয়ে তারা থাকে জনস্থানে,
কাটা নাক নিয়া বুড়ি গেল সেইখানে।
পরে যা হইল সে যে বড় ভয়ংকর:
রাক্ষসের ডাকে বন কাঁপে থর্‌থর্‌।
দেখিতে-দেখিতে তারা, খাঁড়া ঢাল নিয়া,
হাজারে-হাজারে সেথা আইল ছুটিয়া।
শ্বাস ফেলি ঘোঁৎ-ঘোঁৎ ভেঙচায় রাগে,
দাঁত কড়্‌মড়ি শুনি বড় ডর লাগে!
লাঠি গদা, শেল শূল, কুড়াল কাটারি,
রোষেতে ছুঁড়িয়া তারা মারে ভারী-ভারী।
রামের বাণেতে সব হল খান-খান,
দুই দণ্ডে গেল যত রাক্ষসের প্রাণ।
একটা রহিল শুধু, অকম্পন বলে,
চেঁচায়ে লঙ্কায় সেটা ছুটে গেল চলে।
রাবণেরে কয় কাঁপি, "হেই মোহারাজ!
আরে তোর খরটি তো মরিলেক আজ!
দুসানিয়া ফুসানিয়া যেতো মাল ছিলো,
সবেক মানুসা বেটা রামা কাটি দিলো!"
পরেতে আসিয়া সেই নাককাটি বুড়ি

হাই-মাই করি সেথা কাঁদে মাথা খুঁড়ি।

লাফায়ে তখন উঠল রাবণ
রাগেতে আগুন হয়ে,
সারথিরে কয়, "আয় তো রে মোর
গাধাটানা রথ লয়ে!"
সেই রথে চড়ি চলিল রাবণ
যেথায় মারীচ থাকে,
বলে, "চল যাই রামের নিকটে
সাজা দিব আজ তাকে।"
শুনিয়া মারীচ বলে, "হায় বাপ।
মুই তো না সেথা যাব!
বেটা বড় ভূত, লাগাবেক তীর,
লাট্টু পাক মোরা খাব!"
রাবণ কহিল, "নাহি যাস যদি
এখনি কাটিব তোরে।"
মারীচ কহিল, "যাব, যাব, মুই!
কি করিবি লিয়ে মোরে?"
রাজা কয়, "তুমি সোনার হরিণ
সাজিয়া সেথায় যাবে,
সীতার নিকটে নাচিয়া-নাচিয়া
লতা-পাতা খুঁটে খাবে।
রামেরে তখন দিবে সে পাঠায়ে
তোমারে ধরিয়া নিতে,
দূরে নিয়া তারে চেঁচাইবে তুমি
হা লক্ষ্মণ, হায় সীতে!
তাহা শুনি আর নারিবে লক্ষ্মণ
বসিয়া থাকিতে ঘরে,
আমিও তখন সীতারে লইয়া
ছুট দিব রথে করে!"
সাজি লয়ে সীতা তুলিছেন ফুল,
মারীচ তখন এল,
হরিণ সাজিয়া তাঁহার নিকটে
নাচিতে-নাচিতে গেল।
তারে দেখি সীতা আনেন অমনি
শ্রীরাম লক্ষ্মণে ডাকি,
লক্ষ্মণ বলেন, "বুঝেছি, এ-সব

মারীচ বেটার ফাঁকি!"
হেলা করে সীতা নাহি দেন কান
লক্ষ্মণের সে কথায়,
মিনতি করিয়া পাঠান রামেরে
হরিণ ধরিতে হায়!
সে পোড়া হরিণ রামেরে লইয়া
কত দূরে গেল চলে,
বাণ খেয়ে শেষে ডাকিল কাতরে,
"হায় রে লক্ষ্মণ!" বলে।
শুনি তা অমনি লক্ষ্মণেরে সীতা
কাঁদিয়া কহেন ভয়ে,
"হায়, বুঝি তারে খাইল রাক্ষস
যাহ ধনু-শর লয়ে!"
লক্ষ্মণ বলেন, "মারীচের ফাঁকি
নহে গো এ কিছু আর,
রাম বড় বীর, মারিবে তাঁহায়,
এত জোর আছে কার?
একলা হেথায় রাখিয়া তোমায়
যাইব কেমন করে?
কোনো ভয় নাই আসিবেন রাম
এখনি ফিরিয়া ঘরে।"
রুষিয়া তখন কহিলেন সীতা,
"বুঝিনু সকলই হায়,
ওরে দুষ্ট, তুমি এই চাও, যাতে
রাক্ষসে তাঁহারে খায়।"
কঠিন কথায় ব্যথা পেয়ে হায়
গেলেন লক্ষ্মণ চলি,
অমনি সেথায় আইল রাবণ,
"হর হর বোম!" বলি।
যোগীর মতন সেজেছে রাবণ
চেনা নাহি যায় তারে,
টিকি দোলাইয়া হাসিয়া-হাসিয়া
আসিল কুটির দ্বারে।
যোগী ভাবি সীতা বসিতে আসন
দিলেন যতন করে,
ঘরে ছিল ভাত, আনিয়া আদরে
খাইতে দিলেন পরে।

কহিছে রাবণ, "কার মেয়ে তুমি?
কেমনে আইলে বনে?"
সীতা কন, "আমি জনকের মেয়ে
এসেছি পতির সনে।"
শুনি দুষ্ট কয়, "ভিখারীর সাথে
রয়েছ কিসের তরে?
বনের ভিতরে বাঘ থাকে ভারি
খাইবে তোমারে ধরে।
মোর সাথে চল, আমি সেই রাজা,
রাবণ যাহারে কয়,
খাটেতে বসিয়া পাইবে সকল
যা তোমার মনে লয়।"
সীতা কন তারে, "বটে রে অভাগা
এত বড় মুখ তোর!
আজি তোর দাঁত ভাঙিবেন রাম
দাঁড়া দেখি দুষ্ট চোর।"
কুড়ি চোখ তায় ঘুরায় রাবণ
রাগেতে পাগল হয়ে,
বিশ পাটি দাঁত করি কড়্মড়্
চলে যে সীতায় লয়ে।
রথখানি তার আইল অমনি
লাফায়ে উঠিল তায়,
দূরে দুই ভাই জানি কোন ঠাঁই
দেখিল না হায়-হায়!
গাছের উপরে বসিয়া তখন
ঘুমায় জটায়ু পাখি,
চমকি শুনিল ঐ যেন সীতা
কাঁদেন তাহারে ডাকি!
অমনি জটায়ু যমের মতন
ধরিল রাবণে গিয়া,
আধমরা করে ছাড়িল বেটারে
আঁচড় ঠোকর দিয়া।
ভাঙি রথখানি মারি তার ঘোড়া
ছিঁড়ি সারথির মাথা,
কাড়িল ধনুক ঝেড়ে ফেলে বাণ
পিষিল চামর ছাতা।
দেবতার বর পেয়েছে রাবণ,

সে যে মরিবার নয়,
দশ মাথা তার ছিঁড়ে কতবার
আবার নতুন হয়।
বুড়া পাখি হায় কত পারে আর?
বল তার গেল টুটি,
হাত-পা তাহার কাটিয়া রাবণ
সীতা লয়ে যায় ছুটি।

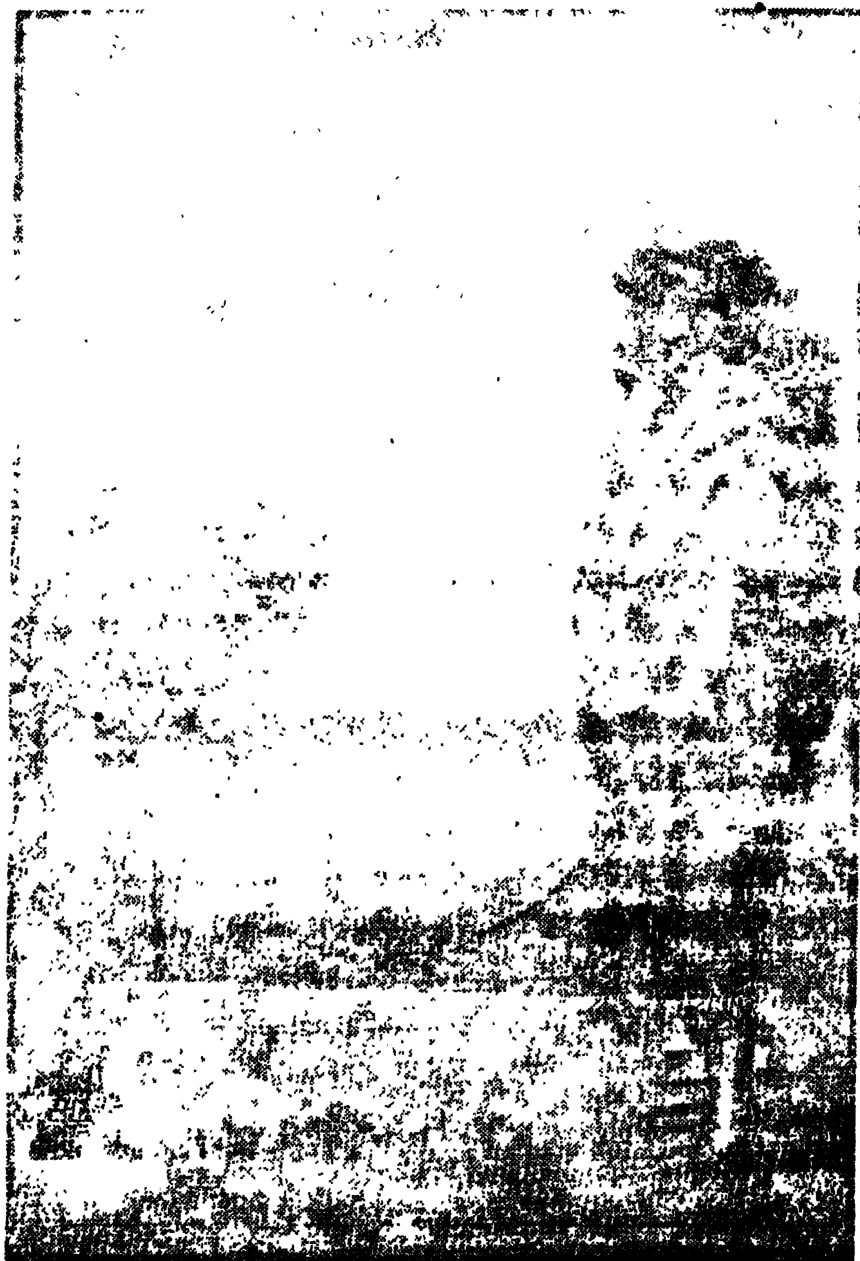
ঘরে ফিরে দুই ভাই না পান সীতায়
কাতরে কাঁদেন রাম করি হায়-হায়।
খুঁজিলেন বনে-বনে গুহায়-গুহায়,
গোদাবরী তীরে আর যত ঝরনায়।
কোথাও না পান তাঁরা দেখিতে সীতারে,
কেহ নাই, তাঁর কথা জিজ্ঞাসেন যারে।
পরে আইলেন তাঁরা জটায়ু যেথায়,
রয়েছে অবশ হয়ে পড়ে যাতনায়।
রোষেতে বলেন রাম দেখিয়া তাহারে,
"এই দুষ্ট খাইয়াছে আমার সীতারে!
রাক্ষস পাখির মতো রয়েছে সাজিয়া—
ঘুমায় কেমন দেখ, সীতারে খাইয়া।"
এই বলি তারে রাম যান মারিবারে
কষ্টেতে তখন পাখি কহিল তাঁহারে—
"মেরে তো আমায় বাপ গিয়েছে রাবণ,
তারপরে তুমি আর মেরো না রে ধন।
পলায়ে গিয়েছে দুষ্ট লয়ে সীতা মায়,
প্রাণ গেল, না পারিনু রাখিবারে তাঁয়।"
জটায়ুরে বুকে লয়ে দুভাই তখন,
কাঁদেন কাতর হয়ে, শিশুর মতন।
কিন্তু হায়, সেই ক্ষণে প্রাণ গেল তার
কিছুই কহিতে পাখি পারিল না আর।

সেথা হতে তারপর সীতারে খুঁজিয়া,
চলিলেন দুই ভাই ঘন বন দিয়া।
কবন্ধ রাক্ষস ছিল তাহার ভিতর,
কি আর কহিব সে যে কত ভয়ংকর।
মাথা নাই, গলা নাই, আছে শুধু ভুঁড়ি,

হা-করে রয়েছে তাই সারা বন জুড়ি।
থামের মতন তার বড়-বড় দাঁত,
যোজন জুড়িয়া দুই সর্বনেশে হাত।
একখানা চোখ দিয়া চায় কট্‌মট্‌,
হাতি মোষ যাই দেখে, ধরে চট্‌পট্‌।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ যান সেই বন দিয়া,
খপ্‌ করে নিল বেটা তাঁদেরে ধরিয়া।
তখন বলেন তাঁরা, "খায় বুঝি গিলে,
এই বেলা কাটি হাত দুই ভাই মিলে।"
এই বলি দুই ভাই তলোয়ার দিয়া,
তাড়াতাড়ি হাত তার ফেলেন কাটিয়া।
গড়াগড়ি দিয়া কিবা চেঁচাইল তায়,
কহিল সে, "কে তোমরা? বল তা আমায়।"
শুনিয়া তাঁদের নাম বিনয়ে সে কয়,
"ভাগ্যেতে আমার হেথা এলে মহাশয়
এখন পোড়াও মোরে যদি দয়া করে
ঘুচিবে আমার দুঃখ, যাব নিজ ঘরে।"
আগুন জ্বালিয়া ভারি দুজনে তখন
কবন্ধে পোড়ান তায় শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
অমনি দেখেন তাঁরা, কিবা চমৎকার,
পরম সুন্দর দেহ হইল তাহার।
আগুন হইতে উঠি তখন সে কয়,
"সুগ্রীবের কাছে তুমি যাও মহাশয়।
ঋষ্যমূক পরবতে, পম্পা নদী-তীরে,
থাকে সে লইয়া সাথে বড়-বড় বীরে।
ত্বরায় তাহারে বন্ধু কর মহাশয়,
করিয়া সীতার খোঁজ দিবে সে নিশ্চয়।"
তাহা শুনি দুই ভাই যান সেথা হতে,
যেথায় সুগ্রীব থাকে, সেই পরবতে।

তারপর পম্পা নদী পার হয়ে শেষে,
আসিলেন দুই ভাই বানরের দেশে।
বানর কতই সেথা থাকে ভারী-ভারী,
পর্বত ছুঁড়িয়া মারে লম্বা লেজ নাড়ি।
রাজা তার বড় বীর, বালী নাম ধরে,
সুগ্রীব তাহার ভাই, কাঁপে তার ডরে।
কিষ্কিন্ধ্যায় থাকে বালী লোকজন লয়ে
ঋষ্যমূক নাহি যায় মাতঙ্গের ভয়ে।
সেই মুনি এই শাপ দিয়েছিল তায়,
"মাথা ফেটে যাবে তোর, আসিলে হেথায়।"
সেই ভয়ে ঋষ্যমূকে নাহি যায় বালী
দূর থেকে সুগ্রীবেরে দেয় শুধু গালি।
পর্বত হইতে দেখি শ্রীরাম লক্ষ্মণে,
বড়ই হইল ভয় সুগ্রীবের মনে।
মন্ত্রী হনুমানে ডেকে বলিল তখন,
"কি লাগি আইল হেথা মানুষ দুজন?
বালী বুঝি পাঠাইল, মারিতে আমায়,
নিশ্চয় জানিয়া হনু আইস ত্বরায়।"
গোপ-দাড়ি পরে হনু সাজিল সন্ন্যাসী
রামের নিকটে পরে দেখা দিল আসি।
বড়ই পণ্ডিত হনু, ভারি বুদ্ধিমান,
হাসি-হাসি কথা কয়, মধুর সমান।
রামেরে করিল সুখী মিষ্ট কথা কয়ে,
কাঁধে করে গেল পরে দুজনেরে লয়ে।
সুগ্রীব রামের কাছে জোড়হাতে কয়,
"দয়া করে মোর মিতা হও মহাশয়।
কত দুঃখ দিয়া বালী দিল তাড়াইয়া,
রাজা কর মোরে রাম তাহারে মারিয়া।"
শ্রীরাম কহেন তারে, "আমি তাই চাই,
হইতে তোমার মিতা এনু এই ঠাঁই।
বালীরে মারিয়া রাজা করিব তোমায়,
দয়া করে দাও মিতা, খুঁজিয়া সীতায়।"
সুগ্রীব কহিল, "মিতা, নাহি কোনো ভয়
সীতারে খুঁজিয়া মোরা আনিব নিশ্চয়।
সেদিন রাবণ গেল এইখান দিয়া,

দেবতার মতো এক মেয়েকে লইয়া।
কেঁদোছল সেই কন্যা তোমাদের ডাকি,
সকলে শুনিনু মোরা এইখানে থাকি।
ফেলে গেল অলংকার মোদের দেখিয়া



সন্ন্যাসী হনুমান

যতন করিয়া তাহা দিয়াছি রাখিয়া।"
কতই কাঁদেন রাম দেখে অলংকার,
"সীতা, সীতা" বলে বুক ফাটে যেন তাঁর।

সুগ্রীব কহিল তাঁরে, "কাঁদিয়ো না মিতা,
নিশ্চয় কহিনু মোরা এনে দিব সীতা।"
তখন রামের বড় সুখ হল মনে,
হাসিয়া কহেন কথা সুগ্রীবের সনে।
সুগ্রীব কহিল, "মিতা, বড় ভয় পাই,
বালীর সমান বীর কোথাও যে নাই।
দুন্দুভি দানবে বালী ফেলে দিল ছুঁড়ে,
যোজন দূরেতে এসে পড়িল সে উড়ে।
ঐ দেখ পড়ে সেই দুন্দুভির হাড়,
দেখ, তায় কত বড় হয়েছে পাহাড়।
হেসে বালী শালগাছ ফোঁড়ে শূলে দিয়া,
মাটিতে চূড়া লয়ে খেলে সে লুফিয়া।
দুন্দুভির হাড় তুমি পার কি ছুঁড়িতে?
তীর মারি শালগাছ পার কি ফুঁড়িতে?"
পায়ের আঙুলে রাম সেই হাড় ঠেলে,
দিলেন যোজন দশ দূরে তাহা ফেলে।
গাঁথা গেল সাত শাল তাঁর এক তীরে,
পর্বত পাতাল ফুঁড়ে এল তাহা ফিরে!
তখন সুগ্রীব ধরি শ্রীরামের পায়,
নাচিতে-নাচিতে ধুলা লইল মাথায়।
যত ভয় ছিল তার, গেল দূর হয়ে,
চলিল সে কিষ্কিন্ধ্যায় শ্রীরামেরে লয়ে।
লাফায়ে-লাফায়ে সেথা করে গরজন,
"কোথায় গেলে হে দাদা? এস-না এখন।"

সে ডাক শুনিয়া বালী সহিবে কেমনে?
ঝড়ের মতন ছুটে এল সেই ক্ষণে।
দুজনে বিষম যুদ্ধ হল তারপর,
কিবা তার লাথি কিল আঁচড় কামড়।
ঢিপ্, ঠাস্, ধুপ্, খট্, ঘোঁৎ, হুপ্, ধাঁই,
কত শব্দ হল তায়, শেষ তার নাই।
হোথায় দাঁড়ায়ে রাম তীর হাতে নিয়া,
বালীরে মারিতে চান্ সেই তীর দিয়া।
কিন্তু তিনি পড়েছেন বড় ভাবনায়,
কে বা বালী, কে বা মিতা, বুঝা নাহি যায়।
বালীরে মারিতে পাছে মিতা যায় মরে,
বাণ না মারেন রাম এই ভয় করে।

কিল গুঁতা খেয়ে মিতা ছুটে এল হটে,
হাঁপায়ে রামেরে আসি কহিল সে চটে,
"এই মোর মিতা তুই! এই তোর কাজ!
তোর লাগি এত কিল খাইলাম আজ।"
শ্রীরাম বলেন, "মিতা করিও না রোষ,
চিনিতে নারিনু তোরে তাই হল দোষ।
গলে বেঁধে এই লতা যাও তুমি ফিরে
মারি কি না মারি দেখ তখন বালীরে!"
সুগ্রীব সে লতাখানি পরিল গলায়,
চেঁচায়ে ডাকিল পরে, "আয়, দাদা আয়!"
আবার বিষম যুদ্ধ করিল দুজন,
রামের বাণেতে বালী মরিল তখন।
এমতে বালীরে মারি শ্রীরাম ত্বরায়,
সুগ্রীবেরে করিলেন রাজা কিষ্কিন্ধ্যায়।
অঙ্গদেরে যুবরাজ করিলেন পরে,
সে হল বালীর পুত্র, ভারি বল ধরে।

তখন ছুটিল যত বানরের দল,
ধুলা উড়াইয়া আর করি কোলাহল।
দেশে-দেশে ফিরি তারা খুঁজিল সীতারে,
পর্বতে নগরে বনে সাগরের পারে।
খুঁজিয়া-খুঁজিয়া পূবে পশ্চিমে উত্তরে,
কোথাও না পেয়ে তাঁরে ফিরে এল ঘরে।
দক্ষিণের লোক ফিরে আসে নি কেবল,
সেথা গেছে হনুমান লয়ে তার দল।
আঙুটি খুলিয়া রাম দিয়াছেন তারে,
পাইলে সীতার দেখা দেখাতে তাঁহারে।
খুঁজেছে নদীর তীরে, পর্বত উপরে,
ঘন বনে, অন্ধকার গুহার ভিতরে।
কোথাও সীতার দেখা না পাইয়া তারা
সাগরের ধারে আসি কেঁদে হল সারা।
বলে, "আর কোন মুখে ফিরে যাব ঘরে?
না খেয়ে মরিব মোরা এইখানে পড়ে।"

তখন কি হল, সবে শুন মন দিয়া,
সেইখানে ছিল পাখি সম্পাতি বসিয়া।
পাখা নাই তার, তাই উড়িতে না পারে,

সেথায় বসিয়া থাকে সাগরের ধারে।
বানর এসেছে এত, দেখিয়া সম্পাতি,
তাদের সকল কথা শোনে কান পাতি।



সম্পাতি

বানর বসিল সেথা মরিবার তরে,
পাখি বলে, "বেশ হল, খাব পেট ভরে!"
বানর কহিল যবে জটায়ুর কথা,
শুনিয়া বড়ই মনে পাইল সে ব্যথা।

বানর সীতার কথা কহিল যখন,
সম্পাতি কহিল, "তাঁরে নিয়েছে রাবণ।
একশো যোজন এই রয়েছে সাগর,
তারপরে লঙ্কা, সেথা রাবণের ঘর।
সূর্যের তেজেতে পাখা পুড়িল আমার,
সীতার সংবাদ দিলে হবে তা আবার।
নিশাকর মুনি এই কহিল আমারে,
সেই হতে বসে আছি সাগরের ধারে।"
তখন দেখিল চেয়ে যতেক বানর,
সম্পাতির লাল পাখা হইল সুন্দর।
আনন্দে আকাশে উড়ে গেল সে চলিয়া,
কোলাহল করে যত বানর মিলিয়া।
তখন অংগদ কয় সকলেরে ডাকি,
"এখন সাগর শুধু ডিংগাইতে বাকি।
তোমরা তো বড় বীর, তায় ভুল নাই,
সাগর ডিংগাবে কেবা, বল দেখি ভাই?"
সকল বানর তায় পায় বড় লাজ,
বড়ই বিষম যেন লাগে সেই কাজ।
এমন সময় উঠি কহে জাম্ববান,
"সাগর ডিংগাতে পারে বীর হনুমান।"
চুপ করে ছিল হনু বসে একধারে,
সাগর ডিংগাতে কয় জাম্ববান তারে।
হনু বলে, "চল যাই মহেন্দ্র পর্বতে
সাগর ডিংগাতে লাফ দিব সেথা হতে।"

হনুমান বড় বীর, ডিঙ্গাবে সাগর,
কিচির-মিচির করে যতেক বানর।
ফুলিয়া হইল হনু পর্বতের মতো,
গুছায়ে লইল গায় জোর ছিল যত।
তারপরে দুই পায়ে যেই দিল ভর,
পর্বত নিঙাড়ি জল ঝরে ঝরঝর।
আকাশ ফাটিয়া যায়, উছলে সাগর,
লাফাইল হনুমান বড় ভয়ংকর।
মেঘের উপর দিয়া ছোটে যেন তারা,
দেবতা অসুর সবে ভয়ে হয় সারা।

সুরসারে কয় ডাকি দেবতারা পরে,
"দেখ তো মা, হনুমান কত বল ধরে?"
সুরসা নাগের মাতা, যে-সে কেহ নয়,
পৃথিবী গিলিতে পারে যদি মনে লয়।
হনুমান বলে, "বাবা! না জানি কে ইনি!
হাঁ করেছে কত ক্রোশ, দেখ চমৎকার,
বড় যদি নাহি হই, গিলিবে এবার।"
ফুলে ওঠে হনুমান মনে ভয় পেয়ে
সুরসা হাঁ করে ঢের বড় তার চেয়ে!
ফুলে-ফুলে হয় হনু নব্বুই যোজন,
হাঁ করে যোজন শত সুরসা তখন।
হনু বলে, "তাই তো রে, গিলিবেই নাকি?
সে হবে না ঠাকরুণ—হনু জানে ফাঁকি।"
শরীর গুটায়ে হনু লইল তখন,
পলকে হইল তেলাপোকার মতন।
ঝাঁ করে ঢুকিল গিয়া সুরসার মুখে,
তখনি বাহির হয়ে পলাইল সুখে।
ঠকিয়া সুরসা হাসি ফ্যাল্-ফ্যাল্ চায়,
কোথা দিয়ে গেল হনু ভাবিয়া না পায়।
ডাকিয়া কহিল তারে, "যাও বাছাধন
সুখেতে নিজের কাজ কর গে এখন।"
বলিয়া সুরসা যায় আপনার দেশে
আকাশে ছুটিয়া হনু যায় হেসে-হেসে।

সিংহিকা রাক্ষসী এল সুরসার পরে,
মুখ মেলে হনুমানে গিলবার তরে।
হনু বলে, "বুড়ি তুই ভালো ভোজ খাবি,
অসুখ না হয় পরে, তাই শুধু ভাবি।"
ছোট হয়ে গেল হনু রাক্ষসীর পেটে,
নাড়ি ভুঁড়ি সব তার নখে দিল কেটে।
হাঁ করে রাক্ষসী মরে, হাসে দেবগণ,
আকাশে ছুটিয়া হনু যায় ততক্ষণ।
লংকার সোনার পুরী দেখে তারপরে,
ঝলমল করে তাহা জলের উপরে।
হনু ভাবে, 'বড় হয়ে যদি সেথা যাই,
রাক্ষসে করিবে দেখি ভারি কাঁই-মাই।'
খুব ছোট হয়ে তাই, পাখির সমান,
ত্রিকূট পর্বতে গিয়া নামে হনুমান।
লুকায়ে রহিল বনে দিনের বেলায়,
আঁধার হইলে গেল খুঁজিতে সীতায়।

চুপিচুপি যায় হনু, ছোট হয়ে ভারি,
নিকট রাক্ষসী তার দেখে এল তাড়ি।
গালি দিল দুশো দাঁত করি কড়্মড়্,
[illegible]গাছপালা হাতে করে দিল চড়।
হনু তারে এক কিল দিল বাম হাতে,
পড়িল রাক্ষসী মুখ সিঁটকায়ে তাতে।
তখন খুঁজিয়া হনু ফেরে ঘরে-ঘরে,
কত মাঠে, কত পথে, রথের উপরে।
মন্দিরে-মন্দিরে খোঁজে, ঘাটে আঙিনায়,
কোথাও সীতায় নাহি দেখিবারে পায়।
হনু বলে, "হায়-হায়! বুঝিনু এখন,
নিশ্চয় খেয়েছে তাঁরে অভাগা রাবণ।"
কত সে কাঁদিল, ভাবি এই কথা মনে
তারপরে এল এক অশোকের বনে।
সেই বনে গিয়া হনু দেখিল সীতায়,
কেবলই কাঁদেন তিনি পড়িয়া ধুলায়
ময়লা কাপড় তাঁর, আলুথালু চুল,
রাক্ষসে ঘিরেছে তাঁরে লয়ে শেল শূল।
হনু বলে, "এই সীতা, চিনিনু এখুন,
ইঁহারেই সেইদিন আনিল রাবণ।"

বিকট রাক্ষসী হনু দেখিল সেথায়,
ভালুকের মতো রোঁয়া তাহাদের গায়।
বাঘমুখী কেউ, কারু গোদ বড় ভারি,
কারু শিঙ, কারু শুঁড়, কেউ নাড়ে দাড়ি।
কারু নেই মাথা, আর কেহ এক-পেয়ে,
উটপানা, বকপানা আছে কত মেয়ে।
সীতারে ঘিরিয়া তারা খিঁচাইছে দাঁত,
কিল দেখাইছে, তুলি এই বড় হাত।
রাবণ সীতারে আসি কত কথা কয়,
রাঁধিয়া খাইবে বলি দেখায় সে ভয়।
ছিঁড়িয়া খাইতে চায় রাক্ষসীরা তাঁরে,
কুড়াল তুলিয়া তাঁরে যায় মারিবারে।
সীতা কন, "তাই হোক ওরে বাছাগণ,
মরিলে তো যাই বেঁচে, মার এইক্ষণ।"

•

গাছে বসে হনুমান দেখিছে সকল,
কেমনে কহিবে কথা ভাবিছে কেবল।
এমন সময় সীতা এলেন সেখানে,
কত সুখ হল তাঁর পেয়ে হনুমানে।
রামের অঙ্গুরী দিয়া হনু কয় তাঁরে,
"কাঁধে ওঠ, যাই মাগো লইয়া তোমারে।"
সীতা কন, "বাছা তুই এতটুকু হয়ে
কেমনে যাইবি বল মোরে কাঁধে লয়ে?"
শুনিয়া তাঁহার কথা হেসে হনুমান,
দেখিতে-দেখিতে হয় পর্বত সমান।
সীতা কন, "বুঝিলাম, ভারি বল তোর,
কিন্তু বাপ্, মাথা যে রে ঘুরে যাবে মোর।"
হনু কয়, "তবে মাতা কাজ নাই গিয়া,
রাম লক্ষ্মণেরে মোরা হেথা আসি নিয়া।
একখানি অলংকার দাও মা আমারে,
রামের নিকট গিয়া দেখাইতে তাঁরে।"
শুনিয়া মাথার মণি দেন সীতা খুলি,
বিদায় হইল হনু লয়ে পদধূলি।

•

যাবার সময় হনু মনে-মনে কয়,
'রাক্ষস কেমন বীর না দেখিলে নয়।'
হুপ্-হাপ্, ধুপ্-ধাপ্ করি তারপর,



অশোকের বন হনু ভাঙে মড়্‌মড়্‌।
বড়-বড় গাছ তোলে দিয়া এক টান,
গাছ দিয়া বাড়ি-ঘর করে খান্‌-খান্‌।
তখন রাক্ষস যত করি "মার্‌-মার্‌,"
ক্ষেপিয়া আইল লয়ে ঢাল তলোয়ার।
হনু বলে, "জয় রাম! কে মরিবি আয়।"
শতেক রাক্ষস মরে তার এক ঘায়।
যত আসে তত মরে, তবু আসে আর,
সাগরের ঢেউ যেন, শেষ নাই তার।
"জয় রাম! জয় রাম!" হাঁকে হনুমান।
রাক্ষসের মাথা পড়ে হয়ে খান্‌-খান্‌।
হাতি দিয়া হাতি মারে, ঘোড়া দিয়া ঘোড়া,
রাক্ষসে রাক্ষস ঠোকে লয়ে জোড়া-জোড়া।
জাম্বুমালী, বিরূপাক্ষ, ভাসকর্ণ আর,
দুর্ধর প্রঘসে মারি করে চুরমার।
যূপাক্ষের হাড় ভাঙে শাল গাছ দিয়া,
অক্ষেরে করিল গুঁড়া সানে আছাড়িয়া।

রাবণের ছেলে অক্ষ মরিল যখন,
বড় ছেলে ইন্দ্রজিতে পাঠাল রাবণ।
বড় শঠ সেই বেটা, ভারি ফন্দি জানে,
ব্রহ্মাস্ত্রে বাঁধিল আসি বীর হনুমানে।
হনু ভাবে, 'লয়ে যাক রাবণের কাছে,
দেখে নিব, পেটে তার কত বিদ্যা আছে।'
তখন রাক্ষস যত ছুটে গেল নাচি
হনুরে বাঁধিল কষে আনি কত কাছি।
তায় কি হইল, সবে শুন মন দিয়া—
ব্রহ্মাস্ত্র খুলিয়া গেল দড়িতে ঠেকিয়া।
দড়ি ঠেকাইতে কভু না হয় সে বাণে,
অবোধ রাক্ষসগণ তাহা নাহি জানে।
হাততালি দিয়া তারা হাসে খিলি-খিলি,
"হেঁইয়ো, হেঁইয়ো!" বলি টানে সবে মিলি।
চিমটি কাটিছে কত কি হবে তা কয়ে,
এই মতে রাবণের কাছে গেল লয়ে।

যতেক রাক্ষস ছিল সভার ভিতরে,
হনুরে দেখিয়া তারা রহিল হাঁ করে।

তারা বলে, "আরে বাপ! কি বড় বান্দর!
কেন রে আসিলি তুই? কোন দেশে ঘর?
বোনটি ভাঙিলি কেনে? কে পেঠালো তোরে?
মিছাটি কহিবি যেবে, খাব তোকে ধরে।"
হনুমান বলে, "আমি শ্রীরামের দূত,
হনুমান মোর নাম পবনের পুত।
সীতাকে ফিরায়ে যদি না দেয় রাবণ,
কাটিবেন মাথা তার শ্রীরাম লক্ষ্মণ।"
ঘুরায়ে কুড়িটা চোখ, বলিছে রাবণ,
"কাট্ তো রে অভাগারে, কাট্ এইক্ষণ।"
সেথা ছিল বিভীষণ, রাবণের ভাই,
সে বলে, "দূতেরে কভু মারিতে তো নাই।"
রাবণ কহিল, "তবে কাজ নেই মেরে,
লেজটি পোড়ায়ে তার, দে বেটাকে ছেড়ে।"

কাপড় হনুর লেজে জড়ায়ে তখন,
তেল ঢালি দিল জ্বালি সেই দুষ্টগণ।
হো-হো করে হনুমান হেসে তায় সুখে,
ঘষে দিল সেই লেজ দুষ্টদের মুখে।
ছোট হল তারপর, ইঁদুর যেমন
খুলিয়া পড়িল তায় দড়ির বাঁধন।
অমনি লাফায়ে উঠে চালের উপরে,
আগুন লাগায়ে হনু ফেরে ঘরে-ঘরে।
না পোড়ে শরীর তার সীতার কথায়
সকল পোড়ায় হনু যাহা কিছু পায়।
জ্বলিল আগুন ভারি করি দাউ-দাউ
ভয়েতে রাক্ষস যত করে হাউ-মাউ।
ছুটাছুটি করে শুধু পাগলের মতো,
আগুনে পুড়িয়া মরে না জানি-বা কত।

তারপর হনুমান সাগরে নামিয়া,
লেজের আগুন সব দিল নিবাইয়া।
এমন সময়ে হনু ভাবে, 'হায়-হায়!
পোড়ায়ে মারিনু বুঝি মোর সীতা মায়!'
অমনি গেল সে ছুটে অশোকের বনে,
ভালো দেখে তাঁয় বড় সুখ পেল মনে।

আবার পায়ের ধূলা লইয়া তাঁহার,
সাগর ডিঙায়ে হনু দলে ফিরে তার।
আনন্দে তখন দেশে চলিল সকলে,
আকাশ ফাটিয়া যায় তার কোলাহলে।
দেখিতে-দেখিতে হনু এসে কিষ্কিন্ধ্যায়,
রামের পায়ের ধূলা লইল মাথায়।
সীতার মানিক দিয়া কহিল সকল,
আনন্দেতে শ্রীরামের চোখে এল জল।

তারপরে মিলিয়া সকলে,
লঙ্কায় চলিল দলে-দলে,
গণিয়া না হয় শেষ, ধূলায় ছাইল দেশ
আকাশ ফাটিল কোলাহলে।

সভা মধ্যে বসিয়া রাবণ
বলিছে, "কহ তো সভাজন,
একেলা বানর আসি সকলই যে গেল নাশি,
উপায় কি হইবে এখন?"

সবে কয়, "কেনে কর ডর?
লাখো মাল বান্ধিবে কোম্মর,
হেথের লিবেক ভারী, বান্দর দিবেক মারি,
তুই থাক্ বসে গদ্দিপর!"

সেইখানে ছিল বিভীষণ,
বিনয়ে সে কহিল তখন,
"সীতারে রাখিলে ধরে, সকলে মরিব পরে,
ফিরায়ে দেহ গো এইক্ষণ!"

ভালো কথা কহিল যে জন,
গালি দিল তাহারে রাবণ,
মনের দুঃখেতে তাই, গিয়া শ্রীরামের ঠাঁই
বন্ধু তাঁর হল বিভীষণ।

তারপরে যতেক বানর
বড়-বড় আনিল পাথর,
গাছ কত ভারী-ভারী, আনে তা কহিতে নারি,
তাহে নল বাঁধিল সাগর।

নলের কি বুদ্ধি চমৎকার,
তেমন দেখে নি কেহ আর।
জলের উপর দিয়া দিল সেতু বানাইয়া
সাগর হইল সবে পার।



সুগ্রীব ও রাবণ

লংকাপুরী ছাইল বানরে
কাঁপে মাটি তাহাদের ভরে।
কে কবে এসেছে কত? গাছে পাতা নাই তত,
দেখিয়া রাবণ কাঁপে ডরে।

তবু তো সে বড়াই না ছাড়ে,
বলে, "কেবা মোর সাথে পারে?"
মুকুট মাথায় দিয়া, কিবা বুক ফুলাইয়া,
দাঁড়ায়েছে লঙ্কার দুয়ারে।

সুগ্রীব তা দেখিল চাহিয়া
অমনি এল সে লাফ দিয়া,
রাবণের ঘাড়ে এসে, পড়িল সে হেসে-হেসে
দিল তার বড়াই ভাঙিয়া!

হায়-হায়! কহিল সকলে,
রাবণ তো গেল রেগে জ্বলে,
কাড়িয়া মুকুট তার, সাজা কিছু দিয়া আর,
হাসিয়া সুগ্রীব গেল চলে।

পরেতে অংগদ বীর গিয়া
রাবণেরে কহে গালি দিয়া,
"তুই বেটা পাবি সাজা, বিভীষণ হবে রাজা
যুদ্ধ কর্ বাহিরে আসিয়া।"

বড় তায় চটিয়া রাবণ,
"কাট্! কাট্!" কহিল তখন
হাঁই-মাঁই করি তায়, অঙ্গদে ধরিতে যায়
চারি বেটা যমের মতন।

তারা এল "হাঁই-মাঁই" বলে,
সে তাদেরে পুরিল বগলে,
"রাম জয়" বলি তবে, আছাড়ি মারিল সবে,
তারপর ঘরে এল চলে।

তখন হইল যুদ্ধ বড় ভয়ংকর,
না জানি মরিল কত রাক্ষস বানর।

দিন নাই, রাত নাই, করে কাটাকাটি,
রক্তেতে বহিল নদী, লাল হল মাটি।
"মার্-মার্" "কাট্-কাট্" মহা গন্ডগোল,
অস্ত্র করে ঝন্ঝন্, বাজে ঢাক ঢোল।
হেথায় রামের বাণ ছোটে যেন তারা,
পলায় রাক্ষস তায় হয়ে দিশাহারা।
অঙ্গদ রুষিয়া গেল দেখি ইন্দ্রজিতে,
পিষিল সারথি তার বিষম লাথিতে।
তাহে দুষ্ট ইন্দ্রজিত পেয়ে বড় ডর,
মেঘে লুকাইয়া যুদ্ধ করে তারপর।

শুন বলি হল তায় কি যে সর্বনাশ,
চোর বেটা মারে বাণ নাম নাগপাশ!
বড়-বড় অজগর ছুটে এল তায়,
বিষম জড়াল রাম লক্ষ্মণের গায়।
সাপে বাঁধা দুই ভাই নড়িতে না পান,
বাণেতে তাঁদের দুষ্ট করিল অজ্ঞান।
ঘরে গিয়া তারপর কয় রাবণেরে,
"মানুষ দুটাকে আমি আসিয়াছি মেরে!"

হেথায় কি হল তাহা শুন মন দিয়া—
কাঁদিছে সকলে রাম লক্ষ্মণে ঘিরিয়া।
আইল গরুড় পাখি তখন সেথায়,
সাপেরে দেখিলে ধরে অমনি সে খায়।
জটায়ুর জ্যেঠা সে যে, ভারি ভয়ংকর,
উড়িলে পর্বত কাঁপে, বড় বয় ঝড়।
তারে দেখি অজগর দুভাইকে ছাড়ি,
'বাপ!' বলি পলাইয়া গেল তাড়াতাড়ি।
গরুড়ে করেন রাম কতই আদর,
উঁচু লেজ করি নাচে যতেক বানর।
কিচির-মিচির শুনি কহিছে রাবণ,
"রাম তো মরিল, তবে গোল কি কারণ?"
রাক্ষসেরা কয়, "আরে রামা হল চাঙ্গা,
চিল্লায়ে বান্দর বেটা নাচে ধিঙ্গা তাঙ্গা।"
শুনিয়া রাবণ বলে, "সব-হল মাটি,"
কোথা রে ধুম্রাক্ষ! এস বেটাদের কাটি!"
ধুম্রাক্ষ চলিল তায় গদা হাতে নিয়া,

বাঘমুখো গাধা সব রথেতে জুড়িয়া।
সঙ্গেতে রাক্ষস কত লেখাজোখা নাই,
দাঁত কড়্মড়ি তারা করে হাঁই-মাই।
ছোট-ছোট বানরের তেজ বড় ভারি,
রাক্ষসের হাড় ভাঙে কিল চড় মারি।
ক্ষেপিল ধূম্রাক্ষ তার যমের মতন,
ভয়েতে মর্কট যত পলায় তখন।
ছোট বানরের দল যায় পলাইয়া,
দূর হতে হনুমান দেখিল চাহিয়া।
অমনি আনিয়া এক পর্বতের চূড়া,
ধাঁই করি ধূম্রাক্ষেরে করিল সে গুঁড়া।
বড়ই বিষম যুদ্ধ বানরেরা করে,
রাক্ষসেরে নাহি দেয় ফিরে যেতে ঘরে।
থাপ্পড় লাগায় ভারি, ছিঁড়ে নাক কান,
গলায় জড়ায়ে লেজ কষে দেয় টান।
যেই আসে তারে মারে, নাহি করে ভয়,
মাথাটি ফাটায় তার বলে, "রাম জয়!"
বজ্রদংষ্ট্র, অকম্পন, যুদ্ধে যেন যম,
কুম্ভহনু, নরান্তক, নহে কেহ কম।
প্রহস্ত কেমন বীর, কি হবে তা বলে?
বানরের হাতে এরা মরিল সকলে।
কেমনে ঘরেতে বসে থাকিবে রাবণ?
নিজেই আসিল তাই লয়ে লোকজন।
ইন্দ্রজিত, অতিকায় সাথে এল তার,
ত্রিশিরা নিকুম্ভ, কুম্ভ মহোদর আর।
লাফায়ে বানর ধায় পর্বত লইয়া,
রাক্ষসেরে নাহি দেয় ফিরে যেতে ঘরে।
রাগিয়া রাবণ মারে চোখা-চোখা বাণ,
পর্বত ভাঙিয়া তায় হয় খান্-খান্।
বড় যুদ্ধ করে বেটা ভূতের মতন,
আঁটিতে নাহিক তারে পারে কোনো জন।
সুগ্রীব অজ্ঞান হল বুকে বাণ ফুটে,
গবয়, ঋষভ, নল, পলাইল ছুটে।
কিল বাগাইয়া তায় এল হনুমান,
দুজনে হইল যুদ্ধ সমান-সমান।
দুজনে মারিল সে কি যে-সে কিল-চড়?
অন্য লোক হলে তায় ভাঙিত পাঁজর।

বড় বীর ছিল তাই মরে নাই তারা,
ব্যথায় চেঁচিয়ে কিন্তু হয়েছিল সারা।
তখন রাবণ দিল হনুমানে ছাড়ি,
নীলেরে মারিতে পরে গেল তাড়াতাড়ি।
বড় চটপটে নীল ছুঁচোবাজি মতো,
চোখের পলকে লাফ দেয় দুই শত।
ছুটে উঠে রাবণের রথের চূড়ায়,
টিপ্ করে পড়ে নীল বেটার মাথায়।
তিড়িঙ-বিড়িঙ নাচি ফেরে হেথা-হোথা,
রাবণ পড়িল গোলে—বাণ মারে কোথা?
হাসিল বানর সব, চটিল রাবণ,
ভয়ংকর বাণ হাতে লইল তখন।
অজ্ঞান হইয়া নীল পড়িল সে বাণে,
ধাইয়া রাবণ গেল লক্ষ্মণের পানে।
দুইজনে হল যুদ্ধ বড়ই বিষম,
দুইজনে ভারি বীর কেহ নহে কম।
রাবণ লক্ষ্মণে মারে কড়্মড়ি দাঁত,
লক্ষ্মণ করেন তারে বাণে চিৎপাত।
তখন রাগেতে বেটা কাঁপি থর্থর্,
ছুঁড়িয়া মারিল এক শক্তি ভয়ংকর।
ব্রহ্মার নিকটে তাহা পাইল রাবণ,
বারণ করিতে তারে নারে কোনোজন।
পড়িল আসিয়া শক্তি বজ্রের সমান,
বুকে বিঁধি লক্ষ্মণেরে করিল অজ্ঞান।
ছুটিয়া রাবণ তায় এল তারে নিতে,
নিয়ে যাবে দূরে থাক, নারিল নাড়িতে।
এমন সময়ে এসে বীর হনুমান,
এক কিলে অভাগারে করিল অজ্ঞান।
লক্ষ্মণেরে তারপরে কোলেতে করিয়া
রামের নিকটে তাঁরে গেল সে লইয়া।
আপনি তখন শক্তি পড়ে গেল খুলে,
হেসে উঠিলেন তিনি সব দুঃখ ভুলে।

নিজেই তখন রাম লয়ে ধনু-শর,
রাবণেরে দিতে সাজা চলেন সত্বর।
পিঠে করে লয়ে তাঁরে যায় হনুমান,
রাগে পেয়ে তারে দুষ্ট কষে মারে বাণ।

হনুরে মারিয়া বাণ কত হবে কাজ?
শ্রীরামের বাণ খেয়ে বাঁচুক তো আজ!
রথ ঘোড়া সব তার গেল তাঁর বাণে,
সারথি মরিল, নিজে মরে বুঝি প্রাণে
মুকুট গিয়েছে উড়ে, মাথা যায়-যায়,
অবশ হয়েছে হাত, বল নাই গায়।
হাসিয়া তখন তারে কহিলেন রাম,
"আজি তবে ঘরে গিয়া করহ বিশ্রাম।"
লাজে আর রাবণের কথা নাহি সরে,
হেঁট করে কালামুখ পলাইল ঘরে।
বসিয়া সভার মাঝে বলিছে রাবণ,
"উপায় কি হবে, সবে কহ তো এখন।
মানুষেরে ধরে খাই, নাহি করি ডর,
কে জানে সে বেটা হয় এত ভয়ংকর?
হায় আমি তার কাছে গেলাম হারিয়া!
কোন বীর দিবে এই মানুষ মারিয়া?
শীঘ্র গিয়া কুম্ভকর্ণে জাগাও এখন,
মানুষ মারিবে সেই যদি করে মন।"
কুম্ভকর্ণ ভাই হয় রাবণ রাজার,
ছুটিয়া পলায় যম দেখা পেলে তার!
এমন বিকট জন্তু দেখে নাই কেহ,
পাহাড়ের মতো তার ভয়ংকর দেহ!
ব্রহ্মা দিল বর, 'শুধু ঘুমাইবে' বলে,
নহিলে গিলিয়া বেটা খাইত সকলে।
ছয় মাস ঘুমাইয়া জাগে একদিন,
হাজারে-হাজারে খায় মহিষ হরিণ।
ঘরের ভিতরে তার নাহি হয় ঠাঁই,
পর্বত গুহায় গিয়া ঘুমায় সে তাই।
ঝড়ের মতন শ্বাস বয় নাক দিয়া,
যে যায় নিকটে, তারে নেয় উড়াইয়া।
তারে জাগাইতে সবে গেল তাড়াতাড়ি,
ফুঁকিল কানের কাছে শাঁক ভারী-ভারী।
তালি দিয়া চটাপট্ চেঁচাইল কত,
কষে নাড়া দিল গায়, যে পারিল যত।
এত করি তবু তারে নারি জাগাইতে,
সকলে মিলিয়া তারে লাগিল মারিতে।
কষে মারে কিল-গুঁতা যত মতো হয়,

চিমটি কাটে যে কত, বলিবার নয়।
দু-হাতে টানিয়া চুল ছিঁড়ে গোছা-গোছা,
হাঁচির ভয়েতে নাকে নাহি দেয় খোঁচা!
কানে জল ঢেলে তায় লাগায় কামড়,
আরো নাক ডাকে তায়, ঘড়র্-ঘড়র্।
হাজার পাহাড়পানা হাতি দিয়া তবে,
ধুরিয়া-ধুরিয়া তারে মাড়াইল সবে।
সুখ বড় পেল তায়, চোখ মেলে তাই,
উঠিয়া তুলিল বেটা এই বড় হাই!
অমনি সকলে আনি খেতে দিল তারে,
শুয়োর, হরিণ, মোষ হাজারে-হাজারে।
সকল করিয়া শেষ কুম্ভকর্ণ কয়,
"কি লাগি জাগালে মোরে এমন সময়?"
জোড়হাতে কয় সবে, "বড়, বড় ডর!
মারি কাটি দিল সব, মানুষ-বান্দর!"
তাহা শুনি কুম্ভকর্ণ চলিল ত্বরায়,
যেথায় রাবণ আছে বসিয়া সভায়।
ভয়েতে বানর সব, তাহারে দেখিয়া,
"মাগো!" বলি দুই লাফে যায় পলাইয়া।

রাবণের কাছে গিয়া কুম্ভকর্ণ কয়,
"কি লাগি জাগালে মোরে, কহ মহাশয়।"
রাবণ সকল কথা কহিল যখন,
সে কহিল, "কেন কাজ করিলে এমন?"
তবু কিন্তু রাবণের রাগ হল ভারি,
যুদ্ধে ভাই কুম্ভকর্ণ যায় তাড়াতাড়ি।
শূল হাতে ধায় সে যে পর্বতের মতো,
বানর ধরিয়া খায়, কাছে পায় যত।
রুষিয়া কামড় তারা মারে তার গায়,
সে কামড়ে কুম্ভকর্ণ সুখ শুধু পায়।
বানরেরা কিছু তার করিতে না পারে,
শরভ, ঋষভ, নীল সকলেই হারে।
অঙ্গদ অজ্ঞান হল, হনু গেল হেরে,
সুগ্রীব পর্বত লয়ে এল তায় তেড়ে।
পর্বত ভাঙিল ঠেকে রাক্ষসের গায়,
রুষিয়া তখন বেটা শূল হাতে ধায়।

ভাগ্যেতে ভাঙিল শূল আসি হনুমান,
নইলে যাইত তায় সুগ্রীবের প্রাণ।
ক্ষেপিয়া উঠিল তবে কুম্ভকর্ণ ভারি,
পর্বতের চূড়া নিল তুলে তাড়াতাড়ি।
ঠাঁই করে সুগ্রীবেরে ঠুকিল তা দিয়া,
ঘরে লয়ে গেল তারে অজ্ঞান করিয়া।
জাগিয়া ভাবিল মনে বানরের রাজা,
রাক্ষস বেটারে কিছু দিয়া যাই সাজা।
যেই কথা সেই কাজ করে বুদ্ধিমান,
দাঁতে ছিঁড়ে নাক তার, হাতে ছিঁড়ে কান।
পায়ের আঁচড়ে নিল ছিঁড়ে দুই পাশ,
চেঁচাল রাক্ষস তায় ফাটায়ে আকাশ।
বিষম ভয়েতে দিল সুগ্রীবেরে ছাড়ি,
পলায়ে বানর রাজা গেল তাড়াতাড়ি।

বোঁচা হয়ে কুম্ভকর্ণ আইল তখন—
নাক নাই, কান নাই ভূতের মতন।
দেখিয়া বানর সব যায় পলাইয়া,
পিছনের পানে আর না চায় ফিরিয়া।
ধনুক ধরিয়া তায় এলেন লক্ষ্মণ,
হাসি কুম্ভকর্ণ তাঁরে কহিল তখন,
"ছেলেমানুষেরে মারি কিবা কাজ মোর?
মারিতে আসিনু আজ দাদাটাকে তোর।"
গদা লয়ে ধায় বেটা শ্রীরামের পানে,
অমনি পড়িল গদা কেটে তাঁর বাণে।
রাগে সে তখনি তুলে লইল পাথর,
পাথর ভাঙিলে নিল লোহার মুদ্গর।
ছুটিয়া রামের বাণ আসে শত-শত,
লাফায়ে বানর ঘাড়ে উঠেছে-বা কত।
আঁচড়-কামড় মেরে করিছে পাগল,
দাঁতে হাতে পায়ে চুল ছিঁড়িছে কেবল,
কিছুতেই কুম্ভকর্ণ না হয় কাতর,
ফিরায় সকল বাণ ঘুরায়ে মুদ্গর!
রোষে রাম বায়ুবাণ মারেন ত্বরায়,
মুদ্গর সহিতে তার হাত কাটে তায়।
ব্যথায় তখন বেটা চেঁচায় বিকট,
আর হাতে তালগাছ নিল চট্‌পট্‌।

সে হাত কাটেন রাম ইন্দ্র অস্ত্র মেরে,
তবু সে খিঁচায়ে দাঁত আসে ডাক ছেড়ে।
দুই পা কাটিল তবু যায় গড়াইয়া—
হাঁ করি খাইতে যায় রামেরে গিলিয়া।
তখন বাণের ছিপি মুখে তার এঁটে,
ইন্দ্র অস্ত্রে মাথা তার দেন রাম কেটে।
ভয়েতে চেঁচাল তায় রাক্ষসের দল,
আনন্দে দেবতাগণ করে কোলাহল।
কাঁদিয়া রাবণ কয়, "কি হবে উপায়?
ভাই বিভীষণে গালি কেন দিনু হায়!"

এমন করিয়া কত কাঁদিল রাবণ,
বড়-বড় ছয় বীর সাজিল তখন।
চলে সাজি অতিকায়, ত্রিশিরারে নিয়া,
দেবান্তক, নরান্তক চলিল সাজিয়া।
মহাপার্শ্ব, মহোদর চলিল দুজন,
ভারি যুদ্ধ করে তারা মিলিয়া তখন।
বানরের কিল খেয়ে মরে গেল পরে,
শুধু অতিকায় বীর সহজে না মরে।
'অক্ষয় কবচ' এক আছে তার গায়,
শেল, শূল, তীর, কিছু নাহি বিঁধে তায়।
লক্ষ্মণ মারেন বাণ বাছিয়া-বাছিয়া,
কবচে ঠেকিয়া সব আইসে ফিরিয়া।
তখন পবন এসে কন তাঁর কানে,
"ব্রহ্মাস্ত্র মারহ, বেটা মরিবে সে বাণে।"
তখন লক্ষ্মণ ছুঁড়ে মারেন সে বাণ,
তাহা দেখি রাক্ষসের উড়িল পরান।
শত অস্ত্র মারি তাহা নারে ফিরাইতে,
মাথা কাটি পড়ে তার দেখিতে-দেখিতে।

রাতে এল ইন্দ্রজিত মেঘে লুকাইয়া,
লুকায়ে মারিল বাণ আড়ালে থাকিয়া।
বাণেতে অজ্ঞান হয়ে পড়িল সকলে,
হাসিতে-হাসিতে তায় গেল বেটা চলে।
লঙ্কায় ফিরিয়া বেটা কয় তারপর,
"মারিয়া আসিনু যত মানুষ-বানর।"

হেথায় পড়েছে সবে হয়ে অচেতন
বাকি শুধু হনুমান আর বিভীষণ।
সবারে খুঁজিয়া তারা ফেরে আলো নিয়া,
না জানি কোথায় কেবা রয়েছে পড়িয়া।
মরার মতন ঐ পড়ে জাম্বুবান
চাহিতে না পারে, চোখে বিঁধিয়াছে বাণ।
কহিল অনেক কষ্টে চিনি হনুমানে,
"তুমি বাঁচাইলে আজি বাঁচি হে পরানে।
ডিঙ্গাইয়া হিমালয় যাও বাছাধন,
কৈলাস পর্বত পাবে দেখিতে তখন।
আর এক পরবত পাবে তার কাছে,
চারিটি ঔষধ বাছা সেইখানে আছে।
বিশল্যকরণী আর মৃতসঞ্জীবনী,
আর যে সন্ধানী আর সুবর্ণকরণী।
এ চারি ঔষধ নিয়া আইস ত্বরায়,
নহিলে আজ তো আর না দেখি উপায়।"
আকাশে ছুটিল হনু, ঝড় যেন বয়,
চোখের পলকে পার হল হিমালয়।
তখন দেখিল হনু, ঔষধ সকল,
কৈলাসের কাছে ঐ করে ঝলমল।
পরে যে কোথায় তারা লুকাইল হায়,
কাছে গিয়া হনু আর খুঁজিয়া না পায়।
হনুমান বলে, "আমি তায় নাহি ভুলি—
পর্বত মাথায় করে লয়ে যাব তুলি।"
এতেক বলিয়া রোষে বীর হনুমান,
পর্বত ধরিয়া দিল কষে এক টান।
চড়্‌চড়্‌ করি তায় এল তাহা উঠি,
মাথায় লইয়া তারে যায় হনু ছুটি।
লঙ্কায় সে ফিরে যেই এল তাহা নিয়া,
ঔষধের গন্ধে সবে উঠিল বাঁচিয়া।
আনন্দে বানর গায় নেচে আর হেসে,
পর্বত লইয়া হনু রাখে তার দেশে।

সেদিন সন্ধ্যায় মিলে বানরসকলে
লঙ্কায় আগুন লয়ে যায় দলে-দলে!
হনু বাকি রেখেছিল, যাহা পোড়াইতে,

সকল করিল ছাই দেখিতে-দেখিতে।
ভয়েতে রাক্ষসগুলি হইল পাগল,
কপাল চাপড়ি তারা চেঁচায় কেবল।
আগুন জ্বলিছে হেথা লঙ্কার ভিতর,
হোথায় চলেছে যুদ্ধ বড় ভয়ংকর।
রাক্ষস না জানি সাজি আসিয়াছে কত,
ক্ষেপিয়া ধাইছে তারা পর্বতের মতো।
বজ্রের সমান পড়ে বানরের চড়,
তাহাতে রাক্ষস মরে করি ধড়্‌ফড়্।
কুম্ভ নামে এক বেটা যুদ্ধ করে ভারি,
দ্বিবিদ, অঙ্গদ গেল তার কাছে হারি।
এমন সময় সেথা সুগ্রীব আসিয়া,
কুম্ভের ধনুকখানি লইল কাড়িয়া।
দুজনে তখন্ খুব হল হুড়াহুড়ি,
সুগ্রীব ফেলিল তারে সাগরেতে ছুঁড়ি
ভিজিয়া-তিতিয়া বেটা উঠে তারপর,
সুগ্রীবের বুকে কিল দিল ভয়ংকর।
তখন সুগ্রীব তারে দিল এক কিল,
গুঁড়া হল কুম্ভ তায় হয়ে তিল-তিল।
রাগেতে কুম্ভের ভাই নিকুম্ভ তখন,
পরিঘ লইয়া ধায় অসুর যেমন।
ঠেকিয়া হনুর বুকে সে পরিঘ তার,
বালির হাঁড়ির মতো হয় চুরমার।
রোষেতে নিকুম্ভ তায় ধরি হনুমানে,
টানিয়া চলিল তারে লয়ে লঙ্কাপানে।
হনু তারে এক কিল মারিল যখন,
কুঁজো হয়ে গেল বেটা 'হ'-এর মতন।
তারপর হনু তার বুকে হাঁটু দিয়া,
মহারোষে মাথা তার ছিঁড়িল টানিয়া।
পরে যে আইল, তার মকরাক্ষ নাম,
হাসিতে-হাসিতে তারে মারিলেন রাম।
আবার সে ইন্দ্রজিত এল তারপরে,
লুকায়ে মারিল বাণ সবার উপরে।
রোষে রাম কন, "আজ মারিব ইহারে,
দেখিব কোথায় গিয়া বাঁচিতে সে পারে।"
তাহা শুনি ইন্দ্রজিত সেথা হতে গিয়া,
মায়ার পুতুল এক এল রথে নিয়া।

সীতা নয়, কিন্তু তাহা ঠিক তাঁরই মতো
"হা রাম!" "হা রাম!" বলি কাঁদিল সে কত।
চুলে ধরে ইন্দ্রজিত নিয়ে এল তারে,
তলোয়ার দিয়া তারে চায় কাটিবারে।
রুষিয়া কহিল হনু, "শোন্ দুষ্ট চোর,
মায়েরে কাটিলে আজ রক্ষা নাহি তোর।"
সে কথায় ইন্দ্রজিত নাহি দেয় কান,
কাটিয়া মায়ার সীতা করে দুই খান।
তখন কাঁদিল সবে হায়-হায় করি,
"সীতা, সীতা!" বলে রাম দেন গড়াগড়ি
বুঝায়ে তখন তাঁরে কহে বিভীষণ,
"সীতারে কেটেছে, তাহা হয় কি কখন?
ফাঁকি দিয়া দুষ্ট বেটা ভুলায়ে তোমারে,
নিকুম্ভিলা নামে যজ্ঞ গেল করিবারে।
সে যজ্ঞ হইলে শেষ হারাবে সবায়,
নহিলে মরিবে নিজে, ভুল নাহি তায়।
ত্বরায় ধনুক লয়ে চলহ লক্ষ্মণ,
এ যজ্ঞ হইতে শেষ না দিব কখন।"
তখনি লক্ষ্মণে সাথে লয়ে বিভীষণ,
নিকুম্ভিলা যজ্ঞ যায় করিতে বারণ।
খেঁকায়ে রাক্ষস এল তাদের দেখিয়া,
শব্দ শুনি ইন্দ্রজিত আসিল ছুটিয়া।
লাগিল বিষম যুদ্ধ তখন সেথায়,
যজ্ঞ শেষ করা আর না হইল তায়।
লক্ষ্মণ হনুর পিঠে, ইন্দ্রজিত রথে,
দুইজনে কত যুদ্ধ হয় কত মতে।
মারিল সারথি ঘোড়া রাক্ষস বেটার,
হাতের ধনুক তার কাটিল দুবার।
নূতন সারথি আনে রথ সাজাইয়া,
বিভীষণ ঘোড়া তার পিষে গদা দিয়া।
রোষে নিল ইন্দ্রজিত শকতি তখন,
কাটিয়া দিলেন তাহা অমনি লক্ষ্মণ।
ইন্দ্র অস্ত্র মারিলেন ধনুকে জুড়িয়া,
অসুর কাটেন ইন্দ্র যেই অস্ত্র দিয়া।
তাহা দেখি রাক্ষসের উড়িল পরাণ,
সেই অস্ত্রে মাথা তার হল দুইখান।
নাচিল বানর তায় 'জয়-জয়' বলে,

দুন্দুভি বাজাল সুখে দেবতা সকলে।
হেথায় সবারে ডাকি কহিছে রাবণ,
"রামেরে মারহ ঘিরি আছ যত জন।
যদি সে না মরে তবু, কাবু হবে তায়,
তখন তাহারে আমি মারিব ত্বরায়।"
বিকট রাক্ষস যত এ কথা শুনিয়া,
রামেরে মারিতে গেল খাঁড়া ঢাল নিয়া।
বিষম রোষেতে তারা গিয়া সেইখানে,
চেঁচায়ে মরিল সবে শ্রীরামের বাণে।

আর বীর নাই রাবণের দেশে,
সকলে গিয়াছি মরে,
নিজেই তখন চলিল রাবণ
সাজিয়া রাগের ভরে।
যতেক রাক্ষস আছিল বাঁচিয়া
সবারে লইল সাথে,
দাঁত কড়্মড়ি চলিল সকলে
হাতিয়ার লয়ে হাতে।
রুষি শেল শূল ছুঁড়িল তাহারা
চেঁচায়ে খিঁচায়ে মুখ,
আছাড়ি তাদের মারিল বানর,
পাথরে পিষিল বুক।
ধনুক ধরিয়া ধাইল রাবণ
রাগেতে আগুন হয়ে,
সাঁই-সাঁই বাণ বিষম ছুঁড়িল,
বানর ভাগিল ভয়ে।
বাণেতে তখন কাটেন লক্ষ্মণ
ধনুক সারথি তার,
ঠেঙায়ে ভাঙিল ভাই বিভীষণ
ঘোড়া চারিটার ঘাড়।
রোষেতে রাবণ মারিল তাহারে
শক্তি ছুঁড়িয়া ভারী,
পথের মাঝেতে দিলেন লক্ষ্মণ
কাটি তাহা তাড়াতাড়ি।
ত্বরায় রাবণ আরেক শক্তি
লইল তুলিয়া তবে,

ঝলমল করি জ্বলে আলো তায়
দেখিয়া কাঁপিল সবে।
মরে বুঝি হায় যায় বিভীষণ!
কে বাঁচাবে তার প্রাণ?
এই ভাবি মনে রাবণে লক্ষ্মণ
মারেন কতই বাণ।
রথের উপরে বসিয়া রাবণ
কাঁপে রাগে থরথর্,
জ্বলে কুড়ি চোখ বিশ পাটি দাঁত
করে তার কড়্মড়্।
ছাড়ি বিভীষণে লক্ষ্মণেরই পানে
শকতি ছুঁড়িয়া মারে,
মহা শব্দে তাহা পড়ি তাঁর বুকে
অজ্ঞান করিল তাঁরে।
'হায়-হায়' বলে বানর সকলে
শকতি খুলিতে ধায়,
বাণেতে বারণ করিল রাবণ—
হায়, কি হবে উপায়!
কেঁদে-কেঁদে রাম তোলেন শকতি
নিজে আসি তারপর,
কত বাণ তাঁরে মারিল রাবণ
তাহে নাই কিছু ডর।
রোষে দেহ তাঁর উঠিল কাঁপিয়া
শুকাল চোখের জল,
ধনুকেতে বাণ সূর্যের মতন
করি ওঠে ঝলমল।
আকাশ পাতাল ছাইয়া তখন
ডাকিয়া ছুটিল বাণ,
আধমরা হয়ে অভাগা রাবণ
পলায় লইয়া প্রাণ।

সেথা ছিল বুড়া সুষেণ বানর
কবিরাজ বড় ভারি,
হনুরে পাঠায়ে তখনি ঔষধ
আনায় সে তাড়াতাড়ি।
বাস পেয়ে তার হাসিয়া লক্ষ্মণ
সুখেতে বসেন উঠি,

অমনি আবার বিষম রোষেতে
রাবণ আইল ছুটি।
ঝন্-ঝনা-ঝন্, ঘট্-ঘটা-ঘট্
ঘোর যুদ্ধ হয় তায়,
দেবতা অসুর সকলে তখন
ছুটিয়া দেখিতে যায়।
আকাশ হইতে আসিল ইন্দ্রের
ঝক্‌ঝকে রথখানি,
কবচ ধনুক, অস্ত্র কত আর
নাম তার নাহি জানি।
সেই রথে তুলে লইল রামেরে
মাতলি সারথি তার,
কি যুদ্ধ তখন হইল বিষম
কি তাহা কহিব আর!
ঐ দেখ হায় রামেরে রাবণ
অস্থির করিল বাণে,
তখনি আবার সাজা পেয়ে তার
মরে বুঝি বেটা প্রাণে।
যতেক দেবতা, কহেন সকলে,
"রামের হউক জয়!"
"তা নয়, তা নয়, রাবণের জয়!"
রুষিয়া অসুর কয়!
হেথায় রাবণ হয়েছেন কাবু
শ্রীরামের হাতে পড়ে,
রথের উপরে নারেন বসিতে
ধনুকখানিকে ধরে।
দশা দেখে তার, দয়া করে রাম
দিলেন বেটারে ছাড়ি,
রথ ফিরাইয়া সারথি পলায়
তারে লয়ে তাড়াতাড়ি।
রথের উপরে পড়ে সে তখন
খাবি খেতেছিল খালি,
ঘরে গিয়া বেটা সাহস পাইয়া
সারথিরে পাড়ে গালি।
"ওরে বেটা গোরু, কি করিলি তুই
লোকে কি কহিবে মোরে?
রথ লয়ে বেটা এলি যে পলায়ে?

বল তো কি করি তোরে?"
সারথি কহিল, "ভাগি নি তো রাজা
ঘোড়াকে পিলানু জল!
যা কহিবি তুই, সে করিব মুই—
এবে কি করি সে বল্।"
হাসিয়া রাবণ কহিল তখন
সারথিরে দিয়ে বালা,
"রামকে না মারি না ফিরিব ঘরে—
চালা তুই রথ, চালা!"
সেই যে ফিরিয়া আইল রাবণ
আর না ফিরিল ঘরে,
বড় কিন্তু তার কঠিন পরান!
বেটা কি সহজে মরে?
মাথা কাটা গেলে তখনি আবার
আর মাথা হয় তার,
মারিতে তাহারে না পারেন রাম
কাটি মাথা শতবার।
তখন মাতলি কহিল তাঁহারে,
"ব্রহ্মাস্ত্র মারহ ছুঁড়ি,"
অমনি সে বাণ লইয়া শ্রীরাম
ধনুকে দিলেন জুড়ি।
পাহাড় কাঁপিল আকাশ ফাটিল,
সাগর উঠিল তীরে,
রাবণ বেটার বুক ভাঙি বাণ
তখনি আইল ফিরে।

মরিল রাবণ, ঘুচিল আপদ,
ভয় না রহিল আর,
হাসিল গাইল ছিল যত লোক,
সুখ না হইল কার?
লাফায়ে-লাফায়ে নাচিল বানর
তা-ধিন্ তা-ধিন্ করে,
স্বরগের ফুল পড়ে ঝরঝর্
তাদের মাথার পরে।
যতেক রাক্ষস করি হায়-হায়
কাঁদিল সকলে তারা,

কাঁদে রানীগণ, নিজে বিভীষণ
কাঁদিয়া হইল সারা।
সোনার দোলায় তুলিয়া রাবণে
শ্মশানে আনিল পরে,
চন্দনের চিতা সাজায়ে তাহারে
পোড়াল যতন করে।

দুঃখিনী সীতার কথা শুন তারপর,
মায়ের চোখেতে জল ঝরে ঝরঝর্
ময়লা কাপড়ে মাতা পড়িয়া ধুলায়,
এমন সময় হনু আইল সেথায়।
হনু বলে, "শুন মাগো, মরিল রাবণ,
মুছ মা চোখের জল, উঠগো এখন।"
সুখেতে সীতার মুখে কথা নাহি সরে,
পাবেন রামের দেখা এতদিন পরে!

হায় রে দুঃখের কথা কহিব কি আর—
সেই রাম না করিল আদর সীতার!
ভ্রূকুটি করিয়া তিনি কহিলেন তাঁরে,
"যেথা ইচ্ছা যাও সীতা, চাহি না তোমারে।
ছিলে তুমি এতদিন রাক্ষসের সনে,
বাস কিনা ভালো আর কহিব কেমনে?"
সীতা বলিলেন, "হায়, একি শুনি আজ?
হায় রে, আমার আর বাঁচিয়া কি কাজ?
আগুন জ্বালিয়া তবে দাও গো লক্ষ্মণ
তাহাতে পুড়িয়া সীতা মরিবে এখন!"
কাঁদিয়া লক্ষ্মণ দেন জ্বালাইয়া চিতা,
অমনি ঝাঁপায়ে তায় পড়িলেন সীতা।
"হায়-হায়" করি সবে কাঁদিল তখন,
আগুন শীতল হল জলের মতন।
না পোড়ে মায়ের চুল, না পোড়ে আঁচল
সূর্যের মতন মাতা হলেন উজল!
যতনে তখন অগ্নি কোলে লয়ে তাঁরে,
উঠিয়া কহেন আসি সভার মাঝারে,
"লহ রাম, লহ এই সীতারে তোমার,
নাই-নাই-নাই দোষ কিছু নাই তাঁর!"

আদরে সীতারে রাম নিলেন এবার,
তখন সুখের সীমা না রহিল আর।
আনন্দ করিল কত সকলে মিলিয়া,
এলেন দেবতাগণ দশরথে নিয়া।
পিতার পায়ের ধূলা লইয়া তখন,
ভুলিলেন সব দুঃখ শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
তুষ্ট হয়ে দেবগণ শ্রীরামেরে কন,
"কি বর চাহ রে বাছা, লহ এইক্ষণ।"
শ্রীরাম বলেন, "তবে দিন এই বর,
বাঁচিয়া উঠুক যত মরেছে বানর।"
অমনি উঠিল বাঁচি বানর সকল,
প্রভাতে জাগিল যেন বালকের দল!
বালির ভিতর হতে ওঠে লাফ দিয়া,
সাগর হইতে উঠে লাঙুল নাড়িয়া।

শ্রীরাম বলেন, "শুন মিত্র বিভীষণ,
দেশে যাই, দেহ ভাই বিদায় এখন।"
সারথি পুষ্পক রথ আনে সাজাইয়া,
হাঁসে লয়ে যায় তাহা আকাশে উড়িয়া।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা উঠিলেন তাতে,
বানর সকলে কয়, "মোরা যাব সাথে।"
রাম কন, "কি আনন্দ! চলহ সকলে!"
অমনি সকলে রথে উঠে দলে-দলে।
সুগ্রীব অঙ্গদ উঠে, আর জাম্ববান,
সকল বানর লয়ে উঠে হনুমান।
যতেক রাক্ষসী উঠে বিভীষণ সনে,
সবারে লইয়া রথ উড়ে সেইক্ষণে!
যখন থামিল রথ কিষ্কিন্ধ্যায় যেয়ে
লাফায়ে উঠিল যত বানরের মেয়ে।
প্রয়াগে আসিল রথ লইয়া সবায়,
সেই মুনি ভরদ্বাজ থাকেন যেথায়।
চৌদ্দটি বছর রাম থাকিবেন বনে
সেই সময়ের শেষ হল সেইক্ষণে।
তখন বলেন রাম হনুরে ডাকিয়া,
"অযোধ্যায় যাও বাছা সংবাদ লইয়া।
গুহ মিতা সনে দেখা হইবেক পথে,

কহিয়ো আমার কথা তারে ভালোমতে।”
আকাশে ছুটিয়া হনু যায় তাড়াতাড়ি,
দেখিতে-দেখিতে গেল গুহকের বাড়ি।
সংবাদ বলিয়া তারে চলিল ত্বরায়,
কাঁদেন রামেরে ভাবি ভরত যেথায়।
জোড়হাতে হনুমান তাঁরে গিয়া কয়,
“দেশে আইলেন রাম শুন মহাশয়।
মোরে পাঠালেন নিতে সংবাদ তোমার,
ত্বরায় দেখিবে তাঁরে কাঁদিয়ো না আর।”

আহা কি আনন্দ আজ অযোধ্যা নগরে,
দেশে আসিছেন রাম এতদিন পরে!
“কি আনন্দ! কি আনন্দ!” এই শুধু বলে,
রামেরে দেখিতে যায় ছুটিয়া সকলে।
রানীগণ যান সবে দোলায় চড়িয়া,
বুড়োরা সকলে যায় নড়ি ভর দিয়া।
রামের খড়ম দুটি লইয়া মাথায়,
ভরত সবার আগে চলেন ত্বরায়।

পথপানে চেয়ে যায় সকলে ছুটিয়া,
হোথায় রামের রথ আসিছে উড়িয়া!
চূড়াখানি যেই তার দেখিল কেবল,
“ঐ রাম!” বলি সবে হইল পাগল।
“দেখি-দেখি, সর!” বলে করে ঠেলাঠেলি,
খোঁড়া বেটা আগে যায় সকলেরে ফেলি।

থামিল যখন রথ, নামিলেন রাম,
লুটায়ে ভরত তাঁরে করেন প্রণাম।
খড়ম পরায়ে পায়ে বলেন তখন,
“ফিরায়ে এখন দাদা লহ রাজ্যধন।”

এমনি করিয়া শেষে রাম আইলেন দেশে,
বড়ই হইল সুখ তায়,
তখন মিলিয়া সবে “রাম জয়-জয়” রবে
রাজা করে তাঁরে অযোধ্যায়।

পুরোনো নাপিত যারা　　　　ক্ষুরে শান দিয়া তারা
সাজিয়া আইল তাড়াতাড়ি,
রামের যতেক জট　　　　চেঁছে দিল চট্‌পট্‌
যতনে কামায়ে দিল দাড়ি।



পুষ্পক

সোনার সভায় তবে　　　　রামেরে বসায়ে সবে
মুকুট মাথায় দিল তাঁর,
ভাই শত্রুঘন্‌ আসি　　　　ধরিলেন হাসি-হাসি

সাদা ছাতা অতি চমৎকার।

দাঁড়াইয়া দুই ধারে চামর ঢুলায় তাঁরে

সুখেতে সুগ্রীব বিভীষণ,

স্বরগ হইতে আনি মুক্তার মালাখানি

পরাইয়া দিলেন পবন।

মিলিয়া দেবতাগণ, ভুলায়ে সবার মন,

কিবা গান গাইল তখন!

"রাম জয়! রাম জয়.!" নাচিয়া সকলে কয়

রাজা পেয়ে মনের মতন।

নক্ষত্রগুলিকে হঠাৎ দেখিলে মনে হয়, যেন উহাদের সংখ্যা নাই ; কিন্তু একটু মনোযোগ করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবে যে, প্রথমে যত বেশি বলিয়া মনে হয়, বাস্তবিক তত বেশি নক্ষত্র আমরা দেখিতে পাই না।

শুধু চোখে যাহা দেখা যায়, তাহার কথাই বলিতেছি, দূরবীন দিয়া যাহা দেখা যায়, তাহার কথা নহে। যাহাদের দৃষ্টি খুব প্রখর, তাহারাও একবারে চার-পাঁচ হাজারের বেশি নক্ষত্র দেখিতে পায় না। চার-পাঁচ হাজার নক্ষত্র আর তেমন একটা বেশি কি? ইহাদিগকে গণিয়া, চিনিয়া, আঁকিয়া খাতায় লিখিয়া কবে শেষ করা হইয়াছে। একখানা সাধারণ বড় ম্যাপে গ্রাম-গুলি যেমন ঘেঁষাঘেঁষি থাকে, আকাশে নক্ষত্র সকলকে তাহার চাইতে বরং কম ঘেঁষাঘেঁষি দেখা যায়।

আমাদের সূর্যও যে একটা নক্ষত্র, এ কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। সূর্য আমাদের এত কাছে বলিয়াই তাহার এত সম্মান। কিন্তু ঐ নক্ষত্রগুলির ভিতরে এর চাইতে ঢের বড়-বড় সূর্য আছে। উহাদের একটা আমাদের কাছে আসিলে, আমরা হয়তো পুড়িয়াই মরিতাম। আর, আমাদের সূর্য ঐ নক্ষত্র-গুলির কাছে গেলে, হয়তো আমরা তাহাকে দেখিতেই পাইতাম না।

জিনিস যত দূরে থাকে, ততই ছোট দেখায়। থালাখানাকে দূরে লইয়া গেলে, তাহা রেকাবীখানার মতন দেখায়। আরো দূরে নিলে হয়তো টাকাটির মতন দেখাইবে। এইরূপে তাহাকে যত দূরে লইয়া যাওয়া যায়, ততই সে ক্রমে আধুলিটির মতন, তারপর সিকিটি, তারপর দুয়ানিটি, তারপর আল্‌পিনের মাথাটির মতন ছোট হইয়া, শেষে একেবারেই অদৃশ্য হইয়া যাইবে। এক ফুট চওড়া থালাখানাকে এক মাইল দূরে লইয়া গেলে, তাহাকে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। মোটামুটি বলিতে গেলে, যে জিনিস যত লম্বা চওড়া, তাহার পাঁচহাজার গুণ দূরে লইয়া গেলে, তাহাকে আর দেখিতে পাওয়া যায় না।

ইহার মধ্যে একটা কথা আছে। এক ফুট চওড়া থালাখানিকে এক মাইল দূর হইতে দেখিতে পাইবে না ; কিন্তু একটি উজ্জ্বল আলো জ্বলিলে তাহাকে এক মাইলের চাইতে ঢের বেশি দূর হইতেও দেখা যায়। তখন আমরা যে বাস্তবিকই আলোর শিখাটা অবধি দেখিতে পাই, তাহা নহে ; আমরা উহার ঝিকিমিকিটুকুমাত্র দেখি। আলোকের শিখাটি যদি এক ইঞ্চি লম্বা হয়, তবে চোখ হইতে পাঁচহাজার ইঞ্চি দূরেই সে অদৃশ্য হইয়া যাইবে ; তারপর যাহা দেখিব, সে কেবল উহার জ্যোতি—আসল জিনিসটা নহে।

নক্ষত্রগুলিকেও আমরা এইরূপই দেখি। শুধু চোখে দেখিলে হয়তো অনেক সময় মনে ভ্রম হইতে পারে যে, বুঝিবা উহাদের একটা কোনোরূপ চেহারা দেখা যাইতেছে। কিন্তু দূরবীন দিয়া দেখিলে, ঐ ভ্রমটুকু চলিয়া যায়। দূরবীন দিয়া উহাদের কোনোরূপ চেহারা দেখা যাওয়া দূরের কথা,

বরং দূরবীন যত ভালো হয়, তাহা দিয়া তারাগুলিকে ততই ছোট দেখা যায়। ছোট দূরবীন দিয়া যে বিন্দুটি দেখিতে পাইবে, বড় দূরবীনে তাহা যেন আরো ছোট বোধ হইবে! ছোট বটে, কিন্তু বেশি উজ্জ্বল।

কথাটা নিতান্ত সামান্য হইল না। এই-সকল নক্ষত্রকে যদি আমাদের সূর্যের সমান মনে করা যায়, তবে একবার ভাবিয়া দেখ দেখি. উহারা কত দূরে!

আমাদের সূর্য সাড়ে আটলক্ষ মাইলেরও বেশি চওড়া। এত বড় জিনিস-টাকে অদৃশ্য করিতে হইলে, তাহাকে অন্তত চারিশত পঁচিশ কোটি মাইল দূরে লইয়া যাইতে হয়। এত দূরে লইয়া গেলে, শুধু চোখে তাহার খালি জ্যোতিটুকু ভিন্ন আর কিছুই দেখা যাইবে না। কিন্তু দূরবীন দিয়া দেখিলে তখনোও তাহাকে একটা মস্ত গোলার মতন দেখা যাইবে।

ঐ নক্ষত্রগুলি এত দূরে যে, দূরবীন দিয়াও তাহাদিগকে কিছুমাত্র বড় দেখা যায় না। বড়-বড় দূরবীনগুলি দূরের জিনিসকে তিনহাজার গুণ নিকটে আনিয়া দেখাইতে পারে, কিন্তু তাহারাও নক্ষত্রগুলিকে কিছুমাত্র লম্বা চওড়া দেখাইতে পারে না। সুতরাং উহারা যে চারিশত পঁচিশ কোটি মাইলের অন্তত তিনহাজার গুণ বেশি দূরে, এ কথা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। কিন্তু বাস্তবিক, উহারা ইহার চাইতেও কত বেশি দূরে আছে, তাহা কে বলিতে পারে? যত দূর দেখা গিয়াছে, তাহাতে উহারা যে ইহারও অনেক বেশি দূরে তাহাই প্রমাণ হয়।

নক্ষত্রগুলি কত দূরে, তাহা মাপিবার চেষ্টা হইয়াছে। এরূপ প্রশ্নের উত্তর খুঁজিতে হইলে, ভয়ানক শক্ত শক্ত অঙ্ক কষিবার দরকার হয়। সে-সকল অঙ্কের কথা আমাদের বুঝিবার সাধ্য নাই; কিন্তু অঙ্ক কষিয়া কি ফল পাওয়া গেল, তাহা জানিতে ইচ্ছা হইতে পারে। যে তারাটা খুব কাছে—সেই যেখানে কিছুদিন আগে আমাদের চিঠি পাঠাইবার কথা হইতেছিল—সে তারাটাও সূর্যের চাইতে প্রায় ২৭১৪০০ দুই লক্ষ একাত্তর হাজার চারিশত গুণ দূরে। ইহার চাইতেও কাছে কোনো নক্ষত্র আছে কি না, তাহা বলা যায় না। কিন্তু আর প্রায় সকল নক্ষত্রই ইহার চাইতে বেশি দূরে। অনেকগুলি নক্ষত্রই এত দূরে যে, তাহারা কত দূরে, তাহা এ পর্যন্ত কেহ অনুমানও করিতে পারে নাই।

যে নক্ষত্রটাকে বেশি উজ্জ্বল দেখা যায়, আমরা হয়তো মনে করিতে পারি যে, তাহা আমাদের বেশি কাছে। কিন্তু ইহা ভুল। এ কথা যদি ঠিক হইত, তাহা হইলে সিরিয়স্ অন্যান্য সকল নক্ষত্রের চাইতে আমাদের বেশি নিকটে হইত। কিন্তু সূর্য আমাদের এখান হইতে যত দূরে, সিরিয়স্ তাহার চাইতে দশলক্ষ গুণ বেশি দূরে। আমাদের সূর্যকে ওখানে লইয়া গেলে, তাহার নিতান্তই দুরবস্থা হইত! সিরিয়সের মতন এত উজ্জ্বল তো তাহাকে দেখা যাইতই না, বরং তাহাকে নিতান্ত মিটমিটে একটি ছোট তারা বলিয়াই মনে হইত।

সিরিয়স্‌টা যে কত বড় সূর্য, এ কথা হইতে তাহা কতক বুঝা যাইতেছে। গণিয়া দেখা গিয়াছে যে, উহা সূর্যের চাইতে যেমন আকারে বড়, তেমনি আবার তুলনায় উজ্জ্বলও অনেক বেশি। আমাদের সূর্যের মতন কুড়িটা সূর্য একসঙ্গে করিলে, সিরিয়সের মতন বড় একটা সূর্য হয় ; কিন্তু আমাদের সূর্যের মতন আটচল্লিশটা সূর্যের কমে সিরিয়সের মতন আলো দিতে পারিবে না।

এই সিরিয়সের আবার একটা সঙ্গী আছে, সেটাও প্রায় সাতটা সূর্যের মতন বড়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, উহার আলো নিতান্তই কম। এইজন্যই খুব ভালো দূরবীন না হইলে, উহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না। সূর্য হইতে পৃথিবী যত দূরে, সিরিয়স্‌ হইতে তাহার সাঁইত্রিশ গুণ দূরে থাকিয়া সিরিয়সের এই সঙ্গীটি তাহার চারিদিকে ঘুরিতেছে। আমাদের উনপঞ্চাশ বৎসরে উহার একটি বৎসর হয়। এই সঙ্গীটিকেসুদ্ধ সিরিয়স্‌ নিজে মিনিটে একহাজার মাইল করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে ; অথচ আমরা শুধু চোখে দেখিয়া উহাকে স্থিরই মনে করিতেছি।

শুধু চোখে যাহা দেখা যায়, তাহার কথা বলিতে গিয়া, আমরা এমন সকল কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছি যে, তাহার খবর দূরবীন ভিন্ন পাওয়া যায় না। বাস্তবিক ইহার পূর্বে দূরবীনের কথা কিছু বলা উচিত ছিল। তবে যে এখানে এ-সকল কথা উঠিল, তাহার কারণ এই যে, নক্ষত্রগুলির সম্বন্ধে কোনো কথা বলিবার সুযোগ আর যে হইবে, এমন বোধ হয় না। সুতরাং এ কথাগুলি বলিতে হইলে, এইখানেই বলা ভালো।

সিরিয়সের যেমন একটি সঙ্গী আছে তেমনি আরো অনেক নক্ষত্রেরই আছে। কোনো কোনো স্থানে তিন-চারিটা নক্ষত্রকেও দলবাঁধিয়া ঘুরিতে দেখা যায়। ইহারা সকলেই সূর্য। ইহাদের সঙ্গে গ্রহ (অর্থাৎ, যেমন আমাদের পৃথিবী। গ্রহদের নিজের আলো নাই ; সূর্যের নিকট হইতে আলো পায়, আর তাহার চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়) আছে কি না, তাহা বলা কঠিন। কারণ গ্রহ থাকিলেও এত দূরে তাহাদিগকে দেখা যাইবে না।

নক্ষত্রগুলিকে একটু মনোযোগ দিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, উহাদের সকলের রঙ একরূপ নহে। কোনোটা সাদা কোনোটা একটু লাল্‌চে। সিরিয়স্‌ খুব সামান্য একটু নীল মিশানো সাদা রঙের। রোহিণীর (Aldebaran) রঙ অনেকটা লাল! দূরবীন দিয়া অনেক রঙিন তারা দেখা যায়। লাল, নীল, সব্‌জ, হল্‌দে, বেগুনি—প্রায় সকল রঙের তারাই আছে। ইহাদের কোনো কোনোটার রঙ আবার বদলায় বলিয়া বোধ হয়। সিরিয়স্‌ এখন সাদা, কিন্তু প্রাচীনকালের এক পণ্ডিত ইহাকে আগুনের মতন লাল রঙের বলিয়াছেন।

এখন তারাগুলির সম্বন্ধে আর একটা কথা বলিলেই, আমার আজকার কাজ শেষ হয়।

জিনিস হইতে আলো আসিয়া আমাদের চক্ষে পড়িলেই, আমরা সেই জিনিস দেখিতে পাই। একটা ঘরের দরজা জানলা বন্ধ করিয়া তাহাকে

যদি অন্ধকার কর, আর সেই ঘরের দরজা বা দেয়ালের কোনো স্থানে যদি একটি শ্লেট-পেন্সিল ঢুকিবার মতো ছিদ্র থাকে, তবে সেই ছিদ্রের ভিতর দিয়া আলো আসিবে। এই ছিদ্রের সামনে একখণ্ড সাদা কাগজ বা কাপড় ধরিলে দেখিবে যে, তাহাতে বাহিরের জিনিসের সুন্দর ছবি পড়িয়াছে। চক্ষের ভিতরেও এইরূপ করিয়া জিনিস হইতে আলো আসিয়া পড়ে, আর তাহার জন্যই আমরা সেই জিনিস দেখিতে পাই।

এখন কথা হচ্ছে এই যে, একটা জিনিস হইতে আলো বাহির হয়, তারপর খানিক পথ চলিয়া, সেই আলো আমাদের চক্ষে পড়ে ; এইরূপ করিতে তাহার সময় লাগে। যত বেশি পথ চলিতে হয়, তত বেশি সময় লাগে।

আলো বড় ভয়ানক ছুটিয়া চলে। এত ছুটিয়া চলে যে, এই পৃথিবীর মধ্যে এক স্থান হইতে আর এক স্থানে যাইতে তাহার নিতান্তই কম সময় লাগে। তত কম সময়ে আমরা যন্ত্রের সাহায্য ভিন্ন কোনো খবরই লইতে পারি না।

কিন্তু খুব দূরের কথা যখন ধরা হয়, তখন দেখা যায় যে, তত দূরে আলো চলিয়া যাইবার সময়ের একটা বেশ মোটা হিসাব দাঁড়ায়।

সূর্য হইতে আলো পৃথিবীতে আসিতে সাড়ে সাত মিনিট সময় লাগে। সূর্য যদি আগে না থাকিত আর এখন হঠাৎ দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিত, তবে আমরা আরো সাড়ে সাত মিনিট পরে তাহাকে দেখিতে পাইতাম। এখন যদি হঠাৎ সূর্য নিবিয়া যায়, তবে আরো সাড়ে সাত মিনিট পর্যন্ত আমরা এই দুর্ঘটনার কোনো খবর পাইব না। এই মুহূর্তে আমরা সূর্যকে যেমন দেখিতেছি, তাহা তাহার সাড়ে সাত মিনিট আগেকার চেহারা।

আলোক এক সেকেন্ডে একলক্ষ ছিয়াশিহাজার তিনশত মাইল যায়। এইরূপ করিয়া সওয়া চার-বৎসর চলিলে, তবে সে সকলের চাইতে কাছের তারা হইতে পৃথিবীতে পৌঁছাইতে পারিবে। ধ্রুবতারা হইতে পৃথিবীতে পৌঁছা-ইতে তাহার চুয়াল্লিশ বৎসর লাগে। এইরূপ, যে তারা যত দূরে, সেখানকার আলো পৃথিবীতে পৌঁছাইতে তত বেশি সময় চাই। এত দূরেও নিশ্চয় তারা আছে যে তাহার জন্মের সময় হইতে চলিতে আরম্ভ করিয়াও তাহার আলো এ পর্যন্ত পৃথিবীতে পৌঁছাইতে পারে নাই। আজ যদি সেই আলো আসিয়া এখানে পৌঁছায়, আর আমরা তাহাকে দেখিতে পাই, তবে মনে করিতে হইবে যে, এ তাহার আজিকার চেহারা নহে--সেই সে যখন জন্মাইয়াছিল, তখনকার চেহারা।

পৃথিবী যখন জন্মাইয়াছিল, তখন হইতেই তো তাহার আলো চারিদিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। উহার জন্মের সময় হইতে যে আলো রওয়ানা হইয়া গিয়া-ছিল, তাহা না জানি এত দিনে কোথায় গিয়া পৌঁছাইয়াছে। মনে কর, সেখানে বুদ্ধিমান জীব আছে, আর তাহাদের ভয়ংকর এক-একটা দূরবীন আছে— সেই দূরবীন দিয়া যেন এই পৃথিবীর মানুষকে ঠিক একটা মানুষের মতনই বড় দেখা যায়। সেখানকার পণ্ডিতেরা দূরবীন দিয়া কিরকম পৃথিবী দেখিতে

পাইতেছে? সেই তাহার জন্মের সময় পৃথিবী যেমন ছিল, তাহারা তাহাই দেখিতেছে। এখানকার এই নদনদী, পাহাড় পর্বত, দেশ গ্রাম, জাহাজ, রেল, এ-সকলের কিছুই তাহারা দেখিতেছে না। তাহারা হয়তো দেখিতেছে, একটা প্রকাণ্ড ধোঁয়াটে জিনিস, আর সেটা হয়তো ঐ সূর্যের মতন ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে!

উহার চাইতে ঢের কাছে যদি কেহ সেইরূপ ভয়ংকর দূরবীনওয়ালা থাকে, সে হয়তো পৃথিবীকে ইক্‌থিয়োসরস্, প্লীসিয়োসরস্ ইত্যাদি জন্তুতে পরিপূর্ণ দেখিবে!

সূর্যে যদি তেমন কেহ থাকে, তবে সে হয়তো, তুমি জল খাবার খাইয়া আঁচাইতে যাইবার সময় দেখিবে যে, তুমি এই সবে খাইতে বসিতেছ।

মুকুল—অগ্রহায়ণ ১৩০৭

দূরবীন

হ্যান্স্ লিপার্সী নামক একজন ওলন্দাজ চশমাওয়ালা প্রথমে দূরবীক্ষণ প্রস্তুত করে। সেই সময়ে গ্যালিলিও নামক ইটালী দেশীয় বিখ্যাত জ্যোতির্বেত্তা বাঁচিয়া ছিলেন। তিনি ঐ দূরবীক্ষণের কথা শুনিয়া নিজে ঐরূপ একটি দূরবীক্ষণ প্রস্তুত করিলেন।

তখনকার দূরবীক্ষণগুলি অবশ্য নিতান্তই ক্ষুদ্র ছিল। কিন্তু ঐ দূরবীক্ষণ দিয়াই গ্যালিলিও আকাশের সম্বন্ধে এমন সকল কথা জানিতে পারিয়াছিলেন, যে লোকে তাহা শুনিয়া আশ্চর্য হইয়া গিয়াছিল। এমন কি, অনেকে তাহা বিশ্বাস করিতে না পারিয়া গ্যালিলিওকে নানারূপে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিতেও ছাড়ে নাই।

গ্যালিলিও তাঁহার দূরবীক্ষণ দিয়া দেখিলেন যে চন্দ্রে বড়-বড় পর্বত আছে; বৃহস্পতি গ্রহের চারিটি চন্দ্র আছে; শুক্র গ্রহের হ্রাস বৃদ্ধি হয়; অর্থাৎ আমাদের চন্দ্র যেমন পূর্ণিমার রাত্রিতে ঠিক গোল থাকে, তারপর দিন দিন একটু একটু কমিয়া শেষে অমাবস্যায় একেবারেই মিলাইয়া যায়, তারপর আবার একটু একটু বাড়িয়া আবার পূর্ণিমা ফিরিয়া আসিলে ঠিক গোল চাঁদটি হয়, শুক্র গ্রহেরও সেইরূপ হইতে দেখা যায়।

গ্যালিলিও তাঁহার দূরবীন দিয়া দেখিয়া যখন বলিলেন যে, সূর্যের গায়ে কালো কালো দাগ আছে, তখন সকলে হাসিয়া উঠিল। অনেকে বলিল যে, 'ও কালো দাগ তোমার চোখেই আছে।'

যাহা হউক, এখন আমরা জানি, যে গ্যালিলিও ঠিক কথাই বলিয়াছিলেন। গ্যালিলিওর সময় হইতে এ পর্যন্ত ক্রমেই ভালো ভালো, বড় বড় দূরবীন প্রস্তুত হইয়াছে। সেই সকল দূরবীন দ্বারা আজকালকার লোক যাহা দেখিতেছে,

গ্যালিলিও তাহা দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। কালে আরো বড় বড় দূরবীন প্রস্তুত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহাদের সাহায্যে যাহা জানা যাইবে, না জানি তাহা কত আশ্চর্য।

দূরবীনের কথা বলিতে গেলে পণ্ডিত হর্শেল সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া থাকা যায় না। ইনি প্রথমে সিপাহী ছিলেন; তৎপর সৈন্যদল হইতে পলায়ন করিয়া শাস্তির ভয়ে নিজের জন্মস্থান জর্মানি দেশ হইতে ইংলণ্ডে আসিয়া গান বাজনার ওস্তাদের ব্যবসা আরম্ভ করেন। কিছুদিনের মধ্যেই এই ব্যবসায়ে তাঁহার বেশ পশার হইয়াছিল, কিন্তু শীঘ্রই তাঁহাকে এই ব্যবসায়ও ছাড়িতে হইল।

হর্শেল দূরবীন দিয়া আকাশ দেখিতে বড়ই ভালোবাসিতেন; কিন্তু তাঁহার ভালো দূরবীন ছিল না। একটি ভালো দূরবীনের জন্য তখনকার একজন বড় কারিকরকে লেখাতে সে ব্যক্তি ভয়ানক দাম চাহিয়া বসিল। হর্শেল গরিব মানুষ, এত টাকা তিনি দিতে পারিলেন না; অথচ একটা ভালো দূরবীন তাঁহার চাই। সুতরাং তিনি স্থির করিলেন যে একটা দূরবীন নিজে তয়ের করিয়া লইবেন।

দূরবীক্ষণ প্রস্তুত করা যেমন তেমন (কঠিন) কাজ নহে। একটা ভালো দূরবীন কি করিয়া প্রস্তুত করিতে হইবে, তাহার মতলব আঁটিতেই খুব বড় একজন পণ্ডিতের দরকার হয়। ইহার উপর আবার খুব ভালো কারিকর না হইলে তাহা প্রস্তুত হয় না।

দূরবীক্ষণের নল অথবা তাহার স্ক্রুপগুলি সহজেই প্রস্তুত করা যায়। কিন্তু উহার মধ্যে আসল জিনিস যে ঐ কয়েক খণ্ড কাচ, তাহাই প্রস্তুত করিতে ভয়ানক বুদ্ধি আর পরিশ্রমের দরকার। বড় কাচখানি গড়িতে এত পরিষ্কার হাতের দরকার হয় যে, উহার কোনো জায়গায় এক ইঞ্চির কুড়ি হাজার ভাগের একভাগ মাত্র ভুল হইলেও তাহাতে কাজ আটকায়। ঐ বড় কাচখানিই দূরবীক্ষণের প্রাণ। দূরবীক্ষণের দামের অনেকটা এই কাচের জন্যই দিতে হয়। কোনো কোনো দূরবীক্ষণে এই কাচখানির পরিবর্তে একখানি আরশি থাকে। হর্শেলের সময়ে খুব বড় কাচওয়ালা দূরবীক্ষণ প্রস্তুত করিবার উপায় জানা ছিল না, আর কাচওয়ালা দূরবীক্ষণের অপেক্ষা আরশিওয়ালা দূরবীক্ষণ প্রস্তুত করিতে পরিশ্রম কম; সুতরাং তিনিও এইরূপ আরশিওয়ালা দূরবীক্ষণই প্রস্তুত করিবেন স্থির করিলেন।

হর্শেল সমস্ত দিন তাঁহার ওস্তাদী ব্যবসায় করিতেন, সন্ধ্যার পরে দূরবীক্ষণের জন্য আরশি পালিশ করিতে বসিতেন। এরূপ করিয়া খুব ভালো দূরবীন প্রস্তুত করা কিরূপ কঠিন কাজ তাহা বুঝিতেই পার। কিন্তু হর্শেল যে কেবলমাত্র ভালো দূরবীন প্রস্তুত করিয়াই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা নহে—তিনি এত ভালো দূরবীন প্রস্তুত করিয়াছিলেন যে তেমন ভালো দূরবীন সে সময়ে আর কেহই প্রস্তুত করিতে পারিত না। কি ভয়ানক খাটুনিই তাঁহার খাটিতে হইয়াছিল! ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলিয়া যাইত, স্নান নাই, আহার নাই,

—হর্শেল ক্রমাগত বসিয়া আরশিই পালিশ করিতেন। তাঁহার ভগিনী ক্যারোলীন সর্বদা তাঁহার কাছে থাকিয়া ক্ষুধার সময় মুখে খাবার তুলিয়া দিতেন, আর অতিরিক্ত পরিশ্রমের ক্লেশ কমাইবার জন্য তাঁহাকে আরব্য-উপন্যাস পড়িয়া শুনাইতেন।

এইরূপ পরিশ্রম করিয়া হর্শেল দূরবীক্ষণ তয়ের করিয়াছিলেন। একটি নয়, দুটি নয়, অনেকগুলি। রাজারা অবধি তাঁহার তৈয়ারি দূরবীক্ষণ পাইলে যারপরনাই খুশি হইতেন। তখনকার দূরবীক্ষণগুলির মধ্যে হর্শেলের তৈয়ারি কয়েকটা দূরবীক্ষণই সকলের চাইতে বড় ছিল।

হর্শেল ক্রমে ওস্তাদী ব্যবসায় ছাড়িয়া দিয়া দূরবীক্ষণ নির্মাণ এবং জ্যোতিষশাস্ত্রের চর্চা লইয়াই দিন কাটাইতে লাগিলেন। কালে তিনি একজন প্রধান জ্যোতির্বেত্তা হইয়াছিলেন। যাহা হউক, তাঁহার সকলের অপেক্ষা বড় কাজ দূরবীক্ষণ-নির্মাণ নহে—তাহা ইউরেনস্ গ্রহের আবিষ্কার। বাস্তবিক জ্যোতির্বেত্তা বলিয়াই হর্শেলের অধিক খ্যাতি। তবে, আমরা নাকি এখন দূরবীক্ষণের কথা লইয়াই একটু ব্যস্ত আছি, সুতরাং অন্য বিষয়ের কথা এখন না পাড়াই ভালো।

হর্শেল অনেক দূরবীন প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহার বড়খানির আরশিটি চার ফুট চওড়া ছিল। ইহার পরে লর্ড রস্‌এর চাইতেও বড় একটা দূরবীন প্রস্তুত করেন, তাহার আরশিখানি ছয় ফুট চওড়া। এত বড় কাচওয়ালা দূরবীন এপর্যন্ত কেহ প্রস্তুত করিতে পারে নাই। সকলের অপেক্ষা বড় কাচওয়ালা দূরবীক্ষণের কাচ পঞ্চাশ ইঞ্চি চওড়া ; গত প্যারী প্রদর্শনীতে এই দূরবীক্ষণটি দেখানো হইয়াছিল।

তোমরা অনেকেই দূরবীন দেখিয়াছ। একটা নল, তাহার দুমাথায় কাচ পরানো—দূরবীনের চেহারা মোটামুটি এইরূপ। একদিকের কাচ বেশ বড় : ইহা দ্বারা দূরবীনের নলের ভিতরে দেখিবার জিনিসের ছবি তৈয়ার হয়। অন্য দিকের কাচ ছোট, ইহাতে সেই ছবিখানিকে খুব বড় করিয়া দেখায়। বড় দেখাইলেই আমাদের বোধ হয় যেন জিনিসটাকে কাছে দেখিতেছি।

বড় কাচখানির ইংরাজি নাম (অব্‌জেক্ট্ গ্লাস) object glass অর্থাৎ জিনিসের কাচ। যে জিনিসটাকে দেখিতে যাইতেছ, এই কাচখানিকে তাহার পানে ফিরাইয়া ধরিতে হয়, এইজন্যই উহার নাম জিনিসের কাচ। আর ছোট কাচের পিছনে চোখ রাখিয়া তাকাইয়া দেখিতে হয়, এইজন্য উহার নাম (আই পীস্) eye piece অর্থাৎ চোখের কাচ। এক কথা, আমার কথা শুনিয়া হয়তো বোধ হইতে পারে যে object glassটি বুঝি একখানি কাচ, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। একখানি কাচ দিয়া object glass তৈয়ার করিলে তাহাতে জিনিসের চারি ধারে রামধনুর মতন রঙ দেখা যায়। সুতরাং এই দোষ দূর করিবার জন্য দুরকমের দুখানি কাচ দিয়া object glass প্রস্তুত করা হয়। অবশ্য যেমন তেমন দুখানি কাচ লইলেই তাহা দ্বারা অব্‌জেক্ট্ গ্লাস প্রস্তুত করা যায় না : ইহার একটা হিসাব আছে। কিন্তু সেই হিসাবটা নাকি একটু কঠিন, সুতরাং

এখানে তাহার চর্চা হইতে পারে না।

আই পীস্‌ও সচরাচর একখানি কাচের হয় না। একখানি কাচের আই পীস্‌ দিয়া একেবারেই কাজ চলে না এমন নহে। অব্‌জেক্ট গ্লাস ভালো হইলে, একখানি কাচের আই পীস্‌ দিয়াও বেশ পরিষ্কার দেখা যায়। কিন্তু যাহা দেখা যায় তাহা সবই উলটা। ঐরূপ আই পীসের ভিতর দিয়া আমাকে দেখিলে দেখিবে আমার পা উপর দিকে মাথা নীচের দিকে।

আকাশ দেখিবার সময় ঐরূপ আই পীস্‌ ব্যবহারে কোনো দোষ হয় না ; কিন্তু পৃথিবীর গাছপালা, মানুষ, গোরু, বাড়িঘর ইত্যাদিগকে উলটা দেখিতে একেবারেই ভালো লাগে না। সুতরাং পৃথিবীর জিনিসপত্র দেখিতে হইলে যাহাতে সোজা দেখা যায়, তাহার বন্দোবস্ত করিতে হয়। এইজন্য আরো অন্তত দুখানি কাচের প্রয়োজন। ইহা ছাড়াও ভালো করিয়া দেখিতে হইলে শুধু একখানি কাচের আই পীসে সকল সময় কাজ চলে না। সুতরাং আকাশ দেখিবার জন্য সচরাচর দুখানি কাচের আই পীস্‌ ব্যবহার হয়। অবশ্য তাহাতেও জিনিস উলটাই দেখা যায় ; কিন্তু হইলেও, দেখায় বেশ পরিষ্কার।

খানিক আগে যে আরশিওয়ালা আর কাচওয়ালা দূরবীনের কথা বলিতেছিলাম, এখন তাহার অর্থ বেশ বুঝিতে পারিবে। আমরা সচরাচর যে-সকল দূরবীন দেখিতে পাই, তাহা কাচওয়ালা দূরবীন ; কেন না, ইহাদের অব্‌জেক্ট্‌ গ্লাস কাচের। অব্‌জেক্ট্‌ গ্লাসের কাজ, দূরবীনের ভিতরে জিনিসের ছবি তৈয়ার করা। এই কাজ আরশি দ্বারাও হইতে পারে। সুতরাং এমন দূরবীনও হয়, যাহাতে অব্‌জেক্ট্‌ গ্লাসের বদলে একখানি আরশি আছে। তাহাকেই বলে আরশিওয়ালা দূরবীন।

এই-সকল কাচ এবং আরশি প্রস্তুত করা যে বড়ই কঠিন কাজ, এ কথা বলিয়াছি। যে কোনোরকমের একটা আরশি বা কাচ হইলেই তো হইল না, ইহার একটা বিশেষ গড়ন আছে। আরশিখানির গড়ন সরার ন্যায়—মাঝখানটায় গর্ত। কাচ দুখানি গোল—তাহাদের একখানার মাঝখানটা পুরু ধার পাতলা, আর একখানার পাশ পুরু মাঝখানটা পাতলা। আর কোন জায়গায় কতখানি পুরু, বা কতখানি পাতলা, বা কতখানি গর্ত, এ-সকলের হিসাবও যেমন তেমন হিসাব নহে।

সুতরাং কাজ কঠিন হইবারই কথা। আরশির বেলা পরিশ্রম অনেক কম, কারণ তাহার একপিঠ গড়িতে পারিলেই হইল। কিন্তু কাচ দুখানিতে চারিটি পিঠ ; সুতরাং তাহাতে চারিগুণ পরিশ্রম। এত পরিশ্রমের অর্থ ঢের খরচ, এ কথা সহজেই বুঝিতে পার। একটা বড় দূরবীনের কথা যদি বলি, তাহা হইলে কথাটা আরো পরিষ্কার বুঝিতে পারিবে।

একটা খুব বড় দূরবীক্ষণের ছবি[১] দেওয়া গেল। আমেরিকার কালিফর্ণিয়া দেশে হ্যামিল্টন্‌ পর্বতের উপরে একটি মানমন্দির (অর্থাৎ নক্ষত্র দেখিবার

[১]পত্রিকায় ছবিটি বিবর্ণ হয়ে যাওয়ায় দেওয়া সম্ভব হল না।

আফিস) আছে। এই মানমন্দিরের নাম লিক্ মানমন্দির। এই মানমন্দিরে একটি বড় দূরবীক্ষণ আছে।

দূরবীনটির নলটি প্রায় ৫৭ ফুট লম্বা। বড় কাচখানি (অব্জেক্ট্ গ্লাস) তিন ফুট চওড়া। যে স্তম্ভের উপরে দূরবীনটি আছে, তাহা ৩৮ ফুট উঁচু।

আটত্রিশ ফুট উঁচুতে দূরবীন থাকিলে দেখিবার সময় খুব মুস্কিল হয় না? আকাশের মাঝখানের অর্থাৎ আমাদের মাথার উপরের কোনো জিনিস দেখিতে হইলে বেশি মুস্কিল না হইতে পারে, কারণ তখন দূরবীনের গোড়ার দিকটা আমাদের চোখের খুব কাছে থাকে; কিন্তু দেখিবার জিনিসটি যদি আকাশের এক পাশে থাকে, তবে তো তাহার দিকে দূরবীন ফিরাইতে গেলেই তাহার গোড়ার দিকটা ভয়ানক উঁচুতে উঠিয়া যাইবে, তখন কি মই দিয়া উঠিয়া দেখিতে হইবে নাকি? মই দিয়া উঠিয়া যে না দেখা যায় এমন নহে। কিন্তু এরূপ করিয়া বেশি উঁচুতে উঠিয়া দেখা সুবিধাজনক নহে। ঘরের মেঝের নীচে এমন কল আছে যে, দরকার হইলে সমস্ত মেঝেটাকে ইচ্ছামতো উঁচু-নিচু করা যায়। দূরবীনের গোড়া যখন খুব উঁচুতে উঠিয়া যায়, তখন তাহার সঙ্গে সঙ্গে মেঝেটাকেও উঁচু করিলে আর গোল থাকে না।

যে স্তম্ভের উপরে দূরবীনটা আছে, তাহার ভিতরটা ফাঁপা। তাহাতে ঘড়ির মতন একটা প্রকাণ্ড কল আছে। দূরবীনটাকে একবার আকাশের কোনো জিনিসের পানে ফিরাইয়া ঐ কল চালাইয়া দিলে, আর সে জিনিস দূরবীনের ভিতর হইতে চলিয়া যাইতে পারে না। মনে কর, একটি তারা সন্ধ্যার সময় পূর্বদিকে দেখা দিয়াছে, আর তোমার ইচ্ছা হইল যে সমস্ত রাত্রি ধরিয়া ঐ তারাটিকে দেখিবে। এখন তুমি যদি একটিবার ঐ তারাটিকে দূরবীনের ভিতরে আনিয়া কল চালাইয়া দাও, তাহা হইলে তারাটি ক্রমাগতই দূরবীনের ভিতরে থাকিবে। তারাটি যেমন ক্রমে ক্রমে উপরে উঠিয়া মধ্যরাত্রে মাথার উপরে আসিবে, দূরবীনও তেমনি ক্রমে একটু একটু ঘুরিয়া মধ্যরাত্রে মাথার উপরের দিক লক্ষ্য করিবে। ভোরবেলা তারাটি যখন পশ্চিমে অস্ত যাইবে, দূরবীনও তখন ঠিক সেই দিকে মুখ ফিরাইবে।

ছবির দিকে একটু মনোযোগ করিয়া দেখিলে দেখিতে পাইবে যে দূরবীনের গায় ছোট-ছোট কয়েকটি দূরবীন আঁটা রহিয়াছে। বড় দূরবীন দিয়া আকাশের জিনিসগুলিকে খুঁজিয়া বাহির করা খুব কঠিন কাজ; এইজন্য ঐ ছোট দূরবীনগুলি উহার গায়ে পরানো রহিয়াছে। একটা জিনিসকে বড় দূরবীন দিয়া দেখিতে হইলে আগে ঐ ছোট দূরবীনের কোনো একটা দিয়া তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়। সেই জিনিসটি যখন ঐ ছোট দূরবীনের ঠিক মাঝখানে আইসে, তখন বড় দূরবীনের ভিতরেও তাহাকে দেখিতে পাওয়া যায়।

দূরবীনের গোড়ার দিকে অনেকগুলি খুঁটিনাটি জিনিস দেখা যাইতেছে। অনেকগুলি ডাণ্ডা দেখা যায়, তাহাদের মাথায় এক-একটা চাকা পরানো। এই চাকাগুলিকে পাক দিয়া দূরবীনটাকে ইচ্ছামতো ঘুরানো ফিরানো ইত্যাদি

নানান কাজ করা যায়।

দূরবীনটা একটা ঘরের ভিতরে রহিয়াছে। ঐ ঘরের উপরটা গম্বুজের মতন। সেই গম্বুজের গোড়া হইতে আগা পর্যন্ত একদিকে ফাঁক আছে ; ঐ ফাঁকের ভিতর দিয়া আকাশ দেখিতে হয়। দূরবীন যখন যেদিকে ফিরে, সমস্ত গম্বুজটাকে ঘুরাইয়া তাহার ফলকটিকে সেই দিকে আনিতে হয়। এই কাজ যাহাতে সহজে হইতে পারে, তজ্জন্য গম্বুজের নীচে চাকা পরানো আছে।

এত কথার পর ইহা সহজেই বুঝিতে পারিবে যে, এরূপ একটা দূরবীনে ঢের টাকা ব্যয় হয়। লিক্ মানমন্দিরের দূরবীনটিতে সওয়া ছয়লক্ষ টাকা খরচ পড়িয়াছিল। এই টাকার চারিভাগের একভাগ অর্থাৎ একলক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার দুইশত পঞ্চাশ টাকা শুধু তিন ফুট চওড়া অব্জেক্ট্ গ্লাসটির দাম।

জেম্স্ লিক্ নামক এক সাহেবের টাকায় হইয়াছিল বলিয়াই লিক্ মানমন্দির নামটি হইয়াছে। লিক্ সাহেব অতিশয় দরিদ্রের সন্তান ছিলেন। লেখা-পড়া অধিক শিখিতে পারেন নাই, কিন্তু ব্যবসায় করিয়া অনেক টাকা উপার্জন করেন। তাঁহার কোনো উত্তরাধিকারী না থাকায় এই সমস্ত টাকা তিনি একটি দূরবীক্ষণ এবং মানমন্দির নির্মাণের জন্য দিয়া গেলেন। তাহার উইলে লেখা ছিল যে এমন একটি দূরবীক্ষণ প্রস্তুত করিতে হইবে যে তেমন দূরবীক্ষণ আর হয় নাই। কিন্তু ঐ দূরবীক্ষণ প্রস্তুত হওয়ার পরে ইহার চাইতেও বড় দুইটি দূরবীক্ষণ তৈয়ার হইয়াছে।

মুকুল—ফাল্গুন ১৩০৭

পুরী

১

আজকাল রেল হইয়া পুরী যাইবার বেশ সুবিধা হইয়াছে, তাই এখন অনেকেই শখ করিয়া সেখানে গিয়া থাকেন। যাইবার পথটি বেশ। অনেকগুলি সুন্দর-সুন্দর নদী পার হইতে হয়। আর বালেশ্বর ছাড়াইলে পথের দুধারে অনেক পাহাড়ও দেখা যায়। নদীগুলির এক-একটা খুব চওড়া, তাহার উপরে বড়-বড় পোল আছে। পার হইবার সময় দু-একটা কুমিরও যে না দেখা যায়, এমন নহে। পাহাড়গুলিও নিতান্ত ছোট নহে, আর দেখিতেও বেশ। মাঝে মাঝে দূর হইতে এক-একটা মস্ত পাহাড় দেখা যায়, তাহার মাথা মেঘে ঢাকা। আবার পথের পার্শ্বেই এক-একটা লাল রঙের পাহাড়ে ছোট-ছোট ঝোপের শোভাও চমৎকার লাগে।

হাবড়া হইতে বালেশ্বর পর্যন্ত পথের দুধারেই প্রকাণ্ড মাঠ ; কাছে লোকের বসতি বড় বেশি দেখা যায় না। কাঁকর মাটি তাহাতে খুব বেশি, গাছপালাও জন্মায় না। সুতরাং এই পথটুকু ভালো না লাগিবারই কথা। সুখের বিষয়

এই যে, রাত্রির মধ্যেই ট্রেন এই-সকল স্থান পার হইয়া যায়। বালেশ্বর গিয়া ভোর হয়।

তবে এই মাঠের ভিতরেও যে দেখিবার একেবারে কিছুই নাই, তাহা নহে। হাঁটিয়া শ্রীক্ষেত্র যাইবার সেই পুরানো পথ এই মাঠের উপর দিয়াই গিয়াছে। রেল হইতে বার বার সেই পথ দেখিতে পাওয়া যায়। দেখিবার যে উহাতে এমন বিশেষ কিছু আছে, তাহা নহে। আমাদের দেশী বিশ্রীগোছের পাকা-রাস্তা যেমন হইয়া থাকে, এও সেইরূপ। তোমরা দেখিলে উহাকে কিছুমাত্র ভালো বলিবে না। তথাপি আমি উহাকে বার বার দেখিয়াও ক্লান্ত হই নাই। আমার যে বড়ই সুন্দর লাগিয়াছিল, তাহা নহে ; কিন্তু ঐ পথটাকে দেখিয়া আমার ছেলেবেলার অনেক কথা মনে হইতেছিল। ঐ পথ দিয়া কত লোক শ্রীক্ষেত্র গিয়াছেন। ছেলেবেলা তাঁহাদের অনেকের মুখে এই পথের বর্ণনা শুনিয়াছি। মাথা-ফাটানো রৌদ্রের মধ্যে তপ্ত কাঁকরের উপর দিয়া পথ চলা। পা ফুলিয়া যায়, তাহার তলা ফাটিয়া যায়, পিপাসায় প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়, তথাপি উৎসাহের ত্রুটি নাই। পুরুষদের চাইতে স্ত্রীলোকদেরই উৎসাহ বেশি। একটি বৃদ্ধা গ্রামের কয়েকটি ভদ্রলোকের সঙ্গে জগন্নাথ দর্শনে গিয়াছিলেন। তিনি মহাপ্রসাদ, জগন্নাথের ছবি, সমুদ্রের ফেনা, হোগলার ঠোঙ্গা, হোগলার পাখা প্রভৃতি অনেক আশ্চর্য জিনিস লইয়া দেশে ফিরিলে পর, বহুদিন পর্যন্ত আমরা তাঁহাকে মুহূর্তের জন্য বিশ্রাম করিতে দিই নাই। জগন্নাথের চেহারা কেন ওরূপ হইল? সুভদ্রা ঠাকরুণ ভাইদের মাঝখানে অমন জড়সড় হইয়া আছেন কেন? কালাপাহাড় কিরকম ভয়ানক লোক ছিল? ইত্যাদি কথা শুনিতে শুনিতে আমাদের মুখের হাঁ আর চোখ ক্রমে গোলাকার হইয়া উঠিত। আর শেষকালে সেই বৃদ্ধা যখন '—' ঠাকুর ফুলা পায় খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে কিরূপ করিয়া আক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহার অভিনয় করিয়া দেখাইতেন, তখন ব্যাপার যাহা হইত সে আর কি বলিব!

সেই '—' ঠাকুর এই পথে শ্রীক্ষেত্র গিয়াছিলেন। এই পথে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে তিনি আক্ষেপ করিয়াছিলেন। তাঁহার নামটি পর্যন্ত এতদিনে ভুলিয়া গিয়াছি, কিন্তু তথাপি কিরূপ করিয়া তিনি এই পথে গিয়াছিলেন তাহা যেন স্পষ্ট মনে হইতেছিল।

আর মনে হইতেছিল সেই বুড়ো ওড়িয়া পান্ডাটির কথা, শিশুকালে যাঁহার সহাস্য মুখখানি দেখিলে আমরা কতই আনন্দিত হইতাম। পান্ডার নিজের সম্বন্ধে এমন বিশেষ সংবাদ আমরা কিছুই জানিতাম না, যাহাতে তাঁহাকে দেখিলে আমাদের ভারি সুখ হইবার কথা। কিন্তু তাঁহার একটি আশ্চর্য লম্বা থলে ছিল, আর সেই থলের ভিতরে নানারকমের সুমিষ্ট 'প্রসাদ' থাকিত! সেই থলে অথবা তাহার ভিতরকার প্রসাদের খাতিরেই শিশুকাল হইতে এপর্যন্ত তাঁহার কথা মনে করিয়া রাখিয়াছি। সেই প্রসাদের থলেসুদ্ধ সেই বুড়ো পান্ডা নিশ্চয় এই পথে গিয়াছিলেন। তখন তিনি আক্ষেপ করিয়া-ছিলেন কি না তাহা আর এখন জানিবার উপায় নাই। কিন্তু ক্লেশ তাঁহার খুবই

হইয়াছিল, এ কথা বলিতে পারি।

এই পথ ভিন্ন আরো দেখিবার জিনিস আছে। চৈত্র-বৈশাখ মাসে দুপুর-বেলায় ঐ-সকল স্থানে মরীচিকা দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সময়ে একবার কটক গিয়াছিলাম, তখন আমি দেখিয়াছি, তাহার পূর্বে কেবল পুস্তকেই উহার কথা পড়িয়াছিলাম, চক্ষে দেখা হয় নাই। মরুভূমিতে মরীচিকা দেখিতে পাওয়া যায় এ কথাই জানিতাম। ও জিনিস যে মরুভূমি ছাড়িয়া আমাদের এত কাছে আসিয়া বসিয়া আছে, তাহা কি আর আমি জানি। কাজেই তখন আমি তাহার মর্ম বুঝিতে না পারিয়া উহাকে জলই মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু কটক হইতে ফিরিবার সময় আমার এ ভ্রম দূর হইল। তখন একজন সাহেব আমার সঙ্গে ছিলেন। তিনি আমাকে বলিলেন, "দেখেছ কেমন মরীচিকা?" আমি অবাক হইয়া বলিলাম, "উহা জল নয়?" তিনি বলিলেন, "না, উহা মরীচিকা। সমুদ্রের কাছে গেলে আরো স্পষ্ট দেখা যায়।" তখন অনেক মনোযোগ করিয়া দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম যে, উহা জল নয়।

রাত্রিতে হাবড়া স্টেশন হইতে রওয়ানা হইয়া সকালে বালেশ্বরে গিয়া যখন ঘুম ভাঙ্গে, তখন বেশ বুঝা যায়, যে একটা নূতন স্থানে আসা গিয়াছে। স্টেশনের নামে আর বাঙ্গালা অক্ষর নাই, তাহার স্থানে ওড়িয়া ভাষা হইয়াছে। আমরা যেমন করিয়া বাঙ্গালা আর দেবনাগর অক্ষরে মাত্রা দিই, ওড়িয়া অক্ষরের মাত্রা তেমন করিয়া দেওয়া হয় না। সোজা কসিটির বদলে তাহাতে পুঁটুলী পাকাইয়া আনিতে হয়; আসল অক্ষরটি তাহার তলায় পড়িয়া থাকে। অনেক অক্ষরেরই আসল অংশটুকু সংস্কৃত অথবা বাঙ্গালা অক্ষরের ন্যায়।

এইরূপে ওড়িয়া অক্ষর দেখিয়া, আর ওড়িয়া ভাষা শুনিয়া বেশ আমোদেই পথ ছাড়ায়। ইচ্ছা হইলে ইহার সঙ্গে ওড়িয়া জলখাবারের বিষয়টাও যোগ করিতে হানি নাই। তবে, তাহাতে আমোদ কতখানি হইবে, আর ক্ষুধাই-বা কতটুকু কমিবে, তাহা যে খাইবে তাহার মেজাজ এবং দাঁতের উপর নির্ভর করে। অন্তত আমি একবার বালেশ্বর স্টেশনের জলখাবারের যে নমুনা দেখিয়াছিলাম, তাহা বাস্তবিকই যদি ঐ অঞ্চলের গুণপনার নমুনা হয়, তবে এ কথা বলিতে পারি, তাহাদের জিনিস খুব মজবুত। খাইবার সময় তাহা যেমন মজবুত, পেটের ভিতর গিয়াও যে তাহার চাইতে কম টেকসই হইবে তাহা মনে হয় না। সুতরাং এক ঠোঙ্গা কিনিলে ক্ষতি কি! আর কিছু লাভ না হউক, পুরী পর্যন্ত অবশিষ্ট মাইল শতেক এই এক ঠোঙ্গা মিঠাইয়ের চর্চাতেই উত্তমরূপে কাটানো যাইবে।

২

পথে ভুবনেশ্বর স্টেশনের কাছে একটু সতর্ক হওয়া আবশ্যক, কারণ ট্রেন হইতে তথাকার মন্দিরগুলির দৃশ্য দেখিতে খুব সুন্দর। আর খুরদা স্টেশনে নামিয়া যে গাড়ি বদলাইতে হয়, সে কথাটাও না ভুলাই ভালো; কারণ তাহাতে

পুরী পেঁছাইবার ব্যাঘাত হইতে পারে। তবে, আমার দাদা যেরূপ সতর্ক হইয়াছিলেন, এতটা না হইলেও চলিবে। তিনি নাকি বড়ই হুঁসিয়ার লোক, তাই কটক হইতে পুরী আসিবার পথে তিনি ভুবনেশ্বরেই তাড়াতাড়ি নামিয়া গাড়ি বদলাইতে ছুটিলেন। গাড়ি যে পাইলেন না তাহা বোধ হয় আর আমার না বলিলেও চলিবে, ততক্ষণে তিনি যে ট্রেনে আসিয়াছিলেন, তাহাও ছাড়িয়া গেল! কিন্তু '—' দাদা সহজে দমিবার লোক নহেন! তিনি বলিলেন, "ভালোই হইল ভুবনেশ্বর দেখিয়া যাই!"

পুরী পেঁছাইবার চারি-পাঁচ মাইল থাকিতেই জগন্নাথের মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। যেন একটা প্রকাণ্ড ভুট্টা। ভুট্টার দানা যেরূপ করিয়া সাজানো থাকে, মন্দিরের আকৃতিও কতকটা ভুট্টারই মতন। মন্দিরের এই দৃশ্যটি দেখিতে বেশ সুন্দর, কিন্তু কাছে গিয়া আমার তাহা এত সুন্দর বোধ হয় নাই। বিশাল সবুজ মাঠের মাঝখানে বিস্তৃত জলাশয়, তাহার পাশে সেই প্রকাণ্ড মন্দির, গাছপালা তাহার কোমরের নীচে পড়িয়া আছে। দেখিলে বাস্তবিকই তাহাকে একটা যেমন তেমন জিনিস বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু মনের এই আনন্দটুকু অল্পক্ষণই থাকে। যতই কাছে যাওয়া যায়, ততই ছোট-ছোট জিনিসে মন্দিরকে আড়াল করিয়া ফেলে। সে সবুজ মাঠ আর বিশাল জলাশয়ের নির্মল জল দেখা যায় না। সমুদ্রের বালি, আর হাড্ডিসার গাছপালা তাহার স্থান অধিকার করে। ইহার উপর আবার যেই স্টেশনে নামিলাম অমনি,

'—দক্ষিণে, বামে, পিছনে সম্মুখে যত
লাগিল পাণ্ডা, নিমেষে প্রাণটা করিল কণ্ঠাগত।'

আমি তীর্থ করিতে পুরী যাই নাই, বেয়ারাম সারাইবার জন্য গিয়াছিলাম। কিন্তু বার বার সবিনয়ে বলাতেও পাণ্ডা মহাশয়েরা আমার কথাটা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে চাহিলেন না। আমি যত বেশি করিয়া বলি, তাঁহারাও ততই আরো যত্নপূর্বক আমাকে আহ্বান করেন। শেষটা গাড়িতে উঠিয়া কতকটা নিশ্চিন্ত হইলাম বটে, কিন্তু বাসায় আসিয়া দেখি, সেখানে একজন আসিয়া আছেন!

যাহা হউক, শেষটা ইঁহাকেও বুঝিতে হইল যে এ ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দেওয়াই ভালো। আমিও রক্ষা পাইয়া নিজের অবস্থা এবং বাসস্থান বিষয়ে মনোযোগী হইলাম।

এইখানে একটা কথা বলিয়া রাখি। আমি বেয়ারাম লইয়া সেখানে গিয়াছিলাম। নিয়ম পালন করিতেই আমার সমস্ত সময় কাটিয়া যাইত; চারিদিকে বেড়াইয়া দেখিবার অবসর আমার হয় নাই। বেড়াইবার অবসর যখন হইত, তখন সমুদ্রের ধারে চলিয়া যাইতাম। মন্দিরের ওদিকে দু-একদিন মাত্র গিয়াছিলাম। আমার ভিতরে যাইবার উপায় ছিল না, বাহির হইতে যাহা দেখা যায়, তাহাই দেখিয়াছি। সুতরাং মন্দিরের সম্বন্ধে আমার বেশি কথা বলিবার

নাই।

মন্দিরটা খুব বড়। আর প্রাচীর সিংহদ্বার প্রভৃতি লইয়া দেখিতেও বেশ জমকাল। কিন্তু কাছে গিয়া কারুকার্য তেমন ভালো বোধ হয় না। সামনের রাস্তাটি খুবই চওড়া ; আমি আর কোথাও এমন প্রশস্ত পথ দেখি নাই। এই পথে জগন্নাথের রথ চলে। পথের এক প্রান্তে রথখানিও রহিয়াছে। সেখানকার বড় পর্ব রথযাত্রা। রথযাত্রার সময় দুই তিন লক্ষ লোক পুরীতে জড়ো হয়। এই কয়দিন ইহারা জগন্নাথের প্রসাদ খাইয়াই দিন কাটায়। প্রসাদ বাজারে বিক্রয় হয়, কিনিয়া খাইলেই হইল। যাহা খাইতে পারে খাইবে, অবশিষ্ট আর একবার খাইবার জন্য রাখিয়া দিবে। জগন্নাথের প্রসাদ ফেলিয়া দিবার জো নাই। বাসি হইয়া পচিয়া গেলেও তাহা খাইতে হইবে। জগন্নাথের প্রসাদ খাইতে জাতির বিচার নাই। চন্ডাল যদি ব্রাহ্মণকে প্রসাদ আনিয়া দেয়, তাহাও তাঁহাকে খাইতে হয়।

পুরীতে গোদের প্রাদুর্ভাবটা কিছু বেশি। সেখানকার লোকের নাকি এই বিশ্বাস যে, জগন্নাথের প্রসাদ মাড়াইলে গোদ হয়।

পুরীতে গিয়া প্রথমেই এফটা ব্যাপার একটু আশ্চর্য বোধ হয়। সমুদ্রের ধারের স্থানগুলিতে গাছপালা বাড়িতে পায় না। বটগাছগুলি আমগাছের মতন। নিমগাছ কুলগাছের মতন। অনেকগুলি গাছই আবার একপেশে। এক-দিকে কারো ডালপালা বেশ বাড়িয়াছে, কিন্তু আর এক দিকে বেশি ডাল নাই, আবার যাহা আছে তাহাতেও পাতা খুব কম। সমুদ্রের ধারের বালি হাওয়ায় উড়াইয়া আনিয়া এই-সকল গাছের ঐরূপ দুর্দশা করে। হাওয়ার দিন সমুদ্রের ধারে এই কথাটি বেশ বুঝিতে পারা যায়। খুব শুকনো দিনে বেশি হাওয়া হইলে, তাহার চোটে বালির কণাসকল ছুটিয়া আসিয়া গায়ে পড়ে। আর এত জোরে পড়ে যে, খালি চামড়ায় পড়িলে অনেক সময় তাহাতে পিঁপড়ের মতন বেদনা বোধ হয়। এই হাওয়ায় তাড়ানো বালির দৌরাত্ম্যে গাছের কচি পাতাগুলি প্রায় মারা যায়।

সমুদ্রের হাওয়া সমুদ্র ছাড়িয়া বেশি দূরে যায় না। সুতরাং সমুদ্রের কাছের গাছপালারই এইরূপ দুরবস্থা। সমুদ্র হইতে দূরে বড় বড় গাছের অভাব নাই। তাহা ছাড়া এক এক রকমের গাছ সে দেশের মাটিতে স্বভাবত খুব বাড়ে বলিয়া বোধ হইল। প্রথমে পুরীর বাসায় ঢুকিয়াই দুটি পেঁপে-গাছ দেখিলাম ; তেমন বড় পেঁপেগাছ আমি আর কখনো দেখি নাই। সে দেশে পেঁপের নাম 'অমৃত ভান্ড'। এমন জমকাল নামের গরিমায়ই-বা সেখানকার পেঁপেগাছ ফুলিয়া এত বড় হয়! আর তাহার ডালপালাই বা কত! বাড়ির পাশেই কয়েকটা বটগাছ ছিল। সে গাছগুলি যেমন উঁচু, পেঁপেগাছগুলি বরং তাহার চাইতে একটু বেশি উঁচু। তবে, পরিসরে অবশ্য ঢের কম।

একপ্রকার মনসাগাছও সেখানে খুব জন্মায়। সে গাছের পাতা দেখিতে সাপের চক্রের মতন। একটা পাতার টিকির ভিতর দিয়া আর একটা বাহির

হয়। ফুল-ফলও পাতার আগাতেই হয়। কুমড়ো ফুলের মতন বড়-বড় হলদে। সেই ফুলগুলি দেখিতে খুব সুন্দর।

সে দেশের ঘরবাড়ির আমি বিশেষ প্রশংসা করিতে পারিলাম না। তিনটি চলনসই শয়ন ঘর, ভাঁড়ার, রান্না ঘর, একটি অতিশয় ক্ষুদ্র স্নানের খোপ, আর সেইরূপ আর একটি জায়গা তাহাতে কাঠ রাখা চলে। তিনটি বারান্দা, পাঁচিল ঘেরা আঙিগনা, ভিতরে একটি কুয়া। এইরূপ একটি বাড়ির জন্য আমাকে মাসে সত্তর টাকা করিয়া দিতে হইয়াছিল। দূরে ঐ বাড়ির চেহারা দেখিয়া ছেলেরা বলিয়াছিল, "য়্যা! বিচ্ছিরি বাড়িটি যদি আমাদের হয়্!" শেষটা সেই "বিচ্ছিরি" বাড়িতেই গাড়ি থামিল। গাড়ি হইতে নামিয়া দেখি, একটি কুকুর সেখানে আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। একটি সে-দেশী চাকরও ছিল; কিন্তু তাহার কথা তেমন উল্লেখযোগ্য নহে। কুকুরটা তাহার চাইতে ঢের ভালো লোক। কুকুর হইলেও সে আমাদিগকে আদর-যত্ন করিতে ত্রুটি করে নাই।

কুকুর আর সেই চাকর ভিন্ন সে বাড়িতে আরো অনেকের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হইল। কিন্তু তাহারা মানুষ নয়, ছোট ছোট ব্যাঙ। একটা দুটো নয়, অনেকগুলি। ভাবে বোধ হইল, যেন তাহারাই সচরাচর ঐখানে থাকে। এমন নিশ্চিন্তভাবে পরের ঘরে থাকিতে আর কোনো জন্তু পারে না। কাজের মধ্যে তো দেখিলাম, খালি থপ্‌থপ্‌ করিয়া দেওয়ালের ধারে বেড়ানো, আর কোণে পেঁছাইলে সেই কোণ বাহিয়া দেওয়ালে উঠিবার চেষ্টা! কাজটি অতিশয় কঠিন! দুই পা ছড়াইয়া দুদিককার দেয়ালে প্রাণপণে ঠেস্‌ না দিলে এ কাজ হইবার জো নাই। আর ছড়ানোও যেমন তেমন হইলে হইবে না। ব্যাঙ ভিন্ন অন্য কোনো জন্তুর সেরূপভাবে পা ছড়াইবার ক্ষমতা আছে কি না, বিশেষ সন্দেহের বিষয়। আর তাহা দেখিলে কি হাসিই পায়, তাহা কি বলিব! কিন্তু ব্যাঙ খুব ধীর প্রকৃতির জানোয়ার, যারপরনাই গম্ভীরভাবেই সে এ কাজ করিতে থাকে।

এই ব্যাঙ তাড়ানোই কিছুদিন ছেলেদের কাজ হইল। সহজে কি তাহারা যায়! ধমকাইলে যে তাহারা কানে শোনে, তাহার কোনো প্রমাণই পাওয়া গেল না। লাঠি দিয়া খোঁচাইতে গেলে খালি একটু ব্যস্ত হয়, কিন্তু ঘরের বাহিরে যে যাইতে হইবে, এ কথা তাহাদের মাথায়ই আসে না। শেষটা একটি ছেলে এক ফন্দি বাহির করিল। কাগজের ঠোঙ্গা সামনে ধরিয়া পিছনে তাড়া করিলে অতি সহজেই ব্যাঙ তাহাতে লাফাইয়া উঠে। তাহার পর তাহাকে বাহিরে ফেলিয়া দিলেই হইল।

এইরূপ করিয়া ব্যাঙের উপদ্রব কমিল বটে, কিন্তু উই দেখা দিল। ঐ উইয়ের লোভেই এত ব্যাঙ আসিয়াছিল। উইয়েরা আমাদের জিনিসপত্র কাটিয়া আমাদিগকে অস্থির করিয়া তুলিল! বই আর জুতার উপরেই তাহাদের বেশি আক্রমণ, বিশেষত জুতা! এই সামান্য ছোট পোকার দাঁতে কি আছে, বলিতে পারি না। জুতা যতই মজবুত হয়, ততই যেন উহা তাহার মিষ্ট

লাগে। লোহা, পিতল ভিন্ন আর কিছুই তাহার দাঁতের কাছে টেকে না, খালি কেরাসিন তেল এক জিনিস আছে, যাহার কাছে উই জব্দ থাকে।

মুকুল : জ্যৈষ্ঠ ১৩১২

৩

পুরীর ঘরের কথা বলিতে ব্যাঙ আর উইয়ের কথা উঠিয়াছিল। তাহার পর দেশের মানুষের কথা আসা স্বাভাবিক। সেদেশের লোক আমরা এখানে বসিয়াই ঢের দেখিতে পাই। তাহারা কেমন কথা কয়, কেমন পান খায়, কেমন রাঁধি, কেমন সুরে পালকি বয় এ-সকল কাহারো অজানা নাই। একটা কথা অবশ্য মনে রাখা উচিত। আমাদের এখানে যাহারা পালকি বহিতে, চাপরাসী গিরি আর মুটের সর্দারি করিতে ও রাঁধিতে আসে, তাহাদের দেখিয়া সে-দেশের ভদ্রলোকের সম্বন্ধে বিশেষ জানা যায় না। দুঃখের বিষয়, সেখানে গিয়াও আমি সেদেশের ভদ্রলোকদের সহিত মিশিবার সুযোগ পাই নাই। সেখানে গিয়াও সেই ওড়িয়া ব্রাহ্মণ আর ওড়িয়া চাকর লইয়াই ব্যস্ত হইয়াছি, আর সেই ওড়িয়া পালকিওয়ালার চ্যাঁচানিতেই কান ঝালাপালা হইয়াছে। একটা বড়রাস্তার পাশেই আমার বাসা ছিল, আর সেই রাস্তার সংলগ্ন একটি ঘরে দিনেরবেলায় আমি বসিতাম। সুতরাং ওড়িয়া পালকি-বেহারার সংগীত শুনিতে আমার ত্রুটি হয় নাই। এখানকার ওড়িয়ারা তেমন গান গাহিতে জানেই না। সেখানে কোনো স্থান দিয়া একটা পালকি গেলে সিকি মাইল পর্যন্ত তাহাদের আক্ষেপ শুনিতে পাওয়া যায়। মনে হয়, যেন তাহারা বড়ই বিপদে পড়িয়াছে, আর সেই বিপদটা যেন তাহাদের পাল্কীর ভিতরে। কেহ কেহ বলিয়াছেন, যে সওয়ারটি ভারী হইলে নাকি ঐরূপ করিয়া তাহারা গালি দেয়। ইহা যদি সত্য হয়, তবে বলিতে হইবে যে পালকিতে উঠিবামাত্র সকলেই হঠাৎ ভয়ানক ভারী হইয়া যায়। আসল কথা কিন্তু তাহার কিছুই নহে। উহাদের ঐ চীৎকারের ভিতরে একটা শৃঙ্খলা আছে। সামনের একজন যেন চ্যাঁচাইয়া বলিল, 'ওরে বাবা রে!' পিছনের একজন যেন উত্তর দিল, 'কি হল রে!' সামনের লোক বলিল, 'ওগো মাগো!' পিছনের লোক বলিল, 'কোথা যাব গো!' 'মাগো' 'বাবা গো' বলে না আর কিছু যে বলে, তাহাও আমি জানি না, কথাগুলি নাকি বড়ই ঊর্ধ্বশ্বাসে বলে তাহাতেই এরূপ মনে হয়। উহাতে বেশ একটা ছন্দ আছে, তাহাতে মনে হয়, যে একসঙ্গে পা ফেলিবার সুবিধার জন্য ঐরূপ করে, কারণ একসঙ্গে পা ফেলিয়া চলাতে সওয়ারির আরাম আছে। অনেক সময় এরূপ বুঝা যায়, যে সামনের ব্যক্তি সর্দার, সে ঐ উপায়ে চলার সম্বন্ধে উপদেশ দেয়। আসল কথাটা যে কি, তাহা উহারাই বলিতে পারে।

এই তো গেল পালকী-বেহারার কথা। তাহার পর চাকর বামুনের কথা। কিন্তু তাহা বলিবার আগে একটু সতর্ক করিয়া দেওয়া দরকার। তীর্থস্থানে

সাধারণত বিস্তর অপদার্থ অলস লোক আসিয়া জড়ো হয়। বিশেষত পুরীর মতন যদি তীর্থস্থান হয়, যেখানে রান্না-বান্নার ঝঞ্ঝাট নাই, অতি অল্প পয়সার প্রসাদ কিনিয়া খাইলেই চলে। চাকর বামুনের সংবাদ লইতে গেলেই এই হতভাগারা আসিয়া উপস্থিত হয়, কাজেই ভালো লোক সেখানকার কে তাহা জানিবার উপায় থাকে না। হয় নিতান্ত বেকুব, নাহয়, বেজায় পাজি, এইরূপ লোকই প্রায় আমার ভাগ্যে জুটিয়াছিল।

চাকর আসিল, তাহার দুই পায়ে দুই গোদ, সেই গোদ ভরাট করিতে যেন শরীরের অন্যান্য স্থানের মাংস খরচ হইয়া গিয়াছে। সে ব্যক্তি আসিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, 'কি কাজ করিতে হইবে?'

'এই জল তুল্‌বি, ঘর ঝাঁট দিবি, বাসন মাজ্‌বি, এই-সব কাজ করবি।'

'সওদা করিব না?'

'না। তাহার লোক আমাদের আছে।'

'সওদা করিব না, ত কঁড় করিব?' বলিয়া বেচারা একেবারেই নিরুৎসাহ হইয়া গেল। বলা বাহুল্য, সে ব্যক্তি আর আমাদের কাজে আসে নাই। অন্য বিষয়ে বুদ্ধি যেমনই থাক, 'সওদা' অর্থাৎ বাজার করার মর্ম, সে বেশ বুঝিয়াছে। বুদ্ধির নমুনাও কিঞ্চিৎ দিতেছি।

সেখানকার একজন পদস্থ বাঙ্গালি ভদ্রলোকের এক ওড়িয়া চাকর ছিল। সে লোক ভালো, সুতরাং তাহার বুদ্ধিটা একটু মোটা। মনে কর, যেন তাহার নাম গদাধর।

একদিন বাবুর একটি অতিশয় পরিচিত বন্ধু দূর দেশ হইতে আসিলেন। বাবু তখন আপিসে গিয়াছে, সুতরাং গদা বলিল, 'বাবু নাই!' বন্ধুটি একটু নিরাশ হইয়া বলিলেন, 'পরিবার তো আছেন?' গদা বলিল, 'না, না, পরিবা নাই!' বন্ধু আর কি করেন, তিনি ক্ষুণ্ণ মনে ফিরিয়া গেলেন। বাড়ির কর্ত্রী সবই শুনিয়াছেন, কিন্তু চ্যাঁচাইয়া তো আর কিছু বলিতে পারেন না। তিনি গদার ব্যবহারে যারপরনাই আশ্চর্য হইলেন, আর সে ভিতরে আসিলে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কিরে গদা, তুই যে বলিলি পরিবার নাই?' গদা নিতান্ত সরলভাবে বলিল 'আমি তো ভালোই করেছি, বাবু 'পরিবা' নিতে এসেছিল, আমি নাই বলে বাঁচিয়ে দিয়েছি।' সেদেশে 'পরিবা' বলিতে তরকারি বুঝায়। গদা মনে করিয়াছে, বাবু তরকারি চায়। সে মনিবের হিতৈষী লোক, তাহার ইচ্ছা নহে যে তাঁহার তরকারি লোকসান হয়, সুতরাং সে আগন্তুক বাবুকে, 'পরিবা' নাই বলিয়া বিদায় করিয়াছে!

যেমন চাকর তেমনি পাচক। তবে এ কথা বলার দরকার যে, আমি যে কয়েকটিকে পাইয়াছিলাম, তাহাদের কেহই বোকা নহে। সুতরাং—আর থাক সে-সব কথা বলিয়া আর এখন লাভ কি? জিনিস তো আর ফিরিয়া পাইব না। উহাদের গায়ে যে হনুমানের মতন জোর ছিল না, ইহাই আমার সৌভাগ্য। নতুবা একদিন ভোরে উঠিয়া হয়তো দেখিতাম, যে আমরা ময়দানে বাস করিতেছি, বাড়ি-ঘর কোথায় গিয়াছে, তাহার ঠিকানা নাই।

পূর্বেই বলিয়াছি, আমি সেখানকার সাধারণ লোকের সহিত মিশিতে পাই নাই, সুতরাং তাহার সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছু বলিতে পারিলাম না। দুইটা বিষয় আমি লক্ষ্য করিয়াছি। তাহারা গায়ে হলুদ মাখিতে খুব ভালোবাসে। আর তাহাদের কেমন একটা বেখাপ্পা কৌতূহল আছে। পথ চলিতে চলিতে তোমাকে ডাকিয়া তোমার আবশ্যক অনাবশ্যক দশটা খবর লইয়া যাইবে। কবে এসেছ? কত দিয়ে ঘর ভাড়া করিলে? ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর এত বার দিতে হইয়াছে, যে আমি চটিয়া যে গল্পের সেই রামা চাকরের মতন একটা কিছু করিয়া বসি নাই ইহা আমার বিশেষ প্রশংসার বিষয় বলিতে হইবে। রামা বাজারে মাছ কিনিয়াছে, সকলেই তাহার দাম জিজ্ঞাসা করে, তাহাতে রামার রাগ হইল। তখন রামা মাছ মাটিতে রাখিয়া রাস্তায় পড়িয়া চীৎকার করিতে লাগিল, আর হাত-পা ছুঁড়িতে লাগিল। বাজারের সমস্ত লোক কাজকর্ম ফেলিয়া রামার কাছে আসিয়া উপস্থিত। সকলেই বলে, 'কি হইয়াছে? কি হইয়াছে?' রামা যখন বুঝিল, যে আর বেশি অবশিষ্ট নাই, প্রায় সকলেই আসিয়াছে, তখন সে আস্তে আস্তে উঠিয়া গা ঝাড়িল, আর মাছটি উঁচু করিয়া ধরিয়া বলিল, 'ওগো, আর কিছু নয়, আমার এই মাছটা সাড়ে সাত আনা হয়েছে, তোমরা সবাই শুনে রাখ! সাড়ে সাত আনা!! সাড়ে সাত আনা!!!'

মাছের কথা শুনিয়া হয়তো অনেকেই ভাবিতেছেন, সেখানে মাছ পাওয়া যায়। মাছ খুব পাওয়া যায়, কিন্তু তাহার কথা আজ বলিলে চলিবে না। অনেক কথা। আর একদিন খালি মাছের কথা বলা যাইবে।

তরকারি বেশি পাওয়া যায় না। কচু, কুমড়া আর কাঁচকলার নাম লইলেই প্রধান জিনিসগুলির কথা একপ্রকার শেষ হয়। আলু তো জগন্নাথ খানই না, সুতরাং তাহা সেখানে জন্মায়ও না। ফলের সময় সেখানে যাই নাই, কাজেই কি কি ফল পাওয়া যায়, আর তাহা খাইতে কেমন, তাহা বলিতে অক্ষম। কলা বেশ, আর আম, পেঁপে, আতা, নোনা, কুল ইত্যাদির গাছ দেখিয়াছি, সুতরাং তাহাও পাওয়া যায়। তবে খাইতে কেমন, তাহা জানি না।

দুধের বড়ই কষ্ট। দুধের দোষে নয়, গোয়ালার গুণে। দুদিন সেখানকার দুধ খাইয়াই বুঝিতে পারিলাম যে, সে কলিকাতার গোয়ালার চাইতে অনেক বেশি বুদ্ধিমান। ডাক্তার বলিলেন, 'গাই না কিনিলে তোমার অসুখ সারিবে না।' পরদিন সকালে গাই কিনিতে লোক পাঠাইলাম, একটি ছোট ছেলে তাহার সঙ্গে গেল। বেলা একটার সময় ষোলো টাকায় কচি বাছুর সমেত এক কালো গাই কিনিয়া তাহারা ঘরে ফিরিল! উহাদের দেরি দেখিয়া আমরা মনে করিয়াছিলাম, না জানি ক্ষুধায় ছেলেটির কতই কষ্ট হইতেছে; কিন্তু ফিরিবার সময় দেখি, তাহার গালভরা হাসি। একটা গোরু কিনিলাম, আর একটা সঙ্গে দিয়াছিল বলিয়া সে মহা সন্তুষ্ট। তাহার খুব আশা হইয়াছে, যে আর দুমাস পরে ছোট গোরুটার দুধও খাওয়া যাইবে।

গোরুর কথা বলিতে সেখানকার দুটা ষাঁড়ের কথা মনে হইতেছে। দুইটাতে সাংঘাতিক শত্রুতা, একটা আরেকটাকে ক্রমাগত খুঁজিয়া বেড়ায়, আর পরস্পরের

উদ্দেশ্যে আক্রোশ প্রকাশ করে, দেখা হইলেই যুদ্ধ বাধিয়া যায়। ইহাদের জ্বালায় অনেক সময় পথ চলা কঠিন হইত। অথচ মানুষের সহিত ইহাদিগকে কখনো খারাপ ব্যবহার করিতে দেখি নাই। বরং একটা একদিন আমাদের ঘরে ঢুকিয়া যেরূপ অপ্রস্তুত হইয়া গেল, তাহাতে উহাদিগকে নিতান্ত ভালোমানুষ ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না। আমরা অবশ্য খুবই ভয় পাইয়াছিলাম, ততোধিক কোলাহল করিয়াছিলাম। আর একটা বাখারি আনিয়া তাহার চোখের সামনে নাড়িতেও ত্রুটি করি নাই। এই বাখারি দেখিয়াই ভয় পাইয়া থাকুক, নাহয় আমাদের বাঙ্গলা কথার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া তাহাকে উৎকট গালি মনে করিয়া থাকুক, যে কারণেই হউক, বেচারা যেন তাহার জীবনে আর কখনো এমন সংকটে পড়ে নাই, এইরূপ তাহার ভাব হইল। আর দরজা খুলিয়া দিবামাত্র সে ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিল।

মুকুল ঃ আষাঢ় ১৩১২

৪

পুরীর সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু যাঁহারা সমুদ্র দেখেন নাই তাঁহারা হয়তো জিজ্ঞাসা করিবেন, 'সমুদ্র কেমন দেখিলে?' আমিও সমুদ্রের কথা বলিবার জন্যই এতক্ষণ ধরিয়া সুযোগ খুঁজিতেছিলাম।

'সমুদ্রটা কেমন?'—এর উত্তরে আমি এমন কোনো কথাই খুঁজিয়া পাইতেছি না, যাহা বলিলে যে সমুদ্র দেখে নাই, সেও মনে মনে তাহার একটা চেহারা কল্পনা করিয়া লইতে পারে। একটি শিশু পুকুর দেখিয়া বলিয়াছিল, 'কত বড় চৌবাচ্ছা!' সে যাহা আগে দেখিয়াছে, নূতন জিনিসকে তাহারই পরিচয়ে চিনিতে চেষ্টা করিয়াছে। অবশ্য সমুদ্রের কূল-কিনারা দেখা যায় না, তখন তাহাকে চৌবাচ্ছা মনে করা শিশুর পক্ষেও সম্ভব না হইতে পারে। আর চৌবাচ্ছাটাকে মনে মনে বাড়াইয়া তুলিয়া তাহার কূল-কিনারা দূর করিয়া দিতে পারিলেও তাহা ঠিক সমুদ্রের মতন হইবে না।

সমুদ্র খুবই বড় তাহার আর সন্দেহ কি? কিন্তু সমুদ্রের তীরে দাঁড়াইয়া তাহাকে যেটুকু বড় দেখা যায়, তাহা তেমন কিছু আশ্চর্যের বিষয় নহে। পদ্মা প্রভৃতি বড় বড় নদীর এক-এক স্থান সোজাসুজি দেখিতে প্রায় এইরূপই বোধ হয়। হিমালয়ে উঠিবার সময় মাঠের দৃশ্য যে দেখিয়াছে, সে ঐরূপ সমুদ্রের চাইতে বড় জিনিসই দেখিয়াছে। যত উঁচুতে উঠা যায়, ততই বেশি দূর অবধি দেখিতে পাওয়া যায়। পুরীর কাছে সমুদ্র আসলে সাতহাজার মাইল লম্বা হইলে কি হইবে? তাহার কূলে দাঁড়াইয়া পনেরো-কুড়ি মাইলের অধিক দেখা যায় না। কিন্তু দার্জিলিং-এর পথে এক-এক জায়গায় নীচের দিকে তাকাইলে মাঠের উপর দিয়া ষাট-সত্তর মাইল পর্যন্ত দৃষ্টি চলে।

সমুদ্রের সম্মান কেবল তাহার মস্ত শরীরটার জন্য নহে, তাহার আরো গুণ আছে। দেশের সাধারণ লোকেরাও সমুদ্রকে একটা দেবতা বলিয়াই মনে করে।

এ কথার প্রমাণ সমুদ্রের ধারে গেলেই পাওয়া যায়।

পুরী তীর্থস্থান, সেখানে অনেক দূর হইতে যাত্রীরা আসে। এ-সকল যাত্রী যে সমুদ্র দেখিবার জন্য আসে, তাহা নহে, তাহাদের উদ্দেশ্য জগন্নাথ দেখা। ভক্তিমান যাত্রীরা অনেকে রেল হইতে জগন্নাথের মন্দির দেখিবামাত্রই হাত জোড় করে, আর মন্দিরে আসিয়া জগন্নাথকে প্রণাম করিয়া তবে সে হাত নাবায়। কিন্তু জগন্নাথের ওখান হইতে বিদায় হইয়াই যে সে যথেষ্ট মনে করিবে তাহা নহে, সমুদ্রকে একবার না দেখিয়া, তাহাকে পূজা না করিয়া, তাহাকে কিছু ফল না খাওয়াইয়া আর তাহার ঢেউ না খাইয়া দেশে ফিরিলে তাহার সকলই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়।

নিতান্ত গরিব, আর নিতান্ত পাড়াগেঁয়ে লোক, পূজা করিবার পয়সা নাই, ঢেউ খাইবার ভরসা নাই, এমন লোকও সমুদ্রকে একবার সেলাম না করিয়া দেশে ফিরিবে না। আমি প্রায়ই দুপুরবেলা সমুদ্রের ধারে গিয়া বসিয়া থাকিতাম, তখন এইসকল লোককে দেখিতে আমার বড়ই ভালো লাগিত। উহাদের অনেকেই দূর দেশ হইতে আসিয়াছে, তাহা উহাদের ভাষাতেই বুঝা যায়। গৃহে কোনো স্নেহের পাত্রকে রাখিয়া আসিয়াছে ; হয়তো খোকা-খুকি, অথবা ছোট ভাই বোন, নাহয় আর কেহ। উহাদের জন্য দু-একটি সুন্দর উপহার প্রায় সকলেই কিনিয়াছে। রঙিন বাঁশের ছাতা, সরু সরু বেত, বিচিত্র বর্ণের থলে এইরূপ দু-একটি জিনিস প্রায় প্রত্যেকেরই হাতে। পুঁটুলির ভিতর হয়তো আরো কত জিনিস আছে। কেহ কেহ আবার দুটি করিয়া ছাতা কিনিয়াছে। বাঁশের ছাতা গুটাইবার জো নাই ; কাজেই দুটিকেই মাথায় দিয়া চলিতে হইতেছে। তাহাতে চেহারাখানি খুলিয়াছে ভালো। মাঝে মাঝে আবার এক-একজনের মাথায় এক-একটা কড়া। তাহাতে ছাতার কাজও চলিতেছে, টুপির কাজও হইতেছে, আবার দরকার হইলে রান্নার কাজও চলিবে।

ইহারা যে কতখানি কৌতূহল আর আগ্রহের সহিত সমুদ্র দেখিতে আসিয়াছে. তাহা ইহাদের মুখ দেখিলেই বুঝা যায়। আর সমুদ্রকে দেখিয়া যে তাহারা কিরূপ সন্তুষ্ট হইয়াছে. তাহাও উহাদের সম্ভাষণেতেই প্রকাশ! 'হাঁ রে! সমুদ্রের মহারাজ!' ইহারা সাধারণত দূর হইতে সমুদ্রের প্রতি ভক্তি দেখাইয়াই চলিয়া যায়। কদাচিৎ দুই-একজন কাছে যাইতে সাহস করে। যাহারা কাছে যায়, তাহাদের উদ্দেশ্য একটু সমুদ্রের জল তুলিয়া মাথায় দেওয়া। একাজটি অনভ্যস্ত লোকের পক্ষে নিতান্ত সহজ নহে। যেদিন সমুদ্রে ঢেউ বেশি থাকে, সেদিন এরূপ করিতে বেশ একটু সাহসের আবশ্যক। একস্থানে দাঁড়াইয়া সমুদ্রের জল হাতে পাওয়া অতি অল্প সময়ই সম্ভব হয়। ঢেউয়ের সঙ্গে জল এক-একবার ছুটিয়া কাছে আসে, আবার অনেকদূর হটিয়া যায়। তাহাও যে শান্তভাবে করে, তাহা নহে। তুমুল বিক্রম আর তর্জন-গর্জনের সহিত ঢেউ আসিয়া ডাঙায় ভাঙিয়া পড়ে ; তাহা দেখিলে মনে ভয় হওয়ারই কথা। ইহার সামনে সাহস করিয়া জল লইতে যে অল্প লোকেই যায়, তাহা

আশ্চর্যের বিষয় নহে। আর, ইহারাও যে একটু জল ছুঁইয়া মাথায় দিতে পারিলে আর মুহূর্তকালও সেখানে বিলম্ব করে না, এ কথা বলাই বাহুল্য।

মানুষের দেহে যেমন মুখখানিই সকলের আগে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সমুদ্রের এই ঢেউগুলি সেইরূপ। সমুদ্রকে দেখিতে পাওয়ার অনেক আগেই ঢেউয়ের কোলাহল শুনিতে পাওয়া যায়। এ কোলাহলের আর নিবৃত্তি নাই। যেন দেশের সব রেলগাড়ি আর ঝড়েদের মধ্যে বচসা। এদিকে হয়তো হাওয়ার লেশমাত্র দেখা যায় না, কিন্তু সমুদ্রে গিয়া দেখ, ঢেউয়ের নৃত্যের বিরাম নাই। লম্বা-লম্বা ঢেউ পনেরো-কুড়ি হাত চওড়া, চারি-পাঁচ হাত উঁচু, আর একশত গজ হইতে সিকিমাইল পর্যন্ত লম্বা। কোথা হইতে ক্রমাগত তীরের পানে ছুটিয়া আসিতেছে। গড়াইয়া, লাফাইয়া, চ্যাঁচাইয়া, ফেনা তুলিয়া, ডিগবাজি খাইয়া শিশুর দলের ন্যায় তাহারা আসিতেছে। তীরের সঙ্গে এই খেলা ভিন্ন উহাদের আর কোনো কাজ নাই। ঢেউটা তীরের উপর আসিয়া পড়িল, আবার তীরের ধাক্কা খাইয়া ফিরিয়া চলিল। ততক্ষণে পিছন হইতে আর এক ঢেউ আসিয়া উপস্থিত, কাজেই দুটিতে ঠোকাঠুকি হইয়া গেল। তখনকার দৃশ্য দেখিতে অতিশয় অদ্ভুত। বাজপড়ার মতন একটা ভয়ানক শব্দ হয় ; আর সেখানকার জলগুলি চুরমার হইয়া তুবড়িবাজির পাহাড়ের আকারের মতন লাফাইয়া উঠে।

দূরে সমুদ্রের ভিতরের দিকে তাকাইলে এ-সকলের কিছুই দেখিতে পাইবে না। সেখানকার ঢেউ অন্যরূপ। গভীর জল ছাড়িয়া যতই কম জলের দিকে আসা যায়, ততই এই-সকল তীরমুখী লম্বা-লম্বা ঢেউ দেখিতে পাওয়া যায়। ঢেউগুলি অবশ্য সমুদ্রের ভিতরের দিক হইতেই আসে : কিন্তু গভীর জলে তাহারা তেমন উঁচু থাকে না, কাজেই তাহারা চোখে পড়ে না। তারপর যত কম জলের দিকে আসিতে থাকে, ততই ক্রমে উঁচু হইয়া শেষটা ভাঙিয়া পড়ে। খুব লক্ষ্য করিয়া দেখিলে বোধ হয় যেন ঢেউয়ের সামনের জলের বেগ কম, এমন কি, অনেক স্থলে ঠিক বিপরীত দিকেই তাহার গতি। এই উলটামুখো জলের সহিত ঠেলাঠেলির দরুনই তীরের কাছে এমন তুমুল কাণ্ড হয়। তীরে ঠেকিয়া সকল ঢেউকেই আবার ফিরিতে হয়। ইহা হইতেই ঐ উলটামুখো জলের উৎপত্তি। ঢেউগুলি তীরে ঠেকিয়া যখন ফিরিয়া চলে, তখন তাহাদিগকে অনেক দূর অবধি স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। পথে আর একটা ঢেউয়ের সঙ্গে বিবাদ হইলেও তাহারা লোপ হয় না ; বিবাদ থামিয়া গেলে আবার তাহাকে অনেকখানি অগ্রসর হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। তবে মোটের উপর দেখা যায়, যে তীরমুখী ঢেউয়ের জোর বেশি। এই কারণেই সমুদ্রে একটা কিছু জিনিস ফেলিয়া দিলে খানিক বাদে সেটা আবার তীরে আসিয়া উপস্থিত হয়। লোকে বলে 'সমুদ্র কাহারো কিছু গ্রহণ করে না : যাহা দেওয়া যায়, তাহা সে আবার ফিরাইয়া দেয়।'

খানিক আগে যে যাত্রীদের সমুদ্রকে খাইতে দিবার কথা বলিয়াছি, তাহার জিনিসপত্রও এইরূপে সমুদ্র ফেরত দেয়। খাইতে দেওয়া আর কিছুই নহে,

কোনোরূপ ফল সমুদ্রে ফেলিয়া দেওয়া, তাহা হইলেই সমুদ্রের আহার করা হইল। যিনি ফল দিলেন, তিনি এ জীবনে আর সে ফল খাইতে পারিবেন না। আবার যেমন তেমন ফল দিলে হইবে না—অন্তত তাহাতে পুণ্যকর্ম—নিজের অতিশয় প্রিয় ফল হইলেই হইল। সমুদ্রের ধারে যে সকল ফলের নমুনা দেখিয়াছি, আর বাজারে সমুদ্রের আহারের জন্য যেরূপ ফল বিক্রি হইতে দেখিয়াছি, তাহাতে বোধ হয়, যে ছোট-ছোট ভিন্ন অন্যরূপ ফল সমুদ্র মহারাজের ভাগ্যে অল্পই জুটিয়া থাকে। নচেৎ মানিতে হয় যে ভালো বড় ফল পাইলে মহারাজ তাহা ফিরাইয়া দিতে বিশেষ কুণ্ঠিত হন। আমি যে-সকল নারিকেল তাঁহাকে ফিরাইয়া দিতে দেখিয়াছি, তাহার আকার সাধারণত কামরাঙ্গার চাইতে বড় হইবে না, পটলের মতনও ছিল।

তারপর সমুদ্রের ঢেউ খাওয়ার কথা। সে অতি চমৎকার ব্যাপার ; তাহার কথা একটু বেশি করিয়া না বলিলে অন্যায় হইবে। সমুদ্রে নামিয়া স্নান করিতে গেলেই উহার ঢেউয়ের অত্যাচার সহ্য করিতে হয়। এই অত্যাচারটি এমন বিধি-পূর্বক হইয়া থাকে যে, একবার উহার আস্বাদন পাইলে আর কখনো তাহা ভুলিতে পারা যায় না। ইহাই 'ঢেউ-খাওয়া', ইহাতে আমোদ যথেষ্ট আছে, উপকারও আছে, আবার আশঙ্কাও আছে। ঢেউয়ের বাড়িতে অনেকে গুরুতর আঘাত পায়, এমন-কি, অনেকের মৃত্যু হয়। অনেক সময় কোনো হতভাগ্য লোক ঢেউয়ের টানে পড়িয়া জন্মের মতো অদৃশ্য হয়।

অবশ্য এরূপ দুর্ঘটনা অনেক সময় অসতর্কতা আর সাঁতার না জানার দরুনই ঘটিয়া থাকে। ঢেউয়ের সঙ্গে লড়িতে গেলে তাহার আঘাত তো লাগিবেই। তাহার সামনে বেকুবের মতন শরীর পাতিয়া দিলেও বিপদের আশংকা আছে। ঢেউ আসিয়া উপস্থিত হইলে তাহাকে বাম পাশ এবং ঘাড় পাতিয়া লইতে হয়। লাফাইতে আপত্তি না থাকিলে ঢেউয়ের সঙ্গে সঙ্গে লাফাইয়া শরীরকে উহার সমান উঁচু রাখিতে পারিলেও ছোট-ছোট ঢেউয়ের সময় কাজ চলিয়া যায়। বড় ঢেউ হইলে ডুব দিয়া উহার নিচে চলিয়া যাওয়াই যুক্তিসঙ্গত। ঢেউ অধিক উঁচু হইলে শেষে ফাটিয়া যায়। এই ফাটিবার সময় উহা হইতে বিশেষ বিপদের আশংকা। এই সময়ে উহা হইতে দূরে থাকিয়া অথবা আগেই উহার নিচে চলিয়া গিয়া আত্মরক্ষা করিতে হয়। ফাটিবার পূর্বে ঢেউ হইতে কোনো ভয় নাই—অবশ্য যাহারা সাঁতার জানে তাহাদের পক্ষে। যাহারা সাঁতার জানে না, তাহাদের জলে না নামাই ভালো। সাঁতার না জানিয়া জলে নামার বিপদ এই যে, অল্প জলও অনেক সময় হঠাৎ অধিক জল হইয়া যায়। তখন সাঁতার ভিন্ন আত্মরক্ষার উপায় থাকে না। তাহা ছাড়া হাজার সতর্ক হইলেও নাড়াচাড়ার হাত এড়াইবার সাধ্য নাই। বড়-বড় ঢেউ এক-একটা এমন আসে, যে তাহার সামনে আর কিছুতেই গাম্ভীর্য রক্ষা করা যায় না। সে আসিয়া তোমাকে লাটিমের মতন ঘুরাইয়া দিবে, ময়দার মতন ঠাসিয়া দিবে, তোমার অতিশয় গম্ভীর মুখখানি কখন হাঁ করিয়া ফেলিবে, তাহা তুমি টেরও পাইবে না ; ততক্ষণে সেরখানেক লোনাজল তোমার উদরস্থ

হইয়া অন্তত কয়েক ঘণ্টার জন্য তোমার মনের শান্তি নষ্ট করিয়া ফেলিবে।

কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, 'যদি এমনি, তবে সে কাজ করিতে যাওয়া কেন ?' ইহার উত্তরে অনেক কথা বলা যায়।

প্রথমত যে পুণ্য করিতে আসিয়াছে, সে লাঞ্ছনার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে। তাহার পুণ্য চাই ; লাঞ্ছনা হইলে তাহাতে বরং পুণ্যের দাম বাড়িবে।

স্বাস্থ্যের জন্য যে আসিয়াছে সে অবশ্য জল বাড়িতে লইয়া গিয়া তাহাতে স্নান করিতে পারে ; কিন্তু তাহাতে উপকার কম। ঐ নাড়াচাড়ায় উপকার বেশি।

আর ঐ লাঞ্ছনার জন্যই যে আসিয়াছে, তাহাকে ওরূপ প্রশ্ন করা তো স্পষ্টই অনাবশ্যক বোধ হইতেছে। ঐ লাঞ্ছনার ভিতরে ভারি একটা আমোদ আছে। চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসরের বুড়োরা ঐ জলে পড়িয়া নাকাল হয়, আবার চ্যাঁচাইয়া হাসেও। ঢেউয়ের পর ঢেউ মাথার উপর দিয়া যাইতেছে ; শরীর-টাকে ধোপার বাড়ি দিবার ফল অনেকক্ষণ যাবৎ হইয়া গেছে ; তথাপি তাহারা উঠিতে চাহে না। তাহার কারণ এই, যে এই নাড়াচাড়াতে তাহাদের শরীর মনে এমন একটা স্ফূর্তি আনিয়া দিতেছে যে অতি অল্প অবস্থায়ই তাহা লাভ করা যাইতে পারে।

আমি জানি, অনেকে ইহার উলটা কথা বলেন। সমুদ্রে স্নান করিলে নাকি তাঁহাদের গা চট্‌চট্‌ করে আর চুলে নাকে মুখে কানে বালি ঢোকে, কাজেই সমুদ্রে স্নান সারিয়া আবার ঘরে আসিয়া তাঁহাদের পরিষ্কার জলে গা ধুইতে হয়। হইতে পারে, কিন্তু আমি ওরূপ কোনো অসুবিধা ভোগ করি নাই, আর তাঁহাদের কেন যে ওরূপ হয়, তাহারও একটি ভিন্ন অন্য কারণ খুঁজিয়া পাই নাই। সে কারণটি এই। অনেকে হয়তো সাঁতার জানেন না, অথবা জানিলেও হয়তো তাঁহারা খুব সতর্ক লোক, অধিক জলে নামিতে ইচ্ছা করেন না। ইঁহারা যেখানে কোমর জলের বেশি হয় না, এইরূপ জায়গায় দাঁড়াইয়া স্নান করেন। ঢেউ যখন আসে, তখন ওখানে ঐ পরিমাণ জল হয় ; কিন্তু ঢেউ চলিয়া সে স্থান একেবারেই শুকাইয়া যায়। এরূপ করাতে আশংকার কারণ খুবই কম ; কারণ কোমর জলে যে ডুবিয়া মরিবে, তাহার ডাঙাতেই আর ভরসা কি ? আমি অনেককে ঐরূপ করিতে দেখিয়াছি, আর তাঁহাদের দুর্দশাও দেখিয়াছি। ঢেউ আসিয়া অনেক দূর অবধি ডুবাইয়া ফেলিল, আবার হটিয়া গিয়া অনেকটা স্থান খালি করিয়া দিল। তখন ঐ খালি জায়গায় গিয়া একজন দাঁড়াইলেন। সে সময়ে তাঁহার চেহারা ঠিক পালোয়ানের মতন। ঢেউ আসিয়া উপস্থিত! তাহার ফলে মুহূর্তের মধ্যে সেই চেহারা আগে খুব ওস্তাদ বাজি-করের মতন, তারপরে উলটান কচ্ছপের মতন হইয়া গেল! ঢেউ ততক্ষণে চলিয়া গিয়াছে, আর স্নানের সখও একপ্রকার মিটিয়াছে ; এখন এই সুযোগে ডাঙায় উঠিয়া আসিতে পারিলে হয়। কিন্তু উঠিবার চেষ্টায় কচ্ছপের অবস্থা হইতে প্রথমে ব্যাঙের, তারপর হাতির অবস্থায় আসিতে না আসিতেই পিছন

হইতে আর-এক ঢেউ আসিয়া তাঁহাকে আগে কুমিরের মতন করিয়া ফেলিল, শেষে কলাগাছের মতন করিয়া কূলের কাছে রাখিয়া গেল। সেখান হইতে নিতান্ত ঝড়ের কাকের মতন অবস্থায় ডাঙ্গায় উঠিয়া আসিলেন। বাড়ি আসিয়া ইঁহার কয় কলসী পরিষ্কার জলের দরকার হইয়াছিল, তাহা জানি না। যাহা হউক, তাহাতে নাকের মুখের আর কানের বালি অনেক পরিমাণ দূর হইলেও, আর চুলের বালি খানিকটা কমিলেও পেটের ভিতরে যে বালি ঢুকিয়াছিল, তাহার যে কিছুই হয় নাই, এ কথা নিশ্চয়। বিচারে যত দোষ, সব অবশ্য ঐ সমুদ্র স্নানেরই সাব্যস্ত হইয়াছিল! ডাঙ্গার কাছের ঘোলাজল আর বালিতে যাহারা স্নান করে, তাহাদের কতকটা এইরূপ দশা হয়। ভিতরকার জল পরিষ্কার, সেখানে স্নান করিলে এ-সকল অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। যাহা হউক, এ কথা স্বীকার করিতে হয়, যে ধারের বালিতে লুট্‌পাট্‌ হওয়ার ভিতরেও অনেককে যথেষ্ট আমোদ পাইতে দেখিয়াছি। যাঁহার বর্ণনা উপরে দেওয়া হইয়াছে, তিনি ঐ দুর্দশার ভিতরেও প্রাণ খুলিয়া হাসিয়াছিলেন।

৫

আমি বলিতেছিলাম যে সমুদ্র স্নান করিতে গেলে প্রায় সকলকেই বিশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয় ; অথচ অনেকে সেই লাঞ্ছনার ভিতরেই ভারি একটা আমোদ অনুভব করেন। ইহা শুনিয়া অনেকের হয়তো সেই জর্মান সৈনিক পুরুষের কথা মনে পড়িবে। একজন সৈনিকের একশত বেতের হুকুম হইল। বেত খাইবার সময় কোথায় সে চ্যাঁচাইবে, না, তাহার হাসি আর থামেই না! সকলে জিজ্ঞাসা করিল, 'হইয়াছে কি ? এত হাসিস কেন?' সৈনিক আরো হাসিতে হাসিতে উত্তর করিল, 'আরে আমি নয়! যে বেত খাইবে. সে অন্য লোক!'

ইহাতে প্রমাণ হয়, যে সুখ-দুঃখ অনেকটা মেজাজের উপরে নির্ভর করে। আমি এমন বলিতেছি না, যে বেত খাইলেও আমাদিগকে হাসিতে হইবে। কিন্তু এ কথা ঠিক, যে হাঁড়িমুখো লোকের ভাগ্যে সুখ বেশি জোটে না। যাক, এখন আবার সমুদ্রের কথা বলি। সমুদ্রের জল আর হাওয়া উভয়ই স্বাস্থ্যকর। জলে লবণ প্রভৃতি জিনিস থাকে, আর ক্রমাগত নাড়াচাড়া পাইয়া তাহার সঙ্গে বায়ু অধিক পরিমাণে মিশিতে পায়। সেখানকার বায়ুও খুব পরিষ্কার, আর তাহাতে ওজোনের (ozone) ভাগ বেশি। অক্সিজেন ঘন হইয়া ওজোন উৎপন্ন হয় ; উহা খুব স্বাস্থ্যকর। তারপর সমুদ্রের ধারে রৌদ্রের গুণও একটু বিশেষরকম দেখা যায়। তাহা খুব উজ্জ্বল, কিন্তু তত গরম নয়। ইহাতেও শরীরের উপকার আছে। এ-সকলের ফল পাইতে হইলে সমুদ্রের জলে স্নান করা, আর সমুদ্রের হাওয়া খাওয়ার দরকার। সমুদ্রের ধারের বাড়িতে বাস করা, দুবেলা সমুদ্রের ধারে বেড়ানো, সমুদ্রের ধারের বালিতে বসিয়া থাকা, এ-সকলের দ্বারা খুব উৎকট রোগও সারিতে দেখা যায়।

বাড়ীটি কিন্তু যতদূর সম্ভব, সমুদ্রের কাছে হওয়া চাই। সমুদ্রের উপর দিয়া যে স্বাস্থ্যকর বায়ু বহিয়া আসে, তাহা সমুদ্রের কূল ছাড়িয়া বেশি দূরে যায় না। সমুদ্রের কূল হইতে খানিক দূরে গিয়াই এই হাওয়া ক্রমে থামিয়া যায়, আর সেইখান হইতেই জ্বর জারির মুল্লুক আরম্ভ হয়। পুরীতে এবিষয়ে খুব অসুবিধা। সমুদ্রের ধারে সেখানে বেশি বাড়ি নাই, যাহা আছে তাহার অতি অল্পই দেশী লোকেরা পায়। যাহা হউক, দু-একটা সুন্দর বাড়ি দেশী লোকদের জন্যও আছে। আর ডাকবাঙ্গালা তো আছেই ; তাহার কুয়ার জলও অতি চমৎকার।

সেখানে কুয়ার জলই খাইতে হয়। সমুদ্রের জল লোনা। সে জল খাইতে তো বিশ্রী লাগেই, খাইলে গা বমিবমি করে, পেটের অসুখও হয়। যদি বেশি করিয়া ক্রমাগত খায়, তবে গলা ফুলিয়া যায়, আর আরো কত অসুখ হয়, তাহা আমি জানি না।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সেখানকার ডাকবাঙ্গালার কুয়াটি সমুদ্রের খুব কাছে, সমুদ্রের ধারের বালির উপরেই খোঁড়া হইয়াছে, অথচ তাহার জল লোনা হওয়া দূরে থাকুক, তেমন পরিষ্কার মিষ্ট জল পুরীর আর কোনো কুয়াতে নাই!

ডাকবাঙ্গালার জায়গাটি অতি সুন্দর। বাঙ্গালাটি সমুদ্রের বালির উপরেই, তাহার বারান্দায় বসিয়াই সমুদ্রের সৌন্দর্য উপভোগ করা যায়।

সমুদ্রের সৌন্দর্যের কথা আর একটু বেশি করিয়া না বলিলে হয়তো অনেকেরই রাগ হইবে, আর আমারও ভালো লাগিবে না। সমুদ্রের অনেক ব্যাপার অতি সুন্দর ; দেখিলে আমোদও হয়, শিক্ষাও হয়, চোখের তৃপ্তি তো আছেই। সমুদ্রের সাধারণ দৃশ্য সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত, জীবজন্তু প্রভৃতি সকলের কথাই বলা আবশ্যক।

যাহারা আর কখনো সমুদ্র দেখে নাই, তাহারা প্রথমে সমুদ্র দেখিয়া অনেক সময় নিরাশ হয়। তাহারা মনে করিয়াছিল, আরো ঢের বড় দেখিব। সমুদ্রটা ঘরের মেঝের মতন সমান নহে, কচ্ছপের পিঠের মতন ঢিপিপানা। তাহার মাঝখানটা উঁচু হইয়া পিছনের অংশকে আড়াল করিয়া দেয়। তোমরা হয়তো বলিবে, 'ইহাতো অতি সহজ কথা, আমরা সকলেই জানি।' তোমরা যে অনেক কথা জানো তাহাতে আমি কোনোরূপ সন্দেহ উপস্থিত করিতে যাইতেছি না। তোমাদের মতন থাকিতে আমরাই কি আর কম জানিতাম। 'গ্রামের ইজ্ দি ডিস্‌পিক্‌শন অফ্ দি আর্থ', 'কমলালেবুর দক্ষিণে ২৭ মাইল চাপা' ; 'জাহাজ সমুদ্রে যেতে ডুবে যায় ; কোমর জলে খানিক ডোবে, মাঝারি জলে মাঝারি ডোবে, বেশি জলে মাস্তুল অবধি ডোবে' এ-সব আমাদের ছেলেবেলায়ও ছিল। তবে, এখন নাকি আমাদের অনেক বয়স হইয়া গিয়াছে, তাই অত কথা আর চট্ করিয়া মনে পড়ে না। একদিন সমুদ্রের ধারে গিয়া দেখি যে জেলেরা ডোঙ্গায় চড়িয়া অনেক দূরে মাছ ধরিতেছে। এ ডোঙ্গা কিন্তু আমাদের দেশের ডোঙ্গার মতন নয় অর্থাৎ তাহা ডোঙ্গাই নয়। বাঁকা বাঁকা তিন-চার খানা আস্ত কাঠ জলে ভাসে। এই ক'খানাকে দড়ি দিয়া বাঁধিলে হাতের অঞ্জলির মতন হয়,

তাহার নাম 'কাটামারণ' ; তাহাতেই চড়িয়া ওখানকার জেলেরা সমুদ্রে মাছ ধরিতে যায়। তাহার কথা পরে বলিব। এখন যাহা বলিতেছিলাম শুন। কাটা-মারণে চড়িয়া জেলেরা অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছে। ডাঙগার উপর হইতে দেখিলাম যে উহাদের অনেক পিছনেও সমুদ্র দেখা যায়। তারপর ডাঙগা হইতে নামিয়া জলের কাছে গেলাম ; তখন দেখি যে সেই কাটামারণগুলির পিছনে আর সমুদ্রের ততখানি দেখা যায় না। তখন আমার সেই পুস্তকে পড়া বিদ্যার কথা মনে হইল। যাহা মুখস্থ করিয়া রাখা গিয়াছিল, এতদিনে তাহা হাতে-কলমে দেখা গেল। দেখিয়া আমার মনে হইল যে, জাহাজ আসিবার সময় কেমন হয় দেখিতে হইবে। ইহার কিছুদিন পরেই একটা জাহাজ আসিল ; কিন্তু দুঃখের বিষয় সেটা সকালবেলায় পূর্বদিক হইতে আসাতে তাহাকে ভালো করিয়া দেখিবার সুবিধা পাই নাই। সমুদ্রের সেই অংশটা তখন সূর্যের আলোকে এমনি ঝক্‌ঝক্ করিতেছিল যে, সেদিকে ভালো করিয়া তাকানো গেল না। যাইবার সময় সেটা আমাকে ফাঁকি দিয়া রাত্রিতে চলিয়া গেল।

পুরীর কাছে সমুদ্র একটুও গভীর নহে, তাই জাহাজ সেখানে কূলের কাছে ভিড়িতে পায় না, প্রায় আধ মাইল দূরে থাকে। জিনিসপত্র নৌকায় করিয়া তুলিয়া দিতে হয়, সে-সকল নৌকায় দড়ির গাঁথুনি। লোনা জলে লোহা দুদিনেই মরিচা ধরিয়া ভাঙিগয়া যায় ; সুতরাং নৌকার তক্তা জুড়িতে লোহা ব্যবহার হয় না। এই-সকল নৌকায় করিয়া সমস্ত দিন ধরিয়া জাহাজে চাউল বোঝাই হইয়াছিল ; আর কোনো জিনিস উঠিতে দেখি নাই। জাহাজ হইতে কোনো জিনিস সেখানে নামেও নাই।

সমুদ্রের রঙ অতি সুন্দর। তাহা যে জমকালো তাহা নহে, কিন্তু যারপর-নাই কোমল এবং সুন্দর। দেখিলে নীল রঙের কোনো দামী পাথরের কথা মনে হয়। বড়-বড় ঢেউগুলির পিঠে আসমানী রঙ, কোলে সবুজ রঙ, তাহাতে সাদা ফেনাগুলি যে কি সুন্দর দেখায় তাহা কি বলিব। লম্বা-লম্বা ঢেউগুলি যখন গড়াইয়া তীরের দিকে আসিতে থাকে, তখন তাহাদের নৃত্যের সঙেগ সঙেগ সেই ফেনাগুলি ফুলের মালার মতন দুলিতে থাকে।

এইরূপ রঙ প্রায় দুপুরবেলায়ই বেশি দেখা যায়। সকালে বিকালে আকাশের রঙ অন্যরূপ থাকে, তখন সমুদ্রের রঙও অন্যরূপ হয়। সে-সব রঙ দেখিতে আরো সুন্দর। কিন্তু আমি যদি এখানে তাহার বর্ণনা করিতে বসি, তবে অনর্থক পুঁথি বাড়িয়া যাইবে, অথচ যাহা চোখে দেখিবার ব্যাপার, মুখে বকিয়া তাহার কিছুই বুঝাইতে পারিব না।

সকালে বিকালে সকলের চাইতে দেখিবার জিনিস সূর্যোদয় আর সূর্যাস্ত। বৎসরের মধ্যে কয়েকমাস পুরীতে এই দুইটিই দেখিতে পাওয়া যায়। খুব ভোরে উঠিতে হয়। তখনো সূর্য উঠে নাই, পূর্বদিকে একটু ঝিকিমিকি দেখা দিয়াছে মাত্র। সে দিকটা ক্রমেই উজ্জ্বল হইতেছে, আর মনটাও তেমনি উৎসুক হইয়া উঠিতেছে—খালি 'কখন উঠিবে' 'কখন উঠিবে' এই ভাব। সে যেন আর উঠিতেই চায় না! শেষে একবার চট্ করিয়া একটুখানি আগুনের কণার মতো দেখা দিল। তখন তাহার চেহারা আমওয়ালা চাখিতে দিবার জন্য ছুরির আগায় করিয়া যে টুকরা বাহির করে সেইরূপ। ঢেউগুলি যেন তাহাকে লইয়া

লুফালুফি করিতে থাকে। ক্রমে কণার মতন, পুলির মতন, গম্বুজের মতন হইয়া শেষে হাঁড়ির মতন হইয়া যায়। উপরের দিকটা গোল, তারপর খানিকটা একটু সরু হইয়া তলার দিকটা আবার চওড়া। শেষটা একবার ঝাঁ করিয়া জল হইতে আলগা হইয়া যায়।

সূর্যোদয়ের ন্যায় সূর্যাস্তও দেখিতে খুব সুন্দর। তখনকার আকাশের রঙ প্রায়ই বেশি জমকাল হয়। চন্দ্রের উদয় অস্তও এইরূপ। তবে চাঁদের আলো কম, সুতরাং তাহার উদয় অস্ত তেমন উজ্জ্বল হয় না।

কিন্তু পূর্ণিমার সময় চাঁদের আলোতে সমুদ্রের এমন একটা স্নিগ্ধ সৌন্দর্য হয় যে অনেকের নিকট তাহাই সর্বাপেক্ষা সুন্দর লাগে।

এ-সব তো গেল আলোকের কথা। অন্ধকারের সময় সমুদ্র দেখিতে কেমন সুন্দর, এ কথা শুনিয়া কেহ হাসিবেন না। খুব অন্ধকার রাত্রিতে সমুদ্রের জলে একপ্রকার আলোক দেখা যায়। অবশ্য উহা হইতে প্রদীপের আলোর ন্যায় আলো বাহির হয় না ; খালি জলে একরকম ঝিকিমিকি মাত্র দেখা যায়। ঢেউ ভাঙিবার সময় মনে হয় যেন অসংখ্য জোনাকী জলের উপর ছড়াইয়া পড়িতেছে। আমি দেখিতে পাই নাই, কিন্তু যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা বলেন যে, তাহা ভারি সুন্দর। সমুদ্রের জলে নাকি একরকম জীবাণু আছে, তাহা নাড়া পাইলে উজ্জ্বল হইয়া উঠে। এই জীবাণু ঐরূপ আলোকের কারণ।

জীবাণুর কথায় জীবজন্তুর কথা সহজেই মনে হইতে পারে ; সুতরাং এখন তাহার কথা বলাই সংগত মনে হইতেছে।

সমুদ্রের জীব বলিলেই সকলের আগে আমার কাঁকড়ার কথা মনে হয়। তারপর শামুক ঝিনুকের কথা, তারপর মাছের কথা ও যাহারা মাছ ধরে তাহাদের কথা।

কাঁকড়া আর শামুক ঝিনুকের কথা আগে মনে হইবার কারণ এই যে, সমুদ্রের ধারে গেলেই ঐগুলিকে দেখিতে পাওয়া যায়। সমুদ্রের ধারে বেড়াইবার অর্ধেক আমোদ উহাদিগকে লইয়া। দুঃখের বিষয় অন্য অনেক স্থানে যেমন নানারকমের সুন্দর-সুন্দর শামুক ঝিনুক পাওয়া যায়, পুরীতে তেমন নাই। তথাপি যাহা আছে তাহার মতন সুন্দর শামুক ঝিনুক আমাদের দেশে পাওয়া যায় না। সে-সকল ঝিনুকের এমন সুন্দর রঙ আর এমন সুন্দর গড়ন যে দেখিলেই কুড়াইতে ইচ্ছা করে। আমরা অনেক ঝিনুক কুড়াইয়াছিলাম।

কাঁকড়ার কথা আর কি বলিব! এমন সরেস জন্তু আর যে খুব বেশি আছে এ কথা আমি বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহি। সমুদ্রের ধারের বালিতে প্রথমে তাহাদের পায়ের দাগ দেখিতে পাই। একটা ছোট গোলার গায় লম্বা-লম্বা কাঁটা বিঁধাইয়া সেই কাঁটাসুদ্ধ গোলাটাকে গড়াইয়া দিলে যেমন দাগ পড়িতে পারে, সেইরূপ দাগ। একটা দুটা নয়, অসংখ্য। যেদিকে চাও খালি ঐরূপ দাগ। আমি তো অবাক হইয়া গেলাম। এরূপ অদ্ভুত চিহ্ন কিসের হইতে পারে, তাহা আমার মাথায়ই আসিল না। খানিক অগ্রসর হইয়া দেখিলাম যে, এইরূপ এক-সার দাগ একটা গর্তের কাছে গিয়া উপস্থিত হইয়াছে, আর গর্তের মালিকও দরজায় বসিয়া আছে। কিন্তু আমাকে দেখিয়া সে বেচারা এত তাড়াতাড়ি গর্তের

ভিতর ঢুকিয়া গেল যে, আমি ভালো করিয়া তাহার পরিচয়ই লইতে পারিলাম না।

আমি প্রথমে মনে করিয়াছিলাম বুঝি মাকড়সা। আকারে একটা মাঝারি মাকড়সার চাইতে বেশি বড় হইবে না, আর রঙটাও কতকটা সেইরকমের। সে যে কাকড়া, তাহা আমার আদবেই মনে হয় নাই, কারণ কাকড়া এমন ছুটিতে পারে তাহা আমি জানিতাম না। যাহা হউক আমার ভ্রম দূর হইতে বেশি সময় লাগিল না। কারণ উহার আশেপাশে ঐরূপ আরো অনেক গর্ত ছিল, আর প্রায় অনেক গর্তের দরজায় এক-একটি ছোট্ট কাকড়াও বসিয়াছিল। উহারা যে কিরূপ বিস্ময় এবং কৌতূহলের সহিত আমাকে দেখিতেছিল তাহা না দেখিলে বুঝিতে পারিবে না। কাঁকড়ার মুখশ্রীতে বিস্ময় কৌতূহল প্রভৃতি ভাবপ্রকাশ পাওয়া সম্ভব নহে, এ কথা তোমরা বলিবার পূর্বেই আমি স্বীকার করিতেছি। তথাপি ঐ সময়ে উহাদের নিতান্তই কৌতূহল হইয়াছিল, এ কথা আমি নিশ্চয় বলিতে পারি। উহাদের অনেকেই আমাকে দেখিবার জন্য গর্ত ছাড়িয়া খানিক অগ্রসর হইয়া আসিয়াছিল, আর আমি একটু নড়িলে চড়িলে উহারাও তাহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

কাঁকড়ার চেহারা দেখিলে আমার ভারি হাসি পায়। প্রথমত উহার চক্ষু দুটি। এক-একটি চোখ এক-একটি বোঁটার আগায় বসান। ঐরূপ দুই চক্ষু দিয়া যখন সে তোমার দিকে তাকাইবে, তখন তোমার মনে হইবে যেন তোমাকে ভালো করিয়া দেখিবার জন্য সে দূরবীন লাগাইয়াছে। ভয়, বিস্ময় বা কৌতূহল হইলে চোখ কেমন বড় হইয়া উঠে দেখিয়াছ? হঠাৎ দেখিলে মনে হয়, যেন চোখ দুটি একটু বাহির হইয়া আসিয়াছে। বোধ হয়, এইজন্যই কাঁকড়ার চেহারায় এতটা কৌতূহলের ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার পর উহার দুটি গোদা হাত, অর্থাৎ দাঁড়া। আমি যে কাঁকড়াগুলির কথা বলিতেছি, তাহাদের আবার একটি দাঁড়া আর একটির চাইতে ঢের বড়। কাহারো ডাইনেরটি বড় কাহারো বামেরটি বড়। বেশি ভারী কাজ হইলে বড় দাঁড়াটি ব্যবহার করে। ছোটটি হালকা কাজের জন্য। কাঁকড়ার মুখ তাহার বুকের কাছে, দাঁড়ায় করিয়া তাহাতে খাবার তুলিয়া দেয়। আমরা যেমন করিয়া হাঁ করি, কাঁকড়া তাহা করে না ; তাহার ঠোঁট আলমারীর দরজার মতন পাশাপাশি খোলে।

বালির উপরে কত কাঁকড়ার গর্ত যে রহিয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। কাছে গেলেই উহারা ভয় পাইয়া গর্তের ভিতরে চলিয়া যায়। কিন্তু যদি কোনোরূপ গোলমাল না করিয়া চুপচাপ বসিয়া থাক, তাহা হইলে খানিক পরেই উহারা আবার বাহিরে আসিবে। গর্তটিকে পরিষ্কার রাখা উহাদের এক প্রধান কাজ। সকলের গর্তের সামনেই খানিকটা নূতন মাটি দেখিতে পাইবে। হয়তো তোমার চোখের সামনেই আবার খানিকটা মাটি আনিয়া উহার উপরে ফেলিবে। দুহাতে সাপটিয়া ধরিয়া গর্তের ভিতর হইতে মাটি লইয়া আসে। দরজার বাহিরে আসিয়াই তাহা ছুঁড়িয়া দূরে ফেলিয়া দেয়। কাঁকড়ার পক্ষে অনেকখানি দূরেই ফেলে বলিতে হইবে। মাকড়সার মতন বড় কাঁকড়াটি মটরের মতন বড় একরাশ

মাটি প্রায় ছয় ইঞ্চি দূরে ফেলিতে পারে। মনোযোগ দিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, মাটি ছুঁড়িয়া ফেলিবার সময় বড় দাঁড়াটিকেই বেশি ব্যবহার করে।

গর্তের সামনে কোনো-একটি ছোট জিনিস ছুঁড়িয়া ফেলিলে কাঁকড়া তাড়াতাড়ি তাহার কাছে ছুটিয়া আসে। তারপর বেশ করিয়া সে জিনিসটিকে হাত বুলাইয়া দেখে ; পছন্দ হইলে তাহাকে তুলিয়া মুখে দেয়। একদিন আমি লম্বা সুতায় রুটির টুকরা বাঁধিয়া দিয়াছিলাম। একটা কাকড়া আসিয়া সেটাকে পরীক্ষা করিলে, তারপর তাহাকে টানিয়া গর্তের ভিতরে লইয়া গেল। গর্তটা বেশ গভীর ছিল ; প্রায় সওয়াফুট সুতা ট্যারছাভাবে ভিতরে ঢুকিয়া গেল তারপর আমি সুতা ধরিয়া টানিলাম। সহজ টানে কি তাহা বাহির হয়! কাঁকড়াটা বোধ হয় কিছুতেই রুটিটুকুকে ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত ছিল না ; তাই সে যতক্ষণ পারিল প্রাণপণে তাহাকে আঁকড়িয়া ধরিয়া রাখিল। শেষে অগত্যা রুটির সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে আসিয়া উপস্থিত! তখনো সে তাহা ছাড়ে নাই। ঐটুকু খাদ্যের মায়ায় সে এতটা ভুলিয়া গিয়াছিল যে, এদিকে আমি যে তাহাকে একেবারে আমার কাছে টানিয়া আনিয়াছি তাহা সে যেন বুঝিতেই পারে নাই। অবশেষে হঠাৎ একবার যখন রুটির সঙ্গে সঙ্গে সে শূন্যে ঝুলিতে লাগিল, তখন তাহার চৈতন্য হইল। এবারে রুটি ছাড়িয়া দিয়া যে গর্তের ভিতরে ঢুকিল শত প্রলোভনেও আর সে বাহিরে আসিল না।

ইহারা কেমন ছোটে, তাহা আগেই বলিয়াছি। ভালোমানুষের মতন সোজা-সুজি সামনের দিকে যে চলে তাহা নহে, সে চলিবে পাশাপাশি—দেখিলেই তাড়া করিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু তাড়া করিতে গেলে দেখা যায় যে তাহাকে ধরা কাজটি বড় সহজ নহে। তুমি খুব চট্‌পটে শয়তানগোছের লোক হইলে অবশ্য শেষে তাহাকে ধরিতে পার, কিন্তু তাহার পূর্বে সে তোমাকে একশো ফাঁকি দিয়া হাজার ঘুরপাক খাওয়াইয়া তবে ছাড়িবে।

এই জাতীয় কাঁকড়া যেমন ছুটিতে পারে, তেমনি আবার এমন কাঁকড়াও আছে যে তাহারা ছুটিবে দূরে থাকুক, শুকনো মাটিতে চলিতেই পারে না। একদিন সমুদ্রের ধারে গিয়া দেখি যে ইঁহাদের একজন চিৎপাত হইয়া পড়িয়া আছেন। দেখিতে বেশ গাঁট্টা-গোঁট্টা জোয়ান কাঁটালের মতন কাঁটাওয়ালা খোলা পরিয়া সঙিগন সিপাই সাজা হইয়াছে। কিন্তু এদিকে দুরবস্থার এক-শেষ। কখন কে চিৎ করিয়া রাখিয়া গিয়াছে তদবধি সেইভাবেই রহিয়াছেন ; সোজা হইবার শক্তিটুকু নাই। দেখিয়া আমার হাসিও পাইল, দয়াও হইল। চেহারাটি আবার অতিশয় উৎকট, গায় হাত দিতে ভরসা হয় না। সুতরাং আমি ছাতার আগা দিয়াই উলটাইয়া দিলাম। কিন্তু খালি উলটাইয়া দিলে কি হইবে, যদি হাঁটিবার ক্ষমতা না থাকে। নৌকার দাঁড়ের মতন কখানি পা ; তাহাতে সাঁতার কাটিবার পক্ষে যতই সুবিধা হউক, ডাঙ্গায় চলার কাজ একেবারেই চলে না। দুই পা না যাইতে যাইতেই আবার ডিগবাজি খাইয়া যেই চিৎ সেই চিৎ। ইহার পরে ঐরূপ আরো অনেক কাঁকড়া জেলেদের জালে ধরা পড়িতে দেখিয়াছি, এ কাঁকড়া কেহ খায় না, সুতরাং জেলেরা এগুলিকে ফেলিয়া দেয়।

যেটাকে যেখানে ফেলে, সেটা আর সেখান হইতে দূরে যাইতে পারে না। কারণ হাঁটিতে গেলেই উলটাইয়া যায়, আর সেইভাবেই তাহাকে পড়িয়া থাকিতে হয়। জালে আর এক রকম কাঁকড়া ধরা পড়ে, তাহার স্বভাব একটু আশ্চর্যরকমের। এই কাঁকড়ার খোলা নাই, অথচ খোলা না থাকিলে কাঁকড়ার বাঁচিয়া থাকাই ভার হয়। তাই সে বিস্তর বুদ্ধি খরচ করিয়া বেশ এক ফন্দি ঠাওরাইয়াছে। সমুদ্রে শঙ্খ শামুক ইত্যাদির খালি খোলার অভাব নাই। এই কাঁকড়া এইরূপ একটা খালি খোলার ভিতরে ঢুকিয়া থাকে। নরম শরীরটির সমস্তই খোলার ভিতরে ; কেবল হাত পাগুলি বাহিরে থাকে, তাহাও ইচ্ছা করিলেই গুটাইয়া লইতে পারে। এইরূপে পরের খোলা পরিয়া ইহারা জীবন কাটাইয়া দেয়, চলাফেরা সমস্তই ঐ খোলাসমেত হইয়া থাকে। যেন সেটা তার নিজেরই খোলা। আমি এইরূপ যতগুলি কাঁকড়া দেখিয়াছি, তাহাদের সকলেই লম্বা-লম্বা কাঁটাওয়ালা একরকম ছোট শঙ্খের ভিতরে ছিল। কাঁটা থাকায় অন্য কোনো জন্তু আসিয়া খপ্ করিয়া তাহাদিগকে গিলিয়া ফেলিবার ভয় ছিল না। এই কাঁকড়ার নাম সন্ন্যাসী কাঁকড়া (Hermit crab)।

জালের আর কাঁকড়ার কথা যখন উঠিয়াছে, তখন মাছের কথাও উঠিবে। মাছ সেখানে সমুদ্রেও ধরা হয়, আর নদী বিল পুকুর ইত্যাদিতেও ধরা হয়। তাহাকে বলে 'ম-ধু-র' মাছ। ('মধুর' পড়িও না। 'ম-ধু-র'। উড়িষ্যার সব কথাই 'কটক বড় মড়ক'-এর মতন করিয়া উচ্চারণ করিতে হয়, হসন্তের ব্যবহার সে দেশে প্রায় নাই।) ইহা ছাড়া চিল্কা হ্রদ হইতেও মাছ আসে। নদী প্রভৃতিতে আমাদের দেশের সাধারণ মাছের মতন মাছই থাকে, তাহার কথা আর বেশি করিয়া কি বলিব। চিল্কার মাছের চেহারাও অনেকটা এইরূপ সুতরাং সমুদ্রের মাছের কথাই আজ বলা যাউক।

সমুদ্রের মাছের নাম শুনিয়াই হয়তো তোমরা ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছ। মনটাকে হয়তো কত বড়-বড় জিনিসের জন্য প্রস্তুত করিয়া লইতেছ। সমুদ্রের বড়-বড় জন্তু অনেক আছে, তাহাতে আর ভুল কি? দুটা একটা তিমি যে বঙ্গোপসাগরে না দেখা যায় এমন নহে ; তাহার প্রমাণ তো জাদুঘরে গেলেই দেখা যায়। কিন্তু আমি এখানে পুঁথি খুলিয়া গল্প ফাঁদিতে বসি নাই, যাহা দেখিয়াছি তাহাই বলিতে যাইতেছি, সুতরাং 'সমুদ্রের সাপ' (Sea Serpent) তিমি প্রভৃতির কথা বলার অবসর আমার হইবে না। আমি যে সমুদ্রের সাপ দেখিয়াছি, তাহা সাড়ে তিন হাতের অধিক লম্বা হইবে না। দেখিতে কতকটা ঢোঁড়া সাপের মতো। গায়ে ডুমোডুমো দাগ আছে, ল্যাজটা চ্যাটাল। এইরূপ একটা সাপ সমুদ্রের ধারে মরিয়া পড়িয়াছিল। সমুদ্রের সাপগুলির ল্যাজ প্রায়ই চ্যাটাল হয়, তাহাতে সাঁতরাইবার খুব সুবিধা। যা হউক আমি মাছের কথাই এখন বলিব। তবে মাছ শব্দটা এখানে একটু খোলাভাবেই ব্যবহার হইতেছে। এরূপ অনেক জানোয়ার যে তাহাদের চৌদ্দ পুরুষের কেহ মাছের ধার ধারে নাই, অথচ তাহারা 'মাছ'। যেমন জেলী মাছ, চিংড়ি মাছ, কট্ল্ মাছ ইত্যাদি। ইহাদের কেহ শামুক, কেহ পোকা, আর কেহ কেঁকি তাহা এক কথায় বলা

ভারি মুশকিল। যাহা হউক লোকে উহাদিগকে মাছই বলে, সুতরাং আমিও তাহাই সুবিধাজনক মনে করিতেছি।

সমুদ্রের মাছ হইলেই যে আমাদের দেশী মাছের চাইতে অনেক ভিন্ন হইবে এমন কোনো কথা নাই। তাহার প্রমাণ এই যে, ইলিশ মাছ সমুদ্রেরই মাছ, সেখান হইতে নদীর ভিতর দিয়া এখানে আইসে। চাঁদা মাছ, ফ্যাঁসা মাছ, চ্যালা মাছ প্রভৃতি সমুদ্রে বিস্তর আছে। বাস্তবিক এইরূপ ঝক্‌ঝকে রুপোলি রঙের মাছই সেখানে বেশী দেখিলাম। এই-সকল মাছ এক-এক দিন জাল বোঝাই হইয়া উঠিতে দেখিয়াছি। রুই, কাতলা জাতীয় মাছ দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

যত মাছ দেখিয়াছি দুঃখের বিষয় তাহার সবকটার নাম শিখিয়া আসিতে পারি নাই। চ্যালার নাম 'খণ্ড বানিয়া', তাহার এক-একটা প্রায় একফুট লম্বা হয়। খাইতে নেহাত মন্দ নহে, কিন্তু বাপ্‌ রে! তাহাতে কাঁটা, কি কাঁটা! 'কো-কি-র' খয়রা মাছের মতন। পিঠের রঙ কাল্‌চে। খাইতে বেশ। 'চাঁদি' হচ্ছে চাঁদা। ইহা সমুদ্রের এক উৎকৃষ্ট মাছ। চাঁদির অনেক প্রকার ভেদ আছে। ছোট, বড়, সাদা, পাঁশুটে সকলরকম চাঁদিই খাইতে ভালো, তবে বড়গুলিরই প্রশংসা বেশি। একরকম ছোট-ছোট চাঁদি আছে, সে যে দেখিতে কি সুন্দর তাহা কি বলিব! রঙটি যেন ঠিক মুক্তার মতন, আর দেখিতে এত কোমল এবং পরিষ্কার যে মনে হয়, যেন তাহাকে অমনি খাওয়া যাইবে। উহার ঝোল চমৎকার লাগিত। সমুদ্রের বেলে মাছের নাম 'মেইলা'। ইহার গায়ের চেহারা বেলের মতো ; ইহার পেটের ভিতরটি পরিষ্কার, কিন্তু মুখ ছুঁচল আর দাড়ি গোঁফ একেবারেই নাই। 'বোঁদ' মাছ বলিয়া আর-একটা মাছ আছে, দাড়ি গোঁফ আর চেহারার জাঁকজমকে সে বেলে মাছকে পরাস্ত করিয়াছে। উজ্জ্বল হলদে রঙের পরিপাটিতে কালো কালো দাগ ; দেখিতে খুব জমকাল—আরো বড় হইলে (লম্বায় দশ ইঞ্চি আন্দাজ হইবে) ভয়ংকর বলা যাইত। এ মাছ কেহ খায় না। জেলেরা উহাকে ধরিয়া ফেলিয়া দেয়। আর একটা অখাদ্য মাছের নাম 'বে-ঙ' মাছ। এ মাছ খুব ছোট ট্যাংরা মাছের মতন। মুখের চেহারা অনেকটা ব্যাঙের মতন। চোখ উঁচু-উঁচু, রঙ হলদে, অন্ধকার রাত্রিতে নাকি এ মাছ ঝক্‌ঝক্‌ করে, আর ইহা খাইলে নাকি অসুখ করে। তারপর 'শিরোমুণ্ডী' মাছ। আমাদের চাকর বলিয়াছিল 'রসমুণ্ডী'! তাহা শুনিয়া তোমরা হয়তো ভাবিতেছ মাছটা খাইতে বুঝি বড়ই সুস্বাদ। স্বাদের কথা বলিতে পারি না, কিন্তু তাহার গন্ধের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইয়াছি। সে কিরূপ পরিচয় তাহা এ কথা বলিলেই বুঝিতে পারিবে যে ঐ মাছ কুটিয়া যে ঘটি লইয়া হাত ধুইয়াছিল, সে ঘটি আর সেদিন কেহ ব্যবহার করিতে পারে নাই, মাছ খাওয়া তো দূরের কথা।

সেদেশে হাঙগরের নাম 'ম-গ-র' (মকর)। এদেশে হাঙগরে মানুষ খায়, আর সেদেশে মানুষে হাঙগর খায়। হাঙগরও মানুষকে বাগে পাইলে তাহার 'গোড় কাটি পক্কাই'তে (পা কাটিয়া নিতে) ছাড়ে না। 'হাতুড়ে' হাঙগরের

মাথাটা ঠিক যেন একটা হাতুড়ির মতন, সেই হাতুড়ির দুই মুখে দুটি চোখ। সুখের বিষয় এই যে, বর্ষাকাল ছাড়া অন্য সময়ে বড়-বড় মানুষ-খেকো হাঙ্গর কূলের কাছে আসে না। তবে দূরে গভীর জলে যে ভয়ানক রাক্ষস সব আছে, তাহার প্রমাণ প্রায়ই পাওয়া যায়। একদিন দুপুরবেলা আমি সমুদ্রের ধারে বসিয়া আছি, এমন সময় প্রায় মাইলখানেক দূরে একটা প্রকাণ্ড মাছ লাফাইয়া উঠিল। এতদূর হইতে মাছটাকে একটা মানুষের সমান বড় দেখা যাইতেছিল। সেটা লাফাইয়া জল ছাড়িয়া প্রায় দশ হাত উঁচুতে উঠিয়াছিল। ইহা দেখিয়া আমার মনে হইল, যে না জানি কতদূর বেগের সহিত সে ছুটিয়াছিল, যাহাতে এমন ভয়ানক লাফ দিতে পারিয়াছে। আর যাহার তাড়ায় এমন অসম্ভব বেগে ছুটিয়াছিল, সেটা না জানি কিরূপ ভয়ানক জানোয়ার।

আর একটা মাছ আছে তাহার নাম 'শাকস্' মাছ। ইহার চেহারা ভারি অদ্ভুত। শরীরটি রুইতনের টেক্কার মতন। তাহার দুই কান হাতির কানের মতন পাতলা। আর এক কোণে ছোট-ছোট দুটি চোখ, আর এক কোণে চাবুকের মতন লম্বা কাঁটাওয়ালা এক লেজ। ঐ লেজ উহার এক ভয়ানক অস্ত্র। উহা দ্বারা অনেকে চাবুক তয়ের করে। শাকস্ মাছের মাংস নাকি বেশ সুখাদ্য।

ইংরাজিতে যাহাকে 'সোল' (sole) বলে, সেই জাতীয় মাছও সেখানে পাওয়া যায়। এই মাছের চোখ একপেশে। মাছটি চাঁদা মাছের মতন পাতলা। ছেলেবেলায় উহার দুটি চোখ দুপাশেই থাকে আর রঙ সাদা থাকে। কিন্তু ইহার ক্রমাগত বালির উপরে এক পাশে কাৎ হইয়া পড়িয়া থাকার স্বভাব হওয়াতে শেষটা নীচের পাশের চোখটি ক্রমে উপরের পাশে চলিয়া আসে। তাহা ছাড়া উপরের পাশের রঙটি ক্রমে চারিপাশের বালির রঙের মতন হইয়া যায়, কিন্তু নীচের পাশের রঙ সাদাই থাকিয়া যায়।

বোধ হয় মাছের কথা ঢের বলা হইয়াছে। এখন যাহারা মাছ নয়, অথচ মাছ বলিয়া পরিচিত হইয়া গিয়াছে, তাহাদের কথা কিছু বলা আবশ্যক।

ইহাদের মধ্যে সকলের আগে 'জেলী' মাছের (Jelly fish) আর 'তারা' মাছের (star fish) কথা বলিতে হয়। জন্তুর মধ্যে ইহারা সকলের চাইতে নিম্ন শ্রেণীর। সাধারণ লোকে ইহাদিগকে দেখিয়া কখনই বলিবে না, যে ইহারা কোনোরূপ জন্তু। বরং ইহাদের চেহারা দেখিলে হঠাৎ গাছপালার কথাই মনে হইতে পারে। যাহা হউক, ইহারা জন্তু। ইহাদের আবার নানারকম শ্রেণী-ভেদ আছে, যদিও আমি একরকম তারা মাছ সেখানে দেখিতে পাই নাই। এই মাছের চেহারা পাঁচ কোণা তারার মতন। তাহার নাক মুখের কোনোরূপ পরিচয় পাওয়া যায় ন। ইহাদের স্বভাব-চরিত্র অতিশয় আশ্চর্য। দুঃখের বিষয়, আমি তাহার কিছুই প্রত্যক্ষ করিতে পারি নাই, পুস্তকে পড়িয়াছি মাত্র। ইহারা ছোট-ছোট শামুক ঝিনুক খাইয়া জীবন ধারণ করে। পুরীতে যে তারা মাছ দেখিয়াছিলাম, তাহার ভিতরে খুব ছোট-ছোট ঝিনুকের খোলা পাইয়াছি। কিন্তু এতদ্ভিন্ন উহাদের আচার ব্যবহারের আর কোনো পরিচয় পাই নাই। এগুলি দেখিতে একটুও সুন্দর নয়। একদিকের রঙ কালো আর একদিকের

রঙ ফ্যাকাসে। মনে হয়, যেন পুরানো জুতার পচা চামড়া আর হাড়ের কুচি দিয়া তাহাকে গড়িয়াছে। কিন্তু আমি পুস্তকে পড়িয়াছি যে অতিশয় সুন্দর তারা মাছ আছে। আর তাহাদের কোনো কোনোটার এই একটা আশ্চর্য স্বভাব আছে, যে তাহারা ভয় পাইলে আত্মহত্যা করে। সমুদ্রের ভিতরে অনেক নাড়া-চাড়া সহ্য করে; কিন্তু জল হইতে তুলিলেই সে দেখিতে দেখিতে তাহার হাত-পা ফেলিয়া দেয়। তারা মাছের মাঝখানটায় তাহার মুখ থাকে; চারি-ধারের পাপড়ি অথবা ডালপালার মতন জিনিসগুলি তাহার হাত-পা। কোনো কোনোটা সাঁতরাইতে পারে, শিকার আঁকড়িয়া ধরিতেও পারে। কিন্তু কোনো কোনোটার হাত-পা নাড়িবার বেশি ক্ষমতা আছে বলিয়া বোধ হয় না। আবার চলাফেরা করিতেই পারে না, একটা বোঁটা দ্বারা কোনো জিনিসের গায়ে আটকানো থাকে, এরূপ তারা মাছও আছে।

জেলী মাছ সেখানে অনেকরকম আছে। আকারে আধুলি হইতে ঝুড়ির মতন পর্যন্ত জেলী মাছ দেখিয়াছি। ইহাদিগকে দেখিলে তালশাঁস অথবা থক্‌থকে সাগুর কথা মনে হয়। সকলগুলিরই সাধারণ আকৃতি ছাতা অথবা টুপির মতন, কোনো কোনোটা ওড়িয়া বেয়ারাদের পানের থলের মতন। আবার সকলেরই কোনোরকমের ঝালর আছে। রঙ সাদা অথবা লালচে, তাহাতে অনেক সময় সবুজ কারিকুরি থাকে। ইহারা জলে সাঁতরাইয়া বেড়ায়, আর ভয় পাইলে শরীর কোঁচকাইয়া হাত-পা গুটাইয়া (ঐ ঝালর উহাদের হাত-পা, মাঝখানে মুখ) সমুদ্রের তলায় পড়িয়া যায়। কোনো কোনোটা রাত্রিতে জ্বলে। অনেকগুলি আবার এমন আছে যে তাহা গায়ে লাগিলে ভয়ানক যন্ত্রণা হয়। এই যন্ত্রণা কতকটা বিছুটির জ্বালার মতন, কিন্তু তার চাইতে অনেক বেশি, আর ইহাতে বুকের ভিতরে কেমন একটা কষ্ট বোধ হয়। জালে পড়িয়া বিস্তর জেলী মাছ উঠে; জেলেরা জেলী মাছকে বলে 'সৎরাং'। ইহাদের ইংরাজি নাম 'জেলী ফিশ' আর 'সাগর বিছুটি' (sea nettle)। ইহাদের কোনোটা নির্দোষ আর কোনোটা বিষাক্ত, জেলেরা তাহা বেশ বুঝিতে পারে। সাধারণত তাহারা এগুলিকে দুহাতে ঘাঁটে, রাঁধিয়া নাকি খায়ও। কিন্তু একদিন একটা খুব উজ্জ্বল স্বচ্ছ আর সবুজ কারিকুরিওয়ালা জেলী মাছ দেখিয়া যেই তাহার কাছে গিয়াছি, অমনি একজন জেলে আমাকে নিষেধ করিয়া বলিল, 'বাবু, বিন্ধিব।' অবশ্য আমি আর তাহার কাছে যাই নাই। আর আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, যে উহার চেহারা আমি কখনো ভুলিব না। অতঃপর আবার তাহাকে দেখিতে পাইলে আমিও বলিতে পারিব—'বিন্ধিব'। এরপর 'কট্‌ল্‌' মাছের (cuttle fish) কথা বলি, তবেই শেষ হয়। এ মাছ যে, মাছ নয়, তাহা তো বলিয়াই রাখিয়াছি। ইহারা শামুক জাতীয় জন্তু; কিন্তু শামুকের মতন ইহাদের খোলা নাই, যদিও একটা নরম গোছের হাড় আছে। এই হাড় সমুদ্রের ধারে অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। সাদা-সাদা শশা বিচির মতন আকৃতি, কিন্তু শশা বিচির চাইতে ঢের বড়। এক ইঞ্চি হইতে আট ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হাড় সচরাচর দেখা যায়। অন্যান্য জন্তুর হাড়ের মতন ইহা

তত মজবুত নহে। কতকটা খড়ির মতন সহজেই গুঁড়া হইয়া যায়। সাধারণ লোকে যত্নপূর্বক এই হাড় কুড়াইয়া আনে, বাজারে বিক্রয়ও করে। এই হাড়ে নাকি অনেক ভালো-ভালো ঔষধ প্রস্তুত হয়। ইহার চলিত নাম 'সমুদ্রের ফেনা।' অনেকের বিশ্বাস, সমুদ্রের ফেনা জমিয়া এই জিনিস জন্মায়। আসলে অবশ্য তাহা নহে, ইহা কট্‌ল্‌ ফিশের হাড়। ইংরাজিতে এ জিনিসকে 'কট্‌ল্‌ বোন্‌' (cuttle bone) বলে।

মুকুল ঃ আশ্বিন ১৩১২

৬

সেবারে আমি সবে কট্‌ল্‌ ফিশের কথা পড়িয়াছিলাম, আর বলিয়াছিলাম, উহাতে ঔষধ হয়। ঐ হাড়ের গুঁড়া পালিসের কাজে লাগে ; অনেকে উহা দিয়া দাঁত মাজে।

জাত বিশেষে কট্‌ল্‌ ফিশ এক-একটা খুব বড় বড়ও হয়, কিন্তু আমি নিতান্ত ছোট-ছোটই দেখিয়াছি। উহাদের অবশ্য কোনোরকম দেশী নাম আছে ; দুঃখের বিষয় আমি তাহা জানি না। একটি জেলের ছেলে চার পাঁচটা কট্‌ল্‌ ফিশ হাতে করিয়া সমুদ্রের ধারে দাঁড়াইয়াছিল, তাহা দেখিয়া আমি উহার সহিত কথাবার্তা আরম্ভ করিলাম। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ওগুলো কি?' উদ্দেশ্য, নামটা শিখিয়া লই। ছেলেটি বড় ভীতু ; কেমন জড়সড় হইয়া উত্তর দিল। তাহাতে নাম যদি বলিয়াও থাকে, আমি তাহার কিছুই বুঝিতে পারি নাই। আমি খালি এই কথাটা একটু বুঝিলাম, যে সে তাহা দিয়া 'তরকারি পাকাইবে।' সবে আমার এইটুকু জ্ঞানলাভ হইয়াছে, আরো ঢের হইবে বলিয়া আশা করিতেছি, এমন সময় কোথা হইতে এক সাহেব আসিয়া আমার সব গোলমাল করিয়া দিল। সে বলে, ওটা নিতান্ত নিম্নশ্রেণীর মাছ। আমি বলিলাম ওটা মাছ নয়, শামুক জাতীয় জন্তু। সাহেব আমার সে কথায় আমলই দিল না। ততক্ষণে সেই ছোকরা কোথায় যে সরিয়া পড়িল, আর তাহাকে দেখিতে পাইলাম না।

সেই কট্‌ল্‌ মাছগুলিকে দেখিয়া আমার ছোট-ছোট শুকনো কচুগাছের কথা মনে হইয়াছিল। শরীরগুলি যেন মুখী কচু (রঙ কিন্তু ঘোর খয়েরি) আর হাত-পাগুলি যেন তাহার শুকনো ডালপালা। এক-একটার এইরূপ আটটি কি দশটি করিয়া হাত (অথবা পা, যাই বল) থাকে। আমি যাহা দেখিয়াছি, তাহার কটা হাত ছিল, গুনিবার অবসর পাই নাই ; কিন্তু উহার আকৃতি যেরূপ দেখিলাম তাহাতে বোধ হইল, যেন উহার দশ হাত। আর, দুটি হাত যেন অন্যগুলির চাইতে বেশি লম্বা বলিয়া বোধ হইয়াছিল ; ইহাও দশ হাতওয়ালা কট্‌ল্‌ ফিশের একটা লক্ষণ। কট্‌ল্‌ ফিশের বড়-বড় উজ্জ্বল দুটো চোখ, আর টিয়া পাখির মতন ঠোঁটও আছে। ঠোঁটটি কিন্তু হাত পায়ের জঙ্গলের ভিতরে লুকানো থাকে বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায় না।

এ জন্তুগুলি যেন সমুদ্রের সঙ। অনেক দেশে ইহাদিগকে 'শয়তান মাছ' (devil fish) বলে। বাস্তবিক এমন বিকট বিদ্ঘুটে চেহারা আর কোনো জন্তুর আছে কিনা সন্দেহ। চালচলন আবার চেহারার চাইতেও অদ্ভুত। আট দশটা পা থাকিলে তাহার চলাফেরা সম্বন্ধে অন্তত আমাদের সাদাসিধা হিসাবে আর কোনো ভাবনার কথা থাকে না। কিন্তু ইহারা এতগুলি পা লইয়াও সন্তুষ্ট নহে ; উহাদের আরো একরকম চলিবার কায়দা চাই। পাগুলি দিয়া পায়ের কাজ আর হাতের কাজ দুইই চলে ; অর্থাৎ চলাফেরাও হয় আবার শিকারকে জড়াইয়া ধরাও যায়। সাধারণ চলাফেরার সময় এই পাগুলিই ব্যবহার হয়। কিন্তু পলায়নের সময় এমন পুরাতন পাড়াগেঁয়ে দস্তুর উহারা পছন্দ করে না ; তখনকার জন্য একটা কোনোরূপ নূতন কায়দার নিতান্তই দরকার। সুতরাং চম্পট দিবার কাজটি দমকলে না হইলে উহাদের মন উঠে না। দমকলের বন্দোবস্ত বিধাতা উহাদের শরীরের মধ্যেই করিয়া দিয়াছেন; তাহা দ্বারা উহারা ইচ্ছা করিলেই পিচকারির মতন বেগে জল ফুঁকিয়া (অবশ্য মুখে ফুঁকিয়া নয়, সেই কলে ফুঁকিয়া) বাহির করিতে পারে। সে জলের এমনি ধাক্কা যে, সেই ধাক্কায় তীরের মতন বেগে পিছু হটিয়া উহারা তিলার্ধে অর্ধ ক্রোশ দূরে গিয়া উপস্থিত হয়।

ইহাদের প্রত্যেকের আবার এক থলে করিয়া কালি থাকে। তেমন বেখাপ্পা গোছের কোনো শত্রু আসিলে ফস্ করিয়া তাহার সামনে একরাশ কালি বাহির করিয়া দেয়। কালিতে জল ঘোলা হইয়া গেলে শত্রুর ধাঁধা লাগিয়া যায়। ততক্ষণে সে শয়তান দমকল ফুঁকিয়া কোথায় গিয়া গা ঢাকা দেয় তাহা টেরই পাওয়া যায় না। ইহার উপরে আবার ইহাদের চলাফেরার অভ্যাস রাত্রিতেই বেশি। সুতরাং ইহাদিগকে সঙ বা ভূত পেত্নী বলিলে এমন অন্যায় আর কি হয়।

আমি পুরীতে যেমন ছোট ছোট কট্‌ল্ ফিশ দেখিয়াছি, তাহাতে আমার হাসিই পাইয়াছিল। কিন্তু এই জাতীয় জন্তু বড় হইলে নিতান্তই ভয়ানক হয়। একরকম আট-পেয়ে কট্‌ল্ ফিশ (octopus) আছে, তাহার এক-একটা হাত পা ছড়াইলে আট-দশ ফুট জায়গা জুড়িয়া বসে। এক-একটা পা-ই তার দশ-বারো ফুট লম্বা, এমন অক্‌টোপসও আছে। হাতির শুঁড়ের আকৃতি এক-একটা পা, তাহার ভিতর দিক দিয়া ছোট-ছোট বাটির মতন একপ্রকার জিনিস সার সার সাজানো থাকে। এই-সকল বাটির মতন জিনিসের প্রত্যেকটি একটি জোঁকের মুখের মতন কাজ করে। অর্থাৎ যাহাতে লাগে, তাহাকেই উহারা এমন ভয়ানক চুষিয়া ধরে যে তাহার প্রাণ পর্যন্ত চুষিয়া বাহির করিবার গতিক হয়। যাহাকে একবার ধরে, তাহার কি আর রক্ষা আছে। আট হাতে জড়াইয়া ধরিয়া একটিবার ঐ ভয়ানক টিয়া পাখির ঠোঁটের মধ্যে লইয়া ফেলিতে পারিলেই বেচারার জীবন শেষ হয়। এইরূপে অক্‌টোপসের হাতে পড়িয়া মানুষের প্রাণ হারাইবার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। ছোটখাটো নৌকা কট্‌ল্ ফিশের টানে উলটিয়া গিয়াছে, এরূপ ঘটনাও ঘটিয়া থাকে।

ঐ চোষণীগুলির সাহায্যে উহারা এমন সব অসম্ভব কাজ করিতে পারে, যে লোকে তাহা দেখিয়া আশ্চর্য হয়। নিতান্ত ছোট ফাটলের ভিতর ঢুকিয়া থাকা, নিতান্ত অসম্ভব স্থানে বাহিয়া উঠা, এ-সকল এবং অন্যান্যরকমের মানুষ বাজিকরের অসাধ্য অনেক কাজ ইহারা নিতান্ত সহজভাবে প্রত্যহই করিয়া থাকে।

ইহারা আঙুরের মতন থোকা থোকা ডিম পাড়ে। শামুকেরাও ঐরূপ করে, তবে শামুকের ডিম অবশ্য খুব ছোট-ছোট। ডিমগুলিকে কোনো নিরাপদ জায়গায় আটকাইয়া রাখিয়া কট্‌ল্ মাছ অতি যত্নে পাহারা দেয়। ইহাদের শরীরের রঙ সকল সময় একরকম থাকে না, ক্রমাগত বদলায়। যে স্থানের যেমন রঙ, উহাদের শরীরের রঙও উহারা অনেকটা সেইরূপ করিতে পারে।

আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে একটি ছেলের হাতে ছোট-ছোট কট্‌ল্ মাছ দেখিয়াছিলাম। আর সে বলিয়াছিল যে উহা রাঁধিয়া খাইবে। অনেকে এই জন্তুর মাংস খুব আদরের সহিত আহার করে, আর ইহাদিগকে শিকার করিবার জন্য বিস্তর ক্লেশ ও বিপদ্ সহ্য করে। এ-সকল লোকের বাস আমাদের দেশে নহে ; কিন্তু আমি একটা পুস্তকে এ কথা লেখা দেখিয়াছি যে ভারতবর্ষের বাজারে নাকি কট্‌ল্ ফিশের মাংস বিক্রয় হয়। এ কথা কতদূর সত্য, তাহা আমি বলিতে পারি না ; তবে এ দেশের কেহ কেহ যে উহা খায়, তাহার প্রমাণ তো ঐ জেলের ছেলেটার কাছেই পাওয়া গেল।

এই-সকল জেলে মাদরাজি ; ইহাদিগকে নোরিয়া বলে। চেহারায় কথাবার্তায়, চাল-চলনে, সকল বিষয়েই ইহারা উড়িয়াদের চাইতে অনেক বিভিন্ন। সেখানকার দেশীয় জেলেও আছে, কিন্তু তাহারা সমুদ্রের মাছ ধরে না, তেমন সাহস আর উদ্যোগ তাহাদের নাই।

ভারতবর্ষের গরিব লোকেরা কি পর্যন্ত পরিশ্রম করিয়া আর ক্লেশ পাইয়া দুবেলা দুই মুঠো ভাতের জোগাড় করে তাহা এই নোরিয়াদিগকে দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়। অবশ্য আমাদের দেশের জেলেরাও কম কষ্ট পায় না। শীত, গ্রীষ্ম, রোদ, বৃষ্টি, কুমিরের ভয় ইহাদের বেলাও খুব আছে। কিন্তু সমুদ্রে মাছ ধরার যে ক্লেশ দেখিয়াছি, তাহার কাছে ঐ-সকল কিছুই নহে।

সচরাচর তিনরকম উপায়ে ইহারা মাছ ধরিয়া থাকে। এক উপায় ছোট-ছোট জাল লইয়া সমুদ্রের কূলে কূলে ছোট-ছোট মাছ ধরা। হাত পনেরো লম্বা আর হাত দেড়েক চওড়া একখানি জাল, তাহার মাঝে মাঝে এড়োবাগে সরু-সরু কাঠি পরানো। দুজন লোক জালের দুই মাথায় ধরিয়া জলের ধারে ধারে চলিতে থাকে। যেই একটা ঢেউ আসিয়া ডাঙ্গার উপরে খানিক দূর অবধি উঠিয়া যায়, অমনি তাহার ফিরিবার পথে জালখানিকে দুজনে বেড়ার মতন খাড়া করিয়া ধরিয়া তাহার পথ আগলায়। কাঠির সাহায্যে জালখানি বেশ দাঁড়াইয়া থাকে, সুতরাং জল সরিবার সময় তাহাকে জালের ভিতর দিয়া সরিতে হয়, আর মাছ আটকা পড়ে। বড় ঢেউ থাকিলে ঐ উপায়ে মাছ ধরা চলে না, আর ইহাতে ছোট-ছোট মাছই পড়ে, তাহাও বেশি নহে।

দ্বিতীয় উপায়, কাটামারণে করিয়া সমুদ্রের ভিতরে গিয়া জাল দিয়া মাছ ধরা। ঐ জাল কিরকম তাহা দেখ নাই। কারণ যাইবার সময় উহা গুটানো থাকে, আর মাছ ধরিবার কাজটা সমুদ্রের ভিতরে এত দূরে হয় যে ভালো করিয়া দেখাই যায় না। জেলেরা সকাল-সকাল উঠিয়া মাছ ধরিতে বাহির হয়, আর দুপুরবেলায় ফিরিয়া আসে। যাইবার সময় ঢেউয়ের হাতে ইহাদিগকে বিস্তর লাঞ্ছনা পাইতে হয়। কতবার কাটামারণসুদ্ধ উলটাইয়া জলে পড়ে। আবার সেই ঢেউয়ের অত্যাচারের ভিতরেই কাটামারণ সোজা করিয়া পুনরায় উঠিয়া বসিতে হয়। কাটামারণে না গিয়া যদি নৌকায় যাইতে হইত, তবে আর মাছ ধরা সম্ভব হইত না। কাটামারণের কাঠগুলি কর্কের মতন জলে ভাসে, আর খুব হালকা। কাটামারণ উলটিয়া গেলে তাহাকে সহজেই সোজা করা যায়। তবে টুপি পরিয়া মাথাটাকে বাঁচাইবার কতক চেষ্টা হইয়া থাকে বটে। ঐ-ঢেউয়ের মুখে সোজা করাই অসম্ভব হইত, তাহার উপর আবার উহার জল সেঁচার দরকার। এই জন্যই ঐ স্থলে নৌকা ব্যবহার হইতে পারে না। আর নৌকায় করিয়া ঐ প্রণালীতে মাছ ধরাও সহজ হইত না।

ছোট-ছোট এক-একটি কাটামারণে দুজন লোক ধরে। দুজনে মিলিয়া মাছও ধরে, কাটামারণও সামলায়, আর তাহা করিতেই তাহাদের সময় চলিয়া যায়। শরীরের যত্ন করিবার অবসরও হয় না, সুতরাং তাহার কোনো চেষ্টাও হয় না। তবে টুপি পরিয়া মাথাটাকে বাঁচাইবার কতক চেষ্টা হইয়া থাকে বটে। ঐ-সকল টুপি উহারা বাঁশের চটা দিয়া নিজেই বুনিয়া থাকে। দেখিতে ঠিক সেঁউতীর মতন।

এ-সকল উপায়ে মাছ ধরিতে ছোট-ছোট জালই ব্যবহার হয়। নভেম্বর মাস হইতে উহারা বড়-বড় জাল দিয়া মাছ ধরিতে আরম্ভ করে। আর সেই সময় হইতেই মাছ ধরা দেখিবার আমোদ আরম্ভ হয়। তখন আর কাটামারণে কাজ চলে না, নৌকার দরকার হয়। নৌকায় করিয়া অনেক দূর অবধি জাল ফেলিয়া আসে ; তারপর ডাঙায় আসিয়া তাহাকে টানিয়া তোলে। এক-একটা জালের পিছনে কুড়ি-পঁচিশ জন করিয়া লোক খাটিতে হয়। স্ত্রী-পুরুষ, ছেলে-বুড়ো সকলে মিলিয়া ইহাতে যোগ দেয়।

আসল যে জাল, সেটা একটা প্রকাণ্ড থলে ; তাহার ভিতরে কুড়ি-বাইশ জন মানুষ পুরিয়া রাখা যায়। এই থলের বিনুনী খুব ঘন আর মজবুত ; একটা ডান্‌কোনা মাছও তাহার ফাঁক দিয়া গলিতে পারে না। থলের মুখের দুই পাশ হইতে খুব লম্বা-লম্বা দুখানা জাল বাহির হইয়াছে ; তাহার এক-ধার জলের উপরে ভাসে, আর একধার জলের নীচে ডুবিয়া ঝুলিতে থাকে। এই যে দুপাশের দুখানা জাল, তাহার বুনট থলের মতন এত ঘন নহে ; আর থলের মুখ হইতে যতই দূরে যাওয়া যায়, ততই উহার ফোকর বড় হইয়া শেষটা এত বড় হয় যে তাহার ভিতর দিয়া তুমি আমিও ইচ্ছা করিলে গলিতে পারি। এত বড় ফোকরের ভিতর দিয়া মাছ কেন গলিয়া পলায় না, আমি অনেক সময় এ কথা ভাবিয়াছি।

জালখানিকে রীতিমত সমুদ্রে ফেলা হইলে, প্রায় সিকি মাইল জায়গা ঘেরা হয়। সিকি মাইল দূরে সমুদ্রের ভিতরে থলেটা থাকে। তাহার মুখের এক পাশ জলের উপরে, এক পাশ জলের নীচে থাকে ; যেন সে মাছগুলিকে গিলিবার জন্য হাঁ করিয়া আছে। এই হাঁ করা মুখের দুপাশ হইতে দুখানি জালের বেড়া ডাঙগা অবধি গিয়াছে ; মাঝখানে মাছ রহিয়াছে। তাহাদের সমুহই বিপদ, কিন্তু তখনো তাহারা তাহা বুঝিতে পারিতেছে না। যদি পারিত তবে তাহাদের অধিকাংশই অনায়াসে ঐ-সকল বড়-বড় ফোকরের ভিতর দিয়া গলিয়া বাঁচিতে পারিত। কিন্তু তাহারা তো তখনো সেই সিকি মাইল দূরের সর্বনেশে থলের সংবাদ পায় নাই। তাহারা প্রথমে খালি সেই বড়-বড় ফোকরওয়ালা বেড়া দুখানিকেই দেখে, আর তাহাদের সাদাসিধা হিসাবে সেই বেড়াকেই সন্দেহ করিয়া তাহা হইতে দূরে থাকে। কাজেই সেই-সকল বড়-বড় ফোকরের মধ্য দিয়া পলায়ন করিবার সুযোগ তাহাদের চলিয়া যায়।

এদিকে জেলেরা ডাঙগায় থাকিয়া দুই বেড়ার দুই মাথা একত্র করিয়া জালে টান ফেলিয়াছে। তাহাদের দুজন জলে নামিয়া ক্রমাগত জাল ঠিক রাখিতেছে, যাহাতে ঢেউয়ের তাড়ায় জাল জড়াইয়া গিয়া মাছ পলাইবার সুবিধা না হয়। ইহাদের গোলমালে মাছগুলি একদিকে যেমন জাল হইতে দূরে থাকিতেছে, আরেক দিকে তেমনি ডাঙগার দিক হইতে থলের দিকে গিয়া জড় হইতেছে। সেদিকে জালের ফোকর ক্রমেই ছোট-ছোট, সুতরাং সে পথে পলাইবার আর ভরসা নাই। তখন ইচ্ছা থাকুক আর না থাকুক, ঐ থলের ভিতরেই তাহাদিগকে ঢুকিতে হয়। 'ভূতে পশ্যন্তি বর্বরাঃ!' অর্থাৎ যাহারা বোকা, বিপদ হইয়া গেলে পরে তাহাদের চৈতন্য হয়, সারা বছর নিদ্রায় কাটাইয়া পরীক্ষার সময় অনেক ছাত্র-বাবুদের যে দশা হয় সেইরূপ!

এত পরিশ্রম করিয়া জালে কি উঠে, তাহা জানিতে সকলেরই ইচ্ছা হয়। কিন্তু এবিষয়ে ফল বড়ই অনিশ্চিত! এক-এক দিন থলে এমনি বোঝাই হইয়া উঠে যে সকলে মিলিয়া তাহাকে টানিয়া ডাঙগায় আনাই কঠিন হয়। আবার একদিন দেখিলাম যে একটা জালে একক্ষেপে মোটে সাড়ে পাঁচ আনার মাছ উঠিল। যে জেলের জালে ঐরূপ হইয়াছিল সে আমাকে বলিল 'বাবু, কাল খুব মাছ পাইয়াছিলাম, তিনশো টাকার মাছ বেচিয়াছি।'

জালে জেলী ফিশটা খুবই উঠে। জাল ডাঙগায় উঠিবার পূর্বেই এ কথা বলা যায় যে আর কিছু উঠুক না উঠুক, ঝুড়িখানেক জেলী ফিশ উঠিবে। আর একটা বিষয় এই দেখা যায় যে এক-একটা জালে এক-এক জাতীয় মাছই খুব বেশি পড়ে। খণ্ডবালিয়া উঠিল তো দেখিবে খালি খণ্ডবালিয়াতেই জাল বোঝাই। কোনোদিন হয়তো দেখিবে থলের প্রায় প্রত্যেক ফোকরেই একটা কাঁকল মাছের ঠোঁট বাহির হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায় যে এই-সকল মাছ ঝাঁকে ঝাঁকে বেড়ায়, আর জালে পড়িলে ঝাঁকসুদ্ধই পড়ে। খুব বড় মাছ আমি জালে পড়িতে দেখি নাই।

সমুদ্রের ধারে বালির উপদ্রব একটু বেশি এ কথা পূর্বেই বলিয়াছি। হাওয়ায় বালি উড়াইয়া সেখানকার টালিবাঁধানো রাস্তাটিকে ক্রমাগতই ডুবাইয়া দেয় ; তাই মাঝে মাঝে লোক লাগাইয়া তাহাকে আবার খুঁড়িয়া বাহির করিতে হয়। সেখানকার ছোট গির্জাটির আঙিনায়ও এইরূপ বালির অত্যাচারের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়।

পুরীর রেলের স্টেশনের কাছে সমুদ্রের ধারে চক্রতীর্থ নামক একটি স্থান আছে। দুই-একটি মন্দির ভিন্ন সেখানে আর কিছু নাই। যে নিমকাঠ দিয়া জগন্নাথের মূর্তি গড়া হইয়াছে, সেই নিমকাঠ সমুদ্রের জলে ভাসিতে ভাসিতে ঐ চক্রতীর্থে আসিয়া লাগিয়াছিল, তাই উহা তীর্থস্থান হইয়াছে। ওখানকার একটি মন্দিরের দেবতা হনুমান। তীর্থযাত্রীরা সেই হনুমানের মন্দির প্রদক্ষিণ করে, আর তাঁহার পূজা দেয়। লোকের বিশ্বাস এই যে হনুমান ওখানে থাকাতে দেশ সমুদ্রের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইতেছে নচেৎ মহা মুশকিলই হইত।

চক্রতীর্থের কাছেই একটা বালির ঢিপির উপরে আর একটি ছোট মন্দির আছে। চৈতন্যদেব পুরীতে সমুদ্রের জলে ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার দেহ যেস্থানে আসিয়া তীরে লাগিয়াছিল, ঐ ছোট মন্দিরটি সেইখানে তয়ের করা হইয়াছে। সেখানে গেলে চৈতন্যদেবের খড়ম প্রভৃতি কতকগুলি জিনিস দেখিতে পাওয়া যায়। সমুদ্রের ধারের আর দুইটি বিষয়ের কথা বলিলেই পুরীর পালা শেষ করিতে পারি। পুরীতে মাঝে মাঝে জাহাজ আসে এ কথা বলিয়াছি। সুতরাং পুরী যে একটি জাহাজের স্টেশন এ কথা আর বিশেষ করিয়া না বলিলেও চলে। এখান হইতে বিলাত প্রভৃতি স্থানে যে-সকল জাহাজ যায়, তাহারা পুরীর কাছ দিয়া যায় না ; তাহাদের পথ পুরী হইতে প্রায় ষাট মাইল দূরে সমুদ্রের ভিতর দিয়া। কিন্তু এমন অনেক জাহাজ আছে, যাহারা রেঙ্গুন প্রভৃতি স্থানে যাতায়াত করে। পুরী এই-সকল জাহাজের স্টেশন।

এই-সকল স্টেশনে দুইটি বিষয়ের বন্দোবস্ত রাখিতে হয়। (১) একটা নিশান, (২) রাত্রিকালের জন্য একটা আলো। সাধারণ নিশান এবং আলোর সঙ্গে এই নিশান আর আলোর একটু প্রভেদ আছে, তাই ইহাদের কথা এখানে উল্লেখ করিয়াছি।

নিশানের দ্বারা জাহাজের লোকদিগকে নানারূপ সংবাদ দেওয়া যায়। ছোট-ছোট অনেকরকমের নিশান আছে, তাহাদের প্রত্যেকটির আকার এবং রঙ ভিন্নরকমের, আর প্রত্যেকটির এক-একটা বিশেষ অর্থ আছে। এই-সকল নিশান আর তাহার অর্থের দস্তুর মতন অভিধান থাকে, তাহার সাহায্যে নিশানের ভাষায় কথাবার্তা চালানো যায়।

বাস্তবিক এরূপ একটা উপায় না থাকিলে জলযুদ্ধের সময় ভারি মুশকিল

হইত। যিনি সেনাপতি, তিনি হয়তো যুদ্ধের সময় ইচ্ছা করিলেন যে নিজের জাহাজগুলিকে কোনো-একটা বিশেষ হুকুম দিবেন। এখন সে হুকুম দেওয়া যায় কি করিয়া? স্থলে হইলে হয়তো দূত পাঠাইয়া সংবাদ দেওয়া সম্ভব হইতে পারিত, (স্থলযুদ্ধের জন্যও নানারূপ সংকেতের ব্যবস্থা আছে) কিন্তু নৌযুদ্ধে এরূপ সংবাদ কে লইয়া যাইবে? আর কেহ লইয়া যাইতে পারিলেও হয়তো সংবাদ পেঁছাইবার পূর্বেই যুদ্ধ শেষ হইয়া যাইবে। এইজন্য নৌযুদ্ধে ঐরূপ নিশানের দরকার। এই-সকল নিশানের মালা গাঁথিয়া মাস্তুলের আগায় ঝুলাইয়া দিলে অন্য-সকল জাহাজের লোকেরাই তৎক্ষণাৎ তাহা দেখিতে পায়, আর হুকুম মতো কাজ করে।

ট্রাফালগারের যুদ্ধের সময় সেনাপতি নেলসন এইরূপে তাঁহার দলের জাহাজগুলিকে নিম্নলিখিত সংবাদ দিয়াছিলেন 'ইংলণ্ড আশা করেন যে, প্রত্যেক লোক তাহার কর্তব্য করিবে।' গত রুশ-জাপান যুদ্ধে যেদিন সেনাপতি টোগো রুশিয়ার জাহাজ সকল চূর্ণ করেন, সেদিন তিনিও এই উপায়ে সৈন্যদিগকে বলিয়াছিলেন যে, 'আজিকার যুদ্ধের উপর আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে।'

ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে ঐরূপ নিশান দিয়া দস্তুর মতন কথাবার্তা চালান যাইতে পারে। জাহাজের সঙ্গে স্টেশনের লোকদেরও এই উপায়ে কথাবার্তা চলে। ইহা ছাড়া ঝড় বৃষ্টির অবস্থা জানাইবার জন্য আবার বিশেষ রকমের সংকেত আছে। এ-সকল সংকেত নিশানে হয় না, কারণ ঝড়ের সময় নিশান জড়াইয়া গিয়া সংকেত বিফল করিয়া দিতে পারে, তাই এজন্য কোনোরূপ কঠিন জিনিস ব্যবহার হয়। জিনিসটি গোল হইলে এক অর্থ, চোকা হইলে এক অর্থ তিন কোনা হইলে এক অর্থ। আবার ইহাদের একটির সঙ্গে আর একটি মিলাইলে তাহারই কতরূপ অর্থ হইতে পারে। এইরূপে অতি অল্প কয়েকটি জিনিস দিয়া অনেকরকম কথা বুঝানো যায়। যেমন 'ভয় নাই।' 'ঝড়!' 'বড় বিপদ!' 'সাবধান' ইত্যাদি। এই-সকল সংকেত দেখিয়া জাহাজের লোকেরা পূর্বেই সতর্ক হয়।

সমুদ্রে যাইবার সময় পথে ঝড়-বৃষ্টির অবস্থা কিরূপ হইবে তাহা জাহাজের লোকের চাইতে ডাঙ্গার লোকের বুঝা অপেক্ষাকৃত সহজ। কারণ জাহাজের লোকেরা চারিদিকে কয়েক মাইলের বেশি দেখিতে পায় না। পরিষ্কার দিনে হয়তো জাহাজ ছাড়িল, কিন্তু আর চারি ঘণ্টা পরেই এমন একটা স্থানে গিয়া তাহাদের উপস্থিত হইতে হইবে যেখানে ভয়ানক ঝড় চলিতেছে। জাহাজের লোকের সেস্থানের খবর সংগ্রহ করিবার উপায় নাই। কিন্তু ডাঙ্গার লোকেরা একস্থানে ঝড়ের সংবাদ পাইলে তৎক্ষণাৎ সকল দেশে তার করিয়া সংবাদ দিতে পারে। এইরূপ কার্যের জন্য রীতিমতো সরকারি আফিস প্রায় সকল স্থানেই আছে। উহাদের কাজ কেবল ঝড়-বৃষ্টি আর বায়ু ও আকাশের অবস্থার খবর লওয়া, এবং সর্বত্র সেই খবর দেওয়া। এইরূপে এক জায়গায় ঝড়ের নমুনা হইলে দেখিতে দেখিতে তাহার খবর জাহাজের স্টেশনে

স্টেশনে গিয়া উপস্থিত হয়, আর অমনি সেখানকার লোকেরা তাহা নিশানে লটকাইয়া দেয়। জাহাজের লোকেরা ক্রমাগত ঐ-সকল নিশানের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চলে।

আলোর দ্বারা অবশ্য এতরকম খবর দেওয়ার ব্যবস্থা নাই ; তথাপি আলোকটি দেখিলে অন্তত এ কথা বুঝিতে পারা যায়, যে অমুক স্টেশনের কাছে আসিয়াছি। এই-সকল আলোর লণ্ঠন বিশেষ রকমের। তাহার সামনের কাচখানার গড়ন এমনি, যে তাহাতে ভিতরকার আলোটাকে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে না দিয়া সোজা সামনের দিকে পাঠাইয়া দেয়। তাহার ফলে অনেক দূর হইতে এই আলো দেখিতে পাওয়া যায়। আতসী কাচের গড়ন যেরূপ, এই লণ্ঠনের কাচের গড়ন কতকটা সেইরূপ, কিন্তু তাহার চাইতে অনেক জটিল।

পুরীর লণ্ঠনটি অতি সামান্যরকমের। কিন্তু এই জাতীয় লণ্ঠন এক-একটা খুব বড়-বড় হয়, আর তাহার আলো সাধারণ আলোর চাইতে অনেক বেশি। অনেক স্থলে আবার এরূপ বন্দোবস্ত থাকে যে আলোটি ক্রমাগত না জ্বলিয়া একবার নিভিবে (অথবা লণ্ঠনটি ঘুরিবে, যাহাতে একবার তাহার সামনের দিক, একবার পিছনের দিক দেখা যায়, আর দূর হইতে মনে হয় যেন আলো জ্বলিতেছে আর নিভিতেছে)। এই উপায়ে বিশেষ বিশেষ স্থানের আলো দেখিয়া জাহাজের লোকেরা বুঝিতে পারে যে, উহা অমুক স্থানের আলো। পৃথক স্থানের আলো জ্বলা নিভার এক-একটি বিশেষ হিসাব আছে। কোনো-টার সহজ হিসাব ; যেমন 'এত সময়ে এতবার।' কোনোটার হিসাব একটু জটিল ; যেমন 'এতক্ষণ পর পর ক্রমাগত এতবার জ্বলিয়া তারপর এতক্ষণ।' এইরূপ অসংখ্য হিসাব হইতে পারে।

এই-সকল আলোর কোনটা কি হিসাবে জ্বলে, জাহাজে জাহাজে তাহার একটা তালিকা থাকে। সেই তালিকা দেখিয়া কোন স্থানের কোন আলো তাহা চিনিয়া লইতে হয়।

আবার পুরীতে

১

এবারে আবার পুরী গিয়াছিলাম। দু' বৎসর আগে আর একবার যাই। এই দু' বৎসরের মধ্যে স্থানটির সমুদ্রের ধারের চেহারা অনেকটা বদলাইয়া গিয়াছে। যে-সকল জায়গায় আগে বালি ভিন্ন কিছুই ছিল না, এখন সেখানে অনেকগুলি নূতন বাড়ি হইয়াছে। ইহারই একটি ছোট বাড়িতে আমরা ছিলাম। প্রথম বারের বাড়িটির চেয়ে এ বাটীটি সমুদ্রের অনেক কাছে।

এ বাড়িতে আসিয়াই কতকগুলি কাঁকড়া আর কুকুরের সহিত পরিচয় হইল। কাঁকড়াগুলি আমাদের উঠানেই থাকিত ; বাড়ি হইবার পূর্বে এ-সকল জমি তাহাদেরই ছিল। কুকুরগুলি বোধ হয় বাড়ি হইবার আগে এখানে আসিয়াছিল। বেচারারা নিতান্তই গরিব। চেহারা দেখিয়া মনে হইল, যেন পেট

ভরিয়া আহার তাহাদের অল্পই জোটে ; কিন্তু এরূপ কষ্ট এবং অযত্নের মধ্যে থাকিয়াও তাহাদের স্বভাবের মিষ্টতা হারায় নাই। প্রথমে ইহাদের একটিই ঐ বাড়িতে ছিল, সুতরাং প্রথম পরিচয় তাহার সঙ্গেই হয়। জীর্ণ শীর্ণ অস্থি-চর্মসার শরীরটিতে যেমন একদিকে তাহার দরিদ্রতার লক্ষণ দেখা গেল, তেমনি লম্বা লম্বা হাত-পা, লম্বা লেজ এবং স্নিগ্ধ মুখশ্রীতে তাহার ভদ্রতার আভাসও ছিল। সেই লম্বা লেজটি নাড়িয়া সে আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিল। আমরা অল্প কয়টি লোক, আমাদের পাতের ভাতে ভালো করিয়া তাহার পেট ভরিত কিনা সন্দেহ, কিন্তু তাহার জন্যই সে যথেষ্ট কৃতজ্ঞ হইয়া সমস্ত রাত্রি আমাদের বাড়িতে পাহারা দিত।

ক্রমে আর দুটি কুকুর আসিয়া জুটিল। ইহাদের একটা একটু বুনো-গোছের ছিল, ভদ্রতার ধার বড় একটা ধারিত না। শিশুকালে কে তাহার লেজ কাটিয়া দিয়াছিল, এখন তাহার তিন আঙ্গুল মাত্র অবশিষ্ট আছে। আমরা ঘনিষ্ঠতা করিতে গেলে সে ঐ তিন আঙ্গুল লেজটুকুই গুটাইয়া অবিশ্বাস প্রকাশ করিত। অন্যান্য কুকুরগুলির তুলনায় ইহার মনটাও একটু কুটিল ছিল বলিয়া বোধ হয় ; কিন্তু আমাদের সঙ্গে সে কোনোরূপ মন্দ ব্যবহার করে নাই।

তারপর আবার একটা মস্ত কুকুর আসিল। যতদিন কেবল আমরাই ছিলাম ততদিন তাহাকে দূরে দূরে দেখিতে পাইতাম বটে, কিন্তু সে আমাদের কাছে বড়-একটা ঘেঁষিত না। কিন্তু যখন আমাদের বাড়িতে ছোট-ছোট ছেলেরা আসিল, তখন দেখি যে কুকুরটা আসিয়া তাহাদের সঙ্গে বন্ধুতা করিয়া বসিয়াছে। ছেলেদের সঙ্গে সে এমনি উৎসাহ করিয়া খেলিত যে, একদিন লাফ দিয়া তাহাদের মাথার উপর দিয়াই চলিয়া গেল।

এই কুকুরগুলিকে ছাড়িয়া আসিতে কষ্ট বোধ হইয়াছিল। আসিবার পূর্বে তাহাদের যথেষ্ট ভাত আর মাছ রান্না করিয়া তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ খাওয়াইলাম। খাইবার সময় তিনটি কুকুর আসিয়া উপস্থিত হইল, বড় কুকুরটাকে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। এত খাবার বোধ হয় আর কোনোদিন তাহারা পায় নাই। লেজকাটা কুকুরটা অনেক ভাত দেখিয়া এতই ব্যস্ত হইয়া উঠিল যে সে পারিলে সব ভাত একাই খায়। সে তাহার নিজের ভাগ পায়ে ঢাকিয়া অন্য দুটা কুকুরের ভাগ খাইতে লাগিল। কাজেই শেষটা তাহার ভাগ খাইবার বেলা আর তাহার পেটে স্থান রহিল না।

পরদিন বড় কুকুরটা আসিয়া উপস্থিত। সে কোথায় যেন গিয়াছিল, সে অবধি তাহার কিছুই খাওয়া হয় নাই। যাহা হউক, তাহার জন্য খাবার যথেষ্ট রাখা হইয়াছিল।

সেবারে পুরীর ব্যাঙ আর উইয়ের কথা বলিয়াছিলাম। এ বাড়িটিতে এই দুই জন্তু দেখিতে পাই নাই। টিকটিকি আর গিরিগিটি অনেকগুলি ছিল। আমাদের বারান্দায় একটা তালপাতার বেড়া ছিল। রাত্রিতে বাহিরের বাতাস আর শীতের তাড়ায় যত গিরিগিটি আসিয়া এই বেড়ায় আশ্রয় লইত।

তাহাদের ঘুমাইবার ভঙ্গির কথা মনে হইলে এখনো আমার হাসি পায়। শরীরটাকে যত উৎকৃষ্ট রকমের বাঁকাইতে পারে ততই বোধ হয় উহাদের ঘুমাইবার সুবিধা। কেহ যদি দড়ি আগায় ঝুলিতে ঝুলিতে পা ঘাড়ে তুলিয়া মাথা নীচের দিকে দিয়া ডিগবাজি খাইবার মাঝখানে ঘুমাইয়া পড়ে, তবে হয়তো সে গিরিগিটির নিদ্রার মর্ম খানিকটা বুঝিতে পারে।

পুরীর বিড়ালগুলি এবারে আমাদিগকে বড়ই জ্বালাতন করিয়াছে। আমরাও যে তাহাদের সহিত বন্ধুতা করিতে পারি নাই, এ কথা বলাই বাহুল্য। আমার লাঠিটার কথা কহিবার শক্তি থাকিলে এ বিষয়ে তোমরা অনেক আশ্চর্য সংবাদ শুনিতে পাইতে। দুঃখের বিষয়, এত করিয়াও উহাদের সংশোধন হয় নাই। এরূপ নির্লজ্জ জন্তু আর বেশি আছে কি না সন্দেহ। যত মার খায়, ততই আরো বেশি করিয়া দৌরাত্ম্য করে। মারের চোটে কোমরও যদি ভাঙিগয়া যায়, তবুও সামনের দুপায় হিঁচড়াইয়াই ছুট দিবে। খানিক দূর যাইতে না যাইতেই দেখিবে তাহার কোমর সোজা হইয়া গিয়াছে। আর খানিক গেলে হয়তো বেদনার কথা একেবারেই ভুলিয়া যাইবে। কাজেই আর বেশি দূর যাইবার পূর্বেই সে ফিরিয়া আসিয়া রান্না-ঘরের কোণে উঁকি-ঝুঁকি মারিবে। সেখানে যদি কেহ থাকে, তবে হয়তো তাহাকে বলিবে 'মিঞাও! কি মিঞা? কড় যে মারিয়াছিলে?' আর যদি কেহ না থাকে, তবে তো বুঝিতেই পার। বল দেখি, এমত অবস্থায় নিতান্ত সাধু মহাপুরুষ ভিন্ন সাধারণ লোকের রাগ হয় কিনা?

সাধু লোকের কথায় পরলোকগত পূজ্যপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের জীবজন্তুর প্রতি অসাধারণ দয়ার কথা মনে পড়ে। পুরীতে নরেন্দ্র সরোবরের ধারে গোস্বামী মহাশয়ের সমাধির স্থানে একটি আশ্রম আছে। সেই আশ্রমের তত্ত্বাবধায়ক মহাশয়ের নিকট এ বিষয়ে অনেক আশ্চর্য কথা শুনিয়াছি। ইতর প্রাণীরা অনেক সময় যথার্থ দয়ালু লোককে চিনিতে পারে, এবং অন্য লোক দেখিয়া তাহাদের মনে যেরূপ ভয় আর অবিশ্বাস হয়, ঐ-সকল দয়ালু লোকের সম্বন্ধে তাহা হয় না। গোস্বামী মহাশয়ের জীবনে ইহার অনেক দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে। বিড়ালের জন্য দুধ রোজ বরাদ্দ করা, গোরু ছাগলকে নিয়মিত আহার দেওয়া এ-সকল তো তাঁহার ছিল। ইঁদুর আরশুলাগুলি পর্যন্ত নাকি ক্ষুধার সময় তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইত। উহারা আসিয়া তাঁহার গা খুঁটিতে আরম্ভ করিলেই উনি বলিতেন, 'ওহে, ইহাদের আহার চাই, কিছু খাইতে দাও।' খাবার দেওয়া হইলে পর উহারা সন্তুষ্ট হইয়া যথাস্থানে চলিয়া যাইত। যে সাপকে আমরা দেখিবামাত্র তাহার মাথা গুঁড়া করিয়া দিই, গোস্বামী মহাশয় সেই সাপকে পর্যন্ত যত্ন করিয়া রোজ দুধ-ভাত খাওয়াইয়াছেন। একটা সাপ ধ্যানের সময় আসিয়া তাঁহার শরীরে বাহিয়া উঠিত, কিন্তু কখনো কোনো অনিষ্ট করিত না।

সকলের চাইতে বানরগুলি তাঁহাকে বেশি করিয়া ভালোবাসিত। আব্দারও তাঁহার নিকট কম করিত না। তাঁহার গায়ে হাত দিয়া তাঁহাকে

ঠেলিয়া টিপিয়া নানা উপায়ে তাঁহার নিকট হইতে খাবার তো আদায় করিতই; খাবার জিনিস মনঃপূত না হইলে আবার আঁচড়াইয়া তাঁহাকে সাজাও দিত। তিনি ইহাতে রাগ করা দূরে থাকুক, বরং হাসিয়া বলিতেন, 'ওহে, কি দিয়াছ, উহার পছন্দ হয় নাই; ভালো জিনিস দাও!'

বানরগুলি তাঁহার নিকট ছানা রাখিয়া নিশ্চিন্ত মনে অন্য কাজে মন দিত, কিছুমাত্র সন্দেহ করিত না। একদিন গোস্বামী মহাশয়ের পরিচিত একটা বানর তাহার বানরীকে লইয়া উপস্থিত হইল। বানরী কখনো সেখানে আসে নাই, কাজেই তাহার সংকোচ হওয়া স্বাভাবিক। তাই সে দরজা অবধি আসিয়া আর কাছে আসিতে চাহিল না। বানরটা আগে নানান উপায়ে তাহাকে উৎসাহ দিল। তবুও যখন সে আসিল না, তখন বানর গোস্বামী মহাশয়ের কাছে আসিয়া তাঁহার হাতখানি টানিয়া নিজের হাতের ভিতরে লইয়া বানরীর দিকে চাহিয়া রহিল, যেন তাহাকে এই কথা জানাইল যে 'দেখ, এ বড় ভালোমানুষ, কিছু করে না।' ইহার পর বানরী আর কাছে আসিতে কোনো আপত্তি করিল না।

গোস্বামী মহাশয় এই-সকল বানরকে বুড়ো দাদা, কাণী, লেজকাটি ইত্যাদি নামে ডাকিতেন। ইহাদের অনেকে নাকি এখনো পুরীর লোকনাথের মন্দিরের কাছে বাস করে। এ কথা শুনিয়া একদিন লোকনাথের মন্দিরের ফটো তুলিতে গেলাম। মন্দিরের আঙিনায় অনেক বানরও উপস্থিত ছিল। কিন্তু উহাদের ছবি তোলা আমাদের ঘটিল না। একজন পাণ্ডা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমাদের সঙ্গে কি চামড়া আছে?' আমরা বলিলাম, 'হাঁ আমাদের ক্যামেরায় চামড়া আছে।' তাহা শুনিয়া সে ব্যক্তি বলিল, 'তবে শীঘ্র বাহিরে যাও, এখানে চামড়া আনিতে নাই।' কাজেই আমরা বাহিরে চলিয়া আসিলাম।

যাহা হউক, আমরা একেবারে শুধু হাতে ফিরিয়া আসিতে রাজি ছিলাম না। মন্দিরের আঙিনার বাহিরে বাগান, সেইখানেই যত বানর থাকে। সুতরাং আমরা পুকুরের ধারে কলা ছড়াইয়া বানরের দলকে নিমন্ত্রণ করিলাম। একজন চ্যাঁচাইয়া ডাকিতে লাগিল, 'আয়, আয়, আয়।' অমনি কয়েকটি বানর আসিয়া উপস্থিত হইল। আমরাও তাহাদের ছবি লইয়া বাড়ি ফিরিলাম। ইহাদের মধ্যে 'কাণী' 'লেজকাটি' প্রভৃতির কেহ আছে কিনা, জানি না।

২

আগেই লোকনাথের মন্দিরের নিকট বানরের ছবি তোলার কথা বলেছি। দুঃখের বিষয়, সেবারের ছবিটির নীচে নরেন্দ্র সরোবরের নাম লেখা হইয়া গিয়াছে। আমার কিন্তু দোষ নাই, ও নাম উহাতে কি করিয়া লেখা হইল, তাহা আমি জানি না।

যাহা হউক, কথাটা যদি উঠিল, তবে নাহয়, নরেন্দ্র সরোবরের ছবিটাও দেওয়া যাউক। পুরীতে এই পুকুরটি অতিশয় প্রসিদ্ধ। আর ছবি দেখিলে বুঝিতে পারিবে, যে উহা যেমন তেমন পুকুর নহে। কলিকাতার লালদীঘি

হইতে উহা অনেক বড়, আর তাহার চারি ধার পাথর দিয়া বাঁধানো; জল বেশ পরিষ্কার, কিন্তু তাহাতে কুমির থাকায় নামিয়া স্নান করাটা তেমন নিরাপদ নহে। প্রত্যহ অনেক লোক ইহাতে স্নান করে বটে, কিন্তু ইহাদের দু-একটিকে মাঝে মাঝে কুমিরে ধরিয়াও থাকে।

পুকুরের মাঝখানে যে একটি ছোট মন্দিরের মতন দেখা যায়, উহা জগন্নাথের গ্রীষ্মাবাস। গ্রীষ্মের সময় কিছুদিন জগন্নাথকে এই স্থানে আনিয়া রাখা হয়। স্থানটি অতি সুন্দর, কিন্তু দুঃখের বিষয়, ছবিটি তেমন ভালো উঠে নাই। তখন সন্ধ্যা হইয়াছিল, তাই ভালো করিয়া ফটো তোলা গেল না।

ফটো তুলিবার জন্য এবারে পুরীর অনেক জায়গায় ঘুরিয়াছি, তাহাদের কথা ক্রমে বলিব। আমরা সমুদ্রের কাছেই ছিলাম, সুতরাং সমুদ্রের নিকটবর্তী অনেকগুলি জায়গায় ছবি তোলা হইয়াছে। আমাদের বাড়ি হইতে খানিক পশ্চিমে গেলেই নরিয়াদিগের গ্রাম। তাহারা সারি সারি ঘর বাঁধিয়া বাস করে। পাশাপাশি দুখানি ঘরের মাঝখানে কিছুমাত্র ফাঁক রাখে না। দরজা জানালার ধার অতি অল্পই ধরিয়া থাকে। হাওয়া তো ঘরের ভিতরে খেলেই না। জিজ্ঞাসা করিলে একজন বলিল, 'অতটুকু ঘরে আবার কত হাওয়া খেলিবে? ঘরে, উঠানে, বাগানে, আঁস্তাকুড়ে ঘন্ট পাকাইয়া তাহার ভিতরে উহারা বাস করে।

ইহারা একরকম হিন্দু। ইহাদের দেবদেবী আছে, পুরুত আছে, মন্দির আছে। মন্দির বলিতে একটা কিছু কাণ্ডকারখানা করিয়া বসিও না। সকলের চাইতে বড় মন্দিরটি ছাড়া আর কোনোটির ভিতরে মানুষ ঢুকিবার জায়গা নাই। অধিকাংশ মন্দিরই বাক্স প্যাঁটরার মতন ছোট-ছোট চালাঘর মাত্র, উহার ভিতরে লাল, কালো, হল্‌দে রঙের ছোট-ছোট দেবতারা বড়-বড় চোখ মেলিয়া যেন আশ্চর্য হইয়া বসিয়া থাকে। একটি দেবতার আবার ঘর পছন্দ হয় না, সে হাঁড়ির ভিতরে থাকিতে ভালোবাসে। মাঝে মাঝে পুরুত আসিয়া ইহাদের পূজা করিয়া যায়। নরিয়ারা ইহাদিগকে খুব মান্য করে, আর ইহাদের সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য কথা বলে। দুঃখের বিষয়, আমি দেবতাগুলির নাম ভুলিয়া গিয়াছি। একজন আছে, তাহাকে হাতি ঘোড়া দিয়া পূজা করিতে হয়। উহার মন্দিরের পাশে বিস্তর হাতি ঘোড়া পড়িয়া আছে। ছোট-ছোট মাটির জিনিস। এক সময়ে ঠিক এইরকম হাতি ঘোড়া আমাদের কুমারেরা গড়িত। ছেলেবেলায় আমরা তাহা দিয়া খেলা করিয়াছি। কিন্তু আজকালকার খোকাদের হয়তো তাহা পছন্দই হইবে না। নরিয়াদের দেবতা ঐ হাতি ঘোড়া পাইয়াই যারপরনাই খুশি হয়। জানোয়ারগুলির অধিকাংশেরই হাত-পা ভাঙ্গা। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ভাঙ্গা হাতি ঘোড়া কেন দিয়াছ?' নরিয়া বলিল, 'আমরা কেন ভাঙ্গা দিব? ঠাকুর উহাতে চড়িয়া চড়িয়া হাত-পা ভাঙ্গিয়াছে।' তখন শুনিলাম, যে রোজ নাকি রাত দুপুরের সময় ঐ দেবতা বেড়াইতে বাহির হয়। এ-সকল হাতি ঘোড়া তখন আর ওরূপ ছোট-ছোট থাকে না, উহারা সত্য-সত্যই বড়-বড় হাতি ঘোড়া হইয়া যায়, আর ঠাকুর তাহাদের পিঠে চড়িয়া ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিয়া আইসে।

এ কথা শুনিয়া একজন বলিল, আমি তো এই খানেই থাকি;. কই আমি তো একদিনও তোমাদের ঠাকুরকে ঘোড়া চড়িয়া বেড়াইতে দেখি নাই!' নরিয়া বলিল, 'দেখিলে কি না তুমি আবার বলিতে আসিতে।' অর্থাৎ উহাদের বিশ্বাস, যে সে সময়ে কেহ ঠাকুরের সামনে পড়িলে তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু হয়।

নরিয়ারা বড়ই গরিব আর পরিশ্রমী। উহাদের কেহ সহজে ভিক্ষা করিতে চাহে না। সমুদ্রের ধারে বেড়াইতে গেলে নরিয়া ছেলেরা আসিয়া পয়সার জন্য বিরক্ত করে বটে, কিন্তু আমি কখনো তাহাদিগকে এমন কথা বলিতে শুনি নাই, যে ভিক্ষা দাও। কেহ হয়তো কতকগুলি কড়ি আনিয়া বেচিতে চাহিবে, নাহয় বলিবে, 'পানিমে যায়গা?' অর্থাৎ তুমি যদি একটা পয়সা দাও, তবে সে সমুদ্রের জলে নামিয়া তোমাকে কিছু তামাশা দেখাইতে প্রস্তুত আছে। তুমি রাজি হইলে উহারা নানারকম সাঁতার কাটিয়া দেখাইবে। রাজি না হইলে বার বার ঐ কথা বলিয়া তোমার কান ঝালাপালা করিয়া দিবে। তাহাতেও কাজ না হইলে ভেংচি কাটিয়া ডিগবাজি খাইয়া তোমাকে খ্যাপাইয়া তুলিবে। এক-দিন ইহারা একটা সং লইয়া আমাদের বাড়িতে আসিয়া বেজায় সোর সরাবৎ আরম্ভ করিয়া দিল। গোলমালের জ্বালায় অস্থির হইয়া আমি বাহিরে আসিয়া দেখি, একটার গায়ে ঘাস জড়াইয়া সেটাকে এক অদ্ভুত জন্তু সাজাইয়াছে, আর সবগুলি মিলিয়া তাহাকে লইয়া কোলাহল করিতেছে, ইচ্ছা, কিছু বকসিস আদায় করে। আমি তখন একটা দরকারি কাজে ব্যস্ত ছিলাম, কাজেই বকসিস দেওয়া দূরে থাকুক, আমি তাহাদিগকে তাড়াইতে পারিলে বাঁচি। সুতরাং আমি করিলাম কি, ঘরের ভিতর হইতে মোটা লাঠিগাছ লইয়া. দাঁত মুখ খিঁচাইয়া, চোখ ঘুরাইতে ঘুরাইতে দুই লাফে একেবারে তাহাদের সামনে আসিয়া উপস্থিত। তাহারা তখন আমাকে ঝড়, না ভূমিকম্প, না ইঞ্জিন, না পাগলা হাতি, কি মনে করিয়াছিল তাহা উহারাই জানে, কিন্তু এক-বার আমাকে দেখিয়া আর কেহ দুবার দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিল না। সংটাই সকলের আগে ছুটিয়া পলাইল।

বাস্তবিক সমুদ্রের ধারের অসুবিধার মধ্যে এই নরিয়া ছেলেগুলিকে ধরিলেও অন্যায় হয় না। ইহাদের লম্ফঝম্প দেখিয়া মাঝে মাঝে আমোদ বোধ হয় বটে, কিন্তু স্ত্রীলোক অথবা নিরীহ লোক দেখিলে ইহারা অনেক সময় বড়ই অভদ্রতা করিয়া থাকে। আবার ইহাদের কোনো কোনোটার চুরির অভ্যাসও আছে।

এবারেও যে সমুদ্রে স্নান করিয়া খুব আনন্দ পাইয়াছি তাহা বলাই বাহুল্য। এখনো আমার হাঁটুতে তাহার দাগ আছে। তিন মাসের মধ্যে একটি দিন মাত্র আমার স্নান বাদ গিয়াছিল সেদিন সমুদ্রে সাইক্লোন হইতে-ছিল। তখন সমুদ্রের চেহারা দেখিয়া আর নামিতে ভরসা হয় নাই। তার পরেই পূর্ণিমার জোয়ার ছিল ; তখনো সমুদ্র খুবই চঞ্চল, কিন্তু স্নান বন্ধ হয় নাই। তবে সেদিনকার সেই পাগলা ঢেউয়ের হাতে যে শক্ত দুইটা আছাড় খাইয়াছিলাম, তাহার কথা অস্বীকার করিতে পারি না। প্রথমে একটা ঢেউ

আসিয়া আমাকে নাকি মুখ থুবড়িয়া দিয়া ফেলিয়াছিল। তাহাতে আমি একটু পিছন বাগে জোর করিয়া সাবধান হইলাম, যেন আর থুবড়িয়া ফেলিতে না পারে। কিন্তু তাহার পরের ঢেউটা যখন আমাকে বালির উপরে চিৎ করিয়া ফেলিয়া কুড়ি হাত লম্বা বিষম এক ধাক্কা দিল, তখন বুঝিলাম যে এর চেয়ে মুখ থুবড়িয়া পড়া ঢের ভালো ছিল।

সূর্যগ্রহণের দিন স্নানের ঘটা খুব বেশি হয়; এবারে সূর্যগ্রহণের সময় পুরীতে ছিলাম। গ্রহণ আরম্ভ হইবার পূর্বেই বিস্তর লোক আসিয়া সমুদ্রের ধারে জড় হইল। অমাবস্যার জোয়ারে সমুদ্রের তেজ খুবই বেশি হয়, কাজেই সেদিনকার স্নান খুব কষ্টকর হইয়া থাকে। কিন্তু স্নানের সময় উপস্থিত হইলে প্রায় কেহই কষ্ট অথবা বিপদের দিকে তাকাইল না। যাহারা নিজে স্নান করিতে পারে না, তাহাদিগকে অপর বলিষ্ঠ লোকেরা সাহায্য করিতে লাগিল। এক-এক জায়গায় দেখিলাম, দশ-পনেরোজন হাত ধরাধরি করিয়া স্নান করিতে নামিয়াছে। আমার বোধ হয়, সেদিন বেশি ভিড়ের সময় প্রায় কুড়িহাজার লোক সমুদ্রের ধারে উপস্থিত ছিল। সর্বসুদ্ধ যে ইহার অনেক বেশি লোকে স্নান করিয়াছিল, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই।

গ্রহণের সময় আমরা কালো কাচের ভিতর দিয়া সূর্য দেখিতেছিলাম। একটি কানা উড়িয়া স্ত্রীলোক সেই কাচের ভিতর দিয়া সূর্য দেখিয়া ভারি আশ্চর্য হইয়া গেল। সে মনে ভাবে নাই যে, সূর্যটাকে ওরূপ আধখানা দেখিতে পাইবে। খানিক ভাবিয়া সে বলিল, আমি কিনা একচোখে দেখি, তাই আধখানা বৈ দেখতে পাই নি।

মেঘের মুলুক

১

ছিলাম মাঠে, এসেছি মেঘের মুলুকে দার্জিলিঙে। কলকাতার চেয়ে সাড়ে সাতহাজার ফুট উঁচুতে। সাড়ে সাতহাজার ফুটে প্রায় দেড় মাইল হয়; সেটা যে ঠিক কতখানি উঁচু, মনের ভিতরে তার একটা পরিষ্কার আন্দাজ করা ভারি শক্ত।

শকুনগুলো অনেক সময় প্রায় হাজার ফুট উঁচুতে উঠতে পারে। আবার বর্ষার মেঘও মাঝে মাঝে হাজার ফুট নিচু অবধি নেমে আসে; হয়তো তার চেয়েও নীচে নামে, বা শকুন যত উঁচুতে উঠতে পারে, সাড়ে সাতহাজার ফুট তার চেয়েও পাঁচ-সাত গুণ উঁচু।

আমরা ছেলেবেলায় বুড়োদের মুখে শুনতাম যে মেঘেরা বাঁশের পাতা খেতে পাহাড়ে যায়, তখন কোচেরা (একরকম পাহাড়ী লোক, যাদের নামে কুচবিহার হয়েছে)। তাদের বল্লম দিয়ে মারে। সেই মেঘ তারা নীচের লোকদের কাছে বেচতে আনে, তাকেই আমরা বলি অভ্র!

এ কথা যে ঠিক নয়, তা অবশ্যি তোমরা সকলেই জান। ঢিপিপানা মেঘে রোদ পড়লে তার চেহারা অনেকের কাছে অভ্রের মতো ঠেকতে পারে। মেঘ হাওয়ায় ভেসে ভেসে ক্রমাগতই গিয়ে পাহাড়ের গায়ে ঠেকছে আর সেখানে বাঁশেরও অভাব নাই। এখন যেমন দার্জিলিং অবধি রেল হয়েছে, আগে তো আর তেমন ছিল না। সেকালের লোকেরা দূর থেকেই এসব দেখে, অভ্রের গল্প তয়ের করেছিল।

শোনা যায় একজন সাহেব পাহাড়ী মুটের ঝাঁকায় চড়ে প্রথমে দার্জিলিং এসেছিলেন। সে অবশ্যি অনেকদিনের কথা, তখন পাহাড়ে উঠবার কোনো-রকমের পথই ছিল না। জানোয়ার চলবার পথ ছিল, সেই পথ ধরে পাহাড়ীরা গভীর বনের ভিতর দিয়ে নীচে নেমে আসত আর লোকজনের উপর ভারি দৌরাত্ম্য করত। সেই পাহাড়ীদের দৌরাত্ম্য বন্ধ করবার জন্য আমাদের সরকার পাহাড়ের নীচে, বনের ধারে পাহারা রাখতেন।

পাহাড়ের নীচেকার এসব জায়গার নাম তরাই। তরাই বড় ভয়ানক স্থান, তখন আরো ভয়ানক ছিল। সেখানে গেলে দু-তিন মাসের ভিতরে জ্বর আর পিলেয় ভুগে হাড্ডিসার হয়ে যেতে হত। সরকারি পাহারাওয়ালারা এমনি করে ভুগত আর পাহাড়ীদের মুখে শুনত যে পাহাড়ের উপরকার জায়গা বড়ই খাসা। শেষে-দু-একজন লোক সাহস করে উপরে গিয়ে দেখে এল সত্যিসত্যিই সে-সকল জায়গা খুব ভালো।

এমনি করে লোকে প্রথমে দার্জিলিঙের কথা জানতে পেরেছিল। দার্জিলিং যাবার পথটি যখন প্রথম তয়ের হয়, তখন তার প্রত্যেক মাইলে ষাটহাজার টাকা খরচ পড়ে। সেই পথের ধারে ধারেই এখন রেলের লাইন বসেছে। খেলনার মতন ছোট-ছোট গাড়ি দেখলে হাসি পায়। ছোট একটি ইঞ্জিন, তার পিছনে ঐরকম আট-দশখানা গাড়ি জুড়ে ট্রেণ হয়েছে, তারই ভিতরে গুটিসুটি হয়ে বসে, হাঁ করে পথের শোভা দেখতে দেখতে দার্জিলিং যেতে হয়।

দার্জিলিঙের পথে বনের শোভা বড় চমৎকার। একলা সে বনের ভিতর যেতে হলে প্রাণটি হাতে করে যেতে হয়, কিন্তু ট্রেণে যেতে কোনো ভয় নেই। একবার কিন্তু ট্রেণের সামনে একটা মস্ত বুনো হাতি পড়েছিল। সে হয়তো ট্রেণটাকে নতুনরকমের কোনো জানোয়ার মনে করে থাকবে, তাই বোধ হয় লাইনের উপর দাঁড়িয়ে সে ভাবছিল যে সেটার সঙ্গে লড়বে কি ভাগবে। এমন সময় ড্রাইভার পোঁ করে বাঁশি বাজিয়ে ট্রেণখানাকে খুব জোরে চালিয়ে দিল আর হাতিও তা দেখে মাগো! বলে লেজ গুটিয়ে দে প্রাণপণে ছুট!

ট্রেণখানি সেই বনের ভিতর দিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে কেন্নোর মতো এঁকেবেঁকে চলে। ত্রিশ ফুট পথ এগুলে তার এক ফুট উঁচুতে ওঠা হয়। পথের ধারে বিশাল বড়-বড় সব গাছ, তাতে নানা রঙের ফুলও আছে ; কোনো কোনোটাকে প্রকাণ্ড লতার জালে জড়িয়ে রেখেছে, কোনো কোনোটার গায়ে লম্বা-লম্বা দাড়ির মতো শ্যাওলা ঝুলছে। নীচের দিকে

তাকাই—উঃ! কি ঘন বন! পাহাড়ের গা ঢেকে দিনকে রাত করে রেখেছে। যদি গাড়ি থেকে পড়ে যাই, তা হলে অমনি বনের ভিতর দিয়ে গড়িয়ে কোথায় চলে যাব। উপরের দিকে তাকাই বাবা! কি উঁচু সব গাছ! জাহাজের মাস্তুলের মতো সোজাসুজি সেই কোথায় উঠে গিয়েছে। ত্রিশ-চল্লিশ হাত অবধি তাদের অনেকের গা একেবারে খালি, শুধু মাথায় খানিকটা ডালপালা। হঠাৎ দেখলে মনে হয় না যে তাদের সঙ্গে আমাদের কোনোরকম পরিচয় আছে। কিন্তু একটু ভালো করে দেখলে মাঝে মাঝে এক-একটা শিমুল, কদম বা আর কোনো জানা গাছ ধরা পড়ে, তাদেরও সেইরকম হাড়গিলে-পানা চেহারা।

গাছের আলো না হলে চলে না। সেই আলোর জন্য ব্যস্ত হয়ে তারা রেষারেষি করে কেবলই উঁচু হতে থাকে। কেননা, ঘন বনের ভিতরে পাশ দিয়ে আলো খুব কমই আসতে পারে, পাশাপাশি বাড়বার জায়গাও নাই। এসব বনে যে বাঁশ যথেষ্ট আছে, সে কথা আগেই শুনেছ। এসব বাঁশের একেকটা এমনি মোটা যে খুব রোগা একজন লোকের কোমরের সঙ্গে তার একটাকে মেপে বাঁশটাই মোটা দাঁড়িয়েছিল।

এর এক-একটা চোঙ্গায় এক কলসী জল অনায়াসে ধরে। পাহাড়ী লোকেরা এই চোঙ্গা দিয়েই কলসীর কাজ চালায়। কলসীর চেয়ে এগুলো নিয়ে পাহাড়ে চলতে ফিরতে অনেক সুবিধা, তাতে আবার এগুলো সহজে ভাঙ্গে না। বনের ভিতরে বড়-বড় অনেক কলাগাছও দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু সে কলা বানরেও খেতে পারে কিনা সন্দেহ, তাতে এতই বীচি।

এমনি বনের ভিতর দিয়ে চলতে চলতে ঝাঁ করে ট্রেণখানা এক-একটা ফাঁকা জায়গায় আসে ; তখন দেখা যায় ইস্, কত উঁচুতে উঠে এসেছি। বাঙ্গালার মাঠ ঐ ধু-ধু করছে। বড়-বড় নদীগুলি সাদা আঁচড়ের মতো সেই কোথায় চলে গিয়েছে।

দেড়হাজার ফুট উঁচুতে উঠলে মেঘের সঙ্গে দেখা হয়। দেশে বসে আকাশের পানে তাকিয়ে আমরা যে-সব ভারী ভারী মেঘ দেখতে পাই, তারা মোটামুটি এইরকম উঁচুতেই থাকে। ক্রমে হয়তো ট্রেণ তার ভিতরে ঢুকে যায়। তখন আর বুঝতে বাকি থাকে না যে আমরা যাকে কুয়াশা বলি, এ ঠিক সেই জিনিস। দূরে থেকে তাকে দেখলেই সে মেঘ, আর ভিতরে ঢুকে দেখলেই সে কুয়াশা।

ততক্ষণে বনের শোভা একটু কমে এসেছে, আর মেঘের আর মাঠের শোভা বাড়ছে। মাঝে মাঝে একেকটা সুন্দর ঝরনাও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। আগে পাগলাঝোরা বলে একটা খুব বড় ঝরনা ছিল, তার পাগলামি একটু বেশি হলেই সে রেলের পথটা ভেঙ্গে ঠিক করে দিত। এখন পাহাড়ের গায়ে নানান দিকে পথ করে তাকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ; কাজেই আর তার তেমন রাগ রঙ্গ নাই। তিনহাজার ফুটের উপরে উঠলে এই ঝোরাটাকে দেখতে পাওয়া যায়। প্রথমে যে-সব মেঘের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, এরপর থেকে

তারা ক্রমেই নীচে পড়ে যেতে থাকে। তারপর ক্রমে মাঠের যে কী শোভা হতে থাকে, সে না দেখলে বুঝবার সাধ্য নাই। তখন আমাদের দেশের ভারী ভারী মেঘগুলোকে দেখে মনে হয় যেন তারা দল বেঁধে ঘাস খাবার জন্য মাঠে গিয়ে নেমেছে।

এক মাইল উঁচুতে উঠলে প্রায় নব্বুই মাইল দূর অবধি মাঠ দেখতে পাওয়া যায়। অবশ্য এত দূর থেকে বিশেষ কিছুই বুঝতে পারা যায় না, কিন্তু মনের ভিতরে কি যে একটা আনন্দ হয় সে কি বলব!

এতক্ষণে আর-একটা খুব আনন্দের ব্যাপার ঘটে যায়। প্রায় সাড়ে চার-হাজার ফুট অবধি ট্রেণখানা বড়-বড় পাহাড়ের দক্ষিণদিক বেয়ে চলতে থাকে; সে-সব পাহাড়ের উত্তরে যে কি আছে তা দেখা যায় না। তারপর যেই হঠাৎ একবার মোড় ফিরে, সেই পাহাড়গুলোকে ডান হাতে ফেলে সে উত্তরমুখো হয়, অমনি দেখা যায়, হিমালয়ের সাদা সাদা বরফে-ঢাকা চূড়োগুলো রোদে ঝিকমিক করছে।

তার পরে শীতটিও ক্রমে জেঁকে উঠতে থাকে, তখন আর বুঝতে বাকি থাকে না যে এবারে এক নতুন রাজ্যে আসা গেছে : তার নতুনরকমের হাওয়া, নতুনরকমের শোভা : সেখানে নতুন ধরনের মানুষ, নতুনতর মেঘের খেলা।

২

দার্জিলিঙের পথে সবচেয়ে উঁচু স্টেশন হচেছ ঘুম। দার্জিলিং তারই এক স্টেশন পরে, আর খানিকটা নীচে। এই পথটুকু ট্রেণখানি আপনি গড়িয়ে যায়, ইঞ্জিনের আর তাকে টানতে হয় না। নেমে আসবার সময় দার্জিলিং থেকে ঘুম অবধি ট্রেণখানাকে ইঞ্জিনে টেনে পেঁছে দেয়; তারপর ঘুম থেকে সুকনা অবধি ট্রেণ অমনি চলে আসে। ইঞ্জিনখানা তাকে সামলে রাখবার জন্য সঙ্গে থাকে বটে, কিন্তু তার টানতে তো হয়ই না, ব্রেক কষে একটু পিছনবাগে ঠেলে রাখতে হয়।

ঘুম থেকে দার্জিলিং মোটে পাঁচমাইল, এইটুকু যেতে আর বেশি সময় লাগে না। চলতে চলতে হঠাৎ একবার মোড় ফিরেই দার্জিলিং শহরটি দেখতে পাওয়া যায়। ময়রার দোকানে যেমন করে মিঠাইয়ের থালাগুলি সাজিয়ে রাখে, পাহাড়ের গায়ে বাড়িগুলি অনেকটা সেইভাবে সাজানো। দেখতে ভারি সুন্দর লাগে। কিন্তু দার্জিলিঙের আসল শোভা ঘর-বাড়িতে নয়, সে হচ্ছে মেঘের আর হিমালয়ের আর আলো আর ছায়ার শোভা।

দেশে থেকে ঘরে বসে আমরা এই মেঘকেই দেখতে পাই; এই মেঘই সমুদ্রের কোলে জন্মলাভ করে, বাঙ্গালার মাঠের উপর দিয়ে এতখানি হাওয়া বেয়ে এসে দার্জিলিঙে উপস্থিত হয়েছে। দেশে বসে তো শিশুকাল থেকে একে দেখে দেখে বুড়ো হয় গেছি, তবে আবার এখানে এসে এর এত নতুন শোভা হল কোত্থেকে?

শোভা হয়েছে এইজন্য যে আমাদের দেশে থাকতে দূর হতে উপরবাগে চেয়ে, তার দিকে ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করে তাকিয়ে থাকতাম, আর এখন তার নিজের দেশে এসে, তার পেটের ভিতর ঢুকে তার নাড়ী-নক্ষত্র সব টের পাচ্ছি। আগে ছিলাম বিদেশী, এখন হয়েছি তার দেশের লোক। সে হামাগুড়ি দিয়ে পাহাড় ডিঙিয়ে, আমাদের ঘরের ভিতরে এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করে যায়। বেড়াতে বেরুলে আমার দাড়ি ভিজিয়ে দিয়ে আমার সঙ্গে রসিকতা করে। হাত ভিজাবে না, নাক মুখ কান কিচ্ছু ভিজাবে না, ধুতি ভিজাবে না, ছাতা ভিজাবে না ; ওর যত ঝোঁক আমার ঐ ঝাঁকড়া দাড়ি-গোঁফগুলোর উপরে আর পশমী কাপড় চোপড়ের উপরেও কতক। এ-সবের উপরে মুক্তার বিন্দু ছড়ানোই যেন তার কাজ।

অনেকদিন ভোরের বেলায় উঠে দেখি ; পাহাড়ের পিঠের উপরে মেঘের খোকারা ঘুমিয়ে আছে, তাদের মাথার উপর দিয়ে হিমালয়ের ঝাপসা ছেয়ে রঙের চূড়াগুলি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। তখনো সূর্য উঠে নি, পূবের আকাশে লাজুক হাসির মতো একটু আলো দেখা দিয়েছে মাত্র। ক্রমে হিমালয়ের মুখ রাঙা হয়ে উঠতে লাগল, ব্যস্ত হয়ে রঙ ঢেলে তুলি নিয়ে বসলাম, মনে হল কতই কিছু আঁকব।

দুষ্টু মেঘের খোকা! রোদের গন্ধ পেয়ে সে বেচারাও তাদের বিছানা ছেড়ে উঠে বসেছে। তারপর এক পা দু পা করে, না জানি কোন দেশের পানে তারা রওয়ানা হল। হিমালয় দিল ঢেকে, আমার আঁকবার আয়োজন সব দিল মাটি করে। দেখতে দেখতে তারা পাহাড় বন বাড়ি ঘর সব গ্রাস করে ফেলল। তখন আর আশপাশের বাড়ি ঘর গাছপালা কিছুই দেখবার জো নেই। আমাদের বাড়িখানা যে মজবুত পাহাড়ের উপরে দাঁড়িয়ে আছে, পুষ্পক রথের মতো শূন্যে উড়ে পরীর মুলুকের পানে ছুটে চলছে না, এ কথাটি বিশ্বাস করা ভার হয়ে উঠল। আবার তার দশমিনিট পরেই দেখা গেল যে মেঘ সব উড়ে গিয়ে চারদিক রোদ ঝকমক করছে।

সারাদিন ভরে এমনিতর খেলা। কখনো গেঁড়ির মতো হামা দিয়ে পাহাড় বেয়ে ওঠে, কখনো ভেড়ার পালের মতো পাহাড়ের গায়ে বসে দল বেঁধে বিশ্রাম করে, কখনো বিশাল দৈত্যের মতন উঠে দাঁড়িয়ে সৃষ্টি আড়াল করে ফেলে। ঐ যে ভারী ভারী মেঘগুলো জল ঢেলে আমাদের দেশ ভাসিয়ে দেয়, তাদের এক-একটা যে কত উঁচু, তা এখানে এলে বেশ বুঝতে পারা যায়।

ঐ দেখ সকল পাহাড়ের হাঁটুর নীচে, বাংলাদেশের মাটির কাছে, তার তলা থেকে বৃষ্টির ধারা নামছে, আর তার মাথা দশহাজার ফুট উঁচু পাহাড় ছাড়িয়ে আরো প্রায় দশ হাজার ফুট উপরে উঠে গিয়েছে।

সারাদিন ভরে এমনিতর খেলা। তারপর সন্ধ্যাবেলায় শীত লেগে, আবার হয়তো তাদের ঘুমের কথা মনে হয় : অমনি তারা পাহাড়ের উপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে, নাহয় দুই পাহাড়ের মাঝখানের গর্তে নেমে, তাকে পরিপূর্ণ করে, বিশ্রাম করতে থাকে। দেখলে মনে হয়, না জানি কোন ধুনুরী মেঘের তুলো ধুনে রেখে

দিয়েছে, তা দিয়ে ঘুমপাড়ানী মাসির লেপ তয়ের হবে।

মনে কোর না যে রোজই এমনিতর হয়। এর শোভা নিত্য নূতন। কখনো বা মেঘে আর রোদে মিলে পাহাড়ের গায়ে রঙ বেরঙের ঢেউ খেলিয়ে চোখ জুড়িয়ে দেয়, কখনো-বা ঘড়্ ঘড়্ গর্জনে দিক বিদিক্ আঁধার করে, দিনের পর দিন খালি জলই ঢালতে থাকে। বর্ষাকালের আগাগোড়াই প্রায় এমনি ভাব। তখন প্রাণ ঝালাপালা হয়ে যায়, আর এদেশে থাকতে ইচ্ছা হয় না।

বৎসরের মধ্যে শরৎকালটি এখানে সকলের চেয়ে সুন্দর ; তখন আকাশ পরিষ্কার থাকে আর হিমালয়ের অতি চমৎকার শোভা হয়। কিন্তু তার কথা আরেক দিন বলব।

৩

যত উঁচুতে ওঠা যায়, ততই শীত। কলকাতার চেয়ে দার্জিলিঙে বেশি শীত, আবার দার্জিলিঙের চেয়ে হিমালয় পর্বতের উপরে বেশি শীত। সেখানে বারো মাসই বরফ পড়ে থাকে, তাই সে-সব পাহাড় দেখতে সাদা।

অবশ্য দার্জিলিংও হিমালয়ের উপরে, কিন্তু তত উঁচুতে নয়। আগে কতকগুলো ছোট-ছোট পাহাড় পার হয়ে তবে হিমালয়ে পৌঁছাতে হয়। দার্জিলিং সেই ছোট পাহাড়ের উপরে। এগুলোকে বলে উপ-হিমালয়। দার্জিলিং থেকে উত্তরদিকে তাকালে হিমালয় যে কি সুন্দর দেখা যায়, কি বলব। এত উঁচু পাহাড় পৃথিবীতে আর কোথাও নাই ; এক জায়গায় দাঁড়িয়ে সার-বাঁধা এতগুলো বিশাল পর্বতও আর কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না। নীচের দিকে তাকাও, রঙ্গিত নদী দেখতে পাবে, সে প্রায় বাংলার মাঠের সমানই নিচু। উপরের দিকে তাকাও, দেখবে হিমালয় চূড়াগুলি যেন আকাশের গায়ে ঠেকে আছে ; তার সকলের চেয়ে উঁচুটি পাঁচ মাইলের-ও বেশি উঁচু। রঙ্গিতের ধারে প্রায় আমাদের এখানের মতনই গরম, আর হিমালয়ের উপরে ভয়ংকর ঠাণ্ডা। সেখানে আজও কেউ যেতে পারে নি, যদিও অনেক চেষ্টা করছে। গাছপালা সেখানে জন্মায় না, খুব উপরে জীবজন্তু থাকবার জো নাই।

এত উঁচুতে বাতাস এমন হাল্কা যে নাক দিয়ে ভালো করে নিশ্বাস ফেলাই কঠিন। কুড়িহাজার ফুট উঁচুতে গেলেই হাঁপ ধরে অস্থির করে দেয় ; কাঞ্চনজঙ্ঘার উপরে গেলে কেমন হবে, তা তো কেউ বলতেই পারে না। কাঞ্চনজঙ্ঘাই হচ্ছে দার্জিলিঙের ওখানকার সব চেয়ে উঁচু পর্বত, ২৮১৫৬ ফুট উঁচু ; তারপর জানু, ২৫৩০৪ ফুট ; তারপর কব্রু, প্রায় ২৪০০০ ফুট ; তারপর পাণ্ডিম, ২২০১৭ ফুট ; তারপর নর্সিং, ১৮১৪৫ ফুট। এমনি করে পরপর কত যে দাঁড়িয়ে আছে, আমি তা বলে শেষ করতে পারব না। আর এই বুড়া বয়সে তাদের সব কটার নাম মুখস্থ করতে গেলে আমার প্রাণই বেরিয়ে যাবে।

আমরা বলি কাঞ্চনজঙ্ঘা, কিন্তু আসলে নাকি সেটা বাংলা কথা নয়। আসল কথাটি হচ্ছে 'খাঁচেন-ঝ-ঙ্গা'। তার মানে বলছি, শুন। 'খাঁচেন' কিনা বড্ড হিম ; 'ঝ' মানে পাঁচ ; আর 'ঙ্গা' হচ্ছে পর্বত।

অর্থাৎ কিনা পাঁচটি পর্বত মিলে ঐ পর্বতটি হয়েছে আর সেখানে বড্ড হিম। এ কথা আমি একটি পুস্তকে পড়েছিলাম, সুতরাং সত্য হওয়া আশ্চর্য নয়।

হিমালয়ের আরেকটা চূড়া আছে, সে কাঞ্চনজঙ্ঘার চেয়েও উঁচু। তোমরা অনেকেই তার নাম শুনেছ। ইংরাজরা তাকে বলে এভারেস্ট, দেশী লোকেরা বলে গৌরী-শঙ্কর, পাহাড়ীরা নাকি বলে ধেও-গঙ্গা। তার মানে যে কি, সে কথা আমি বলতে পারব না। আরেকটু হলেই এই পর্বতটি দার্জিলিং থেকে দেখা যেত। সিঞ্চল থেকে তার আগা দেখতে পাওয়া যায়।

এতোগুলো বড়-বড় পর্বত এক জায়গায় থাকার একটু অসুবিধা আছে। এ বলে, 'আমাকে দেখ।' ও বলে, 'আমাকে দেখ।' কাজেই ওরা যে বাস্তবিকই কত বড়, সে কথা চট করে মাথায় আসে না। আমাদের বাংলার মাঠে এর একটাকে পাওয়া যেত, তবে তার আদর বেশ ভালো করেই হত। এদেশের পরেশনাথ পর্বতখানি ৪৫০০ ফুট মাত্র উঁচু, তাকে দেখেই কত লোকে অবাক হয়ে যায়।

আর এক কথা এই হচ্ছে যে এ-সকল পর্বত যে দার্জিলিঙের খুবই কাছে, তা নয়। কাঞ্চনজঙ্ঘা সেখান থেকে সোজাসুজি পঁয়তাল্লিশ মাইল দূরে। কিন্তু পাহাড়ের পথ দিয়ে সেখানে পৌঁছাতে প্রায় দুশো মাইল হাঁটতে হয়। অথচ, সেখানকার হাওয়া যারপরনাই পরিষ্কার বলে তাকে এতই স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায় যে তাকে এত দূরের জিনিস বলে বোঝাই কঠিন হয়। কাজেই সে আসলে যত বড়, দেখলে মনে হয় যেন তার চেয়ে ঢের ছোট।

যে হিমালয়ে না গিয়েছে, সে বুঝতেই পারবে না সেখানকার হাওয়া কত পরিষ্কার। দশ মাইল দূরের জিনিসটিকে এত স্পষ্ট দেখা যায় যে মনে হয় যেন সে দু-তিন মাইল মাত্র দূরে। কুড়ি মাইল, পঁচিশ মাইল দূরে পাহাড়ের উপরে বাড়ি আছে, পরিষ্কার দিনে তাতে রোদ পড়ে ঝক-ঝক করতে থাকে। এত দূর থেকে নিতান্তই বিন্দুটির মতো ছোট দেখায়, নইলে তার দরজা জানলা গুণে দেওয়া যেত।

এই পরিষ্কার বাতাসেই হিমালয়কে এমন ঝকঝকে করে রেখেছে। সেখানকার রোদের একটা জ্যোতি আছে, যা আমাদের এই ধুলোমাখা রোদে নাই। তার উপরে আবার ঝক্‌ঝকে বরফ। তার উপরে রোদের খেলা একবার যে দেখেছে, সে আর জন্মে তা ভুলতে পারবে না। যদি পারে, সে বড় দুঃখী লোক।

ভোরে আর সন্ধ্যায় যখন ঘন ঘন রোদের রঙ বদলাতে থাকে, তখন হিমালয়ের চেহারাও পলে পলে নূতন হতে থাকে। এই মিছরির কুঁদোর মতো, এই আগুনের মতো, এই সোনার মতো, এই মুক্তোর মতো,

এই গরদের উপর চাঁদির কাজের মতো, এই খড়ির মতো যেন জাদুকরের ভেল্কি। এমনি করে দিনটি কেটে গিয়ে বিকালে আবার সোনার মতো, আগুনের মতো, মানিকের মতো হয়ে পালা শেষ করে। বেগুনী রঙের পাহাড়ের মাথায় সেই মানিকের মতো বরফ, সে যে কি সুন্দর, তার তুলনা কোথাও নাই। রাজরানীর বহুমূল্য পোশাক আর মুকুট তার কাছে লাজে মাথা হেঁট করে।

এমনি করে রাত্রি এসে উপস্থিত হয়। তখন যদি আকাশে উজ্জ্বল চাঁদ থাকে, তবে তার শোভা হয় যেন আরো চমৎকার। অবশ্য তাতে তেমন তাক লাগিয়ে দেয় না, কাজেই সকলের কাছে তার তেমন আদর নাও হতে পারে। কিন্তু যে বোঝে, সে দেখেই বলে, 'আহা!'

লোকে বলেছে ওখানে দেবতাদের বাস। এমন সুন্দর জিনিস দেখে ও কথা বলবে, এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নাই। ও যে কতখানি সুন্দর, এ-সব কথায় তাই বোঝা যাচ্ছে।

যা হোক, দূরে থেকে সুন্দর হলেও, ও-সকল বড় ভয়ংকর স্থান। হিমালয় পার হয়ে তিব্বত যেতে হয়, কিন্তু পার হওয়ার মতো নিচু জায়গা ওতে বেশি নাই। যে কয়েকটি জায়গা আছে, তার কোনটাই প্রায় পনেরো ষোলো হাজার ফুটের কম উঁচু হবে না। তাতেও আবার শীতকালে যাবার জো নাই, কারণ তখন সে-সব জায়গা বরফে ঢাকা থাকে। গ্রীষ্মকালে চমরীর পিঠে চড়ে, ঝড়ের, শীতের আর বরফের তাড়ায় নাকাল হয়ে, অনেক কষ্টে সে পথে চলতে হয়।

মহারাজা সায়াজী রাও গাইকোয়াড়

আজ তোমাদিগকে ভারতের এক স্বাধীন নৃপতির জীবনের কথা বলিব। (বর্তমান কালের আমাদের দেশে যে সমুদয় মহানুভব ব্যক্তি জীবিত আছেন, ইনি তাঁহাদের মধ্যে একজন।) রাজ ঐশ্বর্যের মধ্যে প্রতিপালিত হইয়া ইনি যেপ্রকার প্রকৃত মনুষ্যত্ব ও মহত্ত্বে অগ্রসর হইয়াছেন, সচরাচর তেমন দেখা যায় না। উপরে উপরে দেখিলে মনে হইতে পারে, যাহারা ধনৈশ্বর্যের মধ্যে বর্ধিত তাহাদের পক্ষে মহৎ-জীবন লাভ করা সহজ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখা যায় যে ধনী অপেক্ষা দরিদ্রশ্রেণীর মধ্য হইতেই জগতের অধিকাংশ মহাজন উদ্ভূত হইয়া থাকেন। ইহার কারণ নির্দেশ করাও কঠিন নহে। সংগ্রামে বিপদে ও পরীক্ষায় মানব-চরিত্রের গূঢ় শক্তি সকলের বিকাশ হয়। সম্পদের ক্রোড়ে যাঁহারা লালিত, প্রায়ই ভোগবিলাসের তরঙ্গে তাঁহাদের হৃদয়ের উচ্চ ভাবসকল ভাসিয়া যায়। সকল দেশেই ধনী ও সম্পদশালী লোকদের মধ্যে প্রকৃত মহত্ত্ব বিরল। বিশেষত ভারতবর্ষে ধন এবং মহত্ত্বের একত্র সমাবেশ অতি অল্পই দেখা যায়। বরোদার বর্তমান গাইকোয়াড় মহারাজা সায়াজী রাওয়ের জীবনে কিন্তু এই উভয়ের সুন্দর সম্মিলন হইয়াছে। একদিকে তিনি যেমন রাজা,

বংশগৌরবে অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন, অপর দিকে জ্ঞানে তিনি তৃতীয় স্থানীয়। কিন্তু সেজন্য তাঁহার মহত্ত্ব নহে। তাঁহার সমকক্ষ গুণে এবং চরিত্রের প্রভাবে তিনি সর্বজনপ্রিয়। ভারতের রাজন্যগণের মধ্যে এবং তাঁহার অপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী রাজা তো অনেকে আছেন। আপন আপন রাজ্যের বাহিরে তাঁহাদিগের নাম অধিক শুনা যায় না। কিন্তু বরোদার মহারাজা সায়াজী রাও-এর নাম ভারতের সর্বত্র সুবিখ্যাত। সম্প্রতি তাঁহার রাজ্যারোহণের পঞ্চবিংশ বাৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। তাহাতে সকল প্রদেশের লোক আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বাস্তবিকই আদর্শ নরপতি। বিধাতা তাঁহাকে যে উচ্চ পদ দিয়াছেন, প্রচুর ধনৈশ্বর্য এবং শক্তি দিয়াছেন এ সমুদয়ই তিনি আপনার প্রজা এবং সমগ্র ভারতবাসীর কল্যাণের জন্য উৎসর্গ করিয়াছেন। অন্যান্য রাজাদের ন্যায় ভোগবিলাসে, আমোদপ্রমোদে, আলস্য বা ইংরাজ রাজপুরুষদের তোষামোদে তাঁহার সময় অতিবাহিত হয় না। তিনি প্রতিদিন নিয়মিতরূপে, পাঠ আলোচনা, রাজকার্য পরিদর্শন এবং জনহিতকর কার্যে যাপন করেন। সাহিত্য, শিল্প, দর্শন ও বিজ্ঞানে তিনি সুপণ্ডিত। তাঁহার মতো বিচক্ষণ ব্যক্তি বর্তমান সময়ে আমাদের দেশে কম আছে। দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি বিষয়ে তিনি বহু চিন্তা করিয়াছেন। এ-সকল বিষয়ে তিনি অনেক সময়ে বক্তৃতা করিয়া থাকেন। ভারতবাসিগণ তাঁহাকে আপনাদের একজন প্রধান নেতা বলিয়া মনে করেন। আর তিনিও আপনাকে একজন বলিয়া মনে করেন। তিনি অনেক সময়ে বলিয়াছেন যে আমরা সকলেই এক ভারতমাতার সন্তান। তাঁহার বেশভূষায় বা ব্যবহারে, কোনো-প্রকার আড়ম্বর নাই। অতি সামান্য পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া সামান্য লোকের মতো তিনি সকলের সঙ্গে মিশিয়া থাকেন। তাঁহার আচরণে পদৈশ্বর্যজনিত গর্বের লেশমাত্র দৃষ্ট হয় না।

আমাদের দেশের সকলপ্রকার জনহিতকর কার্যের সঙ্গে তাঁহার পূর্ণ সহানুভূতি আছে এবং যাহা ভালো বুঝিয়াছেন, কাহারো দিকে দৃকপাত না করিয়া তিনি তাহা করিয়া যান। অনেকবার তিনি জাতীয় মহাসমিতিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। রাজন্যবর্গের কথা দূরে থাক, অনেক ক্ষুদ্র জমিদারেরা পর্যন্ত গবর্নমেণ্টের ভয়ে অনেক সময়ে এই-সকল সভায় উপস্থিত হইতে সাহস করেন না। অনেকে মনে করেন যে, গবর্নমেণ্ট এজন্য তাঁহার প্রতি বিরক্ত। কিন্তু তিনি গবর্নমেণ্টের অনুরাগ বিরাগ তুচ্ছ করিয়া প্রকাশ্যভাবে দেশের লোকের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষার সমর্থন করিয়াছেন। এ দুর্ভাগ্যদেশের প্রধান শত্রু ভয়,--রাজভয়, লোকভয়, সমাজভয়ে দেশের লোক অস্থির। মহারাজা সায়াজীরাও ইহার কোনো ভয়ই গ্রাহ্য করেন নাই। তোমরা হয়তো মনে করিতে পার, রাজার আবার ভয় কি? কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রাজাদেরই ভয়ের কারণ অধিক। বড় গাছেই বড় বাজ পড়ে। সামান্য লোকে যে-সব কাজ করিলে কেহই কিছু বলে না, রাজা বা বড় লোকেরা তাহা করিলে সকলেরই দৃষ্টি তাহাতে আকৃষ্ট হয়। এই এই কারণে রাজা ও উচ্চপদস্থ লোকদিগকে

সাবধানে চলিতে হয়। ভয়ের কারণ অধিক না থাকিলেও রাজাদের ভয় যে বেশি, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তাহার প্রমাণ, এই যে কোনো সৎসাহসের কার্যে তাঁহাদিগকে অগ্রসর দেখিতে পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে মহারাজা সায়াজী রাও একমাত্র দৃষ্টান্তস্থল বলিলে অত্যুক্তি না। একদিকে তিনি যেমন রাজভয়কে তুচ্ছ করিয়া কংগ্রেস প্রভৃতি সাধারণ জনহিতকর কার্যে প্রকাশ্য-ভাবে যোগ দিয়াছেন, অপর দিকে তিনি সামাজিক ভয়ের মস্তকে পদাঘাত করিয়া সমুদ্রযাত্রা, বিদেশ-ভ্রমণ প্রভৃতি সংস্কারে স্বয়ং দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। মহারাজা সায়াজী রাও একাধিকবার ইউরোপ এবং আমেরিকা গমন করিয়াছেন! অল্পদিন হইল তিনি মহারানীকে সঙ্গে লইয়া আমেরিকা ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন। প্রকাশ্য সভাতে ব্রাহ্মণ, শূদ্র, খৃস্টান, মুসলমান প্রভৃতি সকলের সঙ্গে বসিয়া আহার করিয়াছেন। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার, বিধবা-বিবাহ প্রচলন, নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের অবস্থার উন্নতি প্রভৃতি সমাজ-সংস্কারে তিনি অতিশয় উৎসাহী। তিনি বরোদা রাজ্যে আইন দ্বারা বাল্য-বিবাহ প্রথা দণ্ডনীয় করিয়াছেন। ইহাতে প্রজারা অনেক প্রতিবাদ করিয়া-ছিলেন। বোধ হয়, তিনি জনসাধারণের অপ্রিয়ও হইয়াছিলেন। কিন্তু লোক-ভয় অগ্রাহ্য করিয়া যাহা কল্যাণকর বোধ করিয়াছেন তাহাই করিয়াছেন। তাঁহার সুশাসনে বরোদা রাজ্যের অভূতপূর্ব উন্নতি হইয়াছে। দেশে শিক্ষা বিস্তার, ন্যায়বিচারের প্রতিষ্ঠা, শিল্প বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া তিনি জন-সাধারণের গভীর শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

অপর দিকে তাঁহার চরিত্র এবং পারিবারিক জীবন আদর্শস্থানীয়। সাধারণত যে-সকল দুর্নীতি সম্পদশালী ব্যক্তিদিগের চরিত্র কলঙ্কিত করে, মহারাজা সায়াজী রাওয়ের চরিত্রে তাহার ছায়াও স্পর্শ করে নাই। তিনি আদর্শ স্বামী এবং আদর্শ পিতা। নিজে যেমন আড়ম্বরশূন্য কর্মশীল জীবন যাপন করিতেছেন, পুত্র-কন্যাদিগকেও সেইপ্রকার শিক্ষা দিতেছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রিন্স ফতেসিংহ কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়া এখন রাজকার্য শিক্ষা করিতেছেন। দ্বিতীয় পুত্র প্রিন্স জয়সিংহ ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত হ্যারো স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া সম্প্রতি আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ লাভ করিয়াছেন; তৃতীয় পুত্র প্রিন্স শিবাজী রাও বোম্বাই নগরীতে শিক্ষালাভ করিতেছেন। একমাত্র কন্যা রাজকুমারী ইন্দিরা বরোদার প্রিন্সেস স্কুলে শিক্ষার্থ প্রেরিত হইয়াছেন। মহারাজা সায়াজী রাও আদর্শ-জীবন যাপন করিতেছেন। অতুল ঐশ্বর্যের প্রচুর শক্তি লাভ করিয়া, ভোগ বিলাসের সকল উপকরণ সত্ত্বেও যিনি নির্মল জীবনযাপন করিতে পারেন, এবং রাজভয় লোকভয় তুচ্ছ করিয়া একান্ত মনে কর্তব্যের পথে চলিতে পারেন, তিনি কি ধন্য নন? বরোদার গাইকোয়াড় মহারাজা সায়াজী রাও বর্তমান ভারতের গৌরব।

বিবিধ প্রবন্ধ

এই পর্যায়ে উপেন্দ্রকিশোরের যে প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হল, সেগুলি তাঁর প্রথম জীবনের রচনা। রচনাকাল ১৮৮৪ থেকে ১৯০৭-এর মধ্যে। প্রবন্ধগুলি নানান বিষয়ে। যেগুলি তথ্যমূলক সেগুলির একটি বড় আকর্ষণীয় দিক আছে। আজ থেকে আশি-নব্বুই বছর আগে পুরী দার্জিলিং ইত্যাদি জায়গার কেমন অবস্থা ছিল, সাধারণ জ্ঞান কতখানি বিস্তারিত ছিল, সে বিষয়ে পড়তে বেশ মজা লাগে। তারপর জ্ঞানের অনেক প্রসার হয়েছে, জায়গাগুলির অদলবদল হয়েছে, কাজেই তথ্যের দিক থেকে এ-সব রচনার অনেক মূল্য।

বিশেষ করে 'আকাশের কথা'র প্রবন্ধ-গুলি ধরা যাক। এখন মানুষ চাঁদে নেমেছে, কিন্তু প্রায় একশো বছর আগেও সে যে আকাশকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করত, এটাই হল বড় কথা। উপেন্দ্র-কিশোর এ বিষয়ে অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখ-লেও সেগুলিকে একত্র করে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন নি। তিনি তাঁর কন্যা পুণ্য-লতাকে বলেছিলেন যে দিনে দিনে আকাশ সম্বন্ধে নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কার হচ্ছে। পুরনো প্রবন্ধগুলি সেকেলে হয়ে গেছে, ওগুলিকে সংশোধন করে তবে পুস্তকা-কারে ছাপাই তাঁর ইচ্ছা। সে কাজ আর তিনি করে উঠতে পারেন নি। যদি-বা করতেন, তা হলেও তাঁর মৃত্যুর পরে এই যে প্রায় ষাট বছর কেটে গেছে, এর মধ্যে সে তথ্যও সেকেলে হয়ে যেত। ঐতিহাসিক দৃষ্টি নিয়ে এই রচনাগুলিকে পাঠ করতে হবে। এর তথ্যগুলি এখন অসম্পূর্ণ ও অপ্রচুর মনে হয়, কিন্তু সেকালেও বৈজ্ঞা-নিকরা কত নিষ্ঠার সঙ্গে গবেষণা করতেন, এগুলি পড়লে সেটা বোঝা যায়।

সূচীপত্র

কেনারাম সম্মুখের লোকটিকে দেখাইতেছেন। তাঁর নিজের পিঠের দিকে একবার দেখিলে হইত। নিজের দোষগুলিকে সকলেই পিছনে ফেলিয়া দিতে চায়। আমি চেঁচাইয়া বলিলাম, "লোকনাথ বড় রাগী, আমি তাহাকে ভালোবাসি না," বল দেখি ভাই, আমার সম্বন্ধে তুমি কিরূপ মনে করিতেছ? অন্যের ছেঁড়া মোজা দেখিয়া বিরক্ত হওয়ার আগে, নিজের জুতার ভিতর চাহিয়া দেখা ভালো। আমি যতক্ষণ বসিয়া থাকিব, ততক্ষণ তুমি হাঁটিতেছ না বলিয়া আমার বিরক্ত হওয়ার অধিকার কি? আর যদি এমন হয় যে আমি হাঁটিতেছি, তাহাতেই-বা কি হইল।

অন্যের তিলটিকে তাল করিবার পূর্বে নিজের তালটি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেওয়া ভালো। গম্ভীরভাবে বক্তৃতা করিলে কি হয়, পরক্ষণেই যদি বক্তা নিজের অসারত্ব হাতে কলমে বুঝাইয়া দেন, তবে লাভ কি হইল? লাভ হইল যে, অন্য কেহ ঐ বিষয় নিয়া আমাকে কিছু বলিলে, আমি তাহাকে বলিব, "আরো একজন একবার বলিয়াছিলেন।" আমার দোষ দেখিয়া তোমার কষ্ট বোধ হইয়াছে? ভালো। কিন্তু কষ্ট পাইয়া যদি তুমি আসিয়া মুরুব্বি লোকের মতন আমাকে বকিতে থাক, তবে হয়তো লাভের মধ্যে এই হবে যে, তোমাতে আমাতে যে ভালোবাসাটুকু ছিল তাহা আর থাকিবে না। ক্লাশে একটি নূতন ছেলে আসিল—বেচারাকে যেন খেলার সামগ্রী পাইলে; অত বোকা বুঝি আর কেহ কখনো দেখে নাই। কিন্তু মনে পড়ে কি? তোমাকে যখন ধরিয়া বাঁধিয়া ইস্কুলে মাস্টারমহাশয়ের কাছে দিয়া যাওয়া হইয়াছিল, তখন তুমিও একটি জানোয়ারের মতন ছিলে কি না? অন্যের ত্রুটি নিয়া হাসি-তামাশা করা যাঁহাদের অভ্যাস, তাঁহাদের অনেকেরই দেখা যায় মেজাজটি বড় উগ্র—কথা সয় না। ইঁহারা যদি অন্যের উপর ঢিল ছুঁড়িবার সময় নিজের গায়ে মারিয়া একবার পরীক্ষা করিয়া দেখেন, তাহা হইলে বড় ভালো হয়। নাহয় প্রতিপক্ষের পাটকেলটির সময় যেন মুখ বিকৃত না করেন। বাস্তবিক ওরূপ লোকের ঐ ঔষধ—আমি বলিলাম 'থক্' তুমি বলিলে 'থুঃ'। বেশ সমানে সমানে গেল। এরূপ বারকয়েক হইলেই দেখিবে আমার রোগ সারিয়াছে, আমি ভালোমানুষ হইয়াছি।

ভালো ঠাট্টা কয়জন করিতে পারে? কথা শুনিয়া হাসিলাম; উপকারও হইল; এরূপ কথা কয়জন বলিতে পারে? প্রায়ই তো দেখি, তুমি বলিলে, আমি হাসিলাম, আর যদু চটিল। আমাদের দেশের একজন প্রতিভাশালী লোক বলিয়াছেন—'কবির আমোদ, কিন্তু বিপিনের ক্লেশ, লোষ্ট্রক্ষেপী বালকের সুখে যথা ভেক।' তুমি তো এক কথা বলিয়া মজা করিলে; আমি বেচারা যে তাহাতে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিলাম। ঠাট্টা মাঝে মাঝে ভালো লাগে, কিন্তু বিদ্রূপকে বড় ভয় করি। যিনি স্বভাবত কাহারো মনে ক্লেশ না দিয়া নির্দোষ কথা বলিয়া সকলকে আমোদ দেন, তিনি বড় ভালো লোক। আর যাহাদের দোষ সংশোধন

করিবার ক্ষমতা নাই, কেবল বিদ্রূপ করিবার জন্য অন্যের সমালোচনা করিয়া থাকে, তাহাদের সম্বন্ধে ছেলেবেলায় পড়িয়াছি, 'খলেরা কেবল পরের দোষই অন্বেষণ করে—'।

সখা—আগস্ট ১৮৮৪

রাগ

বাবা! কি রাগ গো! বাবুর মুখের উপর রাগ হইয়াছে! তাইতো, মুখ ব্যাটার জ্বালায় বাবু এখন আর আরশির সম্মুখে দাঁড়াইতে পারেন না। অমন মুখ আবার বাবুলোকের থাকে? —তাই বাবু রাগ করিয়া মুখকে জব্দ করিবার নিমিত্ত মুখের নাকটা কাটিয়া ফেলিতেছেন। এবারে মুখ একাকার হইয়া যাইবেন।

রাগ হইলে বিচার শক্তি একটু কমিয়া যায়। আমরা কোনো ফকিরের কথা শুনিয়াছি। ফকিরের এক শত্রু ছিল, তাহাকে জব্দ করিবার জন্য নিজের ছেলেকে বলিল, 'তুই আমাকে মারিয়া ওদের দরজায় ফেলিয়া রাখ।' ছেলে তাহাই করিল। বল দেখি জব্দ হইল কে? ছেলেবাবুদের অনেককে দেখিয়াছি, মার উপর রাগ হইয়াছে, সুতরাং সেদিনের মতো আহার পরিত্যাগ করিলেন। পাকা লোক হইলে পাছে মা বিরক্ত করিতে আসেন, তাই গাছে উঠিয়া বসিয়া থাকেন! এই হইল মার শাস্তি। ক্ষুধা কিন্তু রাগ বোঝে না, তাহার সময় হইলে সে হাজির হইবেই। রাগের ফল হইল ক্লেশ; ক্লেশের ফল অনুতাপ।

সকলেই মাঝে মাঝে অন্যায় করিয়া বলিয়া থাকেন, 'রাগের মাথায় করিয়াছি।' বলি, রাগের মাথাটা কি? অর্থাৎ তখন বিচারশক্তি ছিল না। ততক্ষণ আমি পাগল, সুতরাং আমার সাত খুন মাপ! খুনটা নিজের উপর দিয়াই অনেক সময় হইয়া যায়। রাগের মাথায় যত কম কাজ করা যায় ততই ভালো। যদুর ছোট বোন তাহার ছবির বই-এর একখানা পাতা ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিল, যদু 'রাগের মাথায়' তৎক্ষণাৎ বইখানাকে উনুনের ভিতর রাখিয়া আসিল! এ রোগ অনেকেরই আছে।

রাগ হইলেই অনেকে মনে করেন যে তাঁহারা ইচ্ছা করিলে একটা কিছু করিয়া ফেলিতে পারেন, অন্যের তাতে কিছু বলিবার অধিকার নাই। রাগ হইলে অনেকে নিজেকেই কষ্ট দেন—আহা বেচারা!

শেষে একটা কথা বলি। ভাই, রাগকে বিশ্বাস করিও না। রাগ যখন তোমার ভিতরে আসিবেন তখন খুঁজিলে দেখিবে যে বুদ্ধিটি পলায়ন করিয়াছে। রাগ আসিয়া তোমাকে তাঁহার করিয়া লইবেন। তখন আমি গাধা, গোরু, ষাঁড়, মহিষ, যা কিছু হই-না কেন, তোমাতে আমাতে কোনো প্রভেদ নাই।

তাই আজ বাবুর নাকের উপর চোট্!

সখা—আগস্ট ১৮৮৪

আমার মনের ভাব উপরের কথায় হয়তো অনেকে স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছেন না। মুখে কথা না বলিয়া অন্য কোনো চিহ্ন-বিশেষ দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করার নাম সংকেত। অর্থাৎ আমি এ প্রস্তাবে যতবার সংকেত কথাটা ব্যবহার করিব ততবারই ঐরূপ বুঝিতে হইবে।

কোনো-না-কোনো আকারে সংকেত সকল স্থানেই প্রচলিত আছে। আমরা দিনের মধ্যে কতবার সংকেতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকি! বন্ধু আসিয়া একটা কিছু করিতে অনুরোধ করিলেন, তুমি মাথা নাড়িলে ; আমি তোমার উপর চটিয়া গিয়া ভয় প্রদর্শন করিলাম, তুমি মুখে কিছু না বলিয়া অঙ্গুলি বিশেষ উন্নত করত আমাকে হনুমানের খাদ্য খাইতে বলিলে ; ইত্যাদি, আর কত বলিব। এ-সকলই সংকেত। এইপ্রকারের সংকেত সকলেই কিছু কিছু ব্যবহার করিয়া থাকেন।

ইংলণ্ডে বোবা এবং কালারা এইরূপ সংকেতের সাহায্যে মনের ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। হাতের এক-এক প্রকার ভঙ্গি করিয়া তাহারা ইংরাজি বর্ণ-মালার এক-একটা অক্ষর বুঝায়। অক্ষর হইলে আর শব্দ রচনা শক্ত থাকে না। আমাদের দেশেও আছে।

'অহি, কুম্ভ, চক্র, টংকার, তরল, পবন, জাঁতা।'

হস্ত থাকিতে কেন মুখে কথা বলি। অর্থাৎ সাপের ফণার মতো করিয়া হাত তুলিলেই একটি স্বরবর্ণ বুঝাইবে। এক হাতের মুষ্টির উপর আর-এক হাতের মুষ্টি রাখিয়া কুম্ভের অনুকরণ (!) করিলেই ক-বর্গের একটি অক্ষর বুঝাইবে। হাত ঘুরাইয়া চক্র, বাতাসে টোকা দিয়া টংকার, হাতে বাতাসে ঢেউ তুলিতে চেষ্টা করিয়া তরল, পাখার কার্য হাতে করিয়া পবন, ও হাতে হাতে চাপিয়া জাঁতা করিলে, আর চ-বর্গ, ট-বর্গ, ত-বর্গ, প-বর্গ, য-বর্গ (য, র, ল, ব, শ, ষ, স, হ, ক্ষ ইত্যাদি) সকলই ক্রমান্বয়ে হইতে লাগিল।

স্বরবর্ণ বলিয়া পাঁচ আঙুল দেখাইলে পঞ্চম স্বরবর্ণ (উ) বুঝাইল ; প-বর্গ বলিয়া তিন আঙুল দেখাইলে আর প-বর্গের তৃতীয় বর্ণ (ব) বুঝাইল। ইত্যাদি। একটা শব্দ শেষ হইয়াছে ইহা বুঝাইতে হইলে হাততালি দিতে হয়। সুতরাং প্রত্যেক শব্দের শেষে হাততালি পড়িবে।

প্রচলিত টেলিগ্রামের অধিকাংশই সাংকেতিক। জাহাজের লোকেরা নানা-প্রকারের নিশান ব্যবহার করিয়া সাংকেতিক আলাপ করিয়া থাকে। কখনো-বা একটিমাত্র নিশান হাতে লইয়া, তাহাকে নানাপ্রকারে নাড়িয়া সংকেত করা হয়। কখনো মাথার টুপী হাতে করিয়া তদ্দ্বারা সংকেত করা হয়। আরো কতপ্রকারে সংকেত করা হয় যে কি বলিব। কোনো সময় এত দূরের লোককে সংকেত হয় যে এ-সকল কিছুই তত দূর হইতে দেখা যায় না। তখন খুব উঁচু জায়গায় ঘর করিয়া তাহার একটা দিক কেবল খড়্‌খড়ি দ্বারা বন্ধ করা হয়। ঘরের ভিতরে আলো থাকে। খড়্‌খড়ি খুলিলে সেই আলো অনেক দূর হইতে দেখা

যায়। খড়্‌খড়ি খুলিয়া কিছুকাল পর বন্ধ করিলে, একপ্রকার সংকেত বুঝায় ; আর খুলিয়া অমনি বন্ধ করিলে অন্যপ্রকারের সংকেত বুঝায়। এই দুই-প্রকারের সংকেত দ্বারা সব অক্ষর বুঝানো যাইতে পারে। খড়্‌খড়িওয়ালা ঘরের পরিবর্তে অনেক সময় খুব উজ্জ্বল আলো ব্যবহার করা হয়। তখন তাহাকে একখানা তক্তা দ্বারা ঢাকিয়া ফেলিলেই কাজ চলে। সংকেত করিবার সময় তক্তাখানা সরাইতে হয়, তবেই আলোটা দেখা যায়। তক্তা সরাইয়া অল্পক্ষণ রাখিলে একপ্রকার সংকেত আর অধিকক্ষণ রাখিলে অন্যপ্রকার সংকেত বুঝায়।

সংকেতের কথা আমরা শেষ করিলাম। টেলিগ্রাফে যে সংকেত ব্যবহার করা হয় তন্মধ্যে মর্স সাহেবের সংকেত-প্রণালীই অধিক প্রচলিত। মর্সের টেলিগ্রাফের সংকেত এই প্রণালীতে করা হয়—মর্সের টেলিগ্রাফে টাক্ টিক্ করিয়া শব্দ হয়, তাহার হ্রস্বতা ও দীর্ঘতা অনুসারে দুইপ্রকারের সংকেত হইতে পারে। শেষে যতপ্রকার সংকেতের কথা বলা হইল, সবগুলিই কেবল হ্রস্ব দীর্ঘ লইয়া হইয়াছে। শব্দ কি আলোক অধিকক্ষণ থাকিলে তাহা দীর্ঘ, তাহার চিহ্ন (—) এইরূপ। অল্পক্ষণ থাকিলে তাহা হ্রস্ব, চিহ্ন (-) এইরূপ।

সখা—এপ্রিল ১৮৮৫

মূল বর্ণ

রামধনু বিষয়ক একটি প্রস্তাব গত বর্ষের 'সখা'য় লেখা হইয়াছিল তাহাতে এক জায়গায় লেখা ছিল যে, 'লাল সবুজ আর ভায়োলেট এই তিনটি মূল বর্ণ ; আর অন্য কয়েকটি বর্ণ ইহাদের হইতে উৎপন্ন।' লাল, নীল এবং পীত এই তিনটি মূল বর্ণ, এইরূপ বিশ্বাসই সাধারণে প্রচলিত ; সুতরাং আমাদের ঐরূপ লেখাতে অনেকেই চমৎকৃত হইয়াছেন। আমরা এ সম্বন্ধে একখানি চিঠিও পাইয়াছি। চিঠিখানি পড়িয়া আমরা অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি ; এবং আহ্লাদের সহিত এবিষয়ে আমরা যাহা জানি, পত্র-লেখকের সন্দেহ দূর করিবার জন্য তাহা লিখিতেছি।

প্রথমে অবান্তর কথা দু-একটি বলা আবশ্যক হইয়াছে। এ বিষয়টি ভালো করিয়া বুঝিতে হইলে 'সখা'র এই প্রবন্ধে কুলাইবে না। কিন্তু কিছু একটু বুঝাইতে চেষ্টা করার পূর্বেও আলোক সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। আলোক আছে বলিয়াই আমরা জিনিসের রঙ দেখিতে পাই। রঙটা বাস্তবিক জিনিসের নয়, রঙটা আলোকের। জিনিসটা কিছু আমাদের চক্ষে আসিয়া পড়ে না ; আমরা যে-সকল জিনিস দেখি, সেগুলি যদি আমাদের চক্ষে আসিয়া পড়ার দরকার হইত, তবে এতদিনে অন্ধ হইয়া যাইতাম! জিনিস হইতে আলো আসিয়া আমাদের চক্ষে পড়ে। সেই আলোকের যে রঙ জিনিসটারও সেই রঙ দেখা যায়। জিনিস হইতে আলোক দুইপ্রকারে আসিয়া আমাদের চক্ষে পড়িতে পারে। এক—জিনিসটার ভিতর দিয়া আসিতে পারে, আর তাহার গায়ে পড়িয়া

উলটিয়া আসিয়া আমাদের চক্ষে পড়িতে পারে। আর—এক কথা, ভিতর দিয়াই আসুক, আর উলটিয়াই আসুক, জিনিসে যতপ্রকারের আলো পড়ে, সাধারণত তাহার সকলগুলি আমাদের চক্ষে আসিতে পারে না। আলো পড়িবামাত্র জিনিসটা তাহার কিছুটা খাইয়া ফেলে, বাকি আমাদের কাছে আসিতে দেয়। কোনো জিনিস লাল আলো ছাড়া আর সকল রঙের আলো খাইয়া ফেলে, তাহাকে লাল দেখা যায় ; যে জিনিস সবুজ ছাড়া আর সব আলো খায়, তাহাকে সবুজ দেখা যায়। সে জিনিস সকলপ্রকারের আলোই খায়, তাহাকে কালো দেখা যায়। যে জিনিস কোনোপ্রকারের আলোই খাইতে জানে না, সে সাদা। জিনিসে যত আলো পড়ে, তাহার সব যদি সে খাইয়া ফেলে, তবে তাহাকে কালো দেখাইবে। সবুজ জিনিসে সবুজ ছাড়া আর যেরূপ আলোই পড়ুক না, সে তাহা খাইয়া ফেলিবে এবং কালো দেখাইবে।[১] আমরা সাধারণত যে আলোতে দেখি তাহা সাদা। সাদা আলো সকলপ্রকারের আলোর সমষ্টি ; সুতরাং তাহাতে সকলপ্রকারের জিনিসই স্বাভাবিক বর্ণের দেখা যায়। সাদা জিনিস কোনোরূপ আলোকই খায় না, সুতরাং তাহাতে যখন যে রঙের আলো পড়ে, তখন সেই রঙ দেখায়। ইত্যাদি।

লাল রঙের কাচ লাল কেন ? না তাহার ভিতর দিয়া সে কেবল লাল রঙের আলো আসিতে দেয়, আর সব খাইয়া ফেলে। সবুজ কাচের ভিতর দিয়া কেবল সবুজ আলো আসিতে পারে, সেইজন্য সে সবুজ ; ইত্যাদি। এখন মনে কর একখানা লাল রঙের কাচের উপর একখানা সবুজ রঙের কাচ রাখিয়া দুখানারই ভিতর দিয়া চাহিয়া দেখিলে কি দেখিবে? লালে সবুজে মিশিয়া যে রঙ হয়? না ; সবুজ কাচখানা আলোর সব রঙ খাইয়া কেবল সবুজ আলো আসিতে দিয়াছিল, লালখানায় তাহাও খাইয়া ফেলিল। সুতরাং কোনো রঙই দেখিবে না। দেখিবে কেবল কালো।

কাচের উপর আলো পড়িলে তাহার কতকটা উপর হইতেই উলটিয়া আইসে ; কিন্তু সে অতি অল্প। অবশিষ্ট আলো ভিতরে যায়। কাচে রঙ থাকিলে আবার এই যে ভিতরে আসিল ইহাদের কতকগুলিকে সে খাইয়া ফেলে। এখন যাহারা থাকিল তাহাদের কিছু অপর পৃষ্ঠে লাগিয়া ফিরিয়া আইসে, অবশিষ্ট ওপিঠে বাহির হইয়া যায় ; এই দুইরকম আলোর দরুনই কাচের রঙ দেখা যাইবে। যতপ্রকার জিনিসের রঙ দেখা যায়, (তাহাদের যদি নিজের আলো না থাকে) সকলপ্রকার জিনিসের ভিতরেই আলো গিয়া ফিরিয়া বাহিরে আসিয়াছে ইহা নিশ্চয় ; কারণ বাহির হইতে যে আলোক ফিরিয়া আইসে তাহার রঙের কোনোরূপ পরিবর্তন হইতে পারে না। পরিবর্তন হওয়ার

[১] সবারে নুন মিশাইয়া তাহাতে পলতে ভিজাইয়া আলো জ্বালিলে সে আলো বিশুদ্ধ পীতবর্ণের হয়। সেই পীতবর্ণের আলোতে পীত ছাড়া অন্য রঙের জিনিস কালো দেখাইবে। পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইলে প্রথমত, ঘর সম্পূর্ণরূপে অন্ধকার করিয়া লইতে হইবে।

অর্থ এই যে, যতগুলি ছিল, তাহার কিছু খাইয়া ফেলিয়াছে। যাহার নিজের আলো নাই তাহাদ্বারা আর কোনোরূপ পরিবর্তন হওয়া সম্ভব নহে।[১] অনেকে মনে করেন যে, যে জিনিস স্বচ্ছ নহে, তাহার ভিতরে আলো যাইতে পারে না, তবে তাহার রঙ হয় কি করিয়া? ইহার উত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে, এমন জিনিস নাই, যাহা অল্প পরিমাণেও স্বচ্ছ নয়। খুব পাতলা হইলে ধাতুর পাতের ভিতর দিয়াও আলো আসিতে পারে।

এখন কাজের কথা হউক। আমাদের সাধারণ বিশ্বাস, নীল পীত মূল বর্ণ, তার যোগে সবুজ হইয়াছে। এখন জানিলাম, লাল সবুজ মূল বর্ণ, তার যোগে পীতের উৎপত্তি এবং সবুজ ভায়োলেট মূল বর্ণ, তার যোগে নীলের উৎপত্তি। আমাদের প্রমাণ নীল রঙের আর পীত রঙের জিনিসের চূর্ণ মিশাইয়া দেখা। কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে ঐরূপভাবে মিশ্রিত চূর্ণ হইতে যে আলো আইসে তাহার অধিকাংশই দুইপ্রকারের চূর্ণের ভিতর দিয়াই আসিয়া থাকে। সুতরাং ঐরূপ আলোর যে রঙ মিশ্রিত চূর্ণেরও প্রায় সেই রঙ হইবে। নীল পীত যদি মূল বর্ণ হইত, তবে নীল চূর্ণ আলোর সমস্ত অংশ খাইয়া কেবল নীল অংশ রাখিত, সেই অংশ আবার পীত চূর্ণের ভিতর দিয়া যাইবার সময় ভক্ষিত হইয়া যাইত। সুতরাং লাল এবং সবুজ কাচের ভিতর দিয়া আসিয়া আলোর যে দশা হইয়াছিল এখানেও তাহাই হইত। দুই চূর্ণ মিশিয়া প্রায় কালো রঙ হইত। কিন্তু নীল পীত উভয়ের মধ্যেই সবুজ থাকাতে সবুজ আলোটা উভয়প্রকার চূর্ণের ভিতর দিয়াই চলিয়া আসিতে পারে, কেহই তাহাকে খাইয়া ফেলে না। সুতরাং মিশ্রের রঙ সবুজ দেখায়। সেইরূপ লাল চূর্ণ আর সবুজ চূর্ণ মিশাইয়া আমরা একটা ধুঁয়ার মতন রঙ পাই। তাহাতেই মনে করি, বুঝি লাল আলো আর সবুজ আলো মিশিয়াও ঐ রঙই হইবে। কিন্তু লাল আলো আর সবুজ আলো মিশিয়া যে রঙ হয় সে কিরূপ, জান? সে সাদা মতন! অতএব দুই-তিন রঙের চূর্ণ মিশাইয়া সেই রঙের আলো মিশাইয়া ফেলিয়াছি, মনে করিলে চলিবে না।

আমরা এতক্ষণ যাহা বলিলাম তাহাতে আমাদের বক্তব্য বিষয়টাকে খুব পরিষ্কার করিতে পারিয়াছি এরূপ ভরসা করি না। একটি কথা মনে রাখিতে চেষ্টা করিবে: দুই-তিন প্রকারের চূর্ণ মিশাইলে একের বর্ণের সহিত অন্যের বর্ণের যোগ করা হইল না; উভয়ের সাধারণ অংশটুকু রাখিয়া অবশিষ্ট অংশটুকুকে ধ্বংস করা হইল মাত্র। কারণ, প্রথম যার ভিতর দিয়া আলো আসিল, তার যে রঙ তাহা ছাড়া অন্য সকলপ্রকারের আলো সে খাইয়া ফেলিল। অবশিষ্ট আলোটুকু যখন দ্বিতীয় চূর্ণের ভিতর দিয়া গেল সেও তাহাই করিল: ইত্যাদি। একটি দৃষ্টান্ত দিই--সিন্দুর লাল, আল্ট্রামেরিণ পরিষ্কার নীল।

[১] যাহার নিজের আলো আছে, তাহা বাহিরের আলো ছাড়াও দেখা যায়। আর অন্য আলো তাহাতে পড়িলে নিজের আলো তাহাতে মিশাইয়া দিয়া তাহাকে পরিবর্তিত করিতে পারে।

সিন্দুরে আল্ট্রামেরিণে মিশাইলে আমাদের হিসাবে বেগুণে রঙ হওয়া উচিত। কিন্তু কাজে দেখি প্রায় কালো রঙ হয়। লাল মূল বর্ণ, নীলে সবুজ এবং ভায়োলেট আছে; এই দুয়ের মধ্যে সাধারণ কিছুই নাই, সুতরাং মিশ্রিত জিনিস কালো দেখাইবারই কথা। এখানেও দেখা যাইতেছে যে, আমরা যেরূপ বিশ্বাস করি, তার মতন কাজ হইল না। আমরা লাল রঙের জিনিস এবং নীল রঙের জিনিস অন্য জায়গায় মিশাইয়া বেগুণে পাইয়াছিলাম, তাহার কারণ এই ছিল যে, আমরা তখন যে নীল ব্যবহার করিয়াছিলাম তাহা বিশুদ্ধ নীল ছিল না, তাহাতে লালের অংশ কিছু ছিল। সুতরাং সেই লালের আভা দেখিয়া আমরা ভ্রমে পড়িয়াছিলাম। পণ্ডিতেরা এইরূপ অনেক শেষে স্থির করিয়াছেন যে, আমরা সচরাচর যাহা ভাবি তাহা নয়। বাস্তবিক লাল এবং ভায়োলেটই মূল রঙ।

(Deschanel's Natural Philosophy নামক গ্রন্থের বর্ণ বিষয়ক পরিচ্ছেদে ইহার সবিস্তর বর্ণনা আছে।)

সখা—আগস্ট ১৮৮৫

পূজার ছুটির আমোদ

বিদেশী পাচক অনেকেই পূজার ছুটিতে বাড়ি চলিলেন। এই ছুটিতে অনেকেই অনেকপ্রকারের আমোদ করিবেন। নূতনরকমের আমোদ দেখিবার জন্য সকলেই আগ্রহ প্রকাশ করে। একখানি ইংরাজি বই পড়িয়া যে-সব নূতন আমোদের কথা এবারে শিখিয়াছি, তাহার কিছু কিছু সংক্ষেপে লিখিতেছি, একবার নিজেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন।

ঘরের মাঝামাঝি একটা পর্দা টাঙাইয়া তাহার একপাশে আলো রাখিয়া তাহাতে আপনারা থাকিবেন। অপর পার্শ্ব অন্ধকার করিয়া তাহাতে কতকগুলি দর্শক ডাকিয়া বসাইবেন। এখন আপনারা আলো এবং পর্দার মাঝখানে দাঁড়াইয়া যেরূপ অঙ্গভঙ্গি করিবেন, পর্দায় তাহার যে ছায়া পড়িবে, তাহাতে তার চেয়ে ঐ-সকল অঙ্গভঙ্গি আরো সুন্দর দেখাইবে।

খুব সরু সুতার দ্বারা একটা পুতুল টাঙাইয়া তাহার পেছনে যতগুলি আলো ধরা যায়, পর্দায় ঐ পুতুলের ততগুলি ছায়া আসিয়া পড়িবে। এখন এক-একটি আলোকে ইচ্ছামতো নাচাইতে থাকুন, পর্দার ছবিও ঐরূপ নাচিবে। দুই-তিনজন লোক হইলে ইহাতে বেশ আমোদ পাইতে পারেন। বলা বাহুল্য, প্রত্যেকে যদি দুহাতে দুটা আলো ধরিতে পারেন তাহা হইলে উত্তম হয়।

আলোটা একটা টেবিলের উপরে রাখিয়া তাহার সামনে হাত ধরিলে পর্দায় ঐ হাতের ছায়া পড়িবে। এখন বুদ্ধি খাটাইতে পারিলে হাতটিকে কি হাত দুটিকে এরূপভাবে রাখা যাইতে পারে যে, পর্দায় যে ছায়াটা পড়িবে, তাহাকে একটা-না-একটা জানোয়ারের মতন দেখাইবে। হাত কিরূপভাবে রাখিলে

কোন জানোয়ার হইবে, তাহা মুখে বলা তত সহজ নহে। পাঠকগণ অনুগ্রহ-পূর্বক যদি একবার ছবিগুলির[১] দিকে তাকান, তাহা হইলে আমার লেখার অপেক্ষা অনেক বেশি পরিষ্কার বুঝিতে পারিবেন। জানোয়ারগুলি অবিকল হইল না। কিন্তু যাহা হইয়াছে তাহা দেখিয়াই দর্শকেরা বেশ সন্তুষ্ট হইবেন।

সুখা—অক্টোবর ১৮৮৫

বেলুনঃ ১

তোমাদের অনেকেই বেলুন দেখিয়াছ। আসল বেলুন না দেখিয়া থাকাই সম্ভব, কিন্তু বেলুনের নকল সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। বেলুনে চড়িয়া মানুষ আকাশে উঠে এ কথাও অনেকে শুনিয়া থাকিবে। অনেক সময় হয়তো তোমরা কেহ কেহ ভাবিয়াছ যে, ওরূপ একটা বেলুনে চড়িতে পারিলে না জানি কি মজাই হয়! তোমাদিগকে বেলুনে চড়াই, আমার তেমন সাধ্য নাই, কিন্তু যাহাতে তোমরা চারি-পাঁচ দিন স্বপ্নে পড়িয়া বেলুনে চড়িতে পার আজ একটা পুস্তক হইতে তাহারই কিঞ্চিৎ ব্যবস্থা করা যাইতেছে।

ইউরোপে জোজেফ্ মণ্ট্ গল্‌ফিয়র এবং ষ্টীভ্‌ন মণ্ট্ গল্‌ফিয়র নামে দুই ভাই থাকিতেন, তাঁহারাই প্রথমে বেলুন উড়াইতে শিখেন। তাঁহারা দেখিলেন যে ধোঁয়া ঊর্ধ্বে উঠে। ইহাতে তাঁহারা মনে করিলেন যে, ধোঁয়াকে যদি খুব হালকা একটা থলের ভিতর পুরিয়া দেওয়া যায়, তবে ঐ থলেটাও ধোঁয়ার সঙ্গে ঊর্ধ্বে উঠিবে। এই মনে করিয়া তাঁহারা একটা কাপড়ের থলে প্রস্তুত করিলেন এবং তাহাকে একটু উচ্চ স্থানে রাখিয়া তাহার নীচে আগুন জ্বালাইয়া দিলেন। কিছুকাল পরেই বেলুনটা উঠিতে লাগিল এবং প্রায় দেড় মাইল দূরে গিয়া মাটিতে পড়িল।

মণ্ট্ গল্‌ফিয়রদের এই অদ্ভুত কীর্তির বিবরণ লোকে শুনিয়া শুনিয়া হাঁ করিয়া থাকিতে লাগিল—অনেকে বিশ্বাস করিল না। প্যারিস নগরে মসু চার্ল্‌স্ নামে একজন লোক থাকিতেন, তিনি কিন্তু এরূপ করিলেন না। তিনি মনে করিলেন যে, শুধু ধোঁয়ার মধ্যে এমন কিছু থাকিতে পারে না যে, তাহাতে বেলুনটাকে ঠেলিয়া আকাশে তুলিতে পারে। ধোঁয়াটা যতক্ষণ খুব গরম, ততক্ষণ সেটা বাতাসের চাইতে অনেক হালকা থাকে। হালকা থাকে বলিয়াই বেলুনটাকে ঠেলিয়া তুলিতে পারে। এইপ্রকার চিন্তা করিয়া তিনি এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে, বাতাসের চাইতে হালকা অন্য কোনো জিনিস দিলেও ঐরূপ হইবে। তিনি কাপড়ের একটা বেলুন প্রস্তুত করিলেন। বেলুনের ভিতর হইতে বাতাস যেন পলাইতে না পারে, এইজন্য তাহাতে বেশ করিয়া ভালো আঠা মাখাইয়া দিলেন। এই বেলুনের ভিতর জলজান বায়ু পুরিয়া তাহাকে

[১] পত্রিকার পৃষ্ঠায় ছবিগুলি বিবর্ণ হয়ে যাওয়ায় তা এখানে দেওয়া গেল না।

শূন্যে উড়াইবেন সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি প্যারিস নগরে বিজ্ঞাপন দিলেন যে, '২৭এ আগস্ট (১৭৮৩) আমি একটা প্রকাণ্ড গোলাকার জিনিস শূন্যে ছাড়িয়া দিব ; আর সে আপনা আপনি ঊর্ধ্বে চলিয়া যাইবে।' যে স্থান হইতে উড়াইবার কথা হইল, ২৭এ আগস্ট সেখানে লোকে লোকারণ্য। যাহারা সেখানে আসিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে অতি অল্প লোকই চার্ল্‌স্‌ সাহেবের কথায় বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছিল। তাহারা মনে মনে স্থির করিয়া আসিয়াছিল যে পক্ষী ফড়িং ছাড়া আর কোনো জিনিস আপনা হইতেই ঊর্ধ্বে উঠিতে পারে না। চার্ল্‌স্‌ সাহেবের গোলাকার জিনিসটা যখন উঠিতে না পারিয়া মাটিতে পড়িয়া যাইবে, তখন তাঁহাকে কিঞ্চিৎ উত্তম-মধ্যম উপদেশ প্রদানের যুক্তিও স্থির করিয়া আসিয়াছিল। নিরূপিত সময়ের একটু পূর্বেই অনেকে অধৈর্য প্রকাশ করিতে লাগিল। যখন ছাড়িবার সময় হইল তখন যে দাড়িম্বারা বেলুন বাঁধা ছিল তাহা খুলিয়া দেওয়া হইল ; আর দেখিতে দেখিতে সেই প্রকাণ্ড জিনিসটা তিনহাজার ফিটেরও বেশি ঊর্ধ্বে উঠিয়া গেল। দর্শকগণের মনে তখন কিরূপ ভাবের সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। ফ্রান্স দেশের একটি ছোট গ্রামে বেলুনটি পড়িল। সেখানকার লোকেরা মনে করিল, এটা না জানি একটা কি? উচ্চ হইতে নীচে পড়িবার সময় সকল জিনিসই লাফায় ; বেলুনটাও সেইরূপ লাফাইতে লাগিল। শহরে যে বেলুন উড়ান হইয়াছে, এ গ্রামের অধিবাসীগণ তাহা জানিত না ; সুতরাং এ-সব দেখিয়া তাহারা মনে করিল যে এ জানোয়ারটা একটা মস্ত পাখি বৈ আর কিছুই নহে। চারিধারে গণ্ডী করিয়া লোকের সার দাঁড়াইয়াছে ; বুকের ভিতর একটু-একটু গুর্‌গুর্‌ করিতেছে। ইচ্ছা আছে জানোয়ারটাকে দুই-একটা খোঁচা দিয়া তামাশা দেখে, কিন্তু সাহস হইতেছে না—পাছে ঠোক্‌রায়! শেষে কয়েকজন সাহসী লোক অনেক কষ্টে কোমর বাঁধিয়া অনেক বার অগ্রসর এবং অনেকবার পশ্চাৎপদ হইয়া অল্পে অল্পে তাহার কাছে আসিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে যে খুব সাহসী সে খোঁচা দিবার উপযোগী একটা যন্ত্র হাতে লইয়া অগ্রসর হইল। একবার এদিক একবার ওদিক হইতে সেই যোদ্ধা বিস্তর সংগ্রামকৌশল প্রদর্শন করিতে লাগিল। শেষে সাহসে নির্ভর করিয়া প্রাণপণে জানোয়ারের গাত্রে অস্ত্রাঘাত করিল ; অমনি সেটা ফোঁস্‌ ফোঁস্‌ শব্দ করিতে লাগিল, আর যে দুর্গন্ধ—গ্রামবাসীরা রণে ভঙ্গ দিল। কিছুকাল পরে জানোয়ারটা যেন খুব শুট্‌কাইয়া গেল ; তখন তাহারা মনে করিল যে এবারে আঘাত সাংঘাতিক হইয়াছে। অবিলম্বে জানোয়ারটাকে বন্দী করত গ্রামবাসী ভট্টাচার্য মহাশয়দের নিকট লইয়া যাওয়া হইল। তাঁহারা দেখিয়া বলিলেন, 'ইহা এতাবৎ কাল অপরিজ্ঞাত জন্তু বিশেষের চর্ম।'

প্রথমবারেই এইরূপ সুন্দর ফল লাভ করিয়া চার্ল্‌স্‌ সাহেবের সাহস বাড়িল। তিনি আর একটা বেলুন প্রস্তুত করিয়া তাহাতে আরোহণ পূর্বক আকাশে উঠিতে কৃতসংকল্প হইলেন।

সখা—ফেব্রুয়ারি ১৮৮৬

বাতাসের চাইতে হালকা জিনিস ভিতরে পুরিয়া দেওয়াতেই বেলুন উপরে উঠে, এই কথা তোমরা পূর্বেই শিখিয়াছ। এখন তোমাদিগকে আরো কতগুলি কথা বলিব।

মনে কর অনেক দূর উঠিয়া বেলুন আর উঠিতে চাহিতেছে না। তখন যদি তোমার আরো উঠিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে কি করিবে? তাহার সংকেত বলি, শুন। বেলুনে চড়িবার পূর্বে কয়েক বস্তা বালি বেলুনে তুলিয়া দিতে হয়। বেলুন যখন আর উঠে না, তখন এর একটি বস্তা খুলিয়া কিঞ্চিৎ বালি ফেলিয়া দিতে হয়। তাহা হইলেই বেলুন একটু হালকা হইল, এখন আর কিছু দূর নিরাপদে উঠিবে। এইরূপে যখন বালির বস্তা ফুরাইয়া যাইবে, তখন তোমার নামিয়া আসার জোগাড় দেখাই ভালো। অনেক সময় কোনো সমুদ্রের উপর আসিয়া বেলুন পড়িয়া যাইবার জোগাড় করে। সমুদ্রে পড়িলে কি হয়, তা তো জানই; সুতরাং তখন বাধ্য হইয়া উপরের লিখিত উপায় অবলম্বন করিতে হয়। কখন কখন আবার ইহাতেও কুলায় না, তখন একটি দুইটি করিয়া সঙ্গের জিনিসপত্র পর্যন্ত ফেলিয়া দিতে হয়। তাহাতেও যদি না কুলাইল তবেই বিপদ।

আচ্ছা, মনে কর এমন হইল যে বেলুন এত উপরে উঠিয়াছে যে তুমি তাহাতে সুবিধা মনে কর না; তখন যদি আর উঠিতে ইচ্ছা না হয়, কিম্বা যদি নামিয়া আসিতে ইচ্ছা হয়; তখন কি করিবে? তখনকার জন্য দুইপ্রকারের ব্যবস্থা আছে। প্রথম—বেলুনের গায়ে একটি ছিদ্র করিয়া দিতে পারিলেই ভিতরের হালকা জিনিসটা বাহির হইয়া যাইবে, তখন বেলুনটিকে বাধ্য হইয়া নামিতে হইবে। অনেক সময় বেলুনটিকে উপরে রাখিয়াই নিজে নামিবার জোগাড় করিতে হয়। তাহার জন্য দ্বিতীয় উপায়টি উত্তম।

দ্বিতীয় উপায়—কাপড়ের একটা মস্ত ছাতা কর। ছাতাটা শুধু কাপড়ের হইবে, তাহাতে শিক বাঁট দিতে হইবে না। ছাতার মাঝখানটায় একটা গোল ছিদ্র রাখ—ছিদ্রটা যেন খুব বড় হয়। তারপর ছাতার চারিধারে লম্বা দড়ি বাঁধিয়া সমস্তগুলি দড়ির মাথা একত্র করিয়া বাঁধ। যেখানে দড়ির মাথাগুলি বাঁধিয়াছ, সুবিধা হইলে সেখানে বসিবার কোনোরূপ উপায় কর। এই যন্ত্রটিও বেলুনে তুলিয়া লইতে হয়। নামিতে ইচ্ছা হইলে যেখানে বসিবার উপায় করিলে, সেই স্থানটা অবলম্বন করিয়া বেলুনের সহিত ছাতার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতে হয়। বাতাসে ছাতাটা আপনাআপনি ফুলিয়া উঠে। তখন ধুপ্ করিয়া পড়িয়া যাইবার আশংকা থাকে না।

ছাতার মাঝখানে ঐ ছিদ্রটি না থাকিলে ছাতা ভয়ানক দুলিত, ও তোমার পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা হইত। ঐ ছিদ্রটি থাকাতে দেখা গিয়াছে যে, ঐরূপ দুলিবার কোনো ভয় থাকে না। (বল দেখি কেন এরূপ হয়?)

অনেকেই মনে করিতে পারেন যে, লোকে কেবলমাত্র আমোদের জন্যই

বেলুনে উঠে। অনেকে আমোদের জন্য বেলুনে উঠে বটে, কিন্তু তা ছাড়া বেলুনে উঠাতে অনেক উপকার হয়। ইংরিজি বইতে একটি ছবি দেখিলাম। ঐ ছবিতে যে দুইজন লোক বসিয়া আছেন, তাঁহাদের একজন গ্লেশার আর এক-জন কক্স্‌ওয়েল সাহেব। ই'হারা ইংলণ্ডের দুইজন বৈজ্ঞানিক। পৃথিবী হইতে কত ঊর্ধ্বে বাতাসের অবস্থা কিরূপ, জানিবার জন্য ই'হারা বেলুনে চড়িয়াছেন। গ্লেশার সাহেবের সম্মুখে বাতাস পরীক্ষা করিবার উপযোগী যন্ত্রগুলি সাজানো রহিয়াছে। একটি যন্ত্রের সাহায্যে জানা যায় যে 'এত' ঊর্ধ্বে উঠা হইয়াছে। অন্য একটি যন্ত্র বলিয়া দিতেছে যে সেখানকার বাতাসে 'এত' জলীয়বাষ্প আছে। আর একটি বলিতেছে যে সেখানকার বাতাস 'এত' গরম ইত্যাদি।

আমরা একস্থানে বলিয়াছি যে, 'বেলুন এত উপরে উঠিয়াছে যে তুমি তাহা সুবিধা মনে কর না।' ইহার অর্থ হয়তো অনেকেরই বুঝিতে একটু গোল হইয়াছে, সুতরাং অত্যন্ত উচ্চে উঠিলে যে অসুবিধা হয়, তাহার দু-একটি উল্লেখ করা যাইতেছে। কিছু উপরে উঠিলেই দেখিবে শ্বাস ফেলিতে একটু কষ্ট হয়—বাতাস যেন কমিয়া গিয়াছে। এই অসুবিধাটা ক্রমেই বাড়িতে থাকে। এর চাইতে আরো উপরে উঠিলে দেখিবে তোমার গায়েব চামড়া ফাটিয়া যাইতেছে। আরো উপরে উঠিলে তোমার নাকের লোমকূপগুলি দিয়া বিন্দু বিন্দু রক্ত বাহির হইবে। তাই বলিতেছিলাম অধিক উপরে উঠিলে অসুবিধা হইবে।

একটা গল্প বলিয়া শেষ করিতেছি। নেডার নামক এক সাহেব খুব জোগাড়যন্ত্র করিয়া একটা প্রকাণ্ড বেলুন প্রস্তুত করিলেন। তাহার ভিতরে কত কিছু ব্যাপারেরই আয়োজন হইল ; সাহেব মনে করিলেন গোরু হারাইলে ইহার ভিতর তাহাও পাওয়া যাইবে। সকলে শশব্যস্ত হইয়া তামাশা দেখিতে আসিল ; মনে করিল, 'এটা যখন শূন্যে উঠিবে তখন না জানি একটা কি ব্যাপারই হয়।' 'বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়া', বেলুনটা কত দূর উঠিয়াই পড়িয়া গেল। যাহারা তামাশা দেখিতে গিয়াছিল তাহারা বাড়ি আসিয়া হাসিতে লাগিল।

সখা—মার্চ ১৮৮৬

বেলুন ঃ ৩

মার্চ মাসের সখায় বেলুনের একটা ছবি ছিল, তাহাতে একটা নঙ্গর আঁকা ছিল। কেহ কেহ আমাদিগকে প্রশ্ন করিয়াছেন, 'ঐ নঙ্গরটা ওখানে কেন আসিল?'

নঙ্গরটা ওখানে নঙ্গরের কার্য করিতেই আসিয়াছে। নৌকার নঙ্গর জলে ফেলিলে নৌকা যেমন আর চলিতে পারে না, বেলুনের নঙ্গরও সেইরূপ। অনেক সময় বাতাসে ঠেলিয়া বেলুনটাকে এমন স্থানে লইয়া যাইতে চাহে যে বেলুনের

আরোহী তাহা পছন্দ করেন না। তখন ঐ নঙ্গর নীচে নামাইয়া দেওয়া হয়। এইরূপ করিয়া যদি নঙ্গরটাকে নিম্নস্থ কোনো গাছ বা অন্য কিছুতে আটকাইয়া দেওয়া যায় তবেই বেলুন আর চলিয়া যাইতে পারে না।

সম্প্রতি প্যারিস নগরে একপ্রকার বেলুন প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাকে জাহাজের ন্যায় যেখানে ইচ্ছা সেইখানে চালাইয়া নেওয়া যায়। এই বেলুনের আকৃতি ময়রার দোকানে যে চম্‌চম্‌ বিক্রি হয় তাহার ন্যায়। চম্‌চম্‌টাকে থালের উপরে যেভাবে কাত করিয়া রাখে এই বেলুনও শূন্যে ঠিক সেইভাবে থাকে। বাতাসের ভিতর দিয়া চলিবার সময় যাহাতে বিশেষ বাধা না পায় তাহার জন্যই এরূপ করা হইয়াছে। এই চম্‌চমের এক মাথায় একটি হাল। আরোহীদের বসিবার দোলা চম্‌চমের গায়ে ঝুলিতেছে। সেই দোলায় বেলুন চালাইবার কল। কলটি তড়িতের বলে চলে। এই বেলুন চালাইতে তিনটি লোকের আবশ্যক। একজন হাল ধরে; আর একজন কল চালায়; আর একজন বালির বস্তাগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখে—অর্থাৎ বেলুন নামিয়া পড়িতে চাহিলে বালির বস্তা খালি করিয়া তাহাকে হালকা করে।

সখা—মে ১৮৮৬

নানাপ্রসঙ্গ ঃ ১

(১)

একটি ছোট দীপের নীচে একটি বড় দীপ ধর। ছোট দীপটি নিবিয়া যাইতে চাহিবে কেন, জান? দীপ জ্বালাতে অঙ্গারাম্ল নামক একপ্রকার বায়ু জন্মে। সেই বায়ু প্রদীপের শিখায় মুখ হইতে বেগে ঊর্ধ্বে উঠিয়া যায়। বাতাসে অম্লজান নামক বায়ু আছে, তাহা আছে বলিয়াই আগুন জ্বলিতে পারে। বড় দীপটি ছোট দীপের নীচে ধরিলে, তাহা হইতে অঙ্গারাম্ল বায়ু উঠিয়া ছোট দীপটিকে ঘিরিয়া ফেলে, আর বাতাসের অম্লজান আসিয়া তাহাকে জ্বালাইতে পারে না। কাজেই সে নিবিয়া যায়।

ছোট দীপটি নিবিয়া যাওয়ামাত্রই তাহার জ্বলন্ত পলিতাটি আনিয়া বড় দীপের নীচে (খুব কাছে, কিন্তু একটু ব্যবধান রাখিয়া) ধর; যেন ছোট দীপের পলিতা হইতে যে ধূম এখনোও বাহির হইতেছে তাহা বড় দীপটায় লাগিতে পারে। এখন দেখিবে বড় দীপ হইতে একটু আগুন নামিয়া আসিয়া আসিয়া ছোট দীপটিকে পুনরায় জ্বালাইয়া দিবে। ইহাতে এই বুঝা যায় যে পলিতা হইতে যে ধোঁয়া গিয়া বড় দীপটার গায়ে লাগিয়াছিল, তাহাতে এমন কিছু জিনিস ছিল যাহা জ্বলে। এই জিনিসটা পলিতার ভিতর হইতেই বাহির হইতেছিল; অত্যন্ত গরম লাগিলেই জিনিসটা বাহির হয়। এই জিনিসটা শূন্যে উঠিয়া যাইবার সময় জ্বলে, আর তাহাকে আমরা দীপের শিখা বলি।

গরমে এই জিনিসটা বাহির হইয়া গেলে অনেক সময় আর কতগুলি জিনিস পড়িয়া থাকে, তাহাকে আমরা অঙ্গার, ভস্ম ইত্যাদি নাম দিই।

কাঠের কয়লা জ্বালাইলে তাহা হইতে শিখা বাহির হয় না, পাথর কয়লা জ্বলাইলে তাহা হইতে শিখা বাহির হয়। যে জিনিসটা জ্বলিয়া শিখা হয়, কাঠ জ্বলিবার সময়ই সেই জিনিসটা ফুরাইয়া গিয়াছে—তারপর কয়লা পাইয়াছ। কাজেই কাঠের কয়লায় সেই জিনিসটা নাই, আর তাহা জ্বলিবার সময় শিখাও দেখা যায় না। পাথর কয়লায় কিন্তু সেই জিনিসটা আছে, সুতরাং পাথর কয়লা জ্বলিবার সময় শিখা দেখা যায়। পাথর কয়লার এই পদার্থটা কৌশলক্রমে বাহির করিয়া তাহাদ্বারা কলিকাতার রাস্তায় রাত্রি-কালে আলো দেওয়া হয়। তাহাকে তোমরা গ্যাসের-আলো বল। পাথর কয়লা হইতে গ্যাস বাহির করিয়া ফেলিলে যাহা থাকে, তাহার নাম কোক্ কয়লা। কোক্ কয়লা হইতে পাথর কয়লার ন্যায় শিখা বাহির হয় না। তাহার কারণ এই যে, যে জিনিসটা জ্বলিয়া শিখা হয়, তাহার অধিকাংশ অগ্রেই বাহির করিয়া লওয়া হইয়াছে।

দুই পয়সা দিয়া সাহেবদের তামাক খাইবার একটা চীনা মাটির পাইপ ক্রয় কর। তাহার বাটিটির ভিতরে একখণ্ড পাথর কয়লা পুরিয়া বাটির মুখ অতি উত্তমরূপে শিব গড়িবার মাটি দিয়া বন্ধ করিয়া দেও। এখন সেই কয়লা-পূর্ণ পাইপের মাথাটি আগুনে ফেলিয়া দেও, নলটি যেন আগুন হইতে বাহির হইয়া থাকে। কিছুকাল পরে ঐ নলের মুখে আগুন দিলে সুন্দর গ্যাসের আলো জ্বলিবে।

এইগুলি তোমরা সকলেই পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। কেবল আমরা বলিতেছি বলিয়া ভালোমানুষের মতো মানিয়া লইবার কোনো প্রয়োজন নাই। ছোট দীপ আর বড় দীপের পরীক্ষাটি করিবার সময় দেখিবে যেন ছোট দীপটা বড় দীপ অপেক্ষা অনেক ছোট হয়, আর দীপগুলি যেন না কাঁপে।

(২)

অনেকদিন হইল একজন প্রসিদ্ধ ইংরাজ লেখক আয়র্ল্যান্ড দেশ দেখিতে গিয়াছিলেন। সেখানে একটি ছেলে তাঁহাকে পথ দেখাইয়া নানাস্থানে লইয়া গিয়াছিল। বাড়ি আসিয়া সাহেব ঐ ছেলেটিকে কিছু পুরস্কার দিতে ইচ্ছা করিলেন। সাহেব মদ খাইতে ভালোবাসিতেন সুতরাং পকেট হইতে একটি বোতল বাহির করিয়া তাহাকে কিছু মদ খাইতে দিলেন ; ছেলেটি মদ খাইতে চাহিল না। সাহেব তাহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য বলিলেন তোমাকে আট আনা দিব, তুমি খাও। সে খাইতে অস্বীকার করিল। তারপর সাহেব এক বোতল বাহির করিয়া তাহাকে কিছু মদ খাইতে দিলেন ; ছেলেটি মদ খাইতে রাজি হইল না। সে অতি গরিব ছেলে, তাহার গায়ের জামা ছেঁড়া ছিল, কিন্তু সে এত প্রলোভনেও বিচলিত না হইয়া পকেট হইতে একটি মেডেল বাহির করিল ; সেটি মদ্যপাননিবারণী সভার মেডেল। সেই মেডেলটি সাহেবকে

দেখাইয়া বলিল, 'আমি মদ খাইব না প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। আপনার যত টাকা আছে তাহা সমস্ত দিলেও আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিব না।' এই ছেলেটির বাপ অত্যন্ত মদ খাইতেন ; শেষে মদ্যপাননিবারণী সভার যত্নে তিনি মদ খাওয়া ছাড়িয়া ভালো লোক হইয়াছিলেন। মরিবার সময় এই মেডেলটি তিনি ছেলেকে দিয়া গিয়াছিলেন। বালকের কথা শুনিয়া সাহেব মদের বোতল নিকটবর্তী একটা পুকুরে ফেলিয়া দিলেন, এবং 'নিজে আর কখনও মদ খাইব না' এই প্রতিজ্ঞা করিয়া, যাহাতে অন্যেরাও মদ না খায় সেই চেষ্টায় জীবন উৎসর্গ করিলেন।

সখা—মে ১৮৮৬

নানাপ্রসঙ্গ : ২

(১)

দুষ্কর্মের প্রতিফল

এক-একটা জানোয়ারের এক-এক প্রকার দুর্বলতা থাকে। একজন লোক শুনিল যে গায়ের পিরাণ খুলিয়া ফেলিবার মতন করিয়া পা উলটাইয়া মাথার উপর পর্যন্ত আনিয়া, তারপর মাথা নোয়াইয়া পেছনের দিকে হাঁটিয়া কুকুরের কাছে গেলে বড় ভয়ানক কুকুরটাও ভয় পায়। এই ব্যক্তির প্রতিবেশীর একটি সুন্দর ফলের বাগান ছিল। প্রতিবেশী অতিশয় কৃপণ স্বভাব ছিল। তাহার বাগানের দরজায় আবার এক প্রকাণ্ড কুকুর বাঁধা থাকিত। সুতরাং ফলগুলি দেখিয়া তাহার ক্ষুধাই বাড়িত, কিন্তু তাহার নিবৃত্তি হইবার কোনো আশা ছিল না। সে কুকুর সম্বন্ধে এই কথা শুনিয়াই ভাবিল যে এইবার প্রতিবেশীর ফলের বাগানে যাইতে হইবে। যাহা ভাবিল, কাজেও তাহা করিল। আস্তে-আস্তে কুকুরের দিকে পশ্চাৎপদ হইতে লাগিল আর ভাবিতে লাগিল বুঝি কুকুর পলাইয়াছে—বুঝি এইবার বাগানের ভিতর আসিয়াছি। কুকুর কিন্তু ভয় পায় নাই ; তাহার গলায় বাঁধা শিকলটা লম্বা ছিল না বলিয়া সে এতক্ষণ চুপ মারিয়াছিল। উলটোদিকে হাঁটিতে হাঁটিতে যেই লোকটি তাহার কাছে আসিয়াছে, অমনি সে তাহার পাছা হইতে একবারের জলযোগের মতন এক টুকরা মাংস কামড়াইয়া লইল।

অন্যায় কাজ করিতে গেলে তাহারই শাস্তি পাওয়া যায়।

(২)

আশ্চর্য প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব

একজন স্পানিয়ার্ড আফ্রিকা দেশে পাখি মারিতে গিয়াছিল। পাখি শিকার করিয়া ফিরিয়া আসিবার সময় পথে একটা সিংহ আসিয়া তাহার সম্মুখে

দাঁড়াইল। পশুরাজের মুখভঙ্গি দেখিয়াই সে বুঝিতে পারিল যে কেবলমাত্র কুশল জিজ্ঞাসা করিবার জন্য তাঁহার আগমন হয় নাই। তাহার বন্দুক পাখি মারিবার জন্য প্রস্তুত করা ছিল। ইহা ভিন্ন আর গুলি বারুদ তাহার সঙ্গে ছিল না। গুলি করিলে সিংহ মরিবে না, কেবলমাত্র বিপদ বাড়িবে। সুতরাং সে অন্য উপায়ে রক্ষা পাইবার পথ দেখিতে লাগিল। তাহার মাথার টুপিতে অনেকগুলি উটপক্ষীর পালক বাঁধা ছিল। ভাবিয়া চিন্তিয়া সে টুপি মুখে করিয়া লইল। পালকগুলি কেশরের মতন হইয়া তাহার বুক মুখ ঢাকিয়া ফেলিল। ভিতর হইতে চক্ষু দুটি মিট্‌মিট্ করিতে লাগিল। এইরূপ চেহারা করিয়া সে হামাগুড়ি দিয়া সিংহের দিকে যাইতে লাগিল। সিংহ ভাবিল যে এরূপ জানোয়ার তো সে কোনোদিন খাইতে যায় নাই—তবে-বা এটাই তাহাকে খাইতে আসিল। সুতরাং এরূপ কিম্ভূতকিমাকারের সামনে অধিকক্ষণ থাকা নিতান্তই আশংকাজনক মনে করিয়া, সে ইহাপেক্ষা নিরাপদ স্থানে যাইবার পন্থা দেখিল।

একজন লোক নানাপ্রকার শব্দ ও বিদ্‌ঘুটে মুখভঙ্গি করিতে পারিত। এই লোকটাকে একবার সিংহে তাড়া করিল। সে বেচারা প্রাণপণে দৌড়িয়াও দেখিল যে আর বাঁচিবার আশা নাই, এবারে নিশ্চয়ই সিংহ তাহাকে ধরিবে। এমন সময় সে হঠাৎ থামিল। থামিয়াই সিংহের দিকে তাকাইল—আমরা যেরকম করিয়া একে অন্যের পানে তাকাই সেরূপ করিয়া তাকাইল না, সিংহের দিকে পৃষ্ঠদেশ রাখিয়া মাথা নোঙাইয়া দুই ঠ্যাঙের মধ্যস্থ ফাঁক দিয়া তাকাইল ; আর তখন মুখের এমনি একখানা চেহারা করিল যে তেমন চেহারা আর সে কখনো করে নাই। ইহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার সেই ভয়ানক শব্দগুলির ভিতর হইতে বাছিয়া, যে শব্দটি সকলের চাইতে অস্বাভাবিক, সেই শব্দটি করিল। সিংহ থামিল এবং একটু চিন্তান্বিত হইল ; আর-এক মুখ বিকৃতি, আর-এক চীৎকার —সিংহ ভয় পাইল এবং ফিরিল। আর-এক চীৎকার—সিংহ ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়িয়া পলাইল।

হঠাৎ কোনোস্থানে বিপদে পড়িলে ভয়ে জড়সড় না হইয়া বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার উপায় মনে মনে ভাবা উচিত।

(৩)

অভিমানী রাজপুত্র

রুশিয়ার যুবরাজের পুত্র সকালে উঠিয়া মুখ ধুইতে চাহিতেন না। এক-দিন তাঁহার মাস্টার আসিয়া নালিশ করিল, 'ছোট-কর্তা মুখ ধুইতেছেন না।'

যুবরাজ বলিলেন, 'বটে? আচ্ছা দেখা যাবে, এরপর সে কেমন করিয়া মুখ না ধুইয়া থাকে।'

রাজপরিবারের ছেলে বুড়ো সকলকেই পাহারাওয়ালারা সেলাম করিবে, এ-রূপ নিয়ম। পরদিন চারি বৎসরের শিশু-কর্তাটি মাস্টারের সঙ্গে বেড়াইতে বাহির হইলেন। একজন পাহারাওয়ালার কাছ দিয়া তাঁহারা গেলেন ; সে তাল-গাছপানা হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, সেলাম করিল না।

যুবরাজের ছেলেকে সকলেই সেলাম করিয়া থাকে, সুতরাং তিনি ইহাতে একটু বিরক্ত হইলেন, কিন্তু কিছু বলিলেন না। একটু পরেই তাঁহারা আর একজন পাহারাওয়ালার নিকট দিয়া গেলেন। এই ব্যক্তিও কোনোরূপ সম্মান প্রদর্শন করিল না। যুবরাজনন্দন অত্যন্ত চটিয়া মাস্টারকে বলিলেন। এই-রূপ বেড়াইবার সময় অনেক সিপাহীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল, কেহই তাঁহাকে সেলাম করিল না। তিনি দৌড়িয়া যুবরাজের কাছে গিয়া বলিলেন—

'বাবা! বাবা! তোমার বরকন্দাজগুলিকে চাবুক মার। আমি যাইবার সময় এরা আমাকে সেলাম করিতে চাহে না।'

যুবরাজ বলিলেন, 'বাছা, তাহারা ভালোই করে। পরিষ্কার সিপাহীরা কখনো অপরিষ্কার ছোট-কর্তাকে সেলাম করে না।' এর পর হইতে যুবরাজ-নন্দন প্রত্যহ প্রাতে স্নান করিতেন।

যুবরাজপুত্রের অভিমানই তাহার কু-স্বভাব সংশোধন করাইল।

সখা—জুন ১৮৮৬

নানা প্রসঙ্গ ঃ ৩

সাহসী বালক

একদিন আমরা স্কুলে যাইতেছি এমন সময় দেখিলাম আমাদের সমপাঠী একটি বালক নিকটস্থ মাঠের দিকে একটা গোরু লইয়া যাইতেছে। পথে এক-দল ছেলের সঙ্গে তাহার দেখা হইল। ঐ দলের জ- ঠাট্টার বিষয় পাইলে কখনও ছাড়িত না। জ—বলিয়া উঠিল, "কিহে! দুধের দাম কত? বলি উ—তুমি কোন ঘাস খাও? গোরুর শিঙ্গে যে সোনাটুকু আছে তাহার দাম কত? ওহে, তোমরা দেখ! যদি নূতন ফ্যাশন্ দেখিতে চাও, তবে এই জুতা জোড়াটার পানে তাকাও।"

উ—একটু হাসিয়া আমাদিগকে নমস্কার করিল, তারপর মাঠের চারিধারে যে বেড়া ছিল তাহার দরজা খুলিয়া গোরুটিকে ভিতরে দিল। তারপর দরজা বন্ধ করিয়া আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই স্কুলে আসিল। বিকালে স্কুলের ছুটির পর গোরুটিকে বাহির করিয়া লইয়া গেল, কোথায় নিল আমরা কেহই জানিতে পারিলাম না। দুই-তিন সপ্তাহ ধরিয়া সে রোজই এই কাজ করিতে লাগিল।

এই স্কুলের ছেলেরা প্রায়ই ধনীর সন্তান। ইহাদের কতকগুলি আবার এমন মূর্খ ছিল যে, গোরু মাঠে লইয়া গিয়াছিল—বলিয়া উ—কে ঘৃণা করিত।

ইহারা উ—র মনে কষ্ট দিবার জন্য নানারকম বিশ্রী কথা বলিত। উ—তাহাতে কিছুমাত্র বিরক্ত না হইয়া সে-সকল সহ্য করিত। একদিন জ—বলিল, "কিহে উ—তোমার বাবা কি তোমাকে গোয়ালা করিতে চাহিতেছেন নাকি?"

উ—বলিল, "ক্ষতি কি?"

"ক্ষতি কিছু নয়, তবে দেখো যেন কেঁড়ে ধুইয়া তাহাতে খুব বেশি জল রাখিয়া দিও না।"

সকলে হাসিল। উ—কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া উত্তর করিল, "তার কোনো ভয় নাই। আমি যদি কোনোদিন গোয়ালা হই, তবে খাঁটি ওজনে খাঁটি দুধ দিব।"

এই কথাবার্তার পরদিন স্কুলের পরীক্ষার প্রাইজ দেওয়া হইল। তাহাতে নিকটবর্তী স্থান সকলের অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। স্কুলের অধ্যক্ষ প্রাইজ দিলেন। উ—আর জ—উভয়েই খুব ভালো নম্বর পাইয়াছে; পড়াশুনায় তাহারা সমকক্ষ। পুরস্কার বিতরণ শেষ হইলে অধ্যক্ষ বলিলেন যে আর একটি পুরস্কার আছে, সেটি একটি সোনার মেডেল। এই পুরস্কারটি সচরাচর দেওয়া হয় না। ইহাতে অনেক টাকা লাগে বলিয়া যে দেওয়া হয় না তাহা নহে, পুরস্কারের উপযুক্ত ছেলে পাওয়া যায় না বলিয়াই দেওয়া হয় না। পুরস্কারটি সৎসাহসের জন্য দেওয়া হইয়া থাকে। তিন বৎসর হইল প্রথম শ্রেণীর একটি ছেলে একটি গরিব বালিকাকে জল হইতে উঠাইয়া বাঁচাইয়াছিল, তাহাকে এই পুরস্কারটি দেওয়া হইয়াছিল।

অধ্যক্ষ তারপর উপস্থিত সকলের অনুমতি লইয়া একটি ছোট গল্প বলিলেন—

"অনেক দিনের কথা নয়; কতকগুলি বালক রাস্তায় ঘুড়ি উড়াইতেছে, এমন সময় একটি ছেলে ঘোড়ায় চড়িয়া সেই স্থান দিয়া যাইতেছিল। ঘোড়াটা ভয় পাইয়া ছেলেটিকে ফেলিয়া দিল। তাহাতে সে এত আঘাত পাইল যে, কয়েক সপ্তাহ তাহাকে শয্যাগত থাকিতে হইল। যাহাদের জন্য এই বিপদ ঘটিল তাহারা কেহই আহত ছেলেটির সঙ্গে গেল না। কিন্তু একটি ছেলে দূর হইতে এই ঘটনা দেখিয়াছিল, সে যে কেবল আহত ছেলেটির সঙ্গে সঙ্গে গেল এমন নহে, কিন্তু শুশ্রূষা করিবার জন্য তাহার কাছে থাকিল।

"এই ছেলেটি শীঘ্রই জানিতে পারিল যে আহত বালকটি একটি গরিব বিধবার নাতি। বিধবার এক গোরু আছে, সেই গোরুর দুধ বিক্রি করিয়া সে সংসার চালায়। বিধবা বৃদ্ধ এবং খোঁড়া; এই নাতিটি ছাড়া, তাহার গোরু মাঠে নিয়া যায় এমন লোক নাই। সেই নাতিটি আঘাত পাইয়া এখন অচল হইয়া পড়িয়াছে। বালক বলিল, 'আপনার কোনো চিন্তা নাই, আমি আপনার গোরু মাঠে লইয়া যাইব।'

"কিন্তু এইখানেই তাহার সৎকার্যের শেষ হইল না। ঔষধের জন্য টাকার আবশ্যক হইল। বালক বলিল, 'মা আমাকে বুট কিনিবার জন্য টাকা দিয়াছিলেন: সম্প্রতি আমার বুট না কিনিলেও চলে।' বিধবাটি বলিল, 'তাহা

হইতে পারে না। কিন্তু আমাদের ঘরে একজোড়া জুতা আছে। আমার নাতির জন্য কিনিয়াছিলাম, সে পরিতে পারে না। তুমি যদি এইগুলি কিন, তাহা হইলেই বেশ হয়।' বালক সেই কুৎসিত জুতা জোড়া কিনিল এবং এখনো সে তাহা পরিতেছে।

"স্কুলের অন্যান্য ছেলেরা দেখিল যে একজন ছাত্র একটা গোরু লইয়া যাইতেছে ; সুতরাং তাহার উপরে হাসি এবং বিদ্রূপ বর্ষণ হইতে লাগিল। তাহার গোরুর চামড়ার জুতা দুইটার উপর তাহাদিগের বিশেষ দৃষ্টি পড়িল। কিন্তু সে প্রফুল্ল চিত্তে বীরের ন্যায় সেই মোটা চামড়ার জুতা পরিয়া বিধবার গোরু চালাইতে লাগিল। অন্যেরা তাহাকে যে-সকল ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতে লাগিল, এই সরল বালক সে কথা ভাবিলও না। ভালো কাজ করিতেছে, ইহা মনে করিয়াই সে সন্তুষ্ট থাকিল। গোরু চালাইবার কারণ তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে সে চেষ্টা করে নাই, কারণ সৎকার্য করিয়া গর্ব করাটা তাহার ভালো লাগিত না। ঘটনাক্রমে তাহার শিক্ষক কাল এ-সকল কথা জানিতে পারিয়াছেন।

"এখন আমি আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, এই বালকের আচরণে কি আপনারা প্রকৃত বীরত্ব দেখিতে পান নাই? উ—বাবু তুমি ব্ল্যাক্-বোর্ডের পেছনে পলাইও না। বিদ্রূপের সময় তুমি ভয় পাও নাই, প্রশংসারকালে ভয় পাইলে কেন?"

উ—নত মুখে জড়সড় হইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া সকলেই প্রশংসা করিতে লাগিল।

সেই কুৎসিত জুতা দুইটা এখন তাহার পায়ে কেমন শোভা পাইল। তাহার মাথায় মুকুট দিলেও হয়তো তেমন সাজিত না। মেডেল তাহাকে দেওয়া হইল, সকলে আনন্দে উচ্চ করতালি দিতে লাগিল। অন্যান্য যে-সকল ছেলেরা উ—কে বিদ্রূপ করিয়াছিল তাহারা এখন যারপরনাই লজ্জিত হইল, এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাহার সহিত বন্ধুতা করিতে আসিল।

(ইংরাজি হইতে অনূদিত) সখা—জুলাই ১৮৮৬

নানা প্রসঙ্গ : ৪

তোমাকে যদি কেহ লাঠি লইয়া মারিতে আইসে, তবে তুমি কি কর? দৌড়াইয়া পলাও। আততায়ীর হাত এড়াইবার ইহাই সর্বোৎকৃষ্ট উপায় বলিয়া আমরা মনে করি। কিন্তু অনেক জানোয়ার ইহা অপেক্ষা অন্যরূপ উপায় অবলম্বন করে।

অনেক জানোয়ার এইরূপ অবস্থায় পড়িলে মড়ার মতো হইয়া পড়িয়া থাকে। এইরূপে অনেক সময় বিপদ হইতে রক্ষা পায়।

পীউইট্ পাখির বাসার কাছে মানুষ গেলে পীউইট্ ভাব দেখায় যেন সে

ভালো করিয়া উড়িতে পারে না। এরূপ পাখিকে ধরা সহজ মনে করিয়া অনেকেই তাহার পিছনে যায়। এইরূপে পাখি তাহাকে ভুলাইয়া বাসা হইতে দূরে লইয়া যায়।

কেন্দ্রাইকে বিরক্ত করিলে সে শরীর গুটাইয়া গোলাকার হইয়া থাকে। ইহা হইতেই কেন্দ্রাই সম্বন্ধে নিম্নলিখিত হেঁয়ালিটি উৎপন্ন হইয়াছে—

'ছ'কুড়ি ছ'খানা পা,
রক্ত বরণ গা,
টোকা দিলে টাকাটি হয়
তাকে তুই খা।'

উটপক্ষীকে কুকুরেরা তাড়া করিলে যখন সে মনে করে যে আর ইহাদের হাত এড়ানো গেল না তখন মাথাটি বালির নীচে গুঁজিয়া রাখে। অবশ্য ইহাতে বিপরীত ফলই ঘটিয়া থাকে, কিন্তু উটপক্ষী প্রথমে মনে করে যে বড়ই নিরাপদ হইয়াছে।

একপ্রকারের পোকা আছে তাহারা নিজের বাড়িঘর সঙ্গে লইয়া বেড়ায়। কোনোরূপ ভয় পাইলেই ঘরের ভিতর লুকাইয়া থাকে।

একপ্রকারের ফড়িং আছে, তাহার পাখা দুটি একত্র করিলে দেখিতে ঠিক গাছের পাতার মতন হয়। তখন আর তাহাদিগকে সহজে চিনিতে পারা যায় না। এইরূপে তাহারা ফড়িং-খাদক পাখিদের হাত হইতে রক্ষা পায়।

গুগুলিরা যখন নিতান্তই বেকায়দা দেখে, তখন তাহারা মুখের কাছের দরজাটি বন্ধ করিয়া দেয়।

শম্বুকজাতীয় অনেকপ্রকার জলজীব আছে, তাহারা যখন দেখে যে শত্রুর হাত হইতে বাঁচিবার আর অন্য উপায় নাই, তখন একপ্রকার কালো জিনিস পেটের ভিতর হইতে বাহির করিয়া দেয়। ইহাতে জলটা অনেক দূর পর্যন্ত এত কালো হইয়া যায় যে, আর তাহার ভিতর দিয়া কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। এই অবসরে সে পলাইয়া কোনো নিরাপদ স্থানে যায়।

কচ্ছপগুলির কাণ্ড-কারখানা সকলেই দেখিয়াছ, সুতরাং তাহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলার আবশ্যক দেখি না। একপ্রকারের কচ্ছপ আবার শুধু গলাটি আর হাত-পাগুলি ভিতরে লইয়া গিয়াই সন্তুষ্ট হয় না। তাহার শরীরের আবরণটা কবাটের মতো হইয়া সেই হাত-পাগুলিকে ঢাকিয়া রাখে।

শেয়ালগুলি যে কতবার মরিয়া থাকে তাহা আর কি বলিব। এ বিষয়ে শেয়ালের সঙ্গে আর কেহ পারিবে না।

বুনোরোহিতের আঁইস বলিয়া একপ্রকার আঁইস অনেক জায়গায় বিক্রয় হয়; অনেকে তাহাতে আংটি প্রস্তুত করিয়া হাতে দেয়। বাস্তবিকই জঙ্গলে কোনোরূপ রোহিত মাছ থাকে, বা ঐগুলি যে মাছেরই আঁইস, তোমরা এরূপ মনে করিও না। ঐ-সকল আঁইস একপ্রকার চতুষ্পদ জানোয়ারের। আমাদের দেশে এইরূপ জানোয়ার অতি অল্পই আছে; সুতরাং আমরা উহাদিগকে সচরাচর দেখিতে পাই না, দক্ষিণ আমেরিকায় এই জাতীয় অনেক জন্তু বাস করে। এই-

সকল জন্তুকে আর্মাডিলো বলা হয়। আর্মাডিলো অনেকপ্রকারের হইয়া থাকে।

দক্ষিণ আমেরিকায় অনেক বাঁদর থাকে ; তাহাদের জ্বালায় আর্মাডিলো বড় ব্যতিব্যস্ত হয়। বাঁদরগুলি তাহাদিগকে প্রথমে খোঁচায়। যদি তাহারা গর্তে প্রবেশ করে তবে লেজ ধরিয়া টানিয়া বাহির করিয়া যারপরনাই বিড়ম্বনা করে। কেবলমাত্র এক জাতের আর্মাডিলোর নিকট বানরেরা কিঞ্চিৎ জব্দ থাকে। এই আর্মাডিলোর নাম বল্ আর্মাডিলো (Ball Armadillo)। বল্ আর্মাডিলো উপায়ান্তর না দেখিলে হাত-পা গুটাইয়া লেজ-মাথা গুঁজিয়া পাছা সামনে টানিয়া লইয়া বেশ একটি নিরেট গোলাকার জিনিস হইয়া থাকে।

বাঁদরেরা আর তখন ধরিয়া টানিবার মতো কোনো জিনিস পায় না ; সুতরাং অপ্রতিভ হইয়া ঘরে ফিরিয়া যাইতে হয়।

সখা—নবেম্বর ১৮৮৬

নানা প্রসঙ্গ : ৫

(১)

একদিন বড় ঝড় হইতেছিল। দশ-বারোজন লোক একটা ঘরে আশ্রয় লইল। মেঘে আকাশ অন্ধকার হইয়াছে। এমন সময় একখানা কালো মেঘ ঘরের উপরে আসিয়া থামিল। মেঘখানা ভয়ানক কালো ; দেখিলেই ভয় হয়। ইহা দেখিয়া একজন বলিল, "মেঘটা অবশ্যই কিছু চায়, হয়তো আমাদের মধ্যে একজন মহাপাপী আছে, তাহার মাথায় বাজ ফেলিয়া মেঘটা তাহাকে মারিতে আসিয়াছে।" আর-একজন বলিল, "একজন দোষীকে মারিতে গিয়া তাহার সঙ্গে এতগুলি নির্দোষীকে বধ করিবে, বোধ হয় এইজন্যই বাজ পড়িতে দেরি হইতেছে। কিন্তু দেরি আর কতক্ষণ হইবে, দোষী ব্যক্তি যদি শীঘ্র পৃথক হইয়া না যায় তবে আর সকলেও তাহার সঙ্গে মারা যাইবে।" আর-একজন বলিল, "ইহা কখনই হইতে পারে না ; চল আমরা প্রত্যেকেই এক-এক বার করিয়া বাহিরে যাই। যে দোষী সে বাহিরে গেলেই তার ঘাড়ে বাজ পড়িবে।" এই পরামর্শ বেশ সঙ্গত বোধ হইল ; তারপর এক-একজন করিয়া বাহিরে যাইয়া ফিরিয়া আসিতে লাগিল। এইরূপে একজন ছাড়া আর সকলেই বাহিরে গিয়া আসিল, কিন্তু তাহাদের কাহারো মাথায় বাজ পড়িল না। শেষ ব্যক্তির পালা যখন আসিল, তখন সে আর কোনোমতেই বাহিরে যাইতে চাহে না। অন্যান্যেরা মনে করিল, 'এই ব্যক্তিই দোষী, ইহাকে ঘর ছাড়িয়া যাইতে হইবে, নতুবা ইহার সঙ্গে সঙ্গে আমরাও মারা পড়িব।' এই ভাবিয়া সকলে ঠেলিয়া তাহাকে ঘরের বাহির করিয়া দিল, আর অমনি ঘরের উপর বাজ পড়িয়া তাহারা মরিয়া গেল। যাহাকে বাহির করিয়া দিয়াছিল সে বাঁচিল।

(২)

একটি ছোটছেলের বাপ-মা মরিয়া যাওয়াতে সে বড়ই দুঃখে পড়িল। সে মনে করিল যে এরূপ দুঃখ সহ্য করার চাইতে মরিয়া যাওয়াই ভালো। এই ভাবিয়া সে একটা গর্ত খুঁড়িতে আরম্ভ করিল। এমন সময়ে এক পুত্রহীন সওদাগর সেই পথ দিয়া যাইতেছিল, সে সেই ছেলেটিকে ঐরূপ গর্ত খুঁড়িবার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। বালক উত্তর করিল, "আমার মা নাই, বাপ নাই; আমার আর বাঁচিয়া ফল কি? আমি এই গর্তে পড়িয়া মরিব।" সওদাগরের বড় দয়া হইল; সে বলিল, "তোমার মরিয়া কাজ নাই; তুমি আমার সঙ্গে এস, আমরাই তোমার বাপ-মা হইব।" বালক সওদাগরের সঙ্গে তাহার বাড়িতে গেল, সেখানে সে খুব যত্ন পাইতে লাগিল। কিছুদিন পরে সওদাগরের এক ছেলে হইল। সওদাগর ও তাহার স্ত্রী এখন সেই দুঃখী ছেলেটিকে অত্যন্ত হিংসা করিতে লাগিল। তাহাদের হিংসা এতদূর বাড়িয়া উঠিল যে তাহারা সেই ছেলেটিকে মারিয়া ফেলিবার জন্য একটা গভীর কূপ খুঁড়িয়া রাখিল— মনে করিল, 'একবার তো কূপে পড়িয়াই মরিতে গিয়াছিল, এবারে কূপ প্রস্তুত রহিয়াছে দেখিলে অবশ্যই তাহাতে ঝাঁপিয়া পড়িয়া মরিবে।' কিন্তু সেই দুঃখী সন্তান ইহার কোনো খবর পাইবার পূর্বেই সওদাগরের নিজের ছেলে সেই কূপ দেখিতে গেল এবং হঠাৎ তাহাতে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিল।

গল্পগুলি সত্য না হউক ইহাদের ভিতর বেশ উপদেশ আছে! পরের মন্দ ভাবিও না। দেখ এই-সকল লোক পরের অনিষ্ট করিতে গিয়া কি শাস্তিই পাইল!

সখা—জুন ১৮৮৭

মুদ্রাযন্ত্র

চীনেদের বড় বুদ্ধি। গ্রাম্য লোকদিগের অনেকে এখনো বিশ্বাস করে যে স্টীম্-এঞ্জিন্, টেলিগ্রাফ্ ইত্যাদি বড়-বড় কলকারখানা সব চীনেদের তৈরি। বাস্তবিক চীনেদের সম্বন্ধে লোকের এরূপ বিশ্বাস হইবার কারণ আছে। পূর্বকালে যখন অন্যান্য দেশের লোকেরা এ-সব বিষয়ে কিছু জানিত না, তখন চীনেরা অনেকরকম কল ও সংকেত জানিত। তখন যাহা কিছু আশ্চর্য হইত, প্রায় সবই চীনেরা প্রস্তুত করিত। এইরূপেই চীনেদের এরূপ নাম হইল।

যে ছাপাখানা দ্বারা পৃথিবীর এত উপকার হইয়াছে, তাহারও প্রথম মতলবটা চীনেদেরই মাথায় খেলিয়াছিল। গল্প আছে খৃস্টীয় দশম শতাব্দীতে চীন রাজমন্ত্রী ফুং তেও প্রথম ছাপিবার সংকেত আবিষ্কার করেন। অনেক হুকুম, ঘোষণাপত্র ইত্যাদি এত অধিকবার লিখিতে হইত এবং তাহাতে এত অধিক সময় লাগিত যে তাহাতে রাজকার্য সুন্দররূপ চলিবার বড়ই ব্যাঘাত হইত। সুতরাং তিনি মনে করিলেন যে ইহা অপেক্ষা সহজ উপায় একটা বাহির করা আবশ্যক। তিনি দেখিলেন যে সেই-সকল হুকুম কাঠে খোদাই করিয়া

তাহাতে কালি দিয়া, তাহা হইতে ছাপ তুলিলেই এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। এইরূপে তিনি মুদ্রাঙ্কনের মূলমন্ত্র আবিষ্কার করিলেন। সেই সময়ে পী চিং নামক একজন কর্মকার বাস করিত। সে দেখিল যে মস্ত একটা হুকুম কাঠে খোদাই করার চাইতে আলাদা আলাদা অক্ষর খোদা থাকিলে সেইগুলি আবশ্যক মতো একত্র করিয়া অতি সহজেই কাজ চালানো যাইতে পারে। সে মাটির অক্ষর তৈরি করিয়া তাহাদ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখিলে যে পৃথক অক্ষর রাখিলে বেশ কাজের সুবিধা হয়। কিছুদিন পরে পী চিং মরিয়া গেল। তাহার ছেলেদের বুদ্ধি ততটা পাকা হয় নাই, সুতরাং তাহারা মনে করিল যে বাবা কি ছেলেখেলা নিয়াই জীবনটা কাটাইয়া গিয়াছেন। এই ভাবিয়া তাহারা পী চিঙের অক্ষরগুলি ফেলিয়া দিল। শীলমোহরের গোছ করিয়া কাঠ খোদাই করা ভিন্ন ছাপার কার্যের আর অধিক উন্নতি চীনাদের দ্বারা হইল না।

জর্মানি দেশে গুটেন্‌বর্গ নামক একজন লোক ছিলেন, তিনিই প্রকৃত পক্ষে মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার করেন। তিনিও প্রথমে খোদাই করা কাঠ হইতেই ছাপ তুলিলেন। ফষ্ট্ নামক এক ব্যক্তি গুটেন্‌বর্গের আবিষ্কারে বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন, এবং তাঁহার সহিত যোগ দিয়া এই কার্যে তাঁহাকে বিশেষ উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরেই গুটেন্‌বর্গ বুঝিতে পারিলেন যে হাতে ছাপ না তুলিয়া ছাপ তোলার জন্য কোনোরূপ যন্ত্র থাকিলে বড়ই ভালো হয়। তিনি একটি যন্ত্রের কথা ভাবিয়া কনরেড্ সামপাক্ নামক একজন ছুতোরকে বলিলেন, সে তাঁহাকে এক কাঠের ছাপাখানা প্রস্তুত করিয়া দিল। এই ঘটনার দুই বৎসর পরে (১৪৩৮ খৃস্টাব্দে) কষ্টার নামক একজন লোক প্রথমে পৃথক অক্ষরের সৃষ্টি করিলেন। এইরূপে প্রকৃত প্রস্তাবে মুদ্রাযন্ত্রের সৃষ্টি হইল। সর্বপ্রথমে তাঁহারা বাইবেল গ্রন্থ ছাপিতে আরম্ভ করেন। এই প্রথম মুদ্রাঙ্কিত গ্রন্থ এখন অতি দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। অল্পদিন হইল নিউইয়র্ক নগরে (আমেরিকায়) ইহার একখণ্ড নিলামে বিক্রয় হইয়াছিল, তাহার মূল্য ১৮০০০৲ (আঠারো হাজার) টাকা হইয়াছিল।

ইংরাজেরা জর্মনদের নিকট হইতেই এই বিদ্যা লাভ করেন। উইলিয়ম ক্যাক্‌স্টন্ নামক একব্যক্তি কলোন্ নগরে আসিয়া ছাপার কাজ শিক্ষা করেন। তিনি দেশে ফিরিয়া আসিলে ইংলণ্ডের রাজা ১৪৭৪ খৃস্টাব্দে তাঁহাকে একটি ছাপাখানা স্থাপন করিতে অনুমতি দেন। ওয়েস্টমিন্‌স্টার এবি নামক গীর্জাতে সেই ছাপাখানা স্থাপিত হয়।

ইংলণ্ডে ক্যাক্‌স্টনের যে গৌরব, আমাদের দেশে মহাত্মা কেরীরও সেই গৌরব হওয়া উচিত। কেরী সাহেবই প্রথমে এদেশে ছাপাখানা আনয়ন করেন। তাঁহারই যত্নে প্রথম বাঙ্গালা অক্ষর প্রস্তুত হইল। শ্রীরামপুরে প্রথম ছাপাখানা স্থাপিত হয়। তখনকার ছাপা এখন দেখিলে হয়তো তোমরা হাসিবে। আমি বহুকালের পুরাতন একখানি অভিধান দেখিয়াছি। তাহাতে বাঙ্গালা শব্দের ইংরাজি অর্থ লেখা আছে। অভিধানখানি ঠিক ওয়েবস্টারের বড় ডিক্স-

নারির ন্যায় বড় হইবে। ইহার বাঙ্গালা অক্ষরগুলি দেখিতে হাতের লেখা অক্ষরের মতো, কিন্তু বেশ পরিষ্কার। এখন অক্ষরের অনেক উন্নতি হইয়াছে; কিন্তু এক কথা মনে রাখিও, কেরী সাহেবের নিকট আমরা এই-সকলের জন্য ঋণী।

আজকাল ছাপাখানার কিরূপ উন্নতি হইয়াছে তাহা আমাদের দেশের দুই একটি প্রেস দেখিয়া বুঝিতে পারিবে না। নিম্নে প্রধান পাঁচটি ছাপার কলের কথা উল্লেখ করা যাইতেছে—

১ ম্যারিনানির-কৃত। এই কল প্রতি ঘণ্টায় ১৫০০০ হইতে .২০০০০ করিয়া ছাপে।

২ জুলিস ডেরী-কৃত। এই কল প্রতি ঘণ্টায় ১৬০০০ হইতে ৩২০০০ করিয়া ছাপে।

৩ হো সাহেব-কৃত। আমেরিকার তিনটি প্রধান খবরের কাগজ ছাপিতে এইরূপ তিনটি কল ব্যবহৃত হয়। এই কল খবরের কাগজ ছাপিয়া কাটিয়া আঠা দিয়া জুড়িয়া এবং ভাঁজ করিয়া দেয়। এবং এত কাজ করিয়াও ঘণ্টায় ২৫০০০ হিসাবে ছাপে।

৪ এলুজে কোম্পানির প্রেস। এই প্রেসে ঘণ্টায় ৩৫০০০ হইতে ৭০০০০ করিয়া ছাপা হইতে পারে।

৫ স্কট্ রোটারি প্রেস। ইহাতে ঘণ্টায় ৩০০০০ হিসাবে আট পৃষ্ঠা বিশিষ্ট কাগজ ছাপা কাটা ও ভাঁজ করা হয়।

সখা—নবেম্বর ১৮৮৬

জলকণার গল্প

খোকার জল খাইবার ছোট গেলাসটিতে বিরানব্বই লক্ষ কোটি জলের অণু আছে। তাহারা কি সকলেই একস্থান হইতে আসিয়াছে? ঝি তাহাদিগকে কলসী হইতে আনিয়াছে বটে, রামা চাকর কলসীতে করিয়া তাহাদিগকে পুকুর হইতে আনিয়াছিল বটে, কিন্তু পুকুরে তাহারা কোথা হইতে আসিল? খোকা এই কথা ভাবিতেছে। জলকণারা যদি কথা কহিত, আর খোকা যদি তাহাদিগকে এই-সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিত, তবে অবশ্যই তাহারা তাহার উত্তর ভালোরূপ দিতে পারিত। ইহার উত্তরে তাহারা কত আশ্চর্য গল্পই বলিতে পারিত। মনে কর খোকা এক-একটিকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, আর তাহারা উত্তর দিতেছেঃ

১ আমরা তিনহাজার জড়াজড়ি করিয়া টুপ্ করিয়া আকাশ হইতে লাফাইয়া পুকুরে পড়িয়াছিলাম।

২ আমরা ষাটলক্ষ রাত্রিকালে গাছের পাতায় বিশ্রাম করিতে বসিয়াছিলাম. সেখান হইতে গড়াগড়ি করিয়া পুকুরে পড়িয়াছিলাম।

৩ আমরা ডাঙ্গা হইতে পুকুরে নামিয়াছিলাম।

৪ আমরা দলে দলে পর্বত হইতে সমুদ্রে যাইতেছিলাম। পথে বালুকণার ফাঁকের ভিতরে বেড়াইতে গিয়া পথ হারাইয়া ফেলিলাম। শেষে কষ্টেসৃষ্টে সেই বালির ভিতর দিয়া এখানে আসিয়াছি।

খোকার ক্ষুদ্র মাথায় গোল লাগিয়া গেল। তাহার জিজ্ঞাসা ফুরাইল না। সে আরো কত শত কথাই তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল। কত কথাই সে শিখিল। ইহারা বলিল, 'এককালে আমরা সকলেই সমুদ্রে ছিলাম। এখন খোকাবাবু আমাদিগকে গেলাসে পুরিয়া গিলিয়া ফেলিতেছে; তখন আমরা তোমাদের বড়-বড় জাহাজগুলিকে ইচ্ছা করিলে গিলিয়া ফেলিতে পারিতাম। সমুদ্র হইল কি না আমাদের সমাজ। সমুদ্র আর কি? আমরাই তো সমুদ্র। সমুদ্রে যখন ছিলাম, বেশ ছিলাম।

'একবার বড় গরম হইল। গরম হইলে অনেকগুলি গা ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া থাকিতে বড় কষ্ট হয়। আমরা ফাঁক ফাঁক হইয়া বাতাসে মিশিয়া আকাশে উঠিলাম। বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে কত স্থানেই গেলাম, কত তামাশাই দেখিলাম। তখন কিন্তু আমাদিগকে কেহই দেখিতে পাইত না, আমরা বাতাসের ভিতরে ছিলাম।

'একদিন বেশ ঠান্ডা বোধ হইতে লাগিল। আমরা তখন বাতাসের বাহিরে আসিয়া দলবন্ধ হইলাম; মনে করিলাম নীচে নামিয়া দেখি কেমন লাগে। তখন তোমরা আমাদিগকে দেখিতে পাইলে, আর মেঘ বলিয়া ডাকিলে। যখন আমরা পড়িতে লাগিলাম, তখন তোমরা বলিলে 'বৃষ্টি হইতেছে'। আমাদের কেহ কেহ তোমাদের পুকুরে পড়িলাম। কেহ কেহ অন্য স্থানে পড়িয়াও শেষে কেমন করিয়া পুকুরেই আসিল। আর সকলের কি হইল বলিতে পারি না—'

এমন সময়ে খোকার পাতে সন্দেশ পড়িল। খোকা অমনি সব ভুলিয়া গিয়া সন্দেশ লইয়া ব্যস্ত হইল। ইহা নিতান্তই দুঃখের বিষয়। খোকার লোভ একটু কম হইলে আমরা জলকণাদের নিকট আরো কত গল্প শুনিতে পাইতাম।

সখা—ফেব্রুয়ারি ১৮৮৮

দাসত্বপ্রথা : ১

তোমাদের অনেকেই টম্‌কাকার কুটির পড়িয়াছ, এবং দাস-ব্যবসায় সম্বন্ধে অনেক কথা জান। ইউরোপের সভ্য সাহেবগণ আমেরিকায় যাইয়া চিনি, তুলা ইত্যাদির চাষ করিতেন, এবং ইউরোপের বাজারে সেই-সকল জিনিস বিক্রয় করিয়া ধনী হইতেন। এই-সকল কারবারে ক্ষেতে খাটিবার জন্য অনেক লোকের দরকার হইত। মাহিয়ানা করিয়া চাকর রাখিতে গেলে বিস্তর পয়সা লাগে, লাভ তত বেশি হয় না, সুতরাং অল্প পয়সায় যাহাতে কাজ চলে, সাহেবরা শীঘ্রই তাহার একটা উপায় স্থির করিলেন।

আফ্রিকায় নিগ্রো জাতির বাস। নিগ্রোরা বলিষ্ঠ, কর্মক্ষম, সরল এবং শান্ত স্বভাব। একদল লোক ইহাদিগকে বলপূর্বক ধরিয়া আমেরিকায় আনিয়া বিক্রয় করিতে লাগিল; এইরূপে দাস-ব্যবসায়ের সৃষ্টি হইল। এই-সকল লোকদের উপর কিরূপ পশুর মতন নিষ্ঠুর ব্যবহার করা হইত, নিম্নলিখিত গল্পটি পড়িলেই তাহা বুঝিতে পারিবে।

লাইবেরিয়াতে একজন নিগ্রো পাদরি আছেন। বাল্যকালে তাঁহাকে দাস-ব্যবসায়ীদের হাতে পড়িয়া ভয়ানক কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। তাঁহাকে ধরিবার সময় পাষণ্ডেরা তাঁহার গায়ে যে আঘাত করিয়াছিল, এই বৃদ্ধ বয়সেও তাহার চিহ্নসকল আছে। পাঁচ বৎসর বয়সের সময় তাঁহাকে চুরি করিয়া আনে। তাঁহার পিতা আফ্রিকার ঐস্থানের একজন ধর্মযাজক ছিলেন। একটি ছোট গ্রামের একটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কুটিরে তাঁহারা বাস করিতেন। ইহার নিকটেই তাঁহাদের কাঠের ছোট কালো দেবতাটির মন্দির ছিল। রোজ দুবেলা ছেলেদের সেই দেবতার কাছে লইয়া গিয়া হাতজোড় করিয়া পূজা করিতে শিখাইতেন। এইরূপ নির্দোষ সুখে তাঁহাদের জীবন চলিত; ভবিষ্যতের দারুণ দুঃখের কথা তাঁহারা স্বপ্নেও জানিতে পারেন নাই।

এই গ্রামের নিকটেই আর-একদল নিগ্রো বাস করিত। ইহারা টাকার লোভে পর্টুগীজ দাস-ব্যবসায়ীদিগকে এই গ্রামে পথ দেখাইয়া আনিল। এক-দিন রাত্রিতে সকলে নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাইতেছে, এমন সময় একদল সশস্ত্র লোক গ্রামে প্রবেশ করিয়া যতজনকে ধরিতে পারিল, বন্ধন করিল। মৃত লোককে বিক্রি করা যাইবে না, সুতরাং অধিক লোককে মারা হইল না।

পিতা তিনটি সন্তানকে লইয়া সময় থাকিতেই জঙ্গলে পলাইতে পারিয়া-ছিলেন। মাতা কনিষ্ঠ শিশুটিকে লইয়া গ্রামান্তরে কোনো আত্মীয়ের বাড়িতে আশ্রয় লইলেন। পনেরো দিবস তাঁহারা সেই স্থানে ছিলেন, এই সময়ের মধ্যে আত্মীয়েরা অবশিষ্ট তিনটি সন্তান এবং তাঁহাদের পিতার সন্ধান লইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তাঁহাদের কোনোরূপ খবরই পাওয়া গেল না। পনেরো দিনের পর একদিন রাত্রিতে দাস-ব্যবসায়ীরা এই গ্রামে আসিয়া সকলকে আক্রমণ করিল। আত্মীয়েরা কোথায় পলাইয়া গিয়াছিলেন, মাতা এবং পুত্র বন্দী হইলেন। ইঁহাদিগকে পর্টুগীজদিগের ছাউনীতে লইয়া আসিল। সে-খানে সপ্তাহকাল তাঁহাদের উপর বিশেষ কোনো অত্যাচার হয় নাই, কারণ পর্টুগীজেরা এদিক ওদিক মানুষ ধরিতে ব্যস্ত ছিল। সেখানেও অন্যান্য অনেক লোকের উপরে নানারকম লোমহর্ষণ অত্যাচার হইয়াছিল। অনেক পিতা পরিবারের জন্য যুদ্ধ করিয়া বন্দুকের গুলিতে হত হইলেন, অনেক মাতা শিশুসন্তানকে লইয়া পলায়নের চেষ্টা করাতে অস্ত্রাঘাতে প্রাণ হারাই-লেন।

যখন অনেকগুলি 'দাস' সংগৃহীত হইল তখন ইহাদিগকে একটা 'ডিপো'-তে লইয়া যাওয়া হইল। সেখানে চারিশতের বেশি লোককে শৃঙ্খলবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। এরপর ইহাদিগকে শিকল দিয়া বাঁধিয়া আফ্রিকার

সেই ভয়ানক রোদ্রে একশত আশি মাইল পথ লইয়া গেল, এই সময় তাহাদের যে কি নিষ্ঠুর ব্যবহার সহ্য করিতে হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা যায় না। ছেলেগুলি চোখের সামনে থাকিলে তাহাদের কষ্ট দেখিয়া পিতামাতা নিরুৎসাহ হইতে পারে, এই বলিয়া বলপূর্বক তাহাদিগকে পৃথক করিয়া দেওয়া হইল। অনেক সময় স্ত্রীলোক এবং শিশুরা আর চলিতে না পারিয়া রাস্তায় পড়িয়া যাইত ; তখন চাবুক মারিয়া তাহাদিগকে উঠিতে বাধ্য করিত। চাবুকে না কুলাইলে লোহার তীক্ষ্ম লাঠিদ্বারা খোঁচা মারিত। বহু সংখ্যক লোক এত অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া প্রাণত্যাগ করিল। আমাদের পরিচিত শিশুটির মাতা তাহার মধ্যে একজন। শিশুটি কাঁদিতে কাঁদিতে বিষম প্রহার খাইয়া প্রাণের ভয়ে চুপ করিয়া রহিল।

এইরূপে চলিয়া শেষে সমুদ্রের ধারে উপস্থিত হইল। সেখানে তাহাদিগকে লইয়া যাইবার জন্য জাহাজ প্রস্তুত। জাহাজ দেখিয়া তাহাদের মনে অধিকতর আতঙ্ক উপস্থিত হইল। তাহারা জাহাজ দেখিয়া মনে করিল যে, এটা বুঝি একটা ভয়ানক জানোয়ার, আর এটাকে খাওয়াইবার জন্য তাহাদিগকে ধরিয়া আনিয়াছে। ভয়ে হতভাগ্যেরা চীৎকার করিতে লাগিল, তাহাদিগকে বলপূর্বক জাহাজে তোলা হইল।

জাহাজের 'ভিতরে' আলমারিতে বই রাখিবার মতন করিয়া দাসদিগকে রাখা হইত। পরিণত বয়স্কদের জন্য ছয় ফুট লম্বা আর এক ফুট চার ইঞ্চি উঁচু স্থান আর পশাপাশি যত লোক ধরে—বেচারাদের পাশ ফিরিবার সম্ভাবনা থাকিত না। ছেলেদের জন্য পাঁচ ফুট লম্বা এক ফুট উঁচু স্থান। এইরূপে তাহাদের দুই মাস কাল থাকিতে হইত। সাত-আট দিন পর একদিন কেবলমাত্র এক ঘন্টা কালের জন্য তাহাদিগকে উপরে আসিতে দেওয়া হইত।

এত অত্যাচারে কয়জন বাঁচিয়া থাকিবে? তিনজনের ভিতরে দুইজন সাধারণত জাহাজেই মারা যাইত, অবশিষ্টেরাও জন্মের মতো বিকলাঙ্গ হইয়া থাকিত।

সখা—এপ্রিল ১৮৮৯

দাসত্বপ্রথা : ২

আমরা যাহাদের কথা বলিতেছি তাহাদের উপর ঈশ্বর সদয় হইলেন। জাহাজ ছাড়িবার পর এক সপ্তাহের ভিতরেই ইংলণ্ডের একখানা যুদ্ধ জাহাজ তাহাদের পিছু পিছু আসিয়া দাস-ব্যবসায়ীদিগকে আত্মসমর্পন করিতে বলিল। দাস-ব্যবসায়ীরা পলায়নোদ্যত হইল। জাহাজ হালকা করিবার জন্য পিপায় পুরিয়া নিগ্রোদিগকে সমুদ্রে ফেলিয়া দিতে লাগিল।

ইহা দেখিয়া ইংরাজদের জাহাজ অধিকতর বেগে অগ্রসর হইতে লাগিল, এবং শীঘ্রই দাস-ব্যবসায়ীদিগকে ধরিয়া ফেলিল। কিছুকাল ভয়ানক যুদ্ধের

পর পর্তুগীজেরা পরাজিত হইল, জাহাজ ইংরেজদের হস্তগত হইল ; দাস-দিগকে উপরে আনিয়া খাইতে দেওয়া হইল ; এবং তাহারা সেইখানেই থাকিতে পাইল। এরপর জাহাজ লাইবেরিয়ার দিকে চলিল দেখিয়া বেচারা নিগ্রোদের মনে আনন্দ হইল।

লাইবেরিয়াতে আনিয়া তাহাদিগকে নানা স্থানে পাঠাইয়া যাহাতে তাহাদের জীবিকা উপার্জনের পন্থা হয় তাহার চেষ্টা হইতে লাগিল। আমাদের পরিচিত নিরাশ্রয় মাতৃহীন শিশুটিকে এবং অন্যান্য অনেক শিশুকে মিশনারিদের ইস্কুলে ভর্তি করিয়া দেওয়া হইল। এইখানে থাকিয়া তিনি লেখা-পড়া শিখিতে লাগিলেন। মিশনারিরা মাঝে মাঝে তাঁহাকে উপশিক্ষকের কাজ করিতে দিতেন, তাহাতে তাঁহার বিশেষ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাইয়া, সন্তুষ্ট হইয়া একটি স্কুলমাস্টারিতে তাঁহাকে নিযুক্ত করিলেন। এই সময়ে ইঁহাকে খৃস্টধর্মে দীক্ষিত করিয়া জন্ সাউথ নাম দেওয়া হয়। জন্ সাউথ অনেকদিন এই কার্যে ছিলেন, শেষটা তাঁহাকে প্রচারকের পদে নিযুক্ত করা হইল। এই কার্যে তিনি বিশেষরূপে লোকের শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা আকর্ষণ করিয়াছেন।

দাসদিগের দুঃখের কথা বলিয়া শেষ করা যায় না। পথে কিরূপ ক্লেশ সহ্য করিতে হইত তাহাই বলিয়াছি। এরপর যাহারা তাহাদিগকে কিনিত, তাহাদিগের নিকট আরো অত্যাচার সহ্য করিতে হইত। সমস্ত দিন ক্রমাগত খাটিতে হইত। সে যে কি ভয়ানক খাটুনি তাহা আর কি বলিব! এত খাটিয়াও প্রভুর সন্তোষ নাই ; অল্প কাজ হইয়াছে বলিয়া বেত্রাঘাত হইত। সামান্য একটু অবাধ্যতা হইলে তাহাকে মারিয়া তাহার হাড় ভাঙিয়া দেওয়া হইত। যাহারা টম্‌কাকার কুটির পড়িয়াছ তাহারা জান টমের মতন একজন ভালো লোককেও অকারণ এইরূপ প্রহারে একটা পশুর মতন লোকের হাতে প্রাণ হারাইতে হইয়াছিল। অনেক হতভাগ্য পলাইয়া এই পাশব অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার চেষ্টা করিত। দেশের এরূপ আইন ছিল যে এই-সকল লোকদিগকে যে আশ্রয় দিবে তাহারই শাস্তি হইবে। পলাতক দাস যদি একবার ধরা পড়িত তবে আর তাহার যাতনার সীমা থাকিত না। এই-সকল লোককে দিনেরবেলায় জঙ্গলে লুকাইয়া থাকিয়া কেবল রাত্রিতে চলিতে হইত। ইংরাজ রাজ্য হইতে প্রথমে দাস-ব্যবসায় উঠিয়া যায়। আমেরিকার উত্তরে ইংরাজাধিকৃত কানাডা দেশ : পলাতক দাসেরা একবার এই দেশে আসিতে পারিলেই পুনরায় স্বাধীন হইবে, ইহা তাহারা জানিত। তাহারা জানিত যে ধ্রুবতারা সকল সময়েই উত্তর দিকে থাকে, সুতরাং এই তারার দিকে গেলেই উত্তরের সেই কানাডা দেশে যাওয়া যাইবে। এইরূপে রাত্রিতে ধ্রুবতারা লক্ষ্য করিয়া ক্রমাগত উত্তর দিকে আসিতে আসিতে অনেকে শেষে কানাডায় আসিয়া স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। কতজন জঙ্গলে বন্য জন্তুর গ্রাসে প্রাণ হারাইয়াছে। এইরূপ একজন পলাতক দাস এখন কানাডা দেশের একজন সম্মানিত লোক। তিনি পলাইয়া আসিবার সময় কিরূপে সাপের হাতে পড়িয়া রক্ষা পাইয়াছিলেন তাহা বলিয়াছেন।

'আমি তাড়াতাড়ি লাফাইয়া একটা গর্ত পার হইবার সময় একটা কোমল

পিছল জিনিসের উপর পড়িয়া আছাড় খাইলাম। আমি উঠিতে না উঠিতেই একটা কি যেন আমাকে জড়াইয়া ধরিতে লাগিল। আমি বুঝিতে পারিলাম আমাকে সাপে ধরিয়াছে। আমাকে এমন আঁটিয়া ধরিয়াছে যে আমি দুই হাতে মাথা ঢাকিয়া কোনোমতে ক্ষীণ চীৎকার করিতে পারিলামমাত্র। আমি শুনিয়া ছিলাম যে, সাপ গলায় প্যাঁচ দিয়া গলা ভাঙিয়া ফেলে, সেইজন্যই হাত উঁচু করিয়া মাথা ঢাকিয়া ছিলাম। ভয়ে ও কষ্টে নিজের অবস্থা বুঝিবার শক্তি ছিল না। ক্রমে আমার পাঁজরা ভাঙিবার উপক্রম হইল। আমি প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিয়াছি, এমন সময় আমার বন্ধুদিগের শব্দ শুনিতে পাইলাম। তাঁহাদের একজন কাটারি দিয়া সাপের গলা কাটিয়া ফেলিলেন, কিন্তু তবু তাহার শরীরটা আমাকে পূর্বের ন্যায়ই আঁটিয়া ধরিয়া থাকিল। এমন সময় আমার বন্ধুরা ল্যাজের দিকে প্রায় দুই ফিট কাটিয়া ফেলিলেন। আমি তৎক্ষণাৎ বন্ধন মুক্ত হইলাম, কিন্তু তখন আর উঠিবার, কি কথা বলিবার শক্তি নাই। সুখের বিষয় জল নিকটেই ছিল ; আমি শীঘ্রই সুস্থ হইলাম। আমরা যতদূর বুঝিতে পারিলাম, অজগরটা ষোলো ফুট লম্বা হইবে এবং তাহার শরীরের খুব মোটা জায়গাটা একজন বলিষ্ঠ লোকের ঠ্যাঙের মতন মোটা। সাপটা বিষধর ছিল না, কিন্তু আমার এক হাতে এমন দুই-একটি আঁচড় দিয়াছিল যে, অনেক বৎসর পর্যন্ত তাহার দাগ যায় নাই। অনেকদিন পর্যন্ত সাপ দেখিলে, এমন-কি, সাপের নাম শুনিলেই আমার গা শিহরিয়া উঠিত। অনেকদিন পর্যন্ত আমি ঘুমের ভিতরে মাঝে মাঝে চীৎকার করিয়া উঠিতাম। আজ পর্যন্তও আমার সেদিনকার ভয়টা দূর হয় নাই।'

দাসত্বপ্রথা আমেরিকা হইতে উঠাইয়া দিতে অনেকদিন লাগিয়াছিল। অনেক মহৎলোকের বহুদিনব্যাপী চেষ্টার পর দাসত্বপ্রথা রহিত করিবার আইন হইল। কিন্তু যাহারা দাসদিগকে খাটাইত তাহারা এ আইন কিছুতেই মানিতে চাহিল না। অবশেষে তাহারা বিদ্রোহী হইয়া, ভয়ানক যুদ্ধ করিল। অনেক লোকের প্রাণনাশের পর, সাধু লোকদেরই জয় হইল। দাসগণ স্বাধীনতা পাইল। ইহার কিছুদিন পরেই দাস-ব্যবসায়ীদের একজন লোক আমেরিকার সভাপতি লিংকন্‌কে হত্যা করিল। লিংকন্ পূর্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন, দাস-ব্যবসায়ীগণ বিনামী চিঠি লিখিয়াছিল যে, দাসত্বপ্রথা উঠাইয়া দিলে তাঁহার প্রাণ যাইবে। কিন্তু লিংকনের ন্যায় মহৎলোক অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি এই-সকল চিঠি একটা পুলিন্দায় রাখিয়া দিতেন ; সেই পুলিন্দার উপরে লেখা ছিল, 'খুনের চিঠি।' কিন্তু সেই-সকল চিঠির ভয়ের প্রতি কিছুমাত্র মনোযোগ না দিয়া, তিনি নির্ভয়ে দাসত্বপ্রথা উঠাইয়া দিলেন। এইজন্য একটা দুর্বৃত্ত থিয়েটারের ভিতরে তাহাকে খুন করিল। দাসগণ যখন লিংকনের মৃত্যু-সংবাদ শুনিল তখন তাহারা পাগলের ন্যায় রাস্তায় ছুটাছুটি করিতে লাগিল। জীবিতাবস্থায় যখনই দাসগণ তাঁহাকে দেখিতে পাইত তখনই দুই হাতে সেলাম করিয়া নৃত্য করিত আর বলিত, 'ধন্য পরমেশ্বর! ধন্য পরমেশ্বর! প্রভু লিংকাম্!' লিংকন্ শব্দ নিগ্রোরা উচ্চারণ

করিতে না পারিয়া 'লিংকাম্' বলিত। অনেক নিগ্রোর বিশ্বাস হইয়াছিল যে, লিংকন্ই পরমেশ্বর। একবার একজন নিগ্রো ধর্মযাজক তাঁহার শিষ্যদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন—'হে ভাইসকল, প্রভু লিংকাম্ তিনি সকল স্থানেই আছেন; প্রভু লিংকাম্ আমরা যাহা বলি সবই শোনেন, প্রভু লিংকাম্ আমাদের মনের কথা সব জানেন।'

দক্ষিণ আমেরিকায় এতদিন দাসত্বপ্রথা ছিল; কিছুদিন হইল তাহাও উঠিয়া গিয়াছে।

এতক্ষণ অন্যান্য দেশে অতীতকালে যাহা ঘটিয়াছে তাহাই বলিয়াছি। কিন্তু আমাদের দেশে বর্তমান কালেই ছোটখাটো রকমে সেই-সকল ব্যাপার ঘটিতেছে। আসামে অনেক সাহেবের 'চা'র চাষ আছে। চা-ক্ষেত্রে কাজ করিবার জন্য অনেক কুলির প্রয়োজন হয়। এই-সকল কুলির উপর অনেক সময় ভয়ানক অত্যাচার হইয়া থাকে। ভয়ানক খাটুনি, অমানুষিক অত্যাচার এই-সকলই এই কুলিদিগকে অনেক সময় সহ্য করিতে হয়। অল্প কয়েকজন দয়ালু লোক আছেন, যাঁহাদের বাগানে কুলিদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার হয় এবং তাহারা অনেক পরিমাণে সুখে থাকে; কিন্তু এরূপ পাশব প্রকৃতির অনেক লোক আছে যাহারা কুলিদিগকে আমেরিকার দাসদের ন্যায় ব্যবহার করে। ইংরাজ রাজ্যে বলপূর্বক লোককে ধরিবার সাধ্য নাই, সুতরাং কুলি সংগ্রহ করিবার জন্য ইহাদের নিযুক্ত লোকেরা, (ইহাদিগকে আড়কাটি বলে), অন্যরকম উপায় অবলম্বন করে। তাহারা ধার্মিকের বেশে গ্রামে গ্রামে যায়, এবং অল্পবুদ্ধি লোকদিগকে কম কাজ এবং বেশি বেতনের লোভ দেখাইয়া ভুলাইয়া আনে। একবার ইহাদিগকে হস্তগত করিয়া আড্ডায় (ডিপো) আনিয়া ফেলিতে পারিলে আর সহজে নিস্তার নাই। এইরূপ করিয়া যাহারা লোক সংগ্রহ করে তাহারা সম্ভবত কখনই তাহাদের উপর পরে ভালো ব্যবহার করে না। জন্‌সাউথ রাস্তায় যেরূপ কষ্ট পাইয়াছিলেন এই-সকল আড়কাটিদের হাতে কুলিরাও প্রায় সেইরূপ ক্লেশ পায়। কিছুদিন ভালো ব্যবহার করে; সম্পূর্ণরূপে হস্তগত হইলেই অন্য মূর্তি ধারণ করে। আধপেটা খাওয়া, কথায় কথায় প্রহার, অযত্নে থাকা ইত্যাদি তো আছেই; ইহার মধ্যে যাহার কোনোরূপ রোগ হয় সে বেচারার আর রক্ষা নাই। অনেকে সময় থাকিতে টের পাইয়া এই-সকল পশুর নিকট হইতে পলায়ন করে। আমাদের একটা ঝি একবার ইহাদের হাতে পড়িয়াছিল। ইহারা যে আড়কাটি, তাহা সে প্রথমে জানিতে পারে নাই। তাহার সঙ্গে আরো দুইজন ছিল। ইহাদিগকে আড়কাটিরা বলিয়াছিল যে ভালো ব্রাহ্মণের বাড়িতে কাজ করিতে হইবে, ছয় টাকা মাইনে আর খোরাক-পোশাক পাইবে। তাহারা সহজেই রাজি হইল এবং সেই লোকগুলির সঙ্গে একটা বাড়িতে আসিল। সেখানে তাহাদিগকে অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিতে হইল। আমাদের ঝি একটু ব্যস্ত হইল এবং শীঘ্র শীঘ্র কাজ পাইবার জন্য তাগাদা করিতে লাগিল। আড়কাটিরা তাহাকে বুঝাইয়া বলিল যে, 'সাহেব আসিবেন, তিনি যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করেন সব কথাতেই হাঁ বলিও, তা হইলেই তোমার কাজ হইবে।' ঝির তো শুনিয়া চক্ষু-

স্থির—'ওমা! সে কিগো! বামুনের বাড়িতে কাজ কোত্তে এলাম, তা আবার সাহেব কেন আসবে গো?' ঝির প্রাণে বিষম খট্‌কা বাধিল। সে আড়কাটিদের কথা কিছু কিছু জানিত, তাহার মনে গুরুতর সন্দেহ হইল। সে কাঁদিতে লাগিল। তাহাকে খাইতে দিল, সে কিছুই খাইল না। এইরূপে বেলা শেষ হইয়া আসিল। বিকালবেলায় অনেক কথাবার্তা, তর্ক, বিতর্ক, সন্দেহ, প্রবোধ ইত্যাদি চলিতে লাগিল; ইহার মধ্যে আমাদের ঝি—বোঁ করিয়া ছুট্! একেবারে বাড়িতে! অন্যকয়টির শেষটা কি দশা হইল সে বলিতে পারে না।

আড়কাটির কথা এখন এত প্রসিদ্ধ হইয়াছে যে এখন হঠাৎ কেহ অদৃশ্য হইলেই উহাদের কথা মনে হয়। এ বিষয়ে লেখকের নিজের অভিজ্ঞতার ভিতরে যে একটি ঘটনা হইয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করি।

আমাদের একটি ভাগ্‌নে আমার দাদার বাড়িতে থাকিত। একদিন সকালে হঠাৎ সে অদৃশ্য হইল। বারোটার সময়ও বাড়ি ফিরে নাই দেখিয়া দাদা আমাদের বাড়িতে একজন লোক পাঠাইলেন। সকালে সে আমাদের এখানে আসিয়াছিল বটে, কিন্তু আটটার পূর্বেই চলিয়া গিয়াছিল। জোড়াসাঁকোতে তাহার জ্যাঠামহাশয় থাকেন, সেখানে লোক পাঠাইয়া জানা গেল, সে সেখানেও যায় নাই। দেখিতে দেখিতে দুইটা বাজিল; তখন সকলেই চিন্তিত হইলাম। কলিকাতার থানা এবং ডাক্তারখানা একটিও বাকি রহিল না, নারিকেলডাঙ্গা প্রভৃতি স্থানেও অনুসন্ধানের ত্রুটি হইল না, কিন্তু তাহার কোনো সন্ধানই পাওয়া গেল না। বাড়ির মেয়েরা ইহার অনেক পূর্ব হইতেই কাঁদিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই-সকল অনুসন্ধানে রাত্রি আটটা বাজিয়া গেল। এমন সময় আমাদের মনে হইল যে, হয়তো সে আড়কাটিদের হাতে পড়িয়াছে। এই চিন্তায় আমাদের মনের কিরূপ অবস্থা হইল সহজেই বুঝিতে পার।

আমাদের একজন বন্ধু, (তাঁহাকে বিদ্যারত্ন মহাশয় বলিব), আড়কাটিদের সম্বন্ধে অনেক খবর রাখেন। ইনিই প্রথমে কুলিদের অবস্থার প্রতি দেশের লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বিদ্যারত্ন মহাশয় যেই খবর শুনিলেন, অমনি তিনি লাঠি হাতে করিয়া অনুসন্ধানে বাহির হইলেন। এ বিষয়ে কলিকাতার যত সন্দিগ্ধ স্থান আছে, তিনি তাহার প্রায় সকলগুলির কথাই জানেন; কিন্তু যত জায়গায় গেলেন, কোথাও কোনোরূপ সন্ধান পাইলেন না। শেষে যেখানে গিয়েছিলেন সেখানে কতগুলি ষণ্ডা লাঠি লইয়া তাঁহাকে তাড়া করিয়াছিল। তিনি অনেক পুণ্যের জোরে সেই ভয়ানক সংকীর্ণ গলির ভিতর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া বড় রাস্তায় আসিয়া বাঁচিলেন।

বারোটার সময় বিদ্যারত্ন মহাশয় ক্ষুণ্ণ মনে ঘরে ফিরিলেন। স্টেশনে স্টেশনে লোক গিয়াছিল তাহারা ইহার অনেক পূর্বেই ফিরিয়াছে। সকলেই স্তব্ধ, কাহারো মুখে কথাটি নাই। যেরূপে রাত্রি কাটিল, তাহার কিঞ্চিৎ কেহ কেহ বুঝিতে পারিবেন, আমার বলিবার সাধ্য নাই।

ভোরে উঠিয়া আবার সকলে অনুসন্ধানে বাহির হইলেন। কেবলমাত্র দাদা বাড়িতে রহিলেন। সাতটার সময় একজন লোক আসিয়া দরজায় ঘা দিল।

প্রশ্নের পর সে বলিল, 'আমি ময়রা ; মহাশয়ের বাড়িতে একটি ছেলের নিকট জলখাবার দরুন টাকা পাইব। কাল সকালে বিশেষ করিয়া তাগাদা করাতে বলিয়াছিল আমার সঙ্গে এস। আমরা লোক সঙ্গে দিলাম ; তাহাকে এই বাড়ির দরজায় দাঁড় করাইয়া ভিতরে গেল। কিছুকাল পরে বাহিরে আসিয়া বলিল, 'এখানে নয়, ও বাড়ি (লেখকের বাড়ি) চল।' ও বাড়িতে কিছুকাল থাকিয়া আমায় বলিল—'বিকালে'। তাই আমি আসিয়াছি, টাকাটা এখন পাইব কি?' এত ছোটছেলেকে ওরকম করিয়া ধারে সন্দেশ কেন খাওইলে জিজ্ঞাসা করাতে ময়রা তাহার কোনো ভালো উত্তর দিতে পারিল না। অপ্রতিভ হইয়া সম্প্রতি সরিয়া পড়িল—।

আমার ভাগ্নের সম্বন্ধে প্রকৃত কথা এখন একটু একটু বুঝিতে পারা গেল। তাহার জ্যাঠামহাশয়ের বাড়িতে তৎক্ষণাৎ পুনরায় লোক পাঠানো হইল। সেখানে গিয়া দেখা গেল যে, সে ঠোঙ্গায় করিয়া জলখাবার খাইতেছে। দূর হইতে কে আসিতেছে দেখিয়াই ঠোঙ্গাটি রাখিয়া বসিয়া রহিল। অনেক প্রশ্নের পর তাহার ইতিহাস বলিল আর বলিল যে, 'তোমরাই কি শুধু পরিশ্রম করিয়াছ? আমিও ঢের ঘুরিয়াছি।'

আমাদের ওখান হইতে বাহির হইয়া সে কালীঘাট গিয়াছিল। তাহার সঙ্গে একটিও পয়সা ছিল না, সুতরাং এই রাস্তাটুকু হাঁটিয়াই যাইতে হইয়াছিল। ময়রার ভীষণ মূর্তি তাহার প্রাণে জাগিতেছিল। তারপর ময়রা যদি মাতুল-মহাশয়কে বলে, তবে নিতান্তই লজ্জার বিষয় হইবে এবং শাস্তিরও বিশেষ সম্ভাবনা বোধ করিল। কাজেই তাহার কাছে আসিতে কিছুতেই ভরসা হইতে-ছিল না। কালীঘাটে পরিচিত স্থান নাই, সুতরাং শীঘ্রই সেখান হইতে ফিরিতে হইল। এরপর হাইকোর্টের দিকে চলিল। গড়ের মাঠের মাঝামাঝি আসিয়া বড়ই ক্লান্তি বোধ করিতে লাগিল ; সুতরাং কাছে বটগাছতলায় একটা বেঞ্চ দেখিতে পাইয়া সেখানে কয়েক ঘণ্টা নিদ্রা গেল। তারপর হাই-কোর্ট, হাওড়া স্টেশন ইত্যাদি পরিদর্শন করিয়া পাঁচটার সময় তাহার জ্যাঠামহা-শয়ের বাড়িতে উপস্থিত। সেখানে আসিয়াই ঢক্ ঢক্ করিয়া জল পূর্ণ একটি গ্লাসকে খালি করিল। সে বাড়ির লোকেরা তাহার চোখ মুখের অবস্থা দেখিয়া বড়ই ব্যস্ত হইলেন ; কিন্তু তাহাকে কিছু খাইতে দিয়া প্রকৃতিস্থ না করিয়া কোনো প্রশ্ন করিতে সাহস করিলেন না। কিছুকাল বিশ্রামের পর শেষে সে উপরিলিখিত বিবরণটি বলিল। সন্ধ্যার সময় তাহার জ্যাঠামহাশয় একজন লোক সঙ্গে দিয়া বাড়ি পাঠাইয়া দিলেন। অর্ধেক পথ আসিয়া হঠাৎ সে ছুট্ দিল। সঙ্গের লোকটি কিছুতেই তাহাকে ধরিতে পারিল না। মাইল খানেক তাহার পশ্চাতে দৌড়িয়া শেষটা তাহাকে বলিল যে, 'তোমার বাড়ি যাইবার দরকার নাই, আমাদের বাড়িতে আইস।' সে আশ্বস্ত হইল, এবং তাহার জ্যাঠা-মহাশয়ের বাড়িতে ফিরিয়া আসিল।

সে বাড়ি ফিরিয়া আসিতে কিছুতেই রাজি হইল না।

সখা—মে ১৮৮৯

জ্যেঠতাত

একশ্রেণীর লোক আছে, তাহাদিগকে দেখিলেই চোখ বুজিতে ইচ্ছা করে ; তাহারা যদি কথা কয় তবে কানে হাত দিতে ইচ্ছা হয়। অনেক ঘরের কোণে অতিশয় কদাকার একপ্রকার ব্যাঙ বাস করে ; তাহারা যখন মাঝে মাঝে কট্-কট্ শব্দ করিয়া উঠে তখন প্রাণ চমকিয়া যায় ; হঠাৎ যদি খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে চোখের সামনে আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে ছুটিয়া পলাইতে ইচ্ছা করে। জানোয়ারের মধ্যে এগুলি যেমন, মানুষের মধ্যে জ্যেষ্ঠতাত মহাশয়েরা ততোধিক। ইহাদের সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ হইলে আর জীবনে ইহাদিগকে ভুলিতে পারা যায় না।

এক নম্বরে, খবরওয়ালা জ্যেষ্ঠতাত। জগতে এমন ঘটনা নাই, যাহার কথা ইনি শুনিয়া রাখেন নাই। তুমি যদি তাহার কোনো সামান্য বিষয়ে অজ্ঞতা প্রদর্শন কর, তাহা হইলে ইনি অতিশয় আশ্চর্যান্বিত হইবেন। যদি কোনো কথা তুমি অন্যরূপ জান বলিয়া প্রকাশ কর, তবে তোমার আর রক্ষাই নাই, তোমাকে এমন একটা সার্টিফিকেট দিয়া বসিবেন যে, তেমন সার্টিফিকেট সচরাচর কেহ কাহাকেও দেয় না। কিন্তু হয়তো এর পরেই তোমার নিকট হইতে উঠিয়া যাইবেন।

দুয়ের নম্বরে, পণ্ডিত জ্যেষ্ঠতাত। ইনি 'খবরওয়ালা' মহাশয়েরই বড় ভাই। ইহার স্বভাবও অনেকটা তাঁহারই মতন। ইনি যে শ্রেণীতে পাঠ করেন, তাহার তিন-চারি ক্লাশ উপরের পাঠ্যপুস্তক লইয়া নাড়াচাড়া করেন। যে-সকল পুস্তক কোনোদিন চক্ষে দেখেন নাই, তাহাতে কি লেখা আছে, সেই কথাটা বিশেষ করিয়া তোমাকে বার বার বলিলেন। ইস্কুলে গিয়া মাস্টারমহাশয়কে যে-সকল পুস্তকের কথা বলিতে হইবে, তাহার খবর খুব কমই রাখেন। এই শ্রেণীর অনেক জ্যেষ্ঠতাত দেখিয়াছ। এরা প্রায়ই একটু নীচ-প্রকৃতির হইয়া থাকে। ছাত্রসভায় বক্তৃতা করিতে হইলে বই মুখস্থ করিয়া আইসে। এই শ্রেণীর একজন আমাকে একবার চিঠি লিখিয়াছিল ; সেই চিঠিখানি মেকলে সাহেবের একখানা পত্রের অবিকল নকল।

তিনের নম্বরে, মুরব্বি জ্যেষ্ঠতাত। তোমার কোন বিষয়ে কি ত্রুটি আছে, তাহা বাহির করিয়া তোমাকে তিরস্কার করা ইঁহার ব্যবসায়। কোনো-একটা কাজ যদি না করিয়া থাক, তবে তোমার বড়ই অন্যায় হইয়াছে ; আর যদি করিয়া থাক, তাহা হইলে কাজটা ভালো হয় নাই। ইনি যদি তোমার সমপাঠী হন, তবে তোমাকে এমন সকল আঁক কষিতে দিবেন, যাহা তাঁহার বিদ্যায় কিছুতেই কুলায় না। তাহাতে যদি তোমার একটু দেরি হয় তবে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে, তিনি খুব অল্প সময়েই এরূপ আঁক সব কষিয়া ফেলেন। যদি খুব শীঘ্রই আঁকটা কষিয়া ফেলিতে পার, তবে বলিলেন, 'বড় ঘুরিয়াছ।' যদি একটা কোনো সহজ উপায় দেখাইয়া দিতে বল, তবে হয়তো বলিবেন যে, তাঁহার অনেক কাজ আছে, সময় কম। এই বলিয়া প্রস্থান করিবেন।

এই শ্রেণীর একটা লোক এমনভাবে কথাবার্তা বলিত যেন তাহার মতন ভালো জিনিস কিনিতে কেহ জানে না। অন্য কেহ একটা কোনো জিনিস কিনিয়া আনিলেই বলিত, 'তোমাকে ঠকাইয়াছে। আমি এর চাইতে কম দামে আনিতে পারিতাম। অনর্থক পয়সাগুলি জলে ফেলিয়াছ।' নিজের বিদ্যাবুদ্ধি অতি কমই ছিল। কিন্তু সেই বাড়িতে যে-সকল কলেজ-ক্লাশের ছেলে থাকিত তাহাদের পড়াশুনা কেমন চলিতেছে তাহার খবরটা রীতিমতো রাখা হইত। মাঝে মাঝে তাহাদের বই খুলিয়া দুই-একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইত। এই ব্যক্তি একদিন চিৎপুর রোড দিয়া যাইবার সময় দেখিল যে দুইজন লোক রাস্তায় দাঁড়াইয়া তর্ক করিতেছে। কাছে গিয়া জানিতে পারিল যে একজন কতকগুলি সোনার ফুল কুড়াইয়া পাইয়াছে, আর একজন তাহাকে সেগুলি লইয়া যাইতে দিতেছে না। জ্যেষ্ঠতাতকে দেখিয়া তাহারা উভয়েই মধ্যস্থ মানিল। বিচারের মীমাংসা এই হইল যে, ফুলগুলিকে তিনভাগ করিয়া তিন-জনে পাইবে, এবং যে ব্যক্তি প্রথমে কুড়াইয়া পাইয়াছিল তাহাকে অপর দুইজনে সামান্য মূল্য দিবে। জ্যেষ্ঠতাতের সঙ্গে তিনটি টাকা ছিল ; তাহা দিয়া সে কুড়িটি ফুল কিনিল। বাড়ি আসিয়া সে সেদিন আর আস্তে কথা কহিতে পারে না। অধিক বুদ্ধি থাকিলে ব্যাপারটা কিরূপ হয় সকলকে ডাকিয়া তাহাই বুঝাইয়া দিতে লাগিল। একজন একটি ফুল হাতে লইয়া দেখিল যে ফুলটি পিতলের, তাহার উপর সামান্য গিল্টি। এই কথা যখন জানা গেল, তখন হাসির ধুম পড়িল। এর পরে অনেকদিন পর্যন্ত জ্যেষ্ঠতাত কোনো উৎপাত করে নাই।

চতুর্থ নম্বরে—বড়লোক জ্যেষ্ঠতাত। যাহারা সমকক্ষ, তাহাদের সহিত ইহারা কথা কহিবে না। যাহারা নিজের অনেক উপরে তাহাদের সঙ্গে মিশিতে চাহিবে এবং তাহাদের পদলেহন করিবে। ক্লাশে মাস্টারমহাশয়ের সঙ্গে ইয়ারকি দিবে, লোকের নিকট টাকা ধার করিয়া বাবুগিরি করিবে। টাকা চাহিলে বিরক্ত হইবে। নিজের যেমন অবস্থা তেমনি অবস্থার লোকদিগকে ঘৃণা করিবে, কোনো ভালো কাজের জন্য কিছু দিতে বলিলে খাতায় স্বাক্ষর করিবে না—যদি করে, তবে নিশ্চয়ই তাহা দিবে না। ঘৃণায় যাহাদের সহিত কোনোদিন মিশে না, মাঝে মাঝে হঠাৎ এক-একবার তাহাদের নিকট অত্যধিক আত্মীয়তা দেখাইতে আসিবে। তাহাদের সামান্য কোনো জিনিস থাকিলে তাহার প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করিয়া বেশি দাম দিয়া একটা ভালো জিনিস কিনিতে বলিবে। সেই উপলক্ষে নিজের কেমন সব উচ্চদরের জিনিস না হইলে ব্যবহার হয় না, বড়-বড় বই না হইলে পড়া হয় না, তাহা তাহাকে বুঝাইয়া দিবে। এরপর নিজের একটা খুব বড় কাজ করিতে হইবে, আর অধিক সময় নাই, এই বলিয়া বিদায় লইবে। যাইবার সময় হয়তো বলিবে, 'ভাই কিছু টাকা দিতে পার? কাল দিব।' নাহয় এমন একটা কোনো কাজের ভার দিবে, যে তাহা হয় তাহার বিদ্যাবুদ্ধির অতীত, নাহয় তাহা নিজে করিতে সে লজ্জিত হয়, পাছে লোকে তাহাকে ছোট-লোক মনে করে।

এরপর সমালোচক জ্যেষ্ঠতাতের কথা বলিয়া শেষ করিব। এমন বিষয় নাই

যাহা লইয়া এ ব্যক্তি নাড়াচাড়া না করিবে। এমন লোক নাই, নিজের চাইতে সে যত বড় লোকই হউক-না কেন, যাহার সম্বন্ধে সে দু-চার কথা না বলিবে—নিজের যাহা নয়, বা নিজে যাহা করে নাই, সাধ্য সত্ত্বেও তাহার প্রশংসা করিবে না। যদি দায়ে পড়িয়া নেহাত দুই কথা বলিতে হয়, তবে এমন একটা খট্‌কা রাখিয়া দিবে যে তাহাতেই তাহার নিজের কাজ সিদ্ধ হয়। এমন কিছু প্রশংসার কাজ হইতে পারে না যাহা সে মনে করে যে সে করিতে পারে না ; এতদিন তাহা করিয়া ফেলে নাই তাহা তাহার অনুগ্রহ। অন্যের যাহা দেখিয়া নিন্দা বে, সে জিনিসটা নিজের হইলে আবার তাহারই প্রশংসা করিবে।

সখা -মে ১৮৮৯

পুরাতন কথাঃ ১

পরিষ্কার আকাশ হইলে ক্রমাগত চাহিয়া দেখিতে ইচ্ছা করে। চিলগুলি ঘুরিতে ঘুরিতে ঐ কত উঁচুতে উঠিতেছে। দু-একটা শকুন আবার এর চাইতেও কত উপরে উঠিয়া গিয়াছে। নীল আকাশে তাহাদিগকে এক-একটি কালো বিন্দুর মতো দেখায়। কতদিন দেখিয়াছি, আকাশের একস্থানে কোথা হইতে একটি অতি হালকা সাদা মেঘ আসিয়াছে। কোথা হইতে আসিল কিছুই বলিতে পারিতেছি না। মুহূর্তেক আগে সেটি সেখানে ছিল না ; অন্য কোনোদিক দিয়া কখনই আসে নাই—তাহা হইলে দেখিতে পাইতাম।

মেঘটি কোথা হইতে আসিল? আবার ঐ দেখ সে কোথায় চলিয়া গিয়াছে। ঠাকুরমা বলিয়াছিলেন, 'পাহাড়ে গাছের কচি পাতা খাইবার জন্য অভ্রেরা দল বাঁধিয়া শূন্য পথে চলিয়া যায়, আমরা তাহাদিগকে মেঘ বলি ; কিন্তু পাহাড়ের লোকেরা বল্লম হাতে লইয়া প্রচ্ছন্নভাবে তাহাদের অপেক্ষা করিতেছে। এরা যেই পাহাড়ে পৌঁছাইবে, অমনি ইহাদিগকে বধ করিয়া বাজারে বিক্রি করিতে আনিবে।' কিন্তু ঠাকুরমার কথা তো দেখিতেছি এখানে খাটিতেছে না।

মেঘেরা তবে কে? মেঘেরা অতি সূক্ষ্ম জলকণার সমষ্টি। গরম বাতাসের ভিতরে জলীয়বাষ্প মিশ্রিত থাকে ; তখন আমরা তাহাকে দেখিতে পাই না। বরং শুষ্ক বায়ুর ভিতর দিয়া দূরের জিনিস যেমন দেখিতে পাইতাম, জলীয়-বাষ্প মিশ্রিত থাকার দরুন তার চাইতে পরিষ্কার দেখি। ঠাণ্ডা লাগিলে সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম জলের কণাসকল বায়ু হইতে পৃথক হইয়া পড়ে ; তখন তাহাদিগকে আমরা মেঘ বলি। ইহারা যখন আরো ঘন হইয়া মাটিতে পড়িবে, তখন বৃষ্টি হইবে। নদী পুকুর ইত্যাদিতে জল দাঁড়াইবে। ঠাণ্ডা দেশে আবার কত জায়গায় এই জল জমিয়া বরফ হইবে।

মেঘের বেলায় যাহা হইয়াছে, পৃথিবীর বেলাও বিস্তৃত আকারে কতকটা তেমনি হইয়া গিয়াছে। অর্থাৎ আমাদের পৃথিবী এককালে বাষ্পের আকারে ছিল, ক্রমে শীতল হইয়া তরল হয়, শেষটা তাহার বর্তমান কঠিনত্ব প্রাপ্ত

হইয়াছে। এখনো পৃথিবীর সমস্তটা কঠিন হয় নাই। আগ্নেয়গিরি হইতে মাঝে মাঝে অতিশয় গরম গলানো জিনিস সব বাহির হয়, এ কথা তোমরা জান। ঐগুলি পৃথিবীর ভিতরকার জিনিস। ঘি জ্বাল দিয়া রাখিলে যেমন প্রথমে তাহার উপরে খানিকটা জমে, কিন্তু ভিতরটা তরল অবস্থায়ই থাকে, পৃথিবীরও এখন সেই অবস্থা। আর কয়েক শত কোটি বৎসর পরে পৃথিবী এত ঠাণ্ডা হইবে যে, তাহার ভিতর অবধি জমিয়া যাইবে। তখন শীত এত বাড়িবে যে, পৃথিবী আর জীবজন্তুর বাসের উপযোগী থাকিবে না। চন্দ্র বেচারির এখন এই দশা হইয়াছে। তাহার ভিতরকার আগুন অনেককাল নিবিয়াছে। অনেককাল হইল তাহার মৃত্যু হইয়াছে—আমরা তাহার কঙ্কালমাত্র দেখিতেছি। কি ভাগ্য, ভাই, অমর হই নাই। তাহা হইলে সেই ভয়ানক শীতের সময় কি কষ্টই হইত। তুলার গাছ মরিয়া যাইত, সুতরাং কাপড় পরিতে পাইতাম না। ভেড়াগুলি মরিয়া গেলে শীত নিবারণের উপায় থাকিত না। খাবার জিনিস যাহারা জোগায়, তাহাদের মৃত্যু হইলে ক্ষুধায় চিরকালটা ক্লেশ পাইতাম।

সূর্যের ঘূর্ণনের চোটে[১] মাঝে মাঝে তাহার এক-এক টুকরা তাহার ভিতর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়াছিল। ঐ-সকল টুকরা শূন্যে ঘুরিতে ঘুরিতে গোল আকার ধারণ করিল। প্রথমে ইহারা সূর্যের ন্যায় গরম ছিল। এক কড়া গরম দুধ হইতে এক চামচে দুধ তুলিয়া লইলে যেমন চামচের দুধ শীঘ্র ঠাণ্ডা হয় কিন্তু কড়ার রাশিকৃত দুধ তত শীঘ্র শীতল হইতে পায় না। সেইরূপ এই-সকল টুকরা শীঘ্র শীঘ্রই ঠাণ্ডা হইয়া প্রথমে তরল তৎপরে কঠিন হইয়াছে, কিন্তু সূর্য আজিও অতিশয় গরম বাষ্পের আকারে রহিয়াছে। এইরূপ একটি টুকরার সঙ্গে আজকাল আমাদের বড়ই ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে, এবং আমরা 'পৃথিবী' বলিয়া তাহার নামকরণ করিয়াছি।

পৃথিবীর উপরিভাগ কঠিন হইয়াও অনেককাল খুব গরম ছিল। পৃথিবীর জলভাগ তখন বাষ্পের আকারে ছিল। ক্রমে পৃথিবী যখন আরো ঠাণ্ডা হইল, তখন তাহার পূর্বে জল জমিতে আরম্ভ হইল। এইরূপে সমুদ্রগুলির জন্ম হইল।

বস্তুসকল যতই ঠাণ্ডা হইতে থাকে, ততই তাহাদের আয়তন কমিতে থাকে। কঠিন পদার্থের চাইতে তরল পদার্থের আয়তন খুব শীঘ্র শীঘ্র কমে। পৃথিবীর ভিতরকার তরল জিনিস শীঘ্র শীঘ্র কমিয়া যত ছোট হইতেছে, বাহিরের কঠিন আবরণ দেরিতে কমার দরুন, তত ছোট হইতে পারিতেছে না ; সুতরাং সে কোঁকড়াইয়া যাইতেছে। এইরূপে পৃথিবীর উপরিভাগ ক্রমশ অধিক উঁচু-নিচু হইতেছে। এই ব্যাপার আমাদের চক্ষের সামনে অবিরত ঘটিতেছে। এককালে পৃথিবীর কোনো স্থান সমুদ্রের নীচে ছিল, তাহা জাগিয়া উঠিতেছে ; কোনো স্থান-বা আগে উঁচু ছিল, এখন ক্রমে নিচু হইতেছে। কোনো স্থান-বা প্রথমে

[১] সূর্য তেইশ দিনে একবার ঘুরে

একবার উঁচু থাকিয়া, মাঝে নিচু হইয়া, শেষে আবার উঁচু হইতে আরম্ভ করিয়াছে। সুন্দরবনে কোনো সময়ে সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল, এখন জলে ডুবিয়া যাইতেছে। হিমালয় পর্বতের অনেক স্থানে সামুদ্রিক জীবের চিহ্নসকল পাওয়া গিয়াছে ; সুতরাং হিমালয় পর্বতের ঐ-সকল স্থান এক সময়ে সমুদ্রের নীচে ছিল। ইটালিতে একস্থানে একটি মন্দির নির্মাণ করা হইয়াছিল। সেই স্থান ক্রমশ নিচু হইয়া মন্দিরের স্তম্ভগুলির কিয়দংশ পর্যন্ত ডুবিয়া যায়। আবার সেই স্থান উঁচু হইতে আরম্ভ করিয়াছে। নরওয়ের অনেক স্থান নিচু হইতেছে। সুইডেনের অনেক স্থান উঁচু হইতেছে। বল্টিক সমুদ্রের তলা ক্রমশ উঁচু হইয়া তাহার গভীরতা কমিয়া যাইতেছে। এইরূপে সাগর শুকাইয়া দেশ হইতেছে এবং দেশ ডুবিয়া সাগর হইতেছে। ভূমিকম্প ইত্যাদি কারণে অনেক সময় খুব শীঘ্র শীঘ্র ভূপৃষ্ঠে গুরুতর পরিবর্তন সকল ঘটে। দক্ষিণ আমেরিকায় একবার ভূমিকম্প হইয়া এক দেশের কিয়দংশ একেবারে ডুবিয়া গিয়াছিল।

সখা—আগস্ট ১৮৯০

পুরাতন কথা: ২

বৃষ্টি হইলে নিচু জায়গায় জল দাঁড়ায়। বুদ্ধিমান গৃহস্থেরা উঠান উঁচু রাখেন, আর ছোট-ছোট নালা কাটিয়া জল সরিবার বন্দোবস্ত করেন। বৃষ্টির সময় ঐ-সকল নালা ছোট-ছোট নদীর আকার ধারণ করে ; ছেলেবেলায় তাহাতে মোচার খোলার নৌকা ভাসাইয়া আমোদ দেখিয়াছি। উঠানের যা কিছু ধুলা মাটি, খড় কুটা সকলেরই নমুনা বৃষ্টির জলের সঙ্গে ঐ-সকল নালা দিয়া ভাসিয়া চলিয়াছে। নালার জল ভারি ঘোলা হইয়াছে। ঐ জল হয়তো একটা বড় গর্তে যাইয়া পড়িতেছে। গর্তের কাছে গেলে দেখিবে, সেখানে অনেক জল দাঁড়াইয়াছে। বৃষ্টি হইয়া গেলে ঐ জল থিতাইয়া ক্রমে পরিষ্কার হইবে ; ক্রমাগত কয়েকদিন বৃষ্টি না হইলে শুষিয়া যাইবে। এখন যদি একবার ঐ গর্তের তলাটা পরীক্ষা করিয়া দেখ, তবে দেখিবে যে তলায় অতি মিহি মোলায়েম কাদা জমিয়াছে। ঐ কাদা উঠান হইতে আসিয়াছে। উঠান হইতে ভারী জিনিস যাহা কিছু আসিয়াছিল, তাহা ঐ কাদায় ঢাকা পড়িয়াছে।

বর্ষাকালে নদীর জল বাড়ে। চৈত্র বৈশাখ মাসে ছোট নদীটি ঝির্ ঝির্ করিয়া কোনোমতে দিনপাত করে। তাহার পরিষ্কার টল্‌টলে জলটুকু দিন দিন শুকাইয়া যায়, দেখিলে দুঃখ হয়। বর্ষাকাল আসুক, দেখিবে তাহার আর সে অবস্থা নাই। তখন এ স্বচ্ছ জল থাকিবে না, দুরন্ত রাখাল বালকেরাও তখন আর চৌপর দিন ধরিয়া স্নান করিতে থাকিবে না। তখনকার সেই দেশ-ভাসানে ঘোলা জল আর তার বেগ দেখিলেই মনে একটা কুমির-কুমির ভাব

আসে। এভাবেও কিছু আর চিরদিন যাইবে না। বর্ষা চলিয়া গেলে আবার নদীর পরিসর কমিতে থাকিবে। ঘোলা জল থিতাইয়া ক্রমে পরিষ্কার হইবে। নদীর দুই ধারে যে-সকল জায়গা ডুবিয়া গিয়াছিল, তাহারা আবার একটু-একটু করিয়া জাগিবে। এখন দেখিবে তাহাদের উপরেও অতি মিহি মোলায়েম কাদা জমিয়াছে। সাধারণ কথায় বলিবে, 'পলি পড়িয়াছে।'

উঠানের নালার জল যেমন গর্তে পড়িয়াছিল, নদীর জলও তেমনি হয়তো সমুদ্রে পড়িতেছে। নদীর জলে কত জিনিস—কত গাছপালা, কত জন্তুর মৃত শরীর ভাসিয়া যায় ; তাহাদেরও অনেকে সমুদ্রে যাইয়া পড়িতেছে। সেখানে কয়েকদিন ভাসিয়া তারপর তলাইয়া যাইতেছে। এইরূপে নদী যে-সব জায়গার ভিতর দিয়া আসিয়াছে, তাহাদের কিছু কিছু নমুনা সমুদ্রের তলায় আসিয়া পড়িতেছে। প্রত্যেক বর্ষার ঘোলা জল হইতে পলি পড়িয়া আবার ইহাদিগকে ঢাকিতেছে। এইরূপে এক-এক বৎসরের এক-এক স্তর পলি আর সেই-সকল স্তরের মাঝে নানানরকমের জিনিসের নমুনা জমিতেছে।

জোয়ার-ভাঁটা অনেকেই দেখিয়াছ ; না দেখিয়া থাকিলেও তাহার বিষয় পড়িয়াছ। সমুদ্রের জল দিনে দুইবার করিয়া বাড়ে কমে, তাহাকেই আমরা জোয়ার-ভাঁটা বলি। সমুদ্রের সহিত যে-সকল নদীর সংযোগ আছে সেই-সকল নদীতেও জোয়ার-ভাঁটা হয়। সমুদ্রের দিকে নদীর জল গড়াইয়া চলে, কিন্তু জোয়ারের সময় সমুদ্রের জল উঁচু হওয়ার দরুন সমুদ্রের জল নদীর ভিতরে আসে। নদীতে তখন জল বাড়িতে থাকে, এবং দুধারের জমি অনেক দূর অবধি ডুবিয়া যায়। আবার ভাঁটার সময় জল সরিয়া আইসে। জোয়ারের ডোবা জায়গাগুলি আবার ভাসিতে থাকে। তখন দেখা যায়, তাহাদের উপরেও পলি পড়িয়াছে। নদীর জল যত অধিক ঘোলা হয়, এই পলি ততই পুরু হইয়া পড়ে ; আর জোয়ার যত বেশি হয় নদীর দুপাশের জমি ততই দূর অবধি ডুবিয়া যায়।

অমাবস্যা পূর্ণিমায় যত জোয়ার হয়, অষ্টমীর দিন তাহার চাইতে অনেক কম হয়। অমাবস্যার দিন অনেক দূর অবধি ডুবিয়া পলি পড়িয়াছে। আবার পূর্ণিমা না আসিলে এত দূর জল আসিবে না। এর মধ্যে যদি বৃষ্টি না হয়, তবে এই পলি শুকাইয়া খুব শক্ত হইয়া যাইবে। যখন এই পলি কোমল ছিল, তখন ইহার উপর দিয়া কত পশুপক্ষী চলিয়াছে, কত গাছের পাতা বাতাসে উড়িয়া আসিয়া ইহার উপরে পড়িয়াছে ; মিহি কাদায় সেই-সকল পশুপক্ষীর পা এবং সেই-সকল পাতার অতি চমৎকার ছাঁচ রহিয়াছে। এর মধ্যে যদি দু-এক ফোঁটা বৃষ্টি হইয়া থাকে, তবে প্রত্যেকটি ফোঁটার দাগ রহিয়াছে। একবার শুকাইতে পারিলেই এই-সকল দাগ ও ছাঁচ চিরস্থায়ী হইয়া রহিল। পূর্ণিমার সময় ইহার উপর আবার এক স্তর পলি পড়িবে, কিন্তু সে পলিতে এই-সকল দাগের কোনো অনিষ্ট হইবে না। প্রতিদিন সকালে অনেক ঘরের মেজেতে মাটির লেপ দেওয়া হয়। এই-সকল লেপের স্তর একটির সঙ্গে আর একটি মিশিয়া যায় না। পুস্তকের পাতার মতো তাহারা পৃথক পৃথক থাকে। পলি

পড়ার সম্বন্ধেও ঠিক তেমনি। এক স্তর পলি যদি শুকাইতে পাইল, তবে আর এক স্তর পলি তাহার উপরে পড়িলেও দুটি স্তর পৃথক পৃথক থাকিবে।

সখা—আগস্ট ১৮৯০

পুরাতন কথাঃ ৩

এতক্ষণ যাহা বলা গিয়াছে, তাহা হইতে কি শিখিলাম, দেখা যাউক—

১ পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশে ক্রমাগত পরিবর্তন হইতেছে। দেশ ডুবিয়া সাগর হইতেছে, সাগর ডুবিয়া দেশ হইতেছে।

২ জল থিতাইয়া পলি পড়ার দরুন নানারূপ গাছপালা জীবজন্তু ইত্যাদির চিহ্ন থাকিয়া যাইতেছে।

এই দুইটি কথা বেশ করিয়া মনে রাখ। তারপর যাহা বলি শ্রবণ কর।

অনেক সময় জলে এমন জিনিস সব মিশ্রিত থাকে যে, তাহার সাহায্যে জলে ডোবা বস্তুগুলি পাথর হইয়া যায়। একবার এইরূপে পাথর হইতে পারিলে আর সে-সব জিনিসের ধ্বংস হয় না—যুগ-যুগান্তর ধরিয়া তাহাদের চিহ্ন বর্তমান থাকে। পাথর মানুষের অতিশয় প্রয়োজনীয় বস্তু, সুতরাং মানুষেরা তাহা সংগ্রহ করিতে যায়। এইরূপে পাথর আনিতে গিয়া তাহার ভিতরে অনেক সময় নানাপ্রকার জীবজন্তুর হাড় পাওয়া যায়। সেই-সকল হাড় দেখিয়া পণ্ডিতেরা স্থির করিতে পারেন, তাহা কিরূপ জন্তুর হাড় ছিল। লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্বে কোনো নদীর তলায় পলি পড়িয়াছিল, তখন একটা জন্তুর মৃতদেহ তাহাতে ঢাকা পড়িয়াছিল। জলে এমন কোনো পদার্থ ছিল, যাহার জন্য ঐ-সকল পলি এবং হাড় পাথর হইয়া গেল। কালক্রমে সে স্থানের মাটি উঁচু হইয়া সেখানে একটা পাহাড় হইল। আজকাল সেই পাহাড়ের কাছে মানুষ বলিয়া একরকম জন্তু চলাফেরা করে। তাহাদের ঘরদোর তয়ের করিবার জন্য পাথরের দরকার হয় ; সেই পাথর তাহারা ঐ পাহাড়ের গা হইতে কাটিয়া বাহির করিতে গিয়া ঐ হাড়গুলি পাইল। অনতিবিলম্বে পালিয়ণ্টলজিস্ট নামক একপ্রকারের পণ্ডিত মানুষ আসিয়া চশমা চোখে, নোটবই হাতে তাহাদের পরীক্ষা করিতে লাগিল। পরীক্ষায় স্থির হইল যে, এ হাড় যে জানোয়ারের, তাহার মতন জন্তু আর এখন পৃথিবীতে নাই।

কোটি বৎসর পূর্বে হয়তো কোনোস্থানে প্রকাণ্ড বন ছিল। একদিন তাহা ধ্বসিয়া গিয়া জলাতে পরিণত হইল। লক্ষ বৎসর ধরিয়া সেই জল হইতে ঐ বনের গাছপালার উপর পলি পড়িল, তাহারা ঢাকা পড়িল। কালে জলার চিহ্ন পর্যন্ত লোপ হইয়া সেস্থান সমান জমিতে পরিণত হইল। তাহার নীচে সেই যে বহুকালের পুরাতন বনের গাছপালাগুলি ঢাকা পড়িয়াছে, এতদিনে তাহাদের কি হইয়াছে জান? এতদিনে তাহাদের শরীরগঠনের উপকরণগুলি

রূপান্তরিত হইয়া পাথর-কয়লার আকার ধারণ করিয়াছে। এই-সকল পাথর-কয়লার মধ্যে স্থানে স্থানে এক-একটা আস্ত গাছের গোড়া, নানারকমের পাতা ইত্যাদি পাওয়া যায়। তাহার আকৃতি ঠিক বজায় রহিয়াছে, কিন্তু তাহারা পাথর-কয়লা হইয়া গিয়াছে। এই-সকল গাছপালার চিহ্ন দেখিয়াও পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে তাহাদের অনেকেই বর্তমান গাছপালা হইতে অনেকাংশে বিভিন্ন।

বড়-বড় জলার ধারে কত জানোয়ার জল খাইতে আসে। জলে যে-সব লতা-পাতা জন্মে তাহা খাইতেও ছোট-বড় কত জন্তু আসে। এই-সকল জলাতে প্রায়ই ভয়ানক কাদা হয়। আজকালও অনেকের গোরু-বাছুর এইরূপ কাদায় ডুবিয়া মারা যায়। প্রাচীন কালে এইরূপে ঘটনা ঘটিত, তাহা সহজেই বুঝা যায়। জলার ধারে আসিয়া একবার যদি গভীর কাদায় পা পড়িল, তবে আর রক্ষা নাই। যতক্ষণ জন্তুটি পানাহারে ব্যস্ত, ততক্ষণে পাগুলি অজ্ঞাতসারে অনেক দূর বসিয়া গিয়াছে। চলিয়া যাইবার সময় আর পা উঠে না। ভয়ে জন্তুটি যতই হুড়াহুড়ি করিতেছে, পাগুলি ততই অধিক বসিয়া যাইতেছে। অবশেষে শরীরটি অবধি ডুবিয়া সেই ভয়ানক কাদার ভিতরে চিরদিনের জন্য অদৃশ্য হইল। আমেরিকায় এরূপ অনেক জলা ছিল, তাহাদের অনেকগুলি আজও একেবারে শুকাইয়া যায় নাই। এই-সকল স্থান খুঁড়িয়া পণ্ডিতেরা অনেক অত্যাশ্চর্য জন্তুর অস্থি, কঙ্কাল, এমন-কি, অনেক সময় আস্ত শরীর অবধি পাইয়াছেন। আয়র্ল্যান্ড এবং স্কট্ল্যান্ডের স্থানে স্থানেও এমন হইয়াছে। সাইবিরিয়াতেও সময় সময় এরূপ ঘটনার চিহ্ন পাওয়া যায়।

পূর্বকালে কিরূপ জন্তুসকল ছিল, তাহা কিরূপে জানা যায়, এখন তাহা বুঝিতে পারিতেছ। অনেক সময় কেবলমাত্র পদচিহ্ন দেখিয়া জন্তুবিশেষের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। কোনো সময় অস্থিখণ্ডমাত্র দেখিয়া তাহার স্বভাব-চরিত্র নির্ণয় করিতে হইয়াছে। কোনোস্থানে আস্ত কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে : কোনোস্থানে সমস্ত শরীরটাও পাওয়া গিয়াছে। তখন তাহাদের পেট কাটিয়া পরীক্ষা করা গিয়াছে। একবার একজন পণ্ডিত এইরূপে প্রাপ্ত একটা জন্তুর হাড় হইতে সূপ প্রস্তুত করিয়া অন্যান্য পণ্ডিতদের উপহার দিয়াছিলেন। তাঁহারা খাইয়া কি বলিলেন, জানিতে পারি নাই।

পৃথিবীর সকল স্থানেই এইরূপ লুপ্ত জন্তুর চিহ্ন পাওয়া যায়। ভারত-বর্ষেও তাহা নিতান্ত বিরল নহে। ঐ-সকল জন্তু কতদিন হইল লোপ পাইয়াছে, তাহা অবশ্য সকল স্থলে বলা যায় না। কিন্তু কোনটি পুরাতন, কোনটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক, এ কথা অনেক স্থলেই বলা সম্ভব। আবার দুইশত বৎসর পূর্বে লোকেরা দেখিয়াছে, এখন তাহা নাই, এরূপ জন্তুও নিতান্ত কম নহে। পুরাতন প্রাণীবৃত্তান্তের পুস্তকে, এবং প্রাচীন নাবিকদিগের লিখিত প্রবন্ধাদিতে অনেক সময় অনেক জন্তুর বিবরণ এবং চিত্র পাওয়া যায়। আজকাল সে-সকল জন্তুর চিহ্ন পর্যন্ত লোপ পাইয়াছে।

সখা—অক্টোবর ১৮৯০

দেশ ভেদে আদবকায়দার কত প্রভেদ হয়! আবার একস্থানেই ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকের ভিতরে এ বিষয়ে কত মতভেদ দেখা যায়। গল্প আছে যে, একবার অতিশয় নিম্নশ্রেণীর একজন লোক লেখাপড়া শিখিয়া বড়লোক হইয়াছিল। তাহার বড়ই ইচ্ছা হইল যে স্বজাতীয় লোকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আপ্যায়িত করিবে। আয়োজন অনেক হইল ; সমাদরের সীমা নাই। ইহাতে কিন্তু হিতে বিপরীত হইল। তাহারা সহজবুদ্ধি লোক। তাহারা যখন দেখিল যে, যে-সকল কথা বলিয়া দশ জায়গায় নিমন্ত্রণের সময় তাহাদিগকে আদর করে, যে-সকল জিনিস চিরকাল ঐরূপ স্থলে তাহারা খাইয়া থাকে, এ জায়গায় তাহার কিছুই নাই ; তখন তাহাদের বড়ই বেখাপ্পা বোধ হইতে লাগিল। তাহারা বলিল, 'এরা আদবকায়দা কিছু জানে না, এখানে খাওয়া হবে না।' —এই বলিয়া সকলে যাইতে উদ্যত হইল। বাড়ির কর্তা ইহাতে বড়ই ব্যস্ত হইলেন, কি করিবেন কিছুই ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলেন না। এই সময়ে একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলিলেন, 'কোনো চিন্তা নাই, আমি সব করিয়া দিতেছি।' এই বলিয়া তিনি 'আপনি' 'মহাশয়' ইত্যাদি সম্ভ্রমার্থক শব্দ পরিত্যাগ করিয়া 'তুই' 'তোরা' ইত্যাদি শব্দে তাহাদিগকে সম্বোধন করিতে লাগিলেন। বসিতে আসন দেওয়া হইয়াছিল, সে-সব তুলিয়া ফেলিলেন। লুচির পরিবর্তে মোটা-ভাত, শুকনো মাছ আর লংকার চচ্চড়ি, আর কিঞ্চিৎ দধির জোগাড় করিলেন। নিমন্ত্রিতগণ অমনি মহানন্দে কোলাহল করিয়া খাইতে বসিয়া গেল।

পথে দেখা হইলে, ভক্তিভরে কাহারও পায়ের ধুলা নিই, কাহাকে একটি 'কুড়ুলে' নমস্কার করিয়াই যথেষ্ট মান্য হইয়াছে মনে করি ; আবার কোনো অল্পভাগ্য লোককে কেবলমাত্র দন্তপঙ্ক্তি দেখাইয়া বিদায় দিই।

ফ্রান্স দেশে ভদ্রলোকে ভদ্রলোকে দেখা হইলে, অনেক স্থলে পরস্পরকে চুম্বন করিবার রীতি আছে। একজন ফরাসী একবার তাঁহার এক ইংরাজ বন্ধুকে দেখিতে গেলেন। ফরাসী আসিয়াছেন শুনিয়াই ইংরাজ তাড়াতাড়ি স্নানের ঘরে গিয়া মুখময় সাবান মাখিয়া আসিলেন। ফরাসীকে অগত্যা বন্ধুর টাক পড়া তালুতে চুম্বন করিয়া ভদ্রতা রক্ষা করিতে হইল।

আফ্রিকা দেশে এক জাতীয় লোক আছে। তুমি যদি তাহাদের বাড়িতে যাও, আর যদি গৃহস্বামী তোমাকে যৎপরোনাস্তি সমাদর করিতে ইচ্ছা করেন, তবে চাকরকে দুই বাটি রঙ আনিতে বলিবেন, এক বাটিতে সাদা রঙ অপর বাটিতে কালো রঙ। রঙ আসিলেই তিনি তাহার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ লইয়া যত্নের সহিত মুখে মাখিতে থাকিবেন। তুমিও যদি তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ঐরূপ না কর, তবে তোমাকে ভারি অসভ্য, আদবকায়দা-বিহীন জংলী জানোয়ার মনে করিবেন।

একবার একজন বড় ইংরাজ কোনো অসভ্য জাতির সহিত সন্ধি করিতে গিয়াছিলেন। সেই জাতির দলপতির দরবারে সাহেবকে লইয়া যাওয়া হইল।

দলপতি পরম সমাদরে গাত্রোত্থান করিয়া সাহেবকে অভ্যর্থনা করিলেন। সাহেবও অবিকল সেইরূপ অঙ্গভঙ্গি করিয়া প্রতিনমস্কার জানাইলেন। নিকটস্থ হইলে দলপতি সস্নেহে সাহেবের হাতখানি টানিয়া লইলেন, এবং ধীরে ধীরে তাহার ঠিক মধ্যস্থলে অতি সুন্দর এক বিন্দু থুথু ফেলিলেন। সাহেবের অন্তরাত্মা শিহরিয়া উঠিল, কিন্তু পাছে অসভ্যতা হয়, তাই বাহ্যিক কিছু প্রকাশ করিলেন না। দলপতি নিবৃত্ত হইবামাত্রই সাহেব তাঁহার হাতখানি টানিয়া লইয়া নূতন শিক্ষিত প্রণালী অনুসারে যথাসাধ্য সদ্ভাব জ্ঞাপন করিলেন। সাহেবের এই ব্যবহারে উপস্থিত সকলেই যারপরনাই খুশি হইলেন এবং সন্ধি হইতে আর কোনো গোল হইল না।

সখা ফেব্রুয়ারি ১৮৯১

অন্ধদের বই পড়া

ডাক্তার মুনের নাম অনেকে শুনিয়াছেন। ১৮৩৫ সালে ইনি অন্ধ হন। সে আজ পঞ্চাশ বছরের কথা। এত কাল ইনি অন্ধদের জন্য খাটিয়াছেন : বিশেষত কিরূপ অক্ষরে পুস্তক ছাপা হইলে তাহাদের পক্ষে বেশি সুবিধা, তাহার সম্বন্ধে অনেক চিন্তা করিয়াছেন।

অন্ধেরা কিরূপে পড়িতে পারে, এ কথা কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পার। যাহাদের চোখ নাই, তাহারা যে আমাদের মতো চোখের সাহায্যে পড়িতে পায় না, এ কথা সহজেই বুঝা যায়। অন্ধেরা হাতের সাহায্যে পড়ে। প্রায়ই দেখা যায় যাহাদের একটা শক্তি নাই, আরেকটা শক্তি তাহাদের খুব প্রখর হয় আর তা হওয়াও স্বাভাবিক ; একটা শক্তি না থাকিলে অপর একটার দ্বারা তাহার কাজ চালাইতে হয়, কাজেই সেটার চালনা খুব বেশি হয়। চালনার দ্বারা শক্তি বাড়ে।

কোন জিনিসটা কিরূপ পরীক্ষা করিতে হইলে, তাহার উপর হাত বুলাইয়া দেখে। এইরূপ ক্রমাগত হাত বুলাইয়া তাহাদের স্পর্শ শক্তিটা আমাদের চাইতে অনেক প্রখর হয়। অন্ধকে মুখে হাত বুলাইয়া মানুষ চিনিতে স্বচক্ষে দেখিয়াছি। আমরা তাহা পারি না, কারণ আমাদের স্পর্শ শক্তির তেমন চালনা হয় নাই। অক্ষর যদি কালিতে লেখা না হইয়া খোদা হয়, তবে অন্ধ তাহাতে হাত বুলাইয়া, সহজেই তাহার চেহারাটা মনে করিয়া লইতে পারে। অক্ষরগুলি খোদা না হইয়া, উঁচু হইলে আরো সুবিধা হয়।

অন্ধদের পুস্তকের অক্ষর সব উঁচু-উঁচু। অন্ধরা তাহাতে হাত বুলাইয়া বেশ পড়িয়া যাইতে পারে। তবে আমরা যেমন ছোট-ছোট অক্ষর পড়িতে পারি, অন্ধেরা তাহা পারে না। তাহাদের খুব বড়-বড় অক্ষরের দরকার হয়। তোমাদের জন্য যেমন 'সখা ও সাথী' বাহির হইয়াছে, অন্ধদের জন্য ইহার ষোলো-সতেরো

খানার মতন এক-একখানা 'সখা ও সাথী' বাহির করিলে, তবে ইহার সকল কথা তাহাতে ধরিত।

অন্ধদের জন্য নানাপ্রকার লিখিবার প্রণালী বাহির হইয়াছে। মুন সাহেব সেগুলির দোষগুণ বিচার করিয়া, তার চাইতে অনেক সহজ উপায় স্থির করিয়াছেন। এই নূতন উপায়ে এখন বিস্তর ছাপা হইতেছে। তোমরা স্কুলে যতরকম বই পড়, তাহার সবই এখন অন্ধরা পড়িতে পারে—তোমাদের অঙ্ক, ব্যাকরণ, ইতিহাস, ভূগোল, ইত্যাদি সব। অন্ধেরা ম্যাপ দেখে, ছবি দেখে, স্বরলিপি দেখিয়া গান শিখে ; সব ঐরূপে উঁচু-উঁচু করিয়া লেখা। তোমরা চোখে দেখ, তাহারা হাত বুলাইয়া দেখে।

অন্ধদের জন্য যে ছবি প্রস্তুত করা হয়, তাহা তোমাদের ছবির মতো নহে। তাহাদের কোনোরকম রঙ নাই, একটি কালো লাইন পর্যন্তও নাই। যাহারা জন্মান্ধ তাহারা তো কখনো রঙ দেখে নাই, সুতরাং তাহা যে কেমনতর তাহা তাহারা মনেও করিতে পারে না। এ সম্বন্ধে মুন সাহেব যে গল্প বলিয়াছেন, তাহা বলিয়া আমরা এই প্রস্তাব শেষ করিব।

লিখিবার সময়ে আমরা যেমন লাইনের পর লাইন বাম দিক হইতে আরম্ভ করিয়া ডাইনে শেষ করি, অন্ধদের তাহাতে ভারি অসুবিধা হয়। ওরূপ লেখা পড়িতে তাহারা সহজেই পথ হারাইয়া ফেলে। অন্ধদের লাইন একটি আমাদের লাইনের মতন বাম হইতে ডাইনে, তার পরেরটি পারসীর মতন ডান হইতে বামে, তার পরটি আবার বাম দিক হইতে ডাইনে, এইরূপ করিয়া লেখা হয়। এরূপ হইলে, যেখানে একটি লাইন শেষ হইল, সেইখানেই আরেকটি লাইনের গোড়া পাওয়া গেল ; খুঁজিয়া বেড়াইবার আর দরকার হয় না। মুন সাহেবের সেই গল্প আমরা অন্ধদিগের কায়দায় লিখিতেছি। মুন সাহেব বলিতেছেন—

'অন্ধ হইবার পূর্বে আমার কুড়ি বৎসর বয়স হইয়াছিল, তাই কোন কিরকম চেহারা বাড়ির, দেখাইত কেমন সব জন্তু মানুষ ছিল কেমন রঙটা ছিল, সবই আমার বেশ মনে আছে ; কিন্তু আমি একটি মেয়েকে জানিতাম ,পা চারি ঘোড়ার যে করিত মনে সে ।ছিল অন্ধ অবধিই জন্মিয়া সে তাহার দুটিতে ভর করিয়া সে চলে। আর দুটিকে আমাদের হাতের মতন, করিবার প্রস্তুত ছবি জন্য অন্ধদিগের হইতেই ইহা ।রাখে তুলিয়া করিয়া কথা আমার মনে হয়। আমি আমাদের বই লেখার মতন করিয়া উঁচু মেয়েটি অন্ধ সেই ।করিলাম প্রস্তুত ছবি বাড়ির একটি দিয়া লাইন প্রথমে মনে করিল সেটা একটা জন্তু ; সে কিনা পৃথিবীর কোনো জিনিসই আর সঙ্গে তাহার কিন্তু ।করিয়াছিল মনে ওরূপ তাই নাই দেখে কখনো একজন ছিলেন, তিনি অল্পদিন যাবৎ অন্ধ হইয়াছেন। তিনি ছবি খানির একটা এযে মেয়ে বোকা ! লিজি ও উঠিলেন বলিয়া বুলাইয়াই হাত উপর বাড়ি, বেশ বড় বাড়ি।'

সখা ও সাথী—১৩০১

এদেশের অনেক নদীতে জোয়ার ভাঁটা দেখা যায়। চব্বিশ ঘণ্টার ভিতরে দুবার করিয়া সমুদ্রের জল বাড়ে আর কমে ; তাহাকেই জোয়ার আর ভাঁটা বলা হয়। যে-সকল নদীর সঙ্গে সমুদ্রের যোগ আছে, সমুদ্রের জোয়ারের জল তাহাতে প্রবেশ করিয়া তাহার ভিতরেও জোয়ার ভাঁটা জন্মায়। তখন নদীর স্রোত কমিয়া যায়, অথবা একেবারে ফিরিয়াই যায়। কোনো কোনো নদীতে 'বান' ডাকে।

'বান ডাকা' কাহাকে বলে জান? সমুদ্রের জল নদীতে প্রবেশ করিবার সময় কখনো কখনো নদীর জলের চাইতে অনেকখানি উঁচু হইয়া আসে ; ইহা-কেই বলে 'বান ডাকা'। বানের মুখে নৌকা পড়িলে ভারি মুস্কিল ; সুত-রাং ঐ সময়ে নৌকার মাঝিরা ভারি ব্যস্ত হয়। ঘাটে যে-সকল লোক স্নান করে, বান ডাকিবার সময় তাহারা তাড়াতাড়ি ডাঙায় উঠিয়া আসে। দৈবাৎ দু-একজন সময়ে উঠিয়া আসিতে না পারিলে, যারপরনাই হাবুডুবু খায়। বান বেশি উঁচু হইয়া আসিলে, অনেক সময় তাহাতে পড়িয়া লোক মারা যায়।

কলিকাতায় বান অনেক সময় পাঁচ-ছয় ফুট উঁচু হইয়া আসে। একবারে শুনা গিয়াছিল যে, আর আর বারের চাইতে অনেকখানি উঁচু হইয়া বান আসিবে। নদীর ধারের বাঁধগুলি নাকি এইজন্য উঁচু করা হইয়াছিল। নদীর ধারের বড়-বড় আফিস, কারখানা, ডক্‌ ইত্যাদি রক্ষা করিবার জন্যও নাকি দেয়াল গাঁথা হইয়াছিল। বানের তামাশা দেখিবার জন্য হাজার-হাজার লোক কাজ কর্ম ফেলিয়া গঙ্গার ধারে গিয়া অপেক্ষা করিতেছিল ; অনেক ফটোগ্রাফার ক্যামেরা খাটাইয়া প্রস্তুত হইয়াছিল। কিন্তু বান আসিল না!

অমাবস্যা পূর্ণিমায় জোয়ার ভাঁটা খুব বেশি হয় ; সাধারণত সেই সময়েই বান ডাকে। সকল অমাবস্যা পূর্ণিমাতেই যে বান ডাকে তাহা নহে ; আবার নদীতে জোয়ার ভাঁটা থাকিলেই যে, সে নদীতে বান ডাকিবে তাহাও নহে।

জোয়ারটি যেমন প্রবল, নদীর স্রোতও তেমনি প্রবল হওয়া চাই। নদীর মুখ যদি বেশ চওড়া থাকে, তবে সমুদ্রের জল তাহাতে অনেক পরিমাণে ঢুকিতে পায়। নদীর মুখে চড়া না থাকিলে, এই জল ক্রমে নদীর জলের সঙ্গে মিশিয়া যায়। কিন্তু নদীর মুখে চড়া থাকিলে সে জল সেখানে সঞ্চয় হইয়া বললাভ করে।

এই তিন বস্তু—নদীর স্রোত প্রবল থাকা, তাহার মুখ চওড়া থাকার দরুন সমুদ্রের জোয়ারের জল বেশি পরিমাণে প্রবেশ করা, আর চড়ায় বাধা পাইয়া সেই জল রাশিকৃত হওয়া—এক জায়গায় হইলেই জোয়ারের সময় নদী আর সমুদ্রের মধ্যে একটা তুমুল যুদ্ধের জোগাড় পাকিয়া আসে। তখন সমুদ্রের সেই রাশিকৃত জল চড়া ডিঙাইয়া নদীর ভিতরে প্রবেশ করে। নদীর পরি-সর ক্রমে যতই কমিয়া আসে, ততই এই জল ছাড়াইবার স্থান না পাইয়া উঁচু হইয়া উঠে, আর তাহার বেগও ক্রমে ততই বাড়িতে থাকে। রেলের মতন

বেগে সেই জল সোঁ সোঁ শব্দে অগ্রসর হয়; তাহার সামনে যে পড়ে, তাহার আর রক্ষা নাই।

চীন দেশে সিন্‌-তাং-কিয়াং নামক একটি নদী আছে। তাহাতে বড় ভয়ানক বান ডাকে। বান আসিবার এক ঘণ্টা পূর্বে তাহার গর্জন শুনা যায়। নদীর জল হইতে বান বারো ফুট উঁচু হইয়া আসে! ঘণ্টায় চৌদ্দ মাইল তাহার বেগ হয়।

চীন দেশের লোকেরা বানকে বড় ভয় করে। সিন্‌-তাং-কিয়াং নদীর বানের সম্বন্ধে তাহাদের দেশে একটি গল্প আছে। তাহারা বলে যে, প্রাচীন কালে তাহাদের দেশে একজন সেনাপতি ছিলেন, তাঁহার মতন যোদ্ধা কেহ ছিল না। তিনি এত যুদ্ধ জয় করিয়াছিলেন যে, তাহা দেখিয়া শেষটা স্বয়ং সম্রাটের মনে হিংসা হইল। এইজন্য সম্রাট তাঁহাকে গোপনে হত্যা করিয়া, শরীরটা সিন্‌-তাং-কিয়াং নদীতে ফেলিয়া দিলেন। সেই সেনাপতির প্রেতাত্মা আজও সে কথা ভুলিতে পারে নাই: তাই সে রাগের ভরে এক-এক-বার সমুদ্রের জল আনিয়া দেশ ডুবাইয়া দিতে চেষ্টা করে।

সিন্‌-তাং-কিয়াং নদীর বান হয়তো পৃথিবীর মধ্যে সকলের চাইতে উঁচু হয়। কিন্তু 'আমেজন' নদীর বানের পরিসর পৃথিবীর মধ্যে সকলের চাইতে বেশি। সে দেশের লোকেরা এই নদীর বানকে বলে, 'প্ররোরকা'—অর্থাৎ 'সর্বনেশে'। এই নামটি হইতে ব্যাপারটির কতক পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

মুকুল—আশ্বিন ১৩০৬

আকাশের কথা: ১

অন্ধকার রাত্রিতে যদি আকাশ পরিষ্কার থাকে, তাহা হইলে তারাগুলি বড় সুন্দর দেখায়। তখন ছাতে বসিয়া আকাশের পানে তাকাইয়া থাকিতে বেশ লাগে। তারাগুলি কেমন মিট্‌মিট্‌ করে, দেখিয়াছ? দু-একজন হাসি-খুশি লোক আছে, তাহাদের যত হাসি সব চোখ দুটির ভিতরে। তারা-গুলিকে দেখিলে আমার ঐরূপ লোকের চোখের কথা মনে হয়। বোধ হয়, যেন আমাকে দেখিয়া তাহাদের বড়ই হাসি পাইয়াছে।

বাস্তবিক, উহাদিগকে দেখিয়া আমরা যেমন আশ্চর্য হই, তাহা জানিতে পারিলে উহারা নিশ্চয়ই হাসিয়া ফেলিত। সেই কবে পৃথিবীতে প্রথম মানুষ জন্মিয়াছিল, আর আজ এই উনিশ শত সালের জুলাই মাস। এত-দিন ধরিয়া ক্রমাগত তাহাদিগকে দেখিতেছে, তথাপি মানুষের দেখিবার সাধ মিটে নাই, বরং ক্রমাগত বাড়িয়াই চলিয়াছে। লোকে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করিয়া দূরবীন তয়ের করে; সারারাত জাগিয়া সেই দূরবীন দিয়া আকাশ

দেখে। যাহারা এরূপ করে, তাহারা নিতান্ত ছেলেমানুষ নয়। অঙ্কশাস্ত্রে তাহাদের মতো বড় পণ্ডিত খুব কমই আছে।

আজকাল ভালো-ভালো দূরবীন এবং অন্যান্য অনেকরকম যন্ত্র হইয়াছে। আগে এ-সব ছিল না। তখন শুধু চোখে যাহা দেখা যাইত, তাহাতেই লোকে সন্তুষ্ট থাকিত। দেখিতে জানিলে শুধু চোখেই কি কম দেখা যায়? আমরা শুধু চোখে আকাশের যাহা দেখিতে পাই, তাহা কম আশ্চর্য নহে। রোজ দেখিয়া সেগুলি আমাদের কাছে পুরাতন হইয়া গিয়াছে, কাজেই আমরা তাহাদিগকে তেমন আশ্চর্য মনে করি না। চন্দ্র, সূর্য, তারা এ-সকল যদি কিছুই আগে না থাকিত, আর তার পর একদিন হঠাৎ আসিয়া দেখা দিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই খাবার ফেলিয়া ছুটিয়া দেখিতে আসিতাম।

তোমাদের সকলে ধূমকেতু দেখ নাই, কিন্তু ধূমকেতুর কথা অনেক শুনিয়াছ। আচ্ছা, বল দেখি ভাই, একটা ধূমকেতু দেখিবার জন্য তোমাদের মনটা ব্যস্ত হইয়া আছে কি না? কিন্তু ধূমকেতু যদি রোজ উঠিত, তবে তাহার এত খবর কেহ লইত কি না সন্দেহ।

যাহা রোজ ঘটিতেছে, তাহাও অতিশয় আশ্চর্য। এই যে আমরা পৃথিবীর পিঠে চড়িয়া ঘুরপাক খাইতে খাইতে শূন্যে ছুটিয়া চলিয়াছি, বলিতে গেলে এটাই কি একটা কম আশ্চর্যের ব্যাপার? আমাদের পৃথিবী ঘুরিতে ঘুরিতে বৎসরে একবার সূর্যের চারিদিক বেড়াইয়া আইসে। সূর্যটা যদি এক জায়গায় স্থির হইয়া বসিয়া থাকিত, আর পৃথিবী তাহার চারিদিকে ঘুরিত, তবে পৃথিবীর পরিশ্রম একটু কম হইত। কিন্তু এ জগতে কাহারও স্থির হইয়া বসিয়া থাকিবার হুকুম নাই। সুতরাং সূর্যও পৃথিবীকে লইয়া নিজে ঘুরিতে ঘুরিতে আকাশের একদিক পানে ছুটিয়া চলিয়াছে।

পৃথিবীর চারিধারে চন্দ্র ঘোরে ; চন্দ্রকে লইয়া পৃথিবী সূর্যের চারিধারে ঘোরে ; আবার চন্দ্রসুদ্ধ পৃথিবীকে লইয়া সূর্য কোথায় চলিয়াছে! শেষে গিয়া সে কোথায় ঠেকিবে! আর এই আকাশটাই কত বড় যে, এতদিন ছুটিয়াও সূর্য তাহার শেষ পাইল না! একটা তারার দিকে সূর্য ছুটিয়া চলিয়াছে। কিন্তু সেই তারাটা দুশো বৎসর আগে যত দূরে দেখাইত, এখনও তত দূরেই দেখায়। সেই তারাটাই-বা কত দূরে যে, এতকাল ছুটিয়াও সূর্য তাহার কিছু-মাত্র কাছে পৌঁছিতে পারিল না। সূর্য এত দূরে থাকিলে আমরা তাহাকে দেখিতে পাইতাম কি না সন্দেহ। সেই তারাটা বোধ হয় সূর্যের চাইতেও অনেকখানি বড় আর উজ্জ্বল। সেটা খুব বড় সূর্য ; আমাদের এটি একটি ছোট সূর্য।

ঐ তারাগুলি কি তবে সকলেই সূর্য? সূর্যের মতন বড় আর জমকাল না হইলে এত দূরে তাহাদিগকে দেখাই যাইত না। উহারা সকলেই সূর্য। আমাদের সূর্যের চারিধারে যেমন পৃথিবী, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শনি, প্রভৃতি গ্রহ ঘোরে, উহাদের চারিধারেও হয়তো তেমনি অনেক গ্রহ ঘোরে, কিন্তু এত দূরে থাকিয়া সে-সকল গ্রহকে দেখিবার আমাদের কোনো

উপায় নাই। যাহা হউক, এইটুকু দেখা গিয়াছে যে, ঐ-সকল সূর্যের কোনো কোনোটার চারিধারে আর-একটা সূর্য ঘুরিতেছে। এমন প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে যে, ঐ-সকল তারার কোনো কোনোটার এমন এক-একটি সঙ্গী আছে যে, তাহাদের নিজেদের আলো নাই। নিজেদের আলো নাই বলিয়া তাহারা আমাদিগকে দেখা দিতে পারিতেছে না, কিন্তু অন্য উপায়ে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, তাহারা আছে। উহাদের নিজেদের আলো নাই সুতরাং উহারা সূর্য নহে, গ্রহ ; অর্থাৎ, আমাদের পৃথিবী যাহা, তাহাই। আমাদের এই ছোট-খাটো সূর্যের সঙ্গে এতগুলি গ্রহ, আর ঐ-সকল বড়-বড় সূর্যের সঙ্গে গ্রহ নাই? এটা একটা কথাই নহে।

আমরা নিতান্তই ছোট, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস যে আমরা খুব বড়। আমরা ভাবি, 'আমরা যে মানুষ! আহা, আমাদের মতন আর-একটি জন্তু বুঝি হয় না! আমাদের যে পৃথিবী—ইস্! সে কতখানি বড়!' কিন্তু আমরা যে যথার্থই কত ছোট, তাহা বুঝাইয়া দিবার জন্য ঈশ্বর আকাশকে রাখিয়াছেন। দেখ, ওখানে কত সূর্য। ঐ-সকল সূর্যের সঙ্গে কত পৃথিবী আছে। আর, তাহাতে মানুষের মতন, বা, তাহার চাইতে ঢের বেশি বুদ্ধিমান জীব থাকা কোনোমতেই অসম্ভব নহে। উহারা হয়তো আমাদের চাইতে ঢের বেশি কথা জানে, আর এখানকার দূরবীনের চাইতে অনেক বড়-বড় দূরবীন দিয়া আকাশ দেখে। কিন্তু আমাদের খবর কি তাহারা পাইয়াছে? তাহার ভরসা নিতান্তই কম বলিতে হইবে। উহাদের মধ্যে যাহারা আমাদের একটু কাছে থাকে, তাহারা হয়তো আমাদের সূর্যকে একটি ছোট তারার মতো দেখিতে পায়। কিন্তু ইহার বেশি দেখা সম্ভব নহে। পৃথিবী, চন্দ্র, বুধ, বৃহস্পতির কথা তাহারা কিছুই জানে না।

আর মানুষ? হায় হায়, আমাদের কথাও তাহারা জানে না! কোনোদিন যে জানিবে তাহারও আশা নাই। ডাকিলে তো উহারা শুনিবেই না। পৃথিবীর সকল মানুষ জুটিয়া চ্যাঁচাইলেও শুনিবে না। চিঠি লিখিয়াও জানাইবার উপায় নাই। চিঠি কে লইয়া যাইবে? কোন পথে যাইবে? আর যদিই-বা লোক মিলে আর পথ হয়, তবে সে চিঠি কয় দিনে পৌঁছাইবে? তোমার চিঠি-ওয়ালা যদি রেলে চড়িয়া ঘণ্টায় ষাট মাইল করিয়া যায়, তাহা হইলেও সকলের চাইতে কাছের তারাটিতে সে সাড়ে চারি কোটি বৎসরের কমে পৌঁছাইতে পারিবে না! সেই চিঠির জবাব আসিতে আর সাড়ে চারি কোটি বৎসর লাগিবে!

সকলের চাইতে নিকটের তারাটির সম্বন্ধে যদি এমন হয়, তবে দূরের তারাগুলির কথা কি বলিবে! চক্ষে যাহাদিগকে দেখিতে পাই, তাহারা যে আমাদের কাছে, মোটের উপরে এ কথা মানিয়া লওয়া যায়। কিন্তু এই কাছের তারাগুলিও কত দূরে, তাহা উপরের ঐ দৃষ্টান্তটির দ্বারাই বুঝিতে পার। বাস্তবিকই উহারা এত দূরে যে, সকলের চাইতে বড় দূরবীন দিয়াও উহা-দিগকে আমরা কিছুমাত্র বড় দেখিতে পাই না। শুধু চোখে যেমন একটা কিছু মিট্‌মিট্ করিতেছে দেখি, দূরবীন দিয়াও তেমনি একটা কিছু মিট্‌মিট্

করতে দেখি। একটু উজ্জ্বল দেখি বটে, কিন্তু কিছুমাত্র বড় দেখি না।

অবশ্য শুধু চোখে যাহা দেখি, দূরবীন দিয়া তাহার চাইতে অনেক বেশি তারা দেখিতে পাই। দূরবীন যত ভালো হয়, তাহাতে তত বেশি তারা দেখা যায়। এত দূরেও তারা আছে যে, সেখানে দূরবীনেরও দৃষ্টি পেঁছায় না। তাহারা যে কত দূরে, তাহা ভাবিতেও পারি না।

বাস্তবিক আকাশের কথা অতি আশ্চর্য। কিন্তু শুধু আশ্চর্য বলিয়াই যে লোকে আকাশের খবর এত করিয়া লয়, তাহা নহে। এ-সকল কথা জানাতে আমাদের বিস্তর উপকারও আছে। এমন-কি, আকাশের সম্বন্ধে লোকে এত-দিন ধরিয়া যত কথা শিখিয়াছে, এখন যদি হঠাৎ তাহার সমস্তই ভুলিয়া যাওয়া যায়, তবে ভারি মুস্কিল হইবে। প্রথম কথা দেখ, আমাদের সময়ের ঠিক থাকিবে না। সূর্যের দিকে চাহিয়া আমরা সময় ঠিক করি। মোটামুটি সকাল, দুপুর, বিকাল, সন্ধ্যা, রাত, সকল কথাই সূর্যের মুখ চাহিয়া। তাহার চাইতে বেশি হিসাবের কথা—অর্থাৎ ঘণ্টা, মিনিট, সেকেণ্ড ইত্যাদি ঘড়ির হিসাবের কথা—যদি বল, সেখানেও দেখিবে, আকাশকে ছাড়িয়া কাজ চলে না।

একটার সময় কলিকাতায় তোপ পড়ে। তখন সকলে নিজের ঘড়ি ঠিক করিয়া লয়। তোপ কি করিয়া পড়ে জান? আকাশের সম্বন্ধে যত কথা জানা গিয়াছে তাহা লইয়া জ্যোতিষশাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। ইংরাজিতে ইহাকে বলে Astronomy। সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, তারা ইহাদের কোনটা আকাশের কোন স্থানে কোন সময়ে থাকে, জ্যোতিষশাস্ত্রের দ্বারা অঙ্ক কষিয়া তাহা স্থির করা যায়। ঐরূপে অঙ্ক কষিয়া এ-সকল কথা স্থির করিয়া পুস্তকে লিখিলে তাহাকে বলে পঞ্জিকা। কোনদিন ঠিক কোন সময়ে সূর্য আমাদের মাথার উপরে আসিবে, পঞ্জিকা দেখিয়া জানা যায়। সূর্য আমাদের মাথার উপরে আসিবার সময় যদি ঘড়িতে ঠিক সেই সময়টি দেখায়, তবেই বলিতে পারি, ঘড়ি ঠিক। তাহা যদি না হয়, তবে ঐ সময় পঞ্জিকার সঙ্গে মিলাইয়া ঘড়ি ঠিক করিয়া দিতে হয়। সময় দেখিবার জন্য একটা আপিস আছে। এই আপিসে একটা ভালো ঘড়ি আছে। সূর্য মোটামুটি বারোটার সময় আমাদের মাথার উপরে আইসে। ঐ সময়ে ঐ আপিসের লোকেরা দূরবীন দিয়া সূর্য দেখিয়া ঘড়ি ঠিক করে। তারপর একটার সময় ঐ ঘড়ি দেখিয়া তোপ ফেলা হয়। সূর্য, তারা, এ-সকলের সাহায্য না পাইলে ঘড়ি ঠিক রাখা সম্ভব হইত না। তার ফল এই হইত যে, তোমরা কেহ দশটার সময়ই ইস্কুলে গিয়া বসিয়া থাকিতে, আর কেহ বারোটার সময় যাইতে। মাস্টারমহাশয়ের নিতান্তই অসুবিধা হইত, তোমাদেরও পড়া-শুনা ভালো করিয়া হইত না। যখন ইস্কুলে জলখাবারের ছুটি হইত, বাড়ির লোক হয়তো তখন খাবার পাঠাইত না। রেলে যাইতে হইলে আরো মুস্কিল হইত!

সমুদ্রে জাহাজগুলি যদি আকাশ দেখিতে না পায়, তবে তাহাদের পথ চিনিয়া চলাই অসম্ভব হয়। আজ যদি সকলে আকাশের কথা ভুলিয়া যায়, তবে সমুদ্রে জাহাজ চলাও বন্ধ হইয়া যাইবে। যে-সকল জাহাজ এখন সমুদ্রে

আছে, তাহারা সকলেই পথ ভুলিয়া যাইবে। আমরা যে নুনটুকু খাই, তাহাও জাহাজে আসে। সুতরাং জাহাজ চলা বন্ধ হইলে বড়ই মুস্কিল হইবে।

আকাশের কথা জানিলে যেমন আনন্দ, তেমনি উপকার। এইজন্যই লোকে এত কষ্ট করিয়া আকাশের খবর লইতে ব্যস্ত হয়। ভালো করিয়া আকাশের খবর লইতে হইলে অনেক রকম যন্ত্র আর অনেক লেখাপড়া জানিবার দরকার। আমাদের যদিও তাহার কিছুই নাই, তথাপি আমরা এই বিষয়ের অতি সামান্য একটু চর্চা করিতে পারি ; তাহাতেও যথেষ্ট আনন্দ আছে।

আকাশকে আমরা সচারাচর যেমন করিয়া দেখি, তাহাতে তাহার সম্বন্ধে বেশি কথা জানিবার সম্ভাবনা নাই। তাহাকে রোজ দেখিতে হয়, আর খুব সতর্ক হইয়া দেখিতে হয়। এইরূপ করিয়া কিছুদিন দেখিলেই অনেক আশ্চর্য কথা জানিতে পারিবে।

মুকুল—শ্রাবণ ১৩০৭

আকাশের কথা ঃ ২

শুধু চোখে আকাশের যতখানি দেখা যায়, তাহার সম্বন্ধে আজ দুই-একটি কথা বলিব। আকাশে আমরা সচরাচর সূর্য, চন্দ্র, তারা ইত্যাদিকে দেখিতে পাই। মাঝে মাঝে এক-একটা ধূমকেতুও দেখা দেয়। সূর্য, চন্দ্র, ইত্যাদিকে চিনাইয়া দিবার বোধ হয় দরকার হইবে না ; ধূমকেতু আসিলে তাহাকেও চিনিবার যথেষ্ট অবসর পাওয়া যাইবে।

তারাগুলি নিতান্তই ছোট-ছোট, আর ইহাদের সংখ্যাও খুব বেশি। কিন্তু তাই বলিয়া ইহাদিগকে চিনিবার চেষ্টার কোনো ত্রুটি হয় নাই। অতি প্রাচীন-কাল হইতেই লোকে ইহাদের কথা জানিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া আছে। আগে অনেকে বিশ্বাস করিত যে, ঐ তারাগুলি আর কিছুই নহে, ধার্মিক লোকের আত্মা। মহাভারতে ইহার প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। একবার ইন্দ্রের সারথি মাতলি অর্জুনকে রথে করিয়া স্বর্গে লইয়া যাইতেছিলেন।[১] পৃথিবী ছাড়িয়া আকাশের ভিতর দিয়া যাইবার সময়, অর্জুন অনেকগুলি উজ্জ্বল মানুষ দেখিতে পাইলেন। তিনি আশ্চর্য হইয়া মাতলিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ইহারা কে?' তাহাতে মাতলি বলিলেন, 'তুমি পৃথিবী হইতে যে-সকল তারা দেখিয়াছ ঐ তারাসকল পুণ্যবান লোক। পৃথিবীতে থাকিতে তাঁহারা যে-সকল সৎকার্য করিয়াছেন, তাহার ফলে তাঁহারা এখন তারা হইয়াছেন।'

[১] মহাভারত, বনপর্ব ঃ ইন্দ্রলোকাভিগমন পর্বাধ্যায়।

প্রাচীন গ্রীক পুরাণে পার্সিয়ুস্ এবং আন্ড্রোমীডার গল্প আছে। আন্ড্রোমীডা রাজকন্যা ছিলেন। মহারাজ কীফিয়ুস্ তাঁহার পিতা, রানী ক্যাসিয়োপিয়া তাহার মাতা। বিনা দোষে আন্ড্রোমীডার হাত-পা শিকলে বাঁধিয়া, একটা সামুদ্রিক রাক্ষসের আহারের জন্য তাহাকে সমুদ্রের ধারে ফেলিয়া রাখা হইয়াছিল। মহাবীর পার্সিয়ুস্ অনেক অসাধ্য সাধন করিয়া তাহাকে সেই বিপদ হইতে উদ্ধার করেন, এবং তৎপর তাঁহাকে বিবাহ করেন। প্রাচীন গ্রীক পুরাণে লিখিত আছে যে, 'ইঁহাদের মৃত্যুর পর গ্রীক-দেবতা আথেনী, ইঁহাদিগকে আকাশে তুলিয়া লয়েন। আজও পরিষ্কার রাত্রিতে তাঁহাদিগকে সেখানে দেখিতে পাওয়া যায়। আন্ড্রোমীডার হাত-পা বাঁধা; পার্সিয়ুসের যুদ্ধের বেশ। কীফিয়ুস্ দণ্ড হাতে মুকুট মাথায় রাজকাজে নিযুক্ত; কাসিয়ো-পিয়া হাতির দাঁতের চেয়ারে বসিয়া চুল আঁচড়াইতে ব্যস্ত।'

পৃথিবীর যেমন ম্যাপ আছে, আকাশেরও তেমনি ম্যাপ আছে। পৃথিবীতে যেমন নানাদেশ আর নানান সমুদ্র, আকাশেও তেমনি অনেকগুলি নক্ষত্রমণ্ডলী (Constellation) কল্পনা করা হইয়াছে। এই-সকল নক্ষত্রমণ্ডলীর প্রত্যেক-টার এক-একটা নাম আছে। সে-সকল নাম শুনিলে হয়তো তোমাদের হাসি পাইবে। মানুষের নাম আর জন্তুর নাম তাহাতে বেশি; মাঝে মাঝে দুই-একটা জিনিসপত্রের নামও দেখা যায়। মানুষের মধ্যে পার্সিয়ুস্, আন্ড্রো-মীডা, কীফিয়ুস্, কাসিয়োপিয়া, ওরায়ণ, হার্কিউলিস্ ইত্যাদির নাম দেখা যায়। জন্তুর মধ্যে বড় সিংহ, ছোট সিংহ, বড় ভল্লুক, ছোট ভল্লুক, বড় কুকুর, ছোট কুকুর, ষাঁড়, ভেড়া, ছাগল, নেকড়ে বাঘ, জিরাফ, খরগোশ, ঈগল, হাঁস, পায়রা, গোসাপ, কাঁকড়া, বিছে ইত্যাদি। জিনিসপত্রের মধ্যে মুকুট, বীণা, দাঁড়িপাল্লা, জাহাজ ইত্যাদি।

এই-সকল নাম কি দেখিয়া রাখা হইয়াছিল, তাহা এখন বলিবার উপায় নাই। কোনো কোনো স্থলে দেখা যায় যে, তারাগুলি মিলিয়া কোনো-একটা মানুষ বা জিনিসের চেহারার মতন হইয়াছে; কিন্তু অনেক স্থলেই এরূপ চেহারার মিল দেখা যায় না। যাহা হউক ইহাতে কাজের সুবিধা হইয়াছে, তাহার ভুল নাই। সুতরাং ও-সকল নাম কে রাখিয়াছিল, কেন রাখিয়াছিল, এত কথায় আমাদের দরকার কি?

নক্ষত্রমণ্ডলীগুলির যেমন এক-একটা নাম আছে, তেমনি অনেকগুলি নক্ষত্রের নিজের এক-একটা নাম আছে। একটা নক্ষত্র আছে, তাহার নাম 'ধ্রুব' অর্থাৎ 'স্থির'। এই নক্ষত্রের উদয় অস্ত নাই, চিরকাল ইহা প্রায় একই স্থানে থাকে, এইজন্য ইহার ঐরূপ নাম হইয়াছে। ইহার সম্বন্ধে পরে আরো কিছু বলিব।

সকলের চাইতে বড় যে নক্ষত্র তাহার নাম সিরিয়স্। আমাদের দেশে জ্যোতিষশাস্ত্রে ইহাকে বলে মৃগব্যাধ। এখানে একটা কথা বলার নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। তারা বলিতে মোটামুটি আমরা আকাশের যতগুলি জিনিস-কে বুঝিয়া লই, তাহাদের সবগুলি ঠিক এক জিনিস নহে। যতগুলিকে

আমরা তারা বলি, বাস্তবিক তাহাদের কতকগুলি গ্রহ, আর বাকি নক্ষত্র।

আমাদের সূর্য যেমন, নক্ষত্রগুলির সকলেই তেমনি এক-একটি সূর্য। ইহাদিগকে যতবার দেখ একই স্থানে দেখিতে পাইবে।[১] কিন্তু একটা গ্রহকে আজ যদি এক স্থানে দেখ, কাল দেখিবে সে সেস্থান হইতে একটু দূরে চলিয়া গিয়াছে। অবশ্য বেশি দূরে নয়, কিন্তু এতটা দূরে যে, নক্ষত্রগুলির সঙ্গে তুলনা করিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায় যে সে নড়িয়াছে।

আমাদের পৃথিবীও একটা গ্রহ। আর গ্রহগুলিও এক-একটা পৃথিবী। ইহারা সকলেই সূর্যের চারিদিকে ঘোরে। এইজন্যই ইহাদিগকে আকাশে স্থান পরিবর্তন করিতে দেখা যায়।

আমি বলিতেছিলাম যে, সকলের চাইতে বড় নক্ষত্রটার নাম সিরিয়স্। আমি যখন নক্ষত্রের কথা বলিতেছি, তখন গ্রহগুলিকে অবশ্যই বাদ দিয়া লইতে হইবে। দুটি গ্রহ আছে, যাহারা সিরিয়সের চাইতে উজ্জ্বল। ইহাদের একটি বৃহস্পতি, আর একটি শুক্র—যাহাকে শুকতারা বলে। ইহারা গ্রহ, সুতরাং ইহারা স্থান পরিবর্তন করে। অতএব ইহাদিগকে চিনিতে বেশি মুস্কিল হইবে না। অবশ্য এ কথা মনে রাখিতে হইবে যে, একবার বসিয়া ঘণ্টাখানেক তাকাইয়া থাকিলেই ইহাদিগকে স্থান পরিবর্তন করিতে দেখা যাইবে না; কারণ, ইহারা খুব ধীর গতিতে চলে। ক্রমাগত দুই-তিন দিন মনোযোগ করিয়া দেখিলে, অনায়াসেই ইহাদের চঞ্চলতা ধরা পড়িবে।

আকাশের ম্যাপ প্রস্তুত করিবার সময় গ্রহগুলিকে বাদ দিয়া লইতে হয়। যে নড়িয়া বেড়ায় তাহার একটা স্থান নির্দেশ করা সম্ভব কি? যে ময়রার দোকানের সামনে একটা ষাঁড় দাঁড়াইয়া আছে, সেই ময়রার নিকটে গিয়া সন্দেশ খাইতে যদি কেহ আমাকে হুকুম দেয়, তবে আমার মিষ্টমুখ করার ভরসা বড়ই কম থাকে। কারণ, ষাঁড়টির ততক্ষণে ময়রার দোকান ছাড়িয়া জুতা-ওয়ালার দোকানের সামনে চলিয়া যাওয়া কিছুই বিচিত্র নহে। গ্রহগুলিও মনে কর যেন এই চলন্ত ষাঁড়ের মতন; উহারা কখন কোথায় থাকে তাহা ম্যাপে লিখিয়া দেওয়া সম্ভব নহে। তবে ষাঁড়ের সঙ্গে ইহাদের একটা মস্ত তফাত আছে। ষাঁড়ের চলাফেরার একটা হিসাব কিতাব নাই, যখন যেখানে খুশি চলিয়া যায়। কিন্তু গ্রহেরা ভারি আইনজ্ঞলোকের মতন চলে; বেহিসাবী এক পাও ফেলে না। সুতরাং উহাদের কে কখন কোথায় থাকিবে তাহা হিসাব করিয়া স্থির করা যায়। এ সম্বন্ধে এর পরে আরো কথা হইবে। এখন আমরা আকাশের সঙ্গে আর একটু পরিচয় করিতে চেষ্টা করি।

[১] অবশ্য নক্ষত্রদেরও অনেকেরই উদয় অস্ত আছে; সুতরাং একস্থানে দেখা যাওয়ার অর্থ উদয়াস্তের কথাটাকে বাদ দিয়া বুঝিতে হইবে। পৃথিবী ঘুরিতেছে, এইজন্যই ইহাদের উদয়াস্ত হয়, এ কথা বোধ হয় তোমরা সকলেই জান। সুতরাং উদয়াস্ত হয় বলিয়া যে উহারা বাস্তবিকই নড়ে, তাহা নহে।

যখন অন্ধকার রাত্রিতে আকাশ খুব পরিষ্কার থাকে, তখন কি আমরা খালি গ্রহ আর নক্ষত্রগুলিকেই দেখিতে পাই? আর কিছুই দেখি না? আর একটা জিনিস আছে, সেটাকে হয়তো তোমাদের কেহ কেহ দেখিয়াও থাকিবে। এই জিনিসটার চেহারা পাতলা সাদা মেঘের মতন; সুতরাং অনেকেই ইহাকে মেঘ মনে করিয়া অগ্রাহ্য করে। আচ্ছা, এখন হইতে এই জিনিসটার একটু খোঁজ লইতে চেষ্টা কর দেখি? দুদিন (দুদিন কেন কয়েক ঘণ্টা) ধরিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবে যে, আকাশে এমন একটা জিনিস আছে, যাহাকে এতদিন হয়তো মেঘ মনে করিয়া আসিয়াছ, অথচ সে মেঘ নহে। মেঘ চলিয়া যায়, কিন্তু উহা নক্ষত্রগুলির ন্যায় স্থির থাকে। মেঘের আকার বদলায়, কিন্তু উহার আকার সর্বদাই একরকম থাকে। এই জিনিসটার নাম 'ছায়াপথ'। আকাশের এক ধার হইতে আর এক ধার পর্যন্ত ছায়াপথ নদীর আকারে বিস্তৃত রহিয়াছে। একবার দেখিলে উহাকে আর ভুলিবার জো নাই।

তোমরা অবশ্য পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ ইত্যাদি দিক চিনিতে পার। যদি না পার তবে—চুপ! অন্য কাহাকেও বলিয়ো না—চুপিচুপি মার কাছে জানিয়া আইস। যাহারা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'বোধোদয়' পড়িয়াছ, তাহারা নিশ্চয় জান যে, যেদিকে ভোরে সূর্য উঠে, সেটা পূর্বদিক। পূর্বদিকে ডান হাত করিয়া দাঁড়াইলে, সম্মুখে উত্তর, বামে পশ্চিম আর পিছনে দক্ষিণ দিক থাকে।

আমাদের সূর্যের মতন কোটি কোটি সূর্য লইয়া ছায়াপথের সৃষ্টি। সে-সকল সূর্য কত দূরে, কে বলিবে? আমরা এখানে থাকিয়া তাহাদিগকে স্বতন্ত্রভাবে দেখিতে পাইতেছি না; খালি মোটের উপরে ছায়াপথের স্থানটা একটু ফরসা দেখি।

আকাশের গলায় পৈতার মতন ছায়াপথ তাহার চারিদিক বেষ্টন করিয়া আছে। একবারে আমরা তাহার অর্ধেকের বেশি দেখিতে পাই না, কিন্তু কিছুদিন অপেক্ষা করিলে উহার অপর অর্ধেকও দেখিতে পাইব। আজকাল রাত সাড়ে নয়টার সময় যে অর্ধেককে মাথার উপরে দেখিতে পাও, ক্রমাগত কয়েকদিন ধরিয়া দেখিলে দেখিতে পাইবে যে, উহা আর ঐ সময়ে আমাদের মাথার উপরে থাকে না, কিন্তু আরো পশ্চিমে চলিয়া যায়। কিছুদিন পরে দেখিবে যে সে সন্ধ্যার সময়ই আমাদের মাথার উপরে আসিয়া হাজির হয়। তখন শেষরাত্রিতে আকাশের পূর্বদিকে ছায়াপথের অপর অর্ধেককে দেখিতে পাওয়া যাইবে। আজকাল সেই অর্ধেক দিনেরবেলায় উঠে (অর্থাৎ আকাশের যে ভাগে সূর্য সেই ভাগে সে আছে) বলিয়া আমরা তাহাকে দেখিতে পাই না। শীতকালে সেই অর্ধেক সমস্ত রাত্রি আকাশে থাকিবে সন্ধ্যাবেলা সে পূর্বদিকে দেখা দিবে, মধ্যরাত্রে আমাদের মাথার উপরে আসিবে, ভোরের বেলা পশ্চিমে অস্ত যাইবে।

এই ছায়াপথ আমাদিগকে ঘিরিয়া রহিয়াছে; আমরা ইহারই ভিতরে বাস করিতেছি। আকাশের রাজ্যে যেমন দূরের জিনিস লইয়া কারবার,

তাহাতে এ কথা সহজেই মনে হয় যে, আমরা হয়তো ঐ ছায়াপথেরই লোক। আমাদের সূর্য হয়তো এই ছায়াপথেরই একটি অতি গরিব অধিবাসী!

মুকুল—ভাদ্র ১৩০৭

আকাশের কথা ঃ ৩

যদিও আমরা এখন গ্রহের কথা বলিতে বসি নাই, তথাপি একটা কথা বলিলে তত দোষের হইবে না। প্রথম রাত্রিতে যে-সকল উজ্জ্বল তারা দেখা যায়, তাহাদের তিনটি গ্রহ। একটি লাল্চে রঙের ; সেটিকে পশ্চিমে দেখা যায়, আর প্রথম রাত্রিতেই সে অস্ত যায়। এটি মঙ্গলগ্রহ। ইংরাজিতে ইহার নাম Mars। আর-একটি প্রথম রাত্রির তারার মধ্যে সকলের চাইতে বড়। ইহার নাম বৃহস্পতি (Jupiter)? গ্রহদের মধ্যে এইটিই সকলের চাইতে বড়। এই গ্রহটি মঙ্গলের কিছু পরে অস্ত যায়। আকাশের পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে উহার খোঁজ লইবে। আর-একটি গ্রহ ছায়াপথের উপরে। ইহার নাম শনি (Saturn)। দূরবীন দিয়া দেখিবার পক্ষে ইহার মতন সুন্দর জিনিস আর আকাশে নাই। এই-সকল গ্রহকে আকাশের দক্ষিণ ভাগে দেখিতে পাইবে।

আজকালকার প্রথম রাত্রির আকাশে সম্প্রতি আমাদের পরিচয় করিবার উপযুক্ত বেশি জিনিস নাই। কিন্তু যদি রাত্রিতে জাগিতে পার, তাহা হইলে কয়েকটা দেখিবার আছে।

রাত্রি প্রভাত হইবার কিঞ্চিৎ পূর্বে উঠিলে পূর্বদিকের আকাশে দুটা খুব উজ্জ্বল তারা দেখিতে পাইবে। ইহাদের মধ্যে যেটা বেশি উজ্জ্বল, সেটা নক্ষত্র নহে, গ্রহ। ইহাকেই শুকতারা (Venus) বলে। শুকতারার চাইতে কম উজ্জ্বল যেটা, সেটার নামই সিরিয়স্। নক্ষত্রের মধ্যে এইটাই সকলের চাইতে উজ্জ্বল।

সিরিয়সের খুব কাছেই ছায়াপথটাকে বেশ পরিষ্কার দেখিতে পাওয়া যাইবে। আচ্ছা, ওটাকে ধরিয়া ক্রমাগত উত্তর দিকে যাই। অবশ্য, ঠিক উত্তর হইবে না ; মোটামুটি উত্তর।

খানিক দূর গেলেই দেখিবে যে অনেকগুলি উজ্জ্বল তারা মিলিয়া এই ছবির[১] একস্থানের মতন দেখিতে হইয়াছে। এই নক্ষত্রমণ্ডলীকে প্রায় সকলেই চিনে। ইহার বাঙ্গালা নাম কালপুরুষ, ইংরাজি নাম ওরায়ণ (Orion)। অনেকে ইহাকে আদম সুরৎও বলে। মোটামুটি ইহাকে দেখিতে একটা মানুষের মতন। চারি কোণের চারিটা তারা যেন হাত-পা। একটা কোমর-

[১]পত্রিকার পাতায় ছবিটি বিবর্ণ হয়ে যাওয়ায় দেওয়া সম্ভব হল না।

বন্ধও আছে, তাহাতে আবার একটা তলোয়ার ঝুলিতেছে। খুব যোদ্ধা, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

আকাশের একটা ম্যাপ দেখিলে দেখিতে পাইবে যে, তাহাতে ওরায়ণের চেহারা দেওয়া হইয়াছে। উহা কাল্পনিক বলিয়া এখানে তাহা দেওয়ার বিশেষ দরকার বোধ হইতেছে না। কিন্তু ম্যাপের সেই ছবিখানি দেখিতে হাসি পায়। ওরায়ণের বাঁ হাতে একটা জন্তুর ছাল, ডান হাতে এক প্রকাণ্ড গদা! কোথাকার এক ক্ষ্যাপা ষাঁড় শিং বাগাইয়া গুঁতাইতে আসিতেছে; ওরায়ণ তাহার সঙ্গে সাংঘাতিক যুদ্ধ করিতেছেন!

ওরায়ণের কোমরবন্ধের ভিতর দিয়া একটা লাইন টানিলে তাহার একদিক সিরিয়সের কাছ দিয়া যায়, অপর দিক প্রায় ষাঁড়ের মাথায় গিয়া ঠেকে। ষাঁড়ের মাথার মধ্যে সকলের চেয়ে বড় তারাটির নাম রোহিণী। ইংরাজিতে ইহাকে বলে Aldebaran। ওরায়ণের ডান হাতের তারাটির নাম আর্দ্রা, বাম হাতের তারাটির নাম মৃগশিরা।

এই ষাঁড়ই আমাদের পঞ্জিকার বৃষরাশি। সূর্য এক-এক মাসে আকাশের এক-এক স্থানে থাকে। সেই স্থানগুলিকে এক-একটা রাশি বলে। বৈশাখ মাসে আকাশের যে স্থানে সূর্য থাকে, তাহার নাম মেষরাশি। এইরূপে মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ, মীন—বারো মাসে এই বারোটা রাশির ভিতর দিয়া সূর্য ঘুরিয়া আইসে। অবশ্য সূর্য যে বাস্তবিকই বৎসরে এতটা পথ হাঁটিয়া আইসে, আর আমরা এক জায়গায় গালে হাত দিয়া বসিয়া তাহা দেখি, এরূপ নহে। আসলে আমরাই সূর্যের চারিধারে ঘুরিতেছি বলিয়া এরূপ দেখা যায়।

রাশিগুলির কোনটা কোথায় আছে তাহা খুঁজিয়া বাহির করা তোমাদের পক্ষে সহজ হইবে না। বৃষরাশিটাকে চিনিলে। ছায়াপথের এধারে বৃষরাশি, ওধারে মিথুনরাশি। তারপর কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক ঘুরিয়া আসিলেই আবার ছায়াপথে উপস্থিত হওয়া যায়। আজকাল শনিগ্রহটি ইহারই নিকটে দেখিতে পাইবে।

সিরিয়স্ হইতে সোজা চলিয়া ওরায়ণের কোমরবন্ধ, তৎপর বৃষরাশির মাথা। এই লাইন ধরিয়া আর খানিক দূর গেলে আর একটি খুব ছোট নক্ষত্রমণ্ডলী পাওয়া যায়। ছোট-ছোট কয়েকটি নক্ষত্র এক জায়গায় দল বাঁধিয়া আছে, দেখিলে সহজেই চিনিতে পারিবে। এই নক্ষত্রমণ্ডলীর নাম কৃত্তিকা। ইংরাজিতে ইহাদিগকে বলে the Pleiades আমাদের দেশের সাধারণ লোকে বলে, কৃত্তিকারা সাত বোন অর্থাৎ, সাধারণ চক্ষে ঐ স্থানে সাতটি ছোট-ছোট তারা দেখা যায়। কিন্তু দৃষ্টি খুব প্রখর হইলে, ইহা অপেক্ষা বেশিও দেখা যায়। আবার একটু কানা গোছের হইলে সাতটিও দেখিতে পায় না। তোমরা এই তারাগুলি গণিয়া পরীক্ষা করিতে পার, কাহার চশমার দরকার।

এই তারাগুলিকে অনেকে সপ্তর্ষিমণ্ডল বলে, কিন্তু তাহা ভুল। সপ্তর্ষিমণ্ডলকে ইংরাজিতে বলে Great Bear (বড় ভল্লুক)। উহার

সামনের দুটি তারার ভিতর দিয়া লাইন টানিলে ধ্রুবতারাকে পাওয়া যায়। এইজন্য এই তারা দুটির নাম হইয়াছে 'প্রদর্শক' (the pointers)।

পৃথিবীর মেরুদণ্ডটাকে খুব লম্বা করিয়া বাড়াইয়া দিলে ঐ ধ্রুবতারার খুব কাছ দিয়া যায়। এইজন্যই ধ্রুবতারার উদয় অস্ত নাই; উহা সর্বদাই একস্থানে রহিয়াছে। উহার কাছের অন্যান্য তারাগুলিকে লক্ষ্য করিয়া দেখিলে দেখিতে পাইবে যে, উহারা এই ধ্রুবতারারই চারিদিকে ঘোরে। আসলে ধ্রুবতারাও একেবারে স্থির নহে; কারণ, সে আকাশের সুমেরুর ঠিক উপরে নাই। ধ্রুবতারা আকাশের সুমেরুর চারিধারে ঘোরে। কিন্তু সে আকাশের সুমেরুর খুব কাছে আছে বলিয়া এত অল্প স্থানের ভিতর ঘোরে যে, সহজ চক্ষে আমরা তাহাকে স্থির বলিয়াই মনে করি।

যাহারা পৃথিবীর ঠিক মাঝখানে (বিষুবরেখার উপরে) আছে, তাহারা ধ্রুবতারাকে আকাশের প্রান্তে দেখিতে পায়। বিষুবরেখার দক্ষিণের লোকেরা ধ্রুবতারা দেখিতে পায় না। বিষুবরেখা হইতে যত উত্তরে আসিবে, ধ্রুবতারাকে তত ঊর্ধ্বে দেখিতে পাইবে। সুমেরুতে দাঁড়াইতে পারিলে, উহা একেবারে মাথার উপরে আসিবে। ঠিক মাথার উপর হইতে আকাশের উত্তর প্রান্ত পর্যন্ত স্থানটুকুকে তিন ভাগ করিলে যতখানি হয়, আমরা আকাশের প্রান্ত হইতে ধ্রুবকে মোটামুটি ততখানি উপরে দেখিতে পাই। সুতরাং ঠিক উত্তর-দিকটি একবার স্থির করিয়া লইতে পারিলে, ধ্রুবকে বাহির করা মুস্কিল হইবে না। তবে একটু সহিষ্ণুতার ও সাবধানতার প্রয়োজন হইবে; কারণ, ধ্রুব বেশি উজ্জ্বল তারা নহে।

ঠিক খাড়া জিনিসের ছায়া বেলা ঠিক বারোটার সময় যেদিকে পড়ে সেইটা উত্তরদিক। দড়ির আগায় ভার বাঁধিয়া ঝুলাইলে সেই দড়িকে ঠিক খাড়া মনে করা যায়। বারোটার সময় ঐরূপ দড়ির ছায়া কোথায় পড়ে, তাহা খড়ি দিয়া চিহ্নিত করিয়া লইবে। রাত্রিতে ঐ খড়ির দাগ দেখিয়া উত্তরদিক স্থির করিবে। তারপর ধ্রুবতারা খুঁজিয়া বাহির করিবে।

প্রাচীনকালে দিগ্‌দর্শন যন্ত্র ছিল না। তখনকার নাবিকেরা ধ্রুবতারা দেখিয়া দিক স্থির করিত।

আমরা ধ্রুবকে আকাশের প্রান্ত হইতে অনেকখানি উপরে দেখিতে পাই। তোমরা যদি ধ্রুবকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পার, তবে দেখিবে যে, ধ্রুব হইতে আকাশের প্রান্তের মধ্যে যে তারাগুলি আছে, তাহাদেরও উদয় অস্ত নাই।

মুকুল—আশ্বিন ১৩০৪

পুরাণের গল্প

নিজের হাতে ছবি এঁকে, নিজের নব প্রতিষ্ঠিত ইউ. রায় এণ্ড সন্সের কার্যালয় থেকে. নিজের প্রেসে মুদ্রিত করে, এই বই লেখক প্রকাশ করেছিলেন। উপেন্দ্রকিশোর বিশ্বাস করতেন আমাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির মূলে আছে রামায়ণ, মহা-ভারত ও পৌরাণিক ঐতিহ্য। এগুলি না জানলে নিজেদের বা নিজের দেশকে জানা যায় না।

পুরাণ হল প্রাচীন ইতিবৃত্ত ও কিংবদন্তী দিয়ে তৈরি শাস্ত্রবিশেষ। আঠারোটি পুরাণ আছে, যথা ব্রহ্ম, পদ্ম, বিষ্ণু, শিব, ভাগবত, নারদ, মারকণ্ডেয়, অগ্নি, ভবিষ্য, ব্রহ্মবৈবর্ত, লিঙ্গ, বরাহ, স্কন্দ, বামন. কূর্ম, মৎস্য, গরুড়, ব্রহ্মাণ্ড। তা ছাড়া নৃসিংহ, কালিকা ইত্যাদি উপ-পুরাণও আছে। পণ্ডিতরা সবগুলিকে সমান গুরুত্ব দেন না। সাধারণ লোকের পক্ষে সবগুলি বিশদভাবে পড়াও সম্ভব নয়। অথচ আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতির মূলে এগুলিও আছে।

বর্তমান গ্রন্থে উপেন্দ্রকিশোর বাছাই করা কয়েকটি পৌরাণিক কাহিনী ছোটদের উপযুক্ত করে লিখেছেন। যেমনই সব গল্প, তেমনই তার ভাষা। লেখাগুলি মোটামুটি সন্দেশ-এ প্রকাশিত কালানুক্রমেই বিন্যস্ত হল।

সূচীপত্র

পৃথিবীর পিতা

সকলের আগে যাঁহাকে লোকে রাজা বলিয়াছিল, তাঁহার নাম ছিল পৃথু। তিনি সূর্যবংশের লোক ছিলেন, তাঁহার পিতার নাম ছিল বেণ।

'রাজা' কিনা, যে 'রঞ্জন' করে অর্থাৎ খুশি রাখে। পৃথু নানারকমে প্রজাদিগকে খুশি করিয়াছিলেন, তাই সকলে মিলিয়া তাঁহাকে 'রাজা' নাম দিয়াছিল। পৃথুর পূর্বে লোকের দিন বড়ই কষ্টে যাইত। সেকালে গ্রাম নগর পথঘাট কিছুই ছিল না, ঝোপে জঙ্গলে, পর্বতের গুহায় সকলে বাস করিত। পৃথু তাহাদিগকে বাড়ি-ঘর বাঁধিয়া এক জায়গায় থাকিতে শিখান। আর পথ বানাইয়া চলাফেরার সুবিধা করিয়া দেন। সেই হইতে শহর বস্তির সৃষ্টি হইল। সে কালের লোকে চাষবাস করিতে জানিত না। ফলমূল খাইয়া অতি কষ্টে দিন কাটাইত।

জমিতে কাঁকর, আকাশে মেঘ নাই ; খট্‌খটে শুকনো মাটি ফাটিয়া চৌচির হইয়া আছে, তাহাতে শস্য জন্মাইতে গেলেও তাহা হয় না। প্রজারা পৃথুকে বলিল, "হে রাজা, পৃথিবী সকল শস্য খাইয়া বসিয়াছে, আমরা কেমন করিয়া বাঁচিব? ক্ষুধায় বড়ই কষ্ট পাইতেছি আমাদিগকে শস্য আনিয়া দাও।"

পৃথু বলিলেন, "বটে, পৃথিবীর এমন কাজ? শস্য সব খাইয়া বসিয়াছে? আচ্ছা এখনি ইহার সাজা দিতেছি। আন তো রে ধনুক, নিয়ে আয় তো তীর।"

পৃথিবী ভাবিল, 'মাগো, মারিয়াই ফেলে বুঝি।'

সে প্রাণের ভয়ে গাই সাজিয়া লেজ উঁচু করিয়া ছুটিয়া পালাইতে লাগিল। কিন্তু পৃথুর বড়ই রাগ হইয়াছিল, তিনি তাহাকে কিছুতেই ছাড়িলেন না। আকাশ পাতাল ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, ব্রহ্মলোক অবধি ছুটিয়া গেল ; কিছুতেই সে তাঁহাকে এড়াইতে পারিল না। তখন পৃথিবী কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "দোহাই মহারাজ! আমি স্ত্রীলোক, আমাকে মারিলে আপনার পাপ হইবে।"

পৃথু বলিলেন, "তুমি ভারি দুষ্ট। তোমাকে মারিলে অনেক উপকার হইবে। কাজেই ইহাতে পাপ নাই বরং পুণ্য আছে।"

পৃথিবী বলিল, "প্রজাদের যে উপকার হইবে বলিতেছেন, আমি মরিলে তাহারা থাকিবে কোথায়?"

পৃথু বলিলেন, "কেন? আমি তপস্যা করিয়া তাহাদের থাকিবার জায়গা করিব।"

পৃথিবী বলিল, "আমাকে মারিলে শস্য পাওয়া যাইবে না ; শস্য পাইবার উপায় আমি বলিতেছি। সে আর এখন শস্য নাই, আমার পেটে হজম হইয়া দুধ হইয়া গিয়াছে। আমাকে দোহাইলে সেই দুধ পাইতে পারেন। কিন্তু একটি বাছুর চাই, নহিলে দুধ বাহির হইবে না। আর জমির উঁচু নিচু দূর করিয়া দিন, যেন দুধ দাঁড়াইতে পারে, গড়াইয়া না চলিয়া যায়।"

রাজা তখনই ধনুকের আগা দিয়া জমির উপরকার ঢিপি সরাইয়া দিলেন। তাহাতে জমি সমান হইল, আর ঢিপি-সকল এক-এক জায়গায় জড় হইয়া পর্বতের সৃষ্টি হইল। সমান জমির উপরে লোকে ঘর-বাড়ি বাঁধিল। সেই হইতেই গ্রাম নগরের সৃষ্টি। তাহার আগে এ-সব ছিল না।

জমি সমান হইল, এখন একটি বাছুর হইলেই গাই দোহাইয়া সেই জমির উপরে দুধ ছড়ান যাইতে পারে। সেই বাছুর হইলেন স্বয়ম্ভুব মনু। এমন বাছুর তো আর সহজে পাওয়া যায় না, তাঁহাকে দেখিয়াই গাইয়ের বাঁট দিয়া দুধ ঝরিতে লাগিল।

তখন পৃথু নিজ হাতে গাই দোহাইতে লাগিলেন। সে আশ্চর্য গাই না জানি কতই দুধ দিয়াছিল। সংসারে যত শস্য, সকলই তাহাকে দোহাইয়া পাওয়া গেল, সেই শস্য খাইয়া এখনো আমরা বাঁচিয়া আছি। শুধু তাহাই নহে, পৃথুর পরে দেব, দানা, যক্ষ, রাক্ষস প্রভৃতি সকলে আসিয়া সেই গাই দোহাইতে লাগিল। সকলেই নিজের নিজের বাসন আনিল। নিজেদের এক-একটি বাছুর ঠিক করিয়া আনিল, দোহাইবার লোক অবধি আনিতে ভুলিল না। কেহ সোনার বাসনে, কেহ রুপার বাসনে, কেহ লোহার হাঁড়িতে, কেহ পাথরের বাটিতে, কেহ লাউয়ের খোলায়, কেহ পদ্মপাতায় এমনি করিয়া তাহারা কতরকমের জিনিসে যে দোহাইয়া নিল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তথাপি দুধে কম পড়ে নাই।

পৃথিবীও বাঁচিয়া গেল। এত জিনিস যাহার কাছে পাওয়া যায়, তাহাকে কি বুদ্ধিমান লোকে মারে? কাজেই পৃথু তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন।

পৃথু তাহাকে প্রাণদান করিয়াছিলেন, তাই আজও পৃথিবী বাঁচিয়া আছে —আর, প্রাণ দিয়াছিলেন বলিয়াই পৃথু পৃথিবীর পিতার তুল্য হইলেন। সেইজন্যই পৃথিবীকে পৃথুর কন্যা বলা হয়, আর তাহার নাম হইয়াছে 'পৃথিবী' বা 'পৃথ্বী'।

যাহা হউক, পৃথিবীর নামের অন্যরূপ অর্থও দেখা যায়। পৃথ্বী বলিতে খুব বড়ও বুঝায়। পৃথিবী যে খুবই বড় তাহাও তো আমরা দেখিতেই পাইতেছি। সুতরাং পৃথিবী নাম যথার্থই হইয়াছে।

সন্দেশ—বৈশাখ ১৩২০

প্রথম কবি ও প্রথম কাব্য

তমসা নদীর ধারে বাল্মীকি মুনির তপোবন ছিল। দুধারে গভীর বন ; তাহার মাঝখান দিয়া সুন্দর ছোট নদীটি কুলকুল করিয়া বহিতেছে। তাহার জল এতই পরিষ্কার যে তলার বালি অবধি স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। একটুও কাদা নাই, একগাছিও শ্যাওলা নাই। কাচের মতো টলমল করিতেছে।

বাল্মীকি নদীর ধারে বেড়াইতে আসিলেন, আর সেই নির্মল জল দেখিয়া তাঁহার মনে বড়ই সুখ হইল। সঙ্গে তাঁহার শিষ্য ভরদ্বাজ ছিলেন, তাঁহাকে তিনি বলিলেন, "দেখ ভরদ্বাজ, নদীর জল কি নির্মল, যেমন সাধু লোকের মন। আমার বল্কল দাও, আমি এইখানে স্নান করিব।"

সেইখানে দুটি বক নদীর ধারে খেলা করিতেছিল। এমন সুন্দর দুটি পাখি, এবং তাহাদের এমন মিষ্ট ডাক, আর তাহারা মনের আনন্দে এমনি চমৎকার খেলা করিতেছিল যে দেখিয়া মুনি আর চোখ ফিরাইতে পারিলেন না। পাখি দুটির উপরে মুনির কেমন স্নেহ জন্মিয়া গেল, তিনি স্নানের কথা ভুলিয়া কেবলই তাহাদের খেলা দেখিতে লাগিলেন।

এমন সময় কোথা হইতে এক দুষ্ট ব্যাধ আসিয়া পাখি দুটির পানে তীর ছুঁড়িয়া মারিল। এমন সুখে পাখি দুটি খেলা করিতেছিল, তাহাদের কোনো দোষ ছিল না, কোনো বিপদের কথা তাহারা জানিত না। এমন নিরীহ জীবকে বধ করে এমন নিষ্ঠুরও লোক হয়? তীর খাইয়া পুরুষ পাখিটি যাতনায় ছটফট্ করিতে লাগিল, মেয়েটি শোকে আর ভয়ে কাঁদিয়া আকুল হইল। মুনি আর এ দুঃখ সহিতে না পারিয়া ব্যাধকে বলিলেন, "ওরে ব্যাধ, এমন সুখে পাখিটি খেলা করিতেছিল, তাহাকে তুই বধ করিলি? তোর কখনই ভালো হইবে না!"

দয়ালু মুনির মনের দুঃখ তাঁহার চোখের জলের সঙ্গে সঙ্গে এই কথা-গুলির ভিতর দিয়া ফুটিয়া বাহির হইল।

সেই কথায় আপনা হইতেই ছন্দ আসিয়া আপনা হইতেই তাহা কবিতা হইয়া গেল। সেই কবিতাই সকলের প্রথম কবিতা, তাহার পূর্বে কেহ কবিতা রচনা করে নাই।

মুনি আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, "এ কি চমৎকার কথা আমি বলিলাম! আমি কিছুই জানি না, তবু ইহাতে বীণার ছন্দের মতন কেমন সুন্দর ছন্দ হইল! ইহার চারিভাগে সমান সমান অক্ষর হইল! আমি বলি ইহার নাম 'শ্লোক' হউক, কেননা আমার শোকের সময় ইহা আমার মুখ দিয়া বাহির হইয়াছে।"

ভরদ্বাজও বলিলেন, "গুরুদেব! কি সুন্দর কথা, এমন কথা তো আর কেহ কখনো বলে নাই। ইহার নাম শ্লোকই হউক।"

তারপর মুনি স্নান শেষ করিয়া ঘরে আসিয়া সেই পাখির আর সেই সুন্দর ছন্দের কথা ভাবিতেছেন, এমন সময় ব্রহ্মা আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। পাখি দুইটির দুঃখে কাতর হইয়া মুনি আর ব্রহ্মাকে অন্য কথা বলিবার অবসর পাইলেন না, তাঁহাকে সেই দুষ্ট ব্যাধের কথা বলিয়া সেই কবিতাটি গাহিয়া শুনাইলেন।

তাহা শুনিয়া ব্রহ্মা বলিলেন, "বাল্মীকি, তোমার এ কবিতার নাম শ্লোকই হউক। এইরূপ শ্লোক লিখিয়া তুমি রামের বৃত্তান্ত বর্ণনা কর। সে বড় সুন্দর কাহিনী, তাহা যে পড়িবে তাহারই মঙ্গল হইবে। তুমি যাহা লিখিবে তাহার একটি কথাও মিথ্যা হইবে না। যতদিন পৃথিবীতে পর্বত আর নদী

সকল থাকিবে, ততদিন লোকে তোমার 'রামায়ণে'র আদর করিবে ; আর যতদিন রামায়ণের আদর থাকিবে, তুমি স্বর্গে গিয়া ততদিন আমার লোকে থাকিতে পাইবে।"

এই বলিয়া ব্রহ্মা চলিয়া গেলেন, আর তাঁহার কথাগুলি মনে করিয়া বাল্মীকি বলিলেন, "এইরূপ মিষ্ট শ্লোক দিয়া আমি রামায়ণ রচনা করিব।"

তারপর সেই ধার্মিক মুনি কুশাসনে বসিয়া জোড়হাতে ভগবানকে স্মরণপূর্বক রামায়ণ লিখিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে রামায়ণ শেষ হইল। তখন মুনি ভাবিলেন, 'কাব্য তো শেষ হইল, এখন ইহা গাহিবে কে? ঠিক সেই সময়ে 'কুশী' 'লব' দুই ভাই আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। দুটি ভাই রামেরই পুত্র, মুনির বেশে সেই আশ্রমে থাকিয়া লেখাপড়া শিখেন। দেবতার মতন সুন্দর ; গন্ধর্বের মতন মিষ্ট গান গাহেন। মুনি বলিলেন, "এই আমার রামায়ণের উপযুক্ত গায়ক।"

সেই দুটি ভাইকে পরম যত্নের সহিত মুনি রামায়ণ শিক্ষা দিলেন। তারপর একদিন সকল মুনিদিগকে সভায় ডাকিয়া সেই রামায়ণের গান তাঁহাদিগকে শোনান হইল। মুনিরা সকলে মোহিত হইয়া সে গান শুনিলেন, তাঁহাদের চোখ দিয়া দরদর ধারে জল পড়িতে লাগিল, আর মুখ দিয়া ক্রমাগত কেবল "আহা!" "আহা!" এই শব্দ বাহির হইতে লাগিল। শেষে তাঁহারা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। একজন মুনি তাঁহার নিকটে যাহা কিছু ছিল সকলই কুশী-লবকে দিয়া দিলেন। অন্যেরা কেহ বল্কল, কেহ হরিণের ছাল, কেহ কমণ্ডলু, কেহ কুড়াল, কেহ কৌপীন দিলেন। একজন মুনি কাঠ আনিতে চাহিয়াছিলেন, সেই কাঠ বাঁধিবার দড়িগাছি ভিন্ন তাঁহার নিকটে আর কিছুই ছিল না ; তিনি সেই দড়িগাছিই কুশীলবকে দিয়া বারবার আশীর্বাদ করিলেন।

সন্দেশ—বৈশাখ ১৩২০

ত্রিপুর

দেবতাদের সঙ্গে অসুরদের ভয়ানক শত্রুতা ছিল। দিনরাতই কেবল ইহাদের মারামারি চলিত, তাহাতে অনেক সময় অসুরেরাও হারিত, অনেক সময় দেবতারাও হারিতেন। দেবতারা অসুরদের জ্বালায় অস্থির থাকিতেন, আবার অসুরেরা তপস্যা করিলে তাহাদিগকে বর না দিয়াও পারিতেন না। বর দিয়া তারপর তাহার ধাক্কা সামলাইতে তাঁহাদের প্রাণান্ত হইত।

একটা অসুর ছিল তাহার নাম ময়। জাদু, মায়া, ভেলকিবাজি যত আছে, ময় তাহার সকলই জানিত, আর তাহার জোরে সময় সময় দেবতাদিগকে ভারি নাকাল করিত।

একবার যুদ্ধে হারিয়া ময় তপস্যা করিতে লাগিল ; বিদ্যুন্মালী আর তারক নামে আর দুইটা অসুরও তাহার দেখাদেখি তপস্যা আরম্ভ করিল।

তাহারা উপবাস করিয়া শীতে ভুগিয়া, বৃষ্টিতে ভিজিয়া এমনি আশ্চর্য তপস্যা করিল যে, ব্রহ্মা আর তাহাদের কাছে না আসিয়া থাকিতে পারিলেন না।

ব্রহ্মা বলিলেন, "বাপুসকল, আমি তোমাদের তপস্যায় বড়ই তুষ্ট হইয়াছি, এখন, কি বর লইবে বল।"

তখন ময় জোড়হাতে মিষ্ট কথায় তাঁহাকে বিনয় করিয়া বলিল, "প্রভু, দেবতারা আমাদিগকে মারিয়া ধরিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে, এখন আমরা কোথাও একটু থাকিবার জায়গা পাইতেছি না। দয়া করিয়া আমাকে এমন বর দিন, যাহাতে আমি একটি খুব ভালো দুর্গ প্রস্তুত করিতে পারি। সে দুর্গের ভিতরে বসিয়া থাকিলে আর কেহই যেন আমাকে কিছু করিতে না পারে।"

ব্রহ্মা বলিলেন, "একেবারে কেহই কিছু করিতে পারিবে না, এমন কি হয় ?"

ময় বলিল, "তাহা যদি না হয়, তবে এই বর দিন, যে একমাত্র শিব ছাড়া আর কেহ সে দুর্গ নষ্ট করিতে পারিবে না ; আর শিবকেও একটিমাত্র বাণ মারিয়া সে কাজ করিতে হইবে।"

তখন ব্রহ্মা বলিলেন, "আচ্ছা তাহাই হইবে।" এই বলিয়া ব্রহ্মা চলিয়া গেলেন, ময়ও যারপরনাই খুশি হইয়া দুর্গ প্রস্তুত করিতে লাগিল।

ময় বলিল, "আমি এমন দুর্গ বানাইব যে, তাহা তিন ভাগ হইয়া তিন জায়গায় থাকিবে। তাহা হইলে আর এক বাণে তাহাকে নষ্ট করা যাইবে না। খালি, একদিন সেই তিনটি ভাগ একত্র হইবে—যেদিন চন্দ্র আর সূর্য একসঙ্গে পুষ্য নক্ষত্রে থাকিবেন। সেইদিন যদি শিব আসিয়া বাণ মারেন, তবেই আমার এই দুর্গ তিনি নষ্ট করিতে পারিবেন, নহিলে নয়।"

এমনি করিয়াই সে তাহার দুর্গ প্রস্তুত করিল। পৃথিবীর উপরে করিল একটি লোহার দুর্গ : সেটা তারকের জন্য। স্বর্গে করিল একটা রুপার দুর্গ ; সেটা বিদ্যুন্মালীর জন্য। আর স্বর্গেরও উপরে একটা সোনার দুর্গ, সেটা করিল তাহার নিজের থাকিবার জন্য। এইরূপে তিনটি পুরী মিলিয়া দুর্গটি প্রস্তুত হইল, তাই তাহার নাম হইল ত্রিপুর।

তেমন দুর্গ আর কেহ কখনো দেখে নাই। যেমন বড়, তেমনি মজবুত, তেমনি সুন্দর! মাঠ, বাগান, পথ ঘাট, হাট বাজার, নদী পুকুর সকলই তাহার ভিতর আছে, কোনো জিনিসের জন্যই দুর্গের বাহিরে যাইতে হয় না। অসুরেরা যে যেখানে ছিল, খবর পাইয়া সকলে আসিয়া সেই দুর্গে বাস করিতে লাগিল। তাহাদের আর আনন্দের সীমা নাই। আর তাহাদের কিসের ভয় ?

তখন তাহাদের সাহস বাড়িয়া গেল। এতদিন দেবতাদের ভয়ে ঝোপে জঙ্গলে লুকাইয়া ছিল, এখন আবার সুবিধা পাইয়া তাঁহাদের সঙ্গে খোঁচা-খুঁচি আরম্ভ করিল। কোনোদিন স্বর্গের বাগান ভাঙ্গে, কোনোদিন দেবতাদের বাড়িতে গিয়া ঝগড়া করে, কোনোদিন মুনি-ঋষিদিগের তপস্যা মাটি করিয়া দেয়।

ময় নিজে তেমন মন্দ লোক ছিল না কিন্তু অসুরেরা তাহার কথা শুনিলে তো ? তাহারা দল বাঁধিয়া সংসারময় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। যাহাকে পায়,

তাহাকেই ধরিয়া মারে ; তাহাদের ভয়ে লোকে স্থির হইয়া ঘরে থাকিতে পারে না।

তখন সকলে ব্রহ্মার নিকটে গিয়া জোড়হাতে বলিল, "হে পিতামহ। আপনি তো অসুরদিগকে বর দিয়াছেন, এখন আমাদের কি উপায় হইবে? অসুরের জ্বালায় আমাদের প্রাণে বাঁচাই যে ভার হইয়াছে। আপনি যদি ইহাদের শাসন না করেন, তবে আর সংসারে দেবতা, মানুষ বা জীবজন্তু কিছুই থাকিবে না।"

ব্রহ্মা বলিলেন, "তোমরা ব্যস্ত হইও না। আমি বর দিয়াছি বটে কিন্তু উপায়ও রাখিয়া দিয়াছি। উহাদের ঐ দুর্গ একটি বাণেই ভাঙিয়া ফেলা যায়। কিন্তু তাহা তোমরা পারিবে না। চল শিবের কাছে যাই। তিনিই এ কাজের উপযুক্ত লোক।"

শিব তাঁহার ঘরে বসিয়া আছেন, এমন সময় তেত্রিশ কোটি দেবতা সকলে মিলিয়া তাঁহার নিকটে আসিয়া জোড়হাতে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন।

শিব বলিলেন, "তোমরা কি জন্য আসিয়াছ? বল আমি তোমাদের কি উপকার করিতে পারি ; এখনি তাহা করিব।"

দেবতারা বলিলেন, "অসুরেরা তো আর আমাদের কিছু রাখিল না, এখন আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন। আমাদের বাড়ি বাগান সব ভাঙিয়া দিয়াছে, হাতি ঘোড়া ধরিয়া নিয়াছে, ধনরত্ন লুট করিয়াছে, এরপর প্রাণে মারিবে। দোহাই ঠাকুর। আমাদিগকে রক্ষা করুন।"

তাহা শুনিয়া শিব বলিলেন, "তোমাদের কোনো ভয় নাই, আমি ত্রিপুর দুর্গ পোড়াইয়া দিতেছি। একখানা ভালোরকম রথ আন তো।"

এ কথায় দেবতারা সকলে মিলিয়া সংসারের সকল ভয়ংকর আর আশ্চর্য জিনিস দিয়া, এমনি চমৎকার এক রথ প্রস্তুত করিলেন সে কি বলিব। রথের দিকে চাহিয়া শিব অনেকক্ষণ ধরিয়া খালি 'বাঃ! বাঃ!' এইরূপই করিতে লাগিলেন। তারপর তিনি বলিলেন, "বেশ রথ হইয়াছে। এখন ইহার উপযুক্ত একটি সারথি চাই।"

দেবতারা তো বড়ই সংকটে পড়িলেন। এমন রথের সারথি তো যেমন তেমন হইলে চলিবে না—হায় এখন সারথি কোথায় পাই?

তখন ব্রহ্মা বলিলেন, "চিন্তা কি? আমিই সারথি হইব।" এই বলিয়া ব্রহ্মা যখন রথে উঠিয়া রাশ ধরিয়া বসিলেন তখন সকলের কী আনন্দই হইল। শিবও তখন যারপরনাই সুখী হইয়া বলিলেন, "এইবার ঠিক সারথি হইয়াছে।"

সেই রথে চড়িয়া শিব যুদ্ধ করিতে চলিলেন, সঙ্গে দেবতা গন্ধর্ব সকলে জয় জয় শব্দে ছুটিয়া চলিল। ষাঁড়ে চড়িয়া নন্দী চলিল, ময়ূরে চড়িয়া কার্তিক চলিলেন, ঐরাবতে চড়িয়া ইন্দ্র চলিলেন, সাপে চড়িয়া বরুণ চলিলেন, মহিষে চড়িয়া যম চলিলেন। শিবের যত ভূত, তাহারাও শিবের রথ ঘিরিয়া গর্জন করিতে করিতে চলিল, হাতির মতো, পাহাড়ের মতো তাহাদের শরীর, মেঘের মতো তাহাদের ডাক।

এদিকে অসুরেরা এ-সকল দেখিয়া-শুনিয়া বড়ই ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে।

ময় তাড়াতাড়ি অসুরদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, "সাবধান, সাবধান। ঐ দেখ দেবতারা যুদ্ধ করিতে আসিতেছে। দেখিয়ো, যেন উহাদিগকে সহজে ছাড়িয়ো না।"

এমনি করিয়া ক্রমে দেবতা আর অসুরদিগের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অসুরগুলি দেখিতে যেমন ভয়ংকর, শিবের ভূতসকলও তেমনি বিকট; আর তাহাদের যুদ্ধও হইল বড়ই সাংঘাতিক। অসুরেরা মনে করে যে তাহারা দেখিতে ভারি সুন্দর, তাই ভূতগুলির জানোয়ারের মতো মুখ দেখিয়া, তাহারা আর হাসি রাখিতে পারে না।

সেই ভূতদের সঙ্গে খানিক যুদ্ধ করিলেই আবার তাহাদের সে হাসি শুকাইয়া যায়। তবুও অসুরেরা যেমন তেমন যুদ্ধ করে নাই। ময় আর তারক দুজনে নানারূপ মায়া খেলাইয়া ভূত আর দেবতা সকলকেই যারপরনাই ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। কোথা হইতে যে তাহারা যত রাজ্যের আগুন, আর বৃষ্টি, আর ঝড়, আর বাঘ, আর সাপ, আর কুমীর আনিয়া দেবতাদের উপর ফেলিতে লাগিল, তাহা কেহই বুঝিতে পারিল না। তথাপি ক্রমে দেবতাদেরই জয় হইতে লাগিল, নন্দীর হাতে বিদ্যুন্মালী মারা গেল, আর সকল অসুরই কাবু হইয়া পড়িল। তখন ময় দেখিল যে এখন একবার দুর্গের ভিতরে গিয়া একটু বিশ্রাম না করিলে আর চলিতেছে না।

দুর্গের ভিতরে আসিয়া ময় ভাবিতেছে, এখন উপায় কি হয়? এমন দুর্গ করিয়াও দেবতাদের হাতে শেষে এত নাকাল হইতে হইল। বলিতে বলিতে চট্ করিয়া তাহার মাথায় বুদ্ধি জোগাইয়াছে, আর অমনি সে মায়ার বলে দুর্গের ভিতরে এক আশ্চর্য পুকুর তৈয়ার করিয়া ফেলিয়াছে। সে পুকুরের জল অমৃত, সে জল একবার খাইলে বা তাহাতে স্নান করিলে মরা যে সেও বাঁচিয়া উঠে।

তখন আর কিসের ভয়? যত অসুর মরে, সকলকেই আনিয়া সেই পুকুরে স্নান করায়। এমনি করিয়া তাহারা বিদ্যুন্মালীকে আবার বাঁচাইয়া তুলিল, আর কত মরা অসুর যে বাঁচাইল তাহার তো লেখা-জোখাই নাই। বাঁচিয়া উঠিয়াই তাহারা আবার বলিল, "কোথায় গেল শিব? কোথায় নন্দী? কোথায় দেবতা? কোথায় ভূত? মার তাহাদের সকলকে।"

এবারে দেবতারা বড়ই সংকটে পড়িলেন। যত অসুর মারেন, সকলেই খানিক পরে আবার আসিয়া যুদ্ধ করিতে থাকে। একি আশ্চর্য ব্যাপার। মরিয়াও মরে না, বরং তাহাদের গায়ের জোর যেন আরো বাড়িয়া যায়। দেবতাগণ আর ভাবিয়া পথ পাইতেছেন না।

এমন সময় শিবের একটা ভূত ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "কর্তা, অসুর মারিয়া আর কি হইবে? এদের ঘরে পুকুর আছে, তাহার জলে চোবাইলে মরাটি চাঙ্গা হয়।"

অসুরেরা তখন বড়ই ভয়ানক যুদ্ধ করিতেছিল। দেবতারা একে ইহাদের জ্বালায় অস্থির, তাহাতে আবার শিবের রথের চাকা মাটিতে বসিয়া গিয়াছে,

সকলে প্রাণপণে টানাটানি করিয়াও তাহাকে তুলিতে পারিতেছেন না। তখন যদি বিষ্ণু তাড়াতাড়ি এক বিশাল ষাঁড় সাজিয়া শিং দিয়া সেই রথ না উঠাইতেন, তবে না জানি সেদিন কি সর্বনাশই হইত। ইহারই মধ্যে তারকাসুর ঝড়ের মতো ছুটিয়া আসিয়া ব্রহ্মাকে এমনি গুঁতো মারিয়াছিল যে, তিনি হাতের রাশ রথে ফেলিয়া কেবলই হাঁপাইতেছিলেন।

এদিকে বিষ্ণু রথখানিকে শিং দিয়া উঠাইয়া দিয়াই অসুরদিগের দুর্গের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছেন। অসুরেরা তাঁহার বিশাল দেহ আর শিং নাড়া দেখিয়া আর গর্জন শুনিয়া, আর তাঁহাকে আটকাইতে সাহসই পাইল না। তিনি ছুটিতে ছুটিতে সেই পুকুরে গিয়া চোঁ চোঁ শব্দে তাহার সমস্ত জল খাইয়া ফেলিলেন।

ইহার পর আর অসুরেরা ভূতদের সঙ্গে কিছুতেই পারিয়া উঠিল না; তাহারা ঢিপ্ ঢাপ্ ভূতের কিল খাইতে খাইতে ছুটিয়া দুর্গের ভিতরে ঢুকিয়া গেল। তাহা দেখিয়া সকলে হাততালি দিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "কোথায় শিব? কোথায় দেবতা? কোথায় ভূত? মার সকলকে।"

তখন আর অসুরেরা ভূতের ভয়ে স্থির থাকিতে না পারিয়া তাহাদের দুর্গসুদ্ধ সমুদ্রের উপরে চলিয়া গেল। কিন্তু দেবতারা তাহাদিগকে এত সহজে ছাড়িবেন কেন? তাঁহারা সেইখানে গিয়া আবার তাহাদের সঙ্গে বিষম যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। দেখিতে দেখিতে তারকাসুর নন্দীর হাতে মারা গেল, বিদ্যুন্মালীরও সেই দশা হইতে আর অধিক বিলম্ব হইল না।

তারপর ক্রমে সেই সময় আসিয়া উপস্থিত হইল, যখন চন্দ্র আর সূর্য একসঙ্গে পুষ্যা নক্ষত্রে আসিবেন। সেই পুণ্যযোগে ত্রিপুর দুর্গের তিনটি ভাগও এক জায়গায় আসিয়া মিলিবার কথা। তখন তাহার উপরে শিবের বাণ পড়িলে, এক বাণেই সেই দুর্গ নষ্ট হইয়া যাইবে। শিব তাহার জন্যই ধনুর্বাণ লইয়া প্রস্তুত আছেন। ঠিক সময়টি উপস্থিত হইবামাত্র ভীষণ শব্দে তিনি সেই বাণ ছাড়িয়া দিলেন, অমনি তাহা আকাশ পাতাল আলো করিয়া অসুর-দিগের দুর্গের উপর গিয়া পড়িল। সে বাণের তেজ এমনি ছিল যে দুর্গের উপরে তাহা পড়িবমাত্রই দেখিতে দেখিতে সেই দুর্গ পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল!

এইরূপে ত্রিপুর দুর্গের শেষ হইল। অসুরেরা আর সকলেই তাহার সঙ্গে পুড়িয়া মরিয়াছিল, কেবল ময় মরে নাই। সে শিবের ভক্ত ছিল, তাই শিব দয়া করিয়া নন্দীকে পাঠাইয়া আগেই তাহাকে সাবধান করিয়া দেন। নন্দীর কথায় সে তাহার থাকিবার ঘরখানি সুদ্ধ পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইয়াছিল।

সন্দেশ—শ্রাবণ ১৩২০

মহিষাসুর

একটা ভারি ভয়ংকর অসুর ছিল। সে মহিষ সাজিয়া বেড়াইত, তাই সকলে তাকে বলিত মহিষাসুর।

দেবতারা কিছুতেই মহিষাসুরকে আঁটিতে পারিতেন না। একশত বৎসর ধরিয়া তাঁহারা তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিলেন, তাহাতে সে তাঁহাদিগকে হারাইয়া স্বর্গ হইতে তাড়াইয়া দিয়া নিজে আসিয়া ইন্দ্র হইল।

দেবতারা তখন আর কি করেন? তাঁহারা ব্রহ্মাকে সঙ্গে করিয়া মহাদেব আর বিষ্ণুর নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন, বলিলেন, "হে প্রভু, মহিষাসুর তো আমাদের বড়ই দুর্দশা করিয়াছে, আমাদিগকে যুদ্ধে হারাইয়া স্বর্গ হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে ; এখন আপনারা যদি আমাদিগকে রক্ষা না করেন, তবে আমাদের উপায় কি হইবে?"

অসুরদের অত্যাচারের কথা শুনিয়া শিব এবং বিষ্ণুর বড়ই রাগ হইল। সেই রাগে তাঁহাদের আর সকল দেবতাদের শরীর হইতে এমন একটা তেজ বাহির হইল যে সে বড়ই আশ্চর্য ; মনে হইল যেন একটা আগুনের পর্বত আকাশ পাতাল ছাইয়া সকলের সামনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। দেখিতে দেখিতে সেই তেজ জমাট বাঁধিয়া একটি দেবীর মতো হইল।

তাহাকে দেখিয়া দেবতাদিগের আনন্দের আর সীমা রহিল না। তাঁহারা সকলে মিলিয়া কেহ অস্ত্র, কেহ বস্ত্র, কেহ বর্ম, কেহ অলংকার আনিয়া তাঁহাকে দিতে লাগিলেন। হিমালয় বিশাল একটি সিংহ আনিয়া তাঁহার বাহন করিয়া দিলেন।

দেবীর হাজারখানি হাতে দশদিক ছাইয়া গিয়াছে, তাঁহার মুকুট আকাশ ভেদ করিয়া উঠিয়াছে, তাঁহার ভারে পৃথিবী বসিয়া পড়িয়াছে, ধনুর শব্দে আকাশ পাতাল কাঁপিতেছে। তিনি যখন হাজার হাতে হাজার অস্ত্র লইয়া গর্জন করিলেন, তখন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড কাঁপিয়া উঠিল ; অসুরেরা সেই গর্জন শুনিয়া ছুটিয়া আসিল।

তারপর কি যেমন তেমন যুদ্ধ হইল? মহিষাসুর নিজে যেমন ভয়ংকর, তাহার এক-একটি সেনাপতিও তেমনি। তাহাদের একটার নাম চিক্ষুর, আর-একটার নাম চামর, আরগুলির নাম উদগ্র, মহাহনু, অসিলোমা, বাস্কল, পারি-বারিত আর বিড়ালাক্ষ। এই-সকল সেনাপতি আর কোটি কোটি অসুর লইয়া মহিষাসুর দেবীর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আসিল। সকলে মিলিয়া অস্ত্র যে কত ছুঁড়িল তাহার সীমা সংখ্যা নাই। কিন্তু সে অস্ত্রে দেবীর কিছুই হইল না। তাঁহার এক-এক নিশ্বাসে হাজার হাজার ভূত উপস্থিত হইয়া অসুরের দলকে ঠেঙাইয়া ঠিক করিতে লাগিল। দেবীর সিংহও আঁচড়-কামড় দিয়া তাহাদিগকে কম নাকাল করিল না। আর দেবীর নিজের তো কথাই নাই! তাঁহার হাজার হাতে হাজার অস্ত্র ; সে অস্ত্রে তিনি অসুরদিগকে কাটিয়া, ফুঁড়িয়া, পিষিয়া, পুঁতিয়া শেষ করিতে লাগিলেন। সেনাপতিগুলির কোনোটা দেবীর অস্ত্রের ঘায়ে,

কোনোটা তাঁহার কিলে আর চাপড়ে, কোনোটা-বা সিংহের কামড়ে মারা গেল। তখন আর মহিষাসুর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। সে শিং নাড়িয়া, লেজ ঘুরাইয়া, গর্জন করিতে করিতে দেবীর ভূতগুলিকে এমনি তাড়া করিল যে তাহারা পলাইতে পারিলেই বাঁচিত, কিন্তু বাঁচিতে পারিলে তো পলাইবে! দেখিতে দেখিতে সে ভূতের দলকে শেষ করিয়া দেবীর সিংহের পানে ছুটিয়াছে, তাহার লেজের তাড়ায় সাগর লন্ডভন্ড, শিংএর নাড়ায় মেঘ সব খন্ড খন্ড হইতেছে, নিশ্বাসের চোটে পাহাড় পর্বত উড়িয়া যাইতেছে। এমন সময় দেবীর পাশ অস্ত্র আসিয়া তাহাকে এমনি বাঁধন বাঁধিল যে আর তাহার নড়িবার শক্তি নাই! কিন্তু, অসুরের মায়া, সে কি সহজ কথা? চোখের পলকে মহিষটা সিংহ হইয়া বাঁধন ছাড়াইয়া আসিল! দেবী তখনই সেই সিংহকে কাটিলেন। অমনি দেখা গেল যে আর সিংহ নাই, তাহার জায়গায় খড়্গ হাতে একটা মানুষ খেপিয়া আসিতেছে। মানুষ কাটা যাইতে না যাইতেই কোথা হইতে এক হাতি আসিয়া দেবীর সিংহকে শুঁড় দিয়া জড়াইয়া বসিয়াছে। দেবী খড়্গ দিয়া হাতির শুঁড় কাটিলেন, অমনি হাতি আবার মহিষ হইয়া গেল, সেটা আবার শিং দিয়া দেবীকে পর্বত ছুঁড়িয়া মারে। দেবী এক লাফে সেই মহিষের ঘাড়ে চড়িয়া তাহাকে এমনি শূলের ঘা মারিলেন যে তখন অসুর মহাশয়কে সেই মহিষের ভিতর হইতে বাহির হইতেই হইল। কিন্তু তখনো তাহার তেজ কমে নাই, সে আধাআধি বাহির হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছে!

যাহা হউক, যুদ্ধ আর তাহার বেশিক্ষণ করিতে হইল না। কেননা, দেবী সেই মুহূর্তেই খড়্গ দিয়া তাহার মাথা কাটিয়া ফেলিলেন।

তখন তো দেবতাগণের খুব আনন্দ হইবেই। তাঁহারা দেবীকে প্রণাম করিয়া তাঁহার অনেক স্তবস্তুতি করিলেন।

দেবী তাহাতে তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "তোমরা কি বর চাও?"

দেবগণ বলিলেন, "আবার কি বর চাহিব? মহিষাসুর মরিয়াছে। তাহাতেই আমাদের ঢের হইয়াছে। এখন শুধু এইটুকু বল যে আমাদের আবার যদি বিপদ হয় তখন ডাকিলে আসিবে।"

দেবী বলিলেন, "আচ্ছা, আমি আসিব।"

এই বলিয়া তিনি আকাশে মিলাইয়া গেলেন।

অসুর যতদিন আছে, ততদিন দেবতাদিগের বিপদ হওয়ার আর ভাবনা কি?

কাজেই বুঝিতেই পার যে দেবীকে শীঘ্রই আবার তাঁহাদের ডাকে আসিতে হইয়াছিল।

সন্দেশ—ভাদ্র ১৩২০

শুম্ভ, আর তাহার ভাই নিশুম্ভ, এই দুটা অসুর দেবতাদিগকে বড়ই নাকাল করিয়াছিল। তাহারা তাঁহাদিগকে স্বর্গ হইতে তাড়াইয়া দিয়া আর অস্ত্র-শস্ত্র কাড়িয়া লইয়াই সন্তুষ্ট থাকে নাই, তাঁহাদের ব্যবসায় পর্যন্ত নিজেরা করিতে আরম্ভ করিল। চন্দ্র, সূর্য, কুবের, পবন, অগ্নি কাহারও ব্যবসাই তাঁহাদের হাতে রাখিল না।

বিপাকে পড়িয়া দেবতারা বলিলেন, "আর কাহার কাছে যাইব। মহিষাসুরের হাত হইতে যে দেবী আমাদিগকে বাঁচাইয়াছিলেন; সেই চণ্ডিকা দেবীকেই ডাকি।" এই বলিয়া তাঁহারা হিমালয় পর্বতে গিয়া চণ্ডিকা দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন। সেই সময় পার্বতী সেই পথে যাইতেছিলেন, তিনি দেবতাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা কাহার স্তব করিতেছেন?" তাঁহার কথা শেষ হইতে-না-হইতেই তাঁহার শরীর হইতে চণ্ডিকা দেবী বাহির হইয়া বলিলেন, "দেবতারা আমাকেই ডাকিতেছেন, শুম্ভ-নিশুম্ভ তাঁহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছে।" এই বলিয়া চণ্ডিকা দেবী যারপরনাই সুন্দর একটি মেয়ে সাজিয়া হিমালয় পর্বতে বসিয়া রহিলেন।

চণ্ড আর মুণ্ড নামে দুটা অসুর সেইখানে কি করিতে আসিয়াছিল, তাহারা সেই মেয়েটিকে দেখিতে পাইয়া শুম্ভকে গিয়া বলিল যে, "মহারাজ, হিমালয় পর্বতে কি আশ্চর্য সুন্দরী একটি মেয়েকে দেখিয়া আসিয়াছি, কি বলিব। এমন আর কেহ কখনো দেখে নাই। মহারাজ, সংসারে যত ভালো ভালো জিনিস, সব আপনারা আনিয়াছেন, কিন্তু এই মেয়েটিকে রানী করিতে না পারিলে সবই মাটি।"

এ কথা শুনিয়া শুম্ভ তখনই সুগ্রীব নামে একটা অসুরকে ডাকিয়া বলিল, "সুগ্রীব, শীঘ্র যাও। যেমন করিয়া পার সেই মেয়েটিকে খুশি করিয়া এখানে লইয়া আইস।"

সুগ্রীব হিমালয়ে গিয়া দেবীকে বিশেষ করিয়া বুঝাইতে লাগিল "আমার প্রভু যে শুম্ভ আর নিশুম্ভ, তাঁহাদের মতন আর জগৎ-সংসারে কেহই নাই। হে দেবি, ইঁহাদের একজনকে বিবাহ করিলে তোমার আর সুখের সীমা থাকিবে না।"

দেবী বলিলেন, "আহা। তুমি বড় ভালো কথা বলিয়াছ, তোমার যে প্রভু, তাঁহাদের মতন আর কোথাও কেহ নাই। কিন্তু আমার ছেলেমানুষী খেয়াল হইয়াছে, আমাকে যুদ্ধে হারাইতে না পারিলে কেহ আমাকে বিবাহ করিতে পারিবে না। তোমার প্রভুকে গিয়া বল শীঘ্র আসিয়া আমাকে যুদ্ধে হারাইয়া বিবাহ করুন।"

এ কথা শুনিয়া শুম্ভ কি ভয়ানক চটিল, বুঝিতে পার। সে অমনি তাহার সেনাপতি ধূম্রলোচনকে বলিল, "যাও তো ধূম্রলোচন, সেই ঠেঁটা মেয়েটাকে চুলে ধরিয়া নিয়া আইস।" ধূম্রলোচন অনেক লোক লইয়া ভারি

ঘটা করিয়া দেবীকে আনিতে গেল। কিন্তু সে তাঁহাকে ধরিয়া আনিবে কি, তিনি কেবল একটিবার 'হুঁ' করিয়া তাহার দিকে চাহিবামাত্রই পুড়িয়া ছাই, তাহার সঙ্গে আর যত অসুর আসিয়াছিল, দেবীর সিংহই তাহাদিগকে শেষ করিয়া দিল।

তখন শুম্ভ আরো অনেক সৈন্য, রথ, হাতি, ঘোড়া সঙ্গে দিয়া সেই চণ্ড আর মুণ্ডকে পাঠাইল। তাহারা খাঁড়া ঢাল হাতে হিমালয়ে গিয়া বিষম কাঁইমাঁই শব্দে যেই দেবীকে ধরিতে যাইবে অমনি দেবী ভ্রূকুটি করিয়া তাহাদের দিকে তাকাইলেন। ভ্রূকুটি করিবামাত্র তাঁহার কপাল হইতে আর একটি দেবতা বাহির হইয়া আসিলেন, তাঁহার নাম চামুণ্ডা। তাঁহার চেহারা বড়ই ভয়ংকর। রঙ কালো, চোখ লাল, শরীরে মাংস নাই, খালি হাড় আর চামড়া। হাঁ করিলে পাহাড় পর্বত গিলিয়া ফেলিতে পারেন, চ্যাঁচাইলে দেব দানব সকলের মাথা ঘুরিয়া যায়। চামুণ্ডা বাঘের ছাল পরিয়া, মানুষের মাথার মালা গলায় দিয়া গদা খড়্গ পাশ হাতে আসিয়াই অসুরদিগকে ধরিয়া মুড়ি-মুড়কির মতো মুখে পুরিতে লাগিলেন। হাতি, রথ, ঘোড়া, মাহুত, সারথি, অঙ্কুশ, জাঠা, গদা, যাহা হাতে উঠে, মনের সুখে চিবাইয়া খান, বাছিবার দরকার হয় না। অসুরদের যত অস্ত্র আসে, সব গিলিয়া ফেলেন, আর হি, হি, হি, হি করিয়া হাসেন। দেখিতে দেখিতে চামুণ্ডা সকল অসুর খাইয়া শেষ করিলেন। বাকি রহিল কেবল চণ্ড আর মুণ্ড! তাহাদের চুলে ধরিয়া মাথা কাটিতেও মুহূর্তেক মাত্র লাগিল।

ইহার পর শুম্ভ আর নিশুম্ভ নিজেই যুদ্ধ করিতে আসিল। তাহাদের সঙ্গে অতি ভয়ংকর ভয়ংকর অসুর যে কত আসিল, আর হাতি, ঘোড়া, রথ, অস্ত্র যে কতরকম আসিল, তাহার সীমা সংখ্যা নাই। আর যুদ্ধ যাহা হইল, তাহার কথা কি বলিব! দেবীর সঙ্গে চামুণ্ডা আছেন, আর অন্য দেবতারাও নানারকমে তাঁহাকে সাহায্য করিতেছেন, আর দেবীর সিংহ তো আছেই। সে সময়ে দেবী এমন বিকট হাসি হাসিতেছিলেন ; যে অনেক অসুর তাহাতেই মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যাইতেছিল, আর তখন চামুণ্ডার মতন দেবী নিজেও তাহাদিগকে ধরিয়া মুখে দিতেছিলেন। ইহার পর আর টিকিতে না পারিয়া অসুরেরা ছুটিয়া পলাইতে লাগিল।

অসুরদের মধ্যে একজন ছিল, তাহার নাম রক্তবীজ সে বেটা বড়ই ভয়ংকর ; তাহার এক বিন্দু রক্ত মাটিতে পড়িলেই সেখান হইতে একটা বিশাল অসুর দাঁত খিঁচাইয়া উঠিয়া দাঁড়ায়। সেই রক্তবীজকে লইয়া দেবী প্রথমে একটু মুশকিলে পড়িলেন। তাহাকে যত কাটেন, ততই রক্ত পড়ে, আর ততই হাজার হাজার অসুর উঠিয়া দাঁড়ায়। অসুরে ত্রিভুবন ছাইয়া গেল, তাহাদের চীৎকারে পাতালের লোক অবধি কালা হইয়া গেল। দেবতারা তো ভাবিলেন, সর্বনাশ বুঝি হয়।

তখন দেবী চণ্ডিকাকে বলিলেন, "এক কাজ কর। অসুরের গায়ে খোঁচা লাগিতে না লাগিতেই তাহার রক্ত চাটিয়া খাইবে। আর সেই রক্ত হইতে অসুর

হইতে-না-হইতেই তাহাকে গিলিয়া ফেলিবে।" চামুণ্ডা বলিলেন, "আচ্ছা"।
ইহার পর আর রক্তবীজের বেশি বাড়াবাড়ি করিতে হয় নাই। গিলিয়া খাইলে আর অসুর হইয়াই কি করিবে? কাজেই দেখিতে দেখিতে অসুরের দল কমিয়া গেল, রক্তবীজের গায়ের রক্তও ফুরাইয়া আসিল। এতক্ষণ সে ভয়ানক যুদ্ধ করিতেছিল, কিন্তু রক্ত ফুরাইয়া গেলে আর তাহার কিছু করিবার শক্তি রহিল না। দেখিতে দেখিতে দেবী নানা অস্ত্রে তাহাকে মারিয়া ফেলিলেন।

তখন বাকি রহিল কেবল শুম্ভ আর নিশুম্ভ। নিশুম্ভ খানিকক্ষণ খুব যুদ্ধ করিয়া অজ্ঞান হইয়া গেল। তারপর শুম্ভ একাই যুদ্ধ করিতে লাগিল। শুম্ভের আটটা হাত ছিল, গায়ে জোরও ছিল তেমনি ; সে যুদ্ধও করিল খুব। কিন্তু শেষে সেও অজ্ঞান হইয়া গেল।

ততক্ষণে নিশুম্ভের আবার জ্ঞান হইয়াছে। নিশুম্ভের দশহাজার হাত। সেই দশহাজার হাতে দশহাজার অস্ত্র লইয়া সে দেবীর সঙ্গে বিষম যুদ্ধ করিতে লাগিল। মরিবার সময়ও সে সহজে মরিল না। দেবী শূল দিয়া তাহার বুক ভেদ করিয়া ফেলিলেন, সেই বুকের ভিতর হইতে আবার 'দাঁড়া, দাঁড়া,' বলিয়া একটা বিকট অসুর বাহির হইয়া আসিল। যাহা হউক, সে ভালো করিয়া বাহির হইতে-না-হইতেই দেবী হাসিতে হাসিতে তাহার মাথা কাটিয়া ফেলাতে, বেচারা যুদ্ধ করিবার অবসর পায় নাই।

শুম্ভ ইহার মধ্যেই আবার উঠিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছে। ইহাই তাহার শেষ যুদ্ধ। সে অনেকক্ষণ ধরিয়া বিধিমতে দেবীকে মারিবার চেষ্টা করিল। একটি একটি করিয়া তাহার সকল অস্ত্রই দেবী কাটিয়া ফেলিলেন তারপর বাকি রহিল খালি কিল আর চাপড়। একবার দেবীর চাপড় খাইয়া সে চিৎ হইয়া পড়িয়া গিয়াছিল। কিন্তু তখনই আবার উঠিয়া দেবীকে ধরিয়া এক লাফে আকাশে উঠিয়া গেল। তারপর আকাশে থাকিয়াই দুজনের কম যুদ্ধ হইল না। যুদ্ধ করিতে করিতে দেবী তাহাকে বনবন করিয়া ঘুরাইয়া মাটিতে আছড়াইয়া ফেলিলেন ; তাহাতেও কি সে মরে? সে তখনই উঠিয়া কিল বাগাইয়া দেবীকে মারিতে চলিয়াছে। তখন দেবী তাঁহার শূল দিয়া তাহার বুকে এমনি ঘা মারিলেন যে তাহার পর আর তাহাকে উঠিতে হইল না।

তখন যে দেবতারা দেবীর স্তব খুব ভালো করিয়াই করিয়াছিলেন, তাহা আমি না বলিলেও তোমরা বুঝিয়া লইতে পারিবে। দেবী তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "তোমরা কি চাও?" দেবতারা বলিলেন, "এমনি করিয়া আমাদের শত্রুদিগকে বধ করিও।"

সন্দেশ—আশ্বিন ১৩২০

গণেশ

শিবের সঙ্গে যখন পার্বতীর বিবাহ হইল তখন পার্বতী কৈলাস পর্বতে আসিয়া ঘরকন্না করিতে লাগিলেন। শিব খেয়ালশূন্য লোক, তাহাতে আবার ভূতের দল নিয়া থাকেন—মেয়েরা বাড়িতে থাকিলে কেমন

করিয়া চলাফেরা করিতে হয়, সেদিকে তাঁহার নজর একটু কম। যখন তিনি তাঁহার ভূতদের নিয়া বাড়ির ভিতরে আসিয়া উপস্থিত হন, পার্বতী আর তাঁর সখীদের তাহাতে বড় অসুবিধা হয়! দরোয়ান নন্দী তাঁহাকে মানা করিলেও তিনি তাহা শোনেন না, তাঁহাকে ধমকাইয়া ঠিক করিয়া দেন।

পার্বতীর সখী জয়া আর বিজয়া ক্রমাগতই বলেন, "ইহারা সকলেই শিবের লোক, কাজেই তাঁহার ধমকে ভয় পায়। আমাদের নিজের একটি ভালো লোক হইলে বেশ হইত।" এ কথায় পার্বতী কাদা দিয়া যারপরনাই সুন্দর একটা খোকা তয়ের করিলেন, তাহার নাম হইল গণেশ। সেই খোকাটিকে তিনি সুন্দর পোশাক আর গহনা পরাইয়া দরোয়ান সাজাইয়া লাঠি হাতে দিয়া দরজায় বসাইয়া দিলেন। গণেশ জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে বসে আমি কি করব?" পার্বতী বলিলেন, "বাবা, তুমি এখানে দরোয়ান হবে, কাউকে ঢুকতে দিবে না।"

এই বলিয়া গণেশের মুখে বার বার চুমো খাইয়া, পার্বতী স্নান করিতে গেলেন আর তাহার খানিক পরেই শিব তাঁহার ভূতপ্রেত লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু গণেশ দরজা ছাড়িবার লোক নহেন। তিনি বলিলেন, "কোথা যাচ্ছ? থামো, মা স্নান করছেন।" বলিয়াই তিনি লাঠি তুলিলেন। শিব আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, "আরে আমি শিব।" গণেশ বলিলেন, "শিব আবার কে? তুমি কেন যাবে?" শিব বলিলেন, "এ তো দেখছি ভারি রোখা। আরে আমি পার্বতীর স্বামী।" বলিয়া তিনি যেই ঢুকিতে যাইবেন, অমনি গণেশ ধাঁই করিয়া তাঁর পিঠে লাঠি মারিয়া বসিয়াছেন।

তখন তো বড়ই বিষম কাণ্ড উপস্থিত হইল। শিবের হুকুমে তাঁহার ভূতেরা আসিয়া গণেশকে শাসাইতে লাগিল। গণেশ তাহাদের বিকট চেহারা দেখিয়া একটুও ভয় পাইলেন না। তিনি বলিলেন "বাঃ! মুখের ছিরি দেখ। যা বেটারা এখান থেকে।"

ভূতেরা বড়ই মুশকিলে পড়িল। তাহাদের হাসিও পাইয়াছে। রাগও হইয়াছে, আবার ভয়ও হইয়াছে। তাহারা এক-একবার শিবের কাছে ফিরিয়া যায়। আবার তাঁহার তাড়া খাইয়া গণেশের কাছে আসিয়া দাঁত খিঁচায়। গণেশ লাঠি লইয়া তাড়া করিলে আবার শিবের কাছে ছুটিয়া যায়। যাহা হউক শেষে তাহারা শিবের কথায় খুব সাহস পাইয়া গণেশের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করিল। নন্দী আর ভৃঙ্গী দুজনে আসিয়া তাহার দুই পা ধরিয়া দিল টান, আর গণেশ ঠাস্‌ঠাস্‌ করিয়া তাহাদের দুজনকে মারিলেন দুই থাপ্পড়। তারপর দরজার হুড়কা লইয়া ভূতের দলকে তিনি এমনি ঠেঙ্গান ঠেঙ্গাইলেন যে কি বলিব!

এদিকে নারদ মুনি গিয়া দেবতাদিগকে এই যুদ্ধের সংবাদ দিয়াছেন, দেবতারাও সকলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতা মুনি-ঋষি, অপ্সরা, কেহই আসিতে বাকি নাই। শিব তখন ব্রহ্মাকে বলিলেন যে, "দেখ তো ঐ ছেলেটিকে বলিয়া কহিয়া শান্ত করিতে পার

কিনা।”

শিবের কথায় ব্রহ্মা মুনি-ঋষিদিগকে লইয়া গণেশকে শান্ত করিতে গেলেন। গণেশ তাঁহাকে দেখিয়া ভাবিলেন, বুঝি ভূত আসিয়াছে, কাজেই বুঝিতেই পার—ব্রহ্মার মুখে যত দাড়ি ছিল, সব তিনি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। ব্রহ্মা যত চ্যাঁচান, “দোহাই বাবা, আমাকে মারিও না, আমি যুদ্ধ করিতে আসি নাই,” গণেশ ততই আরো বেশি করিয়া তাঁহার দাড়ি ছিঁড়েন! তাহাতেও সন্তুষ্ট



না হইয়া শেষে দরজার হুড়কা লইয়া তাঁহাকে তাড়া করিলেন। তখন আর কাহারও সেখানে থাকিতে ভরসা হইল না, সকলে ঊর্ধ্বশ্বাসে শিবের নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। তারপর সকল দেবতা আর ভূত মিলিয়া গণেশের সঙ্গে যে যুদ্ধ করিল, সে বড়ই ভীষণ।

পার্বতী দেখিলেন যে গণেশের বড়ই বিপদ উপস্থিত, এখন আর শুধু লাঠি হুড়কা লইয়া যুদ্ধ করিলে চলিবে না, তাই তিনি দুইটা ভয়ংকর শক্তি তয়ের করিয়া গণেশকে দিলেন।

তাহার একটার মুখ এমনি বিকট যে সে হাঁ করিলে পাহাড় পর্বত গিলিয়া ফেলিতে পারে। আর-একটা বিজুলীর মতো ঝলমল করে, আর তাহার যে কত হাজার হাত তাহা গণিয়া শেষ করা যায় না। সেই দুই শক্তি দেবতাদের সকল অস্ত্র গিলিয়া ফেলিতে লাগিল, কাজেই গণেশের গদার সামনে তাহাদের কেহই টিকিতে পারিলেন না। দেবতা আর ভূত সকলকেই পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইতে হইল। তাঁহারা কত যুদ্ধ করিয়াছেন আরো কত যুদ্ধ দেখিয়াছেন, কিন্তু এমন বিপদে আর কখনো পড়েন নাই। তখন শিব আর বিষ্ণু পরামর্শ করিলেন যে এই ছেলেটাকে ছল করিয়া মারিতে না পারিলে আর উপায় নাই। বিষ্ণু শিবকে বলিলেন, "আমি সম্মুখ হইতে যুদ্ধ করিয়া ইহাকে ভুলাইয়া রাখিব। সেই সময় তুমি পিছন হইতে ইহার প্রাণ বধ করিবে।"

এই বলিয়া বিষ্ণু মায়ার বলে গণেশের শক্তি দুটিকে অবশ করিয়া দিলেন ; কিন্তু গণেশ তাহাতে ভয় না পাইয়া এমনি গদা ছুঁড়িয়া মারিলেন যে তাহা সামলাইতে বিষ্ণু অস্থির। তাহা দেখিয়া শিব মহারাগে ত্রিশূল হাতে লইলেন। কিন্তু গণেশের গদার ঘায়ে তাহা তাঁহার হাত হইতে পড়িয়া গেল। তাহাতে তিনি পিনাক (শিবের ধনুক) হাতে নিলেন, তাহাও গণেশের গদার ঘায়ে পড়িয়া গেল, আর সেই অবসরে গণেশ তাঁহার পাঁচখানি হাত কাটিয়া ফেলিলেন। তারপর গণেশ আবার বিষ্ণুকে গদা ছুঁড়িয়া মারিলেন, কিন্তু বিষ্ণুর চক্রে ঠেকিয়া তাহা গুঁড়া হইয়া গেল। এমনি করিয়া যেই গণেশ আবার বিষ্ণুর সঙ্গে যুদ্ধে ব্যস্ত হইয়াছেন, অমনি শিব পিছন হইতে আসিয়া ত্রিশূল দিয়া তাঁহার মাথা কাটিয়া ফেলিলেন।

হায়! এই নিদারুণ শোক পার্বতী কিরূপে সহ্য করিবেন? তিনি রাগে আর দুঃখে অস্থির হইয়া এক হাজারটা এমন ভয়ংকর শক্তি তয়ের করিলেন যে, তাহারা দেখিতে দেখিতে সকল সৃষ্টি নাশ করিবার জোগাড় করিল। শিবের কোমর ভাঙিয়া দিল, অন্য দেবতাদিগকে মারিয়া ফেলিতে লাগিল। সে যে কী ভীষণ কাণ্ড তাহা আর বলিবার নয়!

তখন শুধু আর হাতজোড় ভিন্ন উপায় কি, কিন্তু পার্বতীর কাছে আসিতে কাহারও ভরসা হয় না, তাই দূরে থাকিয়াই দেবতাগণ প্রাণপণে সে কাজ করিতে লাগিলেন। অনেক কান্নাকাটির পর শেষে পার্বতী তাঁহাদিগকে বলিলেন, "আচ্ছা গণেশকে যদি বাঁচাইয়া দাও, আর সকল দেবতার আগে তাহার পূজা হয়, তবে আমি তাহাদিগকে ক্ষমা করিব।"

এ কথা শুনিয়া শিব সকলকে বলিলেন, "শীঘ্র তাই কর, নহিলে আর রক্ষা নাই।" অমনি সকলে গণেশকে বাঁচাইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। কিন্তু ইহার মধ্যে ভারি মুশকিল উপস্থিত—গণেশের মাথাটি কোথাও খুঁজিয়া

পাওয়া গেল না। তাহাতে শিব বলিলেন, "তোমরা গণেশের শরীর ধুইয়া তাহার পূজা কর, আর কয়েকজন ছুটিয়া উত্তর দিকে যাও। সে দিকে গিয়া প্রথমে যাহাকে দেখিতে পাইবে, তাহারই মাথাটা কাটিয়া আনিয়া গণেশের দেহের সঙ্গে জুড়িয়া দাও।"

তৎক্ষণাৎ উত্তর দিকে সকলে ছুটিল, আর খানিক দূর গিয়াই একটা এক-দাঁতওয়ালা সাদা হাতি দেখিতে পাইল। হাতি হউক, আর যাহাই হউক, উহারই মাথা কাটিয়া নিয়া গণেশের দেহে জুড়িতে হইবে, কাজেই আর কি করা যায়? সেই হাতির মাথা আনিয়া গণেশের দেহে জুড়িয়া মন্ত্র পড়িতেই গণেশ উঠিয়া বসিলেন। তখন পার্বতীরও রাগ দূর হইল, দেবতাদেরও বিপদ কাটিল। সেই অবধি গণেশের হাতির মাথা, আর সেই অবধিই সকল দেবতার আগে গণেশের পূজা হয়।

সন্দেশ—অগ্রহায়ণ ১৩২০

গণেশের বিবাহ

গণেশ কেমন যুদ্ধ করিয়াছিলেন তাহা বলিয়াছি, গণেশের বিবাহ কেমন করিয়া হইয়াছিল আজ তাহা বলিব।

যুদ্ধের পর হইতে শিব গণেশকে যারপরনাই স্নেহ করেন, আর পার্বতীর তো কথাই নাই। কার্তিক যেমন শিব আর পার্বতীর পুত্র, গণেশ তাঁহাদের তেমনি পুত্র হইলেন, আর তাঁহাদের নিকট তেমন স্নেহ পাইতে লাগিলেন।

কার্তিক আর গণেশ যখন বড় হইলেন, তখন একটা কথা লইয়া দুজনের মধ্যে বড়ই তর্ক উপস্থিত হইল; কার্তিক বলেন, "আমি আগে বিবাহ করিব," গণেশ বলেন, "না আমি আগে বিবাহ করিব!"

তাঁহাদের এইরূপ তর্ক শুনিয়া শিব আর পার্বতী বড়ই ভাবনায় পড়িলেন। দুই পুত্রকেই তাঁহারা সমান স্নেহ করেন; ইঁহাদের কাহাকে চটাইয়া কাহার বিবাহ আগে দেন? শেষে অনেক ভাবিয়া শিব স্থির করিলেন, "তোমাদের মধ্যে যে আগে এই পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া (অর্থাৎ তাহার চারিদিকে ঘুরিয়া) আসিতে পারিবে, তাহার বিবাহই আগে দিব।"

এ কথা শুনিয়া কার্তিক তখনই পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতে বাহির হইলেন। গণেশের এই বড় ভুঁড়ি, তাহা লইয়া ছুটাছুটি করিবার সুবিধা নাই; তিনি ভাবিলেন, 'তাইতো, এখন করি কি? ক্রোশখানেক যাইতে না যাইতেই আমার হাঁপ ধরে, পৃথিবীর চারিদিক আমি কি করিয়া ঘুরিব?'

যাহাই হউক, গণেশ বড়ই বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি মনে মনে এক চমৎকার যুক্তি স্থির করিয়া, স্নানের পর দুখানি আসন হাতে পিতামাতার নিকট আসিয়া বলিলেন, "বাবা! মা! এই দুইখানি আসনে আপনারা দুজনে বসুন, আমি

আপনাদের পূজা করিব।"

এই কথায় শিব আর পার্বতী সন্তুষ্ট হইয়া দুই আসনে দুইজন বসিলেন। গণেশও ভক্তির সহিত তাঁহাদের পূজা করিয়া, সাতবার তাঁহাদের চারিদিকে ঘুরিলেন। তারপরে জোড়হাতে তাহাদিগকে বলিলেন, "এখন তবে আমার বিবাহ দিন।"

শিব কহিলেন, "বাবা, আমি তো বলিয়াছি, কার্তিকের আগে যদি পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিয়া আসিতে পার, তবে তোমার বিবাহই আগে হইবে।"

তাহাতে গণেশ বলিলেন, "সে কি বাবা, আমি যে সাতবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিলাম, তবে কেন এমন কথা বলিতেছেন?"

শিব কহিলেন, "তুমি কখন পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিলে?"

গণেশ বলিলেন, "এই যে আমি আপনাদের পূজা করিয়া সাতবার আপনাদিগকে প্রদক্ষিণ করিয়াছি। বেদে আর শাস্ত্রে আছে যে, পিতামাতাকে পূজা করিয়া প্রদক্ষিণ করিলে তাহাতে পৃথিবী প্রদক্ষিণের ফল পাওয়া যায়, ইহাতে সংশয় নাই। বেদের কথা যদি সত্য হয়, তবে অবশ্য আমার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করা হইয়াছে। সুতরাং আমার শীঘ্র বিবাহ দিন, নচেৎ বেদের কথা মিথ্যা হইয়া যাইবে।"

এ কথায় শিব যারপরনাই আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, "তাইতো বাবা, তুমি তো ঠিক কথাই বলিয়াছ। বেদে আর শাস্ত্রে যাহা আছে, তাহাই তুমি করিয়াছ, সুতরাং তোমার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করা হইয়াছে বৈকি!"

তখনই গণেশের বিবাহের আয়োজন আরম্ভ হইল। দুটি কন্যাও পাওয়া গেল, রূপে গুণে কুলে শীলে সকলের চেয়ে ভালো ; নাম সিদ্ধি আর বুদ্ধি। সুতরাং বিবাহ হইতে আর বিলম্ব হইল না।

এদিকে হইয়াছে কি, গণেশের বিবাহের কিছুদিন পরে কার্তিক প্রাণপণে পৃথিবীর চারিদিকে ছুটিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে কৈলাসে উপস্থিত হইয়াছেন, আর অমনি নারদ মুনি আসিয়া তাঁহাকে বলিয়াছেন, "দেখিলে ইঁহাদের কাজ? তোমাকে ফাঁকি দিয়া তোমার পিতামাতা পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতে পাঠাইলেন আর সেই অবসরে গণেশের বিবাহ দিলেন! শাস্ত্রে বলে এমন মা-বাপের মুখ দেখিতে নাই, এখন তোমার যেমন ভালো মনে হয়, কর।"

এই বলিয়া যেই নারদ বিদায় হইলেন, অমনি কার্তিকও শিব আর পার্বতীকে প্রণাম করিয়া রাগের ভরে ক্রৌঞ্চ পর্বতে চলিয়া গেলেন।

শিব আর পার্বতী ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "কোথায় যাইতেছ বাছা? তোমার যে বিবাহ ঠিক করিয়াছি।"

কার্তিক কি তাহাতে থামেন? তিনি বলিলেন, "না, আমি এখানে আর থাকিব না ; আপনারা আমাকে ফাঁকি দিয়াছেন।"

সুতরাং কার্তিকের আর বিবাহ হইল না ; এইজন্যই তাঁহার আর এক নাম হইয়াছে 'কুমার'।

ইহাতে শিব আর পার্বতীর মনে কিরূপ কষ্ট হইল, বুঝিতেই পার।

তাহারা কার্তিককে ফিরাইতে না পারিয়া নিজেরাই সেই ক্রৌঞ্চ পর্বতে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু কার্তিকের কিনা বড়ই রাগ হইয়াছিল, তাই তিনি তাঁহার পিতামাতাকে আসিতে দেখিয়া ক্রৌঞ্চ পর্বতে থাকিতে চাহিলেন না। দেবতারা অনেক বলিয়া কহিয়া সেখান হইতে বারো ক্রোশের মধ্যে থাকিতে তাঁহাকে রাজি না করাইলে না জানি তিনি কোথায় চলিয়া যাইতেন।

সন্দেশ—পৌষ ১৩২১

অগস্ত্য

অসুরেরা দেবতাদের শত্রু, তাই তাহাদিগকে মারিবার জন্য দেবতারা সর্বদাই চেষ্টা করেন। একবার ইন্দ্রের হুকুমে অগ্নি আর বায়ু দুজনে মিলিয়া অসুরদিগকে পোড়াইয়া ফেলিতে গেলেন। বাতাস যদি আগুনের সাহায্য করে, তবে তাহার তেজ বড়ই ভয়ংকর হয়। হাজার হাজার অসুর সেই আগুনের তেজে পুড়িয়া মরিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে আর সকল অসুরই মারা গেল, খালি পাঁচজন অসুর যে সমুদ্রের ভিতরে লুকাইয়া ছিল, অগ্নি আর বায়ু তাহাদিগকে মারিতে পারিলেন না।

সেই পাঁচটা অসুর যে কেবল জলের ভিতরে ঢুকিয়া প্রাণ বাঁচাইল তাহা নহে, মাঝে মাঝে জলের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া সংসারের সকল লোককে বিষম জ্বালাতনও করিতে লাগিল। তখন ইন্দ্র বলিলেন যে, "অগ্নি আর বায়ু সাগর শুষিয়া ফেলুক।" কিন্তু অগ্নি আর বায়ু তাহাতে রাজি হইলেন না, তাঁহারা বলিলেন, "এই সাগরের মধ্যে কত কোটি কোটি জীব আছে, যাহারা কোনো অপরাধ করে নাই ; আমরা সাগর শুষিতে গেলে তাহারা মারা যাইবে। এমন পাপ আমরা করিতে পারিব না।"

এ কথায় ইন্দ্র ভয়ানক চটিয়া বলিলেন, "তোমরা আমার হুকুম অমান্য করিলে, এই অপরাধে তোমাদিগকে মুনি হইয়া পৃথিবীতে জন্মিতে হইবে।"

ইন্দ্র এই কথা বলিবামাত্র অগ্নি আর বায়ু স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে পড়িয়া গেলেন, এবং দুজনে মিলিয়া একটি মুনি হইয়া একটা কলসীর ভিতর হইতে বাহির হইলেন। এই মুনির নামই অগস্ত্য। ইনি বড়ই আশ্চর্যরকমের লোক ছিলেন ; আর ইনি যে মাঝে মাঝে এক-একটা কাজ করিতেন তাহাও অতিশয় অদ্ভুত।

অসুরেরা জলের ভিতর হইতে আসিয়া অত্যাচার করিয়া যখন দেবতাদিগকে নিতান্তই ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল, তখন বিষ্ণু তাঁহাদিগকে শিখাইয়া দিলেন যে, "তোমরা গিয়া অগস্ত্যকে ধর। তিনি ইচ্ছা করিলেই সাগরের জল খাইয়া ফেলিতে পারেন, আর তাহা হইলে তোমাদেরও অসুর মারিবার খুব সুবিধা হইবে।"

এ কথায় দেবতারা অগস্ত্যের নিকটে আসিয়া বলিলেন, "ঠাকুর, আমাদের

একটি কাজ তো না করিয়া দিলেই নয়। আপনি যদি দয়া করিয়া একটিবার সাগরের জলটুকু খাইয়া ফেলেন, তবেই আমরা অসুরগুলিকে মারিতে পারি, নচেৎ আমাদের বড়ই বিপদ।"

অগস্ত্য বলিলেন, "আচ্ছা, তবে চলুন।" এই বলিয়া তিনি সমুদ্রের জল খাইতে চলিলেন, আর সংসারের লোক ছুটিয়া তাহার তামাশা দেখিতে আসিল। সেই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া তাহারা কি আশ্চর্য যে হইয়াছিল, আর অগস্ত্যের কিরূপ প্রশংসা যে করিয়াছিল, তাহা বুঝিতেই পার। দেখিতে দেখিতে অগস্ত্য সাগরের সকল জল খাইয়া শেষ করিলেন, আর দেবতারাও মনের সুখে দুষ্ট অসুরদিগকে ধরিয়া মারিতে লাগিলেন।

ইল্বল আর বাতাপি নামে দুটা দৈত্যকে অগস্ত্য যেমন করিয়া মারিয়াছিলেন, তাহাও অতি আশ্চর্য। ইল্বল বড় ভাই, বাতাপি ছোট ভাই ; মণিমতী পুরীতে তাহাদের বাড়ি। একবার ইল্বল একটি ব্রাহ্মণের নিকট এইরূপ বর চাহিয়াছিল, "আমার যেন ইন্দ্রের সমান একটি পুত্র হয়।" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "এমন বর তো আমি তোমাকে দিতে পারিব না বাপু।" ইহাতে ইল্বল যারপরনাই চটিয়া গিয়া ব্রাহ্মণ মারিবার এক ফন্দি বাহির করিল।

ইল্বলের একটা বড় আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল যে, সে কোনো মরা জন্তুর নাম ধরিয়া ডাকিলে সেই জন্তু অমনি বাঁচিয়া উঠিয়া তাহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইত। কোনো ব্রাহ্মণ তাহার বাড়িতে আসিলে সে বাতাপিকে ছাগল সাজাইয়া, সেই ছাগলের মাংস রাঁধিয়া তাহাকে খাওয়াইত। ব্রাহ্মণ খাওয়া-দাওয়া সারিয়া বিশ্রাম করিতে বসিলে দুষ্ট দৈত্য ডাকিত, 'বাতাপি! বাতাপি!' অমনি বাতাপি সেই ব্রাহ্মণের পেট ছিঁড়িয়া হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া আসিত। এমনি করিয়া হতভাগা অনেক ব্রাহ্মণ মারিয়াছিল।

এই সময়ে একদিন অগস্ত্য পথে চলিতে চলিতে দেখিলেন যে, একটা গর্তের ভিতরে কতকগুলি লোক ঝুলিতেছে, তাহাদের মাথা নীচের দিকে, পা উপর দিকে। সেই লোকগুলিকে দেখিয়া অগস্ত্যের বড়ই দয়া হওয়াতে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাদের এমন দশা কি করিয়া হইল?" তাহারা বলিল, "বাপু, আমরা তোমার পূর্বপুরুষ। তুমি বিবাহ কর নাই, তাই আমাদের এই দশা। তুমি যদি বিবাহ কর আর তোমার ছেলে হয়, তবেই আমাদের দুঃখ দূর হইতে পারে।"

এ কথায় অগস্ত্য অতিশয় ব্যস্ত হইয়া বিবাহের চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু কোথাও একটি মনের মতন কন্যা খুঁজিয়া পাইলেন না। শেষে আর কোনো উপায় না দেখিয়া তিনি নিজেই একটি কন্যার সৃষ্টি করিলেন। সংসারের সকল জন্তুর মধ্যে যাহার শরীরে যে স্থানটি সকলের চেয়ে সুন্দর, সেইরূপ করিয়া কন্যাটির শরীরে সকল স্থান গড়া হইল। তেমন সুন্দর আর কেহ কখনো দেখে নাই। সেই কন্যা বিদর্ভ দেশের রাজার ঘরে গিয়া তাঁহার মেয়ে হইয়া জন্মগ্রহণ করিল ; রাজা তাহার নাম রাখিলেন, লোপামুদ্রা।

লোপামুদ্রা যখন বড় হইলেন, তখন অগস্ত্য আসিয়া রাজাকে বলিলেন, "মহারাজ, আপনার কন্যাটিকে আমি বিবাহ করিব।" ইহাতে রাজা আর রানী তো বড়ই বিপদে পড়িলেন। এত আদরের কন্যাটিকে কদাকার দরিদ্র মুনির হাতে দিতে কিছুতেই মন উঠিতেছে না ; না দিলে আবার মুনি না জানি কি শাপ দেন, এখন উপায় কি হইবে ? এমন সময় লোপামুদ্রা বলিলেন, "বাবা আমার জন্য আপনারা চিন্তিত হইবেন না ; মুনির সঙ্গে আমার বিবাহ দিন।" সুতরাং শীঘ্রই অগস্ত্য আর লোপামুদ্রার বিবাহ হইয়া গেল।

বিবাহের পর লোপামুদ্রা তপস্বিনীর বেশে স্বামীর গৃহে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। অগস্ত্যের ইচ্ছা হইল, তাহাকে রাজকন্যার মতন সুন্দর বসন-ভূষণ পরাইয়া রাখেন। কিন্তু তিনি অতি দরিদ্র ; বসন-ভূষণ কোথায় পাইবেন? কাজেই ইহার জন্য তাঁহাকে ভিক্ষায় বাহির হইতে হইল। এক-এক রাজার নিকট যান, আর বলেন, "আমি আপনার নিকট ধন চাহিতে আসিয়াছি। আপনি অন্যের ক্লেশ বা ক্ষতি না জন্মাইয়া যদি আমাকে কিছু ধন দিতে পারেন, তবে দিন।"

এইরূপ করিয়া অগস্ত্য ক্রমে শ্রুতধা, ব্রধ্নশ্ব আর ত্রসদস্যুর নিকট গেলেন, কিন্তু ইঁহাদের কাহারও হিসাব-পত্র দেখিয়া তাঁহার মনে হইল না যে, তিনি অন্যের ক্লেশ না জন্মাইয়া তাঁহাকে ধন দিতে পারিবেন। কাজেই ইঁহাদের কাহারও নিকট হইতে তাঁহার ধন লওয়া হইল না। তখন রাজারা তাঁহাকে বলিলেন, "ঠাকুর! চলুন আপনাকে লইয়া ইল্বল দানবের নিকট যাই! উহার অনেক ধন আছে।" এই বলিয়া তাহারা অগস্ত্যকে নিয়া ইল্বলের নিকট উপস্থিত হইলেন।

তাঁহাদিগকে দেখিয়া ইল্বলের আর সৌজন্যের সীমাই নাই। সে নমস্কার দণ্ডবৎ কতই করিল, তাহার উপর আবার ভাই বাতাপিকে এই বড় পাঁঠা সাজাইয়া তাহার মাংসে চমৎকার কোরমা রাঁধিল। সেই মাংস রান্নার সন্ধান পাইয়া রাজা মহারাজেরা তো কাঁপিয়াই অস্থির, কেননা, তাহা খাইলে যে কি হয়, সে কথা তাঁহারা বিলক্ষণ জানিতেন। যাহা হউক অগস্ত্য তাঁহাদিগকে ভরসা দিয়া বলিলেন, "আপনাদের কোনো চিন্তাই নাই আমি সব ঠিক করিয়া দিতেছি।"

তারপর পাতপিঁড়ি প্রস্তুত হইলে সকলে খাইতে বসিলেন। ইল্বল হাসিতে হাসিতে সেই মাংস পরিবেশন করিতে আসিল, অগস্ত্যও হাসিতে হাসিতে তাহার সমস্তই খাইয়া শেষ করিলেন, রাজাদিগকে দিবার জন্য কিছুই অবশিষ্ট রাখিলেন না। তারপর যখন ইল্বল ডাকিল, 'বাতাপি! বাতাপি!' তখন তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "বাতাপি আর কি করিয়া আসিবে? তাহাকে হজম করিয়া ফেলিয়াছি!"

কেহ কেহ বলেন যে, এ কথায় ইল্বল অগস্ত্যকে মারিতে গিয়াছিল আর অগস্ত্য তাহাকে ভস্ম করিয়া ফেলিয়াছিলেন। কিন্তু অন্যেরা বলেন যে, ইল্বল অত্যন্ত ভয় পাইয়া অগস্ত্যকে অনেক ধন দিয়াছিল।

আর-একবার অগস্ত্য বিন্ধ্য পর্বতকে বড়ই নাকাল করিয়াছিলেন। বিন্ধ্য পর্বতের মাথা ক্রমে এতই উঁচু হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাহাতে সূর্যের চলা-ফেরার পথ বন্ধ হইয়া যায়। বৎসরের মধ্যে একবার সূর্যকে উত্তর হইতে দক্ষিণে যাইতে হয়, আবার দক্ষিণ হইতে উত্তরে আসিতে হয়। বিন্ধ্য পর্বতের মাথা এত উঁচু হইয়া যাওয়াতে সূর্যের সেই কাজটি করা অসম্ভব হইয়া পড়িল।

সূর্য দেখিলেন, তাঁহার ব্যবসায়ই মাটি হইতে চলিয়াছে ; কাজেই তিনি অগস্ত্যের নিকটে আসিয়া বলিলেন "ঠাকুর! আমি তো বড়ই সংকটে পড়িয়াছি, এখন আপনি যদি আমাকে উদ্ধার করেন।" অগস্ত্য বলিলেন, "আপনার কোনো চিন্তা নাই, আমি বিন্ধ্য পর্বতের মাথা নিচু করিয়া দিতেছি।" এই বলিয়া তিনি যারপরনাই বুড়া একটি মুনি সাজিয়া বিন্ধ্য পর্বতের নিকট গিয়া বলিলেন, "বাপু, আমি তীর্থ করিতে দক্ষিণ দেশে যাইব। কিন্তু আমি বুড়া মানুষ, তোমাকে ডিঙ্গাইতে পারি, এমন শক্তি আমার নাই। তুমি একটু নিচু হও, আমি তীর্থ করিয়া আসি।"

মুনির কথায় বিন্ধ্য পর্বত মাথা নিচু করিয়াছিল। তখন মুনি তাহার উপর দিয়া দক্ষিণে গিয়া বলিলেন, "যতক্ষণ আমি তীর্থ করিয়া ফিরিয়া না আসি, ততক্ষণ এমনিভাবে থাক, নহিলে কিন্তু ভারি শাপ দিব।" কাজেই বিন্ধ্য আর কি করে? সে হেঁট মুখেই পড়িয়া রহিল। তদবধি আর বেচারা অগস্ত্যের দেখাও পায় নাই, শাপের ভয়ে মাথাও তুলিতে পারে নাই।

সন্দেশ—মাঘ ১৩২০

গঙ্গা আনিবার কথা

অগস্ত্য মুনি সাগরের জল খাইয়া ফেলিয়াছিলেন, এ কথা তোমরা শুনিয়াছ। সেই সাগর অনেকদিন শুকনোই পড়িয়াছিল ; তারপর যে কেমন করিয়া তাহাতে জল আসিল, সে অতি আশ্চর্য ব্যাপার।

অযোধ্যায় এক রাজা ছিলেন ; তাহার নাম ছিল সাগর। রাজার বড় রানীর একটি ছেলে ছিল, তাহার নাম অসমঞ্জ। তাঁহার ছোট রানীর ষাটহাজার ছেলে ছিল, তাহাদের নাম আমি জানি না।

অসমঞ্জ এমনি দুষ্ট ছিল যে ছোট-ছোট ছেলেদিগকে ধরিয়া সে জলে ফেলিয়া দিত আর তাহারা খাবি খাইয়া মরিবার সময় হাসিত। কাজেই রাজা বিরক্ত হইয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিলেন। যা হোক, অসমঞ্জের পুত্র অংশুমান বড় ভালো ছেলে ছিল ; রাজা যত্নের সহিত তাহাকে মানুষ করিলেন।

ইহার অনেক বৎসর পরে একবার রাজা খুব ধুমধামের সহিত অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করিলেন। ঘোড়ার কপালে জয়পত্র বাঁধিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিতে হয় ; সেই ঘোড়া সমস্ত পৃথিবী ঘুরিয়া, ফিরিয়া আসিলে তাহার মাংসে যজ্ঞ হয়, সেই যজ্ঞের নাম অশ্বমেধ। জয়পত্রের মানে এই যে, তাহাতে

লেখা থাকে, "খবরদার! এ ঘোড়া কেহ আটকাইয়ো না!" সে কথা যে পড়ে, সেই চটে, আর গায়ে জোর থাকিলে তখনি ঘোড়া আটকায়। কাজেই ঘোড়াকে ছাড়াইয়া আনিবার জন্য তাহার সঙ্গে খুব মজবুত লোক দিতে হয়।

সগর অংশুমানকে সঙ্গে দিয়া তাঁহার জয়পত্র বাঁধা যজ্ঞের ঘোড়াটি ছাড়িয়া দিয়াছেন ; সে ঘোড়া সেই জয়পত্রসুদ্ধ পড়বি তো পড় স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্রের সামনেই গিয়া পড়িয়াছে আর ইন্দ্রও অমনি এক রাক্ষসের বেশ ধরিয়া তাহাকে চুরি করিয়া বসিয়াছেন।

এখন উপায় কি হইবে? ঘোড়া না পাইলে তো যজ্ঞই মাটি, আর তাহা হইলে নিতান্তই বিপদের কথা। রাজার ষাটহাজার ছেলে তখনই ব্যস্ত হইয়া ঘোড়া খুঁজিতে ছুটিল। শহর বন্দর, পাহাড় পর্বত, বন মাঠ কিছুই তাহারা বাকি রাখিল না। তাহাতেও ঘোড়ার দেখা না পাইয়া ষাটহাজার ভাই ষাটহাজার খন্তা হাতে মাটি খুঁড়িতে আরম্ভ করিল। তাহাতেও ঘোড়া না পাইয়া রাজাকে আসিয়া বলিল, "বাবা, ঘোড়া তো পাওয়া গেল না, এখন কি করি?" রাজা বলিলেন, "আবার খুঁজিয়া দেখ ; ঘোড়া না লইয়া ফিরিয়ো না!"

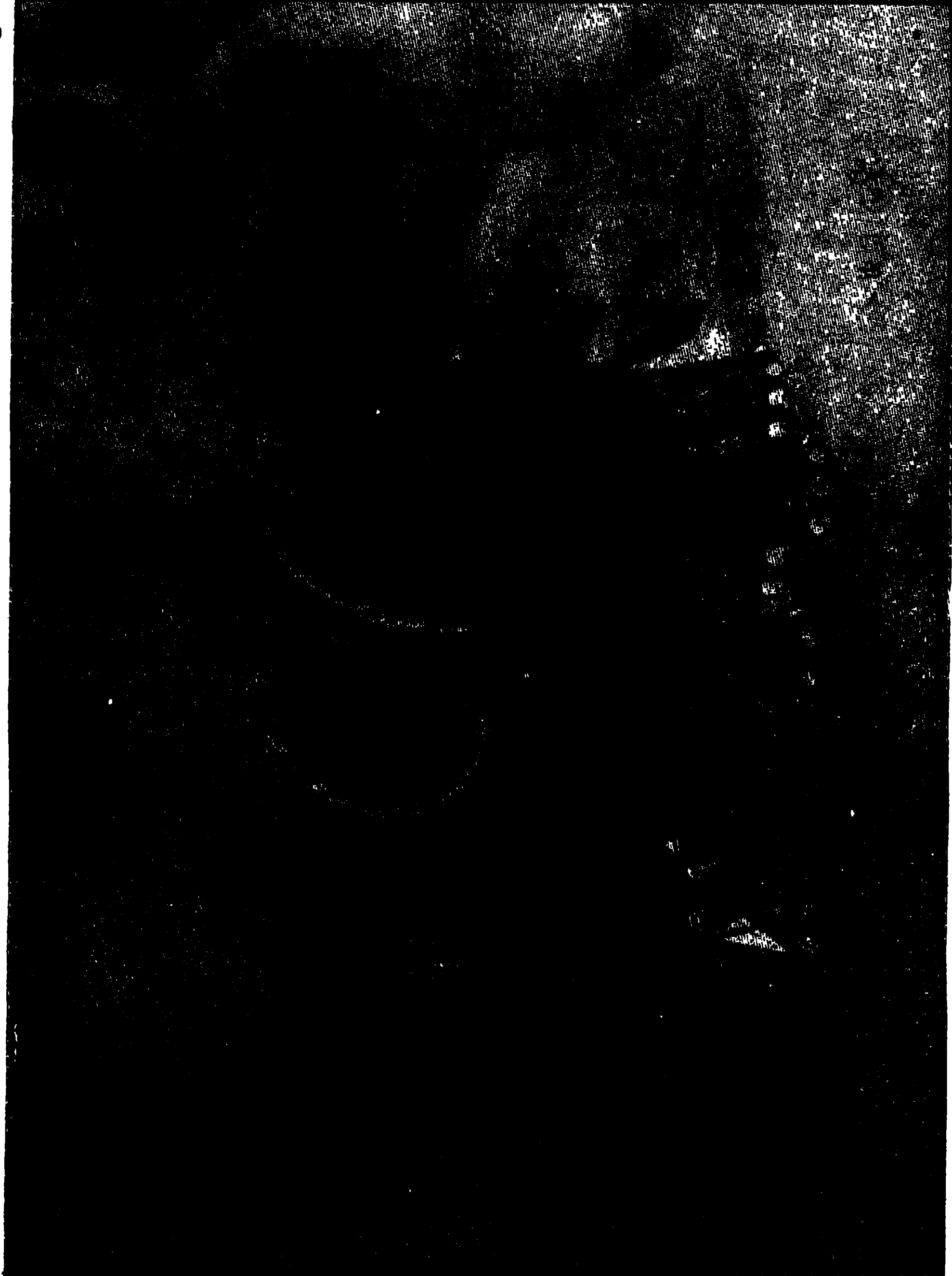
কাজেই বেচারারা আর কি করে, তাহারা আবার প্রাণপণে মাটি খুঁড়িতে লাগিল। খুঁড়িতে খুঁড়িতে পূর্বদিকে গিয়া তাহারা দেখিল যে পর্বতের মতো বিশাল হাতি পৃথিবীটাকে মাথায় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সেই হাতির নাম বিরূপাক্ষ ; সে যখন ঘাড় নাড়ে, তখনই ভূমিকম্প হয়। যাহা হউক, বিরূপাক্ষর কাছে সেই ঘোড়া ছিল না, কাজেই রাজপুত্রেরা সেখান হইতে আবার দক্ষিণ দিকে খুঁড়িয়া চলিল; খুঁড়িতে খুঁড়িতে দেখিল সেদিকেও মহাপক্ষ নামে তেমনি বিশাল এক হাতি পৃথিবীটাকে মাথায় বহিতেছে। এমনি করিয়া তাহারা পশ্চিমে সৌমনাং আর উত্তরে ভদ্র নামে আরো দুটা হাতি পাইল, কিন্তু ঘোড়াকে পাইল না। কেমন করিয়া পাইবে? সে ঘোড়া পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ কোনো দিকেই ছিল না, সে ছিল ঈশান কোণে। সেইখানে যাইবামাত্র রাজপুত্রেরা দেখিল যে, কপিল মুনি সেখানে বসিয়া আছেন, ঘোড়াটি তাঁহার কাছে পাইচারি করিতেছে।

কপিলকে দেখিয়াই রাজপুত্রেরা ভাবিল, 'এই চোর!'. অমনি তাহারা ষাট-হাজার ভাই মিলিয়া খন্তা, লাঙ্গল, গাছ, পাথর হাতে তাঁহার দিকে ছুটিতে ছুটিতে বলিল, 'বটে রে দুষ্ট, তুই আমাদের ঘোড়া চুরি করিয়াছিস? দাঁড়া! এই আমরা যাইতেছি।'

তখন কপিল ভয়ংকর রাগের সহিত এমনি এক হুংকার ছাড়িলেন যে, সে হুংকারেই সেই ষাটহাজার রাজপুত্র পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল।

এদিকে রাজা পথ চাহিয়া বসিয়া আছেন, তাঁহার পুত্রেরা ঘোড়া লইয়া আসিবে, তবে যজ্ঞ শেষ হইবে। কিন্তু রাজপুত্রেরা আর ফিরিল না। তখন তিনি আবার অংশুমানকে ডাকিয়া ঘোড়া খুঁজিতে পাঠাইলেন। এবারে অংশুমানের কাজ অনেকটা সহজ, কারণ তাহার খুড়ারা ইহার আগেই পাতালে

যাইবার পথ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে। সেই পথে চলিতে চলিতে কিছুদিন পরে সেই ভয়ংকর হাতির সহিত তাঁহার দেখা হইল। অংশুমান তাহাকে নমস্কার করিয়া বলিলেন, "হাতি মহাশয়, আপনার মঙ্গল তো? আমি অসমঞ্জের পুত্র অংশুমান, আমার খুড়াদিগকে খুঁজিতে আসিয়াছি। আপনি



কি তাঁহাদের বা আমাদের ঘোড়াটির কোনো সংবাদ রাখেন?" হাতি বলিল, "হাঁ বাপু, এই পথে যাও, ঘোড়া পাইবে।"

এমনি করিয়া ক্রমে সেই চারিটা হাতির প্রত্যেকের সঙ্গেই অংশুমানের

দেখা হইল। তাহার সকলেই বলিল, "যাও বাপু, তুমি ঘোড়া পাইবে।" তারপর আর কিছুদূর গিয়াই তিনি দেখিলেন, তাঁহার খুড়াদের দেহের ছাই পড়িয়া রহিয়াছে, আর তাহার কাছেই সেই ঘোড়াটাও ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। খুড়াদের এই দুর্দশার কথা ভাবিয়া অংশুমানের মনে বড়ই কষ্ট হইল; কিন্তু এখন তো আর দুঃখ করিয়া ফল নাই ; এখন ইহাদের তর্পণ করিতে পারিলে তবেই ইঁহাদের স্বর্গ লাভ হয়। তর্পণের জন্য অংশুমান জল খুঁজিতে লাগিলেন, কিন্তু কোথাও একটু জল পাওয়া গেল না।

জল খুঁজিতে খুঁজিতে গরুড় পক্ষীর সহিত অংশুমানের দেখা হইল। সেই পাখি ছিল অংশুমানের খুড়াদিগের মামা। সে অংশুমানকে বলিল, "ভাই, তোমার খুড়াদিগের তর্পণের কাজ যে সে জলে হইবে না। কপিলের তেজে তাহারা ভস্ম হইয়াছে, গঙ্গার জল ছাড়া ইহাদের তর্পণ তো হইবার নয়। তুমি এখন ঘোড়াটি নিয়া দেশে যাও, তোমার পিতামহের যজ্ঞ সমাপন হউক।"

সুতরাং অংশুমান অগত্যা ঘোড়া লইয়া দেশে ফিরিলেন। পুত্রগণের দুর্দশার সংবাদে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া সগর যজ্ঞ শেষ করিলেন, কিন্তু গঙ্গার জল দিয়া পুত্রগণের তর্পণের কোনো উপায় তিনি করিতে পারিলেন না। গঙ্গা তো তখন পৃথিবীতে ছিলেন না, তিনি থাকতেন স্বর্গে। সগর আরো ত্রিশহাজার বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন, এই ত্রিশহাজার বৎসরের মধ্যে তিনি গঙ্গাকে আনিতেও পারেন নাই, তাঁহার পুত্রগণের উদ্ধারও হয় নাই।

সগর গঙ্গা আনিতে পারেন নাই। অংশুমানও পারেন নাই। অংশুমানের পুত্র দিলীপ খুবই বড় রাজা ছিলেন, কিন্তু তিনিও গঙ্গা আনিতে পারেন নাই।

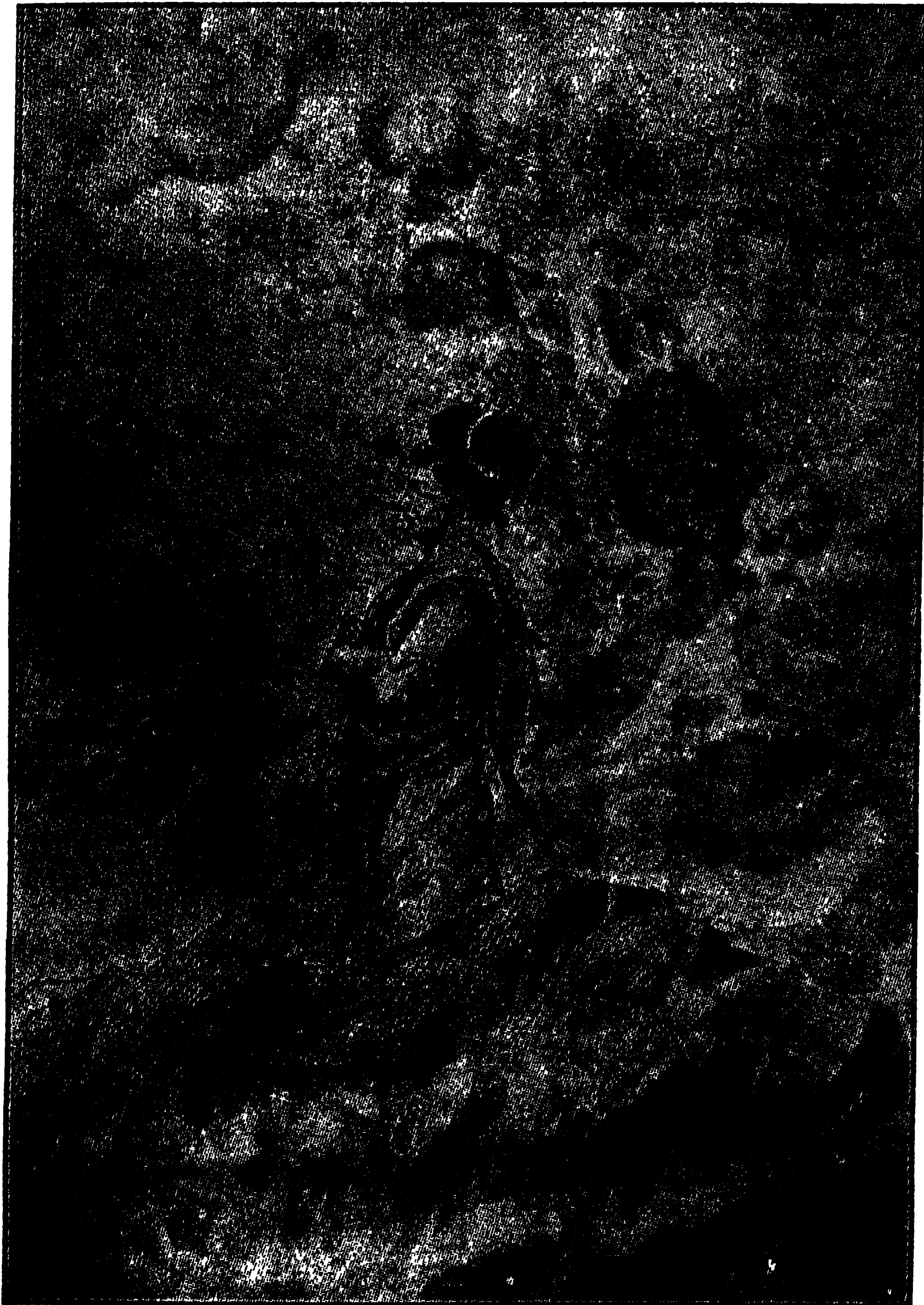
দিলীপের পরে রাজা হইলেন তাঁহার পুত্র ভগীরথ। তিনি যেমন ধার্মিক ছিলেন, তপস্যাও করিয়াছিলেন তেমনি আশ্চর্য। চারিদিকে আগুন জ্বালিয়া, তাহার মাঝখানে বসিয়া তিনি হাত তুলিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। হাজার বৎসরের মধ্যে আর সে হাত নামান নাই, এই সময়ের মধ্যে মাসে শুধু একটি-বারের বেশি খানও নাই।

হাজার বৎসর এমনিভাবে চলিয়া গেল। তাহার পরে ব্রহ্মা দেবতাগণকে সঙ্গে করিয়া আসিয়া বলিলেন, "ভগীরথ! আমি তোমার তপস্যায় বড়ই তুষ্ট হইয়াছি। তুমি কি চাহ?"

ভগীরথ ভক্তিভরে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া, জোড়হাতে বলিলেন, "প্রভু! যদি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে দয়া করিয়া আমাকে গঙ্গা আনিবার উপায় করিয়া দিন।"

ব্রহ্মা বলিলেন, "আচ্ছা বাপু, আমি তাহাই করিয়া দিতেছি। এই যে আমাদের সঙ্গে এই দেবতাটি দেখিতেছ, ইনিই গঙ্গা, হিমালয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা। ইনি তোমার কাজ করিতে পৃথিবীতে যাইবেন। কিন্তু এক কথা— ইনি স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে লাফাইয়া পড়েন, তবে পৃথিবী তো তাহার চোট

সামলাইতে পারিবে না। সে ভয়ংকর চোট খালি একজনে সহিতে পারেন, তিনি হচ্ছেন শিব। সুতরাং তুমি আগে গিয়া শিবকে সেই কাজটি করিতে রাজি করাও, তবেই গঙ্গা পৃথিবীতে নামিতে পারেন।"



তখন ভগীরথ কেবলমাত্র পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের উপর দাঁড়াইয়া এক-বৎসর ধরিয়া ক্রমাগত শিবের স্তব করিলেন। সে স্তব শুনিয়া আর মহাদেব না আসিয়া থাকিতে পারিলেন না। আসিয়াই তিনি মাথা পাতিয়া দাঁড়াইলেন,

এখন গঙ্গা নামিলেই হয়।

এদিকে গঙ্গা ভাবিতেছেন, 'দাঁড়াও, এই বুড়োকে ভাসাইয়া পাতালে লইয়া যাইব।' এ কথা যে মহাদেব টের পাইবেন, সে খেয়াল গঙ্গার ছিল না, আর সেই বুড়ার যে কতখানি ক্ষমতা তাহাও তিনি বুঝিতে পারেন নাই। তিনি ভাবিয়াছিলেন শিবকে নাকাল করিবেন, তাহার বদলে নিজেই নাকালের একশেষ। শিবকে ভাসাইয়া নেওয়া দূরে থাকুক, তাঁহার জটার ভিতরে পড়িয়া আর তিনি বাহির হইবার পথ পান না। সে জটা এখন হিমালয়ের মতো বিশাল হইয়া গিয়াছে, তাহার গলি-ঘুচির ভিতরে গঙ্গাদেবী মা-হারা খুকির মতো ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন।

বৎসরের পর বৎসর যায়, গঙ্গা তবুও সেই সর্বনেশে জটার ভিতর হইতে বাহির হইতে পারেন না। ভাগ্যিস ভগীরথ তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া আবার প্রাণপণে তপস্যা আরম্ভ করিয়াছিলেন, নইলে আরো কতদিন গঙ্গাকে সেখানে থাকিতে হইত কে জানে। ভগীরথের তপস্যায় তুষ্ট হইয়া শিব গঙ্গাকে ছাড়িয়া দিলেন, গঙ্গাও তখন সপ্তধারা হইয়া সাতদিকে বহিয়া চলিলেন।

তখন অবশ্য খুবই একটা তুমুল ব্যাপার হইয়াছিল; আর সকলেই ছুটিয়া তাহা দেখিতে আসিয়াছিল। এত জল, এত ফেনার এমন নৃত্য আর কখনো দেখা যায় নাই, এমন ডাকও কেহ কখনো শুনে নাই। মাছ, কুমির, কচ্ছপ, শুশুক আর সাপে পৃথিবী ছাইয়া গিয়াছিল।

গঙ্গা সাতটি ধারায় বহিয়া সাতদিকে ছুটিলেন; তাহার একটি ধারা ভগীরথের রথের পিছু পিছু যাইতে লাগিল। যত দেবতা, যত দানব, যত মুনি-ঋষি যক্ষ রাক্ষস গন্ধর্ব পিশাচ কিন্নর সকলেই সেই রথের পিছু পিছু গঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়া চলিল।

সেই পথের ধারে ছিল জহ্নু মুনির আশ্রম। মুনি যজ্ঞ করিতে বসিয়াছেন এমন সময় গঙ্গার জল সোঁ সোঁ শব্দে আসিয়া তাঁহার সকল আয়োজন ভাসাইয়া নিল। মুনি তাহাতে যারপরনাই ব্যস্ত হইয়া, আর তাহার চেয়েও বেশি রাগিয়া সেই জল সমস্তই খাইয়া ফেলিলেন। খাইবার সময় সকলে অবাক্ হইয়া সেই আশ্চর্য ব্যাপারের তামাশা দেখিয়াছিল, মুনিকে বারণ করিতে সাহস পায় নাই। মুনি সকল জল খাইয়া ফেলিলে পর তাহারা তাঁহাকে অনেক মিনতি করিয়া বলিল, "ঠাকুর! দয়া করিয়া গঙ্গাকে ছাড়িয়া দিন: ও যে আপনার মেয়ে!"

এ কথায় মুনি অতিশয় তুষ্ট হইয়া কানের ভিতর দিয়া আবার গঙ্গাকে বাহির করিয়া দিলেন। সেই হইতে গঙ্গার নাম হইয়াছে "জাহ্নবী", অর্থাৎ জহ্নুর মেয়ে।

ইহার পরে আর গঙ্গার কোনো বিপদ ঘটে নাই। তিনি ভগীরথের পিছু পিছু পাতালে গিয়া সগরের সেই ষাটহাজার পুত্রের ছাই ভিজাইয়া দিলেন, আর অমনি তাঁহারা সকলে দেবতার ন্যায় সুন্দর রূপ ধরিয়া স্বর্গে চলিয়া গেল।

সেই যে অগস্ত্য মুনি সাগরের জল খাইয়া ফেলিয়াছিলেন, তাহার পর হইতে এতদিন সেই সাগর শুকনো পড়িয়াছিল। এতদিন পরে গঙ্গার জল আসিয়া আবার তাহাকে ভরিয়া দিল।

তখন ব্রহ্মা ভগীরথকে বলিলেন, "যতদিন পর্যন্ত এই সাগরে জল থাকিবে, ততদিন সগরের পুত্রেরা স্বর্গে বাস করিবে। আর এখন হইতে গঙ্গা তোমার কন্যার মতো হইলেন, সুতরাং লোকে তাহাকে 'ভাগীরথী' বলিয়া ডাকিবে।"

সন্দেশ—ফাল্গুন-চৈত্র ১৩২০

সগর রাজার কথা

ইক্ষাকু বংশে সগর নামে একজন অতি প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। রূপে, গুণে, বিদ্যায়, বীরত্বে, তাঁহার সমান আর সেকালে কোন রাজাই ছিলেন না। সব বিষয়েই তিনি সুখী ছিলেন, কেবল এক বিষয়ে তাঁহার বড়ই দুঃখ ছিল ; তাঁহার পুত্র ছিল না। পুত্র লাভের জন্য তিনি তাঁহার বৈদর্ভী এবং শৈব্যা নাম্নী দুই রাণীকে লইয়া কৈলাস পর্বতে গিয়া কঠিন তপস্যা আরম্ভ করিলেন। কিছুদিন পরে, শিব রাজার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া, তাঁহার নিকট আসিয়া বলিলেন, "মহারাজ, তুমি কী চাহ?"

রাজা ভক্তিভরে শিবকে প্রণাম করিয়া, জোড়হাতে বলিলেন, "ভগবন্, আমার পুত্র নাই। আমার মৃত্যুর পর আমার বিশাল সাম্রাজ্য ভোগ করিবার লোক থাকিবে না ; আমার বংশ লোপ হইয়া যাইবে। সুতরাং যদি আমার প্রতি আপনার দয়া হইয়া থাকে, তবে অনুগ্রহ করিয়া, যাহাতে আমার পুত্র হয়, এমন বর দিন।"

এই বলিয়া শিব আকাশে মিলাইয়া গেলেন, রাজাও আনন্দের সহিত রানী-দিগকে লইয়া দেশে ফিরিলেন।

কিছুদিন পরে বৈদর্ভীর ষাটহাজারটি আর শৈব্যার একটি পুত্র হইল। বৈদর্ভীর ষাটহাজার পুত্র জন্মিবার সময় বড়ই আশ্চর্য ঘটনা হয়। ছেলে-গুলি একটা লাউয়ের ভিতরে ছিল। লাউ দেখিয়া রাজা তাহা ফেলিয়া দিবার আজ্ঞা দিয়াছেন, এমন সময় আকাশ হইতে কে যেন অতি গভীর স্বরে বলিল, "মহারাজ, ওটাকে ফেলিয়া দিও না, উহার ভিতরেই তোমার ষাটহাজার পুত্র আছে। উহার ষাটহাজারটি বীচিকে ঘৃতের কলসির ভিতরে রাখিয়া দাও, দেখিবে, তোমার ষাটহাজার পুত্র হইবে।"

সুতরাং রাজা আর লাউটি ফেলিয়া না দিয়া উহার বীচিগুলি ঘিয়ের ভিতরে রাখিয়া দিলেন। ইহাতে অনেকদিন পরে, সেই বীচির ভিতর হইতে ষাটহাজার সুন্দর খোকা বাহির হইল। সেই খোকাগুলি বড় হইয়া ষাট-হাজারটা অসুরের মতন গোঁয়ার গুণ্ডা হইল। তাহাদের জ্বালায় মানুষের কথা আর কি বলিব—দেবতা গন্ধর্ব পর্যন্ত সুস্থির হইয়া বসিতে পারিত না।

শেষে সকলে তাহাদের দৌরাত্ম্যে জ্বালাতন হইয়া, ব্রহ্মার নিকট গিয়া

বলিল, "ভগবন্, আর তো পারি না। ইহাদের দৌরাত্ম্য নিবারণের একটা উপায় করুন!"

ব্রহ্মা বলিলেন, "তোমাদের কোনো চিন্তা নাই আর অতি অল্পদিনের ভিতরেই ইহারা নিজের স্বভাব দোষে নষ্ট হইবে।"

এ কথায় সকলে কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়া, ব্রহ্মাকে প্রণামপূর্বক যে যাহার ঘরে ফিরিল।

তারপর একবার সগর অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। যজ্ঞের ঘোড়ার রক্ষক হইল ঐ ষাটহাজার রাজপুত্র। তাহারা দিনকতক তাহাকে দেশে দেশে তাড়াইয়া ফিরিলে সে শুকনো সাগরের বালির উপর দিয়া ছুটিতে ছুটিতে হঠাৎ কোথায় যে চলিয়া গেল, রাজপুত্রেরা তাহার কিছুই বুঝিতে পারিল না। তখন তাহারা দেশে ফিরিয়া তাহাদের পিতাকে বলিল, "বাবা, সর্বনাশ হইয়াছে; ঘোড়া হারাইয়া গিয়াছে!"

এ কথা শুনিয়া সগর বলিলেন, "তোমরা সকলে মিলিয়া তাহাকে খুব ভালো করিয়া খোঁজ।"

তখন রাজপুত্রেরা আবার ঘোড়া খুঁজিতে বাহির হইল, কিন্তু সমস্ত পৃথিবী খুঁজিয়াও তাহার সন্ধান করিতে পারিল না। সুতরাং তাহারা আবার তাহাদের পিতার নিকট আসিয়া বিনয়ের সহিত বলিল, "বাবা, আমরা শহর, বাজার, পাহাড়, পর্বত, বন, বাদাড়, কিছুই বাকি রাখি নাই। কিন্তু ঘোড়া তো কোথাও খুঁজিয়া পাইলাম না!"

এ কথায় সগর রাগে অস্থির হইয়া বলিলেন, "দূর হ তোরা এখান হইতে! ঘোড়া না লইয়া তোরা আর দেশে মুখ দেখাইতে পারিবি না।"

সুতরাং আবার ষাটহাজার ভাই ঘোড়ার সন্ধানে বাহির হইল। খুঁজিতে খুঁজিতে তাহারা আবার সমুদ্রে উপস্থিত হইয়া দেখিল যে, তাহার এক জায়গায় একটা গভীর গর্ত রহিয়াছে। তখন ষাটহাজার ভাই, ষাটহাজার কোদাল লইয়া, সেই গর্তের চারিধারে খুঁড়িতে আরম্ভ করিল। কিন্তু অনেক খুঁড়িয়াও তাহারা সেই সর্বনেশে গর্তের তলা পাইল না। দিন গেল, মাস গেল, বৎসর চলিয়া গেল, তথাপি সেই গর্তের ভিতরে উঁকি মারিলে, যেমন অন্ধকার ছিল, তেমনই অন্ধকার দেখা যায়।

ইহাতে তাহারা রাগের ভরে আরো বেশি করিয়া খুঁড়িতে লাগিল। গর্ত যতই অন্ধকার দেখা যায়, তাহারা ততই খালি বলে, "খোঁড়্, খোঁড়্, খোঁড়্, খোঁড়।" এমনি করিয়া খুঁড়িতে খুঁড়িতে তাহারা একেবারে পাতালে গিয়া উপস্থিত হইল! পাতালে গিয়াই তাহারা দেখিল যে, সেখানে কপিল মুনি বসিয়া আছেন, আর ঘোড়াটি তাঁহার কাছেই ঘাস খাইতেছে। ঘোড়া দেখিয়া আর কি তাহারা স্থির থাকিতে পারে? তখন কপিল যে সেখানে বসিয়া আছেন তাঁহা যেন তাহারা দেখিয়াও দেখিতে পাইল না। কপিলকে অগ্রাহ্য করিয়াই তাহারা ঘোড়া ধরিতে ছুটিয়া চলিল।

ইহাতে কপিল রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে দুই চক্ষু লাল করিয়া, ভীষণ

ভ্রুকুটির সহিত উহাদিগের পানে তাকাইবামাত্র, সেই ষাটহাজার রাজপুত্র পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল!

যখন এই ভয়ংকর ঘটনা হয়, তখন নারদ মুনি সেই দিক দিয়া যাইতে-ছিলেন। তিনিই রাজপুত্রগণের মৃত্যুর সংবাদ সগরকে শুনান। পুত্রদিগের মৃত্যুর কথা শুনিয়া, সগর দুঃখে অনেকক্ষণ কথা কহিতে পারিলেন না। তারপর নিজের নাতি অংশুমানকে ডাকিয়া তিনি বলিলেন, "এখন তুমি ঘোড়া না আনিতে পারিলে তো আর উপায় দেখি না।"

শৈব্যার যে একটি পুত্র হয়, তাহার নাম ছিল অসমঞ্জ। অসমঞ্জ এমনই দুষ্ট ছিল যে, সে ছোট-ছোট ছেলেপিলের গলায় ধরিয়া তাহাদিগকে জলে ফেলিয়া দিত। তাহার জ্বালায় অস্থির হইয়া সকলে সগরের নিকট নালিশ করাতে, তিনি তাহাকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দিলেন। অংশুমান সেই অসমঞ্জর পুত্র।

সগরের কথায় অংশুমান সেই গর্তের ভিতর দিয়া পাতালে চলিয়া গেলেন ; কপিল তখনোও সেখানে বসিয়াছিলেন, আর ঘোড়াটাও তাঁহার কাছে ছিল। অংশুমান মুনিকে দেখিবামাত্র ভক্তিভরে তাঁহাকে প্রণাম করাতে, মুনি তাহার উপর সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "বাঃ বেশ তো ছেলেটি। তুমি কি চাও, বৎস?"

অংশুমান জোড়হাতে বলিলেন, "ভগবন্, আপনি দয়া করিয়া ঘোড়াটি আমাকে দিলে আমাদের যজ্ঞ শেষ হইতে পারে।"

মুনি বলিলেন, "বটে? তোমাদের যজ্ঞের ঘোড়া? এখনি তুমি ওটাকে নিয়া যাও। তোমার আর কিছু চাই?"

অংশুমান জোড়হাতে বলিলেন, "ভগবন্ দয়া করিয়া যদি আমার খুড়া-মহাশয়দিগকে উদ্ধার করিয়া দেন, তবে বড় ভালো হয়।"

মুনি বলিলেন, "তুমি যখন চাহিতেছ, তখন তাহাও হইবে। কিন্তু সে এখন নহে, আর তাহা এত সহজে হইবে না। তোমার যে নাতি হইবে, সে মহাদেবকে তপস্যায় তুষ্ট করিয়া, তাঁহার সাহায্যে, গঙ্গাদেবীকে স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে লইয়া আসিবে। সেই স্বর্গের নদী গঙ্গার জল লাগিলে তোমার খুড়াগণ উদ্ধার পাইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। এখন শীঘ্র ঘোড়া লইয়া দেশে গিয়া, যজ্ঞ শেষ কর। তোমার মঙ্গল হউক।"

এইরূপে অংশুমান ঘোড়া লইয়া দেশে ফিরিলে, সগরের অশ্বমেধ শেষ হইল।

অংশুমানের পুত্র দিলীপ গঙ্গাকে পৃথিবীতে আনিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁহার চেষ্টায় কোনো ফল হয় নাই। তারপর তাঁহার পুত্র পরম ধার্মিক এবং সত্যবাদী মহারাজ ভগীরথ জন্মগ্রহণ করিলেন।

এই ভগীরথই তপস্যার বলে গঙ্গাদেবীকে পৃথিবীতে আনিয়াছিলেন। তাঁহার পবিত্র জল লাগিয়া সগর রাজার ষাটহাজার পুত্রের উদ্ধার সাধন হইয়াছিল।

এইজন্যই গঙ্গার অপর নাম ভাগীরথী।

হনুমানের মায়ের নাম ছিল অঞ্জনা। বানরের স্বভাব যেমন হইয়া থাকে, অঞ্জনার স্বভাবও ছিল অবশ্য তেমনিই। হনুমান কচি খোকা, তাহাকে ফেলিয়া অঞ্জনা বনের ভিতরে গেল, ফল খাইতে। বনে গিয়া সে মনের সুখে গাছে গাছে ফল খাইয়া বেড়াইতে লাগিল, এদিকে খোকা বেচারা যে ক্ষুধায় চ্যাঁচাইতেছে, সে কথা তাহার মনেই হইল না।

হনুমান বেচারা তখন আর কি করে? চ্যাঁচাইয়া সারা হইল, তবু মার দেখা নাই, কাজেই তাহার নিজেকেই কিছু খাবারের চেষ্টা দেখিতে হইল। সেটা ছিল ভোরের বেলা, টুকটুকে লাল সূর্যটি তখন সবে বনের আড়াল হইতে উঁকি মারিতেছে সেই টুকটুকে সূর্য দেখিয়াই হনুমান ভাবিল ওটা একটা ফল। অমনি আর কথাবার্তা নাই, সে একলাফে আকাশে উঠিয়া ভয়ানক সোঁ সোঁ শব্দে সেই ফল পাড়িয়া খাইতে ছুটিল।

তোমরা আশ্চর্য হইও না। হনুমান তখন কচি খোকা বটে, কিন্তু সে যে সে খোকা ছিল না, সে কথা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। সেই শিশুকালেই তাহার বিশাল দেহ ছিল, আর গায়ের রঙটি ছিল সেই ভোরবেলার সূর্যের মতোই ঝক্‌ঝকে লাল। দেব দানব যক্ষ সকলেই তাহার কাণ্ড দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। অবাক না হইবেই-বা কেন? সেই খোকা এমন ভয়ংকর ছুটিয়া চলিয়াছে যে, তেমন গরুড়েও পারে না, ঝড়েও পারে না। সকলে বলিল, "শিশুকালেই এমন, বড় হইলে না জানি এ কেমন হইবে।"

এদিকে হনুমান গিয়া তো সূর্যের কাছে পৌঁছিয়াছে, কিন্তু ইহার মধ্যে আর-এক ব্যাপার উপস্থিত। সেইদিন ছিল গ্রহণের দিন, রাহু বেচারা অনেক দিনের উপবাসের পর সেইদিন সূর্যকে খানিক সময়ের জন্য গিলিয়া একটু শান্ত হইতে পাইবে। সে অনেক আশা করিয়া সূর্যকে গিলিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিল, কিন্তু সেখানে হনুমানকে দেখিয়া ভয়ে তাহার প্রাণ উড়িয়া গেল। সে অমনি "বাবা গো!" বলিয়া দে প্রাণপণে ছুট্, ছুটিতে ছুটিতে একেবারে ইন্দ্রের সভায় গিয়া উপস্থিত।

ইন্দ্রের কাছে গিয়া সে নিতান্ত ব্যস্তভাবে বলিল, "আপনারই হুকুমে আমি সূর্যটাকে গিলিয়া ক্ষুধা দূর করি ; এখন আবার সেই সূর্য কাহাকে দিয়া ফেলিয়াছেন? আজ তো দেখিতেছি আর-একটা রাহু তাহাকে গিলিতে আসিয়াছে।"

এ কথায় ইন্দ্র যারপরনাই আশ্চর্য হইয়া তখনই ঐরাবতে চড়িয়া দেখিতে চলিলেন, ব্যাপারটা কি? রাহু তাহার আগে ছুটিয়া আবার সূর্যের নিকট গিয়াছিল, কিন্তু বেশিক্ষণ সেখানে টিকিতে পারে নাই।

রাহুর কিনা দেহ নাই, শুধুই একটি গোল মাথা, কাজেই হনুমান, তাহাকে দেখিবামাত্র ফল মনে করিয়া ধরিতে আসিল। রাহু তখন "ইন্দ্র! ইন্দ্র!" বলিয়া চ্যাঁচাইয়া অস্থির। ইন্দ্র বলিলেন, "ভয় নাই আমি এটাকে এখনই

মারিয়া ফেলিতেছি।"

তখন হনুমান, তাড়াতাড়ি ইন্দ্রের দিকে ফিরিয়া তাকাইতেই, ঐরাবতের প্রকাণ্ড সাদা মাথাটা তাহার চোখে পড়িল। সে ভাবিল, এটাও বুঝি একটা ফল। এই ভাবিয়া যেই হনুমান, সেটাকে ধরিতে গিয়াছে, অমনি ইন্দ্র ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া তাহার উপরে বজ্র ছুঁড়িয়া মারিলেন।

সেই বজ্রের ঘায়ে একটা পাহাড়ের উপর পড়িয়া 'হনু' অর্থাৎ দাড়ি ভাঙিয়া যাওয়াতেই তাহার 'হনুমান' এই নামটি হইয়াছিল। পাহাড়ের উপর পড়িয়া সে যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, এমন সময় তাহার পিতা পবন আসিয়া তাহাকে কোলে করিয়া একটা পর্বতের গুহায় লইয়া গেলেন। তারপর তিনি রাগে অস্থির হইয়া বলিলেন, "দাঁড়াও ইহার শোধ ভালো মতেই লইব।"

পবন, অর্থাৎ বায়ু, হইতেছেন সংসারের প্রাণ, সেই বায়ু রাগিয়া বসিলে কি বিপদই না ঘটিতে পারে। সেই রাগের চোটে বাহিরের বায়ু কোথায় চলিয়া গেল, দেহের ভিতরের বায়ু উৎকট হইয়া উঠিল। নিশ্বাস ফেলিতে না পারিয়া জীবজন্তুর প্রাণ যায় যায়। বায়ুর উৎপাতে সকলের মাথা খারাপ হইয়া গেল, তাহারা এক করিতে আর করিয়া বসে। দেবতাদের অবধি পেট ফাঁপিয়া ফানুসের মতো হইয়া গেল ঠিক যেন উদরীর বেয়ারাম।

সেই অবস্থায় সকল দেবতা কাঁদিতে কাঁদিতে ব্রহ্মার নিকট গিয়া বলিলেন, "প্রভু! আমাদের দশা দেখুন। ইহার উপায় কি হইবে?" ব্রহ্মা বলিলেন, "উপায় আর কি? চল বায়ুর নিকট গিয়া তাঁহাকে খুশি করি। ইহা ভিন্ন আর আমাদের গতি নাই।"

পবন অচেতন হনুমানকে লইয়া কোলে করিয়া গুহায় বসিয়া আছেন, এমন সময় ব্রহ্মাকে লইয়া দেবতাগণ সেখানে গিয়া উপস্থিত। ব্রহ্মা আসিয়া হনুমানের মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেই সে সুস্থ হইয়া উঠিয়া বসিল, যেন তাহার কখনো কোনো অসুখ হয় নাই। ইহাতে পবন কত দূর খুশি হইলেন বুঝিতেই পার। পবনের রাগ চলিয়া যাওয়াতে কাজেই সংসারের সকল জীবের বিপদও কাটিয়া গেল।

তখন ব্রহ্মা দেবতাদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ, এই খোকা বড় হইলে তোমাদের অনেক কাজ করিয়া দিবে। সুতরাং তোমরা সকলে ইহাকে বর দিয়া খুশি কর।" এ কথায় দেবতারা যারপরনাই সন্তুষ্ট হইয়া হনুমানকে বর দিতে লাগিলেন। সেই-সকল বরের জোরে হনুমান চিরজীবী হইয়া গেল। কোনো দেবতা বা যক্ষ, রক্ষ গন্ধর্ব বা মানুষের কোনো অস্ত্রে তাহার মরণের ভয় রহিল না। কেহ শাপ দিয়া তাহার প্রাণনাশ করার পথ অবধি বন্ধ হইল। তাহা ছাড়া ব্রহ্মা বলিলেন, "তুমি ভগবানকে জানিতে পারিবে, আর যখন যেমন ইচ্ছা, তেমনি রূপ ধরিতে পারিবে।" সূর্য বলিলেন, "আমার তেজের শতভাগের একভাগ তোমাকে দিলাম। আর একটু বয়স হইলে আমি তোমাকে লেখাপড়া শিখাইব : তাহা হইলে তুমি খুব বলিতে কহিতে পারিবে।"

বর পাইয়া হনুমান বড় লোক হইয়া গেল! তবে অবশ্য ; ইহার সকল ফল

ফলিতে সময় লাগিয়াছিল। শিশুকালে তাহার স্বভাব অন্যান্য বানরছানার চেয়ে বেশি উঁচুদরের ছিল না। মুনিদের আশ্রমে গিয়া সে দৌরাত্ম্যটা যা করিত, সে আর বলিবার নয়। তাহার পিতামাতা কত নিষেধ করিতেন, কিন্তু সে কি নিষেধ শুনিবার পাত্র? তাহার উৎপাতে মুনিদের কোশাকুশী, ঘটি, বাটি, কাপড়-চোপড় কিছু আগলাইয়া রাখিবার জো ছিল না। এদিকে আবার তাহাকে শাপ দিয়াও ফল নাই, কারণ, ব্রহ্মার বরে শাপে মরিবার ভয় তাহার কাটিয়া গিয়াছে আর তাহাকে দেখিয়া তাঁহাদের কতকটা মায়াও হইত। কাজেই তাঁহারা নিরুপায় হইয়া তাহার অত্যাচার সহ্য করিতেন, আর ভাবিতেন, উহাকে বেশি ক্লেশ না দিয়া কি উপায়ে একটু জব্দ করা যায়। শেষে অনেক বুদ্ধি করিয়া তাঁহারা তাহাকে এই শাপ দিলেন, "যা বেটা, তোর যত ক্ষমতা, তাহার কথা তুই একেবারে ভুলিয়া যা। বড় হইলে কেহ সেই ক্ষমতার কথা তোকে মনে করাইয়া দিবে, তখন তুই অনেক অদ্ভুত কাজ করিবি।"

তখন হইতে হনুমান সামান্য বানরছানার ন্যায় নিতান্ত ভয়ে ভয়ে চলে, আর দূর হইতে কাহাকেও দেখিলেই প্রাণপণে ছুটিয়া পলায়। কাজেই মুনিদেরও আর তাহার অত্যাচার সহিতে হয় না। যাহা হউক, সে এর মধ্যে সূর্যের নিকটে ঢের লেখাপড়া শিখিয়া ফেলিল। মুনিদের বাড়ি গিয়া সে যাহাই করুক, লেখাপড়ায় যে সে খুব লক্ষ্মীছেলে ছিল, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে। কি পরিশ্রম করিয়াই না সে লেখাপড়া শিখিয়াছিল। সূর্য তো আর এক জায়গায় বসিয়া থাকেন না, যে, পুঁথি লইয়া তাঁহার কাছে গিয়া বসিলেই কাজ হইবে। হনুমানকে উদয় হইতে অস্ত পর্বত পর্যন্ত রোজ তাঁহার পিছু পিছু ছুটাছুটি করিয়া পড়া বুঝিয়া লইতে হইত। তাহার ফলে সে বিদ্বানও হইয়াছিল বড়ই ভারি রকমের। এমন পণ্ডিত অতি অল্পই জন্মাইয়াছে।

সন্দেশ—কার্তিক, ১৩২১

সূর্যের গৃহিনী

বিশ্বকর্মার নাম তোমরা সকলেই শুনিয়াছ। বিশ্বকর্মা দেবতাদের কারিগরদের দেবতা। এই দেবতার একটি মেয়ে ছিল, তাহার নাম সংজ্ঞা; কেহ কেহ তাহাকে উষা আর সুরেণু বলিয়াও ডাকিত।

বাপের ঘরে সংজ্ঞা সুখেই ছিলেন। কিন্তু, শেষে তাঁহার পিতা যখন সূর্যদেবের সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন, তখন হইতেই বেচারীর দুঃখের দিন আরম্ভ হইল। সূর্যের যে কি ভয়ানক তেজ, তাহা তোমরা সকলেই দেখিতেছ। দূরে থাকিয়াই এত তেজ, কাছে গেলে সে যে কিরকম হইবে, তাহা তো আমরা ভাবিয়াই উঠিতে পারি না। এর উপর আবার সেকালে নাকি সূর্যের তেজ এখনকার চেয়ে ঢের বেশি ছিল। তখন সূর্যের দেহ এমন সুন্দর গোল ছিল না; কদম ফুলের কেশরের মতো, তাহার চারিদিকে কিরণের ছটা

বাহির হইত, তাহার যে কি ভয়ংকর তেজ, তাহা বেচারী সংজ্ঞাই বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

তবু সে তেজ সহিয়া সহিয়া থাকিতে সংজ্ঞা চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। ঝলসিয়া পুড়িয়া ফোস্কা পড়িয়া, তাহার দুর্দশার একশেষ হইল, তবু তিনি অনেকদিন ধরিয়া সূর্যের সেবা করিলেন। ক্রমে, মনু, যম, আর যমুনা বলিয়া তাঁহার তিনটি খোকা-খুকি হইল। খোকা-খুকিরা দূরে দূরে খেলা করিয়া বেড়ায়, তাহাদের কোনো কষ্ট নাই। যত কষ্ট সংজ্ঞার, কেননা, তাঁহাকে সূর্যের কাছে থাকিয়া তাঁহার সেবা করিতে হয়। এতদিন সে কষ্ট সহিয়া সহিয়া তাঁহার শরীর মাটি হইয়া গেল, আর সহিতে পারেন না।

তখন সংজ্ঞা অনেক ভাবিয়া এক বুদ্ধি বাহির করিলেন। বিশ্বকর্মার মেয়ে, কাজেই অনেকরকম কারিকুরি তাঁহার জানা ছিল। আর সেই কারিকুরিতে এখন তাঁহার বড়ই কাজ হইল। তিনি সকলের অসাক্ষাতে এমন একটি মেয়ে তয়ের করিলেন যে, সে দেখিতে অবিকল তাঁহার নিজেরই মতন, কিন্তু সূর্যের তেজে তাহার কিছুই হয় না। মেয়েটির নাম রাখিলেন ছায়া।

ছায়া তয়ের হওয়ামাত্র হাতজোড় করিয়া সংজ্ঞাকে বলিল, "আমাকে কি করিতে হইবে?" সংজ্ঞা বলিলেন, "আমি বাপের বাড়ি যাইতেছি। তুমি এখানে থাকিয়া ঘরকন্না কর। আমার খোকা-খুকিদের যত্ন করিয়া খাইতে-পরিতে দিয়ো। আর, আমি যে চলিয়া গেলাম, এ কথা কাহাকেও বলিয়ো না।"

ছায়া বলিল, "আমি সবই করিব, কিন্তু, যদি আমার চুলে ধরিতে আসে, বা শাপ দিতে চায়, তবে আমি চুপ থাকিতে পারিব না।"

এইরূপ কথাবার্তার পর সংজ্ঞা ছায়াকে সেখানে রাখিয়া ভয়ে ভয়ে, তাঁহার পিতার নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। বিশ্বকর্মা কিন্তু কন্যার দুঃখ বুঝিতে পারিলেন না। তিনি সংজ্ঞাকে দেখিয়া আশ্চর্য তো হইলেনই, বিরক্ত হইলেন তাহার চেয়েও বেশি। তিনি বলিলেন, "তুমি ভারি অন্যায় করিয়াছ, এখনি ফিরিয়া যাও।"

বাপের বাড়িতে আসিয়াও সংজ্ঞার দুঃখ ঘুচিল না। বকুনির জ্বালায় সেখানে টিকিয়া থাকাই তাঁহার দায় হইল। কাজেই তখন আর কি করা যায়? সংজ্ঞা একটি ঘোটকী সাজিয়া সেখান হইতে উত্তর মুখে ছুটিয়া পলাইলেন। সকল দেশের উত্তরে কুরুবর্ষ বা উত্তর কুরু। সেখানকার সুন্দর সবুজ মাঠের কচি কচি ঘাসগুলি খাইতে বড়ই মিষ্ট। সংজ্ঞা ছুটিতে ছুটিতে সেই দেশে গিয়া, সেখানকার সুন্দর মাঠের মিষ্ট ঘাস খাইয়া মনের আনন্দে কাল কাটাইতে লাগিলেন। সেখানে পুড়িয়াও মরিতে হয় না, বকুনিও খাইতে হয় না।

এদিকে সূর্যদেবের ঘরে কাজকর্ম সুন্দর মতেই চলিতেছে। ছায়া দেখিতে ঠিক সংজ্ঞারই মতো, আর কাজেকর্মেও বেশ ভালো। সুতরাং সূর্যদেব টেরই পান নাই যে একটা কিছু হইয়াছে। খোকা-খুকিরা কিন্তু ইহার মধ্যে বুঝিতে

পারিয়াছে যে তাহাদের মা আর তাহাদিগকে ভালোবাসে না। তাহারা জানুক, আর নাই জানুক, ছায়া তো আর তাহাদের মা নয়। সে তাহাদিগকে মার মতো ভালবাসিবে কি করিয়া? মনু শান্ত ছেলে, সে আদর না পাইয়াও চুপ করিয়া রহিল। যম রাগী, সে অভিমানের ভয়ে ছায়াকে পা দেখাইয়া বলিল, "তোমাকে লাথি মারিব।" ছায়াও তখন রাগে অস্থির হইয়া বলিল, "বটে? এত বড় আস্পর্দা? তোর ঐ পা খসিয়া পড়ুক।"

শাপের ভয়ে যম কাঁদিতে কাঁদিতে সূর্যের নিকট গিয়া নালিশ করিল, "বাবা, মা আমাদের ভালোবাসেন না বলিয়া আমি তাঁহাকে পা দেখাইয়াছিলাম, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন, আমার পা খসিয়া পড়িয়া যাইবে। বাবা আমি তো লাথি মারি নাই, তুমি আমার পা খসিয়া পড়িতে দিয়ো না।" সূর্য বলিলেন, "বাবা, তোমার মা যখন শাপ দিয়াছেন, তখন তো আর তাহা আটকাইবার উপায় নাই। তবে, এইটুকু করা যাইতে পারে যে পোকায় তোমার পায়ের মাংস অল্পে অল্পে লইয়া যাইবে, আস্ত পা খসিয়া পড়ার দরকার হইবে না।"

তারপর সূর্যদেব ছায়ার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি মা হইয়া ছেলের সঙ্গে এমন ব্যবহার কেন করিতেছ?" ছায়া প্রথমে চুপ করিয়া রহিল কিন্তু তারপরই যখন সূর্য বিষম রাগের ভরে তাঁহার চুল ধরিয়া শাপ দিবার আয়োজন করিলেন, তখন আর সে না বলিয়া যায় কোথায়?

সে কথা শুনিয়া সূর্য যে কিরূপ ব্যস্তভাবে তাঁহার শ্বশুরের নিকট ছুটিয়া আসিলেন, তাহা কি বলিব। বিশ্বকর্মা দেখিলেন, ঠাকুর বড় বেজায় রকমের চটিয়াছেন, তাঁহার মুখ দিয়া ভালো করিয়া কথাই বাহির হইতে পারিতেছে না। তখন তিনি তাঁহাকে অনেক মিষ্টকথায় শান্ত করিয়া বলিলেন, "ঠাকুর জানেন তো আপনার তেজ কি ভয়ংকর। আমার মেয়ে সে তেজ কিছুতেই সহিতে না পারিয়া ভয়ে পলায়ন করিয়াছে। তবে, আপনি যদি চাহেন তো আপনার এই তেজ আমি অনেকটা কমাইয়া দিতে পারি। তাহা হইলে সংজ্ঞারও আপনার নিকট থাকিতে কষ্ট হইবে না। আর আপনার চেহারাটাও অনেক মোলায়েম হইয়া যাইবে।"

সূর্য বাস্তবিকই সংজ্ঞাকে অতিশয় ভালোবাসিতেন। কাজেই তিনি তৎক্ষণাৎ বিশ্বকর্মার কথায় রাজি হইলেন। বিশ্বকর্মা আর দেরি না করিয়া তাড়াতাড়ি ঠাকুরকে কুঁদে চড়াইয়া দিলেন। আগেই বলিয়াছি, সূর্য সে সময়ে তেমন গোল ছিলেন না। কুঁদে চড়াইয়া শোঁশোঁ শব্দে কয়েক পাক দিতেই তাঁহার উষ্কখুষ্ক কিরণগুলি বাটালির মুখে উড়িয়া গেল আর তাহার ভিতর হইতে তাঁহার ঐ সুন্দর গোল মুখখানি দেখা দিল, তখন সকলেই বলিল, "বাঃ, বেশ হইয়াছে। এখন ঠাকুর যেমন ঠাণ্ডা, তেমনি দেখিতেও ভালো।"

এ কথায় সূর্যদেব যারপরনাই সন্তুষ্ট হইয়া সংজ্ঞাকে খুঁজিতে বাহির হইলেন। তিনি শুনিয়াছিলেন, সংজ্ঞা ঘোটকী সাজিয়া উত্তর দিকে পলায়ন

করিয়াছেন। কাজেই তাঁহাকে কোন দিকে যাইতে হইবে তাহা আর বুঝিতে বাকি রহিল না। সংজ্ঞা সাজিয়াছিলেন ঘোটকী, তিনি সাজিলেন ঘোড়া। তারপর সেই যে সেখান হইতে তিনি চিঁ-হিঁ হীঁ হীঁ শব্দে ছুট দিলেন, আর একেবারে সংজ্ঞার সম্মুখে উপস্থিত না হইয়া থামিলেন না। কিন্তু সংজ্ঞাকে তিনি সহজে ধরিতে পারেন নাই, কারণ সে বেচারী কি করিয়া জানিবেন যে ঐ যে চিঁ-হিঁ হীঁ হীঁ শব্দে ঘোড়াটি ছুটিয়া আসিতেছে, সেই হইতেছে তাঁহার স্বামী? কাজেই তিনি তাহাকে দেখিয়া প্রাণপণে ছুটিয়া পলাইয়াছিলেন। যাহা হউক, শেষে সকল গোলই চুকিয়া গেল, আর তখন তো সুখের সীমাই রহিল না।

সন্দেশ—অগ্রহায়ণ ১৩২১

পিপ্পলাদ

দধীচি মুনির নাম হয়তো তোমরা অনেকেই শুনিয়াছ। তাঁহার মতন তপস্যা অতি অল্পলোকেই করিয়াছে। মহর্ষি দধীচি অতিশয় শান্ত আর পরম দয়ালু ছিলেন। গঙ্গার ধারে নিজের আশ্রমে থাকিয়া পত্নী প্রাতিথেয়ীকে লইয়া ভগবানের নাম করা, গাছপালার প্রতি যত্ন, সকল জীবে দয়া আর অতিথি আসিলে তাহার সেবা করা, এ-সকল ছাড়া তাঁহার আর কাজ ছিল না। কিন্তু এই নিরীহ লোকটির তপস্যার এমনি তেজ ছিল যে, তাহার ভয়ে অসুরেরা তাঁহার আশ্রমের কাছে আসিতেই থর্‌থর্‌ করিয়া কাঁপিত। অথচ দেবতাদিগকে সেই অসুরেরা জ্বালাতনের একশেষ করিত। কতকাল ধরিয়া যে ইঁহাদের যুদ্ধ চলিয়াছিল, তাহার ঠিকানাই নাই। সেই যুদ্ধে কখনো দেবতারা জিতিতেন, কখনো-বা অসুরদিগের নিকট হারিয়া বিধিমতে নাকাল হইতেন। যাহা হউক, একবার দেবতারা নানারকমের আশ্চর্য আশ্চর্য অস্ত্র সংগ্রহ করিয়া অসুরদিগকে খুবই হারাইয়া দিলেন। তারপর তাঁহাদের এই চিন্তা হইল যে, এ-সকল অস্ত্রের কাজ তো ফুরাইল, এখন এগুলোকে কোথায় রাখা যায়? যুদ্ধ করিয়া শরীর অত্যন্ত কাহিল হইয়াছে, এগুলোকে আর স্বর্গে বহিয়া নেওয়ার শক্তি নাই, সেখানে লইয়া গেলেও হয়তো আবার কোন দিন অসুরেরা আসিয়া কাড়িয়া নিবে।

শেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তাঁহারা দধীচির নিকট আসিয়া বলিলেন, "মুনিঠাকুর, আমাদের এই অস্ত্রগুলি যদি দয়া করিয়া আপনার নিকট রাখেন, তবে আমাদের বড় উপকার হয়। আপনার কাছে থাকিলে আর দৈত্যেরা এগুলি চুরি করিতে পারিবে না" এ কথায় দধীচি সবে বলিয়াছিলেন, "যে আজ্ঞা" অমনি প্রাতিথেয়ী তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, "ওগো, তুমি এই ফ্যাঁসাতের ভিতরে যাইয়ো না। দেবতা মহাশয়েরা এখন মিষ্ট কথা কহিতেছেন, কিন্তু আমাদের এখানে থাকিয়া যদি জিনিসগুলি নষ্ট হয় বা চুরি যায়, তখন ইঁহারা বড়ই চটিবেন।" দধীচি বলিলেন, "তাই তো এখন আর কি করা যায়?

'যে আজ্ঞা' বলিয়া ফেলিয়াছি, এখন তো আর 'না' বলা যাইতে পারে না।"

কাজেই অস্ত্রগুলি দধীচির আশ্রমেই রহিল, আর দেবতারা তাহাতে যার-পরনাই তুষ্ট হইয়া নিজের নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন। তারপর এক বৎসর যায়, দু বৎসর যায়, ক্রমে সাড়ে তিনলাখ বৎসর কাটিয়া গেল, তবুও দেবতাদের আর কোনো খোঁজ-খবর নাই। ততদিনে অস্ত্রে মরিচা তো ধরিয়াছেই, তাহা ছাড়া অসুরদের আবার বেজায় তেজ বাড়িয়া উঠিয়াছে। দিনরাত কেবল ঐ অস্ত্রগুলির উপর তাহাদের চোখ ; না জানি কখন কোন ফাঁকে সেগুলিকে লইয়া যাইবে। তখন দধীচি ভাবিলেন যে, দেবতারা তো আসিলেনই না, এখন অস্ত্রগুলি যাহাতে অসুরদের হাতে না পড়ে, তাহার উপায় দেখিতে হয়।

সে বড় আশ্চর্য উপায়। জলে মন্ত্র পড়িয়া অস্ত্রগুলিকে তাহা দ্বারা ধুইব মাত্র, তাহাদের সকল তেজ সেই জলে গুলিয়া গেল। সে জল দধীচি তখনই খাইয়া ফেলিলেন, কাজেই আর কোনো চিন্তার কথাই রহিল না। তারপর দেখিতে দেখিতে অস্ত্রগুলি আপনা হইতেই ক্ষয় হইয়া গেল, তখন অসুরেরা আর কি নিবে?

দধীচি সবে এই কাজটি করিয়া একটু নিশ্চিন্ত হইয়াছেন, আর ঠিক সেই সময়ে দেবতাদের অস্ত্রগুলির কথা মনে পড়িয়াছে। এতদিন বাদে, এত কাণ্ড-কারখানার পরে, তাঁহারা আসিয়া দধীচিকে বলিলেন, "ঠাকুর, অসুরেরা তো আবার ভারি মুশকিল বাধাইয়াছে। শীঘ্র আমাদের অস্ত্রগুলি দিন।"

দধীচি বলিলেন, "তাই তো আপনারা এতদিন আসেন নাই, তাই আমি দৈত্যদের ভয়ে সেগুলি খাইয়া ফেলিয়াছি। এখন কি করি বলুন?"

তাহা শুনিয়া দেবতারা বলিলেন, "আমরা আর কি বলিব? আমরা বলি আমাদের অস্ত্রগুলি দিন। অস্ত্র না পাইলে আর আমাদের বিপদের সীমাই থাকিবে না!"

দধীচি বলিলেন, "সে-সকল অস্ত্র তো এখন আমার হাড়ের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। আপনারা নাহয় সেই হাড়গুলি নিন।"

দেবতারা বলিলেন, "আমাদের অস্ত্রেরই দরকার, আপনার হাড় লইয়া আমরা কি করিব?"

দধীচি বলিলেন, "আমার হাড় দিয়া অতি উত্তম অস্ত্র প্রস্তুত হইবে। আমি এখনই দেহত্যাগ করিতেছি।"

কাজেই তখন দেবতারা আর কি করেন? তাঁহারা বলিলেন, "আচ্ছা তবে একটু শীঘ্র শীঘ্র তাহাই করুন!"

দেবী প্রাথিতেয়ী তখন ঘরে ছিলেন না, স্নান করিতে গিয়াছিলেন। দেবতারা সেই বুদ্ধিমতী, তেজস্বিনী মেয়েকে বড়ই ভয় করিতেন, তাই তাঁহারা ভাবিলেন যে, তিনি ফিরিয়া আসিবার পূর্বেই কাজ শেষ করিতে হইবে। দধীচি যোগাসনে বসিয়া একমনে ভগবানের চিন্তা করিতে লাগিলেন ; দেখিতে দেখিতে তাঁহার পবিত্র আত্মা দেহ ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

তখন দেবতারা বিশ্বকর্মাকে বলিলেন, "এখন তুমি ইঁহার হাড় দিয়া অস্ত্র-

শস্ত্র তয়ের কর।"

বিশ্বকর্মা বলিলেন, "আমি কি করিয়া অস্ত্র তয়ের করিব? ইঁহার দেহ কাটিলে তবে তো হাড় পাওয়া যাইবে। বাপ রে! সে কাজ আমাদ্বারা হইবে না! হাড়গুলি পাইলে আমি এখনই তাহা দিয়া অস্ত্র গড়িয়া দিতে পারি।"

তখন দেবতাদের কথায় গোরুর দল আসিয়া গুঁতাইয়া মুনির দেহ হইতে হাড় বাহির করিয়া দিল, দেবতারাও মহানন্দে তাহা লইয়া প্রস্থান করিলেন। সেই হাড় দিয়া শেষে বিশ্বকর্মা বজ্র প্রভৃতি নানারূপ আশ্চর্য অস্ত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

এদিকে প্রাতিথেয়ী স্নান আহ্নিকের পর কলসী হাতে আশ্রমে ফিরিয়া দেখেন, মহর্ষি নাই, তাঁহার মাংস, লোম আর চামড়া মাত্র পড়িয়া আছে। ঘরে অগ্নি ছিলেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেবী সকল কথাই জানিতে পারিলেন। সেই দারুণ সংবাদ বজ্রাঘাতের ন্যায় তাঁহার চেতনা হরণ করিয়া লইল ; তাঁহার দেহ ধুলায় লুটাইয়া পড়িল। জ্ঞান হইলে পর অনেক কষ্টে শোক সম্বরণপূর্বক তিনি দধীচির দেহের অবশিষ্টটুকু লইয়া আগুনে ঝাঁপ দিলেন। যাইবার সময়ে নিজের নিতান্ত শিশুপুত্রটিকে গঙ্গার নিকটে আর গাছ-পালার নিকটে সঁপিয়া দিয়া বলিয়া গেলেন, "এই পিতৃমাতৃহীন শিশুটিকে তোমরা দয়া করিয়া দেখিবে।"

দধীচিও গেলেন প্রাতিথেয়ীও গেলেন। আশ্রম অন্ধকার হইল। তপোবনের পশুপক্ষী আর বৃক্ষলতারা তখন কাঁদিয়া বলিল, "হায়! যাঁহারা আমাদের পিতা-মাতার মতো ছিলেন, তাঁহাদের দুজনকেই হারাইলাম। আমাদের কি দুর্ভাগ্য! আর তো আমরা তাঁহাদের সেই পবিত্র মুখ দেখিতে পাইব না। এখন তাঁহাদের এই শিশুটিকে দেখিয়াই আমাদের মন শান্ত থাকিবে।"

এখন হইতে এই শিশুটিকে পালন করাই হইল তাহাদের একমাত্র কাজ। চন্দ্রের নিকট হইতে অমৃত চাহিয়া আনিয়া তাহারা শিশুটিকে খাইতে দিল, সেই অমৃতের গুণে শিশু দেখিতে দেখিতে শুক্লপক্ষের চাঁদের মতো বাড়িয়া উঠিল। পিপুল (অশ্বত্থ) গাছেরা তাহার বড়ই যত্ন করিয়াছিল, তাই তাহার নাম হইল পিপ্পলাদ।

পিপ্পলাদ জানিত, সে সেই-সকল গাছপালারই ছানা। তারপর যখন তাহার বুদ্ধি একটু বাড়িয়াছে, তখন সে একদিন তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, "গাছের ছানা তো গাছের মতোই হয়, মানুষের ছানা মানুষের মতো হয়, পাখির ছানা হয় পাখির মতো আর জন্তুর ছানা জন্তুর মতো। কিন্তু আমি যে তোমাদের ছানা, আমার এমন হাত-পা হইল কি করিয়া?"

গাছেরা বলিল, "বাছা, তুমি তো আমাদের ছানা নও। তুমি মুনির পুত্র, তোমার পিতা মহর্ষি দধীচি, মাতা দেবী প্রাতিথেয়ী।"

পিপ্পলাদ বলিল, "আমার বাবা আর মা তবে কোথায় গেলেন?" গাছেরা বলিল, "তোমার পিতা দেবতাদের উপকারের জন্য প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তোমার

মাতা সেই দুঃখে আগুনে ঝাঁপ দিয়াছেন।”

এমনি করিয়া গাছেরা সকল কথাই পিপ্পলাদকে বলিল। তাহা শুনিয়া সে আগে গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিল, তারপর গাছেদের মিষ্ট কথায় একটু শান্ত হইয়া রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, “আমার পিতাকে যাহারা মারিয়াছে, তাহাদিগকে আমি মারিব।”

তখন গাছেরা সেই ছেলেটিকে চন্দ্রের নিকট লইয়া গিয়া সকল কথা বলিল।

তাহা শুনিয়া চন্দ্র বলিলেন, “বৎস পিপ্পলাদ! বল, বুদ্ধি, বিদ্যা, ধন, রূপ, গুণ, সুখ, মান, যশ, পুণ্য, সকলই আমি তোমাকে দিতেছি, তুমি গ্রহণ কর।”

পিপ্পলাদ বলিল, “আমার পিতাকে যাহারা মারিয়াছে, তাহাদিগকে যদি না মারিতে পারিলাম, তবে এ-সব লইয়া আমার কি হইবে? আগে বলুন, কোথায়, কোন দেশে, কোন তীর্থে গিয়া, কি মন্ত্র বলিয়া, কোন দেবতাকে ডাকিয়া আমি এ কাজ করিতে পারিব?”

চন্দ্র বলিলেন, “শিবকে ডাক, তোমার কাজ হইবে।”

পিপ্পলাদ বলিল, “আমি যে ছেলেমানুষ, আমি তো কিছুই জানি শুনি না, আমি কেমন করিয়া তাঁহাকে ডাকিব?”

চন্দ্র বলিলেন, “তুমি চক্রেশ্বর তীর্থে গিয়া ভক্তিভরে তাঁহার কথা ভাব, আর তাঁহাকে ডাক, তবেই তিনি আসিবেন।”

পিপ্পলাদ তখনই সেই তীর্থে গিয়া প্রাণপণে শিবকে ডাকিতে লাগিল। সেই ডাকে শিব তাহার সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, “পিপ্পলাদ, কি চাহ?”

পিপ্পলাদ বলিল, “আমার দেবতুল্য ধার্মিক পিতামাতাকে যাহারা মারিয়াছে, আমি তাহাদিগকে মারিতে পারি, এমন ক্ষমতা আমাকে দিন।”

শিব কহিলেন, “আচ্ছা, তুমি যদি আমার তিনটা চোখই দেখিতে পার, তাহা হইলে দেবতাদিগকে মারিতে পারিবে।”

কিন্তু পিপ্পলাদ অনেক চেষ্টা করিয়াও তাঁহার দুইটা বৈ চোখ দেখিতে পাইল না।

তখন শিব বলিলেন, “আর কিছুদিন তপস্যা কর, দেখিতে পাইবে।”

এ কথায় পিপ্পলাদ এমনি ভয়ংকর তপস্যা আরম্ভ করিল যে, অল্পদিনের ভিতরেই সে দেখিল, শিবের কপালে আর একটি চোখ আছে। তখন শিবের সেই চোখ হইতে আগুনের ঘোড়ার মতন একটা ভয়ংকর ‘কৃত্যা’ (ভূত) বাহির হইয়া ঘোরতর শব্দে পিপ্পলাদকে বলিল, “কি করিব?”

পিপ্পলাদ বলিল, “দেবতাদিগকে ধরিয়া খাও!”

বলিতে বলিতেই সেটা খপ্ করিয়া পিপ্পলাদকে ধরিয়া মুখে দিতে গিয়াছে!

পিপ্পলাদ ভয়ানক থতমত খাইয়া চ্যাঁচাইয়া বলিল, “আরে, আরে, ও কি কর?”

সেটা বলিল, "দেবতাদিগকে খাইতে হইলে, তাহারা যে তোমার শরীর গড়িয়াছে, তাহাও খাইব।"

এ কথায় পিপ্পলাদ আবার শিবের স্তব করিলে, শিব সেই ভয়ংকর জিনিসটাকে বলিলেন, "এ স্থানের এক যোজনের মধ্যে তুমি কাহাকেও খাইতে পারিবে না!" তখন সেই ভূতটা সেখান হইতে দূরে গিয়া এমনই সর্বনেশে আগুন জ্বালাইয়া বসিল যে, আর একটু হইলেই সে দেবতার দলকে পোড়াইয়া শেষ করিত! দেবতারা প্রাণের ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে শিবের নিকট আসিয়া বলিলেন, "রক্ষা করুন প্রভো! আপনার ভূত আমাদিগকে পোড়াইয়া মারিল। আপনি রক্ষা না করিলে এ-যাত্রা আর আমাদের উপায় নাই।"

শিব তাঁহাদিগকে বলিলেন, "তোমরা এইখানে আসিয়া বাস কর। এখানে ওটা তোমাদের কিছু করিতে পারিবে না।"

দেবতারা বলিলেন, "স্বর্গ আমাদের বাসস্থান, তাহা ছাড়িয়া এখানে কি করিয়া থাকি?"

শিব কহিলেন, "তবে এক কাজ কর; সূর্যই হইতেছেন এই সংসারের পিতা। তিনি আসিয়া এখানে বাস করুন, তাহাতেই সকল দেবতার বাস করা হইবে।" এইরূপে তখনকার মতো বিপদ কাটিয়া গেল।

তারপর শিবের উপদেশে পিপ্পলাদের রাগও দূর হইল। তখন শিব অনেকবার পিপ্পলাদকে বর লইতে বলিলেন। পিপ্পলাদ এমন সব বর প্রার্থনা করিল, যাহাতে জগতের উপকার হয়। নিজের জন্য সে কিছুই চাহিল না।

ইহাতে দেবতাগণ যারপরনাই তুষ্ট হইয়া তাহাকে বলিলেন, "বাছা, তুমি তো তোমার নিজের জন্য কিছুই চাহিলে না। আমরা তোমাকে বর দিব, তুমি তোমার নিজের জন্য কিছু চাহিয়া লও।"

তখন পিপ্পলাদ জোড়হাতে দেবতাদিগকে নমস্কার করিয়া বলিল, "আমার পিতামাতার পবিত্র নাম কানে শুনিয়াছি মাত্র, তাঁহাদিগকে দেখিবার সুখ এই অভাগার ভাগ্যে ঘটে নাই, ইহাতে আমার মন বড় অস্থির থাকে।"

দেবতারা বলিলেন, "সেজন্য তুমি কিছুমাত্র দুঃখিত হইয়ো না, এখনই তোমার পিতামাতাকে দেখিতে পাইবে।"

এ কথা শেষ হইতে-না-হইতেই পিপ্পলাদের পিতামাতা দিব্য বেশ পরিয়া, সোনার রথে চড়িয়া স্বর্গ হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পিপ্পলাদ অমনি তাঁহাদের পায়ে লুটাইয়া পড়িল, কিন্তু তাঁহাদের মুখের দিকে চাহিয়া ক্রমাগত চোখের জল ফেলা ভিন্ন আর একটিও কথা কহিতে পারিল না।

দধীচি ও প্রাতিথেয়ী তাহাকে অনেক আদর, অনেক আশীর্বাদ করিয়া, তাহার মনের সকল দুঃখ দূর করিয়া, আবার স্বর্গে চলিয়া গেলেন।

এইভাবে সকল দিকেই সুখ হইল, এখন পিপ্পলাদের সেই ভয়ংকর ভূতটা থামিলেই আর কোনো কথা ছিল না।

দেবতারা বলিলেন, "পিপ্পলাদ, তোমার এটাকে থামাও।"

পিপ্পলাদ বলিল, "সে সাধ্য তো আমার নাই। আপনারা গিয়া উহাকে

থামিতে বলুন ; আমাকে দেখিলে আবার কি না জানি করিতে চাহিবে।"

সে কথায় দেবতারা সেই ভয়ংকর জিনিসটার কাছে গিয়া তাহাকে থামিতে বলিলেন। সে তাহাতে খেঁকাইয়া বলিল, "তাহা হইবে না! সকলকে খাইব, তবে তো থামিব। তাহার আগে আমার এ আগুন কিছুতেই নিভিবার নয়।" বাস্তবিক, ইহাকে থামাইতে দেবতাদের বড়ই বেগ পাইতে হইয়াছিল। সে অনেক কথা, এখন আমার তাহা বলিবার অবসর নাই।

সন্দেশ - পৌষ ১৩২১

রেবতীর বিবাহ

এক রাজা ছিলেন, তাঁহার নাম ছিল রৈবত ককুদ্মী। পশ্চিম সমুদ্রের ধারে, কুশস্থলী নামক নগরে তিনি বাস করিতেন। রৈবতের একটি কন্যা ছিল, তাহার নাম রেবতী। রেবতীর গুণের কথা আর বলিয়া শেষ করা যায় না। মেয়েটি দেখিতে যেমন অপরূপ সুন্দরী, তেমনি সুশীলা আর মিষ্টভাষিণী, আর বুদ্ধিমতীও যতদূর হইতে হয়।

রেবতী যতই বাড়িয়া উঠিলেন, রাজার মনেও ততই ভাবনা হইল যে, 'আহা! আমার এই স্নেহের মেয়েটিকে এখন কাহার হাতে সমর্পণ করি?'

সংসারের যত ভালো ভালো রাজপুত্র একে একে সকলের সংবাদ রাজা লইলেন, কিন্তু কাহাকেও তাঁহার পছন্দ হইল না। মন্ত্রী, পুরোহিত, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব সকলকেই বলিলেন, কেহই তেমন ভালো একটি পাত্রের সন্ধান করিয়া দিতে পারিল না।

শেষে আর কোনো উপায় না দেখিয়া তিনি ভাবিলেন, 'ব্রহ্মার কাছে যাই, তিনি অবশ্যই আমার মনের মতন একটি ছেলের কথা বলিতে পারিবেন।'

এই ভাবিয়া রাজা কন্যাটিকে লইয়া ব্রহ্মার সভায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন হাহা আর হূহূ নামে দুইজন গন্ধর্ব সেইখানে বসিয়া ব্রহ্মাকে গান শুনাইতেছিলেন। হাহা আর হূহূর মতো ওস্তাদ আর এই ত্রিভুবনে কখনো দেখা যায় নাই, তাঁহাদের সেই বিচিত্র সংগীত শুনিতে যে কি মিষ্ট লাগিতে-ছিল, তাহা কি বলিব! সে গান একবার শুনিতে আরম্ভ করিলে আর সকল বিষয়ের কথা ভুলিয়া যাইতে হয়। যতক্ষণ সে গানের শেষ না হয় ততক্ষণ আর উঠিয়া আসিবার জো থাকে না। সে আশ্চর্য গান একবার আরম্ভ হইলে আর শীঘ্র শেষও হইতে চাহে না। সেটা ছিল ত্রেতাযুগের আরম্ভ। গাহিতে গাহিতে সে যুগ শেষ হইয়া গেল, তারপর দ্বাপর আসিল, তাহাও প্রায় শেষ হইতে চলিল, তবে হাহা হূহূ গান শেষ করিয়া তম্বুরা নামাইলেন। এতকাল যে চলিয়া গিয়াছে, রাজার কিন্তু সে খেয়ালই নাই। তিনি ভাবিতেছেন, 'আহা, এমন সুন্দর গান মুহূর্তের মধ্যেই ফুরাইয়া গেল?'

যাহা হউক, এখন নিজের কাজ সারিয়া লইতে হইবে আর বিলম্ব করা

ভালো নহে। এই ভাবিয়া রাজা ব্রহ্মার সিংহাসনের সামনে গিয়া ভক্তিভরে প্রণামের পর জোড়হাতে বলিলেন, "ভগবন্! আমার এই কন্যাটির বিবাহ কাহার সঙ্গে দিব, দয়া করিয়া আমাকে বলিয়া দিন। আমি অনেক রাজপুত্রের সন্ধান লইয়াছি, কিন্তু ইহাদের কোনটি যে সকলের চেয়ে ভালো, তাহা স্থির করিতে পারিতেছি না।"

ব্রহ্মা বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি কাহার কাহার কথা ভাবিয়াছ, আমাকে বল দেখি।"

সে কথায় রাজা অনেকের নাম করিয়া বলিলেন, "ইঁহাদের মধ্যে একটি হইলে আমি সুখী হইতাম।" তাহা শুনিয়া ব্রহ্মা হাসিয়া বলিলেন, "মহারাজ, তুমি যাহাদের নাম করিলে, এখন তো তাহাদের কেহই বাঁচিয়া নাই ; তাহারা ছিল ত্রেতা যুগের লোক, আর এখন হইল দ্বাপরের শেষ। এতদিনে তাহাদের ছেলের ছেলে, নাতির নাতি অবধি মরিয়া গিয়াছে, তাহাদের রাজ্য, বংশ, নাম অবধি লোপ পাইয়াছে!"

তোমরা হয়তো ভাবিতেছ যে, পৃথিবীর আর সব লোক মরিয়া গেল, আর শুধু রাজা আর তাঁহার মেয়েটি বাঁচিয়া রহিয়াছেন, এ কেমন কথা হইল?

কিন্তু সে যে ব্রহ্মার পুরী, সেখানে তো জরা মৃত্যুর অধিকার নাই। কাজেই তাঁহারা দুজন শুধু যে বাঁচিয়া আছেন তাহাই নহে, ঠিক যেমনটি গিয়াছিলেন তেমনি আছেন, একটুও বুড়া হন নাই!

যাহা হউক, ব্রহ্মার কথায় রাজা নিতান্তই আশ্চর্য হইলেন আর ভয় পাইলেন, আর ব্যস্ত হইলেন তাহার চেয়েও বেশি।

তিনি বিষম থতমত খাইয়া বলিলেন, "এ্যাঁ, এ্যাঁ! কি সর্বনাশ। তাই তো! প্রভু, এখন উপায়? এখন তবে আমার এই মেয়েটিকে কাহার হাতে দিই? আমার সমকক্ষ রাজা এখন কে কে আছেন?"

ব্রহ্মা বলিলেন, "মহারাজ! এতদিনে কি আর তোমার সে রাজ্য আছে? তোমার রাজ্যও নাই, প্রজারাও নাই। তোমার সেই সুন্দর কুশস্থলী নগরটি অবধি নাই। তাহার জায়গায় এখন দ্বারকা নামক পুরী হইয়াছে। সেই দ্বারকার রাজা কৃষ্ণ, তাঁহার ভাই বলরাম। সেই বলরামের সঙ্গে গিয়া তোমার এই কন্যার বিবাহ দাও। এ মেয়েটি যেমন লক্ষ্মী, বলরামও তেমনি মহাশয় লোক, সকলরকমেই ইহার উপযুক্ত।"

কাজেই রাজা তখন আর কি করেন? তিনি ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়া দেখেন, বাস্তবিকই তাঁহার রাজ্য, রাজধানী, লোকজন, আত্মীয়-স্বজন সব লোপ পাইয়াছে। পৃথিবী আর সে পৃথিবীই নাই। তাঁহাদের সময়ে চৌদ্দ হাত লম্বা এক-একটা মানুষ হইত, আর এখনকার লোকগুলি মোটে সাত হাত লম্বা! আর তাহাদের চালচলনও যেন কেমন কেমন হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, আর দুঃখ করিয়া কি হইবে? রাজা বলরামকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া, তাঁহার সহিত মেয়ের বিবাহ দিয়া বনবাসী হইলেন।

এদিকে রেবতীকে পাইয়া বলরামের আর আনন্দের সীমাই নাই। কেবল একটি কথায় তিনি একটু মুশকিলে পড়িয়াছেন, বলরাম হইতেছেন দ্বাপর যুগের লোক, তিনি সাত হাত লম্বা, রেবতী ত্রেতা যুগের মেয়ে, তিনি চৌদ্দ হাত লম্বা, বলরাম প্রাণপণে হাত বাড়াইয়াও তাঁহার মাথা নাগাল পান না!

তখন বলরাম করিলেন কি, তাঁহার লাঙলের আগা দিয়া রেবতীকে চাপিয়া অন্যান্য মেয়েদের মতো বেঁটে করিয়া লইলেন। তারপর আর কোনো অসুবিধা রহিল না।

সন্দেশ—মাঘ ১৩২১

ইন্দ্র হওয়ার সুখ

দেবতাদের যিনি রাজা, তাঁহাকে বলে ইন্দ্র। তাঁহার কথা তোমরা অবশ্যই শুনিয়াছ। তাঁহার একহাজার চক্ষু আর সবুজ রঙের দাড়ি ছিল। তাঁহার আসল নাম শক্র, পিতার নাম কশ্যপ, রানীর নাম শচী, পুত্রের নাম জয়ন্ত, হাতির নাম ঐরাবত, ঘোড়ার নাম উচ্চৈঃশ্রবা, সারথির নাম মাতলি, সভার নাম সুধর্মা, বাগানের নাম নন্দন আর অস্ত্রের নাম বজ্র। তাঁহার সভায় গন্ধর্বেরা গান গাইত, অপ্সরারা নাচিত।

লোকে ভাবিত ইন্দ্র বড়ই সুখে থাকেন আর অনেক সময়ই যে তিনি খুব জাঁকজমকের ভিতরে দিন কাটাইতেন, এ কথা সত্যও বটে। কিন্তু সময় সময় তাঁহাকে বেগও কম পাইতে হইত না। দেবতাদের সঙ্গে অসুরদের ভয়ানক শত্রুতা ছিল, আর সেই সূত্রে অসুরেরা মাঝে মাঝে ইন্দ্রকে বড়ই নাকাল করিত। দেবতা আর অসুরের যুদ্ধে একবার বৃত্র নামে একটা অসুর ইন্দ্রকে ধরিয়া গিলিয়া ফেলিয়াছিল। দেবতারা তখন অনেক বুদ্ধি করিয়া সেই অসুরটাকে 'জৃম্ভিকা' অস্ত্র ছুঁড়িয়া মারেন, তাই ইন্দ্র রক্ষা পান, নচেৎ সে যাত্রা আর তাঁহার বিপদের সীমাই ছিল না। জৃম্ভিকা অস্ত্রের গুণ অতি আশ্চর্য। সে অস্ত্র গায়ে লাগিবামাত্র অসুরটা ভয়ানক হাই তুলিল, আর ইন্দ্র সেই ফাঁকে তাহার পেটের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন।

এই যুদ্ধ ভালো করিয়া শেষ হইতে না হইতেই আবার ইন্দ্রের এক নূতন বিপদ উপস্থিত হইল। পূর্বে কোনো কারণে তাঁহার ব্রহ্মহত্যার পাপ হয়। বৃত্রের মৃত্যুর পরে সেই ব্রহ্মহত্যা তাঁহাকে তাড়াইয়া বেড়াইতে লাগিল। বেচারা ভয়ে অস্থির হইয়া যেখানেই পলাইতে যান, ব্রহ্মহত্যা তাঁহাকে তাড়াইয়া সেইখানে গিয়া উপস্থিত হয়। শেষে আর উপায় না দেখিয়া, তিনি একটা প্রকাণ্ড সরোবরের মধ্যে, পদ্মের মৃণালের ভিতরে গিয়া সুতা হইয়া লুকাইয়া রহিলেন। তখন কাজেই ব্রহ্মহত্যা ঠকিয়া গেল। কিন্তু, তথাপি সে তাঁহাকে সহজে ছাড়ে নাই, সে প্রায় সাড়ে তিনলক্ষ বৎসর সেইখানে তাঁহার অপেক্ষায় বসিয়া-

সাড়ে তিনলক্ষ বছর তো আর একদিন দুইদিনের কথা নয়, দেবতার হিসাবেও তাহা একহাজার বৎসর। কাজেই দেবতারা তাঁকে এতদিন দেখিতে না পাইয়া ব্যস্তভাবে তাঁহাকে খুঁজিতে লাগিলেন। শেষে ব্রহ্মার কথায় যদিও তাঁহার সন্ধান পাইলেন তথাপি তাঁহাকে ঘরে আনিতে সাহস পান নাই, কারণ ব্রহ্ম-হত্যা তখনও তাঁহার জন্য সেখানে বসিয়া আছে, সে তাঁহাকে সহজে ছাড়িবে কেন? তখন দেবতারা পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, কোনো পবিত্র নদীতে স্নান করাইয়া ইন্দ্রের শরীরের পাপ ধুইয়া ফেলিবেন, তাহা হইলেই ব্রহ্মহত্যা তাঁহাকে ছাড়িয়া দিবে। এই বলিয়া তাঁহারা ইন্দ্রকে গৌতমী নদীতে স্নান করাইতে গেলেন। সেখানে মহর্ষি গৌতমের আশ্রম ছিল। গৌতম যারপরনাই রাগিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন, "সে হইবে না, এই পাপীকে এখানে স্নান করাইলে আমি তোমাদিগকে শাপ দিয়া ভস্ম করিব! তোমরা শীঘ্র এখান হইতে যাও।"

এ কথায় দেবতারা নর্মদার জলে ইন্দ্রকে স্নান করাইতে গেলেন। সেখানে মাণ্ডব্য মুনির আশ্রম ছিল। মাণ্ডব্য মুনি বিষম ভ্রূকুটির সহিত তাঁহাদিগকে বলিলেন, "এখানে যদি ইঁহাকে স্নান করাও তবে এখনি তোমাদের শাপ দিয়া ভস্ম করিব।"

যাহা হউক, শেষে দেবতারা অনেক স্তুতি মিনতি করায় মাণ্ডব্য ইন্দ্রকে সেখানে স্নান করাইতে দিলেন। তারপর তাঁহাকে গৌতমীতে নিয়াও স্নান করান হইল। ইহার পর আবার ব্রহ্মা তাঁহার কমণ্ডলুর জল দিয়া ইন্দ্রকে ধুইলেন, তবে সে যাত্রার মতো তিনি একটু নিশ্চিন্ত হইলেন।

বাস্তবিক, ইন্দ্র হওয়া আগাগোড়াই সুখের কথা ছিল না। কিন্তু, লোকে ভাবিত ইন্দ্র বড় সুখী। তাই অনেকে ইন্দ্র হইবার জন্য কঠোর তপস্যা করিত। সেজন্য কাহাকেও খুব তপস্যা করিতে দেখিলেই ইন্দ্র ভাবিতেন, 'সর্বনাশ! এইবার বুঝি-বা আমার কাজটি যায়!' তখন তিনি লোকটির তপস্যা ভাঙিয়া দিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু, তাহা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে এক-এক জন লোক ইন্দ্র হইয়া যাইত!

নহুষ নামে এক রাজা একবার ইন্দ্র হইয়া কি হুলস্থুলই বাধাইয়াছিলেন! উচ্চৈঃশ্রবা ঐরাবতে তাঁহার মন উঠিল না, তিনি বলিলেন, "আমি বড়-বড় মুনিদের ঘাড়ে চড়িয়া বেড়াইব!"

অমনি এক আশ্চর্য পালকি প্রস্তুত হইল, মুনিরা হইলেন তাহার বেহারা। নহুষ তাহাতে উঠিয়া বসিয়া মুনিঠাকুরদের উপরে অসম্ভব তম্বি জুড়িয়া দিলেন। সে বেচারাদের গায়ে জোর কম। ফলমূল খাইয়া থাকেন, পালকি বহার অভ্যাস কাহারও নাই, তাঁহাদের কাজে নহুষের মন উঠিবে কেন? নহুষ তখন বেজায় চটিয়া মহর্ষি অগস্ত্যের মাথায় ধাঁই' শব্দে এক প্রচণ্ড লাথি লাগাইয়া দিলেন। তাহার ফলও পাইলেন হাতে-হাতেই, কেননা, তাহার পরমুহূর্তেই মুনির শাপে তাঁহার সেই সুখের ইন্দ্রগিরি ঘুচিয়া গেল, আর তিনি এক প্রকাণ্ড সাপ হইয়া হিমালয়ের নিকটে পড়িয়া গড়াগড়ি

যাইতে লাগিলেন!

আর-একবার অসুরদের সঙ্গে দেবতাদের ভীষণ যুদ্ধ চলিয়াছে, কিন্তু কেহই জয়লাভ করিতে পারিতেছেন না। সেই সময়ে পৃথিবীতে রজি নামে একজন অতিশয় ক্ষমতাশালী রাজা ছিলেন। দুই দলই ভাবিলেন, 'এই রজিকে আনিয়া আমাদের সঙ্গে জুটাইতে পারিলে নিশ্চয় আমরা জিতিব।'

এই ভাবিয়া দেবতারা রজিকে আসিয়া বলিলেন, "হে রাজন, তুমি আমাদের সঙ্গে মিলিয়া অসুর বধ কর, নাহিলে আমরা কিছুতেই তাহাদের সঙ্গে পারিয়া উঠিতেছি না!" রজি বলিলেন, "আপনারা যদি আমাকে ইন্দ্র করেন, তবে আমি আপনাদের সঙ্গে মিলিতে পারি।"

দেবতারা বলিলেন, "অবশ্য তোমাকে আমরা ইন্দ্র করিব, তুমি শীঘ্র আইস!"

এই বলিয়া দেবতারা সবে চলিয়া গিয়াছেন, অমনি অসুরেরা আসিয়া রজিকে বলিল, "মহারাজ, আপনি আমাদের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করুন।"

রজি দেবতাদিগকে যেমন বলিয়াছিলেন, তেমনি অসুরদিগকেও বলিলেন, "আপনারা যদি আমাকে ইন্দ্র করেন, তবে আমি আপনাদের কথায় রাজি আছি!"

কিন্তু, অসুরেরা সে কথায় অতিশয় ঘৃণার সহিত বলিল, "এমন সাহায্যের আমাদের প্রয়োজন নাই। আমাদের ইন্দ্র প্রহ্লাদ আর কোনো ইন্দ্র আমরা চাই না। আপনি নাহয় আমাদের পক্ষে নাই আসিলেন।"

তখন রজি দেবতাদের সঙ্গে জুটিয়া ভয়ানক রাগের সহিত অসুর মারিতে আরম্ভ করিলেন, আর তাহাতে অতি অল্পদিনের মধ্যেই দেবতাদের জয়লাভ হইল। ইন্দ্র দেখিলেন, এখন তো বড়ই বিপদ উপস্থিত, রজিকে এখন সিংহাসন ছাড়িয়া দিতে হইবে। তাই তিনি রজি নিজে কিছু বলিবার আগেই তাঁহাকে বলিলেন, "মহারাজ! লোকে বলে, যে ভয় হইতে রক্ষা করে, সে পিতা। আপনি আমাকে ভয় হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, কাজেই আপনি আমার পিতা হইলেন। আর তাহাতেই আপনি ইন্দ্রও হইলেন, কেননা ইন্দ্রের পিতা হইলে আর ইন্দ্র হওয়ার চেয়ে বেশি বৈ কম কি হইল?"

রজিও ইন্দ্রের সেই ফাঁকিতে ভুলিয়া আহ্লাদের সহিত দেশে ফিরিয়া আসিলেন, স্বর্গে রাজা হওয়ার কথা আর মুখে আনিলেন না।

এই রজির পাঁচশত মহাবীর পুত্র ছিল। রজির মৃত্যুর পরে এই পাঁচশত বীর মিলিয়া যুক্তি করিল, "দেবতারা ফাঁকি দিয়া আমাদের পিতাকে ইন্দ্রপদ হইতে বঞ্চিত করিয়াছিল, আইস, আমরা তাহার শোধ লইব!"

এই বলিয়া তাহারা দেবতাদিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিল, আর দেখিতে দেখিতে দলবল সহিত ইন্দ্রকে তাড়াইয়া দিয়া স্বর্গ আর পৃথিবী দুইই দখল করিয়া বসিল।

এই পাঁচশত ভাই যেমন বীর, তেমনি যদি বুদ্ধিমান হইত তবে আর ইন্দ্রের নিজ রাজ্য ফিরিয়া পাইবার কোনো উপায়ই থাকিত না। কিন্তু ইহারা

বুদ্ধিমানের মতন ধর্মপথে থাকিয়া রাজ্যপালন করার বদলে, নানারূপে অসৎ কার্যে নিজেদের বিষয় ও বল নষ্ট করিয়া ফেলিল। তাহার ফলে, অল্পদিনের ভিতরেই ইন্দ্র তাহাদিগকে তাড়াইয়া আবার আসিয়া স্বর্গের রাজা হইলেন।

ইন্দ্র হওয়ার যে কি সুখ, তাহার সম্বন্ধে আর-একটা মজার গল্প আছে। একবার অসুরেরা ঘোরতর যুদ্ধে দেবতাদিগকে যারপরনাই ব্যস্ত করিয়া তুলিলে, তাঁহারা সূর্যবংশের রাজা পরঞ্জয়কে আসিয়া বলিলেন, "মহারাজ, তুমি আমাদের হইয়া অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ কর।"

পরঞ্জয় কহিলেন, "আমি যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত আছি যদি আপনারা আমার একটি কথায় রাজি হন। আপনাদের যিনি ইন্দ্র, আমি তাঁহার কাঁধে চড়িয়া যুদ্ধ করিব।"

এ কথায় ইন্দ্র আর অন্য দেবতারা সকলেই বলিলেন, "হাঁ, হাঁ—তাহাই হইবে, তুমি আইস!"

তারপর আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইলে, ইন্দ্র বিশাল এক ষাঁড় সাজিয়া পরঞ্জয়কে কাঁধে করিয়া লইলেন, পরঞ্জয়ও তাহাতে ভারি খুশি হইয়া দুই দণ্ডের মধ্যে অসুর মারিয়া শেষ করিলেন। সেই ষাঁড়ের 'ককুদ্' অথবা কাঁধে চড়িয়া যুদ্ধ করায় তখন হইতে পরঞ্জয়ের নাম হইল 'ককুৎস্থ'। দশরথের পুত্র রাম এই ককুৎস্থ বংশের লোক ছিলেন বলিয়া, তাঁহাকেও অনেক সময়ে বলা হয় 'কাকুৎস্থ'।

ইন্দ্রগিরির মজার আর-একটা গল্প বলিয়া শেষ করিব। একজন অতি বিখ্যাত মুনি ছিলেন, তাঁহার নাম আত্রেয় (অত্রি মুনির পুত্র)। ঠাকুরটি বিস্তর যাগযজ্ঞ করিয়াছিলেন, আর তাহাতে তাঁহার ইচ্ছামতো সংসারের সর্বত্র চলা-ফেরার ক্ষমতা জন্মিয়াছিল।

একদিন তিনি বেড়াইতে বেড়াইতে ইন্দ্রের সভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানকার শোভা দেখিয়া, সেখানকার গীত-বাদ্য শুনিয়া, আর সেখানকার ময়রাদের তৈরি মিষ্টান্ন খাইয়া ঠাকুরের মন এমনই ভুলিয়া গেল যে, তিনি দিনরাতই কেবল ভাবিতে লাগিলেন, 'আহা! এই তো সুখ, এমনিই তো চাই!'

তারপর আশ্রমে ফিরিয়া আর তাঁহার নিজের কুঁড়েঘরটি কিছুতেই তাঁহার পছন্দ হয় না।

ব্রাহ্মণীকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওগো! এ-সব কি ছাই খাবার আমাকে খাইতে দাও? এ-সব কি খাইতে ভালো লাগে? ইন্দ্রের বাড়িতে যে চমৎকার মিঠাই খাইয়া আসিয়াছি, ফলমূলের তরকারি কিছুতেই তেমন করিতে পারিবে না!"

এই বলিয়া তিনি বিশ্বকর্মাকে ডাকিয়া হুকুম দিলেন, "আমার এই আশ্রমটিকে ঠিক ইন্দ্রের পুরীর মতো করিয়া দাও। নইলে তোমাকে শাপ দিয়া ভস্ম করিব! ঠিক তেমনি বাড়ি, তেমনি সভা, তেমনি বাগান, তেমনি হাতি, তেমনি ঘোড়া, তেমনি ঝাড়-লণ্ঠন, তেমনি গান-বাজনা, তেমনি মিঠাই-মণ্ডা, লোকজন—সব অবিকল চাই! খবরদার! যেন কোনো কথার একটু তফাত হয়

না!”

শাপের ভয়ে বিশ্বকর্মা তখনই তাড়াতাড়ি সেখানে এক ইন্দ্রপুরী তয়ের করিয়া দিলেন। মুনি-ঠাকুর সেই পুরীতে থাকেন, আর বলেন, “আহা এই তো সুখ! এমনই তো চাই।”

এমনিভাবে কিছুদিন যায়। ইহার মধ্যে অসুরেরা সেই পুরীর দিকে ভ্রূকুটি করিয়া তাকায় আর বলে, “দেখ ভাই, ইন্দ্র বেটা স্বর্গ ছাড়িয়া চুপিচুপি পৃথিবীতে আসিয়া ঘর বাঁধিয়াছে। চল, এই বেলা উহাকে ধরিয়া বৃত্রকে মারিবার সাজাটা ভালোমতে দিই!”

অমনি দলে দলে অসুর, “ইন্দ্র বেটাকে মার!” “ইন্দ্র বেটাকে মার!” বলিতে বলিতে আসিয়া সেই পুরী ঘিরিয়া বসিল।

মুনিঠাকুর মনের সুখে খাটের উপর বসিয়া আছেন, ইহার মধ্যে অসুরদের বিকট চীৎকারে তাহার প্রাণ উড়িয়া গেল। দেখিতে দেখিতে লাখে লাখে শেল, শূল, মুষল, মুদ্গর, গাছ, পাথর, আসিয়া তাঁহার সাধের পুরী চুরমার করিয়া দিতে লাগিল। দু-একটা তীরের খোঁচা যে না খাইলেন তাহাও নহে!

তখন তিনি তাড়াতাড়ি কাঁপিতে কাঁপিতে অসুরদের সামনে আসিয়া জোড়-হাতে বলিলেন, “দোহাই বাবা, আমি ইন্দ্র নহি! আমি মুনি, ব্রাহ্মণ, অতি নিরীহ দীন হীন মানুষ! আমার উপরে তোমাদের এত ক্রোধ কেন?”

অসুরেরা বলিল, “ইন্দ্র নহ, তবে ইন্দ্র সাজিয়াছ কেন? শীঘ্র তোমার এ-সব সাজগোজ দূর করিয়া দাও।”

মুনি বলিলেন, “এই যে বাপু! এক্ষণি আমি এ-সব দূর করিয়া দিতেছি। আমার নিতান্তই মাথা খারাপ হইয়াছিল তাই এমন বেকুবী করিতে গিয়া-ছিলাম। আর কখনো এমন কাজ করিব না!”

তখন আবার বিশ্বকর্মার ডাক পড়িল।

বিশ্বকর্মা আসিলে মুনি বলিলেন, “ভাই! শীঘ্র এ-সব দূর করিয়া আমার সেই আশ্রম আবার আনিয়া দাও, নহিলে তো অসুরের হাতে আমার প্রাণ যায় দেখিতেছি!”

বিশ্বকর্মা দেখিলেন মুনির বড়ই বিপদ, কাজেই তিনি তাঁর কথামতো কাজ করিতে আর বিলম্ব করিলেন না। দেখিতে দেখিতে সেই সোনার পুরীর জায়গায় আবার কুঁড়েঘর আর বন হইল। অসুরদেরও রাগ থামিল, মুনিরও বিপদ কাটিল, বিশ্বকর্মাও হো হো শব্দে হাসিতে হাসিতে ঘরে চলিয়া গেলেন।

সন্দেশ—মাঘ ১৩২১

সাপ রাজপুত্র

এক রাজা ছিলেন, তাঁহার নাম ছিল শূরসেন! রাজার পুত্র না থাকায় তাঁহার মনে বড়ই দুঃখ ছিল। সেই দুঃখ দূর করিবার জন্য তিনি অনেক দানধ্যান, অনেক যাগযজ্ঞ করিলেন। তাহার ফলে শেষে তাঁহার একটি

পুত্র হইল বটে, কিন্তু সে সাধারণ লোকের ছেলেপিলের মতন নহে। সে একটি ভীষণ সর্প! যদিও মানুষের মতো কথা কয়!

রাজা মনের দুঃখে বলিলেন, "হায়, হায়! এই সর্প লইয়া আমি কি করিব? ইহার চেয়ে যে পুত্র না হওয়া আমার অনেক ভালো ছিল।" কিন্তু সাপ সে কথা ভাবিলই না, সে রাজাকে বলিল, "বাবা, আমার চূড়াকরণ, উপনয়ন করাইলে না? আমার হাতেখড়ি দিলে না? বেদ পড়াইলে না? তাহা হইলে যে আমি মূর্খ থাকিয়া যাইব।"

রাজা আর কি করেন? তিনি ব্রাহ্মণ ডাকিয়া সব করাইলেন। সেই সাপ তখন দেখিতে দেখিতে সকল শাস্ত্র শেষ করিয়া মস্ত বড় পণ্ডিত হইয়া উঠিল। তারপর একদিন সে রাজাকে বলিল, "বাবা, আমার বিবাহ দিলে না? তাহা হইলে যে লোকে আমাকে ছেলেমানুষ ভাবিবে, আমার কথা গ্রাহ্য করিবে না। আর তোমারও বংশ লোপ হইয়া যাইবে, তাহার দরুন শেষে তোমাকে নরকে যাইতে হইবে।"

রাজার মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। তিনি বলিলেন, "বাছা, তুমি যদি মানুষ হইতে তবে তো কোনো মুশকিল ছিল না, কিন্তু তুমি যে সাপ, তোমাকে দেখিলে পালোয়ানেরাও ছুটিয়া পলায়। তোমাকে কে তাহার মেয়ে দিতে চাহিবে বল?"

সাপ বলিল, "নাই বা চাহিল। রাজাদের তো জোর করিয়া মেয়ে ধরিয়া আনিয়াও বিবাহ হইতে পারে, তাই কেন কর না? আমার যদি বিবাহ না হয়, তবে আমি নিশ্চয় গঙ্গায় ডুবিয়া মরিব।"

এ কথায় রাজামহাশয় তো বড়ই সংকটে পড়িলেন।

এখন উপায় কি? শেষে অনেক ভাবিয়া তিনি তাঁহার অমাত্যদিগকে বলিলেন, "আমার পুত্র এখন বড় হইয়াছে, আর খুব উপযুক্তও বটে! তোমরা তাহার বিবাহের চেষ্টা দেখ।"

রাজার যে একটি ছেলে আছে, অমাত্যেরা সকলেই তাহা জানে, কিন্তু সেটি যে একটি সাপ, সে কথা তাহাদের কেহই জানে না। সে কথাটি রাজামহাশয় গোপন রাখিয়াছেন। কাজেই রাজার কথা শুনিয়া তাহারা খুব উৎসাহের সহিত বলিল, "মহারাজ! আপনার যখন ছেলে, তখন আর চেষ্টার বিশেষ দরকার কি? দেশ-বিদেশে আপনার নাম; আপনি যাহার নিকট চাহিবেন, সেই মেয়ে দিবে।"

রাজার একটি খুব পুরাতন বিশ্বাসী কর্মচারী ছিল, কিন্তু সে রাজার কথার ভাবে বুঝিয়া লইল যে ইহার মধ্যে কিছু চেষ্টার দরকার আছে। সে বলিল, "মহারাজ! আপনার মনের কথা আমি বুঝিয়াছি। আপনার অনুমতি হইলে, আমি কন্যার চেষ্টায় যাইতে পারি। পূর্বদেশে বিজয় নামে এক রাজা আছেন, তাঁহার রাজ্য ধন লোকজন হাতি ঘোড়ার সীমা নাই। তাঁহার আটটি মহাবল পুত্র আর ভোগবতী নামে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর মতো একটি কন্যা আছেন। সেই কন্যাই আপনার বউ হইবার উপযুক্ত।"

সে কথায় রাজা ভারি খুশি হইয়া তখনই বিস্তর টাকাকড়ি ও লোকজন সঙ্গে দিয়া কর্মচারীটিকে পূর্বদেশে রওয়ানা করিয়া দিলেন। কর্মচারী রাজা বিজয়ের সভায় উপস্থিত হইয়া শূরসেনের পুত্রের জন্য তাঁহার কন্যা ভোগবতীকে প্রার্থনা করিল। সেই সাপকে সে জন্মেও চক্ষে দেখে নাই, জানেও না যে সেটা সাপ। সে তাহাকে মানুষ ভাবিয়া আন্দাজি তাহার কত প্রশংসাই যে করিল, তাহা আর বলিবার নয়। তাহার একটি কথাও সত্য নহে, কিন্তু রাজা বিজয় তাহার আগাগোড়াই বিশ্বাস করিলেন, কাজেই বিবাহের কথা স্থির হইতে আর বিলম্ব হইল না। তারপর আর দু-একবার লোক আসা-যাওয়া করিলেন বিজয় এ কথায়ও রাজি হইলেন যে, বর বিবাহ করিতে আসিবেন না, নিজের অস্ত্র পাঠাইয়া দিবেন, তাহার সঙ্গেই কন্যার বিবাহ হইবে। ক্ষত্রিয়দের মধ্যে এরূপ ঘটনা ঢের হইয়া থাকে, কাজেই তেমনি করিয়া কিছুদিনের মধ্যেই ভোগবতীর বিবাহ হইয়া গেল। কেহই জানিল না যে সে বিবাহ একটা সাপের সঙ্গে হইয়াছে ; ভোগবতীও তাহা জানিল না।

সে শ্বশুরবাড়ি গেলে পর প্রথমে কেহই তাহাকে সেই সাপের কথা জানাইতে সাহস পায় নাই। কিন্তু শেষে যখন সে সকল কথা জানিল, আর সাপকে দেখিল, তখন সেই সাপকেই তাহার যারপরনাই ভালো লাগিল। সে দিনরাত পরম যত্নে তাহার সেবা করে, অতি মিষ্টভাবে তাহার সঙ্গে কথাবার্তা কহে, আর গান গাহিয়া, বাজনা বাজাইয়া, খেলা করিয়া, বিধিমতে তাহাকে খুশি রাখে।

তখন একদিন সাপ তাহাকে বলিল, "ভোগবতী, আমি তোমার উপর বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি ; পূর্বের কথা এখন আমার মনে হইতেছে। আমি অনন্তের পুত্র মহাবল নাগ ; মহাদেবের হাতে আমি থাকিতাম। তখনো তুমি আমার স্ত্রী ছিলে। একদিন শিব আমার উপর চটিয়া আমাকে এই শাপ দেন যে, 'তোমাকে মানুষের ঘরে সাপ হইয়া জন্মাইতে হইবে।' তখন তুমি আর আমি দুজনে মিলিয়া শিবকে অনেক মিনতি করায় তিনি বলিলেন, 'আচ্ছা, তোমরা দুজনে যখন গৌতমী নদীতে গিয়া আমার পূজা করিবে, তখন তোমাদের শাপ কাটিয়া যাইবে।' এখন তুমি আমাকে গৌতমী নদীতে লইয়া চল।"

ভোগবতী তখনই তাহাকে লইয়া গৌতমীতে যাত্রা করিল, আর সেখানে গিয়া শিবের পূজা করিতেই সেই সাপের আবার দেবতার মতো সুন্দর চেহারা হইল।

তখন সে শূরসেনের নিকট গিয়া বলিল, "বাবা, এখন আমার পৃথিবীতে থাকার প্রয়োজন শেষ হইয়াছে ; অনুমতি কর, আমি শিবের নিকট যাই।"

শূরসেন বলিলেন, "বাবা, তুমি হইলে যুবরাজ ; কিছুদিন এখানে থাকিয়া রাজ্যভোগ কর, তোমার ছেলেপিলে হউক, আমরা দেখিয়া চক্ষু জুড়াই। তারপর আমার মৃত্যু হইলে শেষে শিবের নিকট যাইও!"

সে কথায় সম্মত হইয়া মহাবল সুখে রাজ্যভোগ করিতে লাগিল।

সন্দেশ—ফাল্গুন ১৩২১

স্যমন্তক মণি

এক রাজা ছিলেন, তাঁহার নাম ছিল প্রসেন। প্রসেনের ভ্রাতার নাম ছিল সত্রাজিৎ। সূর্যের সহিত সত্রাজিতের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল।

একদিন সত্রাজিৎ তোয়কূল নামক নদীতে নামিয়া সূর্যের উপাসনা করিতেছেন, এমন সময় সূর্য স্নেহবশত নিজেই তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সত্রাজিৎ সূর্যের সেই আশ্চর্য উজ্জ্বল মূর্তি দেখিয়া নিতান্ত বিস্ময়ের সহিত তাঁহাকে বলিলেন, "ভগবন্, আকাশে আপনাকে যেমন উজ্জ্বল দেখি, এখনো তেমনি উজ্জ্বল দেখিতেছি। আপনি যে স্নেহ করিয়া আমার নিকট আসিলেন, তাহার দরুন তো আপনার রূপ কিছুমাত্র কোমল হয় নাই।"

সূর্য তখন একটু হাসিয়া নিজের কণ্ঠ হইতে একটি মণি খুলিয়া রাখিয়া দিলেন। তখন দেখা গেল যে তাঁহার মূর্তি অতি সুন্দর এবং স্নিগ্ধ।

সেই যে মণি, উহারই তেজে সূর্যকে এত উজ্জ্বল দেখা গিয়াছিল। সে মণির নাম স্যমন্তক। উহার এতই গুণ যে, যাহার গৃহে উহা থাকে, তাহার কোনো অসুখ বা অকল্যাণ হয় না। যে দেশে উহা থাকে তথা হইতে দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি সকল উৎপাত দূর হইয়া যায়।

সেই মণিটি সত্রাজিতের বড়ই ভালো লাগিল, সুতরাং সূর্য যাইবার সময় তিনি তাঁহাকে বিনীতভাবে বলিলেন, "হে প্রভো! আপনি তো আমাকে কতই স্নেহ করেন, দয়া করিয়া এই মণিটি আমাকে দিয়া যান।"

সে কথায় সূর্য তখনই তাঁহাকে মণিটি দিয়া গেলেন।

সেই মণি লইয়া সত্রাজিৎ যখন নিজের নগরে ফিরিলেন, তখন নগরে সমস্ত লোক নিতান্ত ব্যস্তভাবে "ঐ সূর্য যাইতেছেন!" "ঐ সূর্য যাইতেছেন!" বলিয়া তাঁহার পিছু-পিছু ছুটিল। সে আশ্চর্য মণি যে দেখে সেই অবাক হইয়া যায়। তাঁহার গুণের কথা যে শোনে, সেই ছুটিয়া তাহা দেখিতে আসে।

সে মণি পাইবার জন্য কৃষ্ণের খুবই ইচ্ছা হইয়াছিল, সত্রাজিৎ তাঁহাকে তাহা দেন নাই। কৃষ্ণ ইচ্ছা করিলে উহা সত্রাজিতের নিকট হইতে কাড়িয়া লইতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহার মতো মহৎ লোকে এমন কাজ কেন করিবেন?

সত্রাজিৎ সেই মণি তাঁহার ভাই প্রসেনকে দেন। প্রসেন প্রায়ই উহা পরিয়া চলাফেরা করিতেন। একদিন সেই মণি গলায় পরিয়া তিনি বনের ভিতর শিকার করিতে গিয়াছেন, এমন সময় ভয়ংকর এক সিংহ আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। সে ভীষণ সিংহের হাত হইতে আর তিনি রক্ষা পাইলেন না।

কিন্তু, কি আশ্চর্য! সিংহ যে প্রসেনকে হত্যা করিল, সে তাঁহাকে খাইবার জন্য নহে, তাঁহার ঐ মণিটি পাইবার জন্য। সে তাঁহাকে মারিয়া মণিটি লইয়া চলিয়া গেল, তাঁহার দেহের দিকে ফিরিয়াও তাকাইল না।

যে বস্তুর প্রতি এক জন্তুর লোভ হয়, অন্য জন্তুরও তাহার প্রতি লোভ হইতে পারে! সিংহ সেই মণি লইয়া বেশিদূর যাইতে না যাইতেই পর্বতের

গুহার ভিতর হইতে এক বিশাল ভাল্লুক আসিয়া তাহার ঘাড় ভাঙিয়া মণিটি কাড়িয়া নিল।

প্রসেন যখন আর ঘরে ফিরিলেন না, তখন তাঁহার আত্মীয়েরা মনে করিল যে নিশ্চয়ই কৃষ্ণ সেই মণির লোভে তাঁহাকে বধ করিয়াছেন, নহিলে এমন কাজ আর কে করিবে? পূর্ব হইতেই কৃষ্ণের ঐ মণির প্রতি লোভ ছিল, তাঁহারই এই কাজ!

বাস্তবিক এ বিষয়ে কৃষ্ণের কোনো অপরাধই ছিল না, কাজেই এই মিথ্যা অপবাদের কথা শুনিয়া, তিনি অতিশয় দুঃখিত হইলেন। আর প্রতিজ্ঞা করিলেন যে যেমন করিয়াই হউক, এই মণি আনিয়া দিতে হইবে।

প্রসেন যখন শিকারে গিয়া প্রাণ হারাইয়াছিলেন, তখন সহজেই বুঝা যায় যে সেই শিকারের জায়গায় গিয়াই তাঁহাকে খুঁজিতে হইবে! কৃষ্ণ ও বলরাম কয়েকটি সাহসী, চতুর আর বিশ্বাসী লোক লইয়া চুপি চুপি সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে গিয়া প্রসেনের দেহ খুঁজিয়া বাহির করিতে তাঁহাদের অধিক বিলম্ব হইল না। প্রসেনের ঘোড়াটিও সেইখানে মরিয়া পড়িয়াছিল। দুটি দেহের চারিধারে সিংহের পায়ের দাগ, সিংহের নখ-দাঁতে দেহ দুটি ক্ষতবিক্ষত!

সেই সিংহের পদচিহ্ন ধরিয়া কিছু দূর গেলেই দেখা গেল যে উহার দেহও ক্ষতবিক্ষত হইয়া পড়িয়া আছে। তাহাকে যে ভাল্লুকে মারিয়াছে, পায়ের চিহ্ন দেখিয়া আর সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ রহিল না। এখন এই ভাল্লুককে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলেই হয়। তাঁহারা অতি সাবধানে সেই ভাল্লুকের পায়ের দাগ দেখিয়া চলিতে লাগিলেন। সে দাগ ক্রমে একটা গুহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সুতরাং বুঝা গেল, সেই গুহার ভিতরেই ভাল্লুকের বাড়ি।

এই কথার আরো প্রমাণ তখনই পাওয়া গেল। গুহার ভিতর হইতে একটি স্ত্রীলোকের গলার শব্দ আসিতেছে, একটি ছেলেরও কান্না শুনা যাইতেছে। স্ত্রীলোকটি ছেলেটিকে শান্ত করিবার জন্য বলিতেছে, “কাঁদিয়ো না বাছা! সিংহ প্রসেনকে মারিয়াছিল, তোমার পিতা সেই সিংহকে মারিয়া স্যমন্তক মণি আনিয়াছেন। এখন সেই মণি লইয়া তুমি খেলা করিবে, আর কাঁদিয়ো না।”

কাজেই সব কিছু বুঝিতে বাকি রহিল না। তখন কৃষ্ণ, বলরাম আর সঙ্গের লোকদিগকে গুহার দরজায় রাখিয়া যেই একা ভিতরে প্রবেশ করিয়াছেন, অমনি পর্বতপ্রমাণ এক বিশাল, বিকট ভাল্লুক ভীষণ গর্জনে পাহাড় কাঁপাইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। তখন যে তাঁহাদের কি ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা আর বলিয়া শেষ করা যায় না। একদিন, দুদিন করিয়া সপ্তাহের পর সপ্তাহ চলিয়া গেল, তথাপি সে যুদ্ধের বিরাম নাই।

এদিকে কৃষ্ণের বিলম্ব দেখিয়া আর ভাল্লুকের ভয়ংকর গর্জন শুনিয়া, বলরাম আর সঙ্গের লোকেরা দ্বারকায় আসিয়া সকলকে বলিয়াছেন যে কৃষ্ণ

আর নাই, তাঁহাকে ভাল্লুকে খাইয়াছে।

একুশ দিনের পর সেই যুদ্ধ শেষ হইল। একুশ দিন যুদ্ধ করিয়া ভাল্লুক বুঝিতে পারিল যে কৃষ্ণের নিকট হার মানা ভিন্ন আর উপায় নাই। তখন সে অশেষ অনুনয়ের সহিত তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল। তারপর সে যেই জানিল যে তিনি এই মণির জন্য আসিয়াছেন, অমনি মণি তো তাঁহাকে দিলই, সঙ্গে সঙ্গে নিজের কন্যাটিও দান করিল।

কৃষ্ণ সেই মণি আর কন্যা লইয়া মনের সুখে দ্বারকায় চলিয়া আসিলেন। দ্বারকার লোকেরা তাঁহাকে দেখিয়া কি বলিল, তাহা আমি জানি না, তবে সত্রাজিৎ যে মণি পাইয়া খুবই খুশি হইয়াছিলেন, এ কথা নিশ্চয় বলিতে পারি।

সেই ভাল্লুকটি যে সে ভাল্লুক ছিল না। সে সেই জাম্ববান্, রামায়ণে যাহার কথা তোমরা পড়িয়া নিশ্চয়ই খুব সন্তুষ্ট হইয়াছ। আর তাহার মেয়েটির নাম ছিল জাম্ববতী। সেও কি ভাল্লুক ছিল?

সন্দেশ—ফাল্গুন ১৩২১

কুবলয়াশ্ব

পূর্বকালে শত্রুজিৎ নামে অতি বিখ্যাত এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম ঋতধ্বজ। ঋতধ্বজের গুণের কথা আর কি বলিব। যেমন রূপ, তেমনি বুদ্ধি, তেমনি বিদ্যা, তেমনি বিনয়, তেমনি বল, তেমনি বিক্রম। এমন পুত্রলাভ করিয়া রাজা শত্রুজিৎ খুবই খুশি হইয়াছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

ইহার মধ্যে একদিন গালব নামে এক মুনি একটি সুন্দর ঘোড়া লইয়া রাজা শত্রুজিতের নিকট আসিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আমি বিপদে পড়িয়া আপনার নিকট আসিয়াছি। একটা দুষ্ট দৈত্য আমাকে বড়ই ক্লেশ দিতেছে। সে কখনো সিংহ, কখনো বাঘ, কখনো হাতি, কখনো আর কোনো জন্তুর বেশে আসিয়া দিবারাত্র আমাকে অস্থির রাখে, উহার জ্বালায় আমার তপস্যাই অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। আমি ইচ্ছা করিলে শাপ দিয়া উহাকে বধ করিতে পারি, কিন্তু তাহাতে তপস্যার হানি হয়, কাজেই আর কি করিব, শুধু নীরবে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলি। এমন সময় একদিন এই ঘোড়াটি আকাশ হইতে আমার নিকট পড়িল, আর দৈববাণী হইল, 'গালব! এই ঘোড়াটির নাম কুবলয়। ইহার কিছুতেই ক্লান্তি নাই, সংসারে ইহার অগম্য স্থান নাই, ইহাকে রোধ করিবার শক্তি কাহারও নাই। রাজা শত্রুজিতের পুত্র ঋতধ্বজ ইহাতে চড়িয়া তোমার শত্রু সেই দুষ্ট দানবকে বধ করিয়া কুবলয়াশ্ব নামে বিখ্যাত হইবে।'

"মহারাজ তাই আমি এই ঘোড়াটি লইয়া আপনার নিকট আসিয়াছি। আপনার পুত্র যদি ইহাতে চড়িয়া দানবটাকে তাড়াইয়া দেন, তবেই এ ব্রাহ্মণের তপস্যা হয়।"

রাজার আজ্ঞায় তখনই ঋতধ্বজ সেই আশ্চর্য ঘোড়ায় চড়িয়া মুনির সঙ্গে

তাঁহার আশ্রমে আসিলেন। তারপর মুনিরা সকলে তাঁহাদের সন্ধ্যাবন্দনা আরম্ভ করিতে-না-করিতেই সেই দুষ্ট দানব শূকর সাজিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। মুনির শিষ্যেরা তাহাকে দেখিয়া প্রাণপণে চ্যাঁচাইতে লাগিল। রাজপুত্র তখনই সেই ঘোড়ায় চড়িয়া তাহাকে তাড়া করিলেন। তাঁহার হাতের অর্ধচন্দ্র বাণের বিষম খোঁচা খাইয়া আর কি দুষ্ট দানব সেখানে দাঁড়ায়? সে প্রাণের মায়ায় কোন পথে পলায়ন করিবে কিছুই বুঝিতে পারিল না। পাহাড়ে, বনে, শূন্যে, সাগরে, যেখানে যায়, রাজপুত্র ঘোড়ায় চড়িয়া, ধনুর্বাণ হাতে সেই-খানেই গিয়া উপস্থিত হন। এইভাবে চারিহাজার ক্রোশ চলিয়া শেষে সে একটা গর্তের ভিতরে লাফাইয়া পড়িল। রাজপুত্রও তাহার সঙ্গে সঙ্গেই গর্তে গিয়া ঢুকিলেন বটে, কিন্তু সেখানকার সেই ঘোর অন্ধকারের ভিতরে আর তাহাকে দেখিতে পাইলেন না।

রাজপুত্র সেই গর্তের পথে দানবকে খুঁজিতে খুঁজিতে একেবারে পাতালে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে আর অন্ধকার নাই, সেখানে ইন্দ্র-পুরীর ন্যায় অতি অপরূপ সোনার পুরী। রাজপুত্র তাহার ভিতরে কতই খুঁজিলেন কিন্তু দানবকে পাইলেন না। মানুষও সেখানে কেহই ছিল না। ছিল কেবল দুটি মেয়ে। তাহার একটি যে কি সুন্দর, সে আর বুঝাইবার উপায়ই নাই।

এই কন্যার নাম মদালসা, ইঁহার বৃত্তান্ত অতি আশ্চর্য। ইঁহার পিতার নাম বিশ্বাবসু, তিনি গন্ধর্বের রাজা। একদিন মদালসা তাঁহার পিতার বাগানে খেলা করিতেছিলেন, এমন সময় হঠাৎ চারদিক অন্ধকার হইয়া গেল। সে অন্ধকার আর কিছুই নহে, উহা পাতালকেতু নামক দুষ্ট দানবের মায়া। দুরাত্মা সেই অন্ধকারের ভিতর সেই অসহায়া বালিকাকে লইয়া পলায়ন করিল, কেহ সে কথা জানিতে পারিল না। তাঁহার আর্তনাদও কেহ শুনিতে পাইল না।

তদবধি সেই দুষ্ট তাহাকে পাতালে আনিয়া নিজ বাড়িতে আটকাইয়া রাখিয়াছে, বলিয়াছে যে, ভালো দিন পাইলেই তাঁহাকে বিবাহ করিবে।

ইহার মধ্যে একদিন মদালসা মনের দুঃখে আত্মহত্যা করিতে যান, তখন সুরভি তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া বলেন, "বাছা, তোমার কোনো ভয় নাই, এই দুষ্ট দানব তোমাকে বিবাহ করিতে পাইবে না! ইহার মৃত্যু যাঁহার হাতে হইবে, তিনিই অবিলম্বে তোমাকে বিবাহ করিবেন।"

রাজপুত্র মদালসার সঙ্গের মেয়েটির নিকট এ-সকল সংবাদ শুনিতে পাইলেন। মেয়েটির নাম কুণ্ডলা! তিনি একজন তপস্বিনী এবং মদালসার সখী। কুণ্ডলা আরো বলিলেন যে, সেদিন পাতালকেতু শূকর সাজিয়া মুনিদের আশ্রম নষ্ট করিতে গিয়াছিল, সেখান হইতে এইমাত্র এক রাজপুত্রের হাতে সাংঘাতিক বাণের খোঁচা খাইয়া আসিয়াছে।

তখন আর ঋতধ্বজের বুঝিতে বাকি রহিল না যে তিনিই সেই রাজপুত্র, আর পাতালকেতুই তাঁহার সেই দানব।

সে কথা শুনিয়া মেয়েদুটির যে আনন্দ হইল!

রাজপুত্রকে দেখিয়াই মদালসার যারপরনাই ভালো লাগিয়াছিল, আর সেজন্য তাঁহার মনে দুঃখও হইয়াছিল যতদূর হইতে হয়। কেননা, ইঁহাকে তো আর পাওয়ার কোনো আশাই নাই, যেহেতু সুরভি বলিয়াছেন, 'যে দানব মারিবে, সেই মদালসাকে বিবাহ করিবে' তাঁহার কথা বৃথা হইবার নহে।

যাহা হউক, এখন সে ভয় কাটিয়া গেল, সুতরাং দুঃখের জায়গায় আনন্দ হইল চতুর্গুণ! তবে আর বিলম্ব কেন? তখনই পুরোহিত তুম্বুরু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিতে দেখিতে পবিত্র আগুন জ্বলিল, ঘৃতের আহুতি পড়িল, মন্ত্রের ধ্বনি উঠিল, শুভকার্য শেষ হইল।

তারপর কুণ্ডলা আবার তপস্যা করিতে গেলেন। রাজপুত্র মদালসা সহ সেই আশ্চর্য ঘোড়ায় চড়িয়া দেশে ফিরিবার আয়োজন করিলেন। অমনি পাতাল কাঁপাইয়া ভীষণ চিৎকার উঠিল, 'নিয়া গেল রে, নিয়া গেল! শীঘ্র আয়, শীঘ্র আয় তোরা!'

তাহার সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার দানব কোথা হইতে খাঁড়া ঢাল গদা শূল হাতে আসিয়া 'মার, মার!' শব্দে ঋতধ্বজকে আক্রমণ করিল।

ঋতধ্বজ তখন করিলেন কি, তাঁহার তূণ হইতে ত্বাষ্ট্র নামক অস্ত্রখানি লইয়া, মারিলেন তাহা সেই দানবের ভেঙ্চির ভিড়ের উপর ছুঁড়িয়া। অমনি দানবের দল চ্যাঁচাইতে চ্যাঁচাইতে পলকের মধ্যে পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল, রাজপুত্রও মনের সুখে মদালসাকে লইয়া দেশে চলিয়া আসিলেন। তখন সেখানে না জানি কেমন বাজি, বাদ্য আর ভোজের ঘটা হইল! না জানি সকলে কতদিন ধরিয়া কত কি খাইল!

ইহার পর হইতে ঋতধ্বজের নাম হইল কুবলয়াশ্ব। এখন তিনি রাজার আজ্ঞায় প্রতিদিনই সেই ঘোড়ায় চড়িয়া মুনিদের আশ্রম হইতে দানব তাড়াইয়া বেড়ান। ইহাদের মধ্যে হইয়াছে কি, সেই পাতালকেতুর ভাই ছিল তালকেতু, সে বেটা দিব্য একটি শুদ্ধ শান্ত মুনি সাজিয়া, যমুনার ধারে আশ্রম করিয়া চোখ বুজিয়া বসিয়া থাকে, যেন সে ভারি একটা তপস্বী!

কুবলয়াশ্ব ঘোড়ায় চড়িয়া সেই পথে যাইতেছেন, এমন সময় সে চোখ মিট্-মিট্ করিতে করিতে আসিয়া তাঁহাকে বলিল, "রাজপুত্র! আমার একটা যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা হইয়াছে, কিন্তু দক্ষিণা দিবার পয়সা নাই। আপনি যদি দয়া করিয়া আপনার গলার ঐ হারখানি আমাকে দেন, তবে আমার সাধ পূর্ণ হয়।"

রাজপুত্র তৎক্ষণাৎ গলার হার তাহাকে দিলেন। তখন সে আবার বলিল, "আপনার জয় হোক! এখন তবে আর একটি কাজ যদি করেন, আমি জলের ভিতরে থাকিয়া বরুণের স্তব করিতে যাইব, ততক্ষণ আমার আশ্রমটির উপর একটু চোখ রাখিবেন।"

রাজপুত্র তাহাতেই সম্মত হইলেন। তালকেতুও চলিয়া গেল। কিন্তু সে তো তপস্যা করিতে গেল না, সে সোজাসুজি কুবলয়াশ্বের বাড়িতে গিয়া

কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "হায়, হায়! ওগো! সর্বনাশ হইয়াছে! রাজপুত্রকে দানবে মারিয়াছে! মৃত্যুর সময়ে তিনি এই হার আমার হাতে দিয়া বাড়িতে সংবাদ দিতে বলিয়াছেন!"

কুবলয়াশ্বের হার দেখিয়া আর কাহারও এ কথায় অবিশ্বাস করিবার উপায় রহিল না। তখন দেশময় হাহাকার পড়িয়া গেল; সে দারুণ সংবাদ সহিতে না পারিয়া মদালসা প্রাণত্যাগ করিলেন।

ততক্ষণে সেই দুষ্ট তালকেতু আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়া হাসিতে হাসিতে কুবলয়াশ্বকে বলিল, "আহা! আপনি আমার বড়ই উপকার করিলেন। আপনি এখানে থাকায় আমি প্রাণ ভরিয়া যজ্ঞ করিয়াছি! এখন তবে আপনি ঘরে ফিরিয়া যাউন।"

এ কথায় রাজপুত্র তথা হইতে চলিয়া আসিলে, দুষ্ট ঘরে বসিয়া হোহো শব্দে হাসিতে লাগিল।

কুবলয়াশ্ব সেই মুনিবেশধারী দুষ্ট দানবের আশ্রম হইতে ফিরিয়া আসিলে সকলে কিরূপ আশ্চর্য আর আহ্লাদিত হইল, তাহা বুঝিতেই পার। কিন্তু মদালসার মৃত্যুর কথা শুনিয়া কুবলয়াশ্বের প্রাণে বড়ই কষ্ট হইল। তিনি সেই দুঃখ ভুলিবার জন্য বন্ধুদিগের সহিত মিশিয়া নানারূপ আমোদ-প্রমোদে দিন কাটাইতে লাগিলেন।

এই সময়ে নাগরাজ অশ্বতরের দুইটি পুত্র ব্রাহ্মণের বেশে তাঁহার সঙ্গে আমোদ-প্রমোদ করিতে আসিতেন! ইঁহাদের কথাবার্তা তাঁহার বড় ভালো লাগিত। এইরূপে তাঁহাদের সহিত কুবলয়াশ্বের এমনি বন্ধুত্ব হইয়া গেল যে পরস্পরকে ছাড়িয়া থাকিতে আর তাঁহাদের কিছুতেই ভালো লাগিত না। নাগপুত্রেরা সমস্ত দিন কুবলয়াশ্বের নিকটে কাটাইয়া রাত্রে গৃহে যাইতে বড়ই কষ্ট বোধ করিতেন, আর কোনোপ্রকারে রাত্রিটি কাটাইয়া প্রভাত হইবামাত্রই পুনরায় কুবলয়াশ্বের নিকট চলিয়া আসিতেন।

একদিন নাগরাজ অশ্বতর তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, এখন তো আর তোমাদিগকে দিনের বেলায় পাতালে দেখিতে পাই না, রাত্রিটি কোনো-মতে এখানে কাটাইয়া, প্রভাত হইতেই তোমরা পৃথিবীতে চলিয়া যাও। ঐ স্থানটার প্রতি তোমাদের এত অনুরাগ কেমন করিয়া হইল?"

নাগপুত্রেরা বলিলেন, "বাবা, আমরা মহারাজ শত্রুজিতের পুত্র ঋতধ্বজকে বড়ই ভালোবাসি; তাঁহাকে না দেখিয়া থাকিতে আমাদের নিতান্ত কষ্ট হয়। তাই প্রভাতে উঠিয়া প্রত্যহ তাঁহার নিকট চলিয়া যাই। বাবা, এমন সুন্দর, এমন সরল, এমন ধার্মিক, এমন মিষ্টভাষী লোক আর এ জগতে নাই!"

এ কথায় নাগরাজ বলিলেন, "বাছা, এমন মহৎ লোকের সহিত তোমাদের বন্ধুত্ব হইয়াছে, আর তাঁহার নিকটে তোমরা এত সুখ পাইতেছ, তোমরা তাঁহার সুখের জন্য কি কিছু করিয়াছ?"

নাগপুত্রেরা বলিলেন, "বাবা, তাঁহার তো কোনো বস্তুরই অভাব নাই; এমন মহৎ লোকের যোগ্য কি আছে, যাহা দ্বারা তাঁহাকে সুখী করিতে পারি?

তাঁহার কোনো কষ্ট দূর করিতে পারিলে আমরা নিশ্চয় করিতাম। তাঁহার স্ত্রী মদালসার মৃত্যুই তাঁহার একমাত্র কষ্টের কারণ, সেই মদালসাকে আমরা কোথা হইতে আনিয়া দিব ?"

কিন্তু, এ কাজটি যতই কঠিন হউক-না কেন, ইহা যে একেবারেই অসাধ্য, নাগরাজ তাহা মনে করিলেন না। তিনি অবিলম্বে হিমালয় পর্বতের প্লক্ষাবতরণ নামক তীর্থে গিয়া কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। সে তপস্যা এমনই চমৎকার হইয়াছিল, আর তখন যে নাগরাজ সরস্বতীর স্তব করিয়াছিলেন, তাহা সরস্বতীর এত ভালো লাগিয়াছিল যে, তিনি আর সেখানে না আসিয়া থাকিতে পারিলেন না !

সরস্বতী আসিয়া বলিলেন, "হে অশ্বতর! আমি তোমাকে বর দান করিব ; বল তোমার কি লইতে ইচ্ছা হয়।"

অশ্বতর অমনি করজোড়ে বলিলেন, "মা, যদি কৃপা হইয়া থাকে, তবে আমাকে আর আমার ভাই কম্বলকে সংগীতে অসাধারণ পণ্ডিত করিয়া দিন!"

একথায় সরস্বতী 'তথাস্তু' বলিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলে অশ্বতর আর কম্বল দুভাই তৎক্ষণাৎ সংগীত-শক্তি লাভ করত অপরূপ তান লয় সহকারে বীণা বাজাইয়া মহাদেবের স্তবগান আরম্ভ করিলেন। অনেকদিন এইরূপ সংগীত আর স্তবের পর, মহাদেবকেও তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে বর দিতে আসিতে হইল। তখন দুই ভাই তাঁহার পদতলে পড়িয়া এই বর প্রার্থনা করিলেন, "কুবলয়াশ্বের স্ত্রী মদালসা যেমন বয়সে, যেমন বেশে, যেমন শরীরে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, অবিকল সেই মূর্তিতে, পূর্বজন্মের সকল কথা স্মরণে রাখিয়া, পুনরায় অশ্বতরের গৃহে জন্মলাভ করুন।"

মহাদেব কহিলেন, "তাহাই হউক! অশ্বতর শ্রাদ্ধ করিতে বসিলে তাঁহার মধ্যম ফণা হইতে মদালসা অবিকল তাঁহার পূর্বের শরীর লইয়া বাহির হইবেন।"

কি আনন্দের কথা হইল! ইহার পর দুই ভাই পাতালে চলিয়া আসিতে আর তিলমাত্রও বিলম্ব করিলেন না। সেখানে আসিয়া অশ্বতর একটি নির্জন স্থানে চুপিচুপি শ্রাদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলে, মহাদেবের কথামতো মদালসা, তাঁহার মধ্যম ফণা হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। অবিকল সেই মদালসা কিছুমাত্র প্রভেদ নাই, যেন দুদিনের জন্য কুবলয়াশ্বের নিকট হইতে পাতালে বেড়াইতে আসিয়াছেন। এ ব্যাপারে কেবল অশ্বতরই উপস্থিত ছিলেন, আর কেহ ইহা দেখিলও না, এ বিষয়ে কোনো কথা জানিতেও পারিল না।

তখন নাগরাজ কয়েকটি বুদ্ধিমতী, মিষ্টভাষিণী সখী সঙ্গে দিয়া মদালসাকে একটি সুন্দর ঘরে লুকাইয়া রাখিলেন।

তারপর সন্ধ্যাকালে নাগপুত্রেরা দুভাই কুবলয়াশ্বের নিকট হইতে ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহারাও অবশ্য এ ব্যাপারের কিছুই জানেন না। নাগরাজ অন্যান্য দিনের ন্যায় সেদিনও তাঁহাদের সহিত কথাবার্তা আরম্ভ করিয়া কহিলেন, "বৎসগণ, সেই রাজপুত্রকে একদিন আমার নিকট আনিলে

না ?"

এ কথায় কুবলয়াশ্ব সম্মত হইলে তিনজনে মিলিয়া তখনই পাতালে যাত্রা করিলেন। কুবলয়াশ্ব কিন্তু জানেন না যে তাহাকে পাতালে যাইতে হইবে বা তাঁহার বন্ধুগণ নাগপুত্র। তিনি জানেন, উঁহারা ব্রাহ্মণকুমার। গোমতী নদীতে আসিয়া নাগপুত্রেরা তাহার জলে নামিতে গেলেন ; কুবলয়াশ্ব ভাবিলেন, গোমতীর পরপারে ব্রাহ্মণকুমারদের বাড়ি। এমন সময় নাগপুত্রেরা হঠাৎ তাঁহাকে লইয়া পাতালে প্রবেশ করিলেন। ইহাতে কুবলয়াশ্ব ভয় পাইলেন না, কেননা, সে স্থান তাহার দেখিতে বাকি নাই। যাহা হউক, সেবারে তিনি দানবের বাড়িই দেখিয়াছিলেন, এবারে সাপের দেশটিও তাঁহার নিকট যারপর-নাই আশ্চর্য এবং সুন্দর বোধ হইল। তাঁহার বন্ধুদ্বয়ও ততক্ষণে ব্রাহ্মণের বেশ ছাড়িয়া নিজের রূপ ধারণ করিয়াছেন। সে রূপ যে ঠিক কি প্রকার, তাহা আমি বলিতে পারি না। সে-সকল সাপের ফণার কথা লেখা আছে; স্বস্তিক চিহ্ন[১] এবং মণিরও উল্লেখ দেখা যায়। অথচ মানুষের মতো তাহাদের হাত-পা, বেশভূষা, কানে কুণ্ডল, গলায় হার!

যাহা হউক, নাগপুত্রেরা কুবলয়াশ্বকে অবিলম্বেই তাঁহাদের পিতার নিকট নিয়া উপস্থিত করিলেন, সেখানে সেরূপ অবস্থায় যেমন কথাবার্তা, প্রণাম, আশীর্বাদাদির প্রথা আছে, সকলই হইয়া গেল। এত পথ চলিয়া আসাতে সকলই ক্লান্ত, সুতরাং অতঃপর স্নানাহারপূর্বক সুস্থ হওয়া হইল প্রথম কাজ!

আহারান্তে বিশ্রামের পর, নাগরাজ আর কুবলয়াশ্বের অনেক কথাবার্তা হইল।

শেষে নাগরাজ বলিলেন, "বাছা, তুমি আমার পুত্রগণের বন্ধু, সুতরাং আমার পুত্রেরই তুল্য। আমারও তোমার প্রতি অতিশয় স্নেহ হইয়াছে। আমার বড় ইচ্ছা হয় যে, আমার পুত্রেরা যেমন আমার নিকট যাহা ইচ্ছা চাহিয়া লয়, তুমিও সেইরূপ কিছু চাহিয়া লও।"

কুবলয়াশ্ব বলিলেন, "আপনার আশীর্বাদে আমার কোনো বস্তুরই অভাব নাই, সুতরাং আমি কি চাহিব? আমি যে আপনাকে দেখিলাম, আপনার পায়ের ধূলা পাইলাম, ইহার উপর আর আমার কিছুই চাহিবার নাই।"

অশ্বতর কহিলেন, "বাবা, তোমার মনে কি কোনো কষ্ট আছে? তাহার কথাই নাহয় আমাকে বল, আমি সাধ্যমতো তাহা নিবারণের চেষ্টা করিব।"

এ কথায় নাগপুত্রেরা বলিলেন, "মদালসার মৃত্যুতে ইঁহার বড়ই কষ্ট হইয়াছে, কিন্তু তাহা তো আর দূর হইবার নহে!"

অশ্বতর বলিলেন, "অবশ্য মরা মানুষকে আর কি করিয়া বাঁচানো যাইবে? তবে মন্ত্রবলে তাহারও মায়ামূর্তি আনিয়া দেখাইতে পারি।"

ইহা শুনিয়া কুবলয়াশ্ব নিতান্ত ব্যস্তভাবে বলিলেন, "যদি তাহা সম্ভব

[১]সাপের ফণায় যে 'চক্র' থাকে

হয়, তবে দয়া করিয়া একবার তাহাই দেখান।"

অশ্বতর বলিলেন, "এই কথা? আচ্ছা, তবে দেখাইতেছি। কিন্তু, মনে রাখিও, ইহা মায়া!"

তারপর অশ্বতর খুব গম্ভীরভাবে বসিয়া বিড়বিড় করিতে লাগিলেন, যেন কতই মন্ত্রতন্ত্র আওড়াইতেছেন। ততক্ষণে তাহার ইঙ্গিত অনুসারে মদালসাকে সেখানে আনিয়া উপস্থিত করা হইল। সকলে ভাবিল, মন্ত্রের কি জোর! কুবলয়াশ্বও জানেন, উহা মন্ত্রেরই কাজ, মায়ার মূর্তি। তথাপি তাঁহার এত আনন্দ হইল যে তাহা আর বলিয়া শেষ করা যায় না।

তারপর যখন অশ্বতর বলিলেন যে, উহা মায়া নহে বাস্তবিকই মদালসা, তখন না জানি ব্যাপারখানা কিরূপ হইয়াছিল!

কুবলয়াশ্ব পাতালেই মদালসাকে পাইয়াছিলেন, এখন সেই পাতালেই তাহাকে আবার পাইয়া মহানন্দে তাহাকে লইয়া গৃহে ফিরিলেন। সেখানে অবশ্য ইহা লইয়া খুবই আনন্দ আর উৎসবাদি হইল।

সন্দেশ—চৈত্র-বৈশাখ ১৩২১-২২

ধ্রুব

সে যে কত কালের কথা, তাহা আমি জানি না। সেই অতি প্রাচীনকালে আমাদের দেশে উত্তানপাদ নামে এক রাজা ছিলেন। উত্তানপাদের দুই রানী ছিলেন, একটির নাম সুনীতি, আর একটির নাম সুরুচি।

সুনীতি বড় লক্ষ্মী মেয়ে ছিলেন, কিন্তু সুরুচি ছিলেন ঠিক তাহার উলটা। আর সুনীতিকে তিনি প্রাণভরিয়া হিংসা করিতেন। রাজা সেই সুরুচিকে এতই ভালোবাসিতেন, যে তাঁহার কথা না রাখিয়া থাকিতে পারিতেন না। সুরুচি তাঁহার নিকট সুনীতির নামে কত মিথ্যা কথাই বলিতেন, তিনি ভাবিতেন, তাহার সকলই বুঝি সত্য। শেষে রাজা একদিন সুরুচির কথায় সুনীতিকে রাজপুরী হইতে বাহির করিয়া দিলেন।

দুঃখিনী সুনীতি তখন আর কি করেন? মুনিদের তপোবনে গিয়া আশ্রয় লওয়া ভিন্ন তাঁহার আর উপায় রহিল না। সেইখানে কয়েকদিন পরেই তাঁহার একটি খোকা হইল, তাহার নাম হইল ধ্রুব। তখন হইতে ধ্রুবকে লইয়া তিনি মুনিদের আশ্রমেই থাকেন। খোকাটি ক্রমে বড় হইতে লাগিল। সে মুনি-কুমারদের সঙ্গে খেলা করে, মুনিদের হোম তপস্যা দেখে আর তাঁহাদের মুখে ভগবানের নাম শুনে। এইরূপে শিশুকালেই তাহার প্রাণে ভগবানের প্রতি ভক্তি জন্মিল।

এমনি করিয়া দিন যায়। ক্রমে ধ্রুবের বয়স চারি-পাঁচ বৎসর হইয়াছে। ইহার মধ্যে সে একদিন শুনিল যে সে রাজার পুত্র, মহারাজ উত্তানপাদ তাহার পিতা। এ কথা শুনিবামাত্র পিতাকে দেখিবার জন্য তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল

হইল। সে ভাবিল আমি এখনই পিতাকে দেখিতে যাইব।'

রাজা উত্তানপাদ সিংহাসনে বসিয়া আছেন, সুরুচি তাঁহার নিকটেই দাঁড়াইয়া, সুরুচির পুত্র উত্তম রাজার কোলে। এমন সময় ধ্রুব সেখানে আসিয়া তাঁহার কোলে উঠিবার জন্য তাহার ছোট হাত দুখানি বাড়াইয়া দিল। রাজার হয়তো তাহাকে কোলে লইতেন খুবই ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু সুরুচির সাক্ষাতে তিনি ছেলেটিকে আদর দেখাইতে সাহস পাইলেন না। তখন সুরুচি বিষম ভ্রূকুটি করিয়া নিতান্ত কর্কশভাবে ধ্রুবকে বলিলেন, "ছেলের আস্পর্ধা দেখ। এত কষ্ট কেন করিতেছিস্ বাছা? জানিস না কি যে তুই সুনীতির ছেলে? উনি তোর পিতা হইলে কি হয়? আমি তো তোর মা নই। রাজাসনে বসা তোর কপালে নাই, সে শুধু আমার ছেলেরই জন্য।" ধ্রুবের প্রাণে এই নিষ্ঠুর কথাগুলি বড়ই লাগিল। সে আর এক মুহূর্তও সেখানে বিলম্ব না করিয়া, ঠোঁট দুখানি ফুলাইয়া মার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। মা তাহার কাঁদ-কাঁদ মুখ আর ছল-ছল চোখ দুটি দেখিবামাত্র তাহাকে কোলে লইয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে বাবা? কেহ কি তোমাকে কিছু বলিয়াছে?"

ধ্রুব কহিল, "মা আমি বাবার কোলে উঠিতে গিয়াছিলাম, সৎমা বলিলেন, আমি তোমার ছেলে বলিয়া নাকি তাঁহার কোলে উঠিতে পাইব না; আমার নাকি কপালে নাই।"

ধ্রুব দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে এই কথাগুলি বলিল; তাহা শুনিয়া সুনীতির যে কি কষ্ট হইল তাহা লিখিয়া বুঝাইবার সাধ্য নাই। তিনি কোনো-মতে চোখের জল থামাইয়া ধ্রুবকে বলিলেন, "বাবা, সুরুচি সত্যই বলিয়াছে। তোমার কপাল মন্দ, তাই তুমি আমার মতো অভাগিনীর পুত্র হইয়াছ। তোমার কপাল ভালো হইলে কেহ তোমাকে এমন কথা বলিতে পারিত না। রাজার আসনে বসা, ভালো ভালো হাতি ঘোড়ায় চড়া, এ-সকল যাহার পুণ্য আছে তাহার ভাগ্যেই জোটে। সুরুচির ছেলে উত্তম অন্যজন্মে অনেক পুণ্য করিয়া-ছিল, তাই এখন সে রাজার কোলে বসিতে পায়। তুমি কর নাই তাই তুমি তাঁহার কোলে বসিতে পাইলে না। সুরুচির কথায় যদি তোমার দুঃখ হইয়া থাকে, তবে যাহাতে তোমার খুব পুণ্য হয় সেইরূপ কাজ কর, তাহা হইলেই তোমার কপাল ভালো হইয়া যাইবে।"

ধ্রুব কহিল, "মা আমার মনে যে বড়ই লাগিয়াছে তোমার কথায় তো আমার দুঃখ যাইতেছে না। আমি এমন কাজ করিব যাহাতে সকলের চেয়ে যে ভালো তাহার চেয়েও ভালো স্থান পাইতে পারি। তোমার ছেলে যে আমি, আমার তেজ তুমি দেখ। বাবার যাহা আছে সবই উত্তমের হউক, অন্যের দেওয়া আমি কিছু চাহি না। আমি নিজে এমন জায়গা দেখিয়া লইব যে বাবাও তাহা পান নাই।"

এই বলিয়াই ধ্রুব ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, তারপর একমনে পথ চলিতে চলিতে সে বনের ভিতরে একস্থানে আসিয়া দেখিল যে সেখানে সাত-

জন মুনি কুশাসনে বসিয়া আছেন। সে তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া বলিল, "আমি উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুব, আমার মার নাম সুনীতি। আমি মনে বড় কষ্ট পাইয়া আপনাদের নিকটে আসিয়াছি ;" মুনিগণ বলিলেন, "বাছা, তুমি চারি-পাঁচ বৎসরের বালক, তোমার মনে আবার কি কষ্ট হইল।" ধ্রুব কহিল, "আমার বিমাতা আমাকে কটু কথা কহিয়াছেন, তাই আমার মনে কষ্ট হইয়াছে।"

ধ্রুবের নিকট সকল কথা শুনিয়া মুনিরা বড়ই আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "আচ্ছা বাছা, এখন তুমি কি চাহ? আমরা তোমার কি সাহায্য করিতে পারি?" ধ্রুব কহিল, "আমি সেই স্থান পাইতে চাহি, যাহা অন্য কেহ পায় নাই। সে স্থান কি করিয়া পাইব আপনারা তাহা আমাকে বলিয়া দিন।" মুনিগণ বলিলেন, "যিনি সকলের বড়, যাহা কিছু আছে সকলই যাঁহার, তুমি সেই হরিকে ডাক, তাহা হইলেই তুমি সে স্থান পাইবে।"

ধ্রুব কহিল, "কি করিয়া তাঁহাকে ডাকিলে তিনি খুশি হইবেন তাহা তো আমি জানি না, তাহা আমাকে বলিয়া দিন।" মুনিরা বলিলেন, "আর কিছুরই কথা ভাবিবে না, কেবল তাঁহারই কথা ভাবিবে, আর শুধু বলিবে, 'তুমি সকলের, তোমাকে কেহ জানিতে পারে না, তুমি সকলই জান, তোমাকে নমস্কার।' ইহাতেই তিনি তুষ্ট হইবেন। তোমার পিতামহ মনু এইরূপেই তাঁহাকে তুষ্ট করিয়াছিলেন।"

তখন ধ্রুব সেই মুনিদিগকে প্রণাম করিয়া মনের আনন্দে সেখান হইতে যমুনার তীরে মধুবন নামক বনে গিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে গিয়া সে দিনরাত একমনে এমনি ব্যাকুলভাবে হরিনাম করিতে লাগিল যে, আর কেহ কখনো তেমন করিয়া তাঁহাকে ডাকিতে পারে নাই। সেই আশ্চর্য তপস্যা দেখিয়া দেবতারা ভয় পাইলেন, পৃথিবী কাঁপিল, সাগর উছলিয়া উঠিল।

ইন্দ্র ভাবিলেন, না জানি এই বালক এমন তপস্যা করিয়া কি বিপদ ঘটাইবে। তখন তিনি আর কতগুলি দেবতার সহিত মিলিয়া ধ্রুবের তপস্যা ভাঙিবার আয়োজন করিলেন। একজন দেবতা সুনীতির বেশে, 'হায় বাছা' 'হায় বাছা' বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গিয়া ধ্রুবকে বলিল, "বাবা, কত আশা করিয়া তোমাকে পাইয়াছি। দুঃখিনীর ধন, আমার যে বাছা আর কেহ নাই, আমাকে কি এমন করিয়া ফেলিয়া আসিতে হয়? তুমি যদি তপস্যা না ছাড়, তবে আমি তোমার সম্মুখেই মরিয়া যাইব।"

কিন্তু ধ্রুবের মন তখন হরির ধ্যানেই মজিয়াছিল সে সকল কপট কান্না শুনিয়াও শুনিল না। তখন সেই দুষ্ট দেবতা "বাবা গো! কি ভয়ানক রাক্ষস আসিয়াছে। পালাও পালাও," বলিতে বলিতে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

অমনি কোথা হইতে ভীষণ রাক্ষসগণ দলে দলে মার্-মার্ কাট্-কাট্ শব্দে ধ্রুবকে খাইতে আসিল। সঙ্গে সঙ্গে শত শত শিয়াল ডাকিয়া উঠিল। রাক্ষসেরাও তাহাদের সিংহের মতো, উটের মতো, কুমিরের মতো মুখ দিয়া আগুন ফুঁকিতে ফুঁকিতে কতই গর্জন করিল. শেল, শূল, মুষল, মুদ্গর

কতই ঘুরাইল, আর দাঁত খিঁচাইল! ধ্রুব তাহা টেরও পাইল না।

এইরূপে যখন ধ্রুবের তপস্যা ভাঙিবার সকল চেষ্টাই বিফল হইল, তখন দেবতারা ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে শ্রীহরির নিকটে আসিয়া বলিলেন, "হে প্রভু, আমাদিগকে রক্ষা করুন। উত্তানপাদের পুত্র অতি ভীষণ তপস্যা আরম্ভ করিয়াছে, না জানি আমাদের কাহার কাজটি কাড়িয়া নিবে। শীঘ্র উহার তপস্যা থামাইয়া দিন।"

শ্রীহরি বলিলেন, "তোমাদের কোনো ভয় নাই। ধ্রুব কি চাহে, আমি তাহা জানি। তাহার বাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া আমি তাহার তপস্যা শেষ করিয়া দিতেছি।" তারপর তিনি সেই মধুবন আলো করিয়া ধ্রুবের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "ধ্রুব! তোমার মঙ্গল হউক। আমি তোমার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া বর দিতে আসিয়াছি ; তুমি কি চাহ?" তখন ধ্রুব চক্ষু মেলিয়া সেই-সকল দেবতার শ্রেষ্ঠ দেবতাকে সম্মুখে দেখিয়া যারপরনাই আনন্দিত হইল, ভয়ও পাইল। সে অমনি তাঁহার পায়ে লুটাইয়া বলিল, "আমি তো জানি না, কি করিয়া আপনার স্তব করিতে হয় ; আমাকে তাহা শিখাইয়া দিন।" বলিতে বলিতে শ্রীহরির কৃপায় তাহার জ্ঞান হইল। তখন সে প্রাণ ভরিয়া অতি মধুর বাক্যে শ্রীহরির স্তব করিতে করিতে বলিল, "বিমাতা আমাকে ধমকাইয়া বলিয়াছেন, যে তাঁহার পুত্র নহি বলিয়া আমি রাজাসনে বসিতে পাইব না। হে প্রভু, আমি আপনার নিকট এমন স্থান চাই যে তাহা সংসারের সকল স্থানের চেয়ে ভালো।" শ্রীহরি বলিলেন, "ধ্রুব, তুমি তাহাই পাইবে। চন্দ্র, সূর্য, বুধ, বৃহস্পতি, সকলের উপরে তোমার স্থান হইল। তোমার মাতাও তারা হইয়া তোমার নিকটে থাকিবেন।"

সেই অবধি শ্রীহরির বরে ধ্রুব আকাশে ধ্রুবতারা হইয়া সংসারচক্র ঘুরাইতেছে এইরূপ আমাদের পুরাণে লেখা।

সন্দেশ—জ্যৈষ্ঠ ১৩২২

বিষ্ণুর অবতার

পুরাণে আছে যে, বিষ্ণু সময় সময় নানারূপ জন্তু ও মানুষের রূপ ধরিয়া অনেক আশ্চর্য কাজ করিয়াছিলেন। বিষ্ণুর এই-সকল রূপ ধারণকে তাঁহার এক-একটি 'অবতার' বলা হয়।

এই যে সৃষ্টি তাহার জীবন নাকি এক কল্প কাল। এক-এক কল্প পরে 'প্রলয়' অর্থাৎ সৃষ্টি নাশ হইয়া আবার নাকি নূতন সৃষ্টি হয়। এখনকার এই জগতের সৃষ্টি হইবার পূর্বে আর-এক জগতের প্রলয় হইয়াছিল। বিষ্ণু তাহার পূর্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে প্রলয়ের কাল উপস্থিত হইয়াছে। তখন তিনি একটি খুব ছোট মাছের রূপ ধরিয়া কৃতমালা নামক নদীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই সময়ে সূর্যের পুত্র বৈবস্বত মনু সেই নদীর নিকটে থাকিয়া তপস্যা করিতেছিলেন। একদিন মনু কৃতমালার জলে নামিয়া তর্পণ

করিতেছেন, এমন সময় হঠাৎ তিনি দেখিলেন যে একটি নিতান্ত ছোট মাছ তর্পণের জলের সঙ্গে তাহার অঞ্জলির ভিতর উঠিয়াছে।

সেই মাছটিই ছিলেন বিষ্ণু, কিন্তু মনু তাহা জানিতেন না। তিনি মাছটিকে জলে ফেলিয়া দিতে যাইবেন, এমন সময় সে তাঁহাকে মিনতি করিয়া বলিল, "আমাকে জলে ফেলিবেন না। বড় মাছেরা আমাকে খাইয়া ফেলিবে।" এ কথায় মনু তাহাকে তাঁহার ঘরে আনিয়া কলসীর ভিতরে রাখিয়া দিলেন। কিন্তু সে মাছ এত তাড়াতাড়ি বাড়িতে লাগিল যে দেখিতে দেখিতে আর সে সেই কলসীতে ধরে না। কলসী হইতে চৌবাচ্চায় রাখিলেন, খানিক পরেই আর সে তাহাতেও ধরে না ; চৌবাচ্চা হইতে পুকুরে রাখিলেন, শেষে তাহাতেও ধরে না, সেখান হইতে হ্রদে রাখিলেন, ক্রমে তাহাও তাহার পক্ষে ছোট হইয়া গেল।

তখন মনু তাহাকে কাঁধে করিয়া সমুদ্রের জলে ফেলিবামাত্র সে লক্ষ যোজন বড় হইয়া যাওয়ায়, তিনি যারপরনাই আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "ভগবান্, আপনি কে? আপনি নিশ্চয় স্বয়ং বিষ্ণু! আপনাকে নমস্কার।" মাছ বলিল, "তুমি ঠিক বুঝিয়াছ, আমি দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালনের নিমিত্ত মৎস্য-রূপ ধারণ করিয়াছি। আজ হইতে সাত দিনের মধ্যে সকল সৃষ্টি সাগরের জলে ডুবিয়া যাইবে। সেই সময়ে তোমার নিকট একখানি নৌকা আসিবে, তুমি সপ্তর্ষিদিগকে আর সকল জীবের দুটি দুটিকে সঙ্গে লইয়া তাহাতে উঠিয়া বসিও তখন আমিও আবার আসিব, আমার শিঙে তোমার নৌকাখানাকে বাঁধিয়া দিও। এই বলিয়া বিষ্ণু চলিয়া গেলেন ; তারপর ক্রমে তাঁহার কথা-মতো সমস্তই ঘটিতে লাগিল। সমুদ্র উথলিয়া উঠিল নৌকা আসিল, সেই মাছও আসিয়া দেখা দিল—সে এখন দশলক্ষ যোজন বড়, তাহার দেহ সোনার, আর মাথায় একটা শিং। সেই শিঙে নৌকা বাঁধিয়া দিলে আর কোনো বিপদের আশঙ্কা রহিল না।

ইহাই হইল বিষ্ণুর মৎস্যাবতার, তারপর কূর্মাবতার। সমুদ্রের ভিতর অমৃত ছিল, সেই অমৃত পাইবার জন্য দেবতারা দৈত্যগণের সহিত মিলিয়া সমুদ্রকে মন্থন করিয়াছিলেন। সেই মন্থনের দণ্ড হইয়াছিল মন্দার পর্বত, আর দড়ি হইয়াছিল বাসুকি নাগ। মন্থন আরম্ভ হওয়া মাত্রই সেই পর্বত জলের ভিতরে ঢুকিয়া যাইতে লাগিল, কাজেই দেবতারা দেখিলেন যে তাঁহাদের সকল পরিশ্রমই মাটি হইতে চলিয়াছে। সেই সময় বিষ্ণু বিশাল কচ্ছপের রূপ ধরিয়া পর্বতটাকে পিঠে করিয়া লইয়াছিলেন, নচেৎ নিশ্চয় তাহা একেবারেই তল হইয়া যাইত, মন্থন অসম্ভব হইত, দেবতাদের ভাগ্যেও আর অমৃত খাওয়া ঘটিত না।

কূর্মাবতারের পর বরাহাবতার। হিরণ্যাক্ষ আর হিরণ্যকশিপু নামে দুইটা ভারি ভয়ানক দৈত্য ছিল। দেবতাদিগকে যে তাহারা কিরূপ নাকাল করিয়াছিল, সে আর বলিবার নহে। হিরণ্যাক্ষ ছেলেবেলায় হাতি আর সিংহে চড়িয়া সূর্যটাকে লইয়া খেলা করিত। তারপর একদিন সে করিল কি, কুকুর যেমন

মুখে করিয়া পিঠা লইয়া ছুট দেয়, তেমনিভাবে সে পৃথিবীটাকে মুখে লইয়া জলের ভিতরে গিয়া ঢুকিল। ইহাতে ব্রহ্মা নিতান্তই ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তাঁহার এমন শক্তি হইল না যে দুষ্ট দৈত্যের মুখ হইতে পৃথিবীটাকে ছিনাইয়া আনেন। তখন তিনি আর উপায় না দেখিয়া বিষ্ণুর স্তব আরম্ভ করিলেন। বিষ্ণু একটা শূকরের বেশ ধরিয়া তাঁহার নাকের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। তারপর সেই শূকর বাড়িতে বাড়িতে পর্বতপ্রমাণ হইয়া জলের দিকে ছুটিয়া চলিল।

সেই জলের নিকটে নারদ মুনি ছিলেন, তিনি সেই শূকরকে দেখিয়াই চিনিতে পারিয়া জোড়হাতে বলিলেন, "আজ্ঞা করুন কি করিব।" শূকর বলিল, "আমি যতক্ষণ হিরণ্যাক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ করিব, ততক্ষণ তুমি কেবলই জল শুষিতে থাকিবে।" নারদ দুহাতে জল তুলিয়া ক্রমাগত মুখে দিতে লাগিলেন, যতক্ষণ না হিরণ্যাক্ষের সহিত বিষ্ণুর যুদ্ধ শেষ হইয়াছিল, ততক্ষণ তিনি থামেন নাই। সেই যুদ্ধ জলে পাঁচশত বৎসর, আর স্থলে পাঁচশত বৎসর, সব সুদ্ধ একহাজার বৎসর চলিয়াছিল। তারপর সেই শূকর হিরণ্যাক্ষকে মারিয়া মুখে করিয়া, পৃথিবীকে জল হইতে তুলিয়া আনিয়া ব্রহ্মাকে দিল।

ইহার পর নৃসিংহাবতার। এবারে বিষ্ণু অর্ধেক মানুষের আর অর্ধেক সিংহের মতো অতি ভীষণ মূর্তি ধারণ করিয়া হিরণ্যাক্ষের ভাই হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়াছিলেন। হিরণ্যাক্ষের মৃত্যুতে ভয়ানক রাগিয়া গিয়া হিরণ্যকশিপু তাহার প্রতিশোধ লইবার জন দশহাজার বৎসর ঘোরতর তপস্যা করে। তাহার দেহে গাছ হইল, তাহাতে পাখিরা বাসা করিল, তথাপি সে তপস্যা ছাড়িল না। তখন ব্রহ্মা আর থাকিতে না পারিয়া তাহাকে বর দিতে আসিলে, সে বলিল, "আপনার সৃষ্ট কোনো বস্তু বা জীব আমাকে বধ করিতে পারিবে না, এই বর আমাকে দিন।" ব্রহ্মা সেই বর তাহাকে দিয়া চলিয়া গেলেন, আর অমনি সেই দৈত্য তাহার জ্ঞাতিবন্ধুগণের সহিত মিলিয়া সৃষ্টি তোলপাড় করিয়া তুলিল। ইন্দ্র, বরুণ, কুবের, কাহাকেও সে নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে দিল না, সকলেরই ধনসম্পত্তি কাড়িয়া লইল। তখন দেবতাগণ তাহার জ্বালায় অস্থির হইয়া বিষ্ণুর নিকট নিজ নিজ দুঃখ জানাইলে বিষ্ণু বলিলেন, "তোমাদের কোনো ভয় নাই, আমি শীঘ্রই এই দৈত্যকে বধ করিয়া তোমাদের দুঃখ দূর করিব।"

কিন্তু বিষ্ণুর উপরেই হিরণ্যকশিপুর সর্বাপেক্ষা অধিক রাগ ছিল। সে তাঁহার পূজা বন্ধ করিয়া দিবার জন্য কোনো চেষ্টারই ত্রুটি করে নাই। তাহার নিজের পুত্র প্রহ্লাদ বিষ্ণুভক্ত ছিল, সেজন্য দুষ্ট দৈত্য সেই বালককে কি ভীষণ যন্ত্রণাই দিয়াছিল! কিন্তু প্রহ্লাদ কিছুতেই হরিনাম পরিত্যাগ করে নাই। হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোর হরি কোথায় আছে?" প্রহ্লাদ বলিল, "তিনি সর্বত্রই আছেন।" হিরণ্যকশিপু একটা থাম দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এই থামের ভিতর আছে?" প্রহ্লাদ বলিল, "অবশ্য আছেন।" হিরণ্যকশিপু তখন খড়্গ লইয়া মহারোষে সেই স্তম্ভে আঘাত করিল। অমনি

বজ্রপাতের ন্যায় ভীষণ গর্জনে বিষ্ণু সেই স্তম্ভের ভিতর হইতে বাহির হইলেন, তাঁহার দেহ অর্ধেক মানুষের, অর্ধেক সিংহের ন্যায় ; নখ অতি ভীষণ ; কেশর উড়িয়া মেঘে ঠেকিয়াছে ; মুখ দিয়া আগুন বাহির হইতেছে। দৈত্যেরা ক্ষণমাত্র তাঁহার সহিত ভীষণ যুদ্ধ করিল। কিন্তু সেই ভয়ংকর নৃসিংহ মূর্তি নিজের নিশ্বাস দ্বারাই আর সকল দৈত্যকে মুহূর্তে ভস্ম করিয়া, দেখিতে দেখিতে হিরণ্যকশিপুর বুক নখে চিরিয়া তাহার রক্ত খাইতে আরম্ভ করিলেন।

এত করিয়াও সেই ভীষণ মূর্তির রাগ দূর হইল না, তাঁহার মুখের আগুনও নিবিল না। তখন দেবতাগণ যারপরনাই ভয় পাইয়া তাঁহাকে থামাই-বার উপায় দেখিতে লাগিলেন কিন্তু কাহারও তাঁহার নিকটে যাইতে ভরসা হইল না। ইন্দ্র বলিলেন, "আমার চোখ ঝলসিয়া যাইবে।" ব্রহ্মা বলিলেন, "আমার দাড়ি পুড়িয়া যাইবে।"

গণেশ অনেক সাহস করিয়া তাঁহার ইঁদুরে চড়িয়া কিছুদূর আসিয়া-ছিলেন, কিন্তু এর মধ্যে হঠাৎ নৃসিংহের ফুঁ লাগিয়া তাঁহার ইঁদুরটি উলটিয়া যাওয়াতে, তাঁহাকে তাঁহার সেই বিশাল ভুঁড়িসুদ্ধ গড়াগড়ি যাইতে হইল।

শেষে আর কোনো উপায় না দেখিতে পাইয়া দেবতাগণ মহাদেবের শরণা-পন্ন হইলে, মহাদেব অতি অদ্ভুত শরভের মূর্তি ধরিয়া নৃসিংহের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই শরভকে দেখিবামাত্র নৃসিংহের রাগ থামিয়া গেল, সকলের ভয়ও দূর হইল।

দেবতাদিগের সহিত অসুরেরা চিরকালই ঘোরতর শত্রুতা করিত, আর অনেকসময়ই তাহাদের লাঞ্ছনা করিত যতদূর হইতে হয়। প্রহ্লাদের পিতা কি করিয়াছিল, তাহা আমরা পূর্বেই শুনিয়াছি। প্রহ্লাদের নাতি 'বলি'ও তাহার চেয়ে নিতান্ত কম করে নাই। এদিকে বলি ধার্মিক ছিল খুবই, কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? সে যে অসুর, কাজেই দেবতাদের সঙ্গে শত্রুতা না করিয়া থাকিতে পারিত না।

একবার সে ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে দলবলসুদ্ধ স্বর্গ হইতে তাড়াইয়া দিল। তখন দেবতাগণ আর কি করিবেন? তাঁহারা অতিশয় দুঃখিত হইয়া বিষ্ণুর আশ্রয় লইলেন। এদিকে ইন্দ্রের মাতা অদিতিদেবীও একমনে বিষ্ণুকে ডাকিয়া এই প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, "হে দেব। আমাকে এমন একটি পুত্র দান কর, যে এই-সকল অসুরকে বধ করিতে পারে।" কিছুকাল এইরূপে প্রার্থনা করার পর বিষ্ণু তাঁহাকে দেখা দিয়া বলিলেন, "মা, তুমি দুঃখ করিও না, আমি নিজেই তোমার পুত্র হইয়া অসুর বধ করিব।"

সেই পুত্রের নাম বামন। এমন সুন্দর ছোট্ট খোকা আর কেহ কখনো দেখে নাই। ঐরূপ ছোট্ট ছিলেন বলিয়াই তাঁহার নাম বামন। দেবতারা তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন, আর কত সুন্দর সুন্দর জিনিস যে তাঁহাকে দিলেন, কি বলিব। কেহ দিলেন পৈতা, কেহ দিলেন লাঠি, কেহ কমণ্ডলু, কেহ কাপড়, কেহ বেদ, কেহ জপের মালা।

বড় হইয়াও সেই খোকা তেমনি ছোট্টটিই রহিয়া গেলেন। তারপর একবার বলি এক বিশাল যজ্ঞ আরম্ভ করিল, মুনি-ঋষি কত যে তাহাতে আসিলেন তাহার সংখ্যা নাই। বামনও সেই যজ্ঞের কথা শুনিয়া বেদের মন্ত্র আওড়াইতে আওড়াইতে তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। বলি দেখিল, কোথা হইতে একটি ছোট্ট মুনি আসিয়াছেন, তাহার মাথায় জটা, হাতে দণ্ড কমণ্ডলু আর ছাতা। সে অতিশয় আদরের সহিত তাহাকে নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি ঠাকুর, আপনার কি চাই?" বামন বলিলেন, "আমি তোমার নিকট তিনপা জমি চাই।"

এ কথায় বলি হাসিয়া বলিল, "সে কি ঠাকুর, তিনপা জমি দিয়া কি করিবে? এ তো ছেলেমানুষের কথা। বড়-বড় গ্রাম চাও, টাকাকড়ি লোকজন যত খুশি চাও।"

বামন বলিলেন, "আমার অত জিনিসের দরকার নাই! আমার তিনপা জমি হইলেই চলিবে। বেশি লোভ করা ভালো নয়।"

তখন বলি বলিল, "আচ্ছা, তবে তুমি তিনপা জমিই নাও।" তারপর হাতে জল লইয়া সে বামনকে তিনপা জমি দান করিতে যাইবে, এমন সময় তাহার গুরু শুক্রাচার্য ব্যস্তভাবে তাহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, "মহারাজ, কর কি? ওঁকে যে সে লোক ভাবিও না। ইনি আর কেহ নহেন, নিজে বিষ্ণুই বামন সাজিয়া আসিয়াছেন। ইঁহাকে কিছুই দিও না, দিলে তোমার সর্বনাশ হইবে।"

বলি বলিল, "সামান্য একজন ভিক্ষুককেও আমি অমনি ফিরাই না, ইঁহাকে কেমন করিয়া ফিরাইব? বিশেষত আমি 'দিব' বলিয়াছি।"

এই বলিয়া বলি তিনপাদ ভূমি দান করিবামাত্র দেখিল, সেই খোকা আর খোকা নাই। সে এখন আকাশের চেয়েও উঁচু বিরাট পুরুষ হইয়া গিয়াছে। তারপর দেখিতে দেখিতে সেই বিরাট পুরুষের নাভি দিয়া আর একটি পা বাহির হইল। তখন তিনি এক পদে পৃথিবী, এক পদে স্বর্গ আর তৃতীয় পদে স্বর্গেরও উপরে মহর্লোক জনলোক প্রভৃতি ঢাকিয়া ফেলিয়া, বলির যত রাজ্য সকলই কাড়িয়া লইলেন। ইহার পর দুষ্ট অসুরগুলিকে বধ করা তো বিষ্ণুর পক্ষে অতি সহজ কাজ। তিনি সে কাজ শীঘ্র শীঘ্র শেষ করিয়া, পুনরায় ইন্দ্রকে ত্রিভুবনের রাজ্য দিয়া দিলেন।

যাহা হউক, বলি ধার্মিক লোক ছিল ; সুতরাং শ্রীবিষ্ণু তাহাকে বধ না করিয়া স্নেহের সহিত বলিলেন, "তুমি এক কল্পকাল বাঁচিয়া থাক। এই ইন্দ্রের পরে তুমি ইন্দ্র হইবে। এখন তুমি সুতল নামক পাতালে গিয়া বাস কর। সে অতি সুন্দর স্থান। দেখিও আর কখনো যেন দেবতাদের সঙ্গে বিরোধ করিও না।" তদবধি বলি পাতালে বাস করিতেছে।

ইহাই হইল বিষ্ণুর বামন অবতার। ইহার পরের অবতার পরশুরাম। সে অবতার বিষ্ণু জামদগ্নি মুনির পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করেন।

সে কালে ক্ষত্রিয়েরা বড়ই উদ্ধত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাদিগকে সাজা দিবার জন্যই পরশুরামের জন্ম।

তখনকার প্রধান ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন কার্তবীর্য, অর্থাৎ কৃতবীর্যের পুত্র, অর্জুন। দত্তাত্রেয়ের বরে অর্জুনের একহাজার হাত হইয়াছিল। সেই একহাজার হাতে একহাজার অস্ত্র লইয়া তিনি দেবতাদিগকে অবধি যুদ্ধে হারাইয়া দিতেন, এজন্য তাঁহার দর্পের আর সীমাই ছিল না।

একবার কার্তবীর্য মৃগয়া করিতে গিয়া বনের ভিতর অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়েন। সেই সময়ে মহর্ষি জমদগ্নি তাঁহাকে নিমন্ত্রণপূর্বক, নিজের আশ্রমে আনিয়া বিবিধ উপচারে আহার করাইয়াছিলেন। ভালো লোক হইলে ইহাতে সে মুনির প্রতি কতই কৃতজ্ঞ হইত। আর হয়তো তাঁহার কত উপকার হইত। কিন্তু কার্তবীর্য সেরূপ স্বভাবের লোক ছিলেন না। মুনি যে তাঁহাকে কত ক্লেশ হইতে বাঁচাইলেন, সে কথা তাঁহার মনেই আসে না। তিনি একদৃষ্টে কেবল মুনির গাইটিকেই দেখিতে লাগিলেন। সেটি কামধেনু, মুনি তাহার নিকট যাহা চাহেন, তাহাই পান, রাজার লোক তাহা খাইয়া শেষ করিতে পারে না। রাজা ভাবিলেন, এ গাইটি তাঁহার না হইলেই চলিতেছে না। কাজেই তিনি মুনিকে বলিলেন, "ভগবন্, গাইটি আমাকে দিন।" মুনি সে কথায় রাজি না হওয়ায় রাজা সেটি তাঁহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া গেলেন।

পরশুরাম কার্তবীর্যকে বধ করিয়া সেই গাই ফিরাইয়া আনিলেন। তারপর তিনি বনে চলিয়া গিয়াছেন এমন সময় কার্তবীর্যের পুত্রেরা আসিয়া অতি নিষ্ঠুরভাবে মহর্ষি জমদগ্নির প্রাণ নাশ করিল।

পরশুরাম আশ্রমে ফিরিয়া সেই দারুণ সংবাদ শুনিবামাত্র ক্রোধে অধীর হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে পৃথিবীর যত ক্ষত্রিয় সব তিনি মারিয়া শেষ করিবেন। তারপর ভীষণ কুঠার হস্তে সেই যে তিনি ক্ষত্রিয় মারিতে আরম্ভ করিলেন, তাহাদিগকে শেষ না করিয়া আর ক্ষান্ত হইলেন না। একবার নয়, দুবার নয়, ক্রমাগত একুশবার তিনি এইরূপে পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করেন। ক্ষত্রিয়ের রক্তে কুরুক্ষেত্রে পাঁচটি কুণ্ড প্রস্তুত করিয়া তাহাতে পিতার তর্পণ করিলে, তবে তাঁহার ক্রোধ কিঞ্চিৎ শান্ত হইল।

ক্ষত্রিয়েরাই ছিল পৃথিবীর রাজা ; তাহাদিগকে বধ করিয়া তাঁহাদের সকলের রাজ্যই পরশুরামের হইল। সেই-সব রাজ্য তখন তিনি মহর্ষি কশ্যপকে দান করিলেন। দান করিয়া তাঁহার মনে এই চিন্তা হইল যে সকলই তো পরের রাজ্য হইল। এখন কোথায় বাস করি ? এই ভাবিয়া তিনি অস্ত্রদ্বারা সমুদ্রের জল সরাইয়া এক নূতন রাজ্যের সৃষ্টি করিলেন। তদবধি উহাই তাঁহার বাসস্থান হইল।

সন্দেশ—আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩২২

পূতনা বলিয়া একটা বড়ই ভীষণ রাক্ষসী কংসের রাজ্যে বাস করিত। ছোট-ছোট ছেলেদিগকে কৌশলে বধ করাই ছিল ইহার ব্যবসায়। রাত্রি-কালে কোনো খোকা-খুকি এই হতভাগিনীর দুধ পান করিলে আর তাহাদের রক্ষা ছিল না। সে সব খোকা-খুকির দেহ তখনই চূর্ণ হইয়া যাইত।

যখন জানা গেল যে কংসকে মারিবার লোকের জন্ম হইয়াছে। অমনি সে দুষ্ট এই পূতনাকে ডাকিয়া বলিল যে যত ষণ্ডা-ষণ্ডা খোকা দেখিবে, সকল-কেই বধ করিতে হইবে। তদবধি সেই হতভাগিনী কেবলই লোকের ছোট-ছোট খোকা মারিয়া বেড়ায়। এমনি করিয়া কত খোকার প্রাণ যে সে হরণ করিল, তাহার সংখ্যা নাই।

নন্দের একটি খোকা হইয়াছে শুনিয়, এই রাক্ষসী একদিন গোকুলে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন কিন্তু তাহার রাক্ষসী মূর্তি ছিল না। সে এমনি সুন্দর একটি মেয়ে সাজিয়া, এমনি সুন্দর বেশভূষা করিয়া, এমনি মিষ্ট হাসি হাসিয়া আসিয়াছিল যে তাহাকে দেখিয়া সকলে ভাবিল, নিশ্চয় স্বয়ং লক্ষ্মী গোকুলে আসিয়াছেন। সে যেদিকে যায়, সকলে তাহাকে পথ ছাড়িয়া দিয়া জড়সড়ভাবে সরিয়া দাঁড়ায়। দুষ্ট রাক্ষসী ধীরে ধীরে সূতিকা ঘরে ঢুকিল, কেহই তাহাকে নিষেধ করিল না। সে ঘরে যশোদা ছিলেন, বলরামের মা রোহিণীও ছিলেন, তাঁহারা তাহাকে দেখিয়া অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন।

রাক্ষসী একপা-দুপা করিয়া আসিয়া বিছানার পাশে বসিল ও হাসিতে হাসিতে যেন কতই আদরে, খোকাটিকে কোলে তুলিয়া দুধ খাওয়াইতে লাগিল। যশোদাও কিছু বলিলেন না, রোহিণীও কিছু বলিলেন না, রাক্ষসীর মায়ায় তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

কিন্তু খোকা সে মায়ায় ভোলে নাই। যিনি স্বয়ং বিষ্ণু, রাক্ষসীর মায়া তাঁহার কাছে খাটিবে কেন! রাক্ষসী হাসিতে হাসিতে খোকাকে দুধ খাইতে দিল, খোকা সেই দুধের সঙ্গে অভাগীর প্রাণ অবধি চুষিয়া লইল। তখন যে রাক্ষসী চ্যাঁচাইয়া ছিল, তেমন চীৎকার আর গোকুলের কেহ কোনোদিন শুনে নাই। তাহারা সকলি ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে তখনই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া দেখিল কি ভীষণ ব্যাপার! বিকট রাক্ষসী মৃত্যু যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, তিন গব্যুতি (ছয় ক্রোশ) পরিমিত স্থানের গাছপালা তাহার দেহের চাপনে চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। রাক্ষসীর এক-একটা দাঁত যেন একেকটি লাঙ্গলের ফাল, নাকের ছিদ্র যেন পর্বতেব গুহা চোখদুটা যেন দুটা কুয়া। সেই রাক্ষসীর বুকের উপর শুইয়া খোকা আনন্দে হাত পা ছুঁড়িতেছে। তখনই সকলে খোকাকে কোলে তুলিয়া লইল। আর ক্রমাগত ষাট্‌ ষাট্‌ বলিতে বলিতে কত দেবতার নাম যে করিল তাহার অন্তই নাই।

উহারা যদি জানিত যে সেই খোকাটাই রাক্ষসীটাকে মারিয়াছে, তবে না জানি কত আশ্চর্য হইত।

আর একদিন খোকাকে একটা গাড়ির নীচে, একটি ছোট্ট খাটে শোয়াইয়া রাখা হইয়াছিল। বোধ হয় এইভাবে তাহাকে প্রায়ই শোয়াইয়া রাখা হইত। সেদিন বাড়িতে কিসের উৎসব ছিল, সকলে তাহাতেই মত্ত, খোকার কথা আর কাহারও মনে নাই ; খোকার কিন্তু এদিকে বড়ই ক্ষুধা হইয়াছে, তাহার দরুন সে পা ছুঁড়িয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিয়াছে। পা ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে একবার তাহার লাথি লাগিয়া, হাঁড়ি কলসীতে বোঝাই সেই প্রকাণ্ড গাড়িখানা উলটিয়া গেল। সে-সব হাঁড়ি কলসী তখনই খান্‌খান্‌ হইয়া ভাঙিয়া গেল। আর শব্দও অবশ্য যেমন তেমন হইল না। তাহা শুনিয়া সকলে ছুটিয়া আসিয়া দেখিল যে খোকা চিৎ হইয়া শুইয়া পা ছুঁড়িতেছে। তাহার পাশে গাড়ি-খানা উলটান, আর হাঁড়ি কলসী চূর্ণ হইয়া তুমুল কাণ্ড উপস্থিত। এত বড় গাড়ি কি করিয়া উলটিল, এ কথা সকলেই তখন ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। সেখানে আর কয়েকটি বালক ছিল, তাহারা খোকাকে দেখাইয়া বলিল, "এই খোকা পা ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে গাড়ি উলটাইয়া ফেলিয়াছে ; আমরা দেখিয়াছি।" শুনিয়া সকলে হাঁ করিয়া একবার খোকার দিকে একবার গাড়িখানার দিকে তাকাইতে লাগিল।

খোকাটি একটু বড় হইলে তাহার 'কৃষ্ণ' নাম রাখা হইল। রোহিণীর খোকার নাম যে 'বলরাম' তাহাও এই-সময়ে রাখা হয়। কি দুরন্ত দুটি খোকাই তাহারা ছিল।

যখন কৃষ্ণ আর বলরাম একসঙ্গে হামাগুড়ি দিয়া বেড়াইতে শিখিলেন, তখন হইতে আর এক মুহূর্তের জন্যেও কাহারও নিশ্চিন্ত থাকিবার জো রহিল না। ছাই আর গোবর দেখিলেই দুটি খোকা অমনি তাহা লইয়া গায়ে মাখা-ইবে, যশোদার সাধ্য কি যে তাহাদিগকে বারণ করেন। একটু চোখের আড়াল হইলেই তাহারা গোয়াল ঘরে ঢুকিয়া ছোট-ছোট বাছুরগুলির লেজ ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ করিত। ইহাদের পিছুপিছু ছুটাছুটি করিয়া যশোদা নাকালের একশেষ হইতে লাগিলেন। শেষে একদিন তিনি আর কিছুতেই ইঁহাদিগকে সামলাইতে না পারিয়া, রাগের ভরে বকিতে বকিতে লাঠি হাতে কৃষ্ণকে তাড়া করিলেন। তারপর তাঁহাকে ধরিয়া মোটা দড়ি দিয়া একটা উদুখলের সঙ্গে বাঁধিয়া বলিলেন, "পালা দেখি এখন!"

এই বলিয়া যশোদা নিশ্চিন্ত মনে ঘরের কাজে গিয়াছেন, আর কৃষ্ণও অমনি সেই উদুখল টানিয়া উঠান পাড়ি দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। উদুখল টানিতে টানিতে তিনি দুটি অর্জুনগাছের মধ্য দিয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু গাছদুটি খুব কাছাকাছি থাকায় উদুখলটি সেখান দিয়া গলিতে না পারিয়া আটকাইয়া গেল। তখন কৃষ্ণের টানাটানিতে সেই প্রকাণ্ড গাছদুটি মহাশব্দে ভাঙিয়া পড়ায় সকলে ভাবিল না জানি কি হইয়াছে। তাহারা নিতান্ত ব্যস্ত-ভাবে ছুটিয়া আসিয়া দেখিল যে খোকা দুইগাছের মাঝখানে বসিয়া, তাহার ছোট-ছোট দাঁতকটি বাহির করিয়া হাসিয়া অস্থির, তাহার পেটের সঙ্গে দড়ি দিয়া উদুখল বাঁধা। সেই হইতে কৃষ্ণের একটি নাম হইল 'দামোদর' ; কিনা

'পেটে দড়ি' (দাম=দড়ি, উদর=পেট)। যা হোক, সে প্রকান্ড গাছ ভাঙ্গা যে সেই খোকার কাজ এ কথা কেহ বুঝিতে পারিল না। বুড়ারা বলিল, "এখানে বড়ই উৎপাত আরম্ভ হইয়াছে দেখিতেছি ; গাড়ি উলটিয়া যায়, বিনা ঝড়ে গাছ ভাঙিগয়া পড়ে। এখানে আর থাকা উচিত নয় ; চল আমরা বৃন্দাবনে চলিয়া যাই।" এই বলিয়া তখনই সকলে গোকুল ছাড়িয়া বৃন্দাবনে চলিয়া গেল।

সন্দেশ—আশ্বিন ১৩২২

শিবের বিয়ে

দুর্গার এক নাম 'পার্বতী', অর্থাৎ, পর্বতের মেয়ে। তাঁর পিতা হিমালয়, মা মেনকা। শিবের সঙ্গে যাতে তাঁর বিয়ে হয়, এজন্য পার্বতী অনেকদিন ধরে কঠিন তপস্যা করেছিলেন, তার ফলে শেষে শিবের সঙ্গেই তাঁর বিয়ে হল।

পার্বতীর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে শিব তাঁকে বিবাহ করতে চাইলেন। কিন্তু বর যে, সে তো আর নিজের কনের বাপের কাছে গিয়ে বিয়ে ঠিক করতে পারে না, তা হলে লোকে হাসে! কাজেই শিব সপ্তর্ষিদের ডেকে পাঠালেন। সপ্তর্ষিরাও তখনই সোনার বল্কল পরে, মুক্তামালা গলায় দিয়ে, মণি-মাণিক্যের গহনা ঝল্‌মলিয়ে তাঁর কাছে এসে জোড়হাতে বললেন, "আমাদের কি সৌভাগ্য!. প্রভু আজ আমাদের স্মরণ করেছেন। আজ্ঞা করুন, আমাদের কি করতে হবে।"

শিব বললেন, "আমি হিমালয় পর্বতের মেয়ে পার্বতীকে বিয়ে করতে চাই ; তোমরা তাঁর কাছে গিয়ে সব ঠিকঠাক কর। দেখো যেন ভালোমতে কাজটি করে আসতে পার।"

সপ্তর্ষিরা তখন নিমেষের মধ্যে আকাশে উড়ে, সেই ঝক্‌ঝকে হিমালয় পর্বতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। হিমালয় দূরে থেকে তাঁদের দেখতে পেয়ে মেনকাকে বললেন, "না জানি ঐ সাতটি সূর্য কি করতে আমাদের এখানে আসছে!" বলতে বলতেই তিনি দেখলেন, ও-সব সূর্য নয়, সাতটি মুনি। তখন তিনি তাড়াতাড়ি তাঁদের কাছে গিয়ে, জোড়হাতে তাঁদের নমস্কার করে বসতে সুন্দর আসন দিয়ে বললেন, "মুনি-ঠাকুরেরা কি মনে করে আমাদের এখানে পায়ের ধুলো দিয়েছেন?" মুনিরা বললেন, "শিব তোমার কন্যা পার্বতীকে বিয়ে করতে চেয়েছেন, তাই আমরা এসেছি। এমন জামাই আর পাবে না রাজা, শিবের কাছে তোমার পার্বতীর বিয়ে দাও।"

তা শুনে হিমালয়ের আর আনন্দের সীমাই রইল না। তিনি তখনি ছুটে গিয়ে, পার্বতীকে সাজিয়ে-গুজিয়ে এনে মুনিদের কোলে বসিয়ে দিয়ে বললেন, "এই নিন, আমার পার্বতীকে।" এমন সুন্দর লক্ষ্মী মেয়ে আর কখনো হয় নি, হবেও না। পার্বতীকে দেখে স্নেহে মুনিদের মন গলে গেল। তাঁরা তাঁর গায়ে

হাত বুলিয়ে, তাঁকে কত আশীর্বাদ করে, বিয়ের সব কথাবার্তা বলে সেখান থেকে পরম আনন্দে হাসতে হাসতে চলে এলেন। স্থির হল যে আর তিনদিন পরেই শিবের সঙ্গে পার্বতীর বিয়ে হবে।

সপ্তর্ষিরা শিবের কাছে এসে এ-সব কথা জানালে শিব যারপরনাই খুশি হয়ে বললেন, "বেশ বেশ! বিয়ের সময় তোমরা আমার পুরুত হবে কিন্তু। তোমাদের শিষ্যদেরও নিয়ে আসবে।"

মুনিরা সে কথায় 'যে আজ্ঞা' বলে চলে যেতেই শিব বিয়ের আয়োজন করবার জন্য তাঁর ভূত প্রেত নিয়ে কৈলাস পর্বতে চলে এলেন। তারপর তিনি নারদকে ডেকে বললেন, "নারদ, বিয়ের ঠিক করেছি ; কনে হচ্ছেন হিমালয়ের মেয়ে পার্বতী। এখন তুমি একটি কাজ কর তো ; দেবতাদের সকলকে নিমন্ত্রণ করে এস। মুনি-ঋষিদেরও বলবে ; যক্ষ-গন্ধর্বেরাও যেন বাদ না পড়ে। সকলকেই আসতে হবে; যে না আসবে তার সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হবে।"

নারদ মুনি যেমন তেমন চালাক লোক ছিলেন না, শিবের হুকুমমতো সব কাজ করে ফেললেন।

ততক্ষণে কৈলাস পর্বতে খুবই ধুমধাম পড়ে গেছে ; ভূতেরা ঢাক, ঢোল, শিঙ্গা, সানাই, কাঁসর, করতাল সব বাজিয়ে সৃষ্টি মাথায় করে তুলেছে। তাদের মুখে আজ আর হাসি ধরে না। ক্রমে দেবতারাও একজন-দুজন করে এসে উপস্থিত হলেন। হাঁসে চড়ে ব্রহ্মা এলেন, গরুড়ে চড়ে বিষ্ণু এলেন। ইন্দ্র, যম, কুবের, বরুণ, কেউ আসতে বাকি রইলেন না। গন্ধর্ব আর অপ্সরারা তো এর ঢের আগেই এসে গান-বাজনা জুড়ে দিয়েছে। শিবও সেই কখন থেকে সেজেগুজে প্রস্তুত হয়ে আছেন। বরের বেশে তাঁকে কি সুন্দরই দেখা যাচ্ছে।

তারপর সকলে শিবকে নিয়ে রওনা হলেন। দেবতারা নিজ নিজ দল নিয়ে বরের আগে আগে যেতে লাগলেন, বাজনদারেরা মাথা দুলিয়ে নাচতে নাচতে তাদের সঙ্গে সঙ্গে বাজিয়ে চলল।

এদিকে হিমালয়ও চুপ করে বসে থাকেন নি। পার্বতীকে নাইয়ে, সাজিয়ে তাঁরাও প্রস্তুত হয়ে আছেন। বাড়ি ঘর সাজিয়ে, তোরণ বানিয়ে, নিশান উড়িয়ে, স্বপ্নপুরীর মতো সুন্দর করা হয়েছে। পর্বতেরা সকলে সেজেগুজে সপরিবারে এসে কাজকর্মে ব্যস্ত রয়েছেন। শিবকে এগিয়ে আনবার জন্য স্বয়ং গন্ধমাদন পর্বত কখন বেরিয়ে গেছেন। বর এলে তাকে আদর করে আনতে হবে, সেজন্য নিজে হিমালয় ফটকে দাঁড়িয়ে।

বাড়ির ভিতরেও অবশ্যি কেউ চুপ করে নাই। মেয়েদের আজ বড়ই আনন্দ আর উৎসাহ। পার্বতীর মা মেনকাদেবী তো আনন্দে মাথা ঠিকই রাখতে পাচ্ছেন না। তিনি এরই মধ্যে নারদ মুনিকে সঙ্গে করে গিয়ে ছাতে উঠে আছেন—যার জন্যে মেয়ে এত তপস্যা করলেন, সেই শিবকে সকলের আগে দেখতে হবে। সাধারণ দেবতারাই যখন দেখতে এত সুন্দর, শিব না জানি তবে কত সুন্দর।

এমন সময় গন্ধর্বের রাজা বিশ্বাবসু এলেন। তিনি দেখতে খুবই সুন্দর ; তাঁকে দেখে মেনকা বললেন, "এই বুঝি শিব!" নারদ তাতে হেসে বললেন, "না, না—ও তো আমাদের বাজনদার ; ও কেন শিব হবে? তা শুনে মেনকা তো থতমত খেয়ে চুপ করে গেলেন, ভাবলেন, 'বাজনদারই দেখতে এমন, শিব না জানি তবে কেমন!'

তারপর এলেন যক্ষদের নিয়ে কুবের ; তিনি গন্ধর্বের রাজার চেয়ে দ্বিগুণ সুন্দর। মেনকা বললেন, "তবে এই শিব!" নারদ বললেন, "না!" শুনে মেনকা আরো আশ্চর্য হলেন।

তারপর এলেন বরুণ, তিনি কুবেরের চেয়ে দ্বিগুণ সুন্দর ; তারপর এলেন যম, তিনি বরুণের চেয়ে দ্বিগুণ সুন্দর ; তারপর এলেন ইন্দ্র, তিনি যমের চেয়েও দ্বিগুণ সুন্দর। মেনকা এঁদের একেকজনকে দেখে ভারি খুশি হয়ে বললেন, "এ নিশ্চয় শিব!" নারদ তাতে না বললেন, তিনি অপ্রস্তুত হয়ে মাথা চুলকাতে লাগলেন।

এমনি করে সূর্য, চন্দ্র, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, বৃহস্পতি সকলকে দেখেই মেনকা বললেন, "এই শিব!" যখন শুনলেন যে এঁদের কেউ শিব নন, শিব এঁদের চেয়েও বড়, তখন তাঁর এতই আশ্চর্য বোধ হল যে, তিনি আর ভাবতেই পারলেন না, সেই শিব তবে কত সুন্দর।

এমন সময় ভূত প্রেত ব্রহ্মদৈত্যি সব নিয়ে শিব এসে উপস্থিত। এত ভূত আর মেনকা কখনো একসঙ্গে দেখেন নি ; তাদের সেই বিকট ভেঙ্চি দেখেই তাঁর মাথা ঘুরে গেল। তাদের সঙ্গে যে আবার পাঁচমুখো একটা কে ষাঁড়ে চড়ে এসেছে—মাথায় জটা, পরনে বাঘছাল, গায়ে ছাই মাখা, গলায় মড়ার মাথা—সে কথার খবর নিবার খেয়ালই তাঁর রইল না। তখন নারদ সেই দেবতাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন—"এই শিব!"

যেই এই কথা বলা, অমনি মেনকা, "ও লক্ষ্মীছাড়া পোড়ারমুখী পার্বতী! করেছিস কি!" বলে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। শিব সে কথা জানতে পেরে ছুটে এসে মেনকার মাথায় জল ঢেলে অনেক হাওয়া করতে শেষে তাঁর জ্ঞান হল।

তখন যে তিনি শিবকে আর নারদকে বকুনিটা বকলেন! নারদের অপরাধ ছিল এই যে তিনি বলেছিলেন, "শিব বড় ভালো, তাঁর সঙ্গে পার্বতীর বিয়ে হবে।" বকতে বকতে তাঁর সেই সাত মুনির কথা মনে পড়ল যাঁরা পার্বতীর বিয়ে ঠিক করতে এসেছিলেন। অমনি তিনি তাঁদের উপর যারপর-নাই চটে বললেন, "বেটারা গেল কোথায়? আজ তাদের দাড়ি ছিঁড়তে হবে!" আবার তখনই মাথায় চাপড় মেরে বললেন, "আর তাদেরই-বা দোষ কি! ঐ অভাগী মেয়েই তো যত নষ্টের গোড়া!" এই বলে তিনি পার্বতীকে কত গালই দিলেন। শেষে তিনি বললেন, "আমি কিছুতেই এই কদাকার বুড়োর কাছে মেয়ের বিয়ে দিব না। ওর না আছে টাকা, না আছে গুণ, না জানে লেখাপড়া, না পারে একটা ঘোড়া কিনে চড়তে।"

তখন সকলে মিলে মেনকাকে কত বুঝালেন, কারও কথায় কিছু হল না। পার্বতী নিজে এসে একবার তাঁকে মিনতি করে দুটো কথা বলেছিলেন, তাতে তিনি দাঁত কড়্মড়িয়ে খেপে উঠে পার্বতীকে এমনি কিল আর কনুয়ের গুঁতো মারতে লাগলেন যে, নারদ মুনি তাড়াতাড়ি এসে তাঁকে ছাড়িয়ে না নিলে সেদিন ভারি মুশকিল হত আর কি!

যা হোক শেষে বিষ্ণু এসে অনেক উপদেশ দিতে মেনকার মন একটু শান্ত হল। ঠিক সেই সময়ে নারদও শিবকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাঁর চেহারা অনেকটা শুধরিয়ে এনে মেনকার সামনে উপস্থিত করলেন। তখন মেনকা দেখলেন যে শিবের মাথায় জটা আর গায়ে ছাই বলে তাঁকে একটু উস্কোখুস্কো দেখায় বটে, কিন্তু আসলে তিনি সকল দেবতার চেয়ে সুন্দর। মেনকা যতই তাঁর মুখের দিকে তাকান, ততই তাঁর মনে হয় যে, 'আহা কি মিষ্টি! কি সরল!'

এমনিভাবে মেনকা অনেকক্ষণ অবাক হয়ে শিবের মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললেন, "আহা! আমার পার্বতীর কপাল ভালো যে এমন স্বামী পেয়েছে!" তা শুনে শিবের ভারি লজ্জা হওয়ায় তিনি জড়সড় ভাবে দেবতার কাছে চলে গেলেন।

এদিকে মেয়েদের মহলে ভয়ানক ছুটাছুটির ধুম লেগে গেছে। সবাই বলছে, "আরে, দেখ এসে, পার্বতীর কি সুন্দর বর হয়েছে।" তারা যে যেমন ছিল, তেমনি ভাবে, কেউ রান্না ফেলে, কেউ কলসী কাঁকে, কেউ চুল বাঁধতে বাঁধতে, কেউ ঘোমটা টানতে টানতে, কেউ আছাড় খেতে খেতে এসে উপস্থিত হল। শিবকে তারা চন্দন দিয়ে, খৈ দিয়ে, আরো কতরকমে পুজো যে করল তা কি বলব! তাঁকে নিয়ে হাসি তামাশা কত হল, তার তো অন্তই নাই। মেনকা অবধি এসে তাতে যোগ না দিয়ে থাকতে পারলেন না। তিনি শিবের পিছনে গিয়ে, তাঁর গলায় কাপড় জড়িয়ে টানতে আরম্ভ করেছিলেন, দেবতারা দেখে ফেলায় হাসতে হাসতে ঘরে পালিয়ে গেলেন।

তারপর শিবকে রেশমী কাপড় পরিয়ে, তাঁর গলায় সোনার ফুলের মালা, কপালে তিলক দিয়ে তাঁকে আর পার্বতীকে বিয়ের জায়গায় নিয়ে যাওয়া হল। মুনিরা বেদ পড়তে লাগলেন। ব্রহ্মা তাঁদের দিয়ে বিয়ের সকল কাজ করিয়ে নিলেন। তারপর তাঁর কথায় এসে শিব আর পার্বতীর কপালে খৈ ছড়িয়ে দিতে লাগল। আর, গন্ধর্ব আর অপ্সরারা মিলে গান বাজনা যে খুবই করল, তার তো কথাই নাই।

এমনি করে শিব আর পার্বতীর বিয়ে হয়ে গেল। হিমালয় দেবতাদের সকলকে এমনি আদর অভ্যর্থনা করলেন যে তাঁদের লাজে মাথা হেঁট করে থাকতে হল। তারা হিমালয়কে কত আশীর্বাদ যে করলেন, তার লেখাজোখা নাই। তখন মেনকা লাজে জড়সড় হয়ে তাঁদের কাছে এসে বললেন, "ঠাকুর! আপনাদের কাছে আমি ভারী পাগলামি করেছি, আমার বড় অপরাধ হয়েছে, আমাকে মাপ করতে হবে।" দেবতারা হেসে বললেন, "আপনার কোনো চিন্তা নাই ; আপনি যা করছেন তাতে আমরা আমোদই পেয়েছি। আপনার দিন দিন

সৌভাগ্য বাড়তে থাকুক।"

তখন আবার বাজনা বেজে উঠল, সকলে সেজে প্রস্তুত হল, দেবতারা মনের সুখে বর কনে নিয়ে কৈলাসে যাত্রা করলেন। হিমালয় আর মেনকা সকলকে নিয়ে এঁদের গন্ধমাদন পর্বত অবধি এগিয়ে দিয়ে, ঘরে ফিরে এসে ভাবলেন, 'হায়, সব যে অন্ধকার! কোথায় গেল আমাদের পার্বতী?"

সন্দেশ—কার্তিক ১৩২২

গরুড়ের কথা

এক

একবার মহামুনি কশ্যপ পুত্রলাভের জন্য খুব ঘটা করিয়া যজ্ঞ করিতেছিলেন। দেবতা এবং মুনিগণ সকলে মিলিয়া সেই যজ্ঞে কাজ করিতে আসেন।

যজ্ঞের সকল কাজ ইঁহাদের মধ্যে বাঁটিয়া দেওয়া হইল। যাঁহারা কাঠ আনিবার ভার পাইলেন, ইন্দ্র তাঁহাদের মধ্যে একজন। ইঁহাদের মধ্যে বাল-খিল্য নামক একদল মুনিও ছিলেন।

এই বালখিল্যদিগের মতন আশ্চর্য মুনি আর কখনো হইয়াছে কিনা সন্দেহ। দেখিতে ইঁহারা নিতান্তই ছোট-ছোট ছিলেন। কত ছোট, তাহা আমি ঠিক করিয়া বলিতে পারিব না। কেহ বলিয়াছেন যে তাঁহারা অঙ্গুষ্ঠ-পরিমাণ, অর্থাৎ বুড়ো আঙুলের মতো ছোট্ট ছিলেন। কিন্তু এ কথা যে একেবারে ঠিক নয় তাহার প্রমাণ এই একটা ঘটনাতেই পাওয়া যাইতেছেঃ

ইঁহাদের দলে কয়জন ছিলেন জানি না। কিন্তু দেখা যায় যে কশ্যপমুনির যজ্ঞের জন্য কাঠ কুড়াইতে গিয়া তাঁহারা সকলে মিলিয়া অতি কষ্টে একটি পাতার বোঁটা মাত্র বহিয়া আনিতেছিলেন। তাহাও আবার পথে একটা দুর্ঘটনা হওয়াতে, তাঁহারা যজ্ঞস্থানে পোঁছাইয়া দিতে পারেন নাই।

দুর্ঘটনাটা একটু ভারী রকমের! গোরুর পায়ের দাগ পড়িয়া, পথে ছোট-ছোট গর্ত হইয়াছিল, সেই গর্ত গুলিতে বৃষ্টির জল দাঁড়াইয়াছিল। পাতার বোঁটা লইয়া ঠেলাঠেলি করিতে করিতে, বাল্যখিল্য ঠাকুরেরা সেই বোঁটাসুদ্ধ সকলে সেই গর্তের একটার ভিতরে গড়াইয়া পড়িয়াছেন ; তারপর আর তাহার ভিতর হইতে উঠিতে পারেন না!

এই সময়ে ইন্দ্র পর্বতপ্রমাণ কাষ্ঠের বোঝা লইয়া সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মুনিদিগের দুর্দশা দেখিয়া তাঁহার বড়ই আশ্চর্য বোধ হইল আর হাসি পাইল। পিপীলিকার মতন মুনিগণকে দেখিয়া, তাঁহার একেবারে গ্রাহ্য বোধ না হওয়াতে, সেই হাসি আর তিনি থামাইতে চেষ্টা করেন নাই। ইহার উপর আবার একটু-আধটু ঠাট্টাও যে না করিয়াছিলেন, এমন নহে। শেষে আবার তাঁহাদিগকে ডিঙাইয়া চলিয়া আসেন।

মুনির সম্মান তো আর শরীরের লম্বা-চওড়া দিয়া হয় না ; তাঁহাদিগের সম্মান আর ক্ষমতা তাঁহাদের তপস্যার ভিতরে ভিতরে। বালখিল্যদের মতন তপস্বী খুব কমই ছিল। আর তাঁহাদের ক্ষমতা যে কিরূপ ছিল, তাহার পরিচয়ও তাঁহারা তখনই দিলেন।

ইন্দ্রের ব্যবহারে অত্যন্ত অপমান বোধ করিয়া, তাঁহারা উঁহারচেয়ে অনেক বড় আর-এক ইন্দ্র জন্মাইবার জন্য, যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। এ কথা জানিবামাত্রই ইন্দ্রের ভয়ের আর সীমা নাই। তিনি তাড়াতাড়ি কশ্যপের নিকট আসিয়া বলিলেন, "বাবা, এখন আপনি না বাঁচাইলে আর উপায় দেখিতেছি না।"

ইন্দ্র কশ্যপের পুত্র। বারোজন আদিত্যের মধ্যে যাঁহার নাম শত্রু, তিনিই ইন্দ্র। সুতরাং পুত্রের জন্য তাঁহার দয়া না হইবে কেন? কশ্যপ ইন্দ্রের সকল কথা শুনিয়া, বালখিল্যদিগের নিকট গিয়া বলিলেন, "মুনিগণ, আপনাদের তপস্যা বৃদ্ধি হউক। আমি একটি কাজ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, আশীর্বাদ করুন যেন আমার কাজটি হয়।"

সত্যবাদী বালখিল্যগণ তখনই বলিলেন, "আপনার কার্যসিদ্ধি হইবে।"

তাহা শুনিয়া কশ্যপ তাঁহাদিগকে মিষ্ট কথায় বুঝাইয়া বলিলেন, "দেখুন, ব্রহ্মা আমার এই পুত্রটিকে ইন্দ্র করিয়া দিয়াছেন। এখন আপনারা যদি ইঁহাকে যজ্ঞ করিয়া তাড়াইয়া দেন, তাহা হইলে তো ব্রহ্মার কথা মিথ্যা হইয়া যায়! আপনাদের যজ্ঞ বৃথা হয়, ইহা কখনই আমার ইচ্ছা নহে। আপনারা যে একটি ইন্দ্র করিতে চাহিয়াছেন, তাহা হইবেই। তবে আমি এই চাহি যে সেই ইন্দ্র আমাদিগের ইন্দ্র না হইয়া, পাখির ইন্দ্র হউক। দেখুন, ইন্দ্র মিনতি করিতেছেন। আপনারা তাঁহার উপর সন্তুষ্ট হউন।"

ধার্মিকের রাগ বেশিক্ষণ থাকে না। সুতরাং কশ্যপের কথায় বালখিল্যগণ তখনই আহ্লাদের সহিত ইন্দ্রকে ক্ষমা করিলেন। তারপর তাঁহারা কশ্যপকে বিনয় করিয়া বলিলেন, "আমরা দুইটি জিনিসের জন্য যজ্ঞ এই আরম্ভ করিয়াছিলাম, নূতন একটি ইন্দ্র, আপনার একটি পুত্র। এ অবস্থায় আপনার যাহা ভালো বোধ হয়, তাহা করুন।"

সুতরাং স্থির হইল যে এই নূতন ইন্দ্রটি যেমন পাখির ইন্দ্র হইবে, তেমনি কশ্যপের পুত্রও হইবে। সেই পুত্রই গরুড়, সে পক্ষিগণের ইন্দ্র।

গরুড়ের শরীর অতিশয় প্রকাণ্ড ছিল আর তাহা সে ইচ্ছা মতো ছোট-বড় করিতে পারিত। আগুনের মতো লাল আর উজ্জ্বল তাহার গায়ের রঙ ছিল। সে বিদ্যুতের মতন বেগে ছুটিতে পারিত আর যখন যেমন ইচ্ছা রূপ ধরিতে পারিত। জন্মমাত্রই সে আকাশে উড়িয়া, আনন্দে চীৎকার করিতে লাগিল।

এদিকে দেবতারা গরুড়কে দেখিয়া মনে করিলেন উহা বুঝি আগুন। তাই তাঁহারা ব্যস্তভাবে অগ্নির নিকটে গিয়া বলিলেন, "আজ কেন তোমার এত তেজ দেখিতেছি? তুমি কি আমাদিগকে পোড়াইয়া মারিবার ইচ্ছা করিয়াছ?"

এ কথা শুনিয়া অগ্নি বলিলেন, "আপনারা ব্যস্ত হইবেন না। উহা

আগুন নহে, কশ্যপের পুত্র গরুড়। ইনি দেবতাদিগের উপকারী বন্ধু, সুতরাং আপনাদের কোনো ভয় নাই।"

তখন তাঁহারা সকলে গরুড়ের নিকটে গিয়া, তাঁহার নানারূপ প্রশংসা করিতে লাগিলেন, "বাপু, তোমাকে দেখিয়া আমরা বড়ই ভয় পাইয়াছি আর তোমার তেজে অস্থির হইয়াছি। সুতরাং তুমি দয়া করিয়া, তোমার শরীরটাকে একটু ছোট কর আর তেজ একটু কমাও।"

তাহাতে গরুড় বলিল, "এই যে মহাশয়, আমি এখন ছোট হইয়া গিয়াছি। আপনাদের আর ভয় পাইতে হইবে না।" এই বলিয়া সে তাহার মাতা বিনতার নিকট চলিয়া গেল।

বিনতার দিন যে তখন কি দুঃখে কাটিতেছিল, তাহা না বলিলে কেহ বুঝিতে পারিবে না! বাসন মাজা, জল টানা প্রভৃতি দাসীর যে কাজ, তাহা তো তাঁহাকে করিতেই হইত। ইহার উপর আবার কদ্রু যখন তখন বলিয়া বসিতেন, "আমি অমুক জায়গায় যাইব, আমাকে পিঠে করিয়া লইয়া চল।"

একদিন বিনতা গরুড়ের নিকট বসিয়া আছেন, এমন সময় কদ্রু তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ বিনতা, সমুদ্রের মধ্যে একটা অতি সুন্দর দ্বীপ আছে, সেখানে অনেক নাগ বাস করে। আমাকে সেইখানে লইয়া যাইতে হইবে।"

তখনই কদ্রু বিনতার পিঠে উঠিয়া বসিলেন আর কতগুলি সাপ, কদ্রুর পুত্র, গরুড়ের পিঠে গিয়া চড়িল। তাহাদিগকে লইয়া দুইজনকে সেই দ্বীপে যাইতে হইল। দ্বীপে গিয়া সাপেরা কিছুকাল আমোদ-আহ্লাদ করিয়াই গরুড়কে বলিল, "তুমি আকাশে উড়িতে পার, তোমার তো না-জানি ইহার চেয়ে কতই ভালো-ভালো জায়গার কথা জানা আছে। সেই-সকল জায়গায় আমাদিগকে লইয়া চল।"

ইহাতে গরুড় নিতান্ত দুঃখিত হইয়া, তাহার মাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মা, সাপেরা কেন আমাকে এমন করিয়া আজ্ঞা দিবে আর আমাকেই-বা কেন তাহা মানিতে হইবে, তাহা বল।"

বিনতা বলিলেন, "বাছা, পণে আমি হারিয়া উহাদের দাসী হইয়াছি, তাই উহারা আমাদিগকে এমন করিয়া খাটাইয়া লয়।"

ইহাতে যে গরুড়ের মনে খুব কষ্ট হইল, তাহা বুঝিতেই পার। সে তখনই সাপদের নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল।

"হে সর্পগণ, কি হইলে তোমরা আমাদিগকে ছাড়িয়া দিতে পার?"

সর্পেরা বলিল, "যদি তুমি অমৃত আনিয়া দিতে পার, তাহা হইলে তোমাদিগকে ছাড়িয়া দিতে পারি।"

এ কথায় গরুড় তাহার মাকে বলিল, "মা, আমি অমৃত আনিতে চলিলাম; পথে কি খাইব বলিয়া দাও।"

বিনতা বলিলেন, "বাছা, সমুদ্রের মধ্যে হাজার হাজার নিষাদ (শিকারী, ব্যাধ) বাস করে, তুমি তাহাদিগকে খাইও। কিন্তু সাবধান! কখনো যেন

ব্রাহ্মণ খাইও না।"

গরুড় বলিল, "মা, ব্রাহ্মণ কিরকম থাকে? আর সে কি করে? সে কি বড়ই ভয়ানক?"

বিনতা বলিলেন, "যাঁহাকে খাইলে তোমার পেটের ভিতরে ছুঁচের মতো ফুটিবে, গলায় আগুনের মতো জ্বালা হইবে, তিনিই জানিবে ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের বড় অদ্ভুত ক্ষমতা, নিতান্ত বিপদে পড়িলেও তাঁহাকে মুখে দিও না। যাও, বাছা, তোমার মঙ্গল হউক।"

এইরূপে মায়ের নিকট বিদায় লইয়া গরুড় অমৃত আনিতে যাত্রা করিল। খানিক দূর গিয়াই সে দেখিল যে তাহার ভারি ক্ষুধা পাইয়াছে, কিছু আহার না করিলে আর চলে না। তখন সে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, নিকটেই একটা নিষাদের গ্রাম দেখা যাইতেছে। তাহা দেখিবামাত্র, সে সেই গ্রামের পথে তাহার সেই বিশাল মুখখানা মেলিয়া রাগিয়া, দুই পাখায় বাতাস করিতে লাগিল। কী ভীষণ বাতাসই সে করিয়াছিল! বাতাসে ঝড় বহিয়া, ঘূর্ণিবায়ু ছুটিয়া, ধুলা উড়িয়া, গ্রামখানিসুদ্ধ একেবারে তাহার মুখের ভিতরে আসিয়া উপস্থিত, এখন মুখ বন্ধ করিয়া, তাহা গিলিলেই হয়।

নিষাদের গ্রাম খাইয়া গরুড়ের পেট একটুও ভরিল না। লাভের মধ্যে গলা জ্বলিয়া বেচারার কষ্টের একশেষ হইল। সে এমনিই ভয়ানক জ্বালা যে আর একটু হইলেই হয়তো গলা পুড়িয়া যাইত। গরুড় ভাবিল, 'কি আশ্চর্য! এক গাল জলখাবার খাইলাম, তাহাতে কেন এত জ্বালা! তবে বা কোনখান দিয়া একটা ব্রাহ্মণ আমার পেটের ভিতর ঢুকিয়া গেল! মা তো ব্রাহ্মণ খাইলেই এমনি জ্বালা হওয়ার কথা বলিয়াছিলেন।'

এই ভাবিয়া সে বলিল, "ঠাকুরমহাশয়! আপনি শীঘ্র বাহিরে আসুন, আমি হাঁ করিতেছি।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আমার স্ত্রীও যে আছে! আমি কেমন করিয়া একলা বাহির হইব?"

গরুড় বলিল, "শীঘ্র আপনার স্ত্রীকে লইয়া বাহিরে আসুন। বিলম্ব হইলে হজম হইয়া যাইবেন।"

ব্রাহ্মণকে তাড়া দিবার কোনো প্রয়োজন ছিল না ; তিনি খুবই শীঘ্র শীঘ্র তাঁহার স্ত্রীকে লইয়া ছুটিয়া বাহির হইলেন। গরুড়ের গলাও তৎক্ষণাৎ ঠান্ডা হইল। তখন ঠিক এক সঙ্গে ব্রাহ্মণও বলিলেন, "কি বিপদ!" গরুড়ও বলিল, কি বিপদ!"

দুই

তারপর ব্রাহ্মণ গরুড়কে ধন্যবাদ দিয়া সেখান হইতে যাত্রা করিল। সে সময়ে তাহার পিতা কশ্যপ সেই পথে যাইতেছিলেন। সুতরাং খানিকদূর গিয়াই দুইজনে দেখা হইল। কশ্যপ গরুড়কে দেখিতে পাইয়া বলিলেন,

"কেমন আছ, বৎস ; তোমার যথেষ্ট আহার জোটে তো?"

গরুড় তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিল, "ভগবন্, আমি ভালোই আছি, কিন্তু আহার তো আমার ভালো করিয়া জোটে না। মাকে সর্পদিগের হাত হইতে ছাড়াইবার জন্য আমি অমৃত আনিতে চলিয়াছি। মা বলিয়াছিলেন পথে নিষাদ খাইতে। নিষাদ অনেকগুলি খাইলাম, কিন্তু তাহাতে আমার কিছুই হইল না। ভগবন্, দয়া করিয়া আমাকে কিছু খাবার কথা বলিয়া দিন। ক্ষুধায় আমার পেট জ্বলিয়া যাইতেছে, পিপাসায় তালু শুকাইয়া গিয়াছে।"

এ কথা শুনিয়া কশ্যপ বলিলেন, "বৎস, ঐ যে একটা প্রকাণ্ড সরোবর দেখা যাইতেছে, ওখানে গেলে পর্বতপ্রমাণ একটা কচ্ছপ, আর তাহার চেয়েও বড় একটা হস্তী দেখিতে পাইবে। পূর্বজন্মে ইহারা বিভাবসু আর সুপ্রতীক নামে দুই ভাই ছিল। ইহাদের পিতা কিছু টাকাকড়ি রাখিয়া যান। ছোট ভাই সুপ্রতীক সেই টাকা তাহাকে ভাগ করিয়া দিবার জন্য বড় ভাই বিভাবসুকে বড়ই পীড়াপীড়ি করিত।

"বিভাবসু রাগী লোক ছিল, তাই সে সুপ্রতীকের পীড়াপীড়িতে অত্যন্ত চটিয়া গিয়া তাহাকে শাপ দিল, 'তুই মরিয়া হাতি হইবি।' ইহাতে সুপ্রতীক বলিল, 'তুমি মরিয়া কচ্ছপ হইবে।'

"এখন সেই দুই ভাই বিশাল হাতি আর প্রকাণ্ড কচ্ছপ হইয়াছে। ঐ শুন, হাতিটা সরোবরের কাছে আসিয়া কি ভয়ংকর গর্জন আরম্ভ করিয়াছে আর তাহা শুনিয়া কচ্ছপটা সরোবরের জল তোলপাড় করিয়া কেমন রাগের সহিত উঠিয়া আসিতেছে দেখ। ঐ দেখ, উহাদের কি বিষম যুদ্ধ বাধিয়া গেল! হাতিটা ছয় যোজন উঁচু আর বারো যোজন লম্বা। কচ্ছপটা তিন যোজন উঁচু আর তাহার বেড় দশ যোজন। এ দুইটাকে খাইতে পারিলে, তোমার পেটও ভরিবে, গায়েও খুব জোর হইবে।"

এই বলিয়া, গরুড়কে আশীর্বাদপূর্বক কশ্যপ চলিয়া গেলেন। তারপর গরুড় এক নখে হাতি আর-এক নখে কচ্ছপটাকে লইয়া আবার আকাশে উড়িল। তখন তাহার চিন্তা হইল, 'কোথায় বসিয়া এ দুইটাকে ভক্ষণ করা যায়?'

গাছের নিকটে গেলে, তাহা তাহার পাখার বাতাসেই ভাঙিয়া পড়িতে চাহে। অনেকক্ষণ পর্যন্ত এমন একটা গাছ খুঁজিয়া পাওয়া গেল না, যাহার উপর গিয়া বসিতে ভরসা হয়।

তারপর অনেক দূরে, অতিশয় প্রকাণ্ড কতকগুলি গাছ দেখা গেল। তাহাদের মধ্যে একটা বটগাছ ছিল ; তাহা এতই প্রকাণ্ড যে তাহার একটা ডাল একশত যোজন লম্বা। গাছটি যেমন বড়, তেমনই ভদ্র। সে গরুড়কে ডাকিয়া বলিল, "গরুড়, আমার এই ডালে বসিয়া তুমি গজ-কচ্ছপ আহার কর।"

গাছের কথায় গরুড় তাহার ডালে বসিবামাত্র, ঘোরতর মট্‌মট্ শব্দে ডাল ভাঙিয়া পড়িল। যাহা হউক, গরুড় ডালটিকে মাটিতে পড়িতে দিল না।

সে দেখিল যে পিঁপড়ের ন্যায় ছোট-ছোট অনেকগুলি মুনি মাথা নিচু করিয়া বাদুড়ের মতো সেই ডালে ঝুলিতেছেন। ইঁহারা সেই বালখিল্য মুনি ; ইঁহারা ঐভাবে তপস্যা করিতেন।

ইঁহাদিগকে দেখিয়া গরুড়ের বড়ই ভয় আর চিন্তা হইল, কেননা ডাল মাটিতে পড়িলে আর ইঁহাদের কেহ বাঁচিয়া থাকিতেন না। সুতরাং সে দুই পায়ে হাতি আর কচ্ছপ আর ডালটিকে ঠোঁটে লইয়া, আবার আকাশে উড়িল। এইরূপ বিশাল বোঝা লইয়া বেচারা ক্রমাগত উড়িতেছে, কোথাও বসিবার জায়গা পায় না, এমন সময় সে দেখিল যে গন্ধমাদন পর্বতে বসিয়া কশ্যপ তপস্যা করিতেছেন।

কশ্যপ তাহার অবস্থা দেখিয়া বলিলেন, "বৎস, করিয়াছ কি ; ঐ ডালে বালখিল্যগণ রহিয়াছেন, উঁহারা যে তোমাকে এখনি শাপ দিয়া ভস্ম করিবেন।"

তারপর তিনি বালখিল্যদিগকে বলিলেন, "আপনারা অনুগ্রহ করিয়া গরুড়কে অনুমতি দিন। সে এই হাতিটাকে আর কচ্ছপটাকে খাইলে, লোকের উপকার হইবে।"

এ কথায় বালখিল্যগণ গরুড়ের উপর সন্তুষ্ট হইয়া, সেই ডাল ছাড়িয়া, হিমালয়ে চলিয়া গেলেন।

তারপর গরুড় কশ্যপকে বলিল, "ভগবন্ এখন এই ডাল কোথায় ফেলি?"

ইহাতে কশ্যপ একটা পর্বতের কথা বলিয়া দিলেন। সে পর্বতে জীব-জন্তু কিছুই নাই, উহার আগাগোড়া কেবল বরফে ঢাকা। সেই পর্বতে ডাল ফেলিয়া, গরুড় গজ-কচ্ছপ ভক্ষণ করিল।

তারপর যখন গরুড় আবার নূতন বলের সহিত অমৃত আনিতে যাত্রা করিল, তখন তাহাকে দেখিয়া দেবগণ বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। ইন্দ্র বৃহস্পতিকে বলিলেন, "ওটা কি আসিতেছে?"

বৃহস্পতি বলিলেন, "কশ্যপের পুত্র গরুড় অমৃত লইতে আসিতেছে আর তাহা লইয়াও যাইবে।"

বৃহস্পতির কথায় তখনই এই বলিয়া অমৃতের প্রহরীদিগের তাড়া পড়িল, "ভয়ংকর একটা পক্ষী অমৃত লইতে আসিতেছে। সাবধান! সে যেন তাহা চুরি করিতে না পারে।"

কেবল প্রহরীদিগকে সতর্ক করিয়াই দেবতাগণ সন্তুষ্ট রহিলেন না। তাঁহারা নিজেরাও অস্ত্রশস্ত্র লইয়া, অমৃত রক্ষার জন্য প্রস্তুত হইলেন। ইন্দ্র বজ্র হাতে এবং অন্যান্য দেবতারা অসি, চক্র, ত্রিশূল, শক্তি, পরিঘ প্রভৃতি ভয়ংকর অস্ত্র লইয়া, অমৃতের চারিদিকে দাঁড়াইলে, বাস্তবিকই তাঁহাদিগকে অতি ঘোরতর দেখা যাইতে লাগিল।

কিন্তু গরুড় যে কতখানি ভয়ানক, দূর হইতে দেবতারা ভালো করিয়া বুঝিতে পারেন নাই। সুতরাং সে কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলে, তাঁহারা মাথা ঠিক রাখিতে না পারিয়া, নিজেরাই কাটাকাটি করিতে লাগিলেন। এদিকে

গরুড়, বিশ্বকর্মা বেচারাকে সামনে পাইয়া, চক্ষের পলকে তাঁহার দুর্দশার একশেষ করিয়া দিল। বেচারা কারিগর লোক, যুদ্ধ করিবার অভ্যাস নাই, তথাপি তিনি কিছুকাল ভয়ানক যুদ্ধ করিয়াছিলেন ; কিন্তু শেষে অজ্ঞান হইয়া গেলেন।

অপর দিকে গরুড়ের পাখার বাতাসে ধুলা উড়িয়া, অন্যান্য দেবতাদিগেরও অজ্ঞান হইতে আর বেশি বাকি নাই। অমৃতের প্রহরীদিগের চক্ষুও ধুলার অন্ধ হইয়া যাইবার গতিক হইয়াছে।

এমন সময় পবন আসিয়া ধুলা উড়াইয়া দিলে, দেবতারা সাহস পাইয়া, গরুড়কে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের অস্ত্রের ঘায়ে গরুড় কিছুমাত্র কাতর না হইয়া, পাখার ঝাপটে তাঁহাদিগকে উড়াইয়া ফেলিতে লাগিল। ইহাতে তাঁহাদের নানারকম দুর্গতি হওয়ায় তাঁহারা অমৃতের মায়া ছাড়িয়া দিয়া, উৎসাহের সহিত পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। গন্ধর্ব ও সাধ্যগণ পলাইলেন পূর্বদিকে, রুদ্র ও বসুগণ দক্ষিণদিকে, আদিত্যগণ পশ্চিমদিকে আর অশ্বিনীকুমার দুই ভাই উত্তরদিকে।

তারপর নয়জন যক্ষ আসিয়া দেখিল যে উহা ভয়ংকর আগুন দিয়া ঘেরা ; সেই আগুনের শিখায় আকাশ ছাইয়া গিয়াছে।

গরুড় যেমন ইচ্ছা তেমনই চেহারা করিতে পারিত। সুতরাং সেই আগুন নিবাইবার জন্য সে তাহার একটা মাথার জায়গায় আটহাজার একশোটা মাথা করিয়া ফেলিল। সেই আটহাজার একশত মুখে জল আনিয়া আগুনের উপর ঢালিলে, আর তাহা নিবিতে অধিক বিলম্ব হইল না।

আগুন নিবিলে দেখা গেল যে একখানি ক্ষুরের মতো ধারালো লোহার চাকা বনবন করিয়া অমৃতের উপর ঘুরিতেছে। অমৃতের নিকট চোর আসিলেই সেই চাকায় তাহার গলা কাটিয়া যায়।

সৌভাগ্যের বিষয়, সেই চাকার মাঝখানে একটি ছিদ্র ছিল। গরুড় সেই ছিদ্র দেখিবামাত্র মৌমাছির মতো ছোট হইয়া, তার ভিতর দিয়া ঢুকিয়া পড়িল। ঢুকিয়া তাহার বিপদ বাড়িল কি কমিল, তাহা বলা ভারি শক্ত।

সেই চাকার নীচেই এমন ভয়ংকর দুইটা সাপ ছিল যে তাহাদের মুখ দিয়া আগুন আর চোখ দিয়া ক্রমাগত বিষ বাহির হইতেছিল। তাহারা একটিবার কাহারও পানে তাকাইলেই, সে ভস্ম হইয়া যাইত। কিন্তু গরুড় তাহাদিগকে তাকাইবার অবসর দিলে তো! সে তাহার পূর্বেই ধুলা দিয়া তাহাদের অন্ধ করিয়া দিয়াছিল। ধুলার কাছে সাপেরা নাকি বড়ই জব্দ থাকে। বাছাদের চক্ষে পলক পড়ে না, কাজেই ধুলা ছুঁড়িয়া মারিলেই সর্বনাশ হয়।

গরুড় যেই দেখিল যে সাপগুলি তাহাদের চোখ লইয়া বিপদে পড়িয়াছে, অমনি সে তাহাদিগকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। তখন আর তাহার অমৃত লইয়া যাইতে কোনো বাধা রহিল না।

গরুড় অমৃত লইয়া আকাশে ছুটিয়া চলিয়াছে, এমন সময় নারায়ণের সহিত তাহার দেখা হইল। নারায়ণ তাহার বীরত্ব দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট

হইয়াছিলেন, সুতরাং তিনি তাহাকে বলিলেন, "তুমি আমার নিকট বর লও, আমি তোমাকে বর দিব।"

এ কথায় গরুড় বলিল, "আমি অমর হইতে আর তোমার উঁচুতে থাকিতে চাহি ; আমাকে সেই বর দাও।"

নারায়ণ বলিলেন, "অচ্ছা, তাহাই হইবে।"

তারপর গরুড় নারায়ণকে বলিল, "তোমাকেও আমার বড় ভালো লাগিয়াছে, তাই আমিও তোমাকে বর দিব। তুমি কি বর চাহ?"

নারায়ণ বলিলেন, "তুমি আমার বাহন হইলে তো সুবিধা হইত। কিন্তু তোমাকে যে বর দিয়াছি, তাহাতে তো আর তোমার উপরে চড়িবার উপায় থাকে নাই ; কাজেই তুমি আমার রথের চূড়ায় বসিয়া থাকিবে, আর জিজ্ঞাসা করিলে বলিবে যে তুমি আমার বাহন।"

গরুড় বলিল, "তথাস্তু।"

এই বলিয়া সে সবেমাত্র অমৃত লইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, এমন সময় ইন্দ্র তাহাকে বধ করিবার জন্য বজ্র ছুঁড়িয়া মারিলেন। কিন্তু তাহাতে তাহার কিছুই হইল না। তখন সে মনে মনে ভাবিল, 'এত বড় একটা অস্ত্র, এত বড় মুনির হাড় দিয়া তাহা প্রস্তুত হইয়াছে আর জগতে তাহার এত বড় নাম। এমন একটা অস্ত্র বৃথা হইলে তো বড় লজ্জার কথা হয়। সুতরাং ইহার জন্য আমার কিছু ক্ষতি হওয়া উচিত হইতেছে।'

এই ভাবিয়া সে তাহার শরীর হইতে একখানি পালক ফেলিয়া দিয়া, ইন্দ্রকে বলিল, "এই নিন ; আমি আপনার অস্ত্রের মান রাখিয়া গেলাম।"

ইন্দ্র তো তাহা দেখিয়া একেবারে অবাক! তিনি তখন গরুড়ের সহিত বন্ধুতা করিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন, তাহা দেখিয়া গরুড়ও তাঁহার উপর খুব সন্তুষ্ট হইল।

তখন ইন্দ্র বলিলেন, "ভাই, অমৃত যাহারা খাইবে, তাহারাই অমর হইয়া আমাদের উপর অত্যাচার করিবে। তোমার যদি উহাতে প্রয়োজন না থাকে, তবে উহা আমাকে দিয়া যাও।"

গরুড় বলিল, "আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে, সুতরাং ইহা আমি কিছুতেই দিতে পারিতেছি না। কিন্তু আমি যেখানে ইহা রাখিব, সেখান হইতে তখনই আপনি ইহা লইয়া আসিতে পারিবেন।"

ইহাতে ইন্দ্র যারপরনাই সন্তুষ্ট হইয়া, গরুড়কে বর দিতে চাহিলে সে বলিল, "সর্পগণ আমার মাতাকে বড়ই কষ্ট দিয়াছে, সুতরাং আমাকে এই বর দিন যে সাপেরা আমার খাদ্য হইবে, তাহাদের বিষে আমার কিছুই হইবে না।"

ইন্দ্র বলিলেন, "আচ্ছা, তাহাই হইবে। এখন তুমি অমৃত লইয়া যাও, তুমি উহা রাখিয়া দিবামাত্র, আমি তাহা লইয়া আসিব।"

এই বলিয়া ইন্দ্র গরুড়কে বিদায় দিলে, সে অমৃতসহ তৎক্ষণাৎ সর্পগণের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "এই দেখ আমি অমৃত আনিয়াছি। এই আমি

উহা কুশের (সেই যাহাতে কুশাসন হয়) উপরে রাখিয়া দিলাম, তোমরা স্নান-আহ্নিক সারিয়া আসিয়া উহা আহার কর।"

তারপর সে বলিল, "তোমরা যাহা বলিয়াছিলে, আমি তাহা করিয়াছি। সুতরাং এখন আর আমার মা তোমাদের দাসী থাকিলেন না।"

নাগগণ ইহাতে সম্মত হইয়া স্নান করিতে গেল আর সেই অবসরে ইন্দ্রও আসিয়া, কুশের উপর হইতে অমৃত লইয়া পলায়ন করিলেন।

সর্পগণ সেদিন খুবই আনন্দের সহিত আর হয়তো খুব তাড়াতাড়ি স্নান আর পূজা শেষ করিয়াছিল। কিন্তু হায়, ফিরিয়া আসিয়া তাহারা দেখিল অমৃত নাই। খালি কুশ পড়িয়া রহিয়াছে! তখন তাহারা ভাবিল, "আর দুঃখ করিয়া কি হইবে? আমরা যেমন ছল করিয়া বিনতাকে দাসী করিয়াছিলাম তেমনি ছল করিয়া আমাদের নিকট হইতে অমৃত লইয়া গিয়াছে।"

তারপর, "আহা, এই কুশের উপর অমৃত রাখিয়াছিল গো!" বলিয়া তাহারা সেই কুশ চাটিতে লাগিল। চাটিতে চাটিতে কুশের ধারে তাহাদের জিব চিরিয়া দুই ভাগ হইয়া গেল! তাই অদ্যও সাপের জিব চেরা দেখিতে পাওয়া যায়।

এইরূপে মাতাকে সর্পগণের হাত হইতে উদ্ধার করিয়া, গরুড় মনের আনন্দে সাপ ধরিয়া খাইতে আরম্ভ করিল। তখন আর তাহার পেট ভরিবার জন্য কোনো চিন্তা রহিল না। পৃথিবীর লোকেরও বোধ হয় তাহাতে সাপের ভয় অনেকটা কমিয়া থাকিবে।

রাবণ

রাবণের কথা তোমরা সকলেই জান। রাবণের পিতার নাম বিশ্রবা, মায়ের নাম কৈকসী। বিশ্রবা পরম ধার্মিক মুনি ছিলেন। রাবণ আর তাহার ভাইবোনেরা জন্মিবার পূর্বেই তিনি বলিয়াছিলেন যে, ইহাদের সকলের ছোটটি খুব ধার্মিক হইবে, আর সকলেই ভয়ংকর দুষ্ট রাক্ষস হইবে।

মুনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই হইল। রাবণ, কুম্ভকর্ণ আর তাহাদের বোন সূর্পনখা, ইহাদের এক একটা এমনি বিকট আর দুষ্ট রাক্ষস হইল, যে কি বলিব। ইহাদের ছোট ভাই বিভীষণও রাক্ষস ছিল বটে কিন্তু সে যারপর-নাই ভালো লোক ছিল।

রাবণের দশটা মাথা আর কুড়িটা হাত ছিল। দাঁতগুলো ছিল থামের মতো বড়-বড়। চুলগুলি আগুনের শিখার মতো লাল, আর শরীরটা কালো পর্বতের মতো বিশাল। তাহার জন্মের সময় পৃথিবী কাঁপিয়াছিল, সূর্য ময়লা হইয়া গিয়াছিল আর সমুদ্রের জল তোলপাড় হইয়া উঠিয়াছিল। দশটা মাথা দেখিয়া তাহার পিতা তাহার নাম রাখিয়াছিলেন 'দশগ্রীব'। উহাই উহার আসল নাম, রাবণ নাম পরে হইয়াছিল।

ছেলেবেলায় রাবণ ভাইদিগকে লইয়া দশহাজার বৎসর ভয়ংকর তপস্যা

করিয়াছিল। এই দশহাজার বৎসর সে আহার করে নাই। এক-একহাজার বৎসর যাইত আর নিজের এক-একটি মাথা কাটিয়া সে আগুনে আহুতি দিত। নয়হাজার বৎসরে নয়টি মাথা সে এইরূপ করিয়া আগুনে দিল। তারপর দশ-হাজার বৎসর পূর্ণ হইলে, যেই সে তাহার বাকি একটি মাথাও কাটিতে যাইবে, অমনি ব্রহ্মা আসিয়া বলিলেন, "দশগ্রীব, আমি খুশি হইয়াছি, এখন তুমি বর লও।"

দশগ্রীব বলিল, "আমাকে অমর করিয়া দিন।" ব্রহ্মা বলিলেন, "সেটি হইবে না, অন্য বর লও।" দশগ্রীব বলিল, "তবে এই বর দিন যে দানব, দৈত্য, যক্ষ, রক্ষ, নাগ, পক্ষী ইহাদের কেহই আমাকে মারিতে পারিবে না।" ব্রহ্মা বলিলেন, "আচ্ছা তাহাই হইবে। তাহা ছাড়া তোমার যে মাথাগুলি কাটিয়া দিয়াছ তাহাও ফিরিয়া পাইবে, ইহার ওপর আবার যখন যেরূপ তোমার ইচ্ছা হয়, তেমনি চেহারা করিতে পারিবে।"

কুম্ভকর্ণ আর বিভীষণও এই দশহাজার বৎসর খুব তপস্যা করিয়াছিল, সুতরাং ব্রহ্মা তাহাদিগকেও বর দিতে গেলেন। বিভীষণ বলিল, "আমাকে দয়া করে এই বর দিন, যেন আমার ধর্মে মতি থাকে।" এ কথায় ব্রহ্মা অতিশয় তুষ্ট হইয়া তাহাকে সে বর তো দিলেনই, তাহা ছাড়া তাহাকে অমর করিয়া দিলেন।

কুম্ভকর্ণকে বর দিবার সময় দেবতারা ব্রহ্মাকে বলিলেন, "প্রভু এমন কাজ করিবেন না, এ বেটা বর পাইলে আমাদের সকলকে খাইয়া ফেলিবে। এর মধ্যেই কতজনকে ধরিয়া খাইয়াছে।"

তাইতো, এখন তবে কি করা যায়? তপস্যা করিয়াছে কাজেই বর দিতেই হইবে, আবার বর দিলেও বিপদের কথা, তখন ব্রহ্মা বুদ্ধি করিয়া সরস্বতীকে কুম্ভকর্ণের মুখের ভিতরে ঢুকাইয়া দিলেন। সরস্বতী ঢুকিতেই তাহার মাথায় কি যে গোল লাগিয়া গেল, আর বেচারা ঠিক করিয়া কথা কহিতে পারিল না। ব্রহ্মা বলিলেন, "কুম্ভকর্ণ, কি চাহ?" কুম্ভকর্ণ বলিল, "আমি খালি ঘুমাইতে চাই। ছয়মাস ঘুমাইয়া একদিন উঠিয়া খাইব।" ব্রহ্মা বলিলেন, "বেশ কথা, তাই হোক।" এই বলিয়া ব্রহ্মা দেবতাদিগকে লইয়া চলিয়া গেলেন, আর কুম্ভকর্ণ মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে ভাবিল, 'তাইতো। এটা কি করিলাম? দেবতা বেটারা আমাকে ফাঁকি দিয়া গেল নাকি?'

যা'হোক, আমরা দশগ্রীবের কথা বলিতেছি। সে তো বর পাইয়া নিতান্তই ভয়ংকর হইয়া উঠিল ; এখন আর কেহ তাহার কোনো কথায় 'না' বলিতে ভরসা পায় না। দশগ্রীবের এক দাদা ছিলেন, তাঁহার নাম কুবের। তিনিও বিশ্রবা মুনির পুত্র, তাঁহার মাতা, ভরদ্বাজ মুনির কন্যা দেববর্ণিনী। কুবের লঙ্কায় বাস করিতেন। দশগ্রীব তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইল, "দাদা লঙ্কাপুরী-খানি আমাকে ছাড়িয়া দাও।"

কাজেই তখন কুবের আর কি করেন? ভালোয় ভালোয় না দিলে জোর করিয়া কাড়িয়া নিবে। তাহার চেয়ে তিনি কৈলাস পর্বতে বাস করিতে

লাগিলেন। দশগ্রীবও তখন পরম আনন্দে রাক্ষসের দলসমেত লঙ্কায় আসিয়া রাজা হইয়া বসিল।

ইহার কিছুদিন পরেই দশগ্রীব বিদ্যুজ্জিহ্ব নামক দানবের সহিত সূর্পনখার বিবাহ দিল। তাহাদের তিন ভাইয়ের বিবাহ হইতেও আর বেশি বিলম্ব হইল না। কিন্তু হায়, শুভকার্য শেষ হইতে না হইতেই ব্রহ্মার আজ্ঞায় ঘোর নিদ্রা আসিয়া কুম্ভকর্ণকে ধরিয়া বসিল। তাহার চোখ বুজিয়া আসিল, মাথা ঢুলিয়া পড়িল, সে বিকট মুখে ভীষণ হাই তুলিয়া বলিল, "দাদা, বড়ই ঘুম পাইয়াছে আমার শয়নের জন্য ঘর করিয়া দাও।" তখনই রাবণের হুকুমে চমৎকার ঘর প্রস্তুত হইল। তাহার ভিতরে গিয়া সেই যে কুম্ভকর্ণ শুইল, হাজার হাজার বৎসরেও আর উঠিল না।

এদিকে দশগ্রীবের জ্বালায় ত্রিভুবন অস্থির! সে দেবতা গন্ধর্ব, মুনি-ঋষি কাহাকেও মানে না, এক ধার হইতে সকলকে মারিয়া তাহাদের বাড়ি, ঘর, বাগান সব চুরমার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কুবের তাহাতে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া তাহাকে বারণ করিবার জন্য দূত পাঠাইলেন। সে দূতের কথা দশগ্রীব তো শুনিলই না ; লাভের মধ্যে বেচারাকে কাটিয়া রাক্ষসদিগকে খাইতে দিল। তারপর রথে চড়িয়া এই বলিয়া সে বাহির হইল, "আমি ত্রিভুবন জয় করিব।"

বাহির হইয়াই সে সকলের আগে গিয়া কুবেরের নিকট উপস্থিত হইল, তাহার উপরেই রাগটা বেশি। কুবেরের যক্ষ অনেক যুদ্ধ করিয়াও তাহার কিছুই করিতে পারিল না। দশগ্রীবের সঙ্গে ভীষণ রাক্ষসেরা গিয়াছিল ; তাহারা যক্ষদের এমনি দুর্গতি করিল যে তাহা আর বলিবার নহে। যক্ষেরা সোজাসুজি সরলভাবে যুদ্ধ করে, আর রাক্ষসেরা নানারকম ফাঁকি দেয় ; কাজেই যক্ষেরা হারিয়া গেল। কুবের নিজে আসিয়াও বিশেষ কিছুই করিতে পারিলেন না। দশগ্রীব তাঁহাকে অস্ত্রের আঘাতে অজ্ঞান করিয়া, তাঁহার 'পুষ্পক' নামক রথখানি লইয়া চলিয়া গেল। সে রথ বড়ই আশ্চর্য ছিল। তাহাতে সঙ্গে দানা, পানি, সইস, কোচমান কিছুরই দরকার হইত না! যেখানে যাইবার হুকুম পাইত অমনি সে উড়িয়া গিয়া সেখানে হাজির হইত।

সেই পুষ্পকরথে চড়িয়া দশগ্রীব স্বর্গের বিশাল শরবনে গিয়া উপস্থিত হইল। পর্বতের উপরে সে অতি পবিত্র বন, কার্তিকেয়ের জন্মস্থান, তাহার উপর দিয়া কোনো রথেরই যাইবার হুকুম নাই! বিশেষত শিব আর পার্বতী তখন সেখানে ছিলেন। কাজে কাজেই পুষ্পক রথ সেখানে গিয়া আটকাইয়া গেল। ইহাতে দশগ্রীব যারপরনাই আশ্চর্য হইয়া নানারূপ চিন্তা করিতেছে, এমন সময় শিবের দূত নন্দী আসিয়া তাহাকে বলিল, "দশগ্রীব, মহাদেব এখানে আছেন, তুমি ফিরিয়া যাও।"

নন্দীর চেহারা বড়ই অদ্ভুত ছিল। ছোট্টো-খাট্টো পিঙ্গলবর্ণ লোকটি, হাত দুখানি এতটুকু, মাথাটি নেড়া, মুখখানি বানরের মতো। দশগ্রীব তাহার কথা শুনিবে কি, সে হাসিয়া অস্থির। কিন্তু নন্দী ছাড়িবার পাত্র

নহে। সে ছোট হইলেও দেখিতে বড়ই ষণ্ডা, তাহাতে আবার হাতে ভয়ংকর শূল। দশগ্রীব রাগের ভরে রথ হইতে নামিয়া সবে বলিয়াছিল, "কে রে তোর মহাদেব?" অমনি নন্দী তাহাকে দুই ধমক লাগাইয়া দিল। তখন সে ভারি চটিয়া বলিল, "বটে? আমাকে যাইতে দিবি না? আচ্ছা, দাঁড়া তোদের পাহাড় আমি তুলিয়া নিব।" এই বলিয়া সত্য সত্যই সে কুড়িহাতে সেই পর্বতের তলা ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। সেকি যেমন তেমন টান? টানের চোটে পর্বত নড়িয়া উঠিল, শিবের ভূতগুলি ভয়ে কাঁপিতে লাগিল, পার্বতী যার-পরনাই ব্যস্ত হইয়া মহাদেবকে জড়াইয়া ধরিতে গেলেন। মহাদেব কিন্তু কিছুমাত্র ব্যস্ত হইলেন না।

তিনি কেবল পায়ের বুড়ো আঙুলটি দিয়া পর্বতখানিকে একটু চাপিয়া ধরিলেন তাহাতেই সে তাহার জায়গায় বসিয়া গেল, আর অমনি দরজার কামড়ে দুষ্টু খোকার আঙুল আটকাইবার মতন দশগ্রীব মহাশয়ের হাতখানিও পর্বতের চাপনে আটকাইয়া গেল।

তখন তো দশগ্রীব দশমুখে ভ্যাঁ ভ্যাঁ শব্দে চ্যাঁচাইয়া অস্থির! চীৎকারে ত্রিভুবন কাঁপিতে লাগিল; সাগর উছলিয়া উঠিল, দেবতারা ছুটিয়া পথে বাহির হইলেন!

হাজার বৎসর ধরিয়া দশগ্রীব ঐরূপ চ্যাঁচাইয়াছিল, আর মহাদেবকে ক্রমাগত মিনতি করিয়াছিল। মহাদেবের দয়ার কথা সকলেই জানে। বেচারার এই কষ্ট দেখিয়া তিনি আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি তাহাকে ছাড়িয়া তো দিলেনই, তাহার উপর আবার ভারি ভারি কয়েকটি অস্ত্রও তাহাকে দিয়া দিলেন, আর বলিলেন, "দশগ্রীব, তুমি চমৎকার চ্যাঁচাইয়াছিলে, তোমার চীৎকারে সকলেই ভয় পাইয়াছিল। অতএব এখন হইতে তোমার নাম 'রাবণ' (যে চীৎকারে লোকের ভয় লাগাইয়া দেয়) হইল।" দশগ্রীব দেখিল, পাহাড় চাপা পড়িয়া মোটের উপর তাহার লাভই হইয়াছে, কাজেই সে খুব খুশি হইয়া সেখান হইতে চলিয়া আসিল।

দশগ্রীব শিবের নিকট বর পাইয়া রাবণ হইল, অস্ত্রশস্ত্রও অনেকগুলি পাইল। তখন হইতে সে ব্রহ্মাণ্ডময় কেবল ঘুরিয়া বেড়ায়, আর রাজরাজড়া যাহাকে সামনে পায় তাহাকেই বলে, "হয় যুদ্ধ কর না হয় হার মান।"

উষীরবীজ নামে একটা জায়গায় মরুত্ত নামে এক রাজা যজ্ঞ করিতেছেন, রাবণ পুষ্পক রথে চড়িয়া হেঁইয়ো হেঁইয়ো শব্দে সেখানে আসিয়া উপস্থিত। যজ্ঞের স্থানে দেবতাদের অনেকেই ছিলেন, রাবণকে দেখিয়াই ভয়ে তাঁহাদের মুখ শুকাইয়া গেল। ছুটিয়া যে পলাইবেন, এতটুকুও তাঁহাদের ভরসা হইল না: কি জানি পাছে ধরিয়া ফেলে। তাই তাহারা সেইখানেই নানা জন্তুর বেশ ধরিয়া লুকাইয়া রহিলেন। ইন্দ্র হইলেন ময়ূর, ধর্ম হইলেন কাক, কুবের হইলেন গিরগিটি, বরুণ হইলেন হাঁস।

এদিকে মরুত্তের সঙ্গে রাবণের খুবই যুদ্ধ বাধিবার জোগাড় দেখা যাই-তেছে, গালাগালি আরম্ভ হইয়াছে মারামারিরও বিলম্ব নাই, এমন সময়

মরুত্তের গুরু সম্বর্ত মুনি তাঁহাকে বলিলেন, "মহারাজ! যুদ্ধ করিয়া কাজ নাই কেননা তাহা হইলে তোমার যজ্ঞ নষ্ট হইয়া যাইবে, তাহাতে সর্বনাশ হইবে।" কাজেই মরুত্ত চুপ করিয়া গেলেন, আর রাবণ "জিতিয়াছি জিতিয়াছি" বলিয়া খুবই বাহাদুরী করিতে লাগিল। তারপর সেখানে যত মুনি উপস্থিত ছিলেন, তাহাদের সকলকে খাইয়া যারপরনাই খুশি হইয়া সে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

তখন দেবতামহাশয়েরা আবার যার যার বেশ ধরিয়া মনে করিলেন, "বাবা, বড্ড বাঁচিয়া গিয়াছি।" যে-সকল জন্তুর সাজ তাঁহারা নিয়াছিলেন, তাহাদের উপরে অবশ্য তাঁহারা খুবই খুশি হইলেন, আর তাহাদিগকে বর দিতে লাগিলেন।

ইন্দ্র ময়ূরকে বলিলেন, "তোমার সাপের ভয় থাকিবে না, আর আমার যেমন হাজার চোখ, তোমার লেজেও তেমনি হাজার চোখ হইবে।" ময়ূরের লেজে আগে শুধুই নীলবর্ণ ছিল, তখন হইতে তাহাতে চমৎকার চক্র দেখা দিল।

ধর্ম কাককে বলিলেন, "তোমার আর কোনা অসুখ হইবে না। মরণের ভয়ও তোমার দূর হইল; কেবল মানুষে যদি মারে তবেই তোমার মৃত্যু হইবে।"

বরুণ হাঁসকে বলিলেন, "তোমার গায়ের রঙ ধব্‌ধবে সাদা হইবে। তখন হইতে হাঁস সাদা হইয়াছে, আগে তাহার আগাগোড়া সাদা ছিল না, পাখার আগা নীল, আর কোলের দিকে ছেয়ে রঙের ছিল।

কুবের গিরগিটিকে বলিলেন, "তোমার মাথা সোনার মতো হইবে।" সেই হইতে গিরগিটির মাথায় সোনালি রঙ।

এদিকে রাবণের আর গর্বের সীমাই নাই। দুষ্মন্ত, সুরথ, গাধি, গয়, পুরুরবা প্রভৃতি বড় বড় রাজারা তাহার নিকট হার মানিয়া গেলেন। অন্যের তো কথাই নাই। কিন্তু অযোধ্যার রাজা অনরণ্য কিছুতেই তাঁহার নিকট হার মানিতে রাজি হইলেন না। তিনি আগেই অনেক সৈন্য প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন, রাবণ তাঁহার রাজ্যে আসিবামাত্র সেই-সকল সৈন্য লইয়া তিনি তাহার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। হায়, তাঁহার সে সৈন্য রাবণের সৈন্যদের কাছে দুদণ্ডের মধ্যেই শেষ হইয়া গেল, নিজেও রাবণের হাতে ভয়ানক আঘাত পাইয়া রথ হইতে পড়িয়া কাঁপিতে লাগিলেন। রাবণ তখন তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিল, "কি? আমার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া এখন কেমন হইল?" অনরণ্য বলিলেন, "মরিতে তো একদিন সকলকেই হয়, কিন্তু আমি তোমার কাছে হটি নাই, যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দিতেছি আর আমি এ কথা তোমাকে বলিতেছি যে, আমাদের এই বংশে দশরথের পুত্র রামের জন্ম হইবে, সেই রামের হাতে তুমি তোমার উচিত সাজা পাইবে।"

রাজার কথা শেষ হইতে না হইতেই দেবতারা তাঁহার উপরে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। স্বর্গে দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে রাজাও দেহ ছাড়িয়া সেখানে চলিয়া গেলেন।

একবার রাবণ মানুষ তাড়াইয়া ফিরিতে ফিরিতে দেখিলেন যে মেঘের

উপর দিয়া নারদ মুনি হরিনাম গান করিতে করিতে আসিতেছেন। রাবণ তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বলিল, "কি ঠাকুরমহাশয়, মঙ্গল তো? কিজন্য আসিয়াছেন?"

নারদ বলিলেন, "আসিয়াছি যে বাপু, একটা কথা আছে। এই-সব মানুষ যখন মৃত্যুর বশ, তখন এরা তো মরিয়াই রহিয়াছে; ইহাদিগকে মারিবার জন্য তুমি আবার এত পরিশ্রম কেন করিতেছ? ইহারা আপনা আপনিই একদিন যমের বাড়ি যাইবে! বাস্তবিক যমই যত নষ্টের গোড়া। অতএব, সেই বেটাকে যদি জব্দ করিতে পার, তবে সকলকেই জয় করা হইবে।"

রাবণ বলিল, "বড় ভালো কথা বলিয়াছেন, ঠাকুর মহাশয়! আমি এখনি যাইতেছি।" বলিয়াই আর এক মুহূর্তও দেরি নাই, অমনি রাবণ যমপুরীর পথ ধরিয়াছে। তখন নারদ ভাবিলেন, 'এবারে মজাটা হইবে ভালো। যাই, একবার দেখিয়া আসি।'

নারদ রাবণের আগেই গিয়া যমের নিকট উপস্থিত হইলেন। যম বিচারাসনে বসিয়া অগ্নিসাক্ষী করিয়া সকলের পাপপুণ্যের বিচার করিতেছিলেন, নারদকে দেখিয়া ব্যস্তভাবে উঠিয়া নমস্কারপূর্বক বলিলেন, "মুনিঠাকুরের আজ কি চাই?"

নারদ বলিলেন, "সাবধান হও, বাছা, রাবণ তোমাকে জয় করিতে আসিতেছে। মুশকিল হইতে আটক নাই কিন্তু বেটা বড় বেখাপ্পা লোক।"

বলিতে বলিতেই রাবণের ঝক্ঝকে পুষ্পক রথও আসিয়া দেখা দিল! রথ হইতে নামিয়াই সে দেখিল যে নরকের কুণ্ডে দলে দলে পাপী-সকল যমদূতগণের তাড়নায় চীৎকার করিতেছে। অমনি আর কথাবার্তা নাই, সে যমদূতগুলিকে বিধিমতে ঠ্যাঙাইয়া সকল পাপীকে ছাড়িয়া দিল। সে বেচারারা হঠাৎ ছাড়া পাইয়া যে কি আশ্চর্য আর খুশি হইল, তাহা আর বলিবার নয়। তখন যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল, সে বড়ই ভয়ংকর। যমপুরীতে অসংখ্য সিপাহী সান্ত্রী থাকে, তাহাদের এক-একজন ভয়ানক যোদ্ধা। তাহারা রাবণ আর তাহার লোকগুলিকে মারিয়া রক্তারক্তি করিয়া দিল। মার খাইয়াও কিন্তু রাবণ যুদ্ধ করিতে ছাড়ে না। শূল শক্তি প্রাস গদা গাছ পাথর কত যে ছুঁড়িল তাহার লেখাজোখা নাই। তখন যমের লোকেরা আর রাক্ষসকে ছাড়িয়া কেবল রাবণের উপরেই এমন ভয়ানক অস্ত্র বৃষ্টি করিতে লাগিল যে, তাহাতে পুষ্পক রথ অবধি ডুবিয়া গিয়া রাবণের দম আটকিয়া মরিবার গতিক। দুর্দশার একশেষ! রক্তধারায় দেহ ভাসিয়া গেল; কবচ কোথায় গিয়াছে তাহার ঠিক নাই। তখন কাজেই তাহাকে রথ হইতে নামিয়া আসিতে হইল।

এতক্ষণে আর রাবণের বুঝিতে বাকি রহিল না যে এবারে একটু বেগতিক, একটা বড়রকমের অস্ত্র না ছাড়িতে পারিলে আর চলিতেছে না। কাজেই সে তখন ধনুকে পাশুপত অস্ত্র জুড়িয়া যমের লোকদিগকে বলিল, "দাঁড়া বেটারা, এবারে তোদের দেখাইতেছি।" এই বলিয়া সে সেই ভয়ংকর অস্ত্র ছুঁড়িবামাত্রই, তাহার তেজে যমের সকল সিপাহি ভস্ম হইয়া গেল। তখন রাবণের

আর রাক্ষসগণের সিংহনাদে ব্রহ্মাণ্ড ফাটে আর কি?

সেই সিংহনাদ শুনিয়াই যম বুঝিতে পারিলেন যে রাক্ষসদিগের জয় হইয়াছে। তখন কাজেই রথে চড়িয়া তাঁহাকে স্বয়ংই বাহির হইতে হইল! সে যে কি ভয়ংকর রথ সে কথা আমি বলিয়া বুঝাইতে পারিব না। তাহার উপর আবার স্বয়ং মৃত্যু প্রাস মুদ্গর লইয়া ভীষণ বেশে যমের সম্মুখে দাঁড়াইয়া, কালদণ্ড প্রভৃতি ভয়ংকর অস্ত্রসকল ধুধু করিয়া জ্বলিতেছে।

সেই রথ আর তাহার ভিতর মৃত্যুকে দেখিয়াই রাবণের লোকেরা "বাপ রে। আমাদের যুদ্ধে কাজ নাই" বলিয়াই ঊর্ধ্বশ্বাসে চম্পট দিল। কিন্তু রাবণ তাহাতে ভয় না পাইয়া যমের সঙ্গে খুবই যুদ্ধ করিতে লাগিল। অস্ত্রের ভয় তো তাহার নাই, কারণ সে জানে যে ব্রহ্মার বরের জোরে সে মরিবে না! কাজেই অনেক খোঁচা যেমন খাইল, খোঁচা দিলও ততোধিক। খোঁচা খাইয়া যম রাগে অস্থির হইয়া উঠিলেন, তাঁহার মুখ দিয়া আগুন বাহির হইতে লাগিল।

তখন মৃত্যু যমকে বলিল, "আমাকে আজ্ঞা করুন আমি এখনই এই দুষ্টকে মারিয়া দিতেছি!. আমি ভালো করিয়া তাকাইলে আর ইহাকে এক মুহূর্তও বাঁচিতে হইবে না।" যম বলিলেন, "দেখ-না, আমি ইহাকে কি সাজা দিই।" এই বলিয়াই তিনি রাগে দুই চোখ লাল করিয়া তাঁহার সেই ভীষণ 'কালদণ্ড' হাতে নিলেন। সে দণ্ড যাহার উপর পড়ে তাহার আর রক্ষা থাকে না।

যমকে কালদণ্ড তুলিতে দেখিয়া ভয়ে সকলের প্রাণ উড়িয়া গেল, কে কোন দিক দিয়া পলাইবে তাহার ঠিক নাই, দেবতাদের অবধি বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করিতেছে। তখন ব্রহ্মা নিতান্ত ব্যস্তভাবে ছুটিয়া আসিয়া যমকে বলিলেন, "সর্বনাশ, কর কি? এই কালদণ্ড তুমি ছুঁড়িলেই যে আমার কথা মিথ্যা হইয়া যাইবে। কালদণ্ড আমিই গড়িয়াছি, রাবণকেও আমি বর দিয়াছি। আমিই বলিয়াছি যে কালদণ্ড কিছুতেই ব্যর্থ হইবে না। আবার আমিই বলিয়াছি যে রাবণ কোনো দেবতার হাতে মরিবে না। এখন এই অস্ত্রে যদি রাবণ মরে, তাহা হইলেও আমার কথা মিথ্যা হয়, যদি না মরে তাহা হইলেও আমার কথা মিথ্যা হয়। লক্ষ্মীটি আমার মান রাখ, এ অস্ত্র তুমি ছুঁড়িও না।"

কাজেই যম তখন আর কি করেন? তিনি বলিলেন, "আপনি হইতেছেন আমাদের প্রভু, সুতরাং আপনার হুকুম মানিতেই হইবে। কিন্তু যদি এ দুষ্টকে মারিতেই না পারিলাম, তবে আর আমার এখানে থাকিয়াই কি ফল?" এই বলিয়া যম সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। তাহা দেখিয়া রাবণ হাততালি দিয়া নাচিতে নাচিতে বলিল, "দুয়ো! দুয়ো! হারিয়া গেলি!" হারিয়া গেলি!" ততক্ষণে অন্য রাক্ষসদেরও খুবই সাহস হইয়াছে, আর তাহারা আসিয়া, "জয় রাবণের জয়।"—বলিয়া আকাশ ফাটাইতে আরম্ভ করিয়াছে!

ব্রহ্মার কথায় যম যুদ্ধ ছাড়িয়া দিলেন। রাবণ ভাবিল, সেটি তাহার নিজেরই বাহাদুরী। তখন আর তাহার গর্বের সীমাই রহিল না! সে বাছিয়া বাছিয়া বড়-বড় যোদ্ধাদের সহিত বিবাদ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। বরুণের

পুত্রগণ তাহার নিকট হারিয়া গেলেন, বরুণ নিজে ব্রহ্মার বাড়িতে গান শুনিতে যাওয়ায় সেখানে উপস্থিত ছিলেন না, তাই তাঁহার মান বাঁচিল। সূর্য যুদ্ধ না করিয়াই বলিলেন, "আমি হার মানিতেছি।" রাবণের ভগ্নিপতি বিদ্যুজ্জিহ্ব বেচারাও তাহার হাতে মারা গেল।

কিন্তু সকল জায়গায়ই যে রাবণ বাহাদুরী পাইয়াছিল তাহা নহে। বলির বাড়িতে গিয়া সে অনেক বড়াই করিয়াছিল। বলি তাহাকে ধরিয়া নিজের কোলে বসাইয়া বলিলেন, "কি চাও বাপু?" রাবণ বলিল, "শুনিয়াছি বিষ্ণু নাকি আপনাকে আটকাইয়া রাখিয়াছেন। আমি আপনাকে ছাড়াইয়া দিতে পারি।"

এ কথা শুনিয়া বলির ভারি হাসি পাইল। তারপর তিনি কথায় কথায় তাহাকে বলিলেন, "ঐ যে ঝক্‌ঝকে চাকাটি দেখিতেছ ওটি আমার কাছে লইয়া আইস তো?" এ কথায় রাবণ নিতান্ত অবহেলার সহিত গিয়া সেই জিনিসটি উঠাইল, কিন্তু কিছুতেই সেটিকে লইয়া আসিতে পারিল না। সে লজ্জিত হইয়া প্রাণপণে টানাটানি করিতে করিতে শেষে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল।

খানিক পরে রাবণের জ্ঞান হইয়াছে, কিন্তু তখন আর লজ্জায় বেচারা মাথা তুলিতে পারে না। তখন বলি তাহাকে বলিলেন, "এই চাকাটি আমার পূর্বপুরুষ হিরণ্যকশিপুর কুণ্ডল।"

আর একবার রাবণ পশ্চিম সমুদ্রে গিয়া একটি দ্বীপে আগুনের মতো তেজস্বী এক ভয়ংকর পুরুষকে দেখিল। তাঁহাকে দেখিয়াই রাবণ বলিল, "যুদ্ধ দাও।" তারপর সে তাঁহাকে কত শূল, কত শক্তি, কত ঋষ্টি, কত পট্টিশের ঘা মারিল, কিন্তু তাঁহার কিছুই করিতে পারিল না। তখন সেই ভয়ংকর পুরুষ রাবণকে টিকটিকির মতন ধরিয়া দুহাতে এমনি চাপিয়া দিলেন যে তাহাতেই তাহার প্রাণ যায় যায়। তারপর তিনি তাহাকে মাটিতে ফেলিয়া পাতালে চলিয়া গেলেন। কিঞ্চিৎ পরে রাবণ উঠিয়া রাক্ষসদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, "সেই ভয়ংকর লোকটা কোথায় গেল?" রাক্ষসেরা একটা গর্ত দেখাইয়া বলিল, "সে ইহারই ভিতরে ঢুকিয়া গিয়াছে।" অমনি রাবণও তাড়াতাড়ি সেই গর্তের ভিতর ঢুকিল। তারপর পাতালের মধ্যে খুঁজিতে খুঁজিতে এক জায়গায় গিয়া দেখিল সেই মহাপুরুষ একটা খাটের উপর ঘুমাইয়া আছেন। সেখানে গিয়া রাবণ সবে দুষ্ট ফন্দি আঁটিতেছে, এমন সময় সেই ভয়ংকর পুরুষ হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিলেন, আর তাহাতেই রাবণ কানে তালা লাগিয়া মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া গেল। তখন ভয়ংকর পুরুষ তাহাকে বলিলেন, "আর কেন? এই বেলা চলিয়া যাও! ব্রহ্মা তোমাকে অমর হইবার বর দিয়াছেন। কাজেই তোমাকে বধ করা হইল না।" এই ভয়ংকর পুরুষ ছিলেন ভগবান কপিল।

আর একবার রাবণ গিয়াছিল মাহিষ্মতীর রাজা অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে। মাহিষ্মতীতে গিয়া সে অর্জুনের মন্ত্রীদিগকে বলিল, "তোমাদের

রাজা কোথায়? আমি তাহার সহিত যুদ্ধ করিব।" মন্ত্রীরা বলিলেন, "তিনি বাড়ি নাই।"

এ কথায় রাবণ সেখান হইতে বিন্ধ্যপর্বতে চলিয়া আসিল। বিন্ধ্য অতি সুন্দর পর্বত। সেই পর্বতের নীচ দিয়া নর্মদা নদী বহিতেছে, তাহার শোভা দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়। এমন নির্মল জল, এমন শীতল বায়ু, এত-রকমের ফুল আর অতি অল্পস্থানেই আছে। রাবণ মনের সুখে সে জলে নামিয়া স্নান করিল।

ঠিক সেই সময়ে একটা ভারি আশ্চর্য ঘটনা ঘটিতেছিল। নর্মদার জল স্বভাবতই পূর্ব হইতে পশ্চিম দিকে বহিয়া থাকে, কিন্তু সেদিন দেখা গেল যে তাহা এক-একবার হঠাৎ উঁচু হইয়া পশ্চিম হইতে পূর্ব দিকে ফিরিয়া আসিতেছে। ইহাতে রাবণ যারপরনাই আশ্চর্য হইয়া শুক সারণকে বলিল, "দেখ তো ব্যাপারটা কি।"

শুক সারণ তখনই পশ্চিম দিকে চলিয়া গেল, আর, খানিক পরেই ব্যস্ত-ভাবে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, মহারাজ, প্রকান্ড শালগাছের মতো উঁচু একটা লোক নর্মদায় নামিয়া স্নান করিতেছে। উহার এক হাজারটা হাত। সেই হাজার হাতে সে এক-একবার নদীর জল আগলাইয়া ঠেলিয়া দিতেছে, আর তাহাতেই সে জল এত উঁচু হইয়া ফিরিয়া আসিতেছে।

এ কথা শুনিয়া রাবণ বলিয়া উঠিল—"অর্জুন"। তারপর আর এক মুহূর্তও বিলম্ব না করিয়া অমনি গদা ঘুরাইতে ঘুরাইতে অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে চলিল। অর্জুনের লোকেরা তাহাকে আটকাইতে চেষ্টা করিয়া-ছিল, কিন্তু রাক্ষসেরা তাহাদিগকে মারিয়া ধরিয়া গিলিয়া খাইয়া নাকাল করিয়াছিল।

অর্জুন এ কথা শুনিতে পাইয়া বিশাল গদা হাতে ছুটিয়া আসিলেন। রাক্ষসেরা তাঁহাকে বাধা দিয়াছিল, কিন্তু সেই গদার সম্মুখে তাহারা কিছুতেই টিকিতে না পারিয়া শেষে ছুটিয়া পলাইল। তখন রাবণ আর অর্জুনের যে যুদ্ধ হইল, সে বড়ই ভয়ানক। দুজনেরই যেমন বিশাল দেহ, হাতে তেমনি ভীষণ গদা। রাবণ ভয়ানক তেজের সহিত অনেকক্ষণ যুদ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু শেষে অর্জুনের গদার ঘায়ে অস্থির হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বসিয়া পড়িল। অর্জুনও অমনি তাহাকে ধরিয়া এমনি বাঁধন বাঁধিলেন যে সে কথা আর বলি-বার নয়; তাহা দেখিয়া দেবতাগণের কি আনন্দই হইল। তাঁহারা যে যত পারিলেন, অর্জুনের মাথায় পুষ্পবৃষ্টি করিলেন।

এদিকে রাক্ষসেরা আসিয়া অর্জুনের হাত হইতে রাবণকে ছাড়াইয়া নিতে কত চেষ্টাই করিল, কিন্তু সে কি তাহাদের কাজ? অর্জুন তাহাদিগকে বিধি-মতে ঠ্যাঙাইয়া রাবণকে লইয়া ঘরে চলিয়া গেলেন।

এখন রাবণের তো আর সংকটের সীমাই নাই, এ সংকট হইতে তাহাকে কে বাঁচায়? বাঁচাইবার লোক একটিমাত্র আছেন, তিনি হইতেছেন উহার পিতামহ পুলস্ত্য মুনি। মুনিঠাকুর নাতির মায়া এড়াইতে না পারিয়া

তাড়াতাড়ি আসিয়া অর্জুনকে বলিলেন, "বাছা, আমার নাতিটিকে ছাড়িয়া দাও। উহাকে যে সাজা দিয়াছ তাহাতেই তোমার খুব নাম হইবে, আর উহাকে রাখিয়া লাভ কি?"

এ কথায় অর্জুন খুশি হইয়া তখনই রাবণকে ছাড়িয়া দিলেন; সে লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া চোরের মতো সেখান হইতে চলিয়া আসিল। কিন্তু দুষ্ট লোকের লজ্জা আর কতকাল থাকে? দুদিন পরেই দেখা গেল যে, রাবণ আবার রাজাদিগকে খোঁচাইয়া ফিরিতেছে।

মুনির কথায় অর্জুন রাবণকে ছাড়িয়া দিলেন, আবার তাহার সহিত বন্ধুতাও করিলেন। কাজেই তখন আর তাহার দর্পের সীমা রহিল না। যে কোনো বীরের নাম শুনিলেই সে তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া উপস্থিত হয় আর তর্জন গর্জন করিয়া আকাশ ফাটাইয়া দেয়। এমনি করিয়া একদিন সে কিষ্কিন্ধায় গিয়া তর্জন গর্জন করিতে লাগিল,—"বালী কোথায়? আমি যুদ্ধ করিব!"

বালী তখন বাড়ি ছিল না, সমুদ্রের ধারে সন্ধ্যা করিতে গিয়াছিল। অন্য বানরেরা রাবণকে বলিল, "বালী সন্ধ্যা করিতে গিয়াছেন, এখনই আসিবেন। ততক্ষণ তুমি এই বিচিত্র সংসারখানি একবার শেষ দেখা দেখিয়া লও; কারণ বালী আসিলে তোমার প্রাণের আশা তিলমাত্রও থাকিবে না। আর, যদি তোমার নিতান্তই শীঘ্র শীঘ্র মরিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে, তবে নাহয় দক্ষিণ সমুদ্রে গিয়া তাঁহাকে খুঁজিয়া লও।"

রাবণ তখনই বানরদিগকে বকিতে বকিতে পুষ্পকরথ হাঁকাইয়া চলিয়া গেল, আর খানিক দূরে গিয়াই দেখিল, বালী সোনার পাহাড়ের ন্যায় সমুদ্রের ধারে বসিয়া আছে। তাহার মুখখানি সকালবেলার সূর্যের মতো লাল আর উজ্জ্বল দেখা যাইতেছে। রাবণ ভাবিল, চুপি চুপি গিয়া বানরকে হঠাৎ জাপটিয়া ধরিতে হইবে। এই বলিয়া সে খুবই চুপি চুপি যাইতে লাগিল; সে জানে না যে, বালী ইহার আগেই তাহাকে দেখিতে পাইয়াছে। আর তাহার মনের কথাটি ঠিক বুঝিয়া লইয়া তাহারই জন্য চুপ করিয়া বসিয়া আছে—একটিবার হাতের কাছে পাইলেই তামাশাটা দেখাইয়া দিবে।

চোখে ভ্রূকুটি, মুখে ঘামাচি, হাত দুটি বিষম ব্যগ্রভাবে বাড়ান, এমনিভাবে আসিয়া রাবণ চোরের মতো বালীর পিছনে দাঁড়াইল; ভাবিল, 'এইবার ধরি!' কিন্তু হায়, তাহার আগেই বালী তাহাকে ধরিয়া বগলে পুরিয়া ফেলিল। সে একটিবার পিছনবাগে তাকাইয়াও দেখে নাই, অথচ ঠিক ফড়িংটির মতো রাক্ষসের বাছাকে ধরিয়া বগলে পুরিয়াছে। রাবণের সঙ্গের রাক্ষসগুলি অবশ্য তখন বড়ই ব্যস্ত হইয়া বালীকে মারিতে গিয়াছিল, কিন্তু বালীর কয়েকটা হাত-পা নাড়া খাইয়াই তাহারা কাঁপিয়া অস্থির, যুদ্ধ আর করিবে কি?

এদিকে রাবণ বালীর বগলে থাকিয়া প্রাণপণে তাহাকে আঁচড় কামড় দিতেছে, কিন্তু বালীর কাছে তাহা পিঁপড়ের কামড়ের মতোও ঠেকিতেছে না।

বালী সে-সব অগ্রাহ্য করিয়া নিজের সন্ধ্যাবন্দনায় মন দিল। দক্ষিণ সাগরের সন্ধ্যা শেষ হইলে, রাবণকে বগলে লইয়াই সে শূন্যপথে পশ্চিম সমুদ্রে গিয়া সন্ধ্যা করিতে লাগিল। তারপর উত্তর সমুদ্রে আর পূর্ব সমুদ্রেও ঠিক সেই-রূপ সন্ধ্যা শেষ না করিয়া সে কিষ্কিন্ধায় ফিরিল না। ততক্ষণে সেই বগলের চাপে আর গন্ধে আর ঘামে রাবণের কি দশা হইয়াছিল, বুঝিয়া লও।

কিষ্কিন্ধায় বালী রাবণকে বগল হইতে বাহির করিয়া হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ?" রাবণ যাতনায় মিটিমিটি চোখে বলিল, "আমি লঙ্কার রাজা রাবণ, আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আসিয়া-ছিলাম। আপনি আমাকে পশুর মতো ধরিয়া এত পথ ঘুরাইয়া আনিলেন, আপনার কি আশ্চর্য ক্ষমতা! আমি আপনার সঙ্গে বন্ধুতা করিব।" সুতরাং তখন দুজনে বন্ধুতা হইয়া গেল। কাজেই সাজা পাইয়াও রাবণের শিক্ষা হইল না। সে আবার ব্রহ্মাণ্ডময় খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল, কোন ছলে কাহারও সহিত যুদ্ধ করিয়া একটু বাহাদুরী লইতে পারে কি না।

ঘুরিতে ঘুরিতে আবার একদিন নারদ মুনির সঙ্গে রাবণের দেখা হই-য়াছে। রাবণ বলিল, "মুনিঠাকুর, বলুন তো, কোন দেশের লোকের গায়ে সকলের চেয়ে বেশি জোর? তাহাদের সহিত আমি যুদ্ধ করিব!" মুনি বলিলেন, "ক্ষীরোদ সমুদ্রে শ্বেতদ্বীপ নামে একটি প্রকাণ্ড দ্বীপ আছে। সেই দ্বীপের লোকের মতো বলবান আর ধার্মিক মানুষ পৃথিবীতে আর কোথাও নাই।" এ কথা শুনিবামাত্রই রাবণ শ্বেতদ্বীপের দিকে পুষ্পকরথ চালাইয়া দিল, মুনিঠাকুরও একটু চিন্তা করিয়া তামাশা দেখিবার জন্য সেইখানেই চলিয়া গেলেন।

তারপর রাক্ষসেরা তো সিংহনাদ করিতে করিতে শ্বেতদ্বীপে গিয়া উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু সে স্থানের এমনি তেজ যে তাহারা কিছুতেই সেখানে টিকিয়া থাকিতে পারিতেছে না। হাওয়ায় পুষ্পক রথ উড়াইয়া নিল, রাক্ষসেরা সকলে ভয়ে পলায়ন করিল। কাজেই তখন আর কি করে? সে রথ আর লোকজন সব ছাড়িয়া দিয়া নিজেই গিয়া দ্বীপের ভিতরে প্রবেশ করিল।

সেখানে কয়েকটি মেয়ে বেড়াইতেছিল। তাহারা দেখিল, দশ মাথা আর কুড়ি হাতওয়ালা একটা লোক পথ দিয়া যাইতেছে, আর প্রাণপণে নিজের চেহারাটাকে ভয়ংকর করিবার চেষ্টা করিতেছে। এ-সব দেখিয়া তাহাদের বড়ই হাসি পাওয়ায় তাহাদের একজন আসিয়া রাবণের হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে বাপু? তোমার বাবার নাম কি? এখানে আসিয়াছ কি করিতে?" এ কথায় রাবণের একটু রাগ হইল। সে খুব গম্ভীর সুরে উত্তর দিল, "আমি বিশ্রবার পুত্র রাবণ। এখানে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছি, কাহাকেও দেখিতে পাইতেছি না"

শুনিয়া মেয়েরা সকলে খিল খিল করিয়া হাসিতে লাগিল। তারপর তাহাদের একজন এক হাতে রাবণের কোমর ধরিয়া অন্য মেয়েদের সামনে নিয়া

তাহাকে ঘুরাইতে ঘুরাইতে বলিল, "দেখ দেখ, আমি কেমন একটা কালো পোকা ধরিয়াছি ; এর আবার দশটা মাথা, কুড়িটা হাত!" বলিয়াই সে সেটা আর-একজনকে ছুঁড়িয়া দিল, সে আবার দিল আরেকজনের হাতে ছুঁড়িয়া। তখন তো রাবণকে লইয়া খুবই একটা লোফালুফির ধুম পড়িয়া গেল। মেয়েদের তাহাতে আমোদের সীমাই নাই, কিন্তু রাবণ বেচারার প্রাণ লইয়া টানাটানি। কাজেই তখন সে আর কি করে? সে দশ মুখের তিনশত বিশ দাঁতে 'কট্টাশ!' করিয়া এক মেয়ের হাতে এক কামড় বসাইয়া দিল। সে মেয়ে তো তখনই "মা-া-া-া গো-া-া!" বলিয়া তাহাকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া প্রাণপণে হাত ঝাড়িতে লাগিল। ততক্ষণে আরেকটি মেয়ে তাহাকে ধরিয়া শূন্যে লইয়া গিয়াছিল, তাহার হাতে সে দিল ভয়ানক আঁচড়াইয়া! সে মেয়েটি তখন তাড়াতাড়ি তাহাকে ছুঁড়িয়া একেবারে সমুদ্রের মাঝখানে ফেলিয়া দিল।

নারদমুনি অবশ্য এতক্ষণ সেইখানে দাঁড়াইয়া তামাশা দেখিতেছিলেন, আর আনন্দে অস্থির হইয়া কেবলই হো হো শব্দে হাস্য আর করতালি দিয়া নৃত্য করিতেছিলেন।

বলাবাহুল্য, রাবণের যুদ্ধের সাধ সেদিন সেই সমুদ্রের জল খাইয়া মিটিয়াছিল।

সন্দেশ—জ্যৈষ্ঠ-আশ্বিন ১৩২১

জরৎকারুর কথা

জরৎকারু মুনি সর্বদাই কঠিন তপস্যায় ব্যস্ত থাকিতেন। বিবাহ বা সংসারের অন্য কোনো কাজ করার ইচ্ছা তাঁহার একেবারেই ছিল না। তপস্যা করিয়া আর তীর্থে স্নান করিয়া তিনি পৃথিবীময় ঘুরিয়া বেড়াইতেন। ঘর. বাড়ি কিছুই তাঁহার ছিল না, যেখানে রাত্রি হইত, সেখানেই নিদ্রা যাইতেন। এমন লোককে ধরিয়া আনিয়া বিবাহ করাইয়া দেওয়া কি সহজ কাজ! এ কাজ হওয়ার কোনো উপায়াই ছিল না, যদি ইহার মধ্যে একটি আশ্চর্য ঘটনা না হইত। ঘটনাটি এই—জরৎকারু নানাস্থানে ঘুরিতে ঘুরিতে একদিন দেখিলেন যে, একটা ভয়ংকর অন্ধকার গর্তের মুখে কয়েকটি নিতান্ত দীন-হীন, রোগা, হাড্ডিসার মানুষ একগাছি খস্‌খসের শিকড় ধরিয়া ঝুলিতেছে! উহাদের পা উপর দিকে, মাথা নীচের দিকে। একটা ইঁদুর ক্রমাগত সেই খস্‌খসের শিকড়খানিকে কাটিয়া, উহার একটি আঁশ মাত্র বাকি রাখিয়াছে, সেটুকু কাটা গেলেই বেচারারা গর্তের ভিতরে পড়িয়া যাইবে! ইহাদিগকে দেখিয়া জরৎকারুর বড়ই দয়া হওয়াতে, তিনি বলিলেন, "আহা! আপনাদের অবস্থা দেখিয়া আমার বড়ই কষ্ট হইতেছে! আপনারা কে? আর, কি করিয়াই-বা আপনাদের এমন কষ্টের অবস্থা হইল? আমি কি আপনাদের কোনো উপকার করিতে পারি?"

সেই লোকগুলি বলিলেন, "আমাদিগকে দেখিয়া তোমার দুঃখ হইয়াছে

বটে, কিন্তু আমাদের দুঃখ দূর করা বড়ই কঠিন দেখিতেছি। আমরা যাযাবর নামক ঋষি। আমরা কেহ কোনো পাপ করি নাই, কেবল আমাদের বংশ লোপ হওয়ার গতিক হওয়াতেই আমাদের এই দুর্দশা! আমাদের বংশে এখনো একটি লোক আছে, উহার নাম জরৎকারু। জরৎকারু বাঁচিয়া আছে বলিয়াই আমরা এখনো কোনোমতে এই খস্‌খসের শিকড়টুকু ধরিয়া টিকিয়া আছি, উহার মৃত্যু হইলেই শিকড়টি ছিঁড়িয়া যাইবে, আর আমরাও এই গর্তের ভিতরে পড়িয়া যাইব। সে মূর্খ কেবল তপস্যা করিয়াই বেড়ায় ; কিন্তু তাহার তপস্যায় আমাদের কি ফল হইবে? তাহার চেয়ে সে যদি বিবাহ করিত আর তাহার পুত্রপৌত্র হইত, তবে আমরা এই বিপদ হইতে রক্ষা পাইতাম। বৎস, আমাদের দশা দেখিয়া তোমার দয়া হইয়াছে তাই বলি, যদি সেই হতভাগার সহিত তোমার দেখা হয়, তবে দয়া করিয়া আমাদের কথা তাহাকে বলিও।"

হায়, কি কষ্টের কথা! পূর্বপুরুষরা এমন ভয়ানক কষ্টে পড়িয়াছেন, আর সেই কষ্টের কারণ জরৎকারু নিজে! এ কথা ভাবিয়া তিনি যারপরনাই দুঃখের সহিত কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "হে মহর্ষিগণ, আপনারা আমারই পূর্বপুরুষ। আমিই সেই দুরাত্মা হতভাগ্য জরৎকারু। আমার অপরাধের সীমা নাই। সেজন্য আমাকে উচিত শাস্তি দিন। আর বলুন, আমি কি করিব।"

ইহাতে পূর্বপুরুষেরা কহিলেন, "তুমি বিবাহ কর।"

জরৎকারু বলিলেন, "আচ্ছা, আমি বিবাহ করিব ; কিন্তু ইহার মধ্যে দুটি কথা আছে। মেয়েটির আমার নামে নাম হওয়া চাই। আর, বিবাহের পর স্ত্রীকে খাইতেও দিতে পারিব না। ইহাতে যদি আমার বিবাহ জোটে, তবেই বিবাহ করিব, নচেৎ নহে।"

এই বলিয়া জরৎকারু বিবাহের জন্য মেয়ে খুঁজিতে লাগিলেন। একে বুড়া, তাহাতে গরিব। স্ত্রীকে খাইতে পরিতে দিতে পারিবে না, কুঁড়েঘর-খানি পর্যন্ত নাই যে তাহাতে নিয়া তাহাকে রাখিবে। এমন বরকে মেয়ে দিতে বোধ হয় বাঘ-ভালুকেও রাজি হয় না—মানুষ তো দূরের কথা। মুনি দেশ-বিদেশে খুঁজিয়া হয়রান হইলেন, কোথাও মেয়ে পাইলেন না। তখন, পূর্ব-পুরুষদের কথা মনে করিয়া, তাঁহার নিতান্ত কষ্ট হওয়াতে, তিনি এক বনের ভিতরে গিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি বলিলেন, "এখানে যদি কেহ থাক, তবে শোন। আমি যাযাবর-বংশের তপস্বী, নাম জরৎকারু। পূর্বপুরুষদিগের আজ্ঞায় আমি বিবাহ করিতে চাহিতেছি, কিন্তু কিছুতেই কন্যা জুটিতেছে না। যদি তোমাদের কাহারও নিকট কন্যা থাকে, আর যদি তাহার আমার নামে নাম হয়, আর যদি আমার টাকা না দিতে হয়, আর মেয়েকেও খাইতে-পরিতে দিতে না হয়, তবে নিয়া আইস, আমি তাহাকে বিবাহ করিব।"

এদিকে হইয়াছে কি—বাসুকির লোকেরা সেই তখন হইতেই জরৎকারুকে খুঁজিতেছে, কিন্তু এতদিন কোথাও তাহার দেখা পায় নাই। জরৎকারু যখন

সেই বনের ভিতর ঢুকিয়া কাঁদিতেছিলেন, তখন বাসুকির ঐ-সব লোকের কয়েকজনও সেখানে ছিল। তাহারা তাঁহার কথা শুনিয়াই বলিল, "ঐ রে, সেই মুনি! ঐ শোন্, সে বিবাহ করিতে চায়! শীঘ্র কর্তাকে খবর দিই গিয়া চল্।"

এই বলিয়া তাহারা বায়ুবেগে ছুটিয়া গিয়া বাসুকিকে এই সংবাদ দিল। বাসুকিও সে সংবাদ পাওয়া মাত্রই তাঁহার ভগিনীকে অতি সুন্দর পোশাক এবং মহামূল্য অলংকার পরাইয়া, জরৎকারুর নিকট উপস্থিত করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া জরৎকারু বলিলেন, "মহাশয়, ইঁহার নামটি কী?"

বাসুকি বলিলেন, "ইঁহার নাম জরৎকারু।"

জরৎকারু বলিলেন, "বেশ! কিন্তু আমি তো টাকাকড়ি দিতে পারিব না।"

বাসুকি বলিলেন, "আপনাকে কিছুই দিতে হইবে না, আমি অমনিই মেয়ে দিতেছি।"

জরৎকারু বলিলেন, "বেশ, বেশ! কিন্তু মেয়েকে খাইতে দিবে কে? আমার তো কিছুই নাই।"

বাসুকি বলিলেন, "তাহার জন্য আপনার কোনো চিন্তা নাই। আমি ইহাকে চিরকাল ভরণপোষণ করিব।"

জরৎকারু বলিলেন, "তবে ভালো, আমি ইঁহাকে বিবাহ করিব। কিন্তু যদি ইনি কখনো আমাকে অসন্তুষ্ট করেন, তবে আমি তখনই চলিয়া যাইব।"

এই কথাবার্তার পর জরৎকারুর সহিত বাসুকির ভগিনীর বিবাহ হইল। ইঁহাদের পুত্রই আস্তীক—যিনি সর্পগণকে জনমেজয়ের যজ্ঞ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন।

আস্তিকের জন্মের কয়েকদিন আগে, জরৎকারু তাঁহার স্ত্রীর উপর রাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। বেচারীর কোনো দোষ ছিল না। তিনি পরম যত্নে স্বামীর সেবা করিতেন।

একদিন বিকালবেলায় জরৎকারু মুনি নিদ্রা গেলেন। ক্রমে সূর্যাস্ত আসিয়া উপস্থিত হইল। সন্ধ্যাকালের উপাসনার সময় হইল। তথাপি মুনির ঘুম ভাঙিল না। ইহাতে তাঁহার স্ত্রী ভাবিলেন, 'এখন কি করি? ঘুম ভাঙাইলে হয়তো ইঁহার রাগ হইবে, আর সন্ধ্যাপূজা না করা হইলে ইঁহার পাপ হইবে।' অনেক ভাবিয়া তিনি স্থির করিলেন যে, যাহাতে ইঁহার পাপ হয়, এমন ঘটনা হইতে দেওয়া উচিত নহে, সুতরাং ইঁহাকে জাগানোই কর্তব্য। এই মনে করিয়া যেই তিনি মুনিকে আস্তে আস্তে জাগাইয়াছেন, অমনি মুনি রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, "কি? আমাকে অপমান করিলে? এই আমি চলিলাম, আর এখানে কিছুতেই থাকিব না।"

ইহাতে বাসুকির ভগিনী নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বিনয়ের সহিত বলিলেন, "ভগবন্, সূর্যাস্ত হইতেছিল, তাই সন্ধ্যাপূজার জন্য আপনাকে জাগাইয়াছিলাম। আপনাকে অপমান করিতে চাহি নাই।"

জরৎকারু বলিলেন, "আমি ঘুমাইয়া থাকিতে কি সূর্যাস্ত হইবার শক্তি

আছে? কাজেই আমাকে জাগাইয়া আমার অপমান করিয়াছ। আমি আর এখানে থাকিব না।”

এই বলিয়া মুনি সেখান হইতে চলিয়া গেলেন ; তাঁহার স্ত্রীর চোখের জলের দিকে একবারও ফিরিয়া চাহিলেন না।

ইহার কিছুদিন পরেই আস্তীকের জন্ম হইল। ছেলেটি দেখিতে দেবতার ন্যায় সুন্দর। আর তাহার এমন অসাধারণ বুদ্ধি যে, শিশুকালেই বেদ পুরাণ সমস্ত পড়িয়া মুখস্থ করিয়া ফেলিল। তাহাকে পাইয়া নাগগণের আর আনন্দের সীমা রহিল না। উহারা কত যত্নের সহিত যে তাহাকে পালন করিতে লাগিল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

এই সময়েই জনমেজয়ের যজ্ঞ আরম্ভ হয়। যজ্ঞের সকল আয়োজন প্রস্তুত, সকলে তাহা আরম্ভ করিতে যাইতেছেন, এমন সময় সেখানে একটি লোক আসিল, তাহার চোখ দুইটা ভারি লাল। লোকটি স্থাপত্যবিদ্যায় বড়ই পণ্ডিত। সে খানিক এদিক-ওদিক দেখিয়া, তারপর বলিল, “যে সময়ে আর যে স্থানে তোমরা যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছ, তাহাতে আমার বোধ হয়, তোমরা ইহা শেষ করিয়া উঠিতে পারিবে না—এক ব্রাহ্মণ আসিয়া ইহাতে বাধা দিবে।” ইহা শুনিয়া জনমেজয় দারোয়ানদিগকে আজ্ঞা দিলেন, “আমাকে না জানাইয়া কাহাকেও ঢুকিতে দিবে না।”

তারপর যজ্ঞ আরম্ভ হইল। পুরোহিতেরা কালো রঙের ধুতি-চাদর পরিয়া মন্ত্র পড়িতে পড়িতে আগুনে ঘি ঢালিতে লাগিলেন, ধোঁয়ায় তাঁহাদের চোখ লাল হইয়া উঠিল। সর্পগণের নাম লইয়া অগ্নিতে আহুতি পড়িবামাত্র (ঘৃত ঢালা হইবামাত্র) তাহারা বুঝিল যে আর প্রাণের আশা নাই। অল্পক্ষণ পরেই দেখা গেল যে, নানারকম সাপ আসিয়া আগুনে পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। বেচারারা ভয়ে অস্থির হইয়া, ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে, বাঁচিবার জন্য কত চেষ্টাই করিতেছে, লেজ দিয়া আর মাথা দিয়া, একজন অপর-জনকে প্রাণপণে জড়াইয়া ধরিতেছে আর ক্রমাগত আপনার লোকদিগের নাম লইয়া চিৎকার করিয়া কত যে কাঁদিতেছে, তাহার তো কথাই নাই। কিন্তু কিছুতেই তাহারা রক্ষা পাইতেছে না! সাদা, হলদে, নীল, কালো, ছোট, বড়, মাঝারি—সকল-রকমের সাপ হাজারে হাজারে আগুনে পুড়িয়া মরিল।

সে সময়ে সাপের চিৎকারে আর কোনো শব্দই শুনিবার উপায় রহিল না। পোড়া সাপের গন্ধে সে স্থানে টিঁকিয়া থাকা ভার হইয়া উঠিল। হায়! মায়ের শাপ কি দারুণ শাপ!

কিন্তু যাহার জন্য আয়োজন, সেই তক্ষক এতক্ষণ কি করিতেছিল? যজ্ঞের কথা শুনিবামাত্র আর সকলের আগে উহারই প্রাণ উড়িয়া গিয়াছিল। সে তখনই নিতান্ত ব্যস্তভাবে ইন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া, হাঁপাইতে হাঁপাইতে জোড়হাতে বলিল, “দোহাই দেবরাজ! আমাকে রক্ষা করুন! জনমেজয় আমাকে পোড়াইয়া মারিবার আয়োজন করিতেছে!”

ইন্দ্র বলিলেন, “তোমার কোনো ভয় নাই, তুমি আমার এইখানে থাকো।”

ইহাতে তক্ষক কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়া ইন্দ্রের পুরীতেই বাস করিতে লাগিল।

এদিকে ক্রমাগতই সাপ আসিয়া যজ্ঞের আগুনে পড়িতেছে। এইরূপে কয়েক ঘণ্টার ভিতরেই অধিকাংশ সাপ মরিয়া গেল, অল্পই বাকি রহিল। সাপের রাজা বাসুকি এ-সকল ঘটনা দেখিয়া বার বার অজ্ঞান হইয়া যাইতে লাগিলেন। সাপেদের মধ্যে কেহ যে রক্ষা পাইবে, এমন আশা তাঁহার রহিল না। তাঁহার কেবল ইহাই মনে হইতে লাগিল যে, "এইবারেই বুঝি আমার ডাক পড়ে।" এমন সময় তাঁহার আস্তীকের কথা মনে পড়িল।

বাস্তবিক, আস্তীক যদি সর্পগণকে রক্ষা করিবার জন্যই জন্মিয়া থাকেন, তবে আর তাঁহার বিলম্ব করিবার সময় ছিল না। এই বেলা গিয়া একটা কিছু না করিলে, আর তাহার যে কাজ করিবার অবসরই থাকিত না। সুতরাং বাসুকি তাড়াতাড়ি তাঁহার ভগিনীকে ডাকিয়া বলিলেন, "আর দেখিতেছ কি বোন? শীঘ্র আস্তীককে ইহার উপায় করিতে বল।"

এ কথায় বাসুকির ভগিনী তখনই আস্তীকের নিকট গিয়া বলিলেন, "বাছা, সর্বনাশ উপস্থিত! তুমি যে কাজের জন্য জন্মিয়াছিলে শীঘ্র তাহা না করিলে তো আর উপায় দেখিতেছি না!"

ইহাতে আস্তীক একটু আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, "আমি কি কাজের জন্য জন্মিয়াছি মা? বল, এখনই তাহা করিতেছি।"

তখন আস্তীকের মাতা তাঁহাকে কদ্রুর শাপের কথা আর জনমেজয়ের যজ্ঞের কথা আর তাঁহাদ্বারা যে সেই যজ্ঞ বারণ হইবে সেই কথা, আগাগোড়া শুনাইলেন। তাহা শুনিয়া আস্তীক বাসুকির নিকটে গিয়া বলিলেন, "মামা, আপনি আর দুঃখ করিবেন না। এই আমি চলিলাম। যেমন করিয়াই হয়, সে যজ্ঞ আমি বারণ করিয়া আসিব, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই।"

এই বলিয়া আস্তীক জনমেজয়ের যজ্ঞের স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বড়-বড় মুনি-ঋষিতে সে যজ্ঞস্থান পূর্ণ ছিল আর তাহার দরজায় যমদূতের মতন সিপাহিসকল ঢাল তলোয়ার হাতে পাহারা দিতেছিল। বালক আস্তীককে দেখিয়াই তাহারা ধমক দিয়া বলিল, "এইয়ো! কোথায় যাইতেছ?"

আস্তীক তাহাতে কিছুমাত্র ভয় না পাইয়া বলিলেন, "তোমাদের জয় হউক, দারোয়ানজী। যজ্ঞটি যেমন জমকাল, তোমরা তাহার উপযুক্ত দারোয়ান। এমন সুন্দর যজ্ঞ কেহ দেখে নাই, এমন ভালো দারোয়ানও আর কোথাও নাই। তোমাদের দয়া হইলে, আমি একটু তামাশা দেখিয়া আসি।"

প্রশংসা শুনিয়া দারোয়ানরা বড়ই খুশি হইল। তারপর তাহারা আস্তীককে ঢুকিতে দিতে আপত্তি করিল না।

ভিতরে গিয়া আস্তীক জনমেজয়কে বলিতে লাগিলেন, "হে মহারাজ! আপনি এমন সুন্দর যজ্ঞ করিতেছেন যে কি বলিব। মহারাজ, আমি প্রার্থনা করি, আমার বন্ধুগণের মঙ্গল হউক। প্রাচীন কালের অতি প্রসিদ্ধ রাজা আর মুনি-ঋষিগণ যে-সকল মহা মহা যজ্ঞ করিয়াছিলেন, আপনার এই যজ্ঞও

তেমনি হইয়াছে। মহারাজ! আমি প্রার্থনা করি, আমার বন্ধুগণের মঙ্গল হউক। কত বড়-বড় মুনিগণ আপনার যজ্ঞে কাজ করিতেছেন। ইঁহারা যে কত বড়-বড় পণ্ডিত, তাহা আমি বলিয়া শেষ করিতে পারি না। আর আপনি যে কিরূপ ধার্মিক রাজা তাহা মনে করিলে বড়ই সুখ হয়।"

নিজের প্রশংসা শুনিলে, দেবতার মনও খুশি হয়। আর সেই প্রশংসা যদি আস্তীকের ন্যায় অপরূপ সুন্দর একটি বালকের সুমিষ্ট কথায় হয়, তবে তাহার উপর সন্তুষ্ট না হইয়া, কেহই থাকিতে পারে না। সুতরাং জনমেজয় বলিলেন, "হে মুনিগণ, আপনাদের কি অনুমতি হয়? আমার তো ইচ্ছা হইতেছে যে এই সুন্দর বালকটি যাহা চায়, তাহা তাহাকে দিয়া দিই।"

মুনিরা বলিলেন, "তক্ষক বিনা ইনি আর যাহা চাহেন, তাহাই পাইতে পারেন।"

তখন রাজা আস্তীককে বর দিতে গেলে, প্রধান মুনি একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "মহারাজ, তক্ষক কিন্তু এখনো আসিল না।"

তাহাতে জনমেজয় বলিলেন, "আপনারা তক্ষককে শীঘ্র উপস্থিত করিবার চেষ্টা করুন।"

তখন সেই লালচোখওয়ালা লোকটি যে বলিয়াছিল, 'এক ব্রাহ্মণ যজ্ঞে বাধা দিবে।' সে বলিল, "মহারাজ, তক্ষক ইন্দ্রের নিকট আশ্রয় লইয়াছে, তাই তাহাকে সহজে আনা যাইতেছে না।"

মুনিরাও বলিলেন, "হাঁ, এ কথা ঠিক।"

ইহাতে প্রধান মুনি ইন্দ্রের পূজা আরম্ভ করিলেন। তখন আর ইন্দ্র চুপ করিয়া স্বর্গে বসিয়া থাকিবেন কিরূপে? তাঁহাকে পূজার স্থানে যাত্রা করিতেই হইল। তক্ষক দেখিল মহা বিপদ! ইন্দ্রকে ছাড়িয়া যাইতেও সাহস হয় না। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সে ইন্দ্রের চাদরের ভিতরে লুকাইয়া রহিল।

এদিকে রাজা জনমেজয় দেখিলেন যে ইন্দ্রের আশ্রয় পাইয়া তক্ষক তাঁহাকে ফাঁকি দিতেছে। সুতরাং তিনি ক্রোধভরে মুনিদিগকে বলিলেন, "যদি ইন্দ্র তক্ষককে লুকাইয়া রাখেন, তবে তাঁহাকে সুদ্ধই দুষ্টুকে পোড়াইয়া মারুন।"

রাজার কথায় মুনিগণ তক্ষকের নাম লইয়া অগ্নিতে আহুতি দিবামাত্র, ইন্দ্রকে সুদ্ধই সে কাঁপিতে কাঁপিতে আকাশের ভিতর দিয়া আসিয়া দেখা দিল। তখন ইন্দ্র প্রাণের ভয়ে তক্ষককে ছাড়িয়া ব্যস্তভাবে প্রস্থান করিল। তক্ষক ঘুরিতে ঘুরিতে ক্রমে যজ্ঞের আগুনের নিকট আসিতে লাগিল। তাহাতে ব্রাহ্মণেরা বলিলেন, "মহারাজ, আর চিন্তা নাই। ঐ দেখুন, তক্ষক চেঁচাইতে চেঁচাইতে এদিকে আসিতেছে। এখন বালকটিকে বর দিতে পারেন।"

তাহা শুনিয়া রাজা বলিলেন, "হে ব্রাহ্মণকুমার, এখন তুমি যাহা চাহ, তাহাই দিব। বল, তোমার কি বর চাই?"

আস্তীক বলিলেন, "আমি এই বর চাহি যে আপনার যজ্ঞ থামিয়া যাউক। আর যেন ইহার আগুনে পুড়িয়া সাপেদের মৃত্যু না হয়।"

এ কথা শুনিয়াই তো রাজা চমকিয়া উঠিলেন। তাঁহাকে যদি হঠাৎ তক্ষকে

কামড়াইত, তবুও বোধ হয় তিনি এত চমকিয়া উঠিতেন না। তিনি নিতান্ত ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "সেও কি হয়? ঠাকুর, আপনি আর কিছু প্রার্থনা করুন। টাকাকড়ি যত আপনার ইচ্ছা হয়, আমি আপনাকে দিতেছি, কিন্তু যজ্ঞ থামাইতে পারিব না।"

আস্তীক বলিলেন, "আমি যাহা চাই, তাহা যদি না পাইলাম, তবে টাকাকড়ি দিয়া কি করিব? আমি আমার মাতুলদিগকে বাঁচাইতে আসিয়াছি, টাকার জন্য আসি নাই।"

তখন মুনিগণ বলিলেন, "মহারাজ যখন দিবেন বলিয়াছেন, তখন এই বালক যাহা চাহিতেছেন, তাহা ইঁহাকে দিতেই হইতেছে।"

এদিকে তক্ষক আগুনের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, আর এক মুহূর্ত পরেই পুড়িয়া মারা যাইবে। ইহা দেখিয়া আস্তীক চিৎকার করিয়া তিনবার তাঁহাকে বলিলেন, "তিষ্ঠ! তিষ্ঠ! তিষ্ঠ!" থাম, থাম, থাম। তাহাতেই তক্ষক আর আগুনে না পড়িয়া কিছুকাল শূন্যে থামিয়া রহিল।

ঠিক এই সময়ে, ব্রাহ্মণদিগের কথায়, জনমেজয় আস্তীককে বর দিতে সম্মত হইয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তবে যজ্ঞ থামুক। সর্পগণের ভয় দূর হউক।"

এ কথায় তখনই যজ্ঞ থামিয়া গেল, তক্ষকেরও আর পুড়িয়া মরিতে হইল না। যাহারা যজ্ঞ দেখিতে আসিয়াছিল, তাহারা ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া, জয় জয় শব্দে কোলাহল করিতে লাগিল। এইরূপে আস্তীক তাঁহার মাতুলদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

আস্তীকের এই কার্যে সাপেরা প্রাণে বাঁচিয়া গেল। সুতরাং তাহারা যে সন্তুষ্ট হইল, এ কথা বলাই বাহুল্য। তাহারা বার বার বলিতে লাগিল, "বাছা, তুমি আমাদের প্রাণ রক্ষা করিয়াছ; বল, আমরা কি করিয়া তোমাকে সন্তুষ্ট করিব?"

আস্তীক বলিলেন, "আপনারা যদি আমার উপর সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে, আমার নাম যে লইবে আপনারা আর তাহাকে হিংসা করিবেন না।"

সাপেরা বলিল, "এখন হইতে যে তোমার নাম লইবে আমরা তাহার কোনো অনিষ্ট করিব না। এ কথা যে অমান্য করিবে, তাহার মাথা শিমুলের কলার মতো ফাটিয়া যাইবে।"

শব্দবেধী

জন্তুকে না দেখিয়া, কেবলমাত্র তাহার শব্দ শুনিয়াই যে তাহাকে তীর দিয়া বিঁধিতে পারে, তাহাকে বলে 'শব্দবেধী'।

রাজা দশরথ এইরূপ 'শব্দবেধী' ছিলেন। যুবা বয়সে অনেক সময় তিনি রাত্রিতে বনে গিয়া এইরূপে কত হাতি, মহিষ, হরিণ শিকার করিতেন। বর্ষার রাত্রে তীর-ধনুক লইয়া চুপিচুপি সরযূর ধারে বসিয়া থাকিতে

তাঁহার বড়ই ভালো লাগিত। নদীর ঘাটে নানারূপ জন্তু জল খাইতে আসিত ; সেই জলপানের শব্দ একটিবার দশরথের কানে গেলে আর সে জন্তুকে ঘরে ফিরিতে হইত না।

একবার এইরূপ বর্ষার রাত্রিতে দশরথ সরযূর ধারে তীর-ধনুক লইয়া বসিয়া আছেন। মনে আর কোনো চিন্তা নাই, খালি কান পাতিয়া রহিয়াছেন, কখন কোন জানোয়ারের শব্দ শোনা যাইবে। প্রায় সমস্ত রাত্রি এইভাবে কাটিয়া গিয়াছে, ভোর হইতে আর বেশি বাকি নাই। এমন সময় নদীর ঘাট হইতে 'গুড়্-গুড়্-গুড়্-গুড়্' করিয়া একটা আওয়াজ আসিল!

দশরথ চমকিয়া ভাবিলেন, 'ঐ হাতি!' আর সেই মুহূর্তেই সেই শব্দের দিকে একটি ভয়ংকর বাণ শন্‌শন্‌ শব্দে ছুটিয়া চলিল।

দশরথ জানেন না যে সে বাণে কি সর্বনাশ হইবে। সে শব্দ তো হাতির শব্দ নয়, ঋষির পুত্র ভোরের বেলায় কলসী হাতে ঘাট হইতে জল নিতে আসিয়াছেন, সেই কলসীতে জল পোরার ঐ শব্দ।

অন্ধ পিতামাতা বিছানায় পড়িয়া কষ্ট পাইতেছেন ; তাঁহারা একে যারপরনাই বুড়া, তাহাতে আবার নিতান্ত দুর্বল, চলিবার শক্তি নাই। পিপাসায় তাঁহাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত, তাই ছেলেটি ছুটিয়া জল নিতে আসিয়াছেন, এমন সময় কোথা হইতে এই নিদারুণ বাণ আসিয়া তাহার বুকে বিঁধিল। রক্তে দেহ ভাসিয়া গেল, কলসী হাত হইতে পড়িয়া গেল।

ঋষিপুত্র ধুলায় পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে বলিলেন, "আহা! আমি তো কাহারও কোনো অনিষ্ট করি না। বনে থাকি, ফলমূল খাই আর বৃদ্ধ অন্ধ পিতামাতার সেবা করি! ওগো! আমি তোমার নিকট কি অপরাধ করিয়াছিলাম যে এমন নিষ্ঠুর সাজা আমাকে দিলে? হায় হায়! আমার পিতামাতাকে দেখিবার যে আর কেহই নাই। আমি মরিলে যে আর তাঁহারা কিছুতেই বাঁচিবেন না!"

ঋষিপুত্রের কথা শুনিয়া দশরথের হাত হইতে ধনুর্বাণ পড়িয়া গেল। তিনি দুঃখে অস্থির হইয়া পাগলের মতো ছুটিয়া আসিয়া দেখিলেন যে সর্বনাশ হইয়া গিয়াছে!

তখন ঋষিপুত্র অতি কষ্টে তাঁহাকে বলিলেন, "মহারাজ! আমার কি অপরাধ ছিল? এই এক বাণে আমারও প্রাণ গেল, আমার পিতামাতারও প্রাণ গেল। আহা! মা আর বাবা পিপাসায় কাতর হইয়া পথ চাহিয়া আছেন, আমি গেলে জল খাইতে পাইবেন।"

দুঃখে দশরথের বুক ফাটিয়া যাইতেছে, তাঁহার কথা বলিবার শক্তি নাই। তাহা দেখিয়া সেই যাতনার মধ্যেও ঋষিপুত্রের দয়া হইল ; তিনি বলিলেন, "মহারাজ! আর এখানে বিলম্ব করিবেন না। এই সরু পথে আমাদের কুটিরে যাওয়া যায়। শীঘ্র গিয়া আমার পিতাকে এই সংবাদ দিন, আর তাঁহার রাগ দূর করুন, নইলে তিনি আপনাকে ভয়ংকর শাপ দিবেন। আর এই বাণ যে আমার বুকে বিঁধিয়া রহিয়াছে, ইহার যন্ত্রণা আমি সহ্য করিতে পারিতেছি না, শীঘ্র

এটাকে তুলিয়া দিন।"

দশরথ ভাবিলেন, "হায়! আমি এখন কি করি? বাণ না তুলিলে ই'হার যন্ত্রণা যাইবে না, কিন্তু বাণ তুলিলেই ই'হার মৃত্যু হইবে।"

তখন ঋষিপুত্র বলিলেন, "আপনার কোনো ভয় নাই। বাণ তুলিবার সময় যদি আমি মরিয়া যাই, তাহাতে আপনার ব্রাহ্মণবধের পাপ হইবে না। আমি ব্রাহ্মণ নহি, আমার পিতা বৈশ্য, মা শূদ্রের মেয়ে।"

এ কথায় দশরথ ঋষিপুত্রের বুক হইতে বাণ টানিয়া বাহির করিলেন, আর তাহার সঙ্গে সঙ্গেই ছেলেটির প্রাণ বাহির হইয়া গেল। তখন সেই কলসী ভরিয়া জল লইয়া দশরথ নিতান্ত দুঃখিত মনে ধীরে ধীরে কুটিরের দিকে চলিলেন। সেখানে অন্ধ মুনি আর তাঁহার অন্ধ পত্নী পিপাসায় কাতর হইয়া পুত্রের আশায় বসিয়া আছেন। দশরথের পায়ের শব্দ শুনিয়া মুনি বলিলেন, "বাবা, এত বিলম্ব কেন হইল? তোমার জন্য তোমার মা বড় ব্যস্ত হইয়াছেন, শীঘ্র ঘরে আইস। তুমি কি রাগ করিয়াছ বাবা? আমাদের যদি কোনো দোষ হইয়া থাকে, তাহা তোমার মনে করা উচিত নয়। তুমি কথা কহিতেছ না কেন?"

দশরথের চোখ জলে ভরিয়া গেল। তিনি অনেক কষ্টে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "ভগবন্, আমি আপনার পুত্র নহি। আমি ক্ষত্রিয়, আমার নাম দশরথ। আজ এই অভাগার বাণে আপনার পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে। আমি জন্তু মারিবার জন্য সরযূর ধারে বসিয়া ছিলাম। আপনার পুত্রের কলসীতে জল ভরার শব্দ শুনিয়া মনে করিলাম বুঝি হাতির শব্দ। অন্ধকারের ভিতরে সেই শব্দের দিকে বাণ ছু'ড়িলাম, তাহাতেই এই সর্বনাশ হইল। এখন এই পাপীর প্রতি আপনার যাহা ইচ্ছা হয় করুন।"

এই বলিয়া দশরথ ছলছল চোখে জোড়হাতে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

মুনি এই দারুণ সংবাদ শুনিয়াও সাধারণ লোকের মতো ব্যস্ত হইলেন না, রাজাকে কোন কঠিন শাপও দিলেন না। তিনি কেবল একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "মহারাজ! তুমি না জানিয়া এ কাজ করিয়াছ, তাই রক্ষা পাইলে, নহিলে আজ তোমার বংশসুদ্ধ নষ্ট হইত। এখন এক কাজ কর, আমরা আমাদের পুত্রের নিকট যাইতে চাহি, একটিবার আমাদিগকে সেখানে লইয়া চল।"

রাজা তখনই তাঁহাদের দুজনকে সরযূর ধারে লইয়া আসিলেন। তাঁহাদের চক্ষু নাই, সুতরাং জন্মের মতো একটিবার পুত্রের মুখ দেখিবার উপায় নাই। তাঁহারা কেবল তাঁহার দেহের উপর পড়িয়া বারবার তাঁহাকে আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন। তারপর চিতা প্রস্তুত করিয়া সেই দেহ পোড়ান হইল।

তখন অন্ধমুনি নিতান্ত দুঃখের সহিত রাজাকে বলিলেন, "মহারাজ! পুত্রের শোকে আমি এখন যে দুঃখ পাইতেছি, এইরূপ পুত্রশোক তোমাকেও পাইতে হইবে।"

এই বলিয়া তাঁহারা দুজনে সেই চিতায় ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন, আর দেখিতে

দেখিতে তাঁহাদের শরীর ভস্ম হইয়া গেল।

ইহার অনেক বৎসর পরে বৃদ্ধ বয়সে, কৈকেয়ীর ছলনায় দশরথ রামকে বনে দেন, আর সেই রামের শোকে তাঁহার মৃত্যু হয়। তখন অন্ধ মুনির সেই কথাগুলি তাঁহার মনে পড়িয়াছিল—

> 'পুত্রব্যসনজং দুঃখং যদেতন্মম সাম্প্রতম্
> এবং ত্বং পুত্রশোকেন রাজন্ কালং করিষ্যসি।।'